সংখ্যা — ৫-৬;

৩য় খণ্ড | ষড়বিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

ভগবান মহাবীর

শ্রীপূরণচাঁদ শামসুখা

(প্রবন্ধ)

যে ভারতে যে সমস্ত মহামানব জন্মগ্রহণ করিয়া মানবকে আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন মহাবীর তাঁহাদের অন্যতম। ইনি জৈনসম্প্রদায়ের চতুর্বিংশতিতম বা শেষ তীর্থঙ্কর। ইঁহার পূর্ব্বে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োবিংশতিতম ভগবান পার্শ্বনাথ পর্য্যন্ত ত্রয়োবিংশতিজন তীর্থঙ্কর ঐতিহাসিক ভারতভূমিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে মহাবীর আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে সময়ে দেশে এক বিশেষ প্রকারের ধর্ম্মভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল। বৈদিক যজ্ঞে অনুষ্ঠিত হিংসার বিরুদ্ধে শ্রমণদের কতিপয় বিশিষ্ট নেতা প্রবলভাবে আন্দোলন করিতেছিলেন এবং কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি বা নির্ব্বাণতত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তৎপ্রতি জনমানসকে আকৃষ্ট করিতেছিলেন। এইরূপ শ্রমণ-সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে নির্গ্রন্থ বা জৈন সম্প্রদায়ের নেতা মহাবীর, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতা গৌতম-বুদ্ধ, আজীবক সম্প্রদায়ের নেতা মঙ্খলিপুত্র গোশালা বিশেষভাবে ভারতীয় চিন্তাধারাকে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বৎসর হইতে ২৪৩৭ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫৯৯ অব্দে বৈশালীর অন্তর্গত ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রামে—প্রাচীনকালের ভাষায় বলিতে গেলে, গ্রীষ্ম-ঋতুর প্রথম মাসে দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ চৈত্র মাসের (চৈত্র মাসকে তখন গ্রীষ্মের প্রথম মাস ধরা হইত) শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে নিশীথ সময়ে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন (১)।

(১) বর্ত্তমান সময়ে ঋতুর গণনা ভিন্ন, কিন্তু শাস্ত্রকারগণ বৎসরে তিন ঋতুই ধরা হইত। চৈত্র হইতে আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক বর্ষা ও অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুনকে হেমন্ত ঋতু বলা হইত এবং তদনুযায়ী আষাঢ় চাতুর্মাস, কার্ত্তিক চাতুর্মাস ও ফাল্গুন চাতুর্মাস গণনা করা হইত।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মহাবীরের জন্মস্থানের নাম ক্ষত্রিয় কুণ্ড-গ্রাম। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে ইহা সম্মিলিত লিচ্ছবী-রাজ-সংঘের রাজধানী পুরাতন ভারতের সুবিখ্যাত নগর বৈশালীর একটী অংশ বা পল্লী অর্থাৎ পাড়া। এই নগরের যে অংশে ক্ষত্রিয়গণ বাস করিতেন তাহাকে ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রাম এবং যে অংশে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন তাহাকে ব্রাহ্মণ কুণ্ডগ্রাম বলা হইত। ইঁহাদের মতে বর্ত্তমান পাটনার সাতাইশ মাইল উত্তরে গঙ্গার উত্তর পারে বসাঢ়, বসুকুণ্ড ও বাণিয়া নামক তিনটী ক্ষুদ্র গ্রামই যথাক্রমে পুরাতন কালের কেন্দ্র বৈশালী কুণ্ডগ্রাম ও বাণিজ্য গ্রাম।—অধুনা জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বেতাম্বরগণ লক্ষ্মীসরাই ষ্টেশন হইতে আঠার মাইল দক্ষিণে গয়া-জেলার অন্তর্গত লছবাড় নামক একটী গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটী পাহাড়ের অধিত্যকাতে ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রাম ছিল বলিয়া মানেন, আর দিগম্বরগণ বর্ত্তমান নালন্দার নিকটবর্ত্তী কুণ্ডলপুর নামক গ্রামকে মহাবীরের জন্মভূমি বলিয়া মানিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুই মত সম্বন্ধেই সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

যে দিবস ভগবান মহাবীর তাঁহার মাতার গর্ভে প্রথম আবির্ভূত হন, সেই রজনীতেই তাঁহার মাতা অর্দ্ধ-সুপ্ত অবস্থায় চতুর্দ্দশটী মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইয়াছিলেন। জৈন ধর্ম্মের ইহা একটী বিশ্বাস যে, কোন ভাবী তীর্থঙ্কর মাতৃগর্ভে আগত হওয়া মাত্র তাঁহার মাতা সেই রাত্রিতে অনুক্রমে এই চতুর্দ্দশটী স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, যথা :—

১। চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট শ্বেত হস্তী, ২। বৃষভ, ৩। সিংহ ৪। লক্ষ্মীদেবী, ৫। পুষ্পমালাযুগল, ৬। চন্দ্র, ৭। সূর্য্য, ৮। ধ্বজা, ৯। কলস, ১০। পদ্ম-সরোবর, ১১। ক্ষীরসমুদ্র, ১২। দেব-বিমান, ১৩। রত্ন-রাশি এবং ১৪। নির্দ্ধূম-অগ্নি।

ভগবান মহাবীরের পিতার নাম সিদ্ধার্থ। ইনি জ্ঞাত্র নামক ক্ষত্রিয় কুলের অধিনায়ক ছিলেন।—মাতার নাম ত্রিশলা। ইনি বৈশালী রাজ-সংঘের অধিনায়ক মহারাজা চেটকের ভগিনী। মহাবীরের পিতৃদত্ত নাম ছিল বর্দ্ধমান; তিনি ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া মহাবীর, জ্ঞাত্র-কুলের সন্তান বলিয়া নায়পুত্ত নাতপুত্ত বৈশালী বা বিদেহ দেশের অধিবাসী বলিয়া বৈশালিক, বিদেহ-দত্ত প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

তাঁহার পিতৃব্যের নাম ছিল সুপার্শ্ব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দিবর্দ্ধন, ভগিনীর নাম সুদর্শনা, স্ত্রীর নাম যশোদা, কন্যার নাম অনবদ্যা বা প্রিয়দর্শনা এবং নাতনীর নাম শেষবতী বা যশোবতী। শ্বেতাম্বর মতে মহাবীর বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁহার এক কন্যা হইয়াছিল। কিন্তু দিগম্বরগণের মত অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার বিবাহ হয় নাই—আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন।

মহাবীরের বাল্যকালের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহাকে শিক্ষকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য যথারীতি পাঠান হইয়াছিল কিন্তু এরূপ বর্ণিত আছে যে, শিক্ষারম্ভের প্রথম মুহূর্ত্তেই তাঁহার জ্ঞান শিক্ষকের জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, কুমার বর্দ্ধমান অতি অচিরেই সমস্ত কলায় প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সংসারে তাঁহার মনোনিবেশ হইত না। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেন। যথা সময়েই বর্দ্ধমান কুমারের বিবাহ হয়, বসু যশোদা কৌণ্ডিন্য গোত্রীয়া ছিলেন। এই বিবাহের ফলে অনবদ্যার জন্ম হয়।

মাতাপিতা বর্দ্ধমান কুমারকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া ইনি স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের জীবদ্দশায় সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেন না। যখন ইঁহার বয়স আটাশ বৎসর তখন সিদ্ধার্থ ও ত্রিশলা উভয়েরই মৃত্যু হয়। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর বর্দ্ধমানকুমার দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিবর্দ্ধনের আদেশ ভিক্ষা করেন; কিন্তু ভ্রাতা আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলায় আরও দুই বৎসর গৃহে অবস্থান করেন। শেষ বৎসরে তিনি প্রত্যহ দান করিতেন—কোন প্রত্যাশী তাঁহার নিকট হইতে পূর্ণ-মনোরথ না হইয়া ফিরিত না।

ত্রিশ বৎসর বয়সে মহাবীরস্বামী সংসার ত্যাগ করা স্থির করিলেন। হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথিতে তৃতীয় প্রহরে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে ক্ষত্রিয়-কুণ্ড-গ্রামের বহির্স্থিত জ্ঞাত্র-কুলের উদ্যানে, দীক্ষাগ্রহণের জন্য মহাড়ম্বরে আত্মীয়-স্বজনাদি সহ উপনীত হন। তথায় অশোক বৃক্ষতলে দেহের সমস্ত আভরণ ও বস্ত্রাদি উন্মোচন করেন এবং স্বহস্তে আপনার মস্তকের কেশ পাঁচবার মুষ্টির আকর্ষণে উৎপাটি

করেন। অতঃপর একটী মাত্র বস্ত্র বাম স্কন্ধে ধারণ করিয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর তের মাস যাবৎ মহাবীর বস্ত্রধারী ছিলেন তৎপরে সম্পূর্ণ বস্ত্ররহিত হন। যে বস্ত্রখানি তাঁহার স্কন্ধে ছিল তাহার অর্দ্ধেক এক ব্রাহ্মণকে দান করেন; অপরার্দ্ধ সুবর্ণবালুকা নদীর তীরে কণ্টক বৃক্ষের সংস্পর্শে স্কন্ধ হইতে অপসৃত হয়। দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি ঘোর তপস্যাতে নিমগ্ন হন। প্রায় সমস্ত সময় মৌনব্রত ধারণ করিয়া কায়োৎসর্গপূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। বর্ষা ঋতুর চারিমাস একস্থানে অবস্থান করিতেন, অন্য সময়ে একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন।

এই সময়ে মঙ্খলি-পুত্র গোশালা আসিয়া মিলিত হন। গোশালা নিজকে শিষ্য করিয়া লইতে মহাবীরকে অনুরোধ করেন; কিন্তু মৌনব্রতী মহাবীর সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন না করায় গোশালা ইঁহার নিকট থাকিয়া যান এবং নিজকে মহাবীরের শিষ্য বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর থাকিয়া গোশালা চলিয়া যান কিন্তু আবার ছয়মাস পরে আসিয়া মিলিত হন। প্রায় ছয় বৎসর একত্রে থাকিবার পর গোশালা মহাবীর স্বামীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং নিজকে সর্ব্বজ্ঞ ও তীর্থঙ্কর বলিয়া ঘোষণা করিয়া আজীবক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু ও নেতা হন। পরবর্ত্তী-কালে গোশালা নির্গ্রন্থ বা জৈন সম্প্রদায়ের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হন।

ভগবান মহাবীর কিঞ্চিদধিক বার বৎসর কাল ঘোর তপস্যারত থাকেন এবং বহুস্থান পর্য্যটন করেন। রাজগৃহ, চম্পা, বৈশালী, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, শ্বেতাম্বী, আলম্ভিকা প্রভৃতি অনেক নগরে, গ্রামে, উদ্যানে, বনে, অনার্য্যদের দৃঢ়ভূমি প্রদেশে (বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণা ?) বাঙ্গলার রাঢ়দেশে ও অন্যান্য বহুস্থানে বিচরণ করেন এবং বহুবিধ কষ্ট সহ্য করেন। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি নৈসর্গিক কষ্ট, মশকাদির দংশন, কুকুরাদির আক্রমণ এবং দৈব ও মনুষ্যাদি কৃত যে সমস্ত প্রচণ্ড কষ্ট ইঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। এই সমস্ত দুঃখকষ্ট তিনি অম্লানবদনে নির্ব্বিকার-চিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন—বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। এস্থলে মাত্র একটী উপসর্গের বিবরণ উল্লিখিত হইল। একস্থানে ধ্যানমগ্ন থাকার সময় এক গোয়ালা তাঁহার দুই কানের ভিতর কীলক প্রোথিত করে। ইহার ফলে তাঁহার উভয় কর্ণমূল প্রদাহিত হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে কিন্তু মহাবীর অবিচলিত-চিত্তে বেদনা সহ্য করিতে থাকেন। মধ্যপাবাপুরের (বর্ত্তমান রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী পাবাপুর) সিদ্ধার্থ-নামক এক বণিক এবং খরক নামক এক বৈদ্যের চেষ্টায় কীলক দুইটী অবশেষে নিষ্কাশিত হয় এবং উক্ত বৈদ্যের দ্বারা ঔষধ লেপনে স্ফীত স্থান ক্রমে আরোগ্য লাভ করে।

এইরূপে মন-বচন-কায়াকে সংযত করিয়া, ক্রোধ-মান-মায়া-লোভকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া শান্ত, প্রশান্ত, আকাশের ন্যায় নিরালম্ব, বায়ুর ন্যায় অপ্রতিবদ্ধ, শরৎকালীন জলের ন্যায় শুদ্ধহৃদয়, পদ্মপত্রের ন্যায় নিরুপলেপ, সাগরের ন্যায় গম্ভীর হইয়া অনুপম জ্ঞান, অনুপম দর্শন, অনুপম চরিত্র, অনুপম বীর্য্য, অনুপম সরলতা, অনুপম কোমলতা, অনুপম বিনয়, অনুপম ক্ষান্তি, অনুপম তুষ্টি, অনুপম সত্য-সংযম-তপশ্চরণ দ্বারা আত্মধ্যানে লীন হইয়া বিচরণ করিতে করিতে সন্ন্যাস গ্রহণের পর দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল। ত্রয়োদশ বৎসরের প্রথমার্দ্ধে, গ্রীষ্ম ঋতুর দ্বিতীয় মাসে চতুর্থ পক্ষে অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে দশমী তিথিতে দিবা তৃতীয় প্রহরের শেষ ভাগে জৃম্ভিক গ্রামের বহির্ভাগে ঋজুবালিকা নদীর তীরে ব্যাবৃত নামক ধর্ম্মায়তনের নিকটে শ্যামাক নামক গৃহস্থের ক্ষেত্রভূমিতে শাল বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন অবস্থাতে তাঁহার কেবল-জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

কেবল-জ্ঞান উৎপন্ন হওয়াতে তিনি অর্হন্, জিন, কেবলী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী হইলেন। সম্পূর্ণ চরাচরের সমস্ত দৃশ্য এবং অদৃশ্য চেতন ও অচেতন পদার্থ এবং বিশ্বভুবনের সমুদয় ভাবরাশি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার গোচরীভূত হইল।

ভগবান মহাবীর কেবল-জ্ঞান লাভ করার পর পাবা-পুরীতে আসিলেন। এস্থলে বেদ-বেদাঙ্গাদি সমস্ত শাস্ত্রে বিশারদ একাদশ জন ব্রাহ্মণাচার্য্য বহু শিষ্যসহ ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এই একাদশ জনকে নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের গণধর পদে স্থাপিত করা হয় ইঁহারা সাধু-সংঘের নেতা হইলেন। ইঁহাদের নাম: নগরের অন্তর্গত গুব্বর-গ্রাম নিবাসী গৌতম-গোত্রীয় তিন ভ্রাতা ১। ইন্দ্র-ভূতি, ২। অগ্নিভূতি, ৩। বায়ুভূতি; কোল্লাগ-সন্নিবেশের অধিবাসী ৪। ব্যক্ত, ৫। সুধর্ম্ম; মৌর্য্য-

সন্নিবেশের অধিবাসী ৬। মিথিত. ৭। মৌর্যাপুত্র : কোশলদেশের অধিবাসী ৮। অচল : মিথিলার অধিবাসী ৯। অকম্পিত : বৎস দেশের তুঙ্গীয়-সন্নিবেশের অধিবাসী ১০। মেতার্য এবং রাজগৃহের অধিবাসী ১১। প্রভাস।

গণধরগণ দ্বাদশ 'অঙ্গশাস্ত্র' নামক জৈনশাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্ত্তমানে যে একাদশ 'অঙ্গ' পাওয়া যায় তাহা পঞ্চম গণধর সুধর্ম্মের প্রণীত। দ্বাদশতম অঙ্গ—যাহার নাম চতুর্দ্দশ "পূর্ব্ব"-শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল, এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান একাদশ অঙ্গের নাম :—১। আয়ারাঙ্গ, ২। সূয়গড়াঙ্গ, ৩। ঠানাঙ্গ, ৪। সমবায়াঙ্গ, ৫। বিবাহ-পন্নত্তি বা ভগবতী, ৬। নায়াধম্মকহা, ৭। উবাগয়দসাও, ৮। অন্তগড়দসাও, ৯। অনুত্তরোববাইয়দসাও, ১০। পহ্নাবাগরণম্, ১১। বিবাগসুয়ম্।

মহাবীর এসময়ে তীর্থ স্থাপনা করেন বলিয়া তীর্থঙ্কর নামে বিখ্যাত হন। জৈন শাস্ত্রে তীর্থ শব্দের বিশেষ অর্থ প্রচলিত আছে। "তীর্থ" বলিতে সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক, শ্রাবিকা এই চতুর্ব্বিধ সঙ্ঘকে বুঝায় এবং যিনি এই প্রকার তীর্থের অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ সঙ্ঘের স্থাপনা করেন তাঁহাকে তীর্থঙ্কর বলে।

মহাবীরের পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের পরম্পরাগত নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের সাধুগণ যাঁহারা এ সময়ে ছিলেন তাঁহারা মহাবীরের সম্প্রদায়ে মিলিত হইলেন ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত সংস্কার মানিয়া লইলেন।

ভগবান মহাবীর তীর্থঙ্কর হইয়া বহু নগরে, গ্রামে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। মগধ কাশী, কোশল, বৈশালী প্রভৃতির রাজগণ তাঁহার অসীম জ্ঞান ও মহান্ চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিতেন। যখন যে কোন স্থানে উপনীত হইতেন তখন সংস্থানের রাঁজাপ্রমুখ ব্যক্তিগণ মহা সমারোহে তাঁহাকে বন্দনা করিতে যাইতেন। মগধের শিশুনাগ বংশীয় মহারাজ বিম্বসার—যিনি জৈনগ্রন্থে শ্রেণিক নামে বিখ্যাত—তাঁহার অনন্যোপাসক ভক্ত ছিলেন।

ভগবান মহাবীর ত্রিশ বৎসর কাল ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া বর্ষাকালের চতুর্থ মাসে, সপ্তমপক্ষে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষে, অমাবস্যা তিথিতে, রজনীর শেষ মুহূর্ত্তে স্বাতী নক্ষত্রে, রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী মধ্যমপাবা নামক নগরে হস্তী-পাল নামক রাজার পুরাতন লেখনশালাতে ৭২ বৎসর বয়সে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে রত অবস্থায় নশ্বর-দেহ ত্যাগ করিয়া জন্ম-জরা-মরণকে চিরকালের জন্য ধ্বংস করতঃ নির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনি ত্রিশ বৎসরকাল গৃহস্থাবাসে ছিলেন, কিঞ্চিদধিক বার বৎসর যাবৎ ঘোর তপশ্চর্য্যা করেন ও কিছু কম ত্রিশ বৎসর তীর্থঙ্করূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন—সর্ব্বসমেত ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মহাবীরের নির্ব্বাণকালে নির্গ্রন্থ বা জৈন সঙ্ঘে ইন্দ্রভূতি প্রমুখ ১৪,০০০ সাধু, চন্দনা প্রমুখ ৩৬,০০০ সাধ্বী, শঙ্খ, শতক প্রমুখ ১,৫৯,০০০ ব্রতধারী শ্রাবক এবং ৩,১৮,০০০ শ্রাবিকা ছিলেন।

ভগবান মহাবীর বিশ্ব-সংসারের মহামানবগণের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যাঁহার জীবন, আদর্শ ও সিদ্ধান্তের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের প্রাণীমাত্রের কল্যাণ নিহিত আছে। যে অতুলনীয় অহিংসা ও কঠোর তপশ্চর্য্যার মহান্ আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কালের প্রত্যেক মুমুক্ষুর পথ-প্রদর্শক হইয়া থাকিবে। যজ্ঞে অনুষ্ঠিত হিংসা নিবারণকল্পে বেদবাক্যের যে আত্মমুখী অর্থ তিনি করিয়াছিলেন তাহার ফলস্বরূপ ইন্দ্রভূতি আদি বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে পারদর্শী মহাবিদ্বান বহু ব্রাহ্মণ যাজ্ঞিক ক্রিয়াকাণ্ড বিসর্জ্জন করিয়া মহাবীর প্রদর্শিত পথে আত্ম-সাধনায় নিবিষ্ট হন। ধর্ম্মক্ষেত্রে জাতিবিভাগের অসারতা ঘোষণা করার ফলে চণ্ডাল বংশোদ্ভব হরিকেশ-বল প্রভৃতি সাধুগণ আত্মসাধনার উচ্চতম শিখরে উপনীত হইয়া মুক্তিসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন এবং বহু উচ্চজাতির শির তাঁহাদের চরণপ্রান্তে অবনত হয়। ভোগবিলাসের অকিঞ্চিৎকারিতা প্রদর্শন করাতে চিরবিলাসী, মহাধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ধন্না, শালীভদ্র প্রমুখ শ্রেষ্ঠিগণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষোপজীবী সাধুগণের বৃত্তি গ্রহণ করেন।

বিশ্বসংসারের সমস্ত প্রাণী জন্ম-জরা-মরণের যে মহাকষ্ট অনাদি কাল হইতে সহ্য করিয়া আসিতেছে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চমহাব্রতের সম্যক অনুষ্ঠান দ্বারা কি প্রকারে আত্মার নিজ-স্বভাব পরিপূর্ণরূপে বিকশিত-করতঃ মুক্তির নির্ঝর, অবিনাশী, শাশ্বত, অব্যাবাধ, অনন্ত আনন্দে বিলীন হওয়া যায় তাহার উপায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই পুণ্যভূমি ভারতের নানাস্থানে সরল, সহজ [illegible] বচনে ভগবান মহাবীর প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

আমরা ঐ মহান্ আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়-ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিয়া এই আশা অন্তরে পোষণ করিতেছি যে একদিন এমন সমস্ত জগতে আসিবে যেদিন এই জ্যোতি-র্বিনন্দিত মহাতীর্থঙ্করের অমৃতোপম বাণী এবং মহান্ চরিত্রের মহত্ত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া সমগ্র জগদ্বাসী তাঁহার পুণ্য নাম ভক্তি-বিনিদ্র অন্তরে স্মরণ করিবে।

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

(১৫)

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। বাড়ী নিস্তব্ধ, সকলেই যার যার গৃহে নিদ্রা-বিভোর। রাস্তায়ও লোকজনের সাড়া-শব্দ কিছু আর বড় নাই, কেবল দুই-একখানা মোটর কখনও যাতায়াত করিতেছে, আর ক্বচিৎ দুই-একখানা রিক্সার ঘণ্টা শোনা যাইতেছে। ধীরে ধীরে লতা তখন উঠিয়া বসিল। একাই এই ঘরটিতে সে শুইয়া ছিল: বলিয়াছিল, একাই ভাল থাকিবে—অনেকটা সুস্থ সে হইয়াছে। ভয়, কি, চিন্তার কোনও কারণ আর নাই। রাত্রিটা এইভাবে কাটিয়া গেলেই সকালতক্ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবে।

উঠিয়া কিছুক্ষণ লতা বসিয়া রহিল। তার পর খোলা জানালার কাছে গিয়া একবার দাঁড়াইল। বাহিরের একটা আলোকচ্ছটা আর সম্মুখের বাড়ীগুলির দ্বিতল ত্রিতল ব্যতীত কিছুই আর দেখা যায় না। জানালাটি বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া লতা আলোটা জ্বালিল। যদি কিছু দরকার হয় এই বলিয়া বাক্সটি এই ঘরেই আনাইয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া দুই তিনখানি কাপড় বাহির করিয়া একটি পুঁটলি বাঁধিল। পলেটি বাহির করিয়া দেখিল, দুইটি টাকা আর দশটি পয়সা মাত্র তাহাতে আছে। এখানে আসিয়া মাসকাবারী কোনও বেতন সে এখনও পায় নাই।—আড়াইটি টাকা মাত্র সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, চিঠিপত্রে আর দেবালয়ে সামান্য কিছু খরচ হইয়া ইহাই সম্বল তাহার হাতে এখন রহিয়াছে। গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পলেটি লতা সেই পুঁটলির মধ্যে রাখিল। তারপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে শেষে পুঁটলিটি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বালিশটির উপরে কাত হইয়া পড়িল।

"লতা!"

চমকিয়া লতা উঠিয়া বসিল—দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিরিঞ্চি। ত্রস্তে মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। বিরিঞ্চি কহিল "না, বস তুমি। উঠ্‌ছ কেন?—আমি এই চেয়ারটায় বরং বস্‌ছি।"

একখানি চেয়ার ঘরে ছিল, আস্তে বিরিঞ্চি সেখানি একটু কাছে সরাইয়া আনিল। মাথার কাপড়টা টানিয়া একটু ঘুরিয়া লতা তখন বসিল।

"লতা!"

মুখে কোনও সাড়া উঠিল না। ফিরিয়া একটিবার চাহিবার চেষ্টা মাত্র লতা করিল।

বিরিঞ্চি কহিল, "শেষে এই বাড়ীতে এসে রাঁধুনী হ'য়েছ?"

"হাঁ।"

"কি করে কোত্থেকে এখানে—"

ঈষৎ কম্পিত মৃদু কণ্ঠে লতা উত্তর করিল, "কাশীতে ছিলাম, সেখানে—"

"ও!—তা কাশীতে—শেষে কি কাশীতে গিয়ে তোমরা ছিলে?"

"এইটুকু খবর পেয়েছিলাম, তোমার বাবা মারা গেছেন, চুঁচড়োয় তোমরা নেই"

লতা নীরব।

"চুঁচড়ো ছেড়ে কি কাশীতেই যাও?"

"না। তখন মামার বাড়ী যাই।"

"তার পর?"

"থাকবার সুবিধে হ'ল না। পরিচয় কিছু দিতে পারি নি, লোকে নানা কথা ব'লত, তাই শেষে কাশীতে আসি।"

মাথায় হাতখানি রাখিয়া একটু নত হইয়া বিরিঞ্চি বসিল। একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "কিন্তু রাঁধুনীর কাজ নিয়েছ—কেন, খরচপত্রের যে একটা ব্যবস্থা তোমাদের হ'য়েছিল?"

"খরচ মাসে মাসে যেত। কিন্তু আমি সেসব দেবত পাঠিয়ে দিই—আর নিই নি।"

আনত মুখে স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া বিরিঞ্চি আবার কহিল "তোমার মা?"

"কাশীতেই আছেন—খোকাকে নিয়ে।"

"খো—কা—ও!"

গভীর একটি নিশ্বাস বুক ভরিয়া উঠিল। মাথায় হাতখানি রাখিয়া আবার বিরিঞ্চি নতভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল।

"তা—তোমার কি তাঁর সঙ্গে কাশীতে থাকবার সুবিধে হ'ল না?"

"না। সেখানেও নানা কথা উঠল। এঁদের বাড়ীতে কাজে লেগেছিলাম; সঙ্গে নিয়ে আসতে চাইলেন—তাই চলে এলাম।"

আরও একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া অতি সঙ্কুচিত ভাবে ধীরে ধীরে বিরিঞ্চি তখন কহিল, "দিনের বেলায় পারিনি, এখন সবাই ঘুমিয়ে—তোমার সঙ্গে একটিবার দেখা করতে এলাম।"

লতা কহিল, "এসেছ, ভালই হ'য়েছে। আমিও ভাবছিলাম, যাবার আগে তোমার সঙ্গে একটিবার দেখা হ'লে ভাল হ'ত।"

"যাবার আগে!—কোথায় যাবে?"

"ঠিক এখনও কিছু ভাবতে পারিনি। তবে—সেখানে হয় যেতেই হবে। এখানে ত আর থাকতে পারি না।"

থাকিতে পারে কি?—সেও রাখিতে পারে কি? প্রতিবাদে উত্তর কিছু বিরিঞ্চির মুখে যোগাইল না। অতি অপ্রতিভভাবে নতশিরে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। একটু আমতা আমতা করিয়া শেষে কহিল, "যে ব্যবহার তোমার সঙ্গে করেছি তার কি কৈফিয়ৎ দিতে পারি জানি না।"

"কৈফিয়ৎ ত কিছু চাইনি আমি।"

"না, তা চাও নি, হয়ত চাইবেও না। তবে—তবে—আমি—যাই হোক—গোটাকত কথা তোমায় বলতে চাই, শুনবে?"

"বল।"

বিরিঞ্চি কহিল, "তোমায় যখন দেখেছিলাম, তোমার বাবার সঙ্গে যখন জানাশুনো হয়, তোমাদের ওখানে যেতাম আসতাম—"

লতা বলিয়া ফেলিল, "এ নাম, এ পরিচয় তখন কেউ জানত না।"

মুখখানি বিরিঞ্চির লাল হইয়া উঠিল। একটুকাল থামিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, "নাম—হাঁ, তা বন্ধু-বান্ধবরা—বাড়ীরও কেউ কেউ প্রায় মোহন ব'লেই আমায় ডাকত। কারও সঙ্গে আলাপ যখন হয়, পিতার নাম ধাম, কি কুলবংশের পরিচয় কেউ আজকাল চায়ও না, যেচেও কেউ বড় দেয় না। বন্ধুদের সঙ্গে এই সব কাজে যে বেরোতাম বাবা সেটা পছন্দই করতেন না—জানতে পারলে ভয়ঙ্কর রেগে যেতেন। তাই ওদের সঙ্গে ডলাটিগরীতে কোথাও গেলে আর কোনও ছুতো দেখিয়ে যেতাম—পরিচয়ও কোথাও দিতাম না। সে যাই হোক, শেষে যখন বুঝতে পারলাম, বাবার মত কোনও মতে পাওয়া যাবে না, তখন—তখন—আমি উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিলাম—হিতাহিত জ্ঞান ছিল না—সামলাতে পারলাম না—পরিচয় সব গোপন ক'রে তোমাকে বিবাহ করি। দু-তিন জন খুব অন্তরঙ্গ বিশ্বাসী বন্ধু ছাড়া কেউ আর কিছু জানত না। উৎসাহও খুব তারা দেখায়, জোগাড়-যন্তরও নিজেরা সব ক'রে নেয়।"

লতা কোনও উত্তর করিল না। চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিল, মুখ ফিরাইয়াই বসিয়া রহিল।

বিরিঞ্চি কহিল, "এমন যে শেষে হবে, স্বপ্নেও তা তখন ভাবিনি। ইলার বাবা ওঁর বড় একজন বন্ধু ছিলেন। এই সম্বন্ধ যখন ক'রলেন, গোপনে একদিন সব কথা তাঁকে জানালাম। কিন্তু কোনও কথা কানেও তিনি তুলেন না। আমি দুর্ব্বল—এমন ধারা অবস্থা তখন ঘটল যে বুঝতে আর পারলাম না, তাঁর মতেই বাধ্য হ'তে হ'ল। বিবাহ দিয়ে অতি তাড়াতাড়ি ক'রেই আমাকে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। তোমার খরচপত্র সম্বন্ধে ঐ ব্যবস্থা ক'রে কেবল তাই আমাকে জানালেন। আর কড়াভাবে নিষেধ ক'রে দিলেন, তোমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না রাখি, কোনও খবরাখবরও কিছু না করি। আর যদি তা কিছু করি, বললেন, জানতে তিনি পারবেন, আর তাহ'লে—তাহ'লে—"

"তাহ'লে—কি?"

"বললেন, খরচপত্র একদম বন্ধ ক'রে দেবেন।"

"কিসের খরচপত্র!—আমাদের পোরপোষের জন্য এই যা ব্যবস্থা করেছিলেন, তাই?"

লতা ঘুরিয়া একবার চাহিল। অশ্রুধারা তখন শুরু হইয়া আসিয়াছিল। সে দৃষ্টির সম্মুখে বিরিঞ্চি মুখ তুলিয়া চক্ষু খুলিয়া চাহিতে পারিল না। অন্যদিকে একটু ফিরিয়া আনতমুখে কহিল, "তাই বটে।—তবে—তবে—"

"কি? কি তবে?"

"আমি—আমি—একেবারে নিরুপায় হ'য়ে প'ড়েছিলাম।"

আর যে সব কথা তখন তিনি বলেছিলেন—তাতে—তাতে—বুঝতেই আমি পারছিলাম না, কি করতে পারি—সর্ব্বনাশ যা ক'রে ফেলেছি, প্রতিকার তার কি হ'তে পারে—মনে হ'ল অগত্যা এই এখন মন্দের ভাল। বিয়ে আর একটা ক'রে ফেলেছি—আইন-কানুনও ভাল জানতাম না—"

"আইন-কানুন! আইন-কানুনের কি? কেন, কি তিনি বলেছিলেন?"

গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিরিঞ্চি কহিল, "সে কথা মুখ ফুটে তোমায় বলতে পারছিনি লতা। তবে—তবে—চেপে রাখাটাও বোধ হয় উচিত হবে না। বলেছিলেন, তোমাকে যে বিবাহ করেছিলাম, ধর্ম্মত কি আইনত তা সিদ্ধ হয় না।"

"সিদ্ধ হয় না!" মুখখানি লতার লাল হইয়া উঠিল। একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "সিদ্ধ হয় না!—তবে যা হয়েছিল, সেটা কি হয়েছিল? পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে অগ্নি, শালগ্রাম, বামুন সাক্ষী ক'রে মন্ত্র প'ড়ে বাবা তোমার হাতে আমাকে সঁপে দিলেন, আর তুমি—" বলিতে বলিতে লতা থামিয়া গেল—দারুণ একটা উত্তেজনার আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

বিরিঞ্চি কহিল, "আমিও তখন সরল মনে ধর্ম্মত আমার বিবাহিতা স্ত্রী ব'লেই তোমাকে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু শেষে শুনলাম—উনি বললেন—পিতা বর্ত্তমান, তাঁর অনুমতি নিইনি—নান্দীমুখ হয়নি, আত্মীয় বান্ধব সকলের অজ্ঞাতে নাম পরিচয় সব গোপন ক'রে, অল্প একটা নামে একা গিয়ে বিবাহ করেছিলাম—"

"কেন করেছিলে?"

"জানতাম না। বিয়ের আইন-কানুনে এত প্যাঁচ যে আছে—"

"সত্যিই আছে? হাঁ, উনি বলেছেন, হয়ত ভয় দেখিয়েছিলেন।—তুমি—আর কারও কাছে গিয়ে সন্ধান নেও নি কিছু?"

"না।—একেবারে হতবুদ্ধি তখন হ'য়ে পড়ি। হিন্দু-বিবাহের সব অনুষ্ঠান আর তার আইন কানুনের অনেক কথাই তখন তিনি বললেন। মনে হ'ল, সব সত্যি। বললেন—সন্তানসম্ভাবনা আছে—তাও জানিয়েছিলাম। তা বললেন, তোমাদের খরচপত্র চ'লে যেতে পারে, পাকা একটা ব্যবস্থা তার করবেন। খবর যা রাখতে হয়, গোপনে তিনিই রেখে এর পর যখন যেমন দরকার হয়, সব তিনি করবেন। কিন্তু আমি যদি এ নিয়ে কোনও গোলমাল কিছু করি, প্রকাশ্যভাবে আদালতের সাহায্যে প্রমাণ করবেন, এই বিবাহ অসিদ্ধ। আদালতের ব্যবস্থায় যেটুকু দায়িত্ব নিতে হয় তার বেশী কিছু কখনও নেবেন না। আর তার ফলে তোমাদেরও লোকসমাজে মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হবে।"

"মাথা হেঁট ক'রে থাকতে আমাদের হয়েছে। যাক্! তখন ত আইনকানুন কিছু জানতে না, কিন্তু এখন—আইন প'ড়ে শুনেছি ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছ, এর আইন-কানুন সত্যি কি ব'লে জানতেও অবিশ্যি পেরেছ—"

বিরিঞ্চি কহিল, "হাঁ, আইনের বই অনেক ঘেঁটেছি। আলোচনাও অনেকের সঙ্গে করেছি। তাতে—তাতে এই বুঝেছি—প্রতিপক্ষ কেউ তেমন জিদ ক'রে যদি পড়ে, বৈধতা প্রমাণ করা শক্ত হবে। বিশেষ তিন-চার বছর হ'য়ে গেছে—তোমার বাবা বেঁচে নেই, চুঁচড়োর স্থায়ী অধিবাসীও ছিলেন না, চাকরী ক'রতেন মাত্র। আমিও ওখানকার কাউকে চিনি না। এখন এই তিন-চার বছর পরে বিয়ের সাক্ষী-টাক্ষী সব জোগাড় করা—সেই পুরুত—সেই নাপিত—কোথায় কে গেছে—নামও আমি জানতাম না—সম্ভব হ'তে পারে ব'লেই মনে হয় না। আবার ওঁরা টাকা খরচও ক'রবেন দু হাতে। একা আমি কি করতে পারি?"

আড়ষ্ট হইয়া লতা বসিয়া রহিল। বিরিঞ্চি কহিল, "ফিরে আসবার পরেও বাবার সঙ্গে কথা হয়। আবার তিনি এই সব কথা ব'লে বিশেষ সাবধান আমাকে ক'রে দেন। বলেন, কোথায় কি ভাবে তোমরা আছ, খবর তিনি রাখছেন, খরচপত্রও চালিয়ে যাচ্ছেন, পাকা ব্যবস্থাও তার ক'রে রেখেছেন। মনে হ'ল, যা হবার হ'য়েছে। এখন—এখন—এ ছাড়া আর উপায়ও কিছু হ'তে পারে না। কিছু ক'রতে গেলেও—উনি বললেন—ইলার বাবাও সহজে ছাড়বেন না, আর আদালতে একটা ঘাঁটাঘাঁটি হ'লে—"

অশ্রুধারা আর বাঁধ মানিতেছিল না—স্খলিত কণ্ঠে লতা কহিল, "আদালতে একটা ঘাঁটাঘাঁটি হয়—সেটা আমিও চাই না। তবে—তবে—সাক্ষী আর কেউ না থাক্, না

কাউকে পাওয়া যাক—তুমি বিবাহ ক'রেছিলে—তোমার কথাটা "

"হয়ত গ্রাহ্যই হবে না—ওঁরা দেখাবেন, বড় একটা স্বার্থের টান আমার এদিকে রয়েছে।"

মাথায় একটুকাল হাতখানি রাখিয়া কি ভাবিয়া লতা শেষে কহিল "নিজের জন্ত কিছু ভাবতাম না। ভাগ্যে যা ছিল হ'য়েছে—সে ক'রে হোক সা'রে ন'রে যেতাম। কিন্তু ঐ যে ছেলেটা এসেছে—আজ অসহায় অজ্ঞান শিশু—বেঁচে যদি থাকে—বড় হ'য়ে যখন উঠবে—কি নাম-পরিচয়ে লোকসমাজে সে দাঁড়াবে? আমি মা, যদি বেঁচে থাকি, কি চোখে আমায় তখন দেখবে?"

বিরিঞ্চি কহিল, "তখন—তখন—আজ আমি নিরুপায় লতা। তবে এর পর—যাই হোক, একটু ভেবে দেখতে দাও আমাকে দেখি কি ক'রতে পারি।"

"কি ক'রবে তুমি? ভেবে কি দেখবে? টাকা, ঘরে পয়সা আছে; কিন্তু তোমার—তোমার—না, সে দান, সে অনুগ্রহ কখনও তাকে ক'রতে দেও না—যদি না তোমাদের এই ঘরে তার ন্যায্য দাবী কখনও স্বীকার ক'রে নিতে পার। পিতার নিকদ্দেশ, অজ্ঞাত কুলশীল, অন্তত এটুকু মান তার থাক। যদি জানতেই কখনও কিছু চায়—খুলে সব ব'লব। জানি না, কি সে তখন ভাববে। যদি তোমার কাছে আসে, এইটুকু মাত্র প্রার্থনা আজ আমার, তার মর্য্যাদা তাকে না দিতে পার, অস্বীকার কিছু ক'রো না।—আচ্ছা, তা হ'লে এখন বিদায় দাও, আমি আসি। কি চোখে আমায় এখন দেখছ জানি না; কিন্তু আমি জানি, তুমি আমার স্বামী, আর দেখা হবে না—শেষ এই প্রণাম তোমাকে ক'রে যাচ্ছি।"

ভূলতা হইয়া একটি প্রণাম করিয়া লতা সেই পুঁটলিটি হাতে লইল। ত্রস্ত উঠিয়া বিরিঞ্চি কহিল, "যাবে! কোথায় যাবে লতা?—একা অসহায়—এই রাত্তিরে—ক'লকাতার এই শহর—"

"পথ ছেড়ে দাও। দোহাই তোমার! যেখায় হোক, যেতেই আমাকে হবে। আজই—এখুনি!—কাল—একটা জানাজানি যখন হবে—তখন যে মুখ নিয়ে আমাকে বেরোতে হবে—না, না, সে আমি ভাবতেই পারছি নি।—অসহায়!—কি ক'রব? মাথার উপরে যিনি আছেন—সর্ব্বহারা সকল অসহায়ের সহায় তিনি। তাঁর ভরসা ক'রেই বেরোচ্ছি এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। যাব—পথ ছাড়।"

"শোন, শোন লতা! দোহাই তোমার!—কোনও ভয় নেই তোমার। কেউ কিছু জানে না, জানবেও না। মাকে কাল গোপনে সব কথা ব'লব। তারপর তোমাদের একটা ভাল ব্যবস্থা যাতে হয়, নিরাপদে স্বচ্ছন্দে থাকতে পার—কালই তা ক'রব। এ সংসারে না রাখতে পারি, অন্তত এটুকু ক'রতে দে আমি বাধ্য!"

"ক'তে পার। কিন্তু রাখবে আমি থাকব—কি পরিচয়ে? কিসের দাবীতে? না না, প্রাণ থাকতে তা পারব না! ভগবানও যদি মুখ তুলে একটু না চান, পৃথিবীতে ঠাঁই যদি একটু না হয়, খোকাকে নিয়ে গঙ্গায় বরং ডুবে মরব। তবু তোমাদের এ আশ্রয় স্বীকার ক'রে নেব না।"

অতি ব্যথিত দৃষ্টিতে বিরিঞ্চি চাহিয়া রহিল। কিন্তু নড়িল না, এদিক ওদিক লতা একবার চাহিল, অন্য কোনও পথে বাহির হইতে পারে কি না।

—"এ কি! তুমি—তুমি—এখানে!—লতাদি!"

চমকিয়া বিরিঞ্চি পাশের দিকে পা কয়েক সরিয়া গেল। লতাও একেবারে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইল, শিথিল হাত হইতে পুঁটলিটি পড়িয়া গেল।

শিরঃপীড়ার ওজুহাত দেখাইয়া সামান্য কিছু আহার করিয়াই বিরিঞ্চি শিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। ইলা যখন শয়ন-গৃহে গেল, দেখিয়া মনে হইল, স্বামী নিদ্রিত। আলোটা নিভাইয়া দিয়া নিঃশব্দে সে গিয়া শয্যার এক প্রান্তে শুইয়া রহিল। নিশুতি রাত্রিতে যখন ঘুম একবার ভাঙ্গিল, দেখিল স্বামী শয্যায় নাই—বাথরুমও দেখিল খালি।

কোথায় গেলেন—অসুস্থ শরীর?—উদ্বিগ্ন হইয়া সে বাহির হইল; এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া সে নীচে নামিল, বাহিরের দিকে কতটুকু যাইতেই মনে হইল—লতা যে গৃহে ছিল, সেই দিকে—একটা কথাবার্ত্তার সাড়া যেন পাইতেছে। তাই ত! লতাদি কি আবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে! ত্রস্তে সে অগ্রসর হইয়া আসিল—মৃদুস্বরে হইলেও মনে হইল, লতা যেন বেশ উত্তেজিতভাবেই কি বলিতেছে, ঘরেও আলো জ্বলিতেছে।—নিকটে আসিয়াই দরজাটা সে খুলিয়া ফেলিল। কি এ ব্যাপার! তার স্বামী এই নিশুতি

রাত্রিতে একা এখানে—লতাদির গৃহে! কেন? আহারে বসিয়াছিলেন, ভাতের থালা লইয়া আসিয়াই লতাদি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! কেন?

"লতাদি!"

"কি, বৌ-ঠাকরুণ!"

"উনি—উনি—এখানে—কেন?"

"ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।"

স্বামীর দিকে ইলা চাহিল—অতি অপ্রতিভভাবে—যেন কাঠ হইয়া—নতশিরে তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। একটু চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "কেন, কেন তুমি এখানে?—কেন এসেছ? লতাদি তোমার কে?"

মৃদুস্বরে বিরিঞ্চি কহিল, "ঘরে যাও এখন ইলা। আমি—আমি—আস্‌ছি—"

"না—বল—বল! আমি আর বরদাস্ত করতে পারছি নি! বল—কেন তুমি এখানে! লতাদি তোমার কে?"

বিরিঞ্চি নীরব! ঘরের ভিতরে লতার দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ইলা কহিল, "তুমি—তুমিই তবে বল লতাদি,—বল, কেন উনি এখানে? কে উনি তোমার।"

"কেউ নন বোন্!—এসেছেন কি করব?—আমি বিদায় হচ্ছি!" বলিয়াই পাশ কাটাইয়া লতা বাহির হইয়া পড়িল।

"না না! যেও না—যেও না! শোন—দাঁড়াও একটু—বল—বল—"

ছুটিয়া ইলা দ্বারের দিকে চলিল। চৌকাঠে হোঁচোট খাইয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িল।

"ইলা! ইলা!"

ত্রস্ত বিরিঞ্চি আসিয়া ইলাকে একটু তুলিয়া ধরিতেই দেখিল, সে মূর্চ্ছিতা। লতাও একবার ঘুরিয়া চাহিল, কিন্তু ফিরিল না।

ক্রমশঃ

বৃন্দাবনী হিন্দোল

শ্রীনিরুপমা দেবী

N. ROOM

"জয় রাধে, শ্রীরাধে!"
স্তব্ধ গভীর নিশীথে প্রহরী হুঙ্কারে গভীর নাদে!
অস্ফুট কলগুঞ্জনে কোথা কে যেন কাহারে সাধে!
"রাধে,—ওগো রাধে!"

ভেঙে যায় ঘুমঘোর অন্তরে পড়ে মোর
অস্ফুট কলগুঞ্জনে কোথা কে যেন কাহারে সাধে,
"রাধে,—ওগো রাধে!"

দুয়ারে কে ডাকে আসি বাজে কি কোথাও বাঁশী?
তুমি সেই ঘন-সাওন পবন চলেছে মেঘের বাজে!
"রাধে,—জয় রাধে!"

ঝলিছে দামিনী-রেখা, দূর বনে ডাকে কেকা
ঝিমি ঝিমি ঝিম্ যামিনীর বীণ
বাজিছে নূপুর ছাঁদে,
"রাধে,—জয় রাধে!"

নিরজন ব্রজবীথি গাহে কেগো কোথা গীতি
যেন নিবিড় মিলনে বিরহ বেদনে
সে ধ্বনি কেবলি কাঁদে
"রাধে,—ওগো রাধে।"

* * * *

পথিক চলিয়া যায় স্বজনে দেখিয়া ধায়
আনন্দ রোলে তুলি কল্লোলে জলধি হৃদয় বাঁধে,
গাহি "রাধে,—জয় রাধে!"
আগত ঝুলন রাত্রি ছুটিছে অযুত যাত্রী
শতেক কণ্ঠে সেই এক নাম
ছুঁয়ে চলে যেন চাঁদে!
"রাধে,—জয় রাধে!"
দুলিছে হৃদয় দোলা অপরূপ হিন্দোলা
উতলা মন-পবন তাঁহারে দোলায় শতেক ছাঁদে
"রাধে,—জয় রাধে!"

উমেদারকাব্যসঙ্কলন

শ্রীরণজিৎচন্দ্র সান্যাল

প্রবন্ধ

গদ্য কাব্য এবং সমালোচনাকে চক্রে ফেলে এ পর্যন্ত মানুষের সাহিত্যের ভাবের ঘরে বাণীর আরাধনা চলেছে ; কিন্তু এই গতানুগতিকতার মধ্যেও যেন মাঝে মাঝে নতুনত্বের নূপুর-ধ্বনি কানে এসে বাজে। কোনও কোনও সাহিত্যিক-পেট্রিয়ট্ যে বিষয়টিকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বা পংক্তিভুক্ত করবার কথা কল্পনা করেছেন সেটি হচ্ছে 'উমেদারকাব্য'—যাকে বর্তমান যুগের বেকার-দর্পণ বা ভবিষ্যতের স্বর্গ নাম দিলেও একই অর্থ হয়। কাব্যে নানারকম ছন্দের সৃষ্টি—অমিতাক্ষর, পয়ার, পঞ্চচামর, লঘুগুরু, মাত্রাবৃত্ত, সনেট্ ইত্যাদি নিয়ে কাব্যের ভাঙাগড়ার ইতিহাস প্রস্তুত হ'ল ; উপন্যাস, ছোট-গল্প, সমালোচনা, রসরচনা, চাটনিরচনা ইত্যাদিকে উৎসর্গ ক'রে এ পর্যন্ত সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের কালির 'দৈনিক' শ্রাদ্ধ হ'ল। কিন্তু যে অবস্থায় মানুষ বাউণ্ডুলে-বৃত্তি বা কেম্ফ্টন-পন্থা বরণ ক'রে নিতে বাধ্য হয়, সেই অবস্থার বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মুষ্টিমেয় সাহিত্যিককেই চিন্তা করতে দেখা যায়। বস্তুবাদী জগতের কোনও মানুষকেই এর আবশ্যকতা সম্বন্ধে নতুন ক'রে স্মরণ করিয়ে দেবার কিছু নেই।

সামান্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বর্তমান সময় প্রত্যেক ইংরেজী-বাংলা দৈনিক পত্রে 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ; বলা বাহুল্য, দশ বৎসর পূর্বেও এর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বিজ্ঞাপনদাতার সংখ্যা যে অনুপাতে না বেড়েছে সেই অনুপাতে বেড়েছে বিজ্ঞাপন-পাঠক—কর্মপ্রার্থী এবং উমেদারের সংখ্যা। পিরোরীর দিক্ দিয়ে আলোচনা করলে একথা মনে হয়, অনুপাতে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির মূলে রয়েছে—আমাদের দেশের শিক্ষিতের হারে শতকরা বৃদ্ধি এবং আর্থিক অবনতি। বর্তমান সময়ে এই মতবাদের মূলে সত্যতা থাকলেও যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন, কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বেকার-সমস্যার মূলে রয়েছে দুটি কারণ :

(১) নিয়োগকর্তাদের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা।

(২) কর্মপ্রার্থীদের অযোগ্যতা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পর নিয়োগকর্তা-দের কার্যালয়ের টেবিলে কর্মপ্রার্থীদের দরখাস্তনামার যে স্তূপ এসে সঞ্চিত হ'তে থাকে—সেগুলি পরীক্ষা ক'রে অনেক নিয়োগকর্তাকে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, কি চাকরি আবশ্যক এবং কি রকম ভাবে দরখাস্তের পসড়া করতে হয় সে সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না ক'রে প্রার্থীরা ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি ক'রে থাকেন। কথাটা সত্য এবং এই অজ্ঞতার দুটি প্রতিষেধক হচ্ছে—(ক) কার্যকরী দরখাস্ত এবং (খ) সুচিন্তিত ইন্টারভিউ-এর মহলা। দরখাস্ত-প্রস্তুতে এবং নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত কৌশল আবিষ্কার করা হয়েছে এবং এই গুলির যথাযথ ব্যবহারে কর্তার দৃষ্টি কর্মীর প্রতি আকৃষ্ট করা সহজ হয়েছে। বর্তমান সময়ের কেনাবেচার জগতে একসঙ্গে 'রথ দেখা, কলা বেচা'র নীতি প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ বর্তমান ব্যবসায়িক জগতের অধিকাংশ কর্ণধার অল্প মূল্যে শ্রেষ্ঠতর কর্মের বিনিময় করবার প্রয়াসী। এই লাভবান হবার মনোবৃত্তির মূলে আমরা দেখ্তে পাই তাঁদের বৈষয়িক ধূর্ততা এবং কর্মীদের অযোগ্যতা। এই মনো-ভাবের প্রতি লক্ষ্য ক'রে অতঃপর প্রত্যেক কর্মীকেই স্বত-গতিশীল মানুষ-যন্ত্রে নিজেকে রূপান্তরিত করবার সাধনা করতে হবে ; কারণ জনৈক বিশেষজ্ঞের কয়েকটি শব্দসমষ্টিতে তা প্রমাণ হবে—'Employment has advanced far beyond the days, when an employee was simply a living being regarded as acting—spontaneously without consciousness.'

বর্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে প্রতিযোগিতা তার শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছে—এই অজুহাতে প্রত্যেক কর্মপ্রার্থীকে উন্নতির সহায়ক বলে দুটি মন্ত্র স্বীকার করতে হবে—

(১) প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার সামর্থ্য লাভ।

(২) কৌশল সহযোগে কর্তৃপক্ষের মনে এই প্রত্যয় সৃষ্টি করা যে, যে রকম আবশ্যক প্রার্থী তার উপযুক্ত! এই অপরিহার্য প্রতিযোগিতার যুগে ব্যবসাবাণিজ্যের কার্যালয়ে যে সকল ব্যক্তির উপর নিয়োগ-কর্তৃত্ব থাকে, বুদ্ধিতে তাঁরা গড়পড়তা মানুষের তুলনায় ধূর্ত এবং বুদ্ধিমান। এই বুদ্ধিমত্তার সুযোগ নিয়ে নিয়োগ কর্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়ে উৎকৃষ্টতর যোগ্যতর ব্যক্তির কাজ কিনতে উৎসুক। কর্মপ্রার্থীদের দরখাস্তের নির্বাচন একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চলে এবং সেই পদ্ধতি অনুধাবন ক'রে দেখা গিয়েছে প্রতি দশখানি দরখাস্তের মধ্যে নয়খানি হয় বাতিল—যার উত্তর হয়—'Your application with reference to our advertisement has been rejected.' অবশিষ্ট একটির উপর নিয়োগ-কর্তৃপক্ষের এই ধারণা হয় যে, ঐ দরখাস্তনামার লেখক সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় উচ্চ শ্রেণীর যোগ্যতা এবং কার্যক্ষমতাসম্পন্ন। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই বক্তব্য বিচার করা হয়। উপরোক্ত বাতিল-করা নয়খানি চিঠিতেই এমন কোনও বিবরণী থাকে না, যার দ্বারা প্রার্থীর নিজস্ব উন্নতির প্রতি আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

দরখাস্ত লেখা আরম্ভ করবার পূর্বে বিচারের বিষয়—বিজ্ঞাপনে নিয়োগকর্তা কি চায়, এই বিচার সহজসাধ্য মনে হয় না, যেহেতু বিজ্ঞাপনে অতি সামান্যই জ্ঞাতব্য হিসাবে আমরা পাই। বলাবাহুল্য, প্রার্থীর এই অনুশীলন-বুদ্ধিতে সাফল্য যেন এক এক ধাপ এগিয়ে আসে। দরখাস্তে technical এবং academic শিক্ষা ও পূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ ছাড়া নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করলে দরখাস্ত কার্যকরী হয়—

(১) কাজকর্মের প্রতি নিজের স্বার্থ।

(২) কার্যালয়ের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি

(৩) বিশ্বাস এবং লয়াল্‌টি।

কর্মে উন্নতি লাভের একটা প্রকাণ্ড সহায়ক হচ্ছে—উচ্চাশা। এই উচ্চাশা অদৃশ্যভাবে ভাগ্যের সঙ্গে দৈনিক-জীবনে মিশে রয়েছে। কর্মীদের মনে উচ্চাশা দৃঢ়ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সেই ক্ষেত্রে—যে ক্ষেত্রে সে কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান, কাজ করবার স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয় সেগুলিকে উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ ক'রে। নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজ ক'রে কর্তৃপক্ষের মনে ভাল ধারণার সৃষ্টি করা অনেক সময় সহজ হয়ে পড়ে। নিয়োগকারী প্রার্থী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সেই হেতু কিছু কৌশলে যতদূর সম্ভব জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়ে কর্মীর প্রতি কর্মনিয়োগকর্তার good will সৃষ্টি করাবার প্রচেষ্টা যুক্তিসঙ্গত। দুই-একটি এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে যে, কোনও কোনও দরখাস্তকারী বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত এবং ইন্টারভিউ-এর যে বাণগুলি লক্ষ্যহীন ভাবে ছুঁড়েছেন তার সংখ্যা পঞ্চাশকে অতিক্রম ক'রে গেছে। এই ব্যর্থতার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে দুটি বিষয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়—(১) সতর্কতার সঙ্গে দরখাস্ত লেখার প্রণালী জ্ঞান এবং (২) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎলাভের পূর্বে প্রশ্নের তালিকা তৈরী করা। আকৃষ্ট করবার ক্ষমতা-সম্পন্ন চিঠির প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয়-সংক্ষিপ্ততা। এসম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ গ্রন্থকার Jos W. Rowbottom তাঁর লিখিত এক গ্রন্থে লিখেছেন—'Brevity gives charity and force to your statements, renders them easily understood and helps them to make an impression upon the reader.' বড় চিঠি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাগ্‌বাহুল্য সৃষ্টি ক'রে নিয়োগকর্তার চিত্তবিভ্রম উৎপন্ন করে এবং এরই ফলে চিঠিখানি তাঁর কাছে দুর্বোধ্য বোধ হয়। ফলকথা, চিঠিতে জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া একান্ত আবশ্যক, কিন্তু সংক্ষিপ্ত না হ'লে তার কোনও কৃতিত্ব এবং কার্যকরী শক্তি নেই। সমগ্র চিঠির সারাংশ হবে—'আমি উপযুক্ত অর্থের সঙ্গে আমার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কর্মের বিনিময় করতে সমর্থ।' যে দরখাস্তে এই সারাংশের অস্তিত্ব থাকে সেই লিপি কর্মস্থলে প্রার্থীর একজন উপযুক্ত দূতের কাজ সম্পন্ন করতে প্রয়াস পায়।

দরখাস্তে জ্ঞাতব্য সংবাদগুলি পর পর এইভাবে সাজাতে হবে—

(ক) প্রার্থীর বয়স, জাতি, ধর্ম

(খ) শিক্ষা

(গ) সেই কার্যে অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ঘ) অন্যান্য টেক্‌নিকাল শিক্ষা ইত্যাদির বিবরণ

(ঙ) সাধারণ শিক্ষার অতিরিক্ত বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

(৫) পূর্বে কোনও কাজে নিযুক্ত থাকলে তার পরিত্যাগের স্বপক্ষে যুক্তি

(ছ) প্রেরিত সার্টিফিকেটগুলির একটি তালিকা

(জ) পূর্ব কাজের বেতন

(ঝ) বর্তমান কাজে বেতনের দাবী।

ইংরেজী এবং বাঙলা ভাষায় বিশেষ ক'রে ইংরেজী ভাষায় দরখাস্তে প্রথমে একটি ভূমিকা থাকে, একটি আদর্শ উদাহরণ দেওয়া গেল, 'Having been given to understand that a post of clerk has fallen vacant in your office, I beg leave to apply for the position, confident that it is one I can ably fill.' বাংলা অনুবাদে দাড়ায়—'কোনও সূত্রে আপনার কারখানায় জনৈক কর্মচারীর স্থান খালি আছে জ্ঞাত হইয়া আমি ঐ কাজটির প্রার্থীরূপে দরখাস্ত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি এবং আমার বিশ্বাস আমি ঐ পদটি যোগ্যতার সহিত পূরণ করিব।' শেষ সম্বোধনে—'I have the honour to be Sir. Your most obedient servant' লেখবার প্রথা আছে; সাধারণ দরখাস্তে পরিশেষে লেখা উচিত—

I have the honour to remain,
Gentleman,
Your's very faithfully

কোনও কোনও অবস্থায় পরস্পর সন্দর্শনের সুযোগ আসে। কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থিত হবার এই যোগাযোগ বিশ্বাস করাবার একটা শ্রেষ্ঠ সুযোগ, এই হেতু কর্মক্ষেত্রে ইন্টারভিউ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টির প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন অর্থে বোঝায় সাক্ষাৎলাভের জন্য কর্মীকে প্রস্তুত হওয়া। সাক্ষাৎলাভের পূর্বরাত্রে দেখা হওয়ার পর যে প্রশ্নগুলি কর্মকর্তার দিক থেকে হবার সম্ভাবনা আছে সেগুলির সন্তোষজনক উত্তরের একটি খসড়া মনে মনে স্থির করে রাখা ভাল, উত্তরগুলির পুনরাবৃত্তি করে রাখাও যুক্তিসঙ্গত। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়।—(১) বয়স, (২) শিক্ষা, (৩) পূর্বেকার অভিজ্ঞতা, (৪) পূর্বেকার এবং বর্তমান বেতনের দাবী। এক্ষেত্রে প্রার্থীকে উপস্থিতবুদ্ধি প্রখর করবার সাধনা করতে হবে। একবার একজন ভদ্রলোক salesman চাকরির প্রার্থী হয়ে একজন ইউরোপীয়ান ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কয়েকটি প্রশ্নের পর প্রশ্নকর্তা ঐ ভদ্রলোকের হাতে কয়েকটি বিক্রয়ের বস্তু দিয়ে বলেছিলেন --'Here are your articles, suppose I am a rich customer, sell those to me."

এক্ষেত্রে ঐ ভদ্রলোকটি যে কর্তৃপক্ষের একজন এ কথা ভুলে গিয়ে একজন ভাল salesman-এর অভিনয় করা আবশ্যক। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভের সময় আসল সার্টিফিকেট এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিদের চরিত্র-যোগ্যতা সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সঙ্গে নেওয়া দরকার হয়। এ ছাড়াও ঐ সময় নিজের পোষাক পরিচ্ছদ এবং চেহারাও যাতে গ্লানিশূন্য ও পরিষ্কার থাকে সে বিষয়ে কিছু দৃষ্টির আবশ্যক, কারণ এগুলির একটা মনস্তত্ত্বমূলক কৃতিত্ব আছে। নিয়োগ-কর্তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অনেক সময় তাঁকে নীরব গম্ভীরভাব অবলম্বন করতে দেখা যায়, এই ভাব অবলম্বনের মধ্যেও একটা পরীক্ষামূলক মনোবৃত্তি লুকিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার প্রার্থীর কার্যতৎপরতা, কথাবার্তায় চটপটে ভাব ইত্যাদি গুণ লক্ষ্য করবার উদ্দেশ্য থাকে জানতে হবে। এই সময় প্রশ্নকর্তার পক্ষ থেকে কোনও প্রশ্ন না এলে নমস্কার সম্ভাষণ ক'রে গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে কিছু বলা ভাল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিয়োগকারী প্রার্থীকে আসন গ্রহণ করতে ব'লে তার সার্টিফিকেট এবং লিখিত দরখাস্তখানির দিকে মনযোগ দেন। অনেক সময় কর্মীর খেলাধূলা সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে কি-না, অর্থাৎ out-door জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়, কর্মী কর্মের গণ্ডীর বাইরে কি ভাবে জীবন কাটায় জানবার উদ্দেশ্যে। Personal interview-এর আসল উদ্দেশ্য কর্মপ্রার্থীর ব্যবহার, ভদ্রতা, বুদ্ধি, তৎপরতা এবং কাজের প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করা। ইন্টারভিউ-ভীত-ব্যক্তিদের মনে রাখতে হবে যে, ওটা হচ্ছে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে দুইজন ব্যক্তির পরস্পরে দেখাশোনা। একজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎ করাকে 'go in to win' ব'লে পরিচিত করেছেন।

যে-ক্ষেত্রে এ সুযোগ হয় না সে-ক্ষেত্রে দরখাস্তের সাথে প্রার্থীর একটি ফটোগ্রাফ পাঠান যুক্তি-সঙ্গত অথচ অভিনব রীতি—এই রীতির প্রচলন ইংলণ্ডে দেখতে পাওয়া যায়। উপযুক্ততার অস্তিত্ব থাকলে ফটোগ্রাফের কার্যকারিতা আছে, কারণ স্বভাবতই মানুষের দৃষ্টি ঐ ফটোগ্রাফের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

শ্রীমধুসূদন

বনফুল

ত্রয়োদশ দৃশ্য

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাস। কলিকাতায় মধুসূদনের বাসার ঠনঃ গোয়ার চিৎপুর রোডে একটি সুবিস্তৃত গৃহ। গৃহের তিনকোণে তিনটি টেবিল ও প্রত্যেক টেবিলের সম্মুখে একটি করিয়া চেয়ার রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ঘরের আর একদিকে দুইটি টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার সোফা প্রভৃতিও আছে। একটি বড় বুক শেল্‌ফে অনেকগুলি পুস্তক দেখা যাইতেছে। একটি টেবিলের নিকট মধুসূদন আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন এবং নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছেন। তাঁহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা এবং গায়েও আদ্ধির জিজিরোতা একটা সূচি-বেওয়া পাঞ্জাবি। হস্তে জ্বলন্ত সিগারেট। টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস রহিয়াছে। কিছুক্ষণ মনে মনে পাঠ করিয়া তাহার পর তিনি জোরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

The infernal serpent, he it was whose guile,
Stirred up with envy and revenge, deceived
The mother of mankind, what time his pride
Had cast him out from Heaven, with all
his host
Of rebel Angels, by whose aid, aspiring
To set himself in Glory above his peers,
He trusted to have equalled the most High
If he opposed and with ambitious aim
Against the throne and monarchy of God
Raised impious war in Heaven and battle proud
With vain attempt—

(নেপথ্যে) মধু, বাড়ী আছে ?

মধু। (বই বন্ধ করিয়া) আছি—এসো—গৌর নাকি ?

গৌরদাস আসিয়া প্রবেশ করিলেন

এস, এস—এলে কবে ! তোমার যে পাত্তাই নেই আজকাল, হে ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটকুলতিলক ! তার পর খবর কি ? তিলোত্তমাসম্ভব পেয়েছ ?

গৌর। (উপবেশনান্তে) পেয়েছি—তার সমালোচনাও পড়েছি। I congratalate you. রাজনারায়ণ, রাজেন. even old fashioned দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ of 'সোম-প্রকাশ' has praised you ! You have worked wonders my friend.—তারপর, খবর কি তোমার ?

মধু। খবর ? খবর ভালই। (হাসিয়া) অর্থাভাব ছাড়া আর কোন অভাব নেই।

গৌরদাস। অর্থাভাব ? কেন ? আদালতে চাকরি করছ—বই লিখেও কিছু পাচ্ছ—you should not be in want.

মধু। বই লিখে আর কত পেয়েছি !

গৌরদাস। পাওনি কি রকম ! রত্নাবলীর অনুবাদ, শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, তিলোত্তমা—you have flooded our literature—আর প্রত্যেক বইখানাতেই তুমি বেশ টাকা পেয়েছ। বড় রাজা, ছোট রাজা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সবাই ত যথেষ্ট দিয়েছেন তোমাকে !

মধু। And I am grateful to them !—কিন্তু ওই কটা টাকাতে আমার কি হবে বল দেখি ! বৈশ্বানর কখনও এক আধ চামচে ঘি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন ! আমি দাউ দাউ করে জ্বলতে চাই ! রাশি রাশি টাকা মুটো মুটো খরচ করতে চাই ! I thrive in luxury, you know—it is a necessity for me and my imagination. I hate—I simply hate to live in close atmosphere. It suffocates me ! এই কটা টাকাতে কোনক্রমে খাওয়া পরা চলতে পারে বটে, কিন্তু আমি কোনক্রমে চলাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। I want to soar—I mean, materially too ! I am thinking of going to England and becoming a Barrister. I must have more money.

গৌর। তোমার জ্ঞাতিদের হাত থেকে বিষয়-সম্পত্তি ত উদ্ধার হয়েছে—নয় ?

মধু। প্রায়—P and B seem to be yielding—the rascals !

গৌর। তবু তোমার কুলুচ্ছে না ?

মধু। My dear G. D. Bysack, you illustrious deputy magistrate, you ought to know that a few hundred rupees per month are too inadequate for the poet of তিলোত্তমা সম্ভব। তৃতীয় সর্গ মনে আছে ?

আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

এড়াইয়া কাঞ্চন তোরণ
হিরণ্ময়, মৃদুগতি চলিলা সকলে :
পদ্মাসনে, পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণপথ দিয়া
চলিলা দিকপাল দল পরম হরষে !
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজি, তাহে
নরকতময় পাতা, ফুল—রত্নমালা,
ফল হায় কেমনে বর্ণিব ফলচ্ছটা ?

হিলোত্তমাসম্ভব খানা শেষ করিয়া ফেলিয়া দিয়া

my imagination revels in descriptions like these.

পড়িতে আরম্ভ করিলেন

ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণ-ফুল ; কেহ ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃত-ফল ক্ষুধা নিবারিলা ;
সঙ্গীত তরঙ্গে কেহ, কেহ রঙ্গে চালি
মন—হৈম তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উত্তরিলা বিরিঞ্চির নন্দির সমীপে
স্বর্ণময়, হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেব-চক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম !—

(বই রাখিয়া দিয়া) No, my dear, I cannot remain within a few hundreds.

গৌর। (হাসিয়া) ওটা পড়ছিলে কি বই ? (টেবিল হইতে দুইটি বই তুলিয়া) এটা ত দেখছি 'হোমার', এখানা ত 'টাসো'—ওটা কি !

মধু। Paradise Lost.

গৌর। নতুন কিছু সুরু করেছ না কি ?

মধু। সুরু করেছি, মানে ? তিনখানা একসঙ্গে সুরু করেছি ! ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক—মেঘনাদবধও সুরু করেছি কাল থেকে।

গৌর। (সাশ্চর্য্যে) একসঙ্গে তিনখানা ! বল কি হে !

মধুসূদন হাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন। মুখে স্মিতহাস্য

মধু। চলবে না কি !

গৌর। না, থাক।

মধু। (হাসিয়া) নতুন গৃহিণীটি কিছু কড়া নাকি !

গৌর। না, সেজন্যে নয়।

মধু। একটা গুজব শুনছি প্যারিচরণ সরকার নাকি 'সুরাপান নিবারিণী' সভা করবে ! সেই দলে ভিড়েছ নাকি ! আচ্ছা, দেবেন ঠাকুর যে কেশব সেন আর তাকে নিয়ে সিংহলে গেছলেন—ফিরেছেন কি ? I have a desire to see Ceylone. And I shall one day.

গৌর। টেবিলের ওপর চিঠিখানা কার হে !

মধু। রাজনারায়ণের, পদ্মাবতী পড়ে কি লিখেছে দেখ না—

গৌর হাত বাড়াইয়া পত্রখানি লইলেন ও পড়িলেন

গৌর। He is a good critic—খুব ত প্রশংসা করেছে দেখছি !

মধু। Oh, yes.

গৌর। আমি মাঝে মাঝে সেই দিনটার কথা ভাবি—

মধু। কোন্ দিনটা ?

গৌর। যেদিন তুমি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে Blank verse নিয়ে তর্ক করেছিলে—it is a memorable day in our literature.

মধু। Have I not convinced not only J. M. T. but every educated man of Bengal that our language is capable of Blank verse ? সংস্কৃত যে ভাষার জননী সে ভাষায় কি না হতে পারে ? মেঘনাদবধে আমি আরও প্রমাণ করব সেটা—it is going to be a grand epic.

গৌর। মাদ্রাজে পড়ে থাকলে কি এসব হত ! ভাগ্যে তোমাকে জোর জবরদস্তি ক'রে এখানে আনিয়েছিলাম।

মধু। নিশ্চয়ই,—গৌরদাস you are another ভগীরথ। আমার কাব্য-সুরধুনীকে তুমিই মর্ত্যে এনেছ।

মাদ্রাজে পড়ে থাকলে টাঁশ ফিরিঙ্গি মিষ্টার দত্ত would have ended in a miserable grave. You have made me famous, my dear G. D. Bysack—please have a drop

মদ আনাইয়া দিলেন

গৌর। (গ্লাসে এক চুমুক দিয়া) আচ্ছা মধু, 'একেই কি বলে সভ্যতা' লেখবার পরও ত তুমি বেশ সমান তালে মদ চালিয়ে যাচ্ছ!

মধু। Why not? My genius and my habit are two different things and I am slave to both.—তবে বেশী মদ এখন খাব না—লিখতে হবে। I cannot write if I drink too much.

গৌর। By the bye—'একেই কি বলে সভ্যতা' বইটাতে একটু যেন personal attack হয়ে গেছে। তোমার 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' সভা যে 'জ্ঞানার্জ্জন' সভারই নামান্তর তা বুঝতে আর কারো বাকী থাকে না। Even there is a Ghose in it!—তোমার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'ও কি সত্যি ঘটনা না কি! It is too realistic a book!

মধু। হ্যাঁ—ও চরিত্রগুলি সাগরদাঁড়ির। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামটা ছোট রাজার দেওয়া—জান ত?

গৌর। কার ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের? তাই-না কি!

মধু। হ্যাঁ—by the bye—আমাদের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যের বহরটা দেখেছ? তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য পড়ে কি বলেছেন শুনেছ? Hopeless! সুন্দর জবাব দিয়েছে রাজেন!

গৌর। কে, রাজেন মিত্তির? বিবিধার্থসংগ্রহে তার সমালোচনা পড়েছি ত!

মধু। না, সে সমালোচনা নয়। রাজেন লিখেছিল—রাজনারায়ণকে। রাজনারায়ণের কাছ থেকে আমি জেনেছি this is private. রাজেন লিখছে রাজনারায়ণকে—I hear that even the renowned Vidyasagar, for whom I have the greatest respect, thinks our poet an abortion—the worthless issue of drunkenness and stupidity! তারপর রাজেন লিখছে—would such abortions were plentiful in the country and men to know their value! (হাসিয়া) বোঝ একবার—টুলো পণ্ডিত বিদ্যাসাগর গেছেন তিলোত্তমাসম্ভব পড়তে! I wonder how many times he stumbled over each line! Poor Vid!

গৌর। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত লোকের কাছ থেকে—this was not expected.

মধু। This was very much expected! চেনো না তাকে? He is always sincere and always truthful—that's the trouble with him! ও ত ওরকম বলবেই—আমি মোটেই আশ্চর্য্য হই নি। ওর ত কোন দোষ নেই! He could not manage the blank verse! মিল্টনও পড়ে নি, তোমারও পড়ে নি—সুতরাং blank verse is quite blank to him. They want every one to write পাঞ্জটিকা or অনুষ্টুভ! ও আবার কখন বুঝতে পারবে—প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে! He will be all praises- দেখো! (একটু থামিয়া) ওদের ব্যাপার কিছু বুঝি না 'শর্ম্মিষ্ঠা'-খানা সংস্কৃত ছাঁদেই ত লিখেছি—তাও নাকি ওদের ভাল লাগে নি। These barren pundits understand nothing but Grammer!

গৌর। বিদ্যাসাগর কিন্তু বাঙলা গদ্য যা লিখেছে তা অপরূপ!

মধু। Oh, yes! His prose is dignified and sweet—তত্ত্ববোধিনীতে মহাভারতের উপক্রমণিকা পড়ছ?

গৌর। বই হয়ে বেরিয়েছে ত সেখানা?

মধু। ঠিক জানি না। It will be a good book no doubt. কালীপ্রসন্ন সিংহ কি কাণ্ড করেছে শুনেছ ত! সমস্ত মহাভারতটা অনুবাদ করবার বিরাট আয়োজন ক'রে বসেছে! A heroic attempt, indeed!

গৌর। বিদ্যাসাগর ওর পেছনে আছে যে! ছেলেটিও ভাল—ওর স্থাপিত 'বিদ্যোৎসাহিনী' সত্যিই 'বিদ্যোৎসাহিনী'।

মধু। Undoubtedly. He is a mere boy, but he has the soul of a sage.

গৌর। টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়েছ? 'অভেদী' বলে আর একখানা বই সুরু করেছে না কি শুনলাম! 'মাসিক পত্র' কাগজটা দেখেছ?

মধু। অত চলতি আটপৌরে ভাষা আমার পছন্দ হয়

না—it leaves no impression—it has no grandeur !

গৌর। ওই কিন্তু বাঙলা ভাষার প্রথম মৌলিক উপন্যাস—I mean আলাল

মধু। । হাসিয়া। তা হোক্! আমিও প্রথমে পৃথিবী শব্দের মৌলিক বানান প এ র ফলা হ্রস্বই লিখেছিলাম। প্রথম হলেই যে ভাল হতে হবে এমন কোন কথা নেই! ভূদেব কোথা হে আজকাল ?

গৌর। ঠিক জানি না! খুন দেখে দেখে বেড়াচ্ছে আর কি! ভূদেবও মাঝে মাঝে লেখে—দেখেছ ?

মধু। দেখেছি! এডুকেশন গেজেট—

গৌর। চারদিকেই যেন নতুনত্বের বান ডেকেছে। ওদিকে ব্রাহ্ম-সমাজে দেবেন ঠাকুর, কেশব সেন, পলিটিক্সে হরিশ—রামগোপাল ঘোষ—সাহিত্যে তোমরা! গত বছর ঈশ্বর গুপ্ত মারা গেছেন তিনিই বোধ হয় প্রাচীন যুগের শেষ কবি—কি বল ?

মধু। আমাদের রঙ্গলালও খুব আধুনিক ন'ন!

গৌর। রঙ্গলাল ত ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য—but he is more chaste! ঈশ্বর গুপ্তের অনেকগুলি শিষ্যই আছেন। ওই দীনবন্ধু!—'নীলদর্পণ' পড়েছ ত? কস্মিন্‌কালে পথিক হচ্ছেন দীনবন্ধু!

মধু। You are carrying coal to New Castle! আমি নীলদর্পণ পড়েছি—and even I am thinking of translating the book. এ ধরণের political propaganda বাঙলাতে না হয়ে ইংরেজিতে হলেই ভাল হয়।

গৌর। দীনবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় তোমার ?

মধু। হয় মাঝে মাঝে—he is a grand fellow—মূর্ত্তিমান হাস্যরস। সেদিন ওর এক বন্ধু—বঙ্কিম চাটুজ্যে—তার সঙ্গেও আলাপ হল! He is a deputy magistrate. I was greatly impressed by his look. My God, he has terrible nose and eyes!—মুখে যদিও বড় একটা কিছু বলে না। প্রভাকরে পদ্য-টদ্য লিখত শুনেছি। He is a brilliant boy.

গৌর। কোথায় তোমাদের আড্ডাটা জমে—বল ত ?

মধু। বাঃ—আমাপুকুরের তারক ঘোষের বাড়ীতে! ঠিক দিগম্বর মিত্তিরের বাড়ীর সামনে। সেখানে মাঝে মাঝে বেশ সাহিত্যিক আড্ডা জমে। Let us have another dose.

মদ ঢালিতে লাগিলেন

গৌর। বেশী মদ খেয়ো না হে—মদ খেয়ে হরিশ মারা যাবার জোগাড় হয়েছে।

মধু। হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ ? বেচারাকে খুব খাটতে হয়—কি করবে! He is fighting tooth and nail against these indigo-planters. He is a thorough-bred editor and wields a powerful pen. It is a misfortune that he and Ramgopal Ghose did not write in Bengali.

গৌর। লোকটার হিম্মৎ আছে ভাই। এই ক'বছর আগে, মিউটিনির সময় কি লেখাটাই লিখেছিল!

মধু। Please don't remind me of the Mutiny—নানা সাহেবের পাশবিক কাণ্ডের কথা ভাবলেও আমার লজ্জা হয়। He killed women and children—My God!

গৌর। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও তার শোধ তুলে নিয়েছে। যাক্—যেতে দাও ওসব কথা! তোমার নতুন লেখাটা একটু শোনাও না! সত্যি আমার একটা দুঃখ থেকে গেছে! শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়টা আমি দেখতে পাই নি। কিছুতেই ছুটি পেলাম না। শুনেছি খুব গ্র্যাণ্ড হয়েছিল। আচ্ছা, 'একেই কি বলে সভ্যতা' আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এ দুটো বই staged হল না কেন বুঝলাম না!

মধু। (এক চুমুক মদ্যপান করিয়া) জানি না! These Rajales are strange fellows! তাদেরই করমাসে বই দুখানা লিখলাম—they paid me for them! শুনছি নাকি some of the young Bengals have intervened—রাজারা তাদের চটাতে রাজী নয়। যাক্ গে—satire আর লিখব না। কেশব—I mean কেশব গাঙ্গুলী—has given me a very good idea and I have got a very good plot for কৃষ্ণকুমারী from Todd.

গৌর। রঙ্গলালও শুনেছি রাজস্থানের গল্প নিয়ে আবার কি যেন একটা লিখছে।

মধু। I wish he would leave the beaten track.

বুক শেল্ফ্ হইতে একখানি বই পাড়িলেন

এই শোন না রঙ্গলালের লেখা—

নহাযোর যুদ্ধে মুগলমান সাতে
দিবারাত্র ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে,
সহস্রেক যোদ্ধা চিতোরের পক্ষে
বিপক্ষের পক্ষে যুঝে লক্ষে লক্ষে।
বহে রক্ত-ধারা বুঁদেলা শরীরে
হয় স্নাত সেনা ঘন স্বেদ নীরে;
গুড়ুম গুম্ গুড়ুম গুম্ মহাশব্দ তোপে
পড়ে সৈন্য ঠাট তরবার কোপে—

This may be a good imitation of 'তুরঙ্গ প্রপাত' —কিন্তু যুদ্ধের বর্ণনা হিসাবে he ought to have been loftier in imagination. তিলোত্তমার প্রথম দিকে আমি দৈত্যদের নিকট পরাজিত দেবতাদের বর্ণনায় খানিকটা যুদ্ধের আভাস দিয়েছি—here you are.

তিলোত্তমাসম্ভব হইতে পড়িতে লাগিলেন

সদা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল-সমাকুল
প্রবল তরঙ্গ-দল তীর অতিক্রমি'
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণ-কুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যাম-অঙ্গ ঋতু-কুল-পতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্রাবন—তার আভরণ !

And here again—

ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইল সবে রণে—
আকুল ! পাবক যথা, বায়ু যার সখা
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশিলে নিবিড় কাননে
মহাত্রাসে উর্দ্ধশ্বাসে পলায় কেশরী,
মদকল, নাগদল চঞ্চল সভয়ে
করভ করিণী ছাড়ি পলায় অমনি
আশুগতি ; মৃগাদল, শার্দ্দূল বরাহ
মহিষ, জীবন-খড়্গী—অক্ষয় শরীরী
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পলায় ভৈরবরবে ত্যজি বনরাজি
পলায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ বেগে ধায় চারিদিকে
মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ
জীবন-তরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে।

গৌর। তোমার লেখা ত অঙ্ক জাতেরই! It has Homeric outlook and Miltonic grandeur!

মধু। মিলটন আমার দেবতা! রঙ্গলালের আদর্শ কারা জান? Byron, Moore and Scott. I wish he would travel farther. He would then find what hills peep over hills—what Alps on Alps arise! বাল্মিকী, ব্যাস, হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে, টাসো, মিলটন—এঁরাই হচ্ছেন কবিকুলগুরু! আদর্শ করতে হ'লে এঁদেরই আদর্শ করব। Byron, Moore, Scott, Pope are at a much lower level

গৌর। হিন্দু কলেজে কিন্তু তোমাকে 'আমরা Pope বলতাম!

মধু। (হাসিয়া) And I became vain like a Cock at this. I was a fool then.

গৌর। রঙ্গলালের কবিতা মাঝে মাঝে কিন্তু বেশ লাগে—

মধু। Oh, yes.—পদ্মিনীর এই লাইনগুলো খুব ভাল লাগে আমার!

পদ্মিনী খুলিয়া পড়িলেন

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়!
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গসুখ তায়!

This is superb. I have also started rhyming in ব্রজাঙ্গনা!

(নেপথ্যে) আসতে পারি আমরা ?

মধু। আসুন! পণ্ডিতরা এসেছে—Gour now I must bid you Good-Night.

গৌর। এখন পড়াশোনা হবে বুঝি—

মধু। হ্যাঁ—I shall dictate now.

গৌর। উঠি তবে। তোমার নতুন লেখাগুলো দেখাই হ'ল না—বাজে কথায় সময় কেটে গেল!

মধু। সে আর একদিন হবে।

তিনজন পণ্ডিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন

আসুন আপনারা, বসুন। গৌর, তোমার কাছে আইনের বইও দু-এক খানা নেব। আইনও পড়ছি জান ত? (হাসিয়া) Carrying on everything.

গৌর। আচ্ছা, কাল আসব! Good Night (প্রস্থান)

মধু। Good Night. (পণ্ডিতদের প্রতি) বসুন আপনারা—

পণ্ডিতগণ তিনকোণে তিনটি টেবিলে গিয়া বসিয়া ছিলেন। মধুসূদন একটি সিগারেট ধরাইয়া প্রথম পণ্ডিতের নিকটে গেলেন

আপনি কৃষ্ণকুমারী লিখছেন, না? কতদূর হয়েছে দেখি! (দেখিলেন) দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক শেষ হয়েছে—না? that's all right!

দ্বিতীয় পণ্ডিতের নিকটে গেলেন

ব্রজাঙ্গনার 'ময়ূরী' কবিতাটা কাল শেষ হয় নি! মাত্র গোড়াটা সুরু করেছিলাম। পড়ুন ত—

২য় পণ্ডিত। (পড়িতে লাগিলেন)

তরুশাখা উপরে শিখিনি
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে
তুইও কি দুঃখিনী!
আহা, কে না ভালবাসে রাধিকা-রমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি শব্দ বিহঙ্গনি!

মধুসূদন সিগারেটটাতে দু-একটা টান দিলেন। তাহার পর তৃতীয় পণ্ডিতের নিকট গেলেন

মধু। মেঘনাদ কতটা হয়েছে?

তৃতীয় পণ্ডিত। ভগ্নদূত এসে রাবণকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছে।

মধু। শেষের কয়েক লাইন পড়ুন ত!

তৃতীয় পণ্ডিত। (পড়িলেন)

এতেক কহিয়া রাজা দূতপানে চাহি
আদেশিলা—কহ দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?

মধু। দেখি—

দেখিলেন ও খাতা ফিরাইয়া দিলেন। তাহার পর সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়া সিগারেটটা ফেলিয়া দিলেন এবং পশ্চাতে হস্তনিবদ্ধ করিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা প্রথম পণ্ডিতের কাছে গেলেন।

লিখুন!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—নগরপ্রান্তে রাজপথ

সম্মুখে দেবালয়

দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী ও মদনিকা

হয়েছে লেখা?

১ম পণ্ডিত। দাঁড়ান—হয়েছে—মদনিকা

মধু। লিখুন তাহলে এবার—মদনিকা বলছে—আর কেন সখি! চল এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্ গে। বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ দেব-দর্শনের ছলে এখানে এসেছি—আর এখানে থাকলে লোকে বলবে কি! নেপথ্যে—রণবাদ্য! লিখেছেন?

১ম পণ্ডিত। হ্যাঁ—নেপথ্যে রণবাদ্য।

মধু। লিখুন—বিলাসবতী এবার বলছেন—ঐ শোন লো শোন! মহারাজ বুঝি ফিরে আসছেন। মদনিকা উত্তরে বলছেন—

পণ্ডিত মাথা নাড়িয়া থামিতে বলিলেন

Oh, you are slow, pundit! হয়েছে? লিখুন—মদনিকা বলছেন—তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দিকি কে আসছে?

আবার কিছুক্ষণ পদচারণ

লিখুন। বিলাসবতী। সখি আমি চক্ষের জলে একেবারে অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা কৈ—আমি ত কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।

মদনিকা। এখন ভাই কাঁদলে আর কি হবে। ওই দেখ মন্ত্রীমশায় আসছেন। (মন্ত্রীর প্রবেশ)

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মধুসূদন আবার বেশ কিছুক্ষণ পদচারণা করিলেন ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন

আপনি আর একবার মন্থরীটা পড়ুন ত!

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (পাঠ)

তরুশাখা উপরে শিখিনি
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে
তুইও কি দুঃখিনী?
আহা কে না ভালবাসে রাধিকারমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি, শশি, বিহঙ্গিনি!

মধু কিছুক্ষণ পরিক্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন

—আয় পাখি আমরা দু'জনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে
নবীন নীরদে প্রাণ তুই করেছিস্ দান
সে কি তোর হবে?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকা-রঞ্জনে
তুই ভাববনে ধনি আমি শ্রীমাধবে।

দ্বিতীয় পণ্ডিত লিখিতে লাগিলেন ও মধুসূদন আবার পদচারণা সুরু করিলেন। সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন

ইন্দ্রের আর একটী নাম—শক্র, না?

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। লিখুন—

কি শোভা ধরয়ে জলধর
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে
স্বর্ণবর্ণ শক্রধনু রতনে খচিত তনু
চূড়া শিরোপর
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। পরে তরুবর?

মধু। মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর। (তৃতীয় পণ্ডিতের প্রতি) এইবার আপনার পালা! পড়ুন ত খানিকটা! একটু আসের থেকে পড়ুন! Just create the atmosphere.

তৃতীয় পণ্ডিত। (পড়িতে লাগিলেন)

কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে সেউটি—
নীরব রবাব বীণা, মৃদঙ্গ, মুরলী—
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে!

মধু। চুপ করুন। ঠিক পড়া হচ্ছে না আপনার—

আর একটা সিগারেট ধরাইলেন ও চৌকির হইতে রিস্টওয়াচটা তুলিয়া লইয়া খানিকক্ষণ নীরবে পড়িলেন। তাহার পর সেখানা রাখিয়া দিয়া পদচারণা করিতে সুরু করিলেন। মধ্যে মধ্যে বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ও দক্ষিণ হস্ত উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

হাতীর কি কি প্রতিশব্দ জানেন বলুন ত! তিলোত্তমাতে ব্যবহার করেছি অনেক কথা—মনে থাকে না সব!

তৃতীয় পণ্ডিত। হাতীর? হস্তী, করী, গজ, মাতঙ্গ, বারণ।

মধু। I think there is another good word.

তৃতীয় পণ্ডিত। কুঞ্জর।

মধু। That's the word—কুঞ্জর। আচ্ছা বহু শব্দের একটা বলুন ত—

তৃতীয় পণ্ডিত। বজ্র, কুলিশ, দাঁড়ান অভিধানটা দেখি—(অভিধান দেখিলেন) ইরম্মদ—

মধু। (উদ্দীপিত হইয়া) yes, I want ইরম্মদ—সুন্দর কথাটা।

আবার খানিকক্ষণ পাদচারি করিয়া

এইবার লিখুন—

প্রণমি রাজেন্দ্র পদে করযুগ যুড়ি
আরম্ভিলা ভগ্নদূত—হায়, লঙ্কাপতি
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
মদকল করী যথা পশে নলবনে

তৃতীয় পণ্ডিত। মদকল শব্দের অর্থই মত্ত হস্তী—আবার করী কেন?

মধু। যা বলছি লিখে যান—

মদকল করী যথা পশে নলবনে

পশিলা বীর-কুঞ্জর অগ্রিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি স্মরিলে সে ভৈরব-হুঙ্কারে!
শুনেছি রাক্ষসপতি মেঘের গর্জ্জনে;
সিংহনাদে: জলধির কল্লোলে: দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব ছুটিতে পবন
—পথে;

ধনুকের ভাল বাঙলা কি! বেশ গালভরা একটা শব্দ বলুন ত! There is a word.

তৃতীয় পণ্ডিত। দাঁড়ান অভিধানটা দেখি—(দেখিলেন) কোদণ্ড?

মধু। কোদণ্ড, কোদণ্ড! লিখুন।

কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর-ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কারে
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর।

মধু। শরের কতকগুলো প্রতিশব্দ দেখুন ত।

তৃতীয় পণ্ডিত। শর, তীর, বান, কলম—

মধু। good—লিখুন—

পদচারণ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘনঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে
মেঘদল আসি যেন আবরিল রবি
গগনে: বিদ্যুৎঝলাসম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে—

আবার পিছনদিকে হস্তনিবদ্ধ করিয়া তিনি পদচারণা সুরু করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রথম পণ্ডিত চাই তুলিলেন ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন। দ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁহাকে চোখের একটা ইঙ্গিত করিলেন।

প্রথম পণ্ডিত। দত্ত মশায়!

মধু। (হঠাৎ চমকাইয়া) Shut up.—কথা বলেন কেন? কি বলছেন?

প্রথম পণ্ডিত। (ইতস্তত করিয়া) আমাদের বেতন প্রায় তিনমাসের বাকী পড়েছে—যদি কিছু দিতেন আজ ভাল হ'ত!

মধু। তিনমাসের বাকী পড়েছে! বেশ ত পাবেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। পাবেন পাবেন ত রোজই শুনছি! আমরা গরীব ব্রাহ্মণ—

মধু। আপনারা কি মনে করেছেন আমার হাতে টাকা আছে—অথচ দিচ্ছি না?

তৃতীয় পণ্ডিত। আজ্ঞে তা নয়—তিনমাসের হয়ে গেল কি না!

মধু। হাতে টাকা এলেই সব মিটিয়ে দেব—এখন যা করছেন করুন।

(নেপথ্যে) দত্ত মশায় বাড়ী আছেন?

মধু। "Damn it—আবার কে এলো!

বাড়ীওলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বাড়ীওলা। ভাড়াটা কবে দেবেন?

মধু। কাল পাঠিয়ে দেব—

বাড়ীওলা। কাল ঠিক চাই কিন্তু—দেখবেন কাল যেন আবার ঘুরতে না হয়।

মধু। না, কাল ঠিক পাবেন।

বাড়ীওলা। ঠিক ত?

মধু। ঠিক!

বাড়ীওলা বাহির হইয়া গেলেন

(পণ্ডিতদিগকে) আপনাদেরও দেব—টাকা পেলেই দেব—টাকা শিগ্‌গিরই পাব কিছু। আসুন সুরু করা যাক। লিখুন। কতদূর হয়েছে?

তৃতীয় পণ্ডিত। উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে—

পিছন হস্তনিবদ্ধ করিয়া মধুসূদন আবার পদচারণ সুরু করিলেন। একটু পরেই দ্বারে আবার শব্দ হইল ও একটি খানসামাগোছের লোক একটি প্যাকেটহস্তে প্রবেশ করিল।

খানসামা। (সেলাম করিয়া) হুজুর মেম সাহেবকো গাউন লায়া—

মধুর হস্তে প্যাকেটটি দিল

মধু। ও, বেটা সেদিন অর্ডার দিয়েছিলাম?

খানসামা। জি হুজুর!

মধু। দেখি—

প্যাকেটটি খুলিয়া ফেলিলেন ও একটি সুদৃশ্য গাউন বাহির করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। গাউনটি দামী ও দেখিতে সত্যই অপরূপ। দেখিতে দেখিতে মধুসূদনের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বাঃ—ফাইন্! It will make Henrietta look like a princess! চমৎকার—ফাইন্—ফাইন্! সুন্দর নয় পণ্ডিত?

প্রথম পণ্ডিত। তাতে আর সন্দেহ কি!

মধু। (ড্রয়ার খুলিয়া) বকশিস্ লে যাও!

(টাকা বাহির করিয়া খানসামাকে দিলেন।

গাউনকা বিল পিছে ভেজ দে না!

খানসামা। জি হুজুর—

খানসামা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

মধু। (গাউনটা তুলিয়া ধরিয়া) চমৎকার—বাঃ—কি সুন্দরই হয়েছে গাউনটা! Fine! হেনরিয়েটাকে পরিয়ে দেখতে হবে এখুনি! আজ আর কিছু হবে না! আপনারা আজ যান!

'হেনরিয়েটা' 'হেনরিয়েটা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

পণ্ডিতগণ পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন

ক্রমশঃ

জাপানের পথে

যাদুকর পি-সি-সরকার

ওশাকা ও টোকিও

এক মাসকাল জাপানের দক্ষিণাংশের মোজী, সিমোনোসেকী, কোবে, ওশাকা, টাকারাজুকা প্রভৃতি শহরে অতিবাহিত করিয়া আমরা ক্রমেই উত্তর দিকে চলিয়াছি। নাগোয়া, কিওতো, ইয়োকোহামা, নারা, ফুজী প্রভৃতি অঞ্চল শেষ করিয়া অবশেষে জাপানের বর্ত্তমান রাজধানী টোকিও শহরে যাই।

সমগ্র জাপান পরিভ্রমণ করিয়া বুঝিলাম, জাপান পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন। পরমেশ্বর যেন সমগ্র পৃথিবীর সৌন্দর্য্য উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন এই প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে। আয়তনে জাপান দেশ আমাদের বাংলা প্রদেশ অপেক্ষা ক্ষুদ্রই হইতে চাহিবে কিন্তু আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধিতে উহা সমগ্র ভারতবর্ষ অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমের অপূর্ব্ব সম্মিলনে সৃষ্ট এই জাপান দেশ। ইহার সব বিষয়েই যেন একটু বৈশিষ্ট্য থাকা চাই।

এদেশের গাছ ফলফুলে পরিপূর্ণ, কিন্তু ফুলে গন্ধ নাই। কুকুর আছে কিন্তু ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকে না। শিশুরা কাঁদে না। বাপ মায়ের হাতে মার খাইয়া তাহারা অযোবদন হইয়া থাকে এবং তখন চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়ে কিন্তু কখনও চীৎকার করিয়া ওঠে না। সেখানে একদিনও একটী শৃগাল দেখি নাই (অবশ্য চিড়িয়াখানায় অনেকই দেখিয়াছিলাম।) সুন্দর সুন্দর পাখী যথেষ্টই আছে কিন্তু কোনটাই গান করে না। কি আশ্চর্য্য!

কোবে শহরে যখন আমার যাদুবিদ্যাভিনয় বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া শহরময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ জাপানী ঐন্দ্রজালিক টেন কাটসু ওশাকা শহরের 'নাকা-জা' থিয়েটার হলে সদলবলে অভিনয় করিয়াছিলেন। 'নিচি-নিচি' সংবাদপত্রে তাঁহার বিবরণ পাঠ করিয়া Japan Tourist Bureau হইতে সমুদয় বিবরণ সঠিকভাবে গ্রহণ করিয়া আমি টেন কাটসুর যাদুবিদ্যা দর্শনাভিলাষে ওশাকা রওনা হইলাম। কোবে হইতে ওশাকা ত্রিশ-পয়ত্রিশ মাইলের মত হইবে এবং আমরা (over-head elongated railway) মাথার উপর দিয়া গামী বিশেষ গতিশীল বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীতে মাত্র কয়েক মিনিট মধ্যেই ওশাকা শহরে পৌছিলাম। ষ্টেশন হইতে বাসযোগে শহরের অপরপ্রান্তে 'তোতমবরি' অঞ্চলে 'নাকা-জা' রঙ্গমঞ্চে পৌছান গেল। রঙ্গমঞ্চের বাহিরে জাপানের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক টেন কাটসুর বিরাট শৈলচিত্রসমূহ শোভা পাইতেছে। বলাবাহুল্য, টেন কাটসুই জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর এবং তিনি একজন মহিলা। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম সোকিওকুশাই টেন কাটসু। মনে মনে ভাবিতেছিলাম, এই টেন কাটসু সমগ্র পৃথিবীময় যাঁহার এত সুনাম। ইঁহার পিতা টেন ইচি যাদুবিদ্যা-জগতের একজন বিশেষ খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত বহুবিধ খেলা বর্ত্তমানের বিংশশতাব্দীর যাদুকর, এমন কি, যাদু-সম্রাটগণও নিজেদের মঞ্চমধ্যে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। টেন ইচি বহুবিধ নূতন খেলা আবিষ্কার করিয়া সভ্য শিক্ষিত আমেরিকা ও ইউরোপের জনসমাজে সেগুলির প্রচার করিয়া শুধু জাপানেরই নহে, সমগ্র প্রাচ্য-দেশের সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তদীয় কন্যা টেন কাটসুও ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র বিজয়মালা লইয়া আসিয়াছেন।

টেন কাটসু আমার পরিচয় পাইতেই বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি ইতি পূর্ব্বে লণ্ডন যাদুকর-সম্মিলনীর পত্রিকাতে ও অপরাপর বহু বিলাতী সংবাদপত্রে আমার নাম ও বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। জাপান ও চীনের বড় বড় সংবাদপত্রে আমার বিস্তৃত জীবনকাহিনী সচিত্র প্রবন্ধগুলি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার হস্তগত হইয়াছে—কাজেই আমার নিজের তরফ হইতে কিছুই করিতে হইল না। সমস্প্রদায় টেন কাটসু আমাকে তাঁহাদের বহুপ্রশংসিত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করাইলেন। টেন কাটসুর যাদুবিদ্যা বাস্তবিকই অতিশয় উচ্চাঙ্গের। বহুবিধ দামী বহুপাতি সাহায্যে—বিশেষ প্রস্তুত দূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে তাঁহার যাদুবিদ্যাভিনয় হইতেছিল। এস্থলে বলিয়া রাখা প্রয়োজন

জাপানের যাদুকর সম্মিলনী—মধ্যে উপবিষ্ট 'টেন কাটসু'

যে, টেন কাটসুর বর্ত্তমান বয়স বাহান্ন বৎসরেরও অধিক। বার্দ্ধক্যবশত তিনি যাদুরঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তদীয়া চব্বিশ বৎসর বয়স্কা কন্যা সোকিওকুশাই টেন কাটসু (জুনিয়ার) নাম লইয়া যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। সাধারণত টেন কাটসু (জুনিয়ার)ই সমস্ত খেলা দেখাইয়া থাকেন—বৃদ্ধা টেন কাটসু প্রত্যহ পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য রঙ্গমঞ্চে আসেন মাত্র। দর্শকগণ ঐ পাঁচ-দশ মিনিটের অভিনয় দর্শনার্থেই পাগল হইয়া ছুটিয়া আসে। আমার আলাপ পরিচয় ঐ আসল টেন কাটসুর সঙ্গেই হইয়াছিল এবং

আমাকে দেখাইবার জন্য তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টারও অধিক কাল তাঁহার নির্ব্বাচিত যাদুক্রীড়াসমূহ দেখাইলেন। পরে তিনি আমার খেলাগুলিও দেখিলেন। টেন কাটসু আমার যাদুবিদ্যাভিনয়ে অত্যন্ত প্রীতা হইয়াছিলেন বলিয়া সেদিন হইতে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। টেন কাটসু প্রেস-প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি দিলেন, 'যাদু-সম্রাট পি-সি-সরকার (নিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আসিয়াছেন)—জাপানে এ পর্য্যন্ত বৈদেশিক যত যাদুকর আসিয়াছেন তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি টোকিও যাদুকর সম্মিলনীতেও একটী পত্র দিয়া দিলেন—যাহাতে আমাকে সেখানে সমুচিত অভ্যর্থনা করা হয়। আমি এর পর টোকিওতে গিয়া দেখি যে, রাজধানীময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে—হাজার হাজার বিশেষ গণ্যমান্য জাপানীর উপস্থিতিতে জাপানের যাদুকর-সম্মিলনীর সভাপতি আমাকে তাঁহাদের 'মেডেল' পরাইয়া দিয়া ও একতোড়া টাকা দিয়া তাঁহাদের 'সম্মানিত সদস্য' (hony. member) নির্ব্বাচিত করিলেন। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ভারতীয় সমস্ত সংবাদপত্রেই ইহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক টেন কাটসু যখন আমার যাদুবিদ্যাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিলেন—সেদিন হইতে জাপানে আমার আদর সর্ব্বাধিক।

জাপানের সংবাদপত্রপরিচালনা বড়ই আশ্চর্য্যরকম। সে দেশে শহর সংখ্যা—মফঃস্বল সংখ্যা নাই। যেদিনকার কাগজ সেইদিনই শহরময় ছড়াইয়া পড়ে। সংবাদপত্র-ওয়ালাদের নিজস্ব উড়োজাহাজ আছে—ঐগুলি অতি প্রত্যূষে সংবাদপত্র লইয়া শহরে শহরে বিলি করিয়া দিয়া আসে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ গতিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীতে সংবাদপত্র শহর হইতে শহরান্তরে প্রেরিত হয়। জাপানের 'নিচি-নিচি' নামক দৈনিক সংবাদপত্রখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহার দৈনিক প্রচার-সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষেরও অধিক।

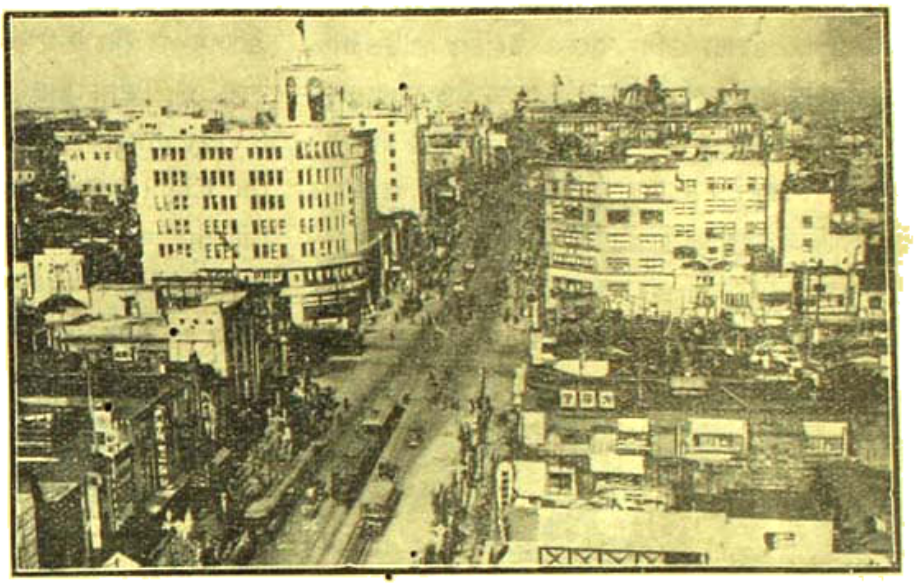

টোকিও শহরের জনবহুল কিল্লা ঈট

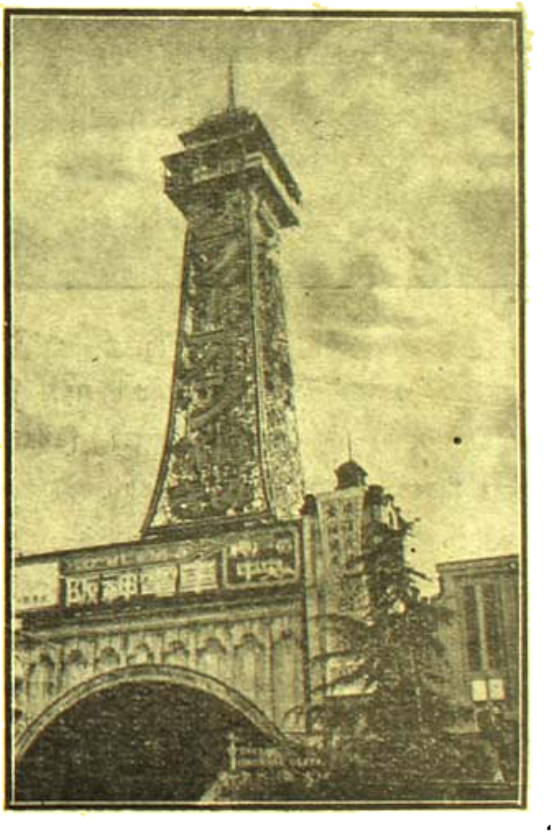

কলিকাতার মনুমেন্টের ন্যায় জাপানের ওসাকা শহরের সুপ্রসিদ্ধ হুতেনকাকু মনুমেন্ট

ঐরূপ 'ওশাকা আশাহী' সংবাদপত্রখানিরও প্রচার-সংখ্যা ভারতবর্ষের যে-কোন পত্রিকার প্রচার-সংখ্যার চেয়ে বহু (বহু শত) গুণ বেশী। সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থাও উহাদের বিশেষ আধুনিক প্রণালীসম্বলিত। লিনো টাইপ, মনো টাইপ, রোটারী মেসিন বাদেও উহাদের রেডিওগ্রাম, টেলিফটো সার্ভিস প্রভৃতি আছে। এতদ্ব্যতীত সংবাদবাহী কবুতর সাহায্যেও তাহারা বহু সংবাদ জুটাইয়া থাকেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণ নানাবিধ ফটোচিত্র গ্রহণ করিয়া উহার ফিল্মনেগেটিভ কবুতরের পায়ায় বাঁধিয়া দিয়া ছাড়িয়া দেয়—সাংবাদিক কবুতরগুলি খবরের কাগজ অফিসে (বহু শত মাইল দূরে) ঐ বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া আসে। সাধারণ

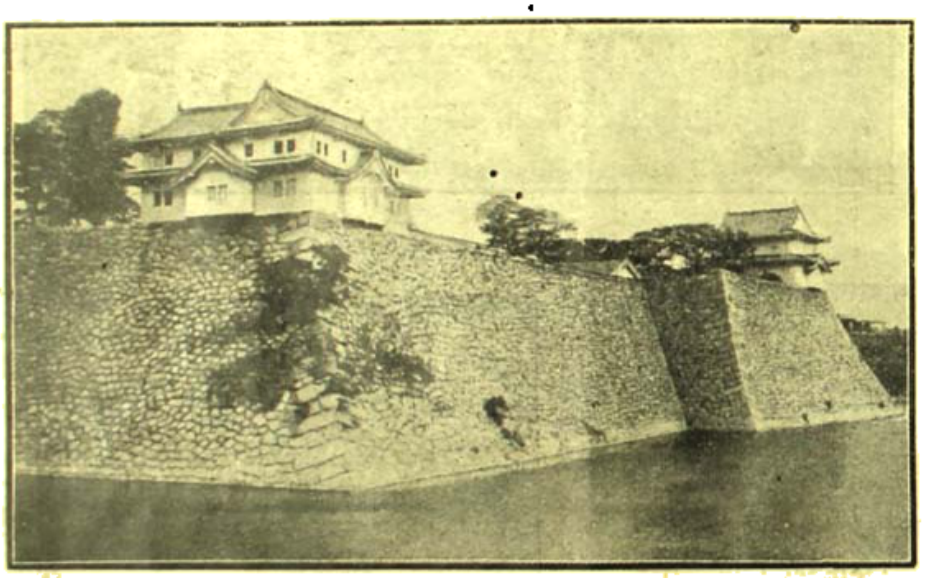

ওশাকাস্থিত জাপানের রাজবাড়ী

মানুষের পক্ষে হয়ত ঐ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসা সম্ভব হইত না। সমুদ্রবক্ষে কোন জাহাজ বিপন্ন হইলে তাহাদের বিবরণ ও আলোকচিত্র ঐ সংবাদবাহী পারাবত বহন করিয়া আনিয়া দেয়।

জাপানে স্কুলের ছেলেরা ইউনিফর্ম পোষাক পরে এবং মিলিটারী প্রথায় চলাফেরা করে। তাহাদের চলার এবং কথা কহিবার ধরণ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মনে তেজ কতদূর। রাস্তায় উহারা কখনও মারামারি ও হুড়াহুড়ি করে না। এ দেশে স্কুল ছুটি হইলে ছাত্রেরা যেরূপ গণ্ডগোল করিয়া বাহির হইয়া চৈ চৈ শব্দে পথ চলিতে থাকে, উহাদের মধ্যে ঐরূপ প্রথা নাই। তাহাদের মধ্যে ধৈর্য্য ও সংযমের বাঁধটা খুবই বেশী। উহারা আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডের পরমভক্ত। একবার অষ্টম এডোয়ার্ড (যখন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ ছিলেন) জাপান ভ্রমণে গিয়া সখ করিয়া রিক্সা টানিয়াছিলেন। জাপানে সেই রিক্সাবাহক প্রিন্স অব ওয়েল্‌স-এর বিরাট তৈলচিত্র সুরক্ষিত হইয়াছে। তাহারা বলে, খুব ভাল রাজা, আসল রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড। (Very good king, real king—King Edward the Eighth) তাঁহারা ঘরে ঘরে সম্রাট এডোয়ার্ড ও মিসেস সিমসনের ফটো রাখিয়াছে। সখে পড়িয়া নহে—তাঁহার রাজোচিত গুণে মুগ্ধ হইয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা করে বলিয়া। যেদিন আইনের কঠোর শাসনে পড়িয়া এই রাজা প্রেমের বেদীমূলে তাঁহার সিংহাসন উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেদিন সমস্ত জাপানী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, সরল প্রাণা মেইজাদল হয়ত বা অন্তরালে কয়েক ফোঁটা অশ্রুও সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহারা ম্যাজিক প্রসঙ্গ উঠিলেই বলে, 'Ex-King Edward is a very good magician'. ইতিপূর্ব্বে আমি জানিতামই না যে, আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড একজন চতুর যাদুকর। জাপানের যাদুকরগণই সর্ব্বপ্রথম ঐ রহস্য আমার নিকট প্রকাশ করে। তাহারা প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্‌কে কতকগুলি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ক্রীড়া দেখাইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। প্রিন্স নাকি তৎকালে টাকা, পয়সা, সিগারেট, ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা প্রভৃতি দ্বারা অতি চমৎকার হাত সাফাই করিতে পারিতেন। কিছুদিন পরে এদেশে ফিরিয়া আসিবার পথে সিঙ্গাপুরের মালয়ার ম্যাজিক সার্কেলে জানিতে পারি যে, ডিউক-অব-উইণ্ডসর একজন অতিশয় প্রতিভাবান যাদুকর। তৎপর ইংলণ্ডের যাদুকর সম্মিলনীর অন্যতম সভাপতি জে সি ক্যানেল লিখিত ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের যাদুবিদ্যা

জীবনের একটা বিস্তৃত কাহিনী পাই। তিনি বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরদের শিষ্যত্ব করিয়া বর্ত্তমানে বহু অলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারী। তিনি নাকি অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী যাদুকরকেও পরাস্ত করিয়াছেন। ইয়োকোহামা ও টোকিওতে লক্ষ্য করিলাম প্রত্যেকেই আগামী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। ঐ বৎসরই জাপানীদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার ২৬০০তম উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং সেই উপলক্ষেও তাহারা একটী বিরাট আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিবার বাসনা করিয়াছে। এখন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ চলিতেছে, কিন্তু এই তিন বৎসর পূর্ব্বেই তাহাদের সাজ সাজ ভাব আরম্ভ হইয়াছে। কিমোনো ডিজাইন, স্কুলের ছেলেদের ইউনিফর্ম্মের ডিজাইন সকলের উপরই অলিম্পিকের পাঁচরঙ্গা চক্রের প্রতীক শোভা পাইতেছে। নূতন দালানকোঠার পরিকল্পনা, প্রচারার্থ পত্রিকার পরিকল্পনা—সকলই চলিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক উৎসবের সদস্যগণ একটী জরুরী সভা আহ্বান করিয়া আমার যাদুবিদ্যার প্রশংসা করিয়া আগামী অলিম্পিক উৎসবে যোগদানের জন্য যথারীতি নিমন্ত্রণও করিয়া ফেলিলেন। ফেরার পথে দেখিলাম, বহু পুরাতন বাড়ী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নূতন পরিকল্পনার নূতন মূর্ত্তিতে সব অট্টালিকা গড়িয়া উঠিতেছে।

জাপান নবীনতার পূজারী। পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া তিল তিল করিয়া নূতন সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া তাহারা তাহাদের দেশকে নূতন তিলোত্তমা করিয়া গড়িতে ব্যস্ত। বিগত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে সমগ্র টোকিও শহর ধূলায় পরিণত হয়। কিন্তু উহাতে জাপানের ক্ষতি অপেক্ষা লাভই হইয়াছে বেশী। শহরের পুনরায় নির্ম্মাণের সময় আধুনিকতম রূপ ও ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শহরসমূহের অনুকরণ করিয়া আজ নূতন রাজধানী টোকিও বর্ত্তমান। সেই ভূমিকম্পের ফলেই টোকিও আজ এত বিরাট—এত সমৃদ্ধ ও এত মনোভিরাম। আজ টোকিও আয়তনে পৃথিবীর তৃতীয় মহানগরী। এই ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরিই জাপানকে আজ এত বড় এবং এত শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। ভূমিকম্পের

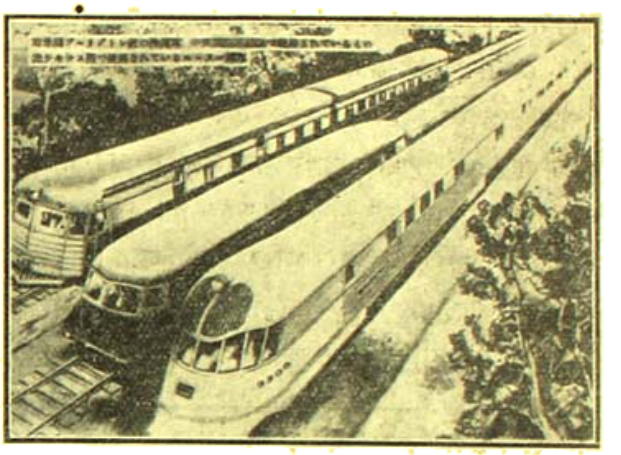

• ভূমিরামাগা নী বিশেষ গতিশীল বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী

জন্য তাহারা সব কিছুই নিত্য নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে—মৃত্যুকে তাহারা ভয় করে না। মৃত্যুকে খেলার সাথী করিয়া লইয়া গৌরবকে তাহারা উচ্চে স্থান দিয়াছে। সেইজন্যই বোধ হয় প্রতি বৎসর তাঁহারা দলে দলে এত পেট কাটিয়া

উৎসবে যুযুৎসু জাপানী তরুণী

আত্মহত্যা 'হারিকিরি' করিতে সক্ষম হয়। আগ্নেয়গিরির জন্য দেশে খনিজ পদার্থ খুব বেশী, কয়লার খনির খোঁড় করিতে করিতে তাহারা বাহির করিয়া ফেলিল গন্ধক, তামা প্রভৃতি, যেগুলি যুদ্ধযাত্রার প্রধানতম উপকরণ। আগ্নেয়-

গিরি ও ভূমিকম্পনের আধিক্য হেতু সে-দেশ নদী-নালা-প্রস্রবণ প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ। সেখানে জলের ঝরণা ও জল-প্রপাতের সাহায্যে (Hydro-electric scheme) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় বলিয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যবহার সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য জাপানের সামান্য পাড়াগ্রামেও ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, হিটার, টেলিফোন প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। সে-দেশে একবার ফোন করিবার খরচ মাত্র এক পয়সা আর কলিকাতায় শহরের এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীর খরচ প্রতিবারে দুই আনা; দুই-তিন পয়সা ইউনিট খরচে সেখানে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে। সে দেশে ইলেকট্রিক খরচ এত সস্তা, সে দেশের বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিদ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যাদির মূল্য অপর দেশ অপেক্ষা সস্তা হইবে

জাপানে তাইওয়ান কৃষ্ট (বুদ্ধমূর্ত্তি)

তাহাতে বিচিত্র কি? তাহারা ঐ সস্তা বিদ্যুৎ পাইয়াই সন্তুষ্ট নয়, তাহাদের মনে আন্তরিক আগ্রহ ও ইচ্ছা, যে-কোন উপায়ে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করিব, উন্নত করিব—'জাপানী আমরা মানুষের মত মানুষ হইব।' ইহা লইয়াই তাহারা প্রাণপাত করিতেছে। এই জন্যই সে-দেশে আজ চোর নাই। প্রতিবেশী চীনাদের মধ্যে কতরূপ অসভ্য গালি দেওয়ার ভাষা বিদ্যমান—এমন কি, সভ্য শিক্ষিত ইউরোপীয় ও আমেরিকান সমাজও উহার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। কিন্তু জাপান এই প্রত্যেকটী জাতির অতিশয় ঘন সন্নিবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের সর্ব্বব্যাপার অনুকরণ করিয়াও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। জাপানী ভাষায় অসভ্য গালি দিবার কোন কথা নাই। ইহা উহাদের নিজেদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কতটা নির্দ্দেশ করে।

বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রেডিও (radio broadcasting) আমেরিকায় বিশেষ সমাদর লাভ করে। জাপানও উহাকে নিজেদের দেশে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তৎকালে রেডিও শ্রোতাদিগকে মাসিক দুই ইয়েন ভাড়া দিতে হইত। কিন্তু তৎপরেই সর্ব্বসাধারণের নিকট উহা বিশেষ আদৃত হয় বলিয়া ভাড়া ক্রমে ক্রমে অল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাদের হিসাবে দেখিলাম প্রথম ১০,০০,০০০ সংখ্যক শ্রোতার জন্য তাহাদের সাত বৎসর সময় লাগে, তৎপর আরও ১০,০০,০০০ বৃদ্ধি পাইতে লাগিয়াছিল মাত্র তিন বৎসর। বিগত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষের হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, মোট রেডিওর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৭,৭৬,১৮৯ অর্থাৎ প্রতি এক হাজার জনের মধ্যে ৩৯৯টী রেডিও বিদ্যমান। বর্ত্তমানে জাপানে প্রত্যেক পাঁচটী পরিবারের মধ্যে একটীতে রেডিও আছে এবং একটী রেডিও রাখার মাসিক খরচ মাত্র পঞ্চাশ সেন অর্থাৎ ছয় আনা। পৃথিবীতে অন্য কোন দেশে বোধ হয় এত সস্তায় রেডিও পাওয়া যায় না। উহাদের প্রোগ্রামেও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হয়। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের চিত্তবিনোদন, দেশের জনসমাজের উপকার করাই উহাদের প্রকৃত লক্ষ্য। উহারা নিজেদের সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে এইভাবে বিভক্ত করে,—(১) সংবাদ (Information) অর্থাৎ যাহাতে সংবাদ, আবহাওয়া, বাজার দর, গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি জানান হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৫-৩০ মিনিট হইতে অর্দ্ধঘণ্টাকাল Employment Agency News বিজ্ঞাপিত করা হয়, ৬-৫৫ মিনিট হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষায় দিনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি টোকিও সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হইতে জানান হয়। (২) Talks, এই বিভাগে বিশেষ চলতি ব্যাপার, রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের বক্তৃতা হয়। ইহাতে আবার

মেয়েদের জন্য প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার দুই ভাগ করিয়া রাখা হয়। (৩) Children's Hour, প্রত্যহ ২৫ মিনিটকাল ছোট ছোট শিশুদের জন্য নানারূপ চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়। (৪) School broadcasting, ইহা বিগত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের পুঁথিগত বিদ্যার বাহিরেও যে সব বিষয় জানিবার প্রয়োজন তাহাই সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়। (৫) Outside broadcasting, এই সময়ে রেডিওর শ্রোতারা বিদেশের রেডিও ষ্টেশন প্রেরিত নানাবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি শ্রবণ করিয়া থাকে। (৬) সর্ব্বশেষে Music, Entertainment. এ ত দ্ব্য তী ত প্রত্যহ বেলা দুইটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত জাপান হইতে (short wave) রেডিও সংবাদ বিদেশে প্রেরিত হয়। ইহা overseas broadcast নামে খ্যাত। ঐ সময়ে ইংরেজী ও জাপানী ভাষায় জাপানের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি, সেদিনকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি, জাপানের নিজস্ব বাণী পৃথিবীময় জানান হয়। বলাবাহুল্য, জাপানের এই overseas broadcast বিদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। উহাদের বেতার টেলিফোন (wireless telephone) বিভাগটী গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে আছে। বেতার টেলিগ্রাম (wireless telegraphy) বিভাগও গভর্ণমেণ্টের আংশিক কর্তৃত্বাধীনে আছে, তবে বিশেষ প্রয়োজন হইলে communication minister-এর সহায়তায় সাধারণের ব্যবহারে আনা যায়।

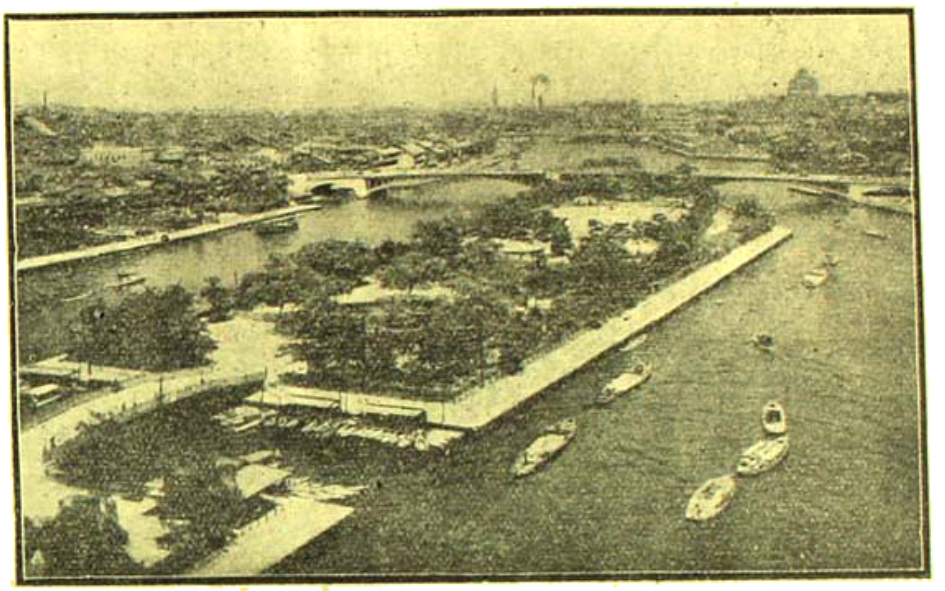

জাপানের দুইটি নদীর মধ্যস্থলে মনোরম উদ্যান

জাপানে বাইসাইকেলের প্রচলন খুবই বেশী। উহাদের ন্যায় ওস্তাদ সাইকেল চালক আমি ইতিপূর্ব্বে আর কোথায়ও দেখি নাই। সার্কাস অভিনেতার ন্যায় উহাদিগকে প্রায়ই ভারকেন্দ্রের কঠিনতম পরীক্ষা দিতে দেখা যায়। ইয়োকোহামাতে দেখিয়াছি, সাইকেলে আরোহী নিজে বাদেও সম্মুখে পিছনে আরও দুই তিন জন লইয়া অক্লেশে গ্লাস ভর্ত্তি সরবৎ লইয়া যাইতেছে। সাইকেলের পিছনে বিরাট মোট বাঁধিয়া—একহাতে খবরের কাগজের বাণ্ডিল ও অপর হাতে তরকারির বোঝা—এ দৃশ্যও প্রায়ই দৃষ্ট হয়। ট্রাম, বাস প্রভৃতি জনযানবহুল রাস্তায় ঐরূপ যাতায়াত করা কম কথা নহে। ওদেশে মোটর (taxi) খুবই সস্তা। গাড়ীগুলির রং কলিকাতার ট্যাক্সির ন্যায় অদ্ভুত লাল রংয়ের নহে—সবগুলিই private car-এর ন্যায় এবং নূতন। দেখিলে মনে

জাপানের পৃথিবী বিখ্যাত পর্ব্বত ফুজিয়ামা

হয় যে, সবেমাত্র যেন কারখানা হইতে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় মাঝে মাঝে অতিশয় জীর্ণ ও কদাকার মোটর দৃষ্ট হয়—জাপানে অনুরূপ মোটরগাড়ী বা ঝিন্না আমি কুত্রাপি দেখি নাই। ভাড়াও অতিশয় কম। মাত্র ছয়

আনা ভাড়া দিয়া আমরা পাচ-ছয় মাইল কখনও আট-নয় মাইল বেড়াইতাম। ট্যাক্সি ড্রাইভারগুলি অতিশয় ভদ্র ও বিনয়ী এবং অনেক স্থলে বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। কোবে অবস্থান কালে মাঝে মাঝে আনন্দমোহন সহায় মহাশয়ের 'ইণ্ডিয়া লজে' বেড়াইতে যাইতাম। 'ইণ্ডিয়া লজে'র ঠিকানা ছিল কমিং-ফ্রম-ফ্যুং-ফ্যুং-ডোরি। এই নামটা আমাদের মনে থাকিত না—আমরা গাড়ীতে উঠিয়াই বলিতাম commit-suicide—'দড়ি', ট্যাক্সী চালক হাসিয়া বুঝিয়া লইত এবং আমাদিগকে 'ইণ্ডিয়া লজে' লইয়া যাইত।

জাপানী হোটেলের আদব কায়দা সবই পৃথক। সঙ্গে পড়িয়া একবার একটী জাপানী হোটেলে উঠিয়াছিলাম। প্রবেশ দ্বারে পৌঁছিবামাত্র কুলী আসিয়া মালপত্র নামাইয়া

জাপানের প্রসিদ্ধ পুতুল নাচ

লইয়া গেল এবং হোটেল ম্যানেজার বা মালিক আসিয়া নমস্কার জানাইল। সেখানে নিজের পরিহিত জুতা পরিবর্ত্তন করিয়া স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়া কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। উপরে গিয়া দেখি, কোনরূপ খাটপালঙ্ক নাই—সমস্ত মেঝে পুরু-মাদুর দ্বারা আবৃত। এই মাদুরকে উহারা টাটামী বলে। ঐ টাটামীর উপর যাহাতে অক্লেশে যাতায়াত করা যায় সেইজন্য তুলার গোলমুক্ত আর একজোড়া চটিজুতা দেওয়া হইল। সেই মেঝের উপর পাচ-ছয় পুরু পুরু তোষক পাতিয়া উঁচু করিয়া দেওয়া হইল উহাই বিছানা। খাইবার জন্য আট ইঞ্চি আন্দাজ উঁচু একটা টেবিল ও তাহাতে কিছু কাঠি ও বাটী আসিল। ভাত (গোহান), জল (নিজু)—সবই আসিল কিন্তু আমাদের তৃপ্তিমত খাওয়া হইল না। দেওয়ালের একদিকে বুদ্ধমূর্ত্তি আঁকা আছে। সেই-স্থান উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধগণ ইচ্ছা হইলে ঐখানে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' করে। জাপানীদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, তাহারা সকলেই বৌদ্ধ কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পৃথিবীর এমন কোন ধর্ম্ম নাই যাহা ওদেশে প্রচারিত হয় নাই। উহারা ধর্ম্মকে বড় করিয়া দেখে নাই। কাহাকেও ধর্ম্মের গোড়ামি করিতে দেখা যায় নাই—তাহারা জানে, তাহাদের ধর্ম্ম দেশসেবা, রাজভক্তি। দেশকেই তাহারা বড় বলিয়া জানিয়াছে এবং দেশের উন্নতি লইয়াই তাহারা ব্যস্ত। সে দেশে একই পিতার এক পুত্র খৃষ্টান, এক পুত্র বৌদ্ধ এবং অপর পুত্র মুসলমান—এই লইয়া সুখে ঘর করিতেছে। সেখানে মসজিদের নিকট কামানের শব্দ হইলেও নামাজের ব্যাঘাত হইতেছে না। পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ ও হীন স্বার্থান্বেষণ তাহাদের মধ্যে নাই। তাহারা বাঁচিতে চায় জাতির জন্য, জন-সমাজের জন্য, সর্ব্বসাধারণের জন্য, তাহাদের 'আদরের দেশ—নিয়নের জন্য। সে দেশের একজন মন্ত্রীর বেতন আমাদের দেশের একজন সাধারণ রাজকর্ম্মচারীর সমান। তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রেরণা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়—তাই আজ তাহারা এত বড়। সেইজন্য জাপান আজ প্রাচ্যজগতে একটী প্রহেলিকা স্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। সামান্য বাঙলা দেশের আয়তনের একটী দেশ আজ সেইজন্য সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্য, সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী জাতিসমূহ আজ বিস্ময়াপ্লুত নয়নে জাপানের কীর্ত্তি দেখিতেছে। বাংলাদেশের সহিত জাপানের তুলনা করিলে স্বতই মনে হয়—

"পাচ কোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী;
রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ ক'রোনি।"

সমাপ্ত

প্রাচী ও প্রতীচী

অতুল দত্ত

(রাষ্ট্রনীতি)

আমরা যদি এই মুহূর্তে দূরনিরীক্ষণশক্তি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইব—এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে একটী মদগর্বিত তরুণ জাতি সাম্রাজ্য-লোভে তাহার শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীকে চরম হিংস্রতার সহিত আক্রমণ করিবার পর এক্ষণে কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষত, অন্য একটী নব-উদ্দীপিত প্রবল প্রতিবেশীর রক্ত চক্ষু তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়াছে। এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তে একটী মহচারী জাতি সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তে বিনষ্টপ্রায় হইবার আশঙ্কায় খিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। নিতীক দুর্বলবীর এই জাতি যে তরাবহ সংগ্রামের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার নিকট সর্বপ্রকার সামরিক দক্ষতা পরাভব স্বীকার করিতেছে। পশ্চিম ইউরোপে দুই বৎসর পূর্বে ফ্যাসিষ্ট শক্তির হীন ষড়যন্ত্রে যে ভয়াবহ মারণযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে এখনও সমভাবে মনুষ্য-জীবন আহুতি প্রদত্ত হইতেছে। কবে এই বিরাট যজ্ঞের অগ্নি নির্বাপিত হইবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত। যদ্যপি ইউরোপে পুঞ্জীভূত বারুদ-স্তূপের পার্শ্বে অনলশলাকা হস্তে মদগর্বিত রাজনীতিকদিগের ইতস্তত পদচারণ সমগ্র ইউরোপকে শঙ্কিত করিয়াছে; যে-কোন মুহূর্তে ভয়াবহ বিস্ফোরণ সমগ্র ইউরোপে প্রবল রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতে পারে।

সুদূর-প্রাচী

সুদূর প্রাচীর যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর জুলাই মাসের প্রথমভাগে উত্তর চীনের লুকোচিয়াও নামক স্থানে একটী তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া এই বিরাট সমরের সৃষ্টি হয়। সমর যাহাতে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে চীনা কর্তৃপক্ষ কৌশলে জাপানকে সাংহাইতে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করেন। তিন মাসকাল যমিয়া প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিবার পর জাপ-সৈন্য সাংহাই ও তৎসন্নিকটস্থ অঞ্চল অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহার পর চীনের তৎকালীন রাজধানী নান্‌কিং অতি অল্পায়াসে জাপানের করতলগত হয়। উত্তর চীনে জাপ-সৈন্য ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া পীত নদী অতিক্রম করে এবং সুংহাই রেলপথে হুচাও জংসনের নিকটে পৌঁছায়। এই স্থানে চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পূর্ব হইতে বিরাট সমরায়োজন করিয়াছিলেন; জাপ-সৈন্যের অগ্রগতি এখানে আসিয়া প্রতিরুদ্ধ হয়। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া জাপ-সৈন্য তিলমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না; এমন কি, তাহারা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় উত্তর চীনে বাঙ্গন স্থানকে জাপ-সৈন্য বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর, তাহারা চীনের বর্তমান রাজধানী লাংয়াও লক্ষ্য করিয়া ইয়াংসী নদীর উপত্যকা-পথে অগ্রসর হইতেছে। যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, জাপ-সৈন্য কিউ-কিয়াং অধিকার করিয়াছে; প্রায় প্রত্যহ জাপানী বিমানপোত হইতে চাংকাওতে বোমা বর্ষণ চলিতেছে।

চীন-যুদ্ধের গতির প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রথমেই মনে হইবে, জাপান যে আশার বুক বাঁধিয়া এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা সফল হয় নাই। জাপান মনে করিয়াছিল যে, চীনের উপকূলভাগ অবরোধ করিয়া দুর্বল চীনকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই বিজিগীষু-সমর্থ হইয়া সে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু কার্যত যাহা ঘটিল, তাহা জাপানের স্বপ্নের অতীত। জাপানের সহিত সমর আরম্ভ হইবামাত্র চীনের বিবদমান দলগুলি আপসাদিগের বিরোধ ভুলিয়া মাতৃভূমির গৌরব রক্ষার্থ একতাবদ্ধ হইল। যুদ্ধের প্রারম্ভে জাপান যে নৃশংসতা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে বিশ্বের দেশে জাপ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইল। বিশেষত চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের চির-বিরোধী কম্যুনিষ্ট দল, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইয়া সুদূর প্রাচীর এই যুদ্ধে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। কম্যুনিষ্টগণ সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে গণ-সংযোগের আবশ্যকতা বুঝাইল। তাহারা উত্তর চীনের প্রতি গ্রামে, প্রতি জনপদে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্য আরম্ভ করিল। তাহাদিগের চেষ্টায় চীনের কৃষকগণ সর্বতোভাবে চীনাবাহিনীকে সাহায্য করিতে লাগিল; সত্বর তাহাদিগের মধ্যে একটী অর্ধ-সামরিক বাহিনী গঠিত হইল। কম্যুনিষ্ট বাহিনীর গরিলা যুদ্ধে উত্তর চীনে জাপ-সৈন্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, উত্তর চীনের বহু জাপ-অধিকৃত স্থান কম্যুনিষ্ট বাহিনী পুনরায় অধিকার করিয়াছে। উত্তর শান্টাঙ্গ প্রদেশে প্রশিক্ষিত গরিলা যোদ্ধা এবং চীনা কৃষকবাহিনীর সহযোগিতায় চীনা সৈন্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। নান্‌কিং হস্তচ্যুত হইবার পর হইতে চীনের পক্ষে যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। কম্যুনিষ্টগণ পূর্ব হইতে গণ-সংযোগের প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন; এই সময় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হন। এই সময় জেনারেল চু-তের নেতৃত্বে অষ্টম রুট আর্মি উত্তর চীনের কৃষকদিগের মধ্যে শুধু প্রচারকার্যই আরম্ভ করিল না, তাহাদিগকে অস্ত্র প্রদান করিয়া একটী অর্ধ-সামরিক বাহিনী গঠন করিল। তখন হইতে কৃষকগণ খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করিয়া, পথ ঘাট বন্ধ করিয়া, কূপের জলে বিষ মিশ্রিত করিয়া আক্রমণকারীকে বিপন্ন করিতে সচেষ্ট হয়।

অর্ধ-সামরিক কুষকবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে অবস্থান করিয়া যুদ্ধে রত সৈন্যদিগকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিতে থাকে। নাম্‌কিং হস্তচ্যুত হইবার পর হইতেই চীনে কম্যুনিষ্টদিগের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কম্যুনিষ্টদিগের চেষ্টায় চীনের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যে প্রবল ভাবের আসিয়াছে, ইহাই জাপানের পক্ষে কাল হইয়াছে। আজ চীনের কৃষকগণ কেবল তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নহে, তাহাদের নিজ অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সামরিক শক্তিও তাহারা লাভ করিয়াছে। আজ চীন যদি সমুদ্র-যুদ্ধে জাপানের নিকট পরাজিতও হয়, তাহা হইলেও পশ্চাতে, জঙ্গলে, গিরিকন্দরে চীনের গরিলা যোদ্ধা, চীনের কৃষক, চীনের ছাত্রছাত্রী যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিবে, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।

নান্‌কিং অধিকার করিবার পর জাপানী সৈন্য বিভিন্ন রণক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিলেও তাহাদিগের অগ্রগতি প্রতি পদে প্রবলভাবে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। ইহার ফলে চীনা সৈন্য কেবল শত্রুকে বাধা দান করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল; এই সময় হইতে তাহারা প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত হয় এবং কতকগুলি হৃত স্থান পুনরায় হস্তগত করে। বিশেষত এই সময় হইতে চীন বিপুল ভাবে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে; ফলে এই পর্য্যন্ত বহু সমরোপকরণ চীনে প্রবেশ করিতেছে; বিভিন্ন দেশের বহু স্বেচ্ছা-সৈন্য, চিকিৎসক এবং শুশ্রূষাকারিণী চীনের পক্ষে যোগ দিয়াছেন। সর্ব্বোপরি রুশিয়ার সহায়তা। রুশিয়া পূর্ব্ব হইতেই চীনকে সাহায্য করিতেছিল; এই সময় ডাঃ সান্-ইয়াৎ সেনের পুত্র ডাঃ সুন্-ফো মস্কোতে গমন করিয়া রুশিয়া হইতে নিয়মিত সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে শত শত রুশ বিমানপোত এবং বৈমানিক সৈন্য চীনের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে।

সুদূর-প্রাচীর এই যুদ্ধ সম্পর্কে রুশিয়ার মনোভাব একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। রুশিয়া সুদূর-প্রাচীর এই অংশের প্রতি প্রথম হইতে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। জাপানের সহিত রুশিয়ার অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ ব্যতীতও জাপান সম্পর্কে রুশিয়া চিরদিন সচেতন। রুশিয়া জানে, জাপান কম্যুনিষ্ট তথা সোভিয়েট-রুশিয়ার চরম শত্রু; অল্প দিন পূর্ব্বে সে জার্ম্মানী ও ইটালীর সহিত কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তি করিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া কমিন্টার্ন অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সমিতির প্রধান পরিপোষক। এই সমিতির প্রধান কেন্দ্র মস্কোতে। সোভিয়েট রুশিয়া জানে, চীনে যদি জাপানের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। এই জন্য সুদূর-প্রাচীর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর চীনের পক্ষ হইতে সাহায্যের আবেদন রুশিয়া আন্তরিকতার সহিত পূরণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সুদূর-প্রাচীতে বিরাট সমরায়োজন করিয়া সে জাপানকে মাঞ্চুকোতে তিন লক্ষ সৈন্য মজুত রাখিতে বাধ্য করিয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, মাঞ্চুকো-সীমান্তে সোভিয়েট বাহিনীর সহিত জাপ-সৈন্যের সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে এই সঙ্ঘর্ষকে সীমান্তের নগণ্য ঘটনা (minor incident) বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং এক্ষণে উহা ক্রমেই ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়। জাপানের পক্ষ হইতে মস্কোতে সীমান্তের আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা বিফল হইয়াছে। সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব লিট্‌ভিনফ্ এই সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে সকল অপরাধ জাপানের স্কন্ধে চাপাইয়া বলিয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলে একজন জাপ-সৈন্যও থাকিবে, ততদিন কোনপ্রকার মীমাংসা হইবে না। এই সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে দোষ কাহার, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না—উভয়েই পরস্পরকে দোষারোপ করিতেছে। তবে এই সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে একটী কথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সোভিয়েট রুশিয়ার সুর এবার বেশ কড়া হইয়া উঠিয়াছে এবং জাপানের সুর একেবারে নামিয়া গিয়াছে।

এই সঙ্ঘর্ষ সীমান্ত অঞ্চলেই আবদ্ধ থাকিবে, না, ক্রমেই উহা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তাহা এক্ষণে বলা কঠিন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সোভিয়েট রুশিয়া সুদূর-প্রাচীতে* সমরায়োজন করিয়া জাপানের তিন লক্ষ সৈন্যকে মাঞ্চুকোতে প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। এক্ষণে জাপানী সৈন্য হাঙ্কাও অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; হাঙ্কাওর নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থান অধিকারও করিয়াছে। কাজেই, এক্ষণে সীমান্ত অঞ্চলে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত করিয়া হাঙ্কাওর উপর জাপানী সৈন্যের আক্রমণের বেগ হ্রাস করিতে সচেষ্ট হওয়া রুশিয়ার পক্ষে অসম্ভব নহে। অবশ্য, এই সঙ্ঘর্ষের সূত্র অবলম্বন করিয়া রুশিয়া জাপানকে চরম আঘাত করিতে চাহিতেছে কি না, তাহাও বলা যায় না। জাপানকে আঘাত করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সুযোগ; রুশিয়া এতদিন প্রতীক্ষা করিয়া আজ এই সুবর্ণ সুযোগ অবলম্বন করিতেছে কি না, কে বলিবে? জাপান আজ চীন যুদ্ধে বিব্রত, এমন কি, বিপন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার কমিন্টার্ন-বিরোধী মিত্রত্রয়ের মধ্যে ইটালী স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের তরঙ্গে আপনাকে বিজড়িত করিয়াছে। ইহা হইতে সে কিন্তু মুক্ত হইবে না, ইহা নিশ্চিত। জার্ম্মানী বধ ইউরোপের সমরানলে বিব্রত; সঙ্কটকবলিত পোল্যাণ্ডকে সে এখনও পরিপাক করিতে পারে নাই। কাজেই, এক্ষণে এই দুইটী শক্তির পক্ষে তাহাদের সুদূর প্রাচীর কমিন্টার্ন-বিরোধী মৈত্রের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। জার্ম্মানী যদিও জাপানের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছে যে, সে তাহাকে নৈতিক এবং 'অন্যান্য উপায়ে' সমর্থন করিবে, তবুও ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মানীর পক্ষে জাপানকে নৈতিক সমর্থন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সমর্থন করা সম্ভব নহে।

সুদূর-প্রাচী

প্যালেষ্টাইনের মরুচারী আরব জাতির বিদ্রোহ আজ তিন বৎসর ধরিয়া সমান গতিতে চলিতেছে। পাকা সাম্রাজ্যবাদী কূটনৈ—ব্যাঙলা ও আয়র্লণ্ডের সম্রাসবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ কূটনৈ—তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও কৌশল উজাড় করিয়াও এই দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি পীল-কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কিত কতকগুলি "টেক্‌নিক্যাল্"

বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য উড্‌হেডের নেতৃত্বে আর একটী কমিশন প্যালেষ্টাইনে গমন করিয়াছিল। এই সময় আরবদিগের সন্ত্রাসবাদ-মূলক কার্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রত্যহ বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, গুপ্তহত্যা, অতর্কিত আক্রমণ প্রভৃতি চলিতে থাকে। বিশেষত উত্তর প্যালেষ্টাইনের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই সন্ত্রাসবাদ অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করে; হাইফা এবং জেরুজালেমের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া ওঠে।

প্যালেষ্টাইন্ সম্পর্কে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথম বলিতে হইবে যে, আরবদিগের এই সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্য ভারতবাসী কখনও সমর্থন করিবে না। আমরা রাজনীতিক্ষেত্রে হিংসানীতি বর্জ্জন করিয়া অহিংস মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। আমরা বুঝিয়াছি, হিংসা-নীতির সাহায্যে যদি বিজয়লাভ সম্ভবও হয়, তাহা হইলেও উহার দ্বারা কখনও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কাজেই, আমরা বলিব, প্যালেষ্টাইনের আরবদিগের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণে মহানুভূতিসম্পন্ন হইলেও আমরা তাহাদিগের অবলম্বিত নীতিকে কোন ক্রমেই সমর্থন করি না।

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব কিরূপ তাহা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। গত মহাযুদ্ধের সময় আরবদিগকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া পরে সেই প্রতিশ্রুতি কিরূপে ভঙ্গ করা হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। পীল-কমিশন আরবদিগের দাবী সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্যালেষ্টাইনকে ত্রিধা বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পীল-কমিশনের সুপারিশগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ সুপারিশে অদূর-প্রাচ্যে বৃটীশ স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাই হইয়াছে—আরব-দিগের দাবী পূর্ণ করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। পীল্-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা আরবদিগের স্কন্ধে চাপাইবার জন্য কুটন্ একরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া মনে হইতেছে। অধুনা রাষ্ট্র-সঙ্ঘ বৃটীশ পররাষ্ট্র দপ্তরের বৈঠকখানায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্র-সঙ্ঘ কুটনের ইচ্ছা পূরণের পথে কোনপ্রকার বিঘ্ন উপস্থাপিত করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত। কিছুদিন পূর্ব্বে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের "ম্যাণ্ডেটস্ কমিশন" পীল্-কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই কথাটি সুস্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। কুটন্ যদিও প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে তাহার অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তবুও সে এই বিষয়ে অত্যন্ত ধীরচার সহিত অগ্রসর হইতেছে। যেখানে আপনার অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় বিঘ্ন উপস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা, সেখানে ধীরতা অবলম্বন করা কুটনের চিরন্তন নীতি। আজ ভারতবর্ষে যুক্ত-রাষ্ট্র প্রবর্ত্তন সম্পর্কে কুটন্ এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে, যুক্ত-রাষ্ট্র সম্পর্কে কিরূপ প্রবল মনোভাব ভারতবর্ষে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সে জানে। প্যালেষ্টাইনে আরবদিগের আন্দোলন দমন করিবার জন্য কুটন্ সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, পীল্-কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে সমগ্র জগতে যে মনোভাব সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্যও সে সচেষ্ট হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কমিশন, কমিটী, আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতির অনুহাতে সে কালহরণ করিতেছে। প্যালেষ্টাইনের হাঙ্গামার ইটালীর গোপন হস্ত কার্য্য করিতেছিল, ইহা মনে করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। কুটন্ ইটালীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে ইটালীকে নিরপেক্ষ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে।

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ইহুদীদিগের দুর্ভাগ্যের কথা স্বতই মনে হয়। এই স্বদেশ তাড়িত গৃহহারা জাতিটী আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ হইতে বিতাড়িত হইতেছে। গত মহাযুদ্ধের পর বিজয়-শক্তি তাহাদিগের জন্য প্যালেষ্টাইনকে "জাতীয় আবাস ভূমি" নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই "জাতীয় আবাস ভূমে" হতভাগ্য ইহুদীগণ মৃগয়ার কুক্কুরের ন্যায় প্রাণ হারাইতেছে। কুটন্ আজ প্যালেষ্টাইনের ইহুদী-দিগের জন্য বিগলিত-অশ্রু। কিন্তু যাঁহারা কুটন্ কূটনীতির সহিত পরিচিত, তাঁহারা বুঝেন যে, কুটন্ ইহুদীদিগকে শিখণ্ডীস্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া আপনার অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব

স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই দুই বৎস-রের গৃহ-যুদ্ধে দশ লক্ষের অধিক স্পেনবাসীর মৃত্যু হইয়াছে এবং স্পেনখানীর প্রথমাক্রান্ত দুই কোটী পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে। এখনে স্পেনের তিনটী প্রদেশ বিদ্রোহীদিগের অধিকারভুক্ত, মাত্র নয়টী প্রদেশ সরকার পক্ষের অধিকারে আছে। কতকগুলি প্রদেশ বিদ্রোহীদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে শ্রবণ করিলে স্বতই মনে হয়, সরকার পক্ষের আর কোন আশা নাই; সত্বর স্পেনে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিশেষত, স্পেনের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ত স্পেনের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নাই —ইহা বস্তুত ফ্যাসিষ্ট ইটালীর প্রকাশ্য আক্রমণে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তবুও আমরা মধ্যে মধ্যে সরকার পক্ষের নেতৃবর্গের নিকট আশার কথা শ্রবণ করি—তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলেন, বিজয় লাভ সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ আশান্বিত। এই সেদিন পণ্ডিত জওহরলাল স্পেন পরিভ্রমণের পর যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সরকার পক্ষ এখনও তাঁহাদিগের বিজয় সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী। যাঁহারা স্পেন যুদ্ধের গতি পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বুঝিবেন, সরকার পক্ষের নেতৃবর্গের এই সকল উক্তি অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর মাত্র নহে। বিদ্রোহিগণ আজ তিনটী প্রদেশের অধিকারী হইলেও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাদ্রিদের উপকণ্ঠে পৌঁছিবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদিগের সাফল্য, সঙ্কল্পের অনুপাতে অত্যন্ত অল্প। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরে এষ্ট্রিয়ান্ প্রদেশ বিদ্রোহিগণ অধিকার করিয়াছে। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসের শেষভাগে বিলো বন্দরটী বিদ্রোহীদিগের করতলগত হইবার পর হইতে উত্তরাঞ্চলে সরকার পক্ষের প্রতিরোধের অবসান হয়। তাহার পর জেনারেল ফ্রাঙ্কো যখন আরাগন উপত্যকায় বিপুল যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন দারুণ শীত ও তুষার পাতের মধ্যে সরকার পক্ষের অতর্কিত আক্রমণে বিদ্রোহী সৈন্য বিপর্য্যস্ত হয়।

মুসোলিনি তখন বিপুল উৎসাহে স্পেনে যোদ্ধা ও যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন ; বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের ইটালীর বিমানপোতগুলিও বিপুল উৎসাহের সহিত সরকার পক্ষের জাহাজগুলির উপর পাশবিক হত্যা-কাণ্ড চালাইতে থাকে। ইটালীর এই সহযোগিতা এবং পাশবিকতার শক্তিলাভ করিয়া ক্যাটালোনিয়া ও ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশের সীমান্তের নিকটে কতকগুলি স্থান বিদ্রোহিগণ অধিকার করিয়াছে। সম্প্রতি এব্রো নদীর তীরে সরকার পক্ষের সৈন্য অতর্কিত আক্রমণে বিদ্রোহী-দিগকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের প্রচারবিভাগের দামামা তারাই শুধু একলা বাজায় না—স্যুটেন, জার্মানী, ইটালী—সকলেই এই দামামার সঙ্গতদার করে। কাজেই আমরা সকলেই শুনিতেছি, সরকার পক্ষের আর কোন আশা নাই—বিদ্রোহিগণ অতি সত্বর সমগ্র স্পেনের একচ্ছত্র প্রভু হইবে। কিন্তু ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে আজ পর্যন্ত স্পেন-যুদ্ধে উভয়পক্ষের লাভালাভ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, অন্ততঃ আরম্ভ হইবার পাঁচ মাস পরে সরকার পক্ষের যে অবস্থা ছিল, এখনও তাহার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস যদি সরকার পক্ষের জয়ের আশা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে এখনও তাহাদিগের জয়ের আশা আছে। অবশ্য, স্পেন-যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক ক্ষেত্রে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে এবং তাহার প্রভাবে স্পেনে কোন অঘটনও ঘটিতে পারে।

স্পেনের ব্যাপারে মহা অসুবিধায় পড়িয়াছে স্যুটেন্। মিঃ ইডেন ও তাঁহার সমর্থকদিগের উপর টেক্কা দিবার উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিতে এই মর্ম্মে একটী দফা সংযোজিত হইয়াছে যে, স্পেনের স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ-প্রশ্ন সীমাংসিত হইবার পূর্ব্বে ঐ চুক্তি বলবৎ হইবে না। চুক্তিতে এই দফাটী যখন সন্নিবদ্ধ হয়, তখন ইটালীর সাহায্যে বিদ্রোহিগণ সরকার পক্ষের সৈন্যকে সাময়িকভাবে বিপন্ন করিয়াছিল। কাজেই, তখন স্যুটেন্ ও ইটালী উভয়েরই মনে হইয়াছে, সত্বরই বিদ্রোহীদিগের বিজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু এখনে উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিতেছে, "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী"—সরকার পক্ষের সৈন্য কিছুকাল মৃতবৎ অবস্থান করিবার পর অকস্মাৎ যখন বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিতেছে, তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই "বৈরী" মরে নাই, তাহার জখমিও তখনও ধকধক করিতেছে। ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উভয়পক্ষই আগ্রহান্বিত। স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ সম্পর্কে নিরপেক্ষতা সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবে সরকার পক্ষ বহু পূর্ব্বেই সম্মত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্রোহী পক্ষ আজ পর্য্যন্ত কোন উত্তর দেয় নাই। শুধু তাহাই নহে, তখনও ইটালীয় সৈন্য বিদ্রোহী পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায়ই যোগদান করিতেছে। কাজেই, স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব কবে কার্য্যে পরিণত হইবে, কখনও কার্য্যে পরিণত হইবে কি-না, তাহা বলা যায় না। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হইলে ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিও লণ্ডন ও রোমের পররাষ্ট্র দপ্তরখানায় ধূলি ধূসরিত হইবে।

চেকোস্লোভেকিয়া সমস্যা

চেকোস্লোভেকিয়ার সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসার জন্য লর্ড রান্‌সিম্যান্ মধ্যস্থতা করিবেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে সদল বলে প্রাগে গমন করিয়াছেন। কিছুকাল ধরিয়া সিউডেটেন্ জার্ম্মানদিগের দাবী সম্পর্কে চেকোস্লোভেকিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বেনার সহিত ঐ দলের প্রতিনিধিদিগের আলোচনা চলিতেছিল, লর্ড রান্‌সিম্যান্ প্রাগে যাওয়া সত্ত্বেও এই আলোচনা চলিতেছে ; উহা বন্ধ হয় নাই। চেকোস্লোভেকিয়ার সংখ্যা-লঘিষ্ঠদিগের দাবী পূরণের জন্য তিনটী বিল চেক্ গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। প্রথম বিলটী বিভিন্ন জাতি সংক্রান্ত (Nationalities Statute), দ্বিতীয়টী ভাষা সংক্রান্ত (the Languages Bill), তৃতীয় বিলটী রাষ্ট্রের পরিচালনা সংক্রান্ত (Bill for the Administrative Reorganisation of the State)। প্রথমোক্ত বিলটীর সর্ত্তগুলি গত জুলাই মাসের মধ্যভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে বোহেমিয়া, মোরাভিয়া-সাইলেসিয়া, স্লোভেকিয়া এবং রুথেনিয়া প্রদেশকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা। এই সকল প্রদেশের আইনসভায় বিভিন্ন জাতির অনুপাতে নির্ব্বাচকমণ্ডলী বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা হয় এবং স্থির হয় যে, প্রত্যেক প্রদেশের আইনসভা সাধারণভাবে স্বায়ত্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং অর্থবিভাগের ভার জাতীয় পরিষদের উপর থাকিবে। এই ব্যবস্থায় সিউডেটেন্ জার্ম্মানগণ সন্তুষ্ট হয় নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থী পূরণের জন্য যদি পৃথক্ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাতে নির্ব্বাচন-প্রথার প্রবর্ত্তনই যে সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে সিউডেটেন্ জার্ম্মানগণ সন্তুষ্ট হইবে কেমন করিয়া ?—ইহাতে যে তাহারা সর্ব্বত্র ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে না !

লর্ড রান্‌সিম্যান্ চেকোস্লোভেকিয়ায় গমনের পূর্ব্বে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই কার্য্যের সহিত বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের কোন সম্বন্ধ নাই। লর্ড রান্‌সিম্যানের চেকোস্লোভেকিয়ায় গমনের অল্পকাল পূর্ব্বেই হিটলারের প্রতিনিধি ক্যাপ্‌টেন্ ওয়েড্‌ম্যান্ বৃটীশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই সময়, চেক্ গভর্ণমেণ্ট সীমান্ত অঞ্চলে সমরায়োজন আরম্ভ করিয়াছে, এই অভিযোগ করিয়া জার্ম্মানী তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। জাতি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হওয়ায় সিউডেটেন্ জার্ম্মানগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল। এই সময় অকস্মাৎ একদিন মিঃ চেম্বারলেন্ ঘোষণা করেন যে, লর্ড রান্‌সিম্যান্ চেকোস্লোভেকিয়ায় যাইতেছেন। লর্ড রান্‌সিম্যানের মধ্যস্থতার প্রস্তাবে জার্ম্মানী ও সিউডেটেন্ জার্ম্মান্ দল সন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, জার্ম্মানী এই সময় রাইনল্যাণ্ডে ও চেক্ সীমান্তে বিপুল সমরায়োজন আরম্ভ করিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান্' পত্রিকার প্রতিনিধি জানাইয়াছিলেন যে, লর্ড রান্‌সিম্যান্ সিউডেটেন্ সমস্যার

মীমাংসার প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও অবস্থা ক্রমেই বৈরাভঞ্জনক হইতেছে। চেক্ সীমান্তে এবং রাইনল্যাণ্ডে জার্ম্মানীর সৈন্য সমাবেশ পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। ইহার পর, রাইনল্যাণ্ডে জার্ম্মানীর সমরায়োজনের আরও বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এক্ষণে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ইহা অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, লর্ড রান্‌সিম্যান্‌কে জার্ম্মানীর ইঙ্গিতেই আগে প্রেরণ করা হইয়াছে। লর্ড রান্‌সিম্যান্ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সমস্যা সম্বন্ধে যাহা প্রস্তাব করিবেন, তাহা জার্ম্মানীর গ্রহণযোগ্য হইবে জানিয়াই যে তাঁহার মধ্যস্থতার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছে। লর্ড রান্‌সিম্যানের প্রস্তাবে চেক্ গভর্ণমেণ্ট সম্মত হইতে চাহিবেন না, ইহা বুঝিয়া জার্ম্মানী তাহাকে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শনের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতেছে। চেকোস্লোভেকিয়া সম্পর্কে রুটীশ রক্ষণশীল দলের মনোভাব কিরূপ তাহা যদি আমরা স্মরণ করি, তাহা হইলে এই অনুমান অযৌক্তিক মনে হইবে না। রক্ষণশীল দলের বড় বড় পাণ্ডারা একাধিকবার বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন জাতি-সন্নিবিষ্ট চেকোস্লোভেকিয়াকে ভাঙ্গিয়া যদি সুইজারল্যাণ্ডের ন্যায় যুক্ত-রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে রুটেনের উহাতে কোন আপত্তি নাই। অপিচ জার্ম্মানীও চেকোস্লোভেকিয়া সম্পর্কে এই দাবীই করিতেছে। চেকোস্লোভেকিয়া যদি যুক্ত-রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে জার্ম্মান-প্রধান অঞ্চলে প্রচার বিস্তার করিয়া ক্রমে সমগ্র চেকোস্লোভেকিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করা জার্ম্মানীর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। আমরা জানি, "চেম্বারলেন এণ্ড কোম্পানী" জার্ম্মানীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এক্ষণে আগ্রহান্বিত। কাজেই, লর্ড রান্‌সিম্যানের দ্বারা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া চেকোস্লোভেকিয়া রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করিয়া জার্ম্মানীর সন্তুষ্টি বিধান তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। লর্ড রান্‌সিম্যানের প্রস্তাবের জন্য যাহাতে কেহ রুটীশ গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করিতে না পারে, তজ্জন্যেই মিঃ চেম্বারলেন পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিয়াছেন যে, লর্ড রান্‌সিম্যানের কার্য্যের সহিত রুটীশ গভর্ণমেণ্টের কোন সম্বন্ধ নাই।

হাফিজ্

নরেন্দ্র দেব

শুদ্ধ করি দিল মৃত্যু জীবনের কলকণ্ঠ আনন্দ সঙ্গীত,
কটাক্ষ হারাল লক্ষ্য, স্পন্দহীন প্রাণছন্দ বক্ষের সম্বিৎ।
অধরের রক্ত আভা লুপ্ত হল মরণের বিবর্ণতা মাখি,
কবর— পাষাণী প্রিয়া ছিন্নদেহ আবরিয়া দিল তৃণে ঢাকি।

এই তো চলেছে বহু জনমের ইতিহাস ধরণীর কোলে,
কে কাহারে মনে রাখে স্মরণের সীমাপ্রান্তে কালক্রমে ভোলে।
একমাত্র তুমি কবি করিয়াছ বিস্মৃতির ব্যর্থতারে জয়,
তোমার দিওয়ান্-গান ঝঙ্কারিয়া উঠিতেছে আজো বিশ্বময়।

যে হাসি নিভিয়া গেছে তারে তুমি করিয়াছ পুনরুদ্দীপিত,
যে প্রেম মরিয়া গেছে সঞ্জীবি তুলেছে তারে তব প্রেমামৃত।
জীবনের শূন্যপাত্রে পূর্ণ করিয়াছ কবি প্রাণতপ্ত-সুরা
বিশীর্ণ নার্গিস্‌পুষ্প তোমারি শিশিরে পুনঃ গৌরভবিধুরা।

বুলবুলের মৃতকণ্ঠে উজ্জীবিত করিয়াছ অভিনব সুর,
গজল্ গুঞ্জরি' ফিরে অন্তরের তীরে তীরে আবেশ মধুর
সরস হয়েছে মরু তব গীত সুষমার সুছন্দ সঙ্গতে,
মৃত্যুর অমৃতবাণী, মুসাফির! দিলে আনি ফরী-শরিয়তে।

ইরাণের নীলাকাশ ভরেছিল তব কণ্ঠ প্রেমের প্রলাপে,
বোগ্‌দাদের বাগিচায় ব্যাকুলতা জেগেছিল গোলাপে গোলাপে।
তরঙ্গিয়া তুলেছিল রুক্‌নাবাদ স্রোতস্বিনী দেওয়ানা বাতাস,
কুঞ্চিত কুন্তল গন্ধে নিশেছিল তরুণের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

এসেছিল নেমে জানি খোরাসান ইস্পাহানি বেহেস্ত্ ভুলোকে
বোগারা সামারখন্দ্ বিলায়ে দিয়েছ কবি প্রেমের পুলকে।
প্রিয়ার গোলাপী গণ্ডে একবিন্দু কৃষ্ণতিল—মূল্য তার দিতে
সাম্রাজ্য করেছ দান আনন্দবিহ্বল প্রাণ অকাতর চিতে।

তৃষার্ত্ত যাদের কণ্ঠ সুধা-উৎস সন্ধানিয়া দিকে দিকে ঘোরে,
অমৃত আনন্দীরসে পরাণ পিয়ালা যারা নিতে চায় ভরে,
বিরহ-ব্যথিত হিয়া, তোমারে খুঁজিয়া ফিরে—হে বন্ধু হাফিজ!
তুমি যে গো মরমীরে শুনায়েছ অঙ্গনীরে প্রেম-মন্ত্র-বীজ।

পথের ধূলা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

প্রভাত-জীবনের ক্রীড়াভূমি—সারাজীবনের নিভৃত মনের অলস দিনের লীলাভূমি। তাই অমূল্য চৌধুরী ভালবাসত ছেলেখেলা দেখতে। আজ কিন্তু ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ তাকে বিমর্ষ করলে। সে যেন আজ মন-ভোলা আত্মহারা।

পুকুরের দূরের পাড়ে কনক-চাঁপার শাখায় মাছরাঙা চীৎকার করছিল। কূলায়-প্রত্যাশী আরো কত পাখীর এলোমেলো কলরবে মুখর ছিল সন্ধ্যা-গগন। অমূল্য চৌধুরীর কানে পৌঁছিল মাত্র তার সুকুমারের নাটকী তর্জন।

—মেরে নাক চ্যাপ্টা ক'রে তোমায় ইয়াংসিকিয়াঙের স্রোতে ভাসিয়ে দেব।

—হোয়াঙ্-হোর জলের ধাক্কায় চুবন খেয়ে জ্ঞান থাকলে তো?—প্রত্যুত্তর দিলে তার প্রত্যুৎপন্নমতি ভ্রাতুষ্পুত্র।

তারপর কে কাকে চীন মুলুকের কোন্ প্রদেশের কোন্ শহরে আবদ্ধ ক'রে জান ক'রে দেবে অবলুপ্ত সে বিষয়ে বাদানুবাদ হ'ল।

এসব কথায় চৌধুরী মশায়ের বাল্য স্মৃতি জেগে উঠে তাকে ছেলা স্কুলের অনতি দূরে বেঞ্চি থেকে চীন-সাম্রাজ্যে নিয়ে গেল না, একথা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু এ কি উৎকট দৃষ্টিছাড়া খেলা—বিশেষ যখন কিম্বদন্তী বলে চীনেরা আরসোলা খায়।

ইত্যবসরে বালকদের বিতণ্ডা ভূগোল ছেড়ে জীবতত্ত্বে এসে উপস্থিত হ'ল। কারণ কালু বললে—লালু, তোমার গর্দানটা টেনে এমন লম্বা করে দেব যে তুমি জিরাফ হ'য়ে বগাচক বগাচক করে লাফিয়ে বেড়াবে।

—বল কি ভাই কালু?—বললে লালু—তোমার হাত দুটো করব বেঁটে—বেঁটে বেড়াবে তুমি কেঙ্গারুর মত তড়িলাফ দিয়ে।

পরবর্তী সম্ভাষণের মধ্যে ওরাঙ গরিলা লেমার সম্বর হিপো প্রভৃতি বিশিষ্ট জানোয়ারদের নামোল্লেখ হ'ল।

বাক্-সংগ্রামের এ প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় অমূল্য হ'ল উত্তেজিত ও উত্যক্ত। তার প্রধান ভয় জাতি-বিরোধকে। বালকের ঝগড়া যৌবনের মনোমালিন্যে পরিশেষে বাটোয়ারার নামলায় পরিণত হয়। ব্যবহার-জীবীদের করাল গ্রাস লোভ-হীন সুন্দর মুখ বিভীষিকার সৃষ্টি করত তার মনে।

রোগের বীজ অঙ্কুরে বিনষ্ট না হ'লে বলবান হয়। তাই লালু-কালুর ডাক পড়লো তার দরবারে।

—এসব ঝগড়া কে শেখালে তোমাদের?

—মাষ্টার মশায়। বেশ নূতন রকম নয় বাবা?

—দেখুন কাকামণি, চাষাদের ছেলেরা যখন ঝগড়া করে একজন অন্যকে বলে গরু, গাধা, বাঁদর।

—তারা ভালো ভালো জানোয়ারের নাম কি ক'রে জানবে বাবা?

—তাদের তো আর মাষ্টারমশায় নাই—এম্-এ, বি-এল—যে, খেলার ছলে নূতন নূতন দেশের নাম শেখাবে।

শিশুদের সঙ্গে শিক্ষা-পদ্ধতি আলোচনা বাতুলতা। বোঝাপড়া করতে হবে এম্-এ, বি-এল যোগেশ রায়ের সঙ্গে। এম্-এ, বি-এল! মাথামুণ্ডু। অগত্যা চৌধুরী বললে—যাও।

আনন্দে কালু চরকার মত ঘুরতে লাগ্‌লো। লালু নিজের অঙ্কে ঘুরতে ঘুরতে ঘূর্ণায়মান কালুকে প্রদক্ষিণ করলে।

এবার একাধারে শৈশব-স্মৃতি ও অপত্য-স্নেহ স্বভাব-কোমল অমূল্যের চিত্তকে সরস করলে।

সে বললে—তোদের খেলা ভুল হচ্ছে। একজনের চোখ বাঁধতে হবে—আর সে বলবে—আমি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না।

কালু বললে—চোখ বুজব কেন বাবা? সূর্য্য যে চোখ খোলা। ঝলসানো তার চোখ—তার কিরণে লোকে দেখতে পায়, গাছপালা বাড়ে।

—ধোবার কাপড় শুকোয়। কিন্তু সূর্য্য!

—হ্যাঁ বাবা, আমি যেন সূর্য্য! তাই ঘুরছি।

—আর বড় কাকামণি, আমি পৃথিবী। আমি ঘোরবার সময় যেদিকটা সূর্য্যের দিকে থাকে সেদিকটা দিন। আর যেদিকটা থাকে না সেদিকে নিবিড় অন্ধকার রাত্রি। তাই ঘোরবার সময় এক একটা চোখ বন্ধ করছি দেখছেন না কাকামণি।

—অসম্ভব! আমায় কি তোরা পাগল করবি?

বালকদের উচ্চ হাস্যে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হ'ল অবনী। কালু-লালু সমস্বরে বললে—ছোট কাকাবাবু!

যখন সভা-স্থলে শান্তির স্থির-মূর্ত্তি আত্ম-প্রতিষ্ঠা করলে; উভয় ভ্রাতা সরল বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকালো। উভয়ে উপলব্ধি করলে আগন্তুক গবেষণার গুরুত্ব। ছেলেরা স্বস্থানে প্রস্থান করলে। যাবার সময় একজন বললে—ভাঙা অতিথশালা—ফাটা ভিতে অশথ-বটে মিলেছে ভাল-পালা।

অন্য জন বললে—তবে আমি যাইগো তবে যাই।

ভোরের বেলা শূন্য কোলে—
ডাকবে যখন খোকা বলে—
বলব আমি নাই সে খোকা নাই।

—এসব কি ভাই?

—কেন দাদা, রবিবাবুর কবিতা।

—হুঁ!—বললে দাদা।

তারপর সে সকল কথা বললে। এ কি খেলা না জোঠামি! ঘোরতর পাকামি। খেলার ভেতর হোয়াও-হো! সর্ব্বনাশ!

যোগেশ মাষ্টার অবনীর সহপাঠী। সে তাকে এনেছে। তার উদ্ধত শিক্ষকতা অমূল্যকে উৎপীড়িত করত। কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতার সরল প্রাণে ব্যথা লাগবার ভয়ে সে কোনো কথা বলতে পারতো না। মোট কথা, মাষ্টারটি ফাজিল।

ব্যাপার আরো সঙ্গীন হ'ল যখন তাদের আদরের ভগ্নী রেবা এসে বললে—দাদামণি, বত্রিশের ঘর পূর্ণ করতে পার?

অবনী বললে—পাঁজিতে লেখা আছে।

—পুঁথিতে তো সবই লেখা থাকে। পুস্তকের বিদ্যা আর পরের হাতের ধন।

যে কথা জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাচ্ছিল অমূল্য, অবনীর প্রশ্নের উত্তরে রেবা সে কথা বললে—মাষ্টার মশায় শিখিয়েছে।

অমূল্য বললে—হুঁ! মনে মনে বললে—নিয়তির সঙ্গে লড়াই করা—ঝরণার গায়ে শিলা-বৃষ্টি ক'রে তার বেগ থামাবার চেষ্টা করা—একই কথা।

অপ্রস্তুতের হাসি হেসে মনে মনে অবনী বললে—যোগেশের তালে পা ফেলে দাদা চলতে পারছে না। একটা না অশান্তির উদ্ভব হয়।

যোগেশ তার বাল্য-বন্ধু, সহপাঠী। যোগেশ পণ্ডিত, কিন্তু তার চাল-চলন চিরদিন বে-থাপ্পা। যোগেশ দরিদ্র। মাদারীপুরে দিনকতক ওকালতী করবার চেষ্টা করেছিল বেচারা, কিন্তু গুণগ্রাহিতার অভাবে তাকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করতে হ'য়েছিল। কর্ম্মের ব্যর্থ সন্ধান এবং অর্থাভাবে বাসা হ'তে বিতাড়িত হবার অব্যর্থ ইঙ্গিতে বেচারা যখন কর্ণধারহীন তরণীর মত ঘুরছিল—পার্ক সার্কাসে একখণ্ড জমির উপর নতুন মিঞার "আমোদ বাগিচা" তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

পথের মেলার পরিচালকদের মুক্তপ্রাণ আর অবাধ স্ফূর্ত্তি অনুপ্রাণিত করলে নিরুৎসাহকে। জীবিকার উপায় শহরে অগণিত। প্রবেশ মূল্য এক আনা। এখানে দেখানো হয়—ভোজবাজি, হুলাহুলা নৃত্য, জীবন্ত বাঘের সঙ্গে বীরাঙ্গনার কৌতুক-ক্রীড়া।

পরিচালক নতুন মিঞার সাথে তার আলোচনা হ'ল অনুষ্ঠানের উন্নতি সম্বন্ধে। সে বালক চীনা-মেম সেজে ছলা নাচে আর বোম্বাই বীরাঙ্গনা সেজে বাঘের খেলা দেখায়—তাকে ঝিঙি দীপের ঘুলিয়া নারী সাজালে খেলার সৌষ্ঠব বাড়ে। বীরাঙ্গনার পোষাক পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তার সঙ্গে যদি ডি-এল-রায়ের—"ভারত আমার"—কাশী নজরুলের—"কে বিদেশী"—গাওয়া হয়, আর প্রত্যেক ক্রীড়ার সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজানো হয় তাহ'লে এ খেলা চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মাঠেও দেখানো যেতে পারে।

যোগেশের কথাগুলা নতুন প্রাণে তীরের মত লাগলো। খোদার মেহেরবাণী না লাভ করলে যোগেশবাবুর মত সহযোগী পাওয়া দুর্লভ। যোগেশ যখন তার দলে যোগ দিতে সম্মত হ'ল, নতুন দৈনিক একটাকা পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতিতে যোগেশকে নিযুক্ত করলে আমোদ-বাগিচার সহকারীরূপে।

অবনী সাতদিনের জন্য কলিকাতায় এসে শহরের আমোদে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। দেশের জন্য হোটেলে তার অনেক পুরাতন বন্ধু এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে। বিলাসপুরের নির্জ্জনতায় প্রতিশোধ নিলে অবনী শহরের সকল প্রমোদাগারে ঘুরে।

অকস্মাৎ দেখলে তারা আমোদ-বাগিচা—প্রবেশ মূল্য এক আনা। অনেক প্রবিক ও শিল্পী তাঁবুর দ্বারে দাঁড়িয়ে শুনছিল—নতুন মিঞার বক্তৃতা।

এক বন্ধু বললে—এটা না দেখলে জীবনের কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে।

সত্য কথা। তারা প্রবেশ করলে শিবিরে।

প্রথমে দর্শন গৈরিক আলখাল্লা—শিরে তারবুস টুপি এক হাতে ত্রিশূল অপর হস্তে চাঁদ—যোগেশ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'ল তারা তাকে চিন্‌লে না। কিন্তু সঙ্গীতের সময় ছদ্মবেশ গোপন রাখতে পারলে না তাদের বন্ধুকে। তারা সমস্বরে বললে—যোগেশ! সে মুন্নু! যোগেশ!

এ অবস্থায় আবিষ্কৃত হ'লে অঙ্কে অপ্রস্তুত হ'ত কিন্তু যোগেশ রায় ভিন্ন ধাতে গড়া। সে উৎসাহ পেলে শিক্ষিত দর্শকদের শুভাগমনে। সুতরাং সে নির্দ্দিষ্ট গানের পর গাহিল—আমরি বাঙলা-ভাষা।

ক্রীড়া-অন্তে যবনিকা পড়লো যাতে ইংরেজীতে লেখা Good-bye.

বন্ধুরা ধরলে যোগেশকে।

—কি করব ভাই-সকল, এক পেট বিদ্যে। তার মধ্যে ডাল ভাত প্রবেশ করলে ভারতীর একাধিপত্য থাকা যায়। তাই তার চেষ্টা ওঠরে অন্ন না প্রবেশ করে। যখন শেক্স-বিদ্যার জেলাসিতে পেটের জ্বালায় ঠাকুরের লেকে আত্ম-সমর্পণ করতে যাচ্ছিলাম—বিধি মন্ত্র মিক্সার রূপধারণ ক'রে একমুঠা অন্নের ব্যবস্থা করলেন।

সেটা কি কথা হ'ল—ঐ সঙ্গ—ঐ ভাঁড়ামি—ঐ কদর্য্য স্ত্রীলোকের নাচের সঙ্গে বাজনা বাজানো।

—ওর বাবাও স্ত্রীলোক না। লতিফ পুরুষ-মানুষ।

কিন্তু এ রত্নকে উদ্ধার করতেই হবে। অবনী হাতে পায়ে ধরে তাকে ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষক—অভিভাবক হ'তে সম্মত করলে।

মন্ত্র তার বকেয়া পারিশ্রমিকের চার টাকার স্থলে তিন টাকা দিলে।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর দীঘির চাতালে বসে অমূল্য বললে—বেচু, মাষ্টার বাবুকে ডেকে দে তো।

অমূল্য যদি শুনতো যোগেশ মন্ত্র মিক্সার ছলের অবতার-প্রাপ্ত আর্টিষ্ট—তাহ'লে ভ্রাতার মনে কষ্ট দিয়েও সে তাকে বিদায় দিত। মোট কথা, যোগেশের কথা-বার্ত্তা, চালচলন অমূল্যর মনের জড়তাকে সচল করবার চেষ্টা করত। সে চাইত অতীতকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে—সম্ভ্রান্ততার ধীর স্থির অচল আসনে।

আজ কিন্তু অমূল্যর মন সচল হ'য়েছিল। তার জমিদারী শাসনের সুপ্ত সিংহ-বিক্রম জেগে উঠেছিল। যোগেশ খুকুর-ধারে এসে বললে—দাদা, ডেকেছিলেন?

—হ্যাঁ। দেখ যোগেশ, ছেলেদের কু-শিক্ষা দেওয়া বন্ধ কর।

—কু-শিক্ষা!

—হ্যাঁ কু-শিক্ষা। জাতি-বিরোধের শিক্ষা।

প্রহেলিকাময় মনে হ'ল তার উক্তি। যোগেশ বোঝালে, খেলার ছলে ছেলেদের নীতি-শিক্ষা দেওয়া শাস্ত্রসম্মত। বিবাদ ছেলেরা করবেই। সেটা তাদের প্রকৃতিগত। সেই প্রকৃতির লীলার মাঝে ভূগোল জীবতত্ত্ব বা ইতিহাসের শিক্ষা অবাধে অনায়াসে গুড়ি মেরে প্রবেশ করতে পারে।

অমূল্যর রক্তের চাপ অসাধারণ। চিকিৎসক তাকে উত্তেজিত হ'তে নিষেধ করেছিল। আজ কিন্তু তার উত্তর-কালের বংশের দুলালদের শিক্ষা সমস্যা ঘাচিঞা করছিল সমাধান।—আজ

সে বললে—ভদ্র জানোয়ারের নামে পরস্পরকে ডাকলে—'সবার উপরে মানুষ সত্য' ইত্যাদি নীতি চোট খায়।

—সহজ পথে যে নদী চলে তার গতি কেহ রোধ করতে পারে না। যেমন গিরি নদী। শিশু শিশুকে পশু সম্বোধন করে—এটা কলহের বিধি। এতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে—মানব শিশুর মানবতার ঔৎকর্ষ্যবোধের।

অমূল্য বললে—শিশু-কলহ জাতি-বিরোধের ভিত্তি।

যোগেশ বললে—জাতি-বিরোধকে কেন্দ্র ক'রে মহাভারত লেখা। তার শেষ পরিণতি ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের ক্ষয়।

তর্কের শেষ নাই। বিশেষ শিক্ষিত দুর্ব্বৃত্ত যদি হয় এক পক্ষের তার্কিক। অমূল্য বললে—আমার হুকুম, কাল থেকে ছেলেদের কেবল বই পড়াবে—

—ও হুকুম মোটেই আমি মানব না।

কি? তার অমিত-বিক্রম পূর্ব্ব-পুরুষের ভিটায় দাঁড়িয়ে তার বংশের কেহ অদ্যাবধি শোনেনি এমন অশিষ্ট কথা বেতনভোগীর মুখে। হুকুম মানব না!

উত্তেজনায় অমূল্যর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়েছিল। ক্রোধে ও

ঘৃণায় যোগেশের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়েছিল। ধনীর উৎপীড়ন দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা। সে তো পথের ধূলা। পথে ফিরে যাবে, কিন্তু এ অশিষ্টতা সহ্য করবে না।

যোগেশ বললে—আমি শিক্ষক, শিক্ষাবিষয়ে কারও কথা মানব না।

—মনিবেরও না!

কাঁপছিল অমূল্য। তার চক্ষু মুদে আসছিল। যোগেশ বুঝলে সে পীড়িত। চকিতে তাকে ধরে পুকুর পাড়ে শুইয়ে দিলে। না হ'লে সে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ত।

আত্মগ্লানিতে যোগেশ দগ্ধ হচ্ছিল—তার উদ্ধত অবিমৃষ্ট-কারিতার জন্য।

ডাক্তারবাবু বললেন—ভয় নাই। সারারাত বরফ দিতে হবে মাথায়—আর কোনো শব্দ করবে না কেউ।

বাবুর অসুখ—সর্দ্দিগরমী। সংসারে হুলস্থূল পড়ে গেল। কেউ জানল না তার আকস্মিক রোগের সাক্ষাৎ কারণ।

যোগেশের প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর কর্ম্মক্ষমতা। সে বিশাল অট্টালিকার সকল শব্দ বন্ধ করলে। ডাক বসিয়ে শহর থেকে সর্ব্বদা বরফ আনাবার ব্যবস্থা করলে। নিজে সারারাত তার সেবা করলে।

এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছিল যোগেশের মনের মাঝে। অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায় সত্য। দুই মাস এদের আশ্রয়ে থেকে সে পৃথিবীর মুখে আবার হাসি দেখেছিল—কিন্তু এ কি ব্যাপার। সত্যই তো যে অর্থ দেয় তার স্বত্ব আছে কি সুর-বাজবে তা বলবার।

রাত্রি বারোটার সময় অমূল্য চোখ মেলে তাকালে। তার স্ত্রী ও জননী আগ্রহে কথা কইবার চেষ্টা করলে। যোগেশ হাতজোড় ক'রে তাদের নিষেধ করলে।

অমূল্য তার দিকে তাকালে। সে বললে—দাদা, চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ুন।

সুবোধ বালকের মত অমূল্য চোখ বুজলে—তার আজ্ঞায়, ব্রোমাইডের নেশায়।

যোগেশের কাছে উত্তরকাল চিরদিন সোনার কিরণ মাখা। এবার সে বুঝলে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে ভাবী-কালেও। বিলাসপুরে বসে সে একখানা পুস্তক লিখেছিল অর্থ-নীতি সম্বন্ধে। কলিকাতার এক প্রকাশকের কাছে পাঠিয়েছিল সে তার পাণ্ডুলিপি। কিন্তু এক্ষেত্রে—

—জল!

সে এক টুকরো বরফ দিলে রোগীর মুখে। তখন ভোর চারটে। বাকী সব নিদ্রামগ্ন। অমূল্য চোখ চাইল।

যোগেশ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—দাদা, ভাল?

সে ঘাড় নাড়লে।

এবার যোগেশের চোখের বাঁধ ভাঙল, শিশুর মত কেঁদে সে রোগীর পা ধরলে। বললে—দাদা, ক্ষমা কর অকৃতজ্ঞ পশুকে—ক্ষমা কর।

—ছিঃ! বললে রোগী। সে কম্পিত করে যোগেশের কণ্ঠ বেষ্টন করে বললে—না ভাই, না।

প্রভাতে চিকিৎসক বললে—ভয় কেটে গেছে, কিন্তু এমনি শুশ্রূষা চলা চাই তিন দিন তিন রাত।

কালুর মা বিধবা। বাড়ীর বড়বৌ। জোড় হাত ক'রে তাকে ভাগালে যোগেশ—দেবরের সেবা সে প্রত্যক্ষ-ভাবে করতে পেলে না। কালুর মা কোণোবৌ কাছে কাছে রইল, কিন্তু তার পরিশ্রম করতে হ'ল না। জননী নীরবে এই কান্ত যুবকের দিকে তাকাতো—ছেলের দিকে তাকাতো। অন্তরালে অবনীকে বলত—ধন্যি বন্ধু পেয়েছিলি বাবা!

রোগীকে যোগেশ শেখালে কেমন ক'রে বরফ পুরতে হয় বরফ-থলিতে—ঔষধ খাওয়াতে, হরলিক্স করতে।

সপ্তম দিনে গৃহস্বামী বৈঠকখানায় বসলেন; চণ্ডীর পূজা, চণ্ডীপাঠ, দরিদ্র নারায়ণের সেবা ইত্যাদি সমাপ্ত হল।

অষ্টম দিনে জননী তিন বউ দুই ছেলেকে নিয়ে সভা করলে। আলোচ্য বিষয় গুরুতর।

গৃহিণী বললে—শান্তার বড়লোকের ঘরে বিয়ে দিয়ে জলে পুড়ে মলাম বাবা। এক দিনের জন্যে পাঠালে না।

এ অভিযোগ জননীর চিরন্তন। অবনী বললে—সে তো ভাল মা। তাঁরা এত ভালবাসেন শান্তাকে যে একদিনের জন্য তাকে চোখের আড়াল করতে চান না।

গৃহিণী কুপিত হ'লেন। বললেন—তোরা নিষ্ঠুর। তোরা গোঁয়ার। বোনের জন্যে কিছু মায়া নেই তোদের।

মুখ ফুটে বললেন না—তোদের নিজেদের বউ কাছে থাকলেই হ'ল।—তিনি বধূমাতাদের দিকে তাকালেন। বড় নেজো সমস্বরে বললে—সত্যি। ভাসুরের সান্নিধ্যহেতু ছোট জন কেবল ঘাড় নাড়লে।

অমূল্য চৌধুরী বললে—আনতে চাই তো আমরা—ভালবাসা—

ছোটবাবু বললে—দাদা উত্তেজিত হ'য়ো না—রক্তের চাপ।—তাদের বিরক্ত ক'রে লাভ কি না?

গৃহিণী বললেন—তোর লেকচার থামা। বি-এ পাশ সবাই করে।

এবার সভাস্থল হাস্য-মুখর হ'ল।

গৃহিণী মনোভাব ব্যক্ত করলেন। বেবার বিবাহ দেবেন ওরীয়েন্টের সঙ্গে। জামাতাকে গৃহে রাখবেন।

—বর-জামাই! বললে অবনী।

গৃহিণী বললে—তোরা চাই না দিস, শহরে আমার যে বাড়ী আছে সেখানে তাদের রাখবো। রোজ তারা আসবে আমায় দেখতে। আর জামাই ওকালতি করবে।

বড়বৌ বিচক্ষণা। সর্বদা শাশুড়ীর সঙ্গে একমত। সে বললে—আমাদের নিজেদের যা মামলা হয় তাতে তার চলে যাবে।

—কিন্তু এমন শান্তশিষ্ট গবিষ্ঠ বর-জামাই পাবে কোথা মা? আবার শ্বশুরবাড়ীর মামলা করা চাই।

—পেয়েছি। পাব। এম্-এ, বি-এল।

কে?

—যোগেশ মাষ্টার।

বিস্ময়ে অবনী শিস দিলে। বহুকষ্টে ঊর্দ্ধগামী রক্ত-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করলে অমূল্য। বধূত্রয় মুগ্ধবিস্ময়ে গৃহকর্ত্রীর মুখপানে চাহিল।

রাত্রে আবার যখন মজলিস বসলো অবনী যোগেশের দারিদ্র্য আমোদ-বাগিচা প্রভৃতির গল্প বললে। ওকালতী সে করবে না। শেষে বললে—মা দারিদ্র্যের জন্য বলছি না। শেষে তোমরাই ওকে অবজ্ঞা করবে—শাশুড়ী স্বামী ওর সঙ্গে কথা বলবে না—নায়েব গোমস্তারা আড়ালে হাসবে।

গৃহিণী ও বড়বৌ ঘনে ছিল। আমোদ-বাগিচা! হুলাহুলা!

অমূল্যবাবু বললেন—না যোগেশের চিত্ত খুব উঁচু। জীবিকার জন্য সাকাস করায় দোষ নাই। কিন্তু—

সে তার ঔদ্ধত্যের কথা বললে না।

ইত্যবসরে যোগেশের অমায়িক মাতৃ-সম্বোধন, তার মার্জ্জিত রুচি, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, তার গুণরাশিনাশি দারিদ্র্য-দোষকে পরাভূত করলে বর্ষীয়সীর বিচারের কাঠগড়ায়।

তিনি বললেন—সেইটাই তো ভাল। তাহ'লে তার বাড়ীর দিকে টান হ'বে না।

ভ্রাতৃত্রয় মাথা দুলকে বললে—দেখি।

পরদিন প্রত্যূষে ভ্রাতৃত্রয় যখন বসে চা-পান করছে—হাতে চামড়ার স্যুটকেশ, মুখে হাসি—যোগেশ এসে হাজির।

কি ব্যাপার!

সে হেসে বললে—"কোমাস"এর শেষটা মনে আছে? কর্ম্ম অবসানে হরিত ধরণীর প্রান্তে চললাম—যেথায় ধনুকের মত গোল আকাশ মিশেছে ধরণীর সাথে।

ব্যাপারটা কি?

—সত্য কথা বলি ভাই। বনের পাখী সোনার খাঁচায় নোটেই সুখে থাকে না। পথের ধূলা স্বর্ণ-রেণুর সঙ্গে মিশলে—সোনা হয় মলিন।

অমূল্য বললে—যোগেশ, কবিতায় সমস্যা আরও জটিল হয়।

সে বললে—দাদা, ফুটপাথ ডাকুচে—পথে পথে ঘুরে আর একবার দেখব কাজকর্ম্ম জোটে কি-না। পকেটে নগদ বাট টাকা আছে—তিনমাস অনশন-দমন।

মেজোবাবু জানতো মানুষটির জিদ্। অবনী তর্ক করলে। ধরা দেয় না যোগেশ—মাগুর মাছের মত পিছলে যায়।

অবনী রেগে বললে—গরীব সবাই। তোর মত সবাই জেঁকো নয়। তোর পয়সা থাকলে ঔদ্ধত্য—দম্ভ—

দম্ভ! এবার প্রাণ খুলে হাসলে যোগেশ। বললে—পালিপেটে দম্ভটা সত্যিই আসে। কিন্তু আমি নিজের পথের সন্ধানে পথে যাচ্ছি ভাই।

এমন সময় এক কাণ্ড হ'ল। তাকে তার একশত টাকা এলো 'অর্থ-নীতি প্রবেশ' মনোনীত হ'য়েছে।

প্রকাশক কপি-রাইট কিনেছে। আর একশ টাকা দেবে যখন পুস্তক প্রকাশিত হবে।

সে বললে—অমূল্যদাদা, আরও চার মাস ছুটতে পারবো। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি—যদি ছ'মাসে না অন্ন জোটে—আপনাদের সদাব্রতের অতিথি হ'ব। ঢাকুরের লেকে ডুব্‌বো না।

অমূল্য ডিপ্লোম্যাট। অমূল্য সংযমী। সে বললে—জান তো ভাই, আমরা কেউ নই। মার অনুমতি নাও।

—আলবাৎ।

না চুপি চুপি তাকে সে কথা বললে।

উন্মাদের মত হাসলে যোগেশ। তারপর নাচলে। মার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বললে—ওকথা বোলো না মা। দেবতা-পূজার ফুল পগারে ফেলবে? তবে মা আসি।

মা ব্যাপারটা বোঝবার পূর্ব্বে সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো।—সর্ব্বনাশ! দেব-পূজার ফুল! পালাও লোভী! পালাও পালাও!—

সে পিছনে তাকালে না। ছুট্! ছুট্! পথের ধূলার সোঁদা গন্ধ তাকে শক্তিশালী করলে।

———

উড়িষ্যার জঙ্গলে তেষট্টি দিন

শ্রীউমাপদ চক্রবর্ত্তী

ভ্রমণ

STUDENTS' C. P. G. A. COMMON-ROOM

অতুল হইতে পূজনীয় বড়দার স্নেহের আহ্বান আসিল। কারণ কয়েক মাস থেকেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইবার একান্ত বাসনা ছিল। উড়িষ্যার ভ্রমণ এই আমার প্রথম নয়; প্রথম বারে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর, ১৯১৭-তে কটক হইতে ত্রিশ মাইল ঘুরে জগৎসিংপুর এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পুরী যাত্রার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। কিন্তু এবারের ভ্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক, জ্ঞানবর্দ্ধক ও আনন্দদায়ক। বড়দা বহুদিন থেকেই উড়িষ্যার কার্য্যব্যাপদেশে আছেন, সম্প্রতি অতুলে বদলি হইয়াই আমাকে ওই স্থানের অপরূপ দৃশ্য দেখিতে যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। আমার বড়দার পুরা নাম—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইনি আমার জ্যেষ্ঠ মাতুলের একমাত্র পুত্র। অতুলের পূর্ব্ববিভাগের সব ডিভিশনাল অফিসার।

সাথী হইলেন শ্রীযুক্ত নলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সম্পর্কে কাকা আর আমার মাতুলপুত্র শ্রীমান সত্যচরণ। বিদেশে, বিশেষত যেখানে বাঙালীর সংখ্যা খুব অল্প, এরকম জায়গায় সঙ্গী না হইলে ভ্রমণই বৃথা।

২৭শে অক্টোবর (১৯৩৭) বৈকালে যাত্রা করিলাম। হাওড়া ষ্টেশনে পুরী এক্সপ্রেসে উঠিলাম। গাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা থাকায় কম্বল বিছাইয়া তৃতীয় শ্রেণীকে মধ্যমে পরিণত করিলাম ও দটাস শুইয়া পড়িলাম। ৮.৪৫ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল। বহু ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের পুল পার হইয়া প্রায় দু'-শত বাহাত্তর মাইল ঘুরে পড়গপুর ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। দামোদর নদ খুব বিস্তৃত নহে, কিন্তু রূপনারায়ণের রূপ দেখিবার মত। এক পার হইতে অন্য পারের নৌকার মৃদু আলোকগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। সমে রূপসী মনোরমে

গাড়ী বদলিয়া একেবারে বালেশ্বর-এ গিয়া গাড়ী থামিল (১৯৯ মাইল)। বালেশ্বর ষ্টেশনের পশ্চিম দিকে নীলাচল নামক সুবিশাল পর্ব্বত যেমের মত দেখা যাইতে লাগিল। এখানে গাড়ী ২৫মিনিট অপেক্ষা করিল এবং কলিকাতাগামী পুরী এক্সপ্রেস আসিয়া পৌঁছিলে আমাদের গাড়ী ছাড়িল এবং ভদ্রক ও জগৎসিংপুরে থামিয়া এবং বৈতরণী, ব্রাহ্মণী ও মহানদীর পুল অতিক্রম করিয়া কটকে আসিল, তখন রাত্রি পাঁচটা। শ্রীমান্ সত্যচরণ এইদিকে ভ্রমণে এই প্রথম—কাজেই সে বালেশ্বর হইতে বসিয়া থাকিয়া জ্যোৎস্নালোকে পাহাড়গুলি দেখিতে লাগিল। রেল লাইনের পাশে জেনারেলই একটি পাহাড় দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল ও আমাকে ডাকিয়া তুলিল। কটকে অবতরণ করিয়া পুরী-ভালচর গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অতুল যাইতে হইলে এখান ভালচরের গাড়ীতে চড়িতে হয় এবং কটক হইতে তেষট্টি মাইল দূরত্ব খেরামগুলি ষ্টেশনে নামিয়া পরে মোটরযোগে চৌদ্দ মাইল যাইতে হয়।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একখানি গাড়ী সকালে সাড়ে সাতটার সময় পুরী হইতে আসিয়া কটকে উপস্থিত হয়। যথাসময়ে ভালচর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া পুনরায় মহানদী পার হইলাম, কিন্তু এবারে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা অতি মনোরম। সম্মুখে মহানদীর সুবীর্ণ এমিকাট জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং দূরে মহানদীর পরপারে বিশ্বম্ভরপ্রায়ী তরঙ্গায়মান পাহাড়-শ্রেণী সূর্য্যালোকে ঝলমল করিতেছে। কতক্ষণ দেখা গেল—একদৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব নিসর্গ শোভা দর্শন করিতে লাগিলাম এবং পরম আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। অতঃপর গাড়ী জগৎপুর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া

ব্রাঞ্চ লাইনে তালচর অভিমুখে চলিতে লাগিল এবং শীঘ্রই আমাদের গাড়ী পাহাড়সমূহের মধ্য দিয়া কখন সরলরাখে, কখন তির্য্যক্‌ভাবে বেঁকে চলিতে চলিতে বহু জঙ্গল অতিক্রম করিল। কোথও স্থানে পাহাড় কাটিয়া রেল লাইন নির্ম্মিত হইয়াছে। মাটি প্রস্তরময় ও লালবর্ণ। গাড়ী ক্রমশ একটু একটু করিয়া পাঁচশত ফিট উর্দ্ধে উঠিল। কারণ রেল লাইনের পার্শ্বে বিজ্ঞাপনীতে দেখিলাম (সমুদ্র-লেভেলের পাঁচশত ফিট উর্দ্ধে)। দুই পার্শ্বে পাহাড়—কোনটার উপরে মন্দির, কোনটার উপর রাজার বাড়ী। এইভাবে গাড়ী বহু পাহাড় ও জঙ্গল অতিক্রম করিয়া রাত্র আটপড় ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। মধ্যে একস্থানে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল—সেখানে না আছে প্লাটফরম, না আছে কোন ষ্টেশনের চিহ্ন, অথচ গাড়ী হইতে লোক নামিল ও দুই-একজন উঠিল। পাছে ইহাদের টিকিট লয় ও দেয় —এ এক মজার ষ্টেশন, নাম 'চাহরাটিকা', আছে শুধু একখানি মাত্র সাইন বোর্ড। তাহার পর পড় ষ্টেশনে—এখান হইতে পাহাড়ের উপর রাজার প্রাসাদ ও শহরের গৃহগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। বোর্টের উপর গাঁটিকে বেশ সুন্দর শহর বলিয়া বোধ হইল। তাহার পর নরসিংহপুর ও ঝিঙ্কোল রোড ষ্টেশন ; নিকটবর্ত্তী ঝিঙ্কোল পাহাড়ের নামানুসারে এই ষ্টেশনের নামকরণ হইয়াছে। রাত্র আটপড়, ডেঙ্কানল ও ঝিঙ্কোল সমস্তই করদরাজ্য। অকস্মাৎ বেলা দশটার সময় ঝিঙ্ক পাহাড় অতিক্রম করিয়া ট্রেণ বেরামগুলিতে আসিয়া পৌঁছিল (তিন শত ক্রোশ মাইল)। ইহাই পরবর্ত্তী ও শেষ ষ্টেশন তালচর (তিন শত আঠার মাইল)।

বেরামগুলি ষ্টেশনে অঙ্গুল যাইবার বাস পাওয়া যায়—এই বাসখানি প্রত্যহ দশটার সময় বেরামগুলি হইতে অঙ্গুলের মধ্য দিয়া সম্বলপুরে যায় এবং আর একখানি বাস প্রত্যহ প্রাতে সম্বলপুর ত্যাগ করিয়া বেলা চারিটার সময় অঙ্গুলের মধ্য দিয়া বেরামগুলি পৌঁছে। সেই রাত্রে বাসে ষ্টেশনেই থাকে। কারণ প্রত্যহ একখানি ট্রেণ বৈকালে তালচর হইতে বেরামগুলি দিয়া পুরী যায় ও প্রাতে দশটার সময় একখানি ট্রেণ পুরী হইতে এখানে আসে। আর বাকী সময় কেবল মালগাড়ী তালচর হইতে কয়লা লইয়া যাতায়াত করে। আমরা বাসে উঠিলাম এবং বহু বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রায় এক ঘণ্টা পরে অঙ্গুল শহরে আসিয়া পৌঁছাইলাম। শহরের প্রবেশেই পুলিশ লাইন। তারপর অন্যান্য স্থান। আমাদের বাস ডাক ঘরের সম্মুখে আসিয়াছিল। কাজেই প্রথমে সে ডাকঘরে উপস্থিত হইল এবং একে একে যাত্রীদিগকে নামাইয়া দিতে লাগিল।

আমরা আমার বন্ধুর বাটীর ঠিকানা বলায় আমাদিগকে একেবারে বাসের ছাদের মধ্যে লইয়া আসিল। বেলা তিনটার সময় বড়বা অফিস্ হইতে বোর্টে পাঠাইয়া দিলেন। সেই মোটরে চড়িয়া আমরা নিকটবর্ত্তী চারি মাইল দূরস্থ একটী পাহাড় দর্শন করিতে গেলাম। তবে সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়েরা থাকায় অধিকদূর পর্য্যন্ত আরোহণ করা হয় নাই। তারপর পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত শহর পরিভ্রমণ করিলাম। এইখানে আমাদের ভ্রমণের প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে অঙ্গুলের রাজা বাস করিতেন। কোনও কারণে সেই সময়ে অঙ্গুল বৃটিশ সরকারের অধীনে আসে এবং ইহা একটী স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়। সেই সময় হইতে এখানে একটী জেল (১৮৯৭), ডাক্তারখানা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, হাইস্কুল (১৯২৯) ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। মার্কিট চাইল—গভর্ণর, মন্ত্রী অথবা রাজকর্ম্মচারী, যাঁহারা পরিদর্শনে আসেন—তাঁহাদের অস্থায়ী বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট। ইহা ছাড়া বনবিভাগের একটী বড় অফিস আছে, থানা ও ডাকঘর, একটী বাজার আছে। সেখানে শাকসব্জী একটু পাওয়া যায় তবে মাছ আদৌ পাওয়া যায় না। মাংস অবশ্য দুর্লভ নহে। বাজারে সাইকেলের দুই-চারিটি দোকান, মাড়োয়ারীদের কাপড়, ষ্টেশনারি ও আটা পি ইত্যাদির দোকান আছে। উহারা সকলেই অবস্থাপন্ন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি মাড়োয়ারী, বাঙালী ও উড়িয়া ঠিকাদারও আসেন। বাঙালীদের মধ্যে দুই-চারিজন সওদাগরি করেন ও বাকী চারি-পাঁচ ঘর চিরকালের এই সমষ্টিজিসনের অধীনে দুইশতচারি মাইল রাস্তা আছে এবং প্রায় আড়াইশত খানি সরকারি গৃহ আছে। প্রতি বৎসর এই গুলির সংস্কার কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। এখানকার শুপ্পরের লাল কাঁকর বিছান রাস্তাগুলি বড়ই সুন্দর। বেশ সরল, দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী। এই শহরের মধ্যে দুইটী সরোবর আছে। তাহাতে লোকেরা প্রাতঃকালে স্নান করে। যাকণ শীতেও প্রাতঃস্নান—এখানকার প্রথা। এখানে মোটর মেরামতের কারখানা আছে ; তাহা বর্ত্তমানে একজন বাঙালী কর্ত্তৃক পরিচালিত। এই সাবডিভিসন হইতে একজন বাঙালী উড়িয়া ব্যবস্থাপরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু গিরিজা-ভূষণ ঘোষ বি এ—কংগ্রেস সদস্য। রাস্তাগুলি পরিষ্কার। প্রত্যেকটি বাড়ীতেই কূপ আছে। শহরটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে সরকারি চক্‌বেলের বাসস্থান, দক্ষিণে বাজার, স্কুল ইত্যাদি। পশ্চিমে হেমন্তপাড়া এবং উত্তরে আমলাপাড়া। এখান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে প্রতি রবিবারে হাট বসে। হাটে সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়। তার মধ্যে গাঁয়ের কাপ ও বাসন, গামছা (উড়িয়াদের), আকের গুড় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি বৃক্ষবিক্ষের আছে। সেখানে পেঁপে, কমলালেবু, কলি, আম, আম ইত্যাদির গাছ যথেষ্ট আছে।

এখানে পুরী, দেওঘর ইত্যাদি শহরের মত রোগীর ভিড় নাই। এখানকার চারিদিকে বহু মাইল ব্যাপিয়া উন্মুক্ত প্রান্তর—কেবল দক্ষিণ-দিকে পাহাড়ের কোলে কয়েকটি পল্লী আছে। পল্লীর অবস্থা আদৌ ভাল নহে। এখান হইতে সম্বলপুর (একশত দুই মাইল), আমঝিরা (উনত্রিশ মাইল), ঝিকড়পাড়া (ত্রিশ মাইল), তালচর (ষোল মাইল), মোরা পাটনা (বাট মাইল), ইত্যাদি যাইবার রাস্তা আছে। তার মধ্যে মোরা পাটনা হইতে কটক তিন মাইল মাত্র, মহানদীর তীরে অবস্থিত। ঝিকড়পাড়া দিয়া মহানদী পার হইয়া যথাক্রমে বালেশ্বরের ও ফুলঝরের রাস্তা দিয়া কটক ও পুরী যাওয়া যায়। আমার সম্বলপুর হইতে কটক যাইবারও রাস্তা আছে। মোরাপাটনা যাইবার পথে বেরামগুলি, ডেঙ্কানল, ঝিঙ্কোল ইত্যাদি পড়ে।

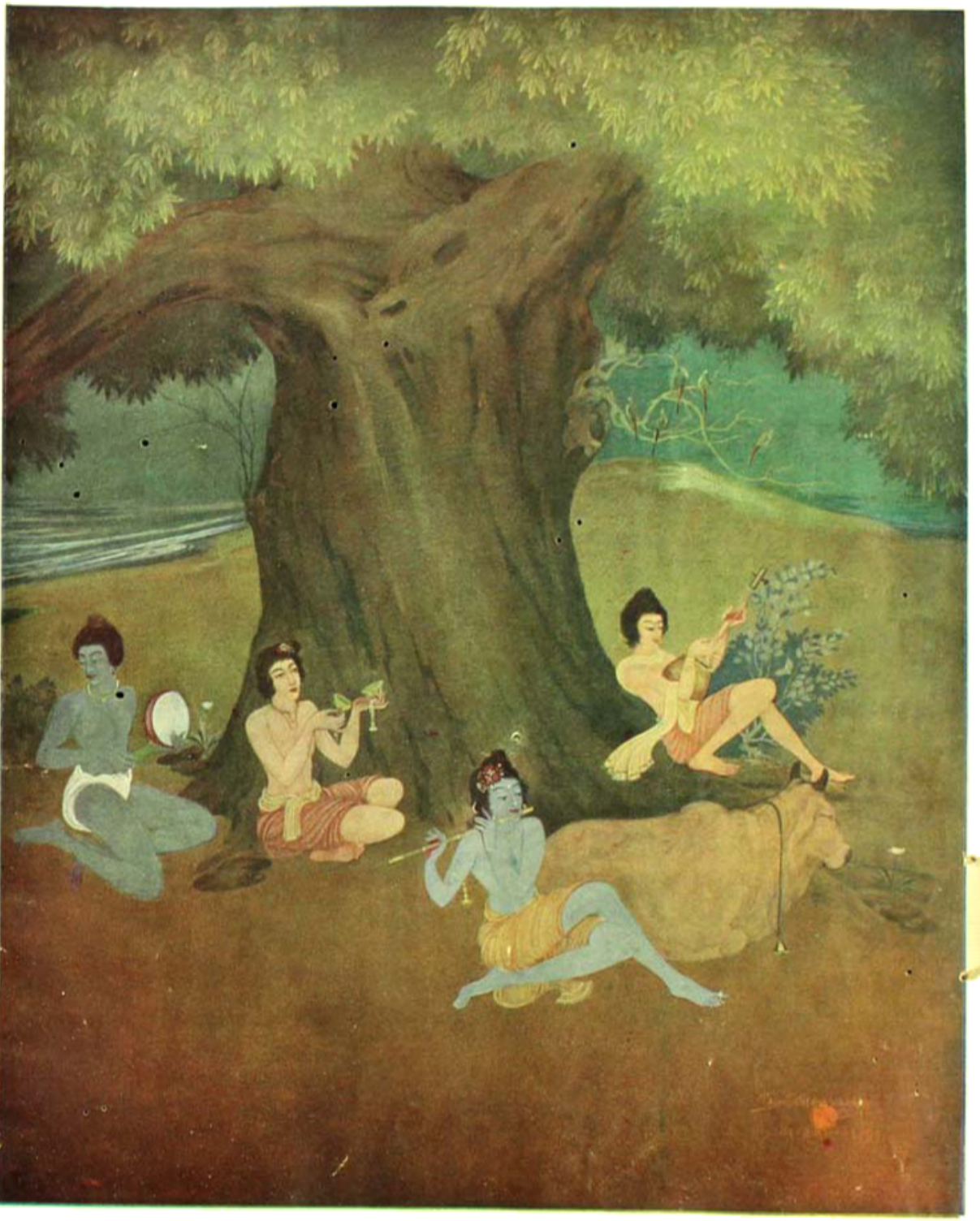

শিল্পী— শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু

গোষ্ঠ বিহার

শহরের দক্ষিণভাগে নাতি-উচ্চ একটি পাহাড় আছে, ইহার নাম সুনাগড়। ইহার উপর আবহাওয়া নির্ণায়ক যন্ত্রাদির একটি গৃহ আছে। ইহার ছাদে উঠিলে সমস্ত শহর ও ইহার চারি দিককার পাহাড়-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষত উত্তর ও পূর্ব্বদিকের পাহাড়গুলি দূরে অবস্থিত বলিয়া শহরের অন্য কোনও স্থান হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। শহরের মধ্যস্থলে অর্দ্ধ মাইলব্যাপী একটি মাঠ আছে। সেখানে স্কুলের ছেলেরা খেলা করে। তাহা ছাড়া, যেখানে সেখানে একাও একাও মাঠ আছে। মাঝে মাঝে দুই-চারিটি বৃক্ষ—সমস্তই মহুয়া, পাল, নিম, অর্জ্জুন ইত্যাদি। এই গাছগুলির তলা দিয়া শহরের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। ভূমি সর্ব্বত্রই সমতল। এই সমতলভূমির উপর বেড়াইতে বড়ই ভাল লাগে—মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর ক্ষুদ্র পাহাড় রচনায় ব্যস্ত। বস্তুত শহরের বাস্তু যে এত নির্জ্জন হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণা ছিল না।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে নিম্না নামক একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী উপলখণ্ড অতিক্রম করিয়া বীর মঁদর খণ্ডিতে প্রধাবিত হইতেছে। নদীর অধিকাংশ

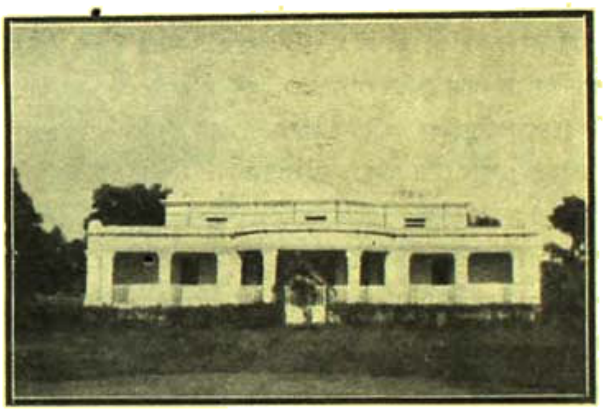

ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বাংলো, অঙ্গুল

ভাগে বালুকা পূর্ণ, কিন্তু বর্ষাকালের দৃশ্য এরূপ নহে; সেই জন্য ইহার উপর একটী পাথরের তৈরি অতিবৃহৎ পুল আছে। এই পথে সম্বলপুর যাইতে হয়। এখান হইতে চারি মাইল দূরে একটি পাহাড় অবস্থিত। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী পাহাড়—ইহাকে শহরের যে-কোন স্থান হইতে মানা ভাবে দেখা যায়।

চিল্পিপল এখান হইতে চব্বিশ মাইল উত্তরে বাথড়িয়ার রাস্তায় যাইতে হয়। মোটরযোগে চিল্পিপলে যাওয়া যায়।

শহরের পশ্চিম-উত্তর দিকে যে পথটি কৃষি ক্ষেত্রের দিকে গিয়াছে সেই পথে আমাদের মোটর চলিতে লাগিল। বামদিকে অসংখ্য পাহাড়-শ্রেণী ও দক্ষিণে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় পড়িল। ক্রমে আমাদের মোটর লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই জঙ্গলটি একটি নাতি-উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত, কিন্তু এই অমুচ্চ পাহাড়টি বহু মাইল বিস্তৃত। দূর হইতে পাহাড় বলিয়া বোধ হয় না। ইহাকে পাহাড় না বলিয়া উচ্চভূমি বলাই ভাল। ইহার নাম নিম্না জঙ্গল। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তা বেশ সরলভাবে গিয়াছে। আমলকী গাছ এই জঙ্গলে যথেষ্ট আছে। যথা মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা সমুদায় আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটায় জল আছে, আবার কোনটায় নাই। সরকার কাজে রাস্তা খুব নীচে আসিয়া আবার উপরে উঠিয়াছে এবং লাল সাকার্ড ড্রাইভারকে সাবধান করিয়া দিতেছে—ধীরে ধীরে চালাইও। কচিৎ দুই-একটি স্থানে রাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছে—তাহাতেও এইরূপ একটি করিয়া সাকার্ড আছে। এইরূপভাবে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণের পর এই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আমরা এক পল্লীগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে নিম্না বাংলো (বার মাইল) অবস্থিত। গৃহখানি একতালা—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; প্রত্যেক বাংলোর মত তিন খানি ঘর আছে ও বাথরুম ইত্যাদিও আছে। আমরা অতঃপর কয়েকটি পল্লীগ্রাম পার হইয়া আবার পূর্ব্বোক্ত ন্যায় একটি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এখানকার জঙ্গল বেশ ঘন ও গাছগুলিও বৃহদ্বর। ইহা বামদিকে বহু মাইল বিস্তৃত কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে ইহার বিস্তার দুই-এক মাইলের অধিক নহে। এই জঙ্গলে নীল গাই, হরিণ, ভালুক, বাঘ ও

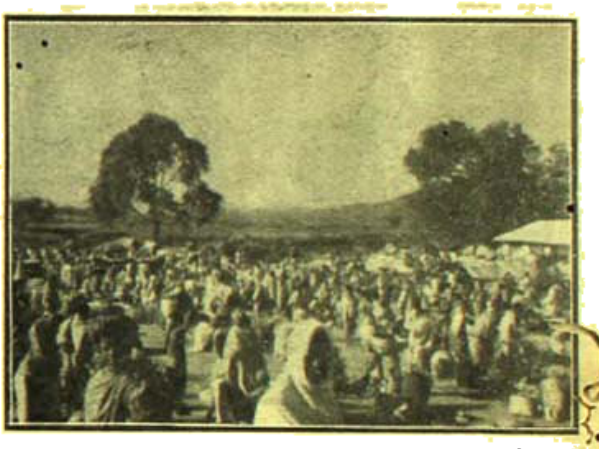

অঙ্গুলের ঘাটের চিত্র

বাইসন দেখিতে পাওয়া যায়। বামপার্শ্বে নূতন নূতন পাহাড়শ্রেণী দেখা হইতেছে, কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে পাহাড় খুব দূরে—অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আবার সোজা রাস্তায় চলিতে চলিতে আবার কয়েকখানি গ্রাম দেখা গেল—আবার জঙ্গল আরম্ভ হইল—মধ্যে পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে—দুই-একটি নালার উপর পুলও আছে, উহা কাঠের তৈরী। কারণ কাঠই এখানে সুলভ। আমাদের মোটর বেশ দ্রুতবেগে চলিতেছে—আর মাঝে মাঝে সরিয়া যোকাই গরুর গাড়ীসমূহের জন্য মোটরের বেগ কমাইতে হইতেছে। এখানকার গরুগুলি মোটর দেখিতে অভ্যস্ত নহে, কারণ এদেশে সাধারণত মোটর চলে না—সাইকেলই চলে। তাই কখন কখন গরুগুলি গাড়োয়ানদের যথেষ্ট চেষ্টা করেও মোটরগাড়ী দেখিয়া মাঠ বা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমরা চিল্পিপলার নিকটবর্ত্তী হইলাম। ক্রমে জঙ্গল পাতলা হইয়া আসিল। ধানক্ষেত ও কুটীরসমূহ

দেখা যেন। ঠিক প্রবেশ করিবার মুখে কাঠের তৈরি পুলটি ভাঙিয়া থাকায় আমরা নীচের রাস্তাটি দিয়া অতি কষ্টে পার হইলাম।

এখানে আমাদের রাত্রিবাসের কথা ছিল। কাজেই মোটর হইতে বেডিং ও আবশ্যকীয় ছুটকেশ ইত্যাদি বাহির করিয়া গাড়ী গ্যারাজে পাঠান হইল।

বাংলোটি বেশ বড় ও সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘরগুলি বেশ বড় ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমরা একটু বিশ্রাম করিবার পর জলযোগান্তে চিঙ্গিপেরা ভ্রমণে বাহির হইলাম। প্রথমেই দেখিলাম যে একটি নালা বহিয়া জল আসিতেছে। আমরা কোথা হইতে এরূপ জল আসিতেছে জানিবার জন্য সেই জলপথ অনুসরণ করিয়া যাইতে লাগিলাম—মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে লাফাইয়া লাফাইয়া সেই জলপথ অতিক্রম করিতে হইল এবং ক্রমশ গ্রামের প্রান্তভাগে আসিয়া উপনীত হইলাম। প্রথমে ধারণা হইয়াছিল যে কোন পুষ্করিণী হইতে এইরূপ জল আসিতেছে কিন্তু যখন শুনিলাম যে নিকটে কোনও নদী বা নালা নাই—এই জল প্রায় দুই ক্রোশ দূর হইতে আসিতেছে এবং সেই স্থানে

Granite House-এর চিত্র, অঙ্কুল

একটি ঝোরা হইতে শুধু শুধু শব্দ করিয়া ক্রমাগত জল উঠিতেছে—শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। এই জলই এখানকার অনেকটি গ্রামকে রক্ষা করে, কারণ বাকল গ্রীষ্ম সময় পুকুর ও কূপ শুকাইয়া যায়, তখন গ্রামবাসিগণ এই জল পান করে ও শস্যক্ষেত্রে নালা কাটিয়া লইয়া যায়। ক্রমে আমরা সন্ধ্যাকালে একটী জঙ্গলের নিকট উপস্থিত হইলাম। এখানকার একজন দেশীয় খৃষ্টান মিশনারীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। আমরা পরস্পর বাংলার কথা কহিতেছি, এমন সময় দেখি টনি গরিকার বাংলায় আমাদের উত্তর দিলেন, বলিলেন—এখানে ভালুকের ভয় অত্যন্ত বেশী—প্রতি বৎসর এখানকার ডাক্তারখানায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক ভালুক কর্ত্তৃক আহত অবস্থায় আনীত হয় ও দুই-চারি জন মারাও যায়। এই জঙ্গল বহু মাইল ব্যাপী—পশ্চিমে পাহাড়-রাজ্য ইহার শেষ।

সেদিনকার মত ফিরিয়া আসিয়া বাংলোয় রহিলাম। ঠিক হইল যে, জঙ্গলে শিকার করিতে যাওয়া হইবে। এখান হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে এক জঙ্গলের মধ্যে আমরা কয়েকজন একটি বন্দুক ও কয়েকটি টর্চ লইয়া চলিলাম। তবে আমরা রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত কোন হরিণের সাক্ষাৎ বা পাওয়ার অবস্থা ফিরিয়া আসিলাম। সেই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে এত বেশী ঠাণ্ডা যে, সকলকেই বাধ্য হইয়া এত শীত ফিরিয়া আসিতে হইল। শীতে সমস্তই জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইলাম। আমার ইচ্ছা ছিল—এদেশের অধিবাসিগণের অবস্থা দেখিবার জন্য গ্রামের মধ্য দিয়া যাই, কিন্তু আমার সহিগণ প্রায় মাইলখানেক দূরে প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত একটি মন্দির দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন, কারণ শুনিলাম সেখানে কয়েক দিন ধরিয়া উৎসব হইতেছে—অর্দ্ধ পথে একদল সংকীর্ত্তনকারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল—তাহারা ঐ মন্দির হইতে আসিতেছে। খানিক দূর নরকরো রাস্তায় যাইবার পর আমরা সোজা পথে—নালা, পাথর, মাঠ অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। ঠিক মন্দিরের সম্মুখে একটি চল্লিশ ফুট চওড়া শুষ্ক নালের উপর দিয়া উপস্থিত হইলাম। কদাকারে নৌকাযোগে মন্দিরে আসিতে হয়—মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বেদীর উপর তুলসী গাছ ও তাহার চারিধার নানা প্রকার বৃক্ষ ও রঙিন কাগজ দ্বারা সজ্জিত। মন্দিরে এক বাঙালী সন্ন্যাসীকে দেখিলাম, কারণ সে বাংলায় গান করিতেছিল। অন্ধকারময় মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে ও একটি ধাঁড় মন্দিরের দালানে প্রস্তরীভূত অবস্থায় দেখা গেল। তারপর আমরা মন্দির হইতে ফিরিয়া গ্রামের পথ ধরিলাম। গ্রামবাসিগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পথে একটা ক্ষুদ্র নদীর মত নালা দেখা গেল—আমরা দুই-একজন নালাস্থ প্রস্তরখণ্ডসমূহের উপর পা দিয়া কোন রকমে পার হইলাম—আমাদের একজনের জুতা লাফ দিতে গিয়া জলে পড়িল। অধিকাংশ লোকের অবস্থা শোচনীয়, মধ্যে মধ্যে দুই-একখানি বাড়ী দেখিলাম—তাহারাই গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন।

তাহার পর বাসায় আসিয়া দেখি যে এক সদ্য মৃত হরিণ আনিয়া পৌঁছিয়াছে। আর একদল স্থানীয় লোক তোরে শিকারে গিয়া এই এই হরিণটিকে মারিয়াছে। ইহা বয়ে তিন বছর ও উচ্চে দুই হাত হইবে।

শহরের সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। শহরের পূর্ব্বদিকে—স্মার্ট সাহেবের বাসা। মাঠের উপর ইলেকট্রিক আলো আছে। —ইনি এখানকার পর্ব্বত হইতে টিচাগড় পেপার মিলে কাগজের জন্য বাঁশ জোগান দিয়া থাকেন। প্রতি এক শত বাঁশের জন্য গভর্ণমেণ্ট এক টাকা, পাস ও গাড়ীভাড়া—বেয়াল্লিশটি পর্য্যন্ত দুই টাকা। কতক কতক বাঁশ—ত্রিকড়পাড়া ঘাট হইতে মহানদীর স্রোতে ভাসাইয়া নৌকায় তোলা হয় ও কটকে পৌঁছে। তথা হইতে রেলযোগে কলিকাতায় পৌঁছে। সময়ে সময়ে কোম্পানির মোটরলরীও বাঁশ লইয়া যায়। আর পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে—মাইধরপুর যাইবার পথে প্রান্তর মধ্যে ত্রিবর্ণ পতাকা রঞ্জিত কংগ্রেস সমস্ত শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ গোপ মহাশয়ের উদ্যানসন্নিহিত কুটীর। দক্ষিণ দিকে কারখানা এবং কয়েকখানি গ্রাম—নিকটেই মন্দার গিরি ও কালিয়া পাহাড় (চারি-পাঁচ মাইল)। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ও

আছে। পশ্চিমে ঠিকাদার রাজা ত্রিকনরীর বাসগৃহ ও নিম্না নদীর পুল প্রায় দেড় শত হাত লম্বা, চারিটি পিলার আছে, প্রত্যেকটির ব্যবধান প্রায় আটাশ হাত। পশ্চিমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও জঙ্গল—উত্তরে মিশনরী পাদ্রে সাহেবের বাসগৃহ এবং পুলিশ টেলিং স্থল আছে—কিছুদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ও আছে।

ঠিক হইল ত্রিকড়পাড়া যাওয়া হইবে অর্থাৎ অঙ্গুলের পশ্চিমে যে পাহাড়শ্রেণী দেখা যায় তাহার মধ্য দিয়া ত্রিশ মাইল দূরে মহানদীর তীর পর্য্যন্ত। আমরা প্রথমত শহরের পশ্চিম প্রান্তের নিম্না নদীর পুল অতিক্রম করিয়া মন্দার গিরি (চারি মাইল) অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে মন্দার গিরির নিকটবর্ত্তী হইলাম। ক্রমে মন্দার গিরি ও কালিমা পাহাড় ও ডাইনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ রাখিয়া আমাদের মোটর দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইখানে দক্ষিণ দিকে কতকগুলি মরা পাহাড় দেখিলাম। তৎপার্শ্বে প্রকাণ্ড সবুজ পাহাড় রহিয়াছে। এইবার আমাদের রাস্তার দুইপার্শ্বে পাহাড়শ্রেণী দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় আমাদের রাস্তা আর একটি রাস্তা অতিক্রম করিল (ছয় মাইল)—ইহা কটক-সম্বলপুর রোড—অঙ্গুল হইতে সম্বলপুর যাইতে ডাইনে যাইতে হয় আর কটক যাইতে হয় বামে। আমাদের রাস্তা সম্মুখ দিকে। ক্রমশ আমরা পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। পাহাড়শ্রেণীর বিরাম নাই—কখনও পাহাড়গুলি রাস্তার উপর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। এইভাবে চলিতে চলিতে আমাদের মোটর পুণ্যাপড় নামক স্থানে (পূর্ত্ত বিভাগের বাংলো আছে) (নয় মাইল) আসিয়া পৌঁছিল। এখানে দুই-চারিখানি গৃহ আছে। এ পর্য্যন্ত রাস্তা সমতল না হইলেও উৎরাই ও চড়াই নাই। তারপর আমরা প্রথম একটি পার্ব্বত্য ঝর্ণা দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম—গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হইয়াছে কিন্তু সম্মুখে দুই চারি হাতের অধিক রাস্তা দেখা যাইতেছে না। গাড়ী ক্রমশ নামিয়া চলিতেছে—এইভাবে গাড়ী প্রায় পঞ্চাশ ফিট নামিবার পর একটী ঝর্ণা দেখা গেল—অল্প অল্প জল আসিতেছে—প্রস্থ প্রায় বিশ ফিট হইবে। জলের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখণ্ড রহিয়াছে। গভীরতা কোথাও দুই হাত, কোথাও বা তিন হাত। এই ঝর্ণার উপর প্রস্তর নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র সেতু আছে, লম্বা প্রায় পঁচিশ ফিট হইবে। এই স্থানে মোটর চালনা করিতে দক্ষতার প্রয়োজন, নতুবা দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা। এইবার মোটর দ্রুতবেগে চড়াই রাস্তা দিয়া উঠিতে লাগিল এবং ক্রমশ রাস্তার দুই পার্শ্বে গভীর জঙ্গল দেখা গেল, উহা আর কিছুই নয়—মোটরখানি একটি পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে লাগিল। তারপর আবার একটুখানি সমতল ভূমির উপর দিয়া চলিল।

তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা বরহরপুর ডাক বাংলোতে উপনীত হইলাম (ছয় মাইল)।

এতদিন পর্য্যন্ত অঙ্গুলে আসিয়া মনে করিতাম যে, রাস্তাগুলি সবরকই বেশ ভাল, কিন্তু এখানে আসিয়া সে ভ্রম দূর হইল, প্রতি মিনিটেই রাস্তা বাঁকিতেছে—এই বক্রতা, অসমতলতা ও গভীর বনরাজি—প্রত্যেকবার পথিককে একসঙ্গে ইহার ভীষণতা, অভিনবত্ব ও আনন্দ উপলব্ধি করিতে শিখায়। এইরূপে আমরা ফুলর পার্ব্বত্য ঝর্ণা ইত্যাদি অতিক্রম করিতে করিতে জগন্নাথপুর ডাকবাংলোতে উপস্থিত হইলাম (চব্বিশ মাইল)। এইখানে জঙ্গলের গভীরতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। রাত্রে বাংলোর বারান্দায়

চিল্লিপাল্লার পি, ডব্লিউ, ডি, বাংলো

নিম্রানদী মধ্যস্থ উপলখণ্ডসমূহের উপর দণ্ডায়মান। বামদিক হইতে লেখক, অমরকৃষ্ণ, বিধুভূষণ, রমন, কুমারকৃষ্ণ ও তাহার সঙ্গীগণ

রক্ষিত ইজি চেয়ারে ভাল্লুক (ভল্লুক) প্রভৃতি হিংস্র জন্তু আসিয়া নিম্না নদীর বাংলোর অতি নিকটেই বন ও পাহাড়—ইহাকে এক কথায় পাহাড়-রাজ্য বলা চলে। লোকজনের বাস খুবই কম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, পথে আসিতে আসিতে মধ্যে মধ্যে বাঁশ বোঝাই গরুর গাড়ী সমূহ আমাদের মোটরের গতিরোধ করে। খুব জোরে হর্ণ দিয়া গাড়ী চালাইলে গরুগুলি ভয়ে পার্শ্বে চলিয়া যায় এবং বাঁশ আসিয়া মোটরে ধাক্কা লাগিতে পারে। এই জন্য লোকেরা গাড়ী হইতে নামিয়া গরুকে ধরিয়া রাখে—কখনও গরু খুলিয়া দেয়। কাগজ প্রস্তুতের জন্য এখানকার গরুর গাড়ী করিয়া জঙ্গল হইতে বাঁশ রপ্তানি হয়।

সম্মুখে পড়িল—অসংখ্য পাহাড়—এই পাহাড়শ্রেণী ভেদ করিয়া আমাদের যাইতে হইবে। সত্বরই আমরা পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং দুই পার্শ্বে ভীষণ জঙ্গল ও পাহাড় দেখিতে দেখিতে পুরাপকোট নামক ডাকবাংলোয় উপস্থিত হইলাম, ইহা অঙ্গুল হইতে ত্রিশ মাইল। এখানে

সুবৃহৎ পাহাড়ের ঠিক নিম্নে কয়েকটি গৃহ দেখা যায়। ডাকবাংলো একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আমরা ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলাম এবং এইরূপ সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করিতে করিতে অকস্মাৎ ঘাটে চারিটার সময় মহানদী তীরস্থ ত্রিকড়পাড়া নামক স্থানে উপনীত হইলাম। সম্মুখে মহানদীর অপর পার্শ্বে সুউচ্চ পর্ব্বতরাজি, যাহা নদীকূলে প্রায় দুইক্রোশ ব্যাপী উচ্চ একটী প্রকাণ্ড পাহাড় সমস্ত শ্রীঘ্র উল্লেখন করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিতেছে—দক্ষিণে পশ্চিমে নদীর উভয় পার্শ্বে ক্রমাগত পাহাড়ের পর পাহাড়—আর কিছুই দেখা যায় না—প্রত্যেক পাহাড়টিই নদীতীর হইতে উত্থিত—স্থানে স্থানে মনে হয়, যেন নদীগর্ভ হইতে উঠিয়াছে। আর নিম্নে তরঙ্গায়িত কূল কূল নাদিনী শুভ্রতোয়া মহানদী তীব্র বেগের আনন্দে পর্ব্বতের চরণই অগ্রাহ্য করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

এইবার আমরা মোটর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মহানদীর বক্ষে

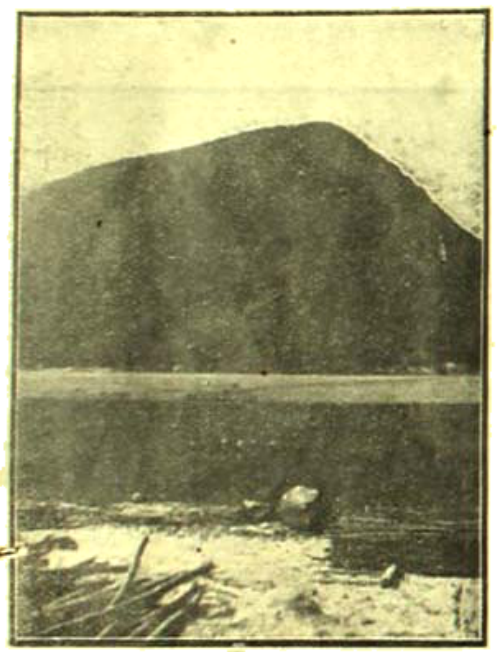

মহানদীর দৃশ্য (ত্রিকড়পাড়া ঘাট)

নৌকাতে আরোহণ করিলাম এবং দুর্পদিকে নৌকা চালাইতে বলিলাম। প্রথমে দেখিয়া মনে হইল—মহানদী এত অপ্রশস্ত, কিন্তু পরে দেখিলাম উহা প্রস্থে প্রায় এক মাইল। একস্থানে দুই পার্শ্ব হইতে পাহাড় আসিয়া নদীকে যেন বাঁধিয়া ফেলিয়াছে এবং দূর হইতে সেই স্থান অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হইল। কাজেই আমরা সেই স্থানটি দেখিবার জন্য জোরে নৌকা চালাইতে লাগিলাম। যতই আমরা অগ্রসর হই, ততই উহা দূরে সরিয়া যায়—এইভাবে ক্রমাগত অর্দ্ধ ঘণ্টা চালাইয়াও যখন তাহার নিকটে উপনীত হওয়া গেল না তখন অগত্যা আমাদিগকে ফিরিতে হইল। মহানদীর অপর পার্শ্বে অবতরণ পূর্ব্বক গরুর গাড়ীতে বেলায় উপস্থিত হইলাম এবং সেখানে নদীতীরে পরাণ রাখিয়া আবার নৌকারোহণ করিলাম। তারপর যখন তীরে ফিরিলাম তখন দেখি ৫-৩০ মিঃ—সন্ধ্যা হইয়াছে। অতঃপর আমরা মোটরযোগে সেই পথ অতিক্রম করিয়া ত্রিশ মাইলস্থ পুরাণকোট নামক বাংলোয় উঠিলাম,—উহা একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। শুনিলাম এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বড়ই বেশী। পরে অঙ্গুলাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে রাত্রি হইল—আমরা বন্য জন্তু দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইয়া রহিলাম। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। তবে কেবল মাত্র একটি সম্বর হরিণ তাহার ধূসর শৃঙ্গ লইয়া আমাদের পথমধ্যে আবির্ভূত হইল। হরিণটি বেশ বড়—একটি বড় বাছুরের মত। এবং মোটরের আলোকে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া বনমধ্যে অদৃশ্য হইল। রাত্রিকালে আর বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। ক্রমে আমরা জগন্নাথপুর, বরহনপুর, পুণ্যাপড় ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া অঙ্গুলে উপস্থিত হইলাম রাত্রি দুইটা ৭-৪৫ মিঃ।

আবার একদিন এক মাইল ব্যাপী খালের অতিক্রম করিয়া মহানদীর পারস্থ একটা বৃহৎ পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। এমন সময়ে হঠাৎ একটা শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইল। প্রথমে মনে হইল ঝড়ের শব্দ কিন্তু পরে আমাদের ভুল ভাঙ্গিল। এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই একটা ঝরণা দেখিতে পাইল। এই কর্ণা ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলাম কিন্তু ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষলতা আমাদের পথরোধ করিল; তা'ছাড়া নিরস্ত্র হইয়া সেই অরণ্যসঙ্কুল পর্ব্বতপ্রদেশে আরোহণ বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তারপর আমরা দাশপাল্লা ও ফুলঝরীর পথে কিয়ৎদূর বেড়াইলাম। দাশপাল্লার পথ গভীর জঙ্গল ও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে—দিবসের অন্ধকার। আর ফুলঝরীর পথে জঙ্গল থাকিলেও দেখা গেল তাহাকে ততটা ভীষণ বলিয়া বোধ হয় না। বাসায় ফিরিতে প্রায় দুইটা বাজিল। পথে কয়েকটা বানর, বন্দুর ও বন্য কুক্কুটের দল দেখা গিয়াছিল।

সম্বলপুরের পথে—২৯শে ডিসেম্বর বেলা দশটায় সম্বলপুরের পথে রওয়ানা হইলাম। সঙ্গে বড়দার পুত্র ও জামাতা। প্রথমত ছয় মাইল পর্য্যন্ত পথ ত্রিকড়পাড়ার পথে যাইতে হইল, অতঃপর আমরা ত্রিকড়পাড়া রাস্তা ছাড়িয়া কটক-সম্বলপুর রোড ধরিলাম। বাম পার্শ্বে ক্রমাগত পাহাড় শ্রেণী, বিরাম নাই। তবে রাস্তা খুব উঁচুনীচু নহে। সম্মুখে দূরে ও বামদিকে দুই-চারিটি পাহাড় দেখা গেল। পথে একটি পাহাড় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—এইটি এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ পাহাড়—অঙ্গুল হইতে দক্ষিণে যে পর্ব্বতমালা দেখিতে পাওয়া যায়—তন্মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ। আর একটি পাহাড় গায়ে একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড দেখিতে বড়ই সুন্দর লাগিল—এইভাবে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা জরপাড়া বাংলো অতিক্রম করিলাম এবং ক্রমে বেলা এগারটার সময় অঙ্গুল হইতে ২৬ মাইল দূরস্থ একটি সুন্দর বাংলোতে উপনীত হইলাম। বেলা অধিক হওয়ায় আর অধিকদূর যাওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। আমরা সেই বাংলোর সম্মুখস্থ বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করিলাম।

ক্রমে ছুটি ফুরাইয়া আসিল—৩১শে ডিসেম্বর বাড়ী ফিরিবার পথে

তালচর দেখিয়া ফিরিব স্থির করিলাম। দুইখানি মোটর যোগে সকলে অহোরাত্রি দমদম পূর্বক বেলা এগারটায় যাত্রা করিলাম। প্রথম আট মাইল যেরাপণ্ডলির পথে আসিয়া ডানদিকে তালচরের রাস্তা পাওয়া গেল। গাড়ী কখন চালু রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল, দুই পার্শ্বে অসমতল খাস ক্ষেত্র। মাঝে একটি ক্ষুদ্র নদী পড়িল, জল খুব অল্প—গাড়ীতে চড়িয়াই পার হওয়া গেল। কিয়ৎদূর এইভাবে যাইবার পর আমাদের গাড়ী তালচর রাজ্যের সীমানায় উপস্থিত হইল, একজন কর্মচারী আমাদের গাড়ী থামাইতে বলিলেন। আমাদের অগ্রে একখানি মোটর আসিতেছিল, তাহা হইতে একজন ভদ্রলোক নামিয়া আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তালচর যাইতেছি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি রাজার বাড়ী ও রাণী পার্ক দেখিবেন?"—আমরা বলিলাম যে উহা দেখিবার জন্যই যাইতেছি, তখন তিনি আমাদিগকে, তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। ড্রাইভারের কাছে শুনিলাম, ইনি তালচরের রাজা। সাধারণ পোষাকে—মাথায় টুপি, গায়ে শিকের শার্ট, ও পায়ে জুতো ও পরিধানে কাপড়। পরিষ্কার বাংলা কথা বলিলেন। ক্রমে আমরা রাজবাড়ীর গেট অতিক্রম করিয়া রাণী পার্কে উপস্থিত হইলাম। রাজা একজন প্রদর্শক সঙ্গে দিলেন। সে প্রথমে আমাদের একটি নক্স আগত ভল্লুক বাচ্চা দেখাইলেন এবং খাচার ভিতর দুইটা ব্যাঘ্র ও দুইটি সিংহ দেখাইল।

তাহার পর আমাদের মোটর রাণী পার্কস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিল—দেখিলাম কতকগুলি ঘোড়া, জেব্রা ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। আমরা সমস্ত পার্কটি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম—ক্রমে আমাদের গাড়ী পার্শ্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া কিছু উচ্চে উঠিল—সেখানে রাজার ও রাজার আত্মীয় স্বজনের ও অন্যান্য কয়েকটি মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। সে গুলি দেখিবার মত—হঠাৎ দেখিয়া দক্ষিণেশ্বরের মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়। মৃৎ শিল্পের এই সকল নিদর্শন দেখিবার পর আমরা সেই জঙ্গলের মধ্যস্থ রাস্তা দিয়া মোটরযোগে চলিতে লাগিলাম। আর দুই পার্শ্বে বৃক্ষরাজি ও প্রস্তরখণ্ড মধ্যে হরিণ, জেব্রা ও অন্যান্য বন্য জানোয়ার (অবশ্য বাঘ, সিংহ ও ভল্লুক ব্যতীত) ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইহা চিড়িয়াখানা নহে। এই পার্কের পরিধি আট-দশ মাইল হইবে এবং মধ্যে পাহাড় আছে তাহা কৃত্রিম নহে—খানিকটা বন ও পাহাড় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া এই উদ্যান প্রস্তুত করা হইয়াছে। ক্রমশ আমরা একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের নিকটবর্তী হইলাম ও নানা প্রকার জন্তু জানোয়ার দেখিয়া অবশেষে রাজবাড়ীর জলের পম্প, ইলেকট্রিক কারখানা ও রাজবাড়ীর বহু মন্দির, সভাগৃহ ইত্যাদি দর্শন করিতে করিতে পুনরায় গেটের কাছে আসিলাম—এখানে দশ-বারটা হাতী রহিয়াছে দেখা গেল। রাজবাড়ীর পূর্ব্বদিকে ব্রাহ্মণী নদী প্রবাহিত ও উহার অপর তীরস্থ পাহাড়গুলি সুন্দর দেখাইতেছিল। বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মণী নদী তীরস্থ রাজপ্রাসাদটি বড়ই মনোরম। এই পার্কটি অতিক্রম করিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল। তারপর এখান হইতে দুই মাইল দূরস্থ তালচর খনি দেখিতে গেলাম। সেখানে তিনটি কয়লার খনি আছে, একটি বি-এন-রেলের, দ্বিতীয়টী ভিলিয়ার্স কোম্পানীর এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ মারাঠা রেলের। এখানকার খনিতে বিশেষ গ্যাস ওঠে না, আমরা কয়েকজন কয়লার খনির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এখানে চারি শত ফিট নিম্নে কয়লা পাওয়া গিয়াছে। ইহা দুই-তিন মাইল বিস্তৃত। ইহার খুলি মজুরেরা অত্যন্ত কেরোসিন কুপি লইয়া কাজ করিতেছে। আমরা অবশ্য গ্যাস লাম্প লইয়া গিয়াছিলাম। ইহার ভিতরে ক্ষুদ্র রেলপথ আছে, তাহাতে কয়লা বোঝাই টব ইঞ্জিনদ্বারা চলিতেছে। সেখানে কয়লা তোলা হইতেছে। অনেক স্থানে ইহার খনিরেখাগুলির উচ্চতা মাত্র ফিটেরও কম। কাজেই সাবধানে চলিতে হয় মাথা নড়িলে মাথায় আঘাত লাগিতে পারে—আর প্রদর্শক না থাকিলে পথ হারাইবারও সম্ভাবনা আছে। ফেনে করিয়া একটি লিফ্‌ট উঠিতেছে ও নামিতেছে। কলিকাতা সহরে যাহারা লিফ্‌ট-এ উঠিয়াছেন, তাহারা ইহার কতকটা অনুভব করতে পারেন—দুইটি সুদৃঢ় কেন জলাশয় দিনের পর

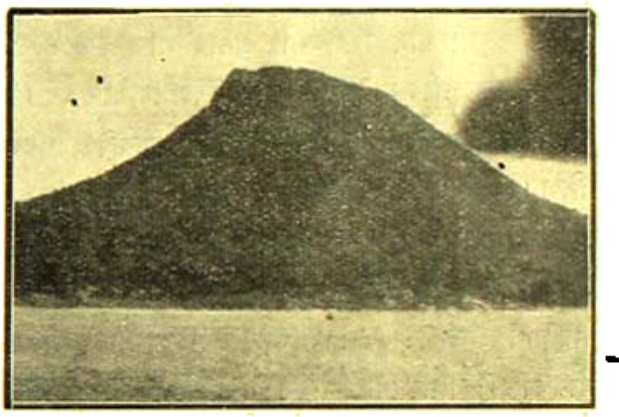

মন্দার-গিরি (স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে এই নাম জানিয়াছি)

দিন চল্লিশ ঘণ্টা এই কাজ করিতেছে। একটিতে কয়লা ওঠে আর অপরটিতে মানুষ ওঠা-নামা করে। সেই চারি শত ফিট নিম্ন হইতে যন্ত্র চালিত পম্প সাহায্যে উপরে জল উঠিতেছে ও তালচরের খনির কর্ম্মচারী ও কুলিদের জন্য সরবরাহ হইতেছে, এবং রাস্তায় রাস্তায় ও গৃহে গৃহে ইলেকট্রিক বা বিজলিবাতি জ্বলিতেছে—এই তালচর রেল লাইন অধিক দিন পূর্ব্বে স্থাপিত হয় নাই। খনিসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর ইহার পত্তন হইয়াছে। বৈকাল ৫-১৫ মিঃ টেনে তালচর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং রাত্রি দশটায় সময় কটক হইতে পুরী এক্সপ্রেসে উঠিয়া পরদিন প্রাতে হাওড়া পৌঁছাইলাম। এই দুই মাসে ছয় শত মাইল রেল পথে, পঞ্চাশে পাঁচ শত মাইল এবং মোটরে পাঁচ শত মাইল,—মোট ষোল শত মাইল বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়া বহু অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন শরীরের ও মনের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বাঙ্গলায় শারদীয়া পূজা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আমাদের এই সুফলা সুফলা বঙ্গভূমিতে হিন্দুর ঘরে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রতিপত্তি ও বিস্তারের কথা চিন্তা করিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। পূজা বলিতে আমরা এই দুর্গাপূজার কথাই বুঝি, অন্য পূজার কথা মনে আসে না। কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক প্রভৃতি নানা পূজার প্রচলন দেশে থাকিলেও, এই শারদীয়া দুর্গাই সমস্ত বাঙ্গলা দেশের চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। 'বাসন্তী'ও তিন দিনের পূজা; বাসন্তীর রূপকল্পনাও শারদীয়া দুর্গারই অনুরূপ, তথাপি বাসন্তী বাঙ্গলায় প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই, সে কথা ভাবিয়া দেখিতে হয়। হয় তো, বর্ষারম্ভের বৈশাখ, বাসন্তী-চৈত্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়া। এই চৈত্রে ও বৈশাখে বঙ্গদেশে যথাক্রমে চৈতালি ফসল কাটিবার ও ধান্য বপন করিবার সময় বলিয়া গৃহস্থ-বাঙ্গালী সে সময়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে পূজাপালন করিবার সুযোগ পায় না। নয় তো, শরৎ ঋতুর উদারতা গ্রীষ্মসুলভ চৈত্র অপেক্ষা পূজাপার্ব্বণের অধিকতর উপযোগী মনে করিয়া বাঙ্গালী শারদীয়া পূজারই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। কেনও হইতে পারে, শক্তির উদ্বোধনই প্রধানতঃ এই শারদীয়া দুর্গাপূজার উদ্দেশ্য বলিয়া এবং এই আদ্যাশক্তির সহিত তাঁহার পুত্রকন্যা-পরিবৃত পারিবারিক পূর্ণ মূর্ত্তিটির প্রকাশ বলিয়া, গৃহপরিবারপ্রিয় শক্তি-পূজক বাঙ্গালী মনে-মনে ইহারই অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র এই শরৎকালেই অকাল-বোধন করিয়া শক্তিলাভের জন্যই এই দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া শরতের শক্তি-আরাধনাই বাঙ্গলায় বেশী আদর পাইয়াছে। শ্যামাপূজাও শক্তিপূজা। তাহাও এই দুর্গাপূজারই কাছাকাছি। এবং এই শ্যামাপূজাও প্রচলন হিসাবে দুর্গাপূজারই পরবর্ত্তী। শক্তিপূজক বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিক অভ্যুদয়। বৈষ্ণবধর্ম্মানুগত কীর্ত্তনাদি সেজন্য দেশে প্রসার লাভ করিলেও শক্তিপূজা কিন্তু কমে নাই। অবশ্য দেশের দারিদ্র্যবশতঃ অনেক স্থানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এই মাত্র।

বস্তুতঃ এই দুর্গাপূজার প্রভাব বাঙ্গলায় এমনই প্রবল যে, অনেকেই এক পূজা হইতে অন্য পূজাপর্য্যন্ত মনে-মনে দেন বর্ষগণনা করিয়া থাকেন। 'ভয় নাই, পূজার আগেই দিব,' কিম্বা 'এখন নয়, পূজার পরে'—এই সকল কথা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, মাত্র তিন দিনের ব্যাপার হইলেও, এই পূজা যেন সমস্ত বৎসরের মধ্যে একটি প্রাচীর বা পরিখা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। মাত্র তিনটি দিনের বলিদান হইলেও, 'পূজার আগে' ও 'পূজার পরে' বলিতে যেন সময়ের একটা বিশেষরূপ পার্থক্য বুঝায়।

কবে এই পূজা প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল, রামচন্দ্রের সময়ে কি সুরথ রাজার সময়ে, সে আলোচনা বিশেষজ্ঞ পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের বিচার্য্য। আমরা শুধু এইটুকু বুঝি ও জানি—এই দুর্গাই সমগ্র বঙ্গদেশের আরাধ্য দেবতা। যে প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিতে পারিল, সে ধন্য। যে তাহা পারিল না, ঘটা করিয়া না হউক, সেও ঘট ভরিয়া পূজা সারিল। তাহাও যাহার সাধ্যে নাই, সে দুর্ভাগাও কুটীরাঙ্গনে কেবলমাত্র আলিপনা আঁকিয়া ও জলপূর্ণ মৃৎকলসে আম্রপল্লব মাত্র সাজাইয়া মনে-মনে মা-দুর্গার মানসিক সেবা সারিয়া লইল।

দুর্গার কল্পনা ও দিব্যমূর্ত্তি অতিশয় চিত্তগ্রাহিণী। একাধারে সব দিক দিয়া চিত্তবৃত্তি ও ভাবের সেবা করিবার যোগ্য এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূজা আর নাই। রুচি, কল্পনা ও কারুকলার দিক্ হইতেও ইহার জোড়া মেলে না। একই সঙ্গে শিব, শক্তি, সিদ্ধি, শান্তি, বিজয়, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যের আরাধনাও অন্যত্র দুর্লভ। কমলাকান্তের অপূর্ব্ব দুর্গোৎসব ইহার বিস্তারিত বর্ণনা সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। মানুষের সকল উচ্চবৃত্তি, কামনা ও আদর্শ এখানে চরিতার্থ।

বাঙ্গলাদেশের সমস্ত নরনারীর অন্তরে কোনো-না-কোনো দিক্ দিয়া এই পূজা সার্থকতা লাভ করে। যাহার ঘরে পূজা, সেখানে তো আনন্দের উৎসব পড়িয়া যায়। এই পূজায় প্রবাসপ্রত্যাগত আত্মীয়-মিলনের যে শুভ সুযোগ উপস্থিত হয়, সমস্ত বঙ্গবাসীরই ইহা পরম কাম্য। সকলেই এই বৎসরান্তের আনন্দ-মিলনের আশায় অতিশয় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। যাহার ধন আছে, মন নাই, সেও এই পূজার সুদীর্ঘ অবকাশে দেশ-দেশান্তর ভ্রমণের আনন্দ লাভ করে। যে দীনদরিদ্র, তাহার ঘরের বালকবালিকারাও বৎসরের মধ্যে এই সময়ে একবার মাত্র একখানি নূতন বস্ত্র লাভ করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠে। ভিক্ষা বা ধারকর্জ্জ করিয়াও তাহার গৃহে সেদিন নূতন আহার্য্যের যথাসাধ্য ব্যবস্থা হয়। যে অভাগার ভাগ্যে তাহাও দুর্লভ, সেও সেদিন সপরিবারে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিমা দর্শন করিয়া ও প্রসাদ পাইয়া আনন্দময়ীর আগমনের কথঞ্চিৎ আভাষ লাভ করে। দরিদ্র চাষীর ঘরেও সেদিন আনন্দের ইঙ্গিত। ধান্যাদি শারদীয় শস্যের পুষ্টির সঙ্গে সেদিন তাহারও আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন বাড়িয়া উঠে। বাঙ্গলার বাতাসে সেদিন আনন্দের হিল্লোল, বাঙ্গলার মাটীতে সেদিন আগমনীর উল্লাস, বাঙ্গলার নদ-নদীতে সেদিন বিজয়ার কল্লোল ধ্বনিত হইয়া উঠে।

স্বভাবতই এই শরৎকাল সুন্দর। সুশুভ্র সূর্য্যালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত। আকাশে বাতাসে জলে স্থলে—চারিদিকে সৌন্দর্য্যের বিকাশ। বর্ষার বারিধারায় কর্দ্দমাক্ত পল্লীপথ আজ বিশুষ্ক। দুঃসহ গ্রীষ্মাবসানের নাতিশীতোষ্ণ বাতাসে যেমনে আজ স্বস্তির নিশ্বাস। নদী-তড়াগের বক্ষে আজ সুপরিস্ফুট স্বচ্ছতা। গৃহে গৃহে গৃহাঙ্গনে অযত্ন-পালিত শেফালিকা-ঝুকে অজস্র পুষ্পসম্ভার। সরোবরে কুমুদকহ্লারকোকনদের অফুরন্ত শোভা। বর্ষাবাসের কুলায়-কোটর ত্যাগ করিয়া সৌরকরোজ্জ্বল আকাশে পক্ষিগণ পক্ষবিস্তার করিয়া আজ সঙ্গীতমুখর।

পূর্ব্বে এই শরৎকালে দিগ্বিজয়ের দিন ছিল। শক্তি-দেবীর পূজা শেষ করিয়া শরতের পরিশুষ্ক পন্থায় রাজা-রাজড়ারা দিগ্দেশ জয় করিতে বাহির হইতেন। ইহ-জগতের অধিকাংশ সুখের আকরই শক্তি। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। এমন যে আত্মা, তাহাও বলহীনের জন্য নহে। আজ বাঙ্গালী বলহীন, দুর্ব্বল। সে সত্যকার শক্তিসেবা ভুলিয়াছে। কিন্তু এমন দিন ছিল, যেদিন এই আদ্যাশক্তি মহামায়ার আরাধনায় সমুদয় বঙ্গপল্লী মুখরিত হইয়া উঠিত। বিজয়ার রাত্রে বা পরবর্ত্তী প্রভাতে গুরুলঘু নির্ব্বিচারে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আলিঙ্গন ও যথাযোগ্য সম্ভাষণের আদান-প্রদানও এক অভিনব আনন্দময় ব্যাপার ছিল। বিসর্জ্জনের মর্ম্ম ব্যথা ইহাতে যেন অনেকটা ভুলাইয়া দিত। এই বিজয়ার পরে গৃহস্থের গৃহাঙ্গনেও আমরা পল্লীতে পল্লীতে লাঠিখেলা দেখিয়াছি। সেদিন আর নাই। গ্রামে গ্রামে দেশশাসনের কল্যাণে ম্যালেরিয়া ঢুকিয়া দেশকে শ্রীহীন স্বাস্থ্যহীন করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালীও আর সে বাঙ্গালী নাই। তাহার বুকে সে প্রাণ নাই, মুখে সে গান নাই। তবু পূর্ব্বের সেই স্মৃতি ও রীতি আজিও তাহার মজ্জাগত হইয়া আছে। তাই, এই শরতের শারদীয়া অদ্যাপি বঙ্গগৃহে দরিদ্রের প্রাণের পূজা পাইতেছে। তাই, ইহার এত প্রভাব। সত্যকার শক্তি-সাধনায়, 'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে' বলিয়া ডাকিয়া আবার এই প্রভাব বাড়াইতে হইবে।

আরো একটি কথা এবং তাহাই বোধ করি, সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। যাহা এই উৎসবের প্রাণ, যাহা এই কোমলচিত্ত বঙ্গবাসীর বিশিষ্ট আকর্ষণ, তাহা হইতেছে এই অনুষ্ঠানের সত্যকার আভ্যন্তরিক মানবতা. ইহার অন্তরের দিক্। বঙ্গগৃহে গৃহিণীই গৃহকর্ত্রী—গৃহিণীই গৃহ। দুর্গাপূজার এই অন্তরের দিক্‌টাই একান্তভাবে তাহার চিত্ত স্পর্শ করে। মেয়ের প্রতি মায়ের যে স্নেহ অপরিসীম, সেই স্নেহধর্ম্মই এই উৎসবের মধ্যে যেন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। মা-মেনকার আনন্দদুলালী উমা শ্বশুরঘর হইতে তিনটি দিনের জন্য পিতৃ-গৃহে আসিতেছেন। ইহা যেমন আনন্দময়, তেমনি করুণ। পিতৃগৃহের স্বল্পকালস্থায়ী আনন্দ-কারুণাই আগমনীগানে মুখরিত। শাশ্বত-জননীর সহিত শাশ্বত-কন্যার এই সাম্বৎসরিক মিলনমাধুর্য্যই এই দুর্গাপূজাকে বাঙ্গালীর অন্তরের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গগৃহের এই মধুময়ী স্নেহরসধারাই এই দুর্গাপূজাকে নিত্যপ্রাণে সঞ্জীবিত ও নিত্যগানে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই তিন দিনের পরে বিদায় দিতে হইবে জানিয়াও মা-মেনকার মুখের—

এবার আমার উমা এলে আর আমি পাঠাব না।

বলে বলুক লোকে মন্দ (আমি) কাউরি কথা শুনব না।

বাঙ্গলার সমস্ত মাতৃহৃদয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তাই, এই শারদীয়া দুর্গাপূজা বাহিরের পূজাড়ম্বর মাত্র নহে, অন্তরের আনন্দ-বেদনার নিত্যকার ও সত্যকার পূজা। তাই, ইহার প্রসারও তেমনি অধিক।

এবং

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সার্জ্জারির প্র্যাক্‌টিক্যালের সঙ্গে ফাইনালে এনাটমি পরীক্ষার পালা শেষ করিয়া সত্যেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল মেডিকেল কলেজের বাহিরে—কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাথে।

পরীক্ষা শেষ হয় নাই! মন এতদিন চিন্তার ভারে আচ্ছন্ন ছিল, পৃথিবীর রূপ রস-গন্ধ সে তার মেলিয়া মনে মেলিয়া দিতে পারে নাই। এখন পথে আসিয়া সত্যেন্দ্র দেখিল, আকাশ তেমনি ঝলমল করিতেছে; পোলবীথির কোণে পোস্ট-বেয়ারের গায়ে অজস্র লালে ফুলে আলো হইয়া আছে; ট্রামে-বাসে জীবনের তেমনি কলরব।

খাঁচার পাখীকে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া দিলে সে যেমন প্রথমে স্তম্ভিত থাকে, পরে মুক্তির উল্লাসে মাতিয়া ওঠে, সত্যেন্দ্রর মন তেমনি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিবার পর চারিদিকের জীবন-প্রবাহে আপনাকে উৎসারিত করিয়া দিতে চাহিল।

সামনে যে-বাস পাইল, কোনো-কিছু না ভাবিয়া একেবারে তাহাতে সে চড়িয়া বসিল এবং আসিয়া নামিল এস্‌প্লানেডে। বাস হইতে নামিবামাত্র একখানা হ্যাণ্ডবিল হাতে পাইল। হ্যাণ্ডবিল পড়িল। ছাপা আছে—

আতুর-আশ্রম-নির্ম্মাণের
সাহায্য-কল্পে
এম্পায়ার থিয়েটারে
শনিবার ৮ই মে, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়
ভদ্র-মহিলাদের নৃত্য-গীত—মণিপুরী ম্যাজিক—
রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয়—
চৌরঙ্গীর টেম্পল্ হাউসে
অগ্রিম সীট্ রিজার্ভ করুন

সামনেই টেম্পল হাউস। সত্যেন্দ্র গিয়া সেখানে ঢুকিল এবং নগদ পাঁচ টাকা ফেলিয়া সীট কিনিল—একেবারে সামনের চেয়ার।

ভাবিল, এতদিন যেন কোন্ বিরাগী অন্ধকূপে পড়িয়াছিল, আজ আলোর দেখা পাইয়াছে!

কিন্তু ৮ই মে'র এখনো দুদিন বাকী! এ দুটা দিন কি করিয়া কাটাইবে?

সত্যেন্দ্র গেল এমহিনষ্টোন্ সিকচার পালেসে।...

৮ই মে।

সাড়ে পাঁচটা বাজিতেছে, সত্যেন্দ্র আসিল এম্পায়ারে।

প্রমোদ-বিলাসী যৌবন লোকে লোকারণ্য। গাড়ীর ঘটা, পোষাকের ঘটা, সাজসজ্জার ঘটা, রূপ-মাধুরীর ঘটা! সে-ঘটায় চোখ ঝলসিয়া যায়, মন ঠিকরিয়া পড়ে!

আট আনা দাম দিয়া প্রোগ্রাম কিনিয়া সত্যেন্দ্র ঢুকিল অডি-টোরিয়মে।

গাঢ় লাল রঙের মোটা মখমলের পর্দায় ওদিকটা ঢাকা। সত্যেন্দ্রর মনে হইল, ঐ পর্দার আড়ালে আলো-হাসি-সুরের লহর বহিতেছে...কত আশা...কত আনন্দ...

মানুষের রক্ত-পুঁজ ঘাঁটিয়া দিন কাটাইলেও সত্যেন্দ্রর মন আর্টের ছোঁয়াচে পড়িয়া উঠিয়াছে। সে গান গায় চমৎকার—বাজায় ভালো এবং মেডিকেল কলেজের নাটক অভিনয়ে বরাবর নায়িকা সাজিয়া গভীর ডাক্তার-দর্শকদের সে বিমোহিত করিয়াছে! অর্কেষ্ট্রার সুরে-সুরে মনের পর্দা উঠিল এবং প্রমোদ-লীলা সুরু হইল।

তিন-চারিটা নাচ-গানের পালা চুকিলে পঞ্চম পর্ব্বে গান গাহিতে বসিলেন এক কিশোরী...চমৎকার গান! যেমন কণ্ঠ, সুরের উপরে তেমনি অনায়াস-অধিকার! সুরগুলাকে লইয়া খেলাইতেছেন—আশ্চর্য্য কৌশলে!

কিশোরী গাহিতেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান—

আমার মল্লিকা-বনে
যখন প্রথম ধরেছে কলি—
তোমায় লাগিয়া তখনি বন্ধু,
রেখেছিনু অঞ্জলি...

গানের সুরে-ভাষায় সত্যেন্দ্র ভুলিয়া গেল, পাঁচ টাকার টিকিট কিনিয়া দর্শকের আসনে বসিয়া সে রিহার্শাল-দেওয়া গান শুনিতেছে! আবেশে তার দু'চোখ মুদিয়া আসিল। মনে হইল, কোন্ মল্লিকা-বনে প্রথম-আশা ফুলগুলি লইয়া কে যেন তাহারি জন্য অঞ্জলি রচিয়াছিল...সে যেন সে অঞ্জলির দাম চুকাইয়া চলিয়া আসিয়াছে বনের গান অবসান হইবার আগেই...

সহসা চটপট করতালি-ধ্বনিতে তার আবেশ গেল ভাঙিয়া। চোখ মেলিয়া সত্যেন্দ্র চাহিয়া দেখে, ষ্টেজের উপরে পর্দা পড়িয়া গেছে। সুরের যে রেশ জাগিয়াছিল, অশান্ত বিমুগ্ধ দর্শকের দল করতালির বিকট শব্দে সে আবেশটুকু ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে!

সত্যেন্দ্র প্রোগ্রাম খুলিল—কে এ সুরের পরী?...

প্রোগ্রামে নাম নাই। শুধু লেখা আছে—

রবীন্দ্র-সঙ্গীত—শ্রীমতী···

বুক ভরিয়া নিশ্বাসের উচ্ছ্বাস!

ষ্টেজে তখন মণিপুরী-ম্যাজিক সুরু হইয়াছে। পাঁচটা পায়রা কাহিয়া চোখের-সামনে সেই কাটা-পায়রার খড়ে বেঁটে-খাটো ম্যাজিশিয়ান কাকের মুণ্ড আঁকিয়া দিয়াছে···পায়রা সে 'বকুম্‌বম্'-বুলি ঘুচিয়া 'কাকের'-সুরে 'কা'-'কা' কর্কশ রব তুলিয়াছে···দর্শকের দলে তেমনি বিকট কলরোলের সঙ্গে ম্যাজিকের তারিফ করিতেছে!

এ-কলরোল সত্যেন্দ্রর বুকে বাজিতেছিল, ভীষণ বজ্র-নির্ঘোষের মতো। নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, হায়রে মূঢ়ের দল,—সেই গান আর এই ভেল্‌কিকে সমানভাবে তারিফ করিয়া এ বর্বরতা-প্রকাশে তোমাদের লজ্জা হয় না?···

একটার পর আর একটা পালা বহিয়া চলিল, চলন্ত মটরের মতো! থাক্ যাই যে ভালোর রেশ দু'দণ্ড মনকে আচ্ছন্ন রাখিবে! ভালো-মন্দ মিশিয়া এ যেন তাণ্ডব-লীলা চলিয়াছে!

ইন্‌টারভ্যালের সময় সত্যেন্দ্র ভাবিল, আর নয়। এবারে সরিয়া পড়া যাক! উঠিয়া সে আসিল থিয়েটার-বাড়ীর লবিতে। সেখানে বেশ ভিড়···ষ্টেজের ভিতরকার সঙ্গে বাহিরের মিলন ঘটিয়াছে। দু-চারজন রঙমাখা মেয়ে-আর্টিষ্ট আসিয়া বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আলাপে করিতেছে!···

সিঁড়ির উপরে সত্যেন্দ্রর চোখ পড়িল···

হাসি-কলরবের ঝলক বহিতেছে।

···সেই সুর-পরী না? তাই···

মুগ্ধ নয়নে সত্যেন্দ্র চাহিয়া রহিল তার পানে···

এক বান্ধবীর সঙ্গে পরী কথা কহিতেছিল। সত্যেন্দ্র সে-কথা শুনিল। পরী বলিতেছিল—শেষে আমাকে আর একখানা গান গাইতে হবে, ভাই···প্রোগ্রামে নেই···সকলের অনুরোধ।

বান্ধবী বলিল—প্রোগ্রামে নাম দিস্‌নি কেন?

হাসিয়া পরী বলিল—আমি বাদ বাজাতে চাই না ভাই। I hate the idea···

বান্ধবী বলিল—তোর গান কিন্তু খুব চমৎকার হয়েছিল···কারো অমন নয়···

হাসিয়া পরী বলিল—থাম্, থাম্—তুই চিরদিন আমাকে flatter করিস্!···ভালো কথা, ম্যাজিক কেমন দেখলি?

বান্ধবী বলিল—চমৎকার! কি করে' করে ভাই?

পরী বলিল—আপাগোড়া ফাঁকি! ধেৎ···

পরী চাহিল সত্যেন্দ্রর পানে···সে দৃষ্টিতে যেন অগ্নিশিখা! অপ্রতিভ হইয়া সত্যেন্দ্র সরিয়া গেল···পথের দিকে।

পরক্ষণে ভাবিল, না, পরী আর একখানি গান গাহিবেন—সকলের। ···সত্যেন্দ্র ধীরে ধীরে আবার আসিয়া অডিটোরিয়ামে ঢুকিল।···

পর্দা উঠিল। অতি-সাধারণ কতকগুলা নাচ-গান-বাজনা···

তারপর আবার সেই পরীর গান···

পরী গাহিল—

তবু মনে রেখো—
যদি দূরে যাই চলে, তবু মনে রেখো!
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায়
নব প্রেম-জালে।

সত্যেন্দ্র মুগ্ধ, তন্ময়···এমন ভালো গান সে কোনোদিন শোনে নাই···

পরী গাহিতেছিল—

যদি পড়িয়া মনে,
ছল-ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন-কোণে
তবু মনে রেখো।

চক্ষু মুদিয়া সত্যেন্দ্র মনে মনে বলিল—রাখিব! মনে রাখিব! চিরদিন মনে রাখিব!···

যবনিকা পড়িলে সত্যেন্দ্র আসিয়া লবিতে দাঁড়াইল। দলে-দলে লোক চলিয়াছে···পা বেঁধিয়া, ধাক্কা দিয়া, পায়ের উপর দিয়া···যেন ঢেউয়ের পরে ঢেউ চলিয়াছে! এবং শেষ-ঢেউ চলিয়া গেলে···

ঐ পরী···সঙ্গে আরো চারজন লোক···দুজন তরুণ পুরুষ···দুজন তরুণী···কথা কহিতে-কহিতে চলিয়াছে···পরীর হাতে রাশীকৃত ফুল··· সত্যেন্দ্র দাঁড়াইয়া দেখিল···

থিয়েটার ছাড়িয়া ক'জনে পথে চলিয়াছে···চৌরঙ্গীর দিকে।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে ক'জনে চেতনা-হারা···

পরীর হাত হইতে পথে কি ও পড়িল?···পরীর হুঁশ নাই! আহারো হুঁশ নাই···সত্যেন্দ্র ছুটিয়া পথে আসিল।

ব্যানিটি ব্যাগ!···তুলিয়া হাতে লইল, ভারী। ব্যাগ লইয়া সত্যেন্দ্র চলিল পরীর পিছনে···

কি বলিয়া ডাকিবে? কি বলিয়া দিবে? পিছন-পানে কেহ চাহিয়া দেখে না···ঘুরিয়া সে আসিল সামনে···ব্যাগটা দেখাইয়া কহিল—আপনার ব্যাগ!

বলিতে গিয়া কথাটা গেল ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া···

পরী দাঁড়াইল···চমকিয়া উঠিল। বলিল—আমার ব্যাগ · কোথায় পেলেন?

পরীর মুখে মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কম্পিত স্বরে সত্যেন্দ্র বলিল,—পথে পড়ে গিয়েছিল···

—ও···থ্যাঙ্কস···

ব্যাগ লইয়া পরী আর সত্যেন্দ্রর পানে চাহিল না, সঙ্গীদের উদ্দেশে বলিল—কোথায় গাড়ী রেখেছো চারুবা?

সঙ্গী বলিল—গ্রাণ্ড-হোটেলের সামনে!···

—বাবাঃ!···

ছোট্ট কথাটুকু বলিয়া পরী ঘোড় বাঁকিয়া চৌরঙ্গীর ফুটপাথে উঠিল।

মোড়ে দাঁড়াইয়া সত্যেন্দ্র রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিল···সে একলা ঘামিয়াছে !···

সত্যেন্দ্র গিয়া মাঠে বসিল। জ্যোৎস্নায় দিক ভরিয়া আছে। আকাশে মেঘ নাই···নক্ষত্র-সভায় হাসির ঝিকিমিকি···

সত্যেন্দ্র যেন স্বপ্ন দেখিতেছে ! সুরের স্বপ্ন ! জ্যোৎস্নায় সেই সুর··· জ্যোৎস্না গাহিতেছে—

তবু মনে রেখো···

যদি দূরে যাই চলে···মনে রেখো···

শুধু মনে রাখিবার জন্য করুণ-আকুল নিবেদন ! সত্যেন্দ্র গাহিল আপন-মনে—মনে রেখো···মনে রেখো···

মনে রাখিয়া লাভ ? একবার এই দেখা···জীবনে আর কখনো দেখা হইবে, সে আশা নাই ! কি করিয়া দেখিবে ? চেনে না, নাম জানে না···অসম্ভব।

সহরের পথে কলরব ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল···রাত্রি গভীর !···

সত্যেন্দ্র ভাবিল, পাগলের মতো এ সে কি ভাবিতেছে ! কোথাকার কে কিশোরী···! না···না···না ! মনকে বলিল—পাগল !

মন বলিল, কিন্তু চমৎকার। দেখিতে যেমন সুন্দর···তেমনি সুন্দর গানে গায় !

রাত্রে ঘুমের ঘোরে এম্পায়ারের সেই ষ্টেজ···স্বপ্ন-বায়ুতে ভরিয়া কতবার আসিয়া মনের উপরে চাপিয়া বসিল···ষ্টেজের উপরে আলোর পুতুল ! আর সে পাহাড়ের গা বহিয়া ঝরিতেছে সুরের নহর !

সকালে চিঠি পাইল। বাবা লিখিয়াছেন—

আমার ছুটী হইয়াছে। আমি কাল ষ্টার্ট করিয়া পরশু কলিকাতায় পৌঁছিব। পরের দিন বাহির হইব শিলঙ। তুমি প্রস্তুত থাকিবে।

ভালো···ভালো···সহরের এ ঘুরের হাওয়ায় এখন আর বাধা করা সম্ভব নয় ! পাগল হইয়া যাইবে।

বাবা নিত্যগোপাল বাবু লক্ষ্ণৌয়ের প্রোফেসর। বয়সে এত বড় বাঙালী পণ্ডিত স্যর প্রফুল্ল রায়ের পরে আর দেখা যায় নাই। দেশী পাহাড়-পাহড়া হইতে যে সব ঔষধ তৈয়ার করিয়াছেন, আর্মানী-আমেরিকা পর্য্যন্ত তাহের ভয়ে-জয়-জয় করিতেছে !

নিত্যগোপাল বাবু আসিলেন। বলিলেন,—তুমি আগে বেরিয়ে পড়ো। ছোটখাট একটা বাঙলো ঠিক করো গিয়ে···বেশ ভালো জায়গা দেখে ! দশ-বারো দিন পরে আমি যাবো···স্যর পি-সি রায়ের সঙ্গে একটা জরুরি পরামর্শ আছে। মনে, একটা খটকা লাগছে, তাই ওঁকে ধরে সে খটকার মীমাংসা করবো !

সত্যেন্দ্র একা চলিল শিলঙ। নলবাগ ফলের পিছনে বাঙলো মিলিল। ঘরে বসিয়া খোলা জানালা দিয়া পাহাড় দেখা যায়—বন-গিরি-নির্ঝর দেখা যায়।

আহার আর নিদ্রা—এ দুই কাজের জন্য বাঙলো। বাকী সারা সময়টা সত্যেন্দ্র ঘুরিয়া বেড়ায়। দৃশ্য-বৈচিত্র্যে কলিকাতার সেই সুর-পরীর ছায়া মাঝে মাঝে মিলাইয়া যায়···

সেদিন গিয়াছিল নংক্লের দিকে। দু-চারিটা ছোট পাহাড় ঘুরিয়া বাড়ীর পথে ফিরিতেছে, সহসা কানে বাজিল গানের কলি···

সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে

কে তারে বাঁধলো অকারণে !

এ গলা যেন বড় চেনা ! কে গায়···এ বন-গিরিতে ?

গানের সুর লক্ষ্য করিয়া সত্যেন্দ্র আসিল একটা ঝোপের কাছে··· একখানা বড় পাথর। তার উপরে বসিয়া···

সত্যেন্দ্র চমকিয়া উঠিল,···এ যে সেই পরী !···কোনো ভুল নাই। এ রূপ, এ-কণ্ঠ দুনিয়ায় আছে শুধু একজনের।···এবং সে-জন···

আবেগের উচ্ছ্বাসভরা সত্যেন্দ্র কহিল—আপনি এখানে !

পরীর গান থামিয়া গেল। ভ্রূকুটি-ভরা দৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রর পানে চাহিয়া পরী কহিল—আপনি ভুল করছেন !···আপনাকে আমি চিনি না।

সে-কণ্ঠে অমন ভুবন-ভুলানো সুর···এমন কঠিন বাঁধ সে কণ্ঠে !

সত্যেন্দ্র ভড়কাইয়া গেল।

পরী অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইল···

সত্যেন্দ্র কহিল—ক্ষমা করবেন।···কিন্তু আমার ভুল হয়নি। কিছুদিন আগে এম্পায়ারে আপনার গান শুনেছি···রবীন্দ্রনাথের সেই 'মনে রেখো' গান···

এ কথায় পরীর দৃষ্টি আবার এদিকে ফিরিল···সে দৃষ্টিতে সংশয়··· বিস্ময়···

সত্যেন্দ্র বলিল—হঠাৎ দূর থেকে গান শুনলুম···মনে হলো, সেই গলা···তাই এসেছিলুম···

পরী কহিল—তামাসা দেখতে !···কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন, এম্পায়ারে আমার গান শুনেছিলেন টাকা দিয়ে টিকিট কিনে···

সত্যেন্দ্র অবাক !

পরী কহিল—এখানে আমি কাকেও শোনাবার জন্য গান গাইচি না —এবং সে-গান শোনাতে টিকিট বেচতে বসিনি !···আমি গান গাইছি মনে বসে একা···কোনো ভদ্দর লোক যে আমার এ 'প্রাইভেসি'র মর্য্যাদা রক্ষা করবে না, এ কথা আমার মনে হয়নি···

কথায় রোষের ছিটা ! কথা বলিয়া পরী জুতা টানিয়া পায়ে দিল— দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সত্যেন্দ্রকে যেন সে চাবুক মারিল ! তেমনি যাতনা বহিয়া সে কহিল—আমাকে ক্ষমা করবেন। অতর্কিত কৌতূহল নিয়ে আমি এখানে আসিনি আপনার নির্জ্জন-বিশ্রামসুখে ব্যাঘাত দিতে !···আপনাকে কেতে হবে না···আপনি নিশ্চিন্ত মনে বসুন···আমিই চলে যাচ্ছি !···

পরী একবার কঠিন তন্নীতে সত্যেন্দ্রকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিল, পরে বলিল—এ আমার কেনা জায়গা নয়। আমার লুকিয়ে থাকা

আপনিই বা কেন এখান থেকে চলে গিয়ে স্বতন্ত্র থেকে যাবেন, বুঝি না !··· আর আপনাকে চলে যেতে বলবো আমার স্বার্থে···এমন অভদ্র আমি নই সত্যি···

এ কথার উত্তরের জন্য সত্যেন্দ্রকে কোনো সুযোগ না দিয়া পত্নী দ্রুত পায়ে সেখান হইতে চলিয়া গেল !

সত্যেন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিল···নিস্পন্দ···যেন কাঠের পুতুল !···

তারপর মনকে বাড়া দিয়ে বলিল, পত্নীর কথা ভুলিয়া যাও ! যাকে ভাবিতেছ, যদি—সে যদি নয়—অগ্নিশিখা !

সেদিন সত্যেন্দ্র ফিরিয়াছিল দিংগাই দিয়ে। পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া আসিতে দেখা আবার সেই পত্নীর সঙ্গে !

পত্নী চুপ করিয়া বসিয়া আছে—ওদিকে বহুদূরে হিমগিরির তুষারশির দেখা যাইতেছে···তাহারি পানে চাহিয়া।

পত্নীকে দেখিয়া সত্যেন্দ্র ফিরিল—বেটকরে একটা পাথরে হুঁচোট লাগিল। ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল অগভীর এক গহ্বরে।

পতনশব্দে পত্নী চাহিয়া দেখিল ; দেখিয়া উঠিয়া আসিল। সত্যেন্দ্র তখন গহ্বর ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছে।

অপাঙ্গদৃষ্টিতে হাসির মৃদু বিদ্যুৎ ছিটাইয়া পত্নী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

সত্যেন্দ্র বলিল—আমি আজ আপনার পথে আসিনি···আপনি এসেছেন !

—তার মানে ?

পত্নী ফিরিয়া চোখের অবিচল দৃষ্টি সত্যেন্দ্রর মুখে নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র কহিল,—মানে, আমি এখানে এসেছি বেলা দুটোয়। পাহাড়ের উপরে ছিলুম···এখন নেমে আসছিলুম।

পত্নী কহিল—আমায় দেখে ?

সত্যেন্দ্র কহিল—আপনাকে দেখলুম এখানে এসে।···কিন্তু একটা কথা না বলে' থাকতে পারছি না···

—বলুন···

—এ পথে একলা এসে ভালো করেন নি ! একটা পাগিয়া মদ খেয়ে দু'দিন আগে একজনকে মারধোর করে তার পয়সা-কড়ি আর তার স্ত্রীর গয়না কেড়ে নিয়েছে।

পত্নী কহিল—আমি একলা আসিনি !

ও !

সত্যেন্দ্রর বুকের উপরে কে যেন মুগুর মারিল !···তাহা হইলে···

সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল !

পত্নী কহিল—আপনি পড়ে গেছলেন···হাঁটুর নীচে কেটে গেছে, দেখছি।

হাঁটুর নীচে আলা করিতেছিল—এতক্ষণে সত্যেন্দ্রর হুঁশ হইল। চাহিয়া দেখিল, খানিকটা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

সত্যেন্দ্র কহিল—ও কিছু নয়···

পাহাড়ের গা বহিয়া ছোট নিঝর-রেখা···

সত্যেন্দ্র এ-কথায় 'না' বলিতে পারিল না। জল লইয়া ক্ষত ধুইল।

পত্নী কহিল—আপনি শিলঙে থাকেন ?

—না। বেড়াতে এসেছি।···আপনিও বোধ হয় বেড়াতে এসেছেন ?

পত্নী কহিল—হ্যাঁ।···

তারপর সে চাহিল পাশে পাহাড়ের পানে, কহিল—আপনি পাহাড়ে চড়েছিলেন ?

মাথা নাড়িয়া সত্যেন্দ্র জানাইল, হাঁ।

পত্নী কহিল—আমিও চড়বো ভেবেছিলুম···কিন্তু একা···সাহস হলো না।

সত্যেন্দ্র কহিল—আপনি যে বললেন, একা এসেছেন···

সত্যেন্দ্রর মুখে-চোখে কৌতুকের মৃদু হাসি।

পত্নী ঘলিয়া উঠিল, কহিল—ঠেরা করছেন !···না, আমি একলা আসিনি। এসেছি বিশুদার সঙ্গে···বিশুদা গেছে একজোড়া জুতোর সন্ধানে। নাগরা-পায়ে দিয়ে পাহাড়ে ওঠা উচিত নয়। ওদিকে শাশিলা-বস্তীতে জুতো পাওয়া যায়। বিশুদা বললে তাই একজোড়া কিনতে গেছে···একপাটি নাগরা দিয়ে গেছে বিশুদা···দেখছেন না একপাটি নাগরা এখানে পড়ে আছে ?

পত্নীর পায়ের পানে সত্যেন্দ্র চাহিয়া দেখে নাই—এখন চাহিল। পদ্মের মতো পা···পায়ের তলা অলক্ত রাগ রাঙানো !

সত্যেন্দ্র কহিল—আপনি পায়ে আলতা দেন !

পত্নী কহিল—কেন দেবো না বলতে পারেন ? আমি বাঙালীর মেয়ে···খিরিস্তি নই।

সত্যেন্দ্র কহিল—যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

—করতে পারেন। তার জবাব দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা···

সত্যেন্দ্র কহিল—মানে, আপনি নব সময়ে আমার উপর এত রাগ করেন কেন ? আমি আপনার সঙ্গে কোনো অশিষ্ট বা অভদ্র আচরণ করেছি বলে' তো মনে পড়ে না। বরং···

পত্নীর চাহনিতে বক্র ভাবের আভাস···দেখিয়া সত্যেন্দ্র চুপ করিল।

পত্নী কহিল—বলুন কথাটা শেষ করুন···থামলেন কেন ?

সত্যেন্দ্র কহিল—আপনি যে রাগ করছেন···

পত্নী কহিল—ও আমার স্বভাব। খুশী হলেও আমি সময়ে-সময়ে রাগ করি···

সত্যেন্দ্র কহিল—তারী আশ্চর্য স্বভাব তো আপনার !

পত্নী কহিল—আমার সমালোচনা করবেন না···কি বলবার আছে, বলুন···আমি আর বেশীক্ষণ এখানে থাকবো না···বেলা পড়ে আসছে··· বাড়ী ফিরতে হবে···

সত্যেন্দ্র কহিল—আপনার বিশুদা এলে তবে তো ফিরবেন···

পত্নী কহিল—আপনাকে সব কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কি ?···

না, আমি যদি বিশুদা কিরে আসার আগেই ফিরি—আপনি যাবা দিতে পারেন ?

সত্যেন্দ্র কহিল—কিন্তু ঐ একপাটি জুতো পায়ে দিয়ে···?

পত্নীর মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিল···কথায় তুলিয়া পত্নী কহিল, যদি শুধু পায়েই ফিরি, কি করতে পারেন আপনি ?

কথার সঙ্গে সঙ্গে নাগরার পাটি হাতে তুলিয়া পত্নী বেটা দখলে নিক্ষেপ করিল পাহাড়ের দিকে···

সত্যেন্দ্র অপ্রতিভ হইল, কহিল—বেশচি, আমার সঙ্গে আপনার কুকণে দেখা···আমার জন্ত এ লোকসান করবেন, আমি তা সহ্য করবো না···এতে আপনি যত রাগই করুন···

এই কথা বলিয়া সত্যেন্দ্র চলিল নাগরা কুড়াইবার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের দিকে।

নাগরা লইয়া ফিরিবার সময় দেখে, আর একপাটি নাগরা পথে পড়িয়া আছে—চলার বেগেই খুলিয়া গিয়াছে। সে পাটি কুড়াইয়া দু'পাটি মিলাইয়া দেখিল···ঠিকই বটে !

সত্যেন্দ্র চাহিল পত্নীর পানে···পত্নী এই দিকেই চাহিয়াছিল···

সত্যেন্দ্র এদিকে আসিতেছে দেখিয়া পত্নী ছুটিল···শুধু-পায়ে মুড়ি-কাঙরের উপর দিয়া···

সত্যেন্দ্র কহিল—ছুটবেন না···পথ ভালো নয়।

সে কথা কে শোনে ? কাজেই সত্যেন্দ্রকেও ছুটিতে হইল।···

উঁচু-নীচু পথ—মুড়ি-কাঁকর-কাঁটায়-জঙ্গলে ভরা···

পত্নী পারিল না···পায়ে কাঁটা ফুটিল। 'উঃ' বলিয়া সে বসিয়া পড়িল মাটির উপরে ডান-পা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া···

সত্যেন্দ্র কাছে আসিল, কহিল—পায়ে লাগলো তো ! শুধু-পায়ে অভ্যাস নেই···

পত্নী কথা কহিল না···পায়ের পানে চাহিয়া মাথা নামাইল।

সত্যেন্দ্র কহিল,—দেখি,···আমাকে দেখতে দিন···

পত্নী কহিল, আপনার জন্তেই তো হলো···

—আমার জন্ত ! সত্যেন্দ্রের স্বরে বিস্ময়···এবং সঙ্কোচ।

পত্নী কহিল,—নিশ্চয়।···আপনি আমায় মিথ্যাবাদী ভেবেছেন তো···

সত্যেন্দ্র কোনো কথা কহিল না···চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি···সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল···

তার পর কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কোনো কথা নাই। পত্নী শেষে এ নীরবতা ভঙ্গ করিল, বলিল,—পায়ে কাঁটা ফুটেছে···বড় বড় কাঁটা···

সত্যেন্দ্র কহিল,—তাইতো বলছি, আমায় দেখতে দিন···তুলে দিতে পারবো···

সঙ্কিত দৃষ্টিতে পত্নী চাহিল সত্যেন্দ্রর পানে···

সত্যেন্দ্র কহিল,—ও বিদ্যা আমি জানি···ছ'বছর মেডিকেল কলেজে পড়েছি···

পত্নী কহিল,—আপনি ডাক্তার ?

তার স্বরে বিস্ময়ের রাশি !

সত্যেন্দ্র কহিল,—হ্যাঁ···

দু'চোখে শ্রদ্ধা···পত্নী কহিল,—আমি ভেবেছিনু···

—কি ভেবেছিলেন ?

লজ্জায় পত্নী মুখ নামাইল···মুখে ফুটিল রক্ত গোলাপ। সত্যেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিল।

পত্নী বলিল—না, আমি তা বলবো না···

সত্যেন্দ্র বলিল—বেশ, ইচ্ছা না হয়, বলবেন না···কিন্তু পা দেখতে দিন আমায়···বেলা পড়ে আসছে। হেঁটে ফেরা ভিন্ন উপায় নেই··· অন্তত: ঐ খানিকা যতটা পারা যায়···

পা মেলিয়া দিতে হইল···সত্যেন্দ্র পা ধরিয়া কাঁটা তুলিয়া দিল···

তার সারা অঙ্গে বিদ্যুতের প্রবাহ···পত্নী লজ্জায় এতটুকু !

কাঁটা বাহির হইল···এত বড় কাঁটা ! কাঁটাটা সত্যেন্দ্র ভালো করিয়া দেখিল। দেখিয়া বলিল—বেশ বড় কাঁটা···

বলিয়া কাঁটাটা রাখিল জামার পকেটে···

পত্নী কহিল,—ও কি ! গায়ে ফুটে যাবে যে···ডাক্তার ফুল' কাঁটা তার কোটোরের ধর্ম ছাড়বে না তো···

সত্যেন্দ্র কহিল,—এটা রেখে দেবো···স্মৃতি ! এখন চলুন···পারবেন চলতে ? না, আমি হাত ধরবো ?

ক্ষিপ্র স্বরে পত্নী কহিল—না, না, হাঁটতে খুব পারবো···

সত্যেন্দ্র কহিল—বিশুবার জন্ত দাঁড়াবেন না ?

পত্নী কোনো কথা কহিল না, মৃদু হাস্যে অন্ত দিকে চাহিল।···

দুজনে চলিল···অস্তসূর্য্যের আভায় চারিদিক লালে লাল···কাহারো মুখে কথা নাই !

পত্নী কহিল,—কথা কইচেন না যে ?

—না। একটা গল্প মনে পড়ছে···

—কি গল্প ?

—Androcles and the Lionএর গল্প···নিশ্চয় সে গল্প পড়েছেন ! এ্যাণ্ড্রোক্লিস ছিল কাফ্রী দাস, আর এক সিংহের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল···

পত্নী কহিল,—রেখে দিন আপনার পচা গল্প···ভালো কথা, আপনার নাম ?

সত্যেন্দ্র কহিল,—সত্যেন ব্যানার্জী !

—এখানে কোথায় আছেন ?

—'শান্তি-আবাসে'।

—ও···ঐ মস্ত বড় বাড়ীর কাছে ?

—হ্যাঁ।

—ও-বাড়ী না ভাড়া নিয়েছেন প্রোফেসার এন্ ব্যানার্জী ? শুনেছি···

সত্যেন্দ্র কহিল,—হ্যাঁ। প্রোফেসার নগেন্দ্র ব্যানার্জী। তিনি আমার বাবা···

—আপনি নগেন বাবুর ছেলে !

—আমার বাবাকে আপনি চেনেন ?

—কে না তাঁর নাম জানে ! অত বড় পণ্ডিত-লোকে···

পাশিগ্রা বস্তীতে একটা ডুলি মিলিল। পত্নী ডুলিতে চড়িল··· বলিল, ধন্যবাদ···আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি যেতে পারবো এখন···

আশ্চর্য মেয়ে ! সেই কাল চুকিল, অমনি প্রস্থান !

সত্যেন্দ্র ভাবিল, যাও তুমি ! ভাবিলো না, দীন-আতুরের মতো তোমার পিছনে গিরির তোমার কৃপা চাহিয়া ! জানি···তোমার মতো মেয়েরা···গর্বে-অহঙ্কারে সারাক্ষণ মন ভরিয়া আছে ! তুমি···তুমি···

মনের উচ্ছ্বাস মনে মরিয়া মনেই মিলাইয়া গেল···সত্যেন্দ্রধীরে ধীরে ঘুরে ফিরিল···

টেলিগ্রাম আসিয়াছে। বাবা তার করিয়াছেন, দু-একদিনের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবেন···

বাবা প্রোফেসার এন্ ব্যানার্জী আসিলেন।···

এবং···

দুদিন পরে সন্ধ্যার সময় বাবা ডাকিলেন—সতু···

সতু ওরফে সত্যেন্দ্র আসিল। বাবা বলিলেন,—এই ছুটিতে ঠিক করেছি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলবো। জানো তো, আমার বন্ধু গুষ্টর চ্যাটার্জী···শিলঙ হাসপাতালে আছেন···তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, এ আমাদের অনেকদিনের বাসনা। সেইজন্যই শিলঙে ছুটী কাটানোর ব্যবস্থা করেছি···

সত্যেন্দ্র কহিল—কিন্তু আমার একটু নিবেদন ছিল···

বাবা বলিলেন,—জানি, একালের ছেলের বিয়ের ব্যাপারে কি নিবেদন হতে পারে ! তুমি বলবে, আমি বিয়ে করবো আমাদের কলেজে পড়ে যিনি শান্তি সেন···না হয় ব্যারিষ্টার মিষ্টার রায়ের মেয়ে ডলি,···কি বলো···দীপ্তি···সাহারা ? কি শ্রেটা গার্ভো, নর্মা শীয়ারার ! ও-সব নিবেদন আমি শুনবো না, জেনে রেখো। আমার এক কথা···যেদিন তিনি গেছেন···সেদিন থেকে তোমাকে নিয়ে পড়ে আছি···চ্যাটার্জীরও ঠিক আমার দশা। সেও উইডোয়ার আর তার ঐ এক মেয়ে পুঁটু··· লেখাপড়া শিখেছো···বাপের কথা অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না।···

সত্যেন্দ্র নিঃশব্দে সব কথা শুনিল···জবাব দিল না।

বাবা বলিলেন,—চ্যাটার্জী আজ তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন···সন্ধ্যার সময় যাবে তাঁর ওখানে। আমি আজ যেতে পারবো না···ক্লান্ত ! এ-কথা তাঁকে তুমি বলো···চ্যাটার্জী থাকেন পাইন মাউন্টের কাছে 'গিরি-নিবাসে'। 'পাইন-মাউন্ট' জানো ?

—জানি।

—বেশ। আজ সন্ধ্যাবেলায় যাবে···বুঝলে !

মাথা নাড়িয়া সত্যেন্দ্র জানাইল, বুঝিয়াছে !

যাইতে হইল···যেন কারাবাসে চলিয়াছে, এমনি ভারী মন লইয়া।

এবং···

কিন্তু কেন ? ঐ তো রহিয়া কিশোরী ! কিসের লোভে মন এমন বিষিয়া হয় ! এ দুর্বলতা অনুচিত !

মনের উদ্বাস ভাব তবু কাটে না···

এবং এমনি উদাস মন লইয়া সে আসিয়া দাঁড়াইল গিরি-নিবাসের ফটকের সামনে। বাগান-ঘেরা ছবির-মতো বাড়ী। বাঁধা পাইনের ফাঁকে ফাঁকে নানা জাতের ফুলের ঝোপ-ঝাড়···চমৎকার সাজানো।

সূর্য অস্ত গিয়াছে। তার রশ্মিটা তখনো পৃথিবীর অঙ্গ হইতে মিলাইয়া অদৃশ্য হয় নাই !

ফটকের সামনে সত্যেন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিল নির্বাক নিস্পন্দ···অনেক ক্ষণ। চারিদিক নিবিড় নিস্তব্ধতায় ঘেরা।

সে স্তব্ধতা চিরিয়া সহসা আসিল গানের লহর ! সেই কণ্ঠ··· গাহিতেছিল—

আলো-ঝলমল পূর্ণিমারি জোছনা রাতে
সারা নিশি জাগি ছিনু ফুলবনে—
সে ছিল সাথে—
জোছনা রাতে !···

সুরের মায়ায় একপা একপা করিয়া ফটক পার হইয়া সত্যেন্দ্র কখন বাগানে আসিয়াছে, খেয়াল ছিল না।

সে শুধু ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে···সুরের আকর্ষণে···

এবারে গান শুনিল খুব কাছে···

নয়নে কে যেন বুলালো স্বপন—আমার ভুলি !
এখন প্রেমের মধুমঞ্জরী গো—উঠিছে দুলি !

স্বপ্নমোহে সত্যেন্দ্র চেতনাহারা···

চেতনা জাগিল ছোট একটি প্রশ্নে,—কে ?

চমকিয়া সত্যেন্দ্র চাহিয়া দেখে, পত্নী ! সামনে !···তার গান থামিয়া গিয়াছে।

পত্নী কহিল—ডাক্তারবাবু যে ! আমার পায়ের ধুলো নিতে, নিশ্চয় ?

সত্যেন্দ্রর বিস্ময়ের সীমা নাই···

বিস্ময়ের ঘোর কাটিলে একটি সুমধুর সম্ভাবনার আশায় মন ভরিয়া উঠিল। সত্যেন্দ্র কহিল—এইটে না গিরি-নিবাস ?

পত্নী কহিল—হ্যাঁ।

সত্যেন্দ্র কহিল—ডক্টর চ্যাটার্জী এখানে থাকেন ?

—থাকেন।

সত্যেন্দ্র কহিল—তাঁর মেয়ে পুঁটু এ-বাড়ীতে থাকেন ?

পত্নী কহিল—পুঁটু বলে কেউ থাকে না এখানে।

আবার বিস্ময় ! সত্যেন্দ্র কহিল—তাঁর মেয়ে ? ঐ একটিই মেয়ে তাঁর এবং সে মেয়ের নাম পুঁটু···

পত্নী কহিল—এবং সে-নাম বহ্নির মোদ পেয়েছে এবং খুঁটি এখন খুঁটি নয় এবং সে এখন শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না দেবী !···

একটু পরে উইং চাটার্জীর সঙ্গে কথা হইতেছিল সন্তোষ ব্যানার্জীর।

আজ সন্ধ্যায় আসিয়াছে, সন্তোষ ফাইনাল এম-বি পাশ করিয়াছে···সসম্মানে।

উইং চাটার্জী। তোমার বাবার সঙ্গে এ কথা হয়ে আছে বহু বৎসর আগের···

সন্তোষ। বাবা তাই বলেছিলেন ?

উইং চাটার্জী। জ্যোৎস্নার সঙ্গে তোমার জানাশোনা হয়েছে, শুনেছি···accidentally.

সন্তোষ। আজ্ঞে হাঁ।

উইং চাটার্জী। এবং তোমার বাবা আর আমি ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েছি এক-স্কুলে সেই সাবেকী নাইনস্ ক্লাশ থেকে—

সন্তোষ। আজ্ঞে, আমি শুনেছি···

উইং চাটার্জী। এবং তোমার বাবা কাজ হয়েছেন···আমিও কম কাজ নই। কি জানো, বয়স হয়েছে তো···

সন্তোষ। আজ্ঞে হাঁ···

দেড় মাস পরের কথা।

সন্তোষ আর জ্যোৎস্না বসিয়া কথা কহিতেছিল।

সন্তোষ। এবং তুমি আমাকে চিনতে ?

জ্যোৎস্না। নিশ্চয়। যেদিন এম্পায়ারের সামনে ভ্যানিটি-ব্যাগ কুড়িয়ে এনে হাতে দিলে—তোমার পাশে চেয়েই চিনেছিলুম, তুমি কে ! তোমার ছবি দেখেছি তো···আমাদের ঘরে ছবি ছিল···বাবার বন্ধুর ছেলে···এবং সে ছেলের হাতে বাবা তাঁর মেয়েকে সম্প্রদান করবেন, এ কথা আমাদের বাড়ী কারো অজানা ছিল না।

সন্তোষ। তবু আমাকে কোনোদিন পরিচয় দাওনি ?

জ্যোৎস্না। না। মজা দেখতুম।

সন্তোষ। কিন্তু শিলঙে···

জ্যোৎস্না। বাবা শিলঙে থাকেন। আমি গিয়েছিলুম কলকাতায় মাসিমার গুখানে। ওরা ধরলে, চারিটি-পেতে একটা গান গাইবার জন্য। আমার মাসতুতো-ভাই বিভূতি ছিল চারিটি-কবিটির একজন মেম্বার।

সন্তোষ। এবং শিলঙে আমার আসবার কথা···

জ্যোৎস্না। আমি জানতুম। বাবা বলেছিলেন, তোমার এগজামিন চুকেছে। প্রোফেসার ব্যানার্জী ছুটী নিয়ে তোমাকে সঙ্গে করে শিলঙে আসবেন; এবং কিছুদিন থাকবেন—থেকে ফিরে বাবার কুরুবেন।···বাবাই তো ঐ 'আরাম নিবাস' বাড়ীটা ঠিক করে জান তোমাদের জন্য !

সন্তোষ। তুমি তো কম মেয়ে নও ! এত কথা জেনে···

জ্যোৎস্না। (সলজ্জে) না হলে পরের কাঁটা তুলতে পথের লোককে পা বাড়িয়ে দেবো—এ বিশ্বাস তোমার হলো কি করে ?···তোমার সঙ্গে অত যে কৌতুক করেছিলুম, তোমার পরিচয় না জানা থাকলে তোমার পানে ফিরেও তাকাতুম না মশাই···প্রগতি-যুগ হলে কি হবে, বাঙালীর ঘরের মেয়ে তো···গল্প-উপন্যাসের নায়িকা নই !

কথা এইখানে বন্ধ হইল···সন্তোষ লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; অধর দিয়া জ্যোৎস্নার অধর চাকিয়া দিল।

কুয়াশা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল-চৌধুরী

রাত্রি শেষ, তবু হায় দিনের প্রকাশ নাহি হয়।
পৃথিবীর চারিদিকে কুয়াশার ঘন আবরণ,
প্রকৃতি স্তম্ভিত প্রাণ দাঁড়াইয়া প্রেতের মতন,
মানুষ লভিতে নারে মানুষের কোনো পরিচয়।
আলোর ধরণী আজ ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারময়,
মানুষের দেহমন তন্দ্রালস তমিস্রা-মগন;
অনন্ত সৃষ্টিরে ঘিরি' ওঠে শুধু নীরব ক্রন্দন
আলোর পরশ লাগি। দাও দীপ্তি ওগো জ্যোতির্ময়।
কোথা সূর্য্য, জাগো জাগো; হানো এই মায়া কুজ্ঝটিকা।
কুয়াশা তো সত্য নয়, সত্য সেই সুন্দর আকাশ;
দূর কর কুয়াশার মিথ্যাময় জীর্ণ যবনিকা,
মানুষ দেখিতে পাক্ দেহ মন আত্মার প্রকাশ।

মানুষের পরিচয় মানুষের সাথে, সত্য আজি হোক্,
অন্তরে বাহিরে তার উৎসারিত হোক্ সূর্য্যালোক।

বাঙ্গালী সৈন্যদল

শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ বি-এ

ব্রহ্ম

বঙ্গবাসীদিগকে অবসর সময়ে সামরিক শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় ১১/১৯ হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্ট্ নামক ভারতীয় সার্ব্বভৌম সৈন্যদলের, (Indian Territorial Force) একটী শাখা স্থাপিত হইয়াছিল।

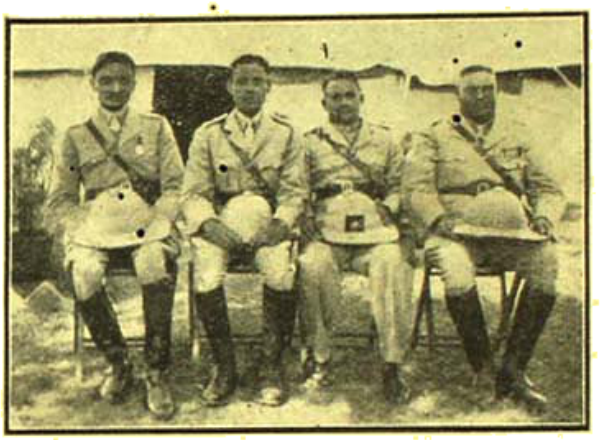

অফিসারগণ—বামদিক হইতে—ক্যাঃ এস, সি, চৌধুরী, লেঃ বি, বি, সরকার, ক্যাঃ ডি, মিত্র ও লেঃ বি কে বসু

কিন্তু প্রয়োজনমত স্বাস্থ্যবান এবং শিক্ষিত ব্যক্তির অভাবে উক্ত রেজিমেণ্ট ভাঙ্গিয়া যায়; কারণ রুগ্ন এবং নিরক্ষর সৈন্য লইয়া স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর কার্য্য যথোপযুক্তরূপে সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব নয়। ঐ সৈন্যদলটী উঠিয়া যাইবার পরে ক্যাপ্টেন্ এস সি চৌধুরীর ঐকান্তিক চেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের নিমিত্ত পঞ্চম বঙ্গীয় পৌর পদাতিক সৈন্যদল (5th Bengal Presidency Urbun Infantry) নামক একটী সৈন্যদল গত বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষিত সমাজকে সামরিক শিক্ষার অভূতপূর্ব্ব সুযোগ ও সুবিধা দানের ব্যবস্থা করিয়া ক্যাঃ চৌধুরী বাঙ্গালী জাতির যে মহোপকার করিলেন তজ্জন্য জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে।

এখন প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের কর্ত্তব্য কালবিলম্ব না করিয়া এই সৈন্যদলভুক্ত হওয়া এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সামরিক শিক্ষা লাভ করা। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে অন্য জাতির কবল হইতে মাতৃভূমিকে রক্ষা করিতে হইলে চাই যথোপযুক্ত সামরিক শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন হইবে এই নবগঠিত ও নবভাবে উদ্দীপ্ত বাঙ্গালী সৈন্যদলে।

প্রথমবারে যে সকল ব্যক্তি এই দলভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের দর্শন করিয়া ক্যাঃ চৌধুরী ও তাঁহার সহকারী অফিসারগণ বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়; কারণ বহু ইঞ্জিনিয়র, উকিল, ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন কেরাণী, শিক্ষক এবং বেকার আসিয়া উত্তমরূপে দলপুষ্ট করিয়াছেন। নূতন ব্যক্তিগণকে দলভুক্ত করিবার সময় লেপ্টন্যাণ্ট্ বি বি সরকার যেরূপ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়। তাঁহার নিঃস্বার্থ পরিশ্রম কতক পরিমাণে সফলতা আনয়ন করিয়াছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে অধিকসংখ্যক নূতন ব্যক্তি স্বেচ্ছায়

লেঃ বি কে বসু ব্যাটালিয়ন হাবিলদার মেজর ও কোয়ার্টার মাষ্টার এবং 'বি' কোম্পানীর সমস্তবিহীন অফিসারগণ

আসিয়া দলভুক্ত হইয়া সঙ্ঘের সৈন্যদলটীকে বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে রাখিবার সহায়তা করিবে।

দলভুক্ত নূতন ব্যক্তিগণকে লইয়া কলিকাতায় এলেন্‌বরা ময়দানে গত বড়দিনের অবকাশের প্রথম দিন হইতে ৯ই জানুয়ারী (১৯৩৮) পর্য্যন্ত প্রথম শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সর্ব্বশুদ্ধ চারিজন অফিসার এই শিবিরের কার্য্যাবলী পরিচালনা করেন। ক্যাঃ এস সি চৌধুরী ছিলেন অফিসার কমাণ্ডিং। লেঃ বি বি সরকার ছিলেন 'এ' কোম্পানী কমাণ্ডার এবং লেঃ বি কে বসু ছিলেন 'বি' কোম্পানী কমাণ্ডার। চিকিৎসা বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিতেন ক্যাঃ ডি মিত্র।

২৪শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) সকালে বাঙ্গালী বাবুর দল একটি করিয়া ছোট সুট্‌কেশ এবং সামান্য বিছানা লইয়া শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সকলের বক্ষে ছিল নবীন আশা এবং মুখে ছিল আনন্দের ভাষা। পরস্পর পরস্পরের সহিত যখন আলাপ করিতে ব্যস্ত তখন হঠাৎ বংশীধ্বনি করিয়া আদেশ হইল - ফল্ ইন্ (fall in)। তৎক্ষণাৎ যিনি যেমনভাবে পারিলেন সুবিধামত আঁকাবাঁকা লাইনের

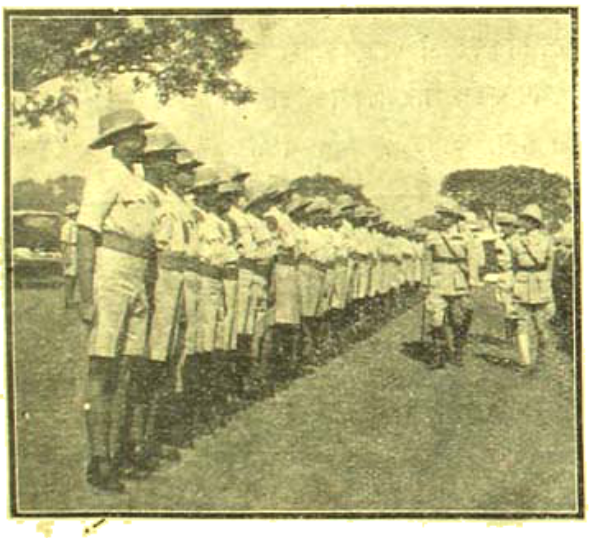

ডি—ও—সি মেজর জেনারেল নিওলে সৈন্যদলকে পরিদর্শন করিতেছেন

মধ্যে একটু স্থান করিয়া লইলেন। কে একজন মিহি সুরে গাহিতে আরম্ভ করিলেন—

ওরে তোরা পালা রে ভাই পালা,
একটু পরে বুঝবি ওরে মিলিটারীর জ্বালা···

সুরটী শেষ না হইতে কর্ণে প্রবেশ করিল তীব্র আদেশ —এখনই গান বন্ধ কর। তৎক্ষণাৎ তিনি নিস্তব্ধ হইলেন।

অতঃপর গুদাম হইতে প্রত্যেকে একখানি সতরঞ্চি, ২খানি কম্বল, একটী এনামেলের থালা ও মগ্ লইয়া কম্প-

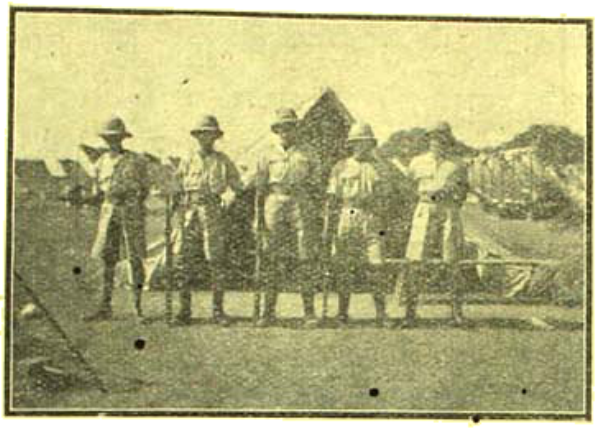

কোয়ার্টার গার্ডের সম্মুখে প্রহরীগণ

কর্ত্তাদের নির্দ্দেশমত তাঁবুর মধ্যে আপন আপন স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলেন। পোষাক-পরিচ্ছদও (Uniform) যথা সময়ে পাওয়া গেল। সন্ধ্যার সময় প্রত্যেক তাঁবুর জন্য একটী করিয়া হ্যারিকেন্ আলো মিলিল।

যদিও প্রথম দিন বিশেষ পরিশ্রম হয় নাই তথাপি অসংখ্যবার আদেশের উপর আদেশ আসিয়া সদ্যের সৈনিক-গণের মনের কোণে যে একটু ভীতির সঞ্চার করে নাই তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। নৈশভোজনের পরে বংশীধ্বনির সঙ্কেতে আলোক নির্ব্বাপিত হইবামাত্র কোলাহলমুখরিত এত বড় শিবির একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। কেবল মাঝে মাঝে দূর হইতে ট্রাম এবং মোটরের শব্দ আসিয়া নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গেল। পরদিনের কঠিন কার্য্যতালিকা মনকে আলোড়ন করিতে আরম্ভ করিলে নিদ্রাদেবী আসিয়া সকল চিন্তার অবসান করিলেন।

প্রয়োজন মত সামান্য পরিবর্ত্তিত হইলেও সাধারণত দৈনিক কার্য্যতালিকা ছিল :—

শয্যাত্যাগ	৫টা ৩০ মিঃ
প্রাতঃকালীন চা	৬টা
ফিজিক্যাল্ ট্রেণিং ···	৬টা ৩০ মিঃ হইতে ৭টা
পোষাক পরিধান	৭টা হইতে ৭টা ৩০ মিঃ

প্যারেড্	৭টা ৩০ মিঃ হইতে ৮টা ৩০ মিঃ
প্রাতঃরাশ	৮টা ৩০ মিঃ হইতে ৯টা ১৫ মিঃ
প্যারেড্	৯টা ১৫ মিঃ হইতে ১২টা ১৫ মিঃ
মধ্যাহ্ন ভোজন	১টা ১৫ মিঃ

শিবিরের চিকিৎসা বিভাগ

প্যারেড্	৩টা হইতে ৪টা ১৫ মিঃ
আমোদ-প্রমোদ	৬টা হইতে ৭টা ৪৫ মিঃ
নৈশভোজন	৮টা
হাজিরা গ্রহণ	৯টা ১৫ মিঃ
লাষ্ট্ পোষ্ট্	৯টা ৪৫ মিঃ
আলোক নির্ব্বাণ ...	১০টা

২৫শে ডিসেম্বর অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগের আদেশ শুনিয়া বাবুর দল সত্যই একটু 'কাবু' হইয়া পড়িলেন। গতকল্য পর্য্যন্ত দারুণ শীতের জন্য যাঁহারা বাটীতে আটটার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতে পারেন নাই তাঁহারা কি-না এই উন্মুক্ত ময়দানে কম্বলের ভিতর হইতে বাহিরে আসিবেন! ঠাণ্ডা বাতাসের প্রবল বেগ যেন অস্থি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দেয়! কিন্তু উপায় নাই। বাধ্য হইয়া আদেশ পালন করিতে হইল।

হাপ্প্যাণ্ট্ এবং গেঞ্জি সম্বল করিয়া ফিজিক্যাল ট্রেনিং-এর নিমিত্ত সকলে বাহির হইয়া পড়িলেন। কুয়াশায় ময়দান সমাচ্ছন্ন। অদূরস্থিত বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপ অন্ধকার ভেদ করিয়া যখন সকলে ছুটিয়া চলিলেন তখন কয়েকজন গাহিতে লাগিলেন—

উষার দুয়ারে হানি আঘাত,
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল···ইত্যাদি।

দ্বিপ্রহরে প্যারেড্ শেষ হইবামাত্র কেহ কেহ ভূমিশয্যার উপর লম্বা হইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কেহ বলিলেন, 'এত খাটুনি, আগে জানলে কি আর আসতুম!' আবার কেহ বলিলেন, 'হায় রে, একদিনেই চেহারাখানা অর্দ্ধেক হ'য়ে গেল!' অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু বলিলেন, 'দাদা, ভয় পাবেন না—শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়'। সহানুভূতি পাইয়া প্রাণে যেন নূতন শক্তির সঞ্চার হইল।

সন্ধ্যার আলোক জ্বালিবার পরে দেখা গেল, হ্যারিকেনে তৈল গরম করিয়া কেহ পায়ে মালিশ করিতেছেন, কেহ বা বালির পুঁটুলি গরম করিয়া সেঁক লাগাইতেছেন, আবার কেহ বা বুটের ঘর্ষণের ফলে ফোস্কা লইয়া হা-হুতাশ করিতেছেন। প্রথম প্রথম কষ্ট অনেকেরই ভোগ করিতে হইয়াছে।

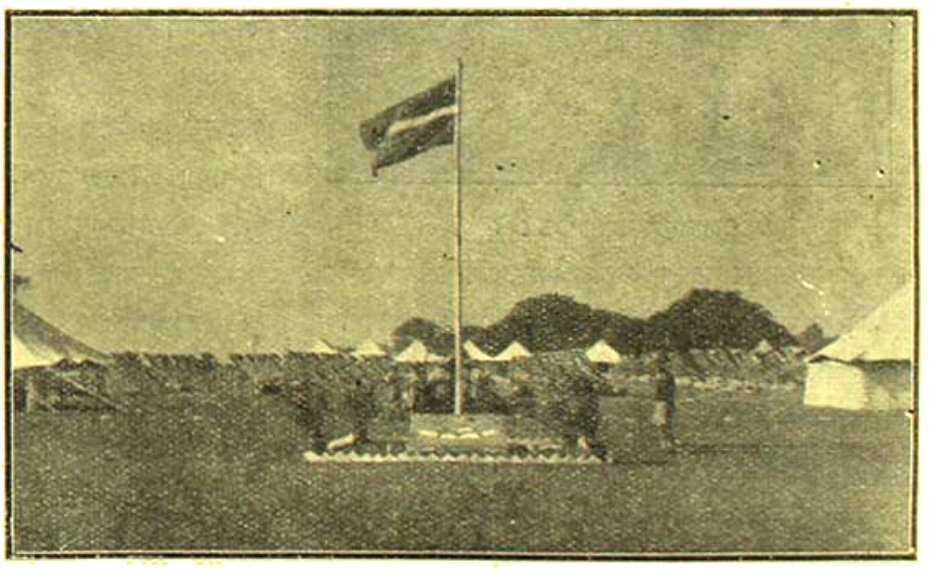

শিবিরের সম্মুখে উড্ডীয়মান পতাকা

ক্রমে কঠিন পরিশ্রম সহ্য হইয়া আসিয়াছিল। তবে যেদিন প্রথম রাইফেল্ (Rifle) লইয়া প্যারেড্ হইল, সে দিন পুনরায় অনেকে কষ্ট বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে শরীরের জড়তা পুনরায় কাটিয়া গেল এবং কার্য্যতালিকা অনুসারে নির্দ্দিবাদে কার্য্য করা অভ্যাসগত হইয়া পড়িল।

উভয় কোম্পানীর হাবিলদার-মেজর নিজ নিজ কোম্পানীর শিক্ষার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা সত্যই উল্লেখযোগ্য। 'বি' কোম্পানীর হাবিলদার-মেজর

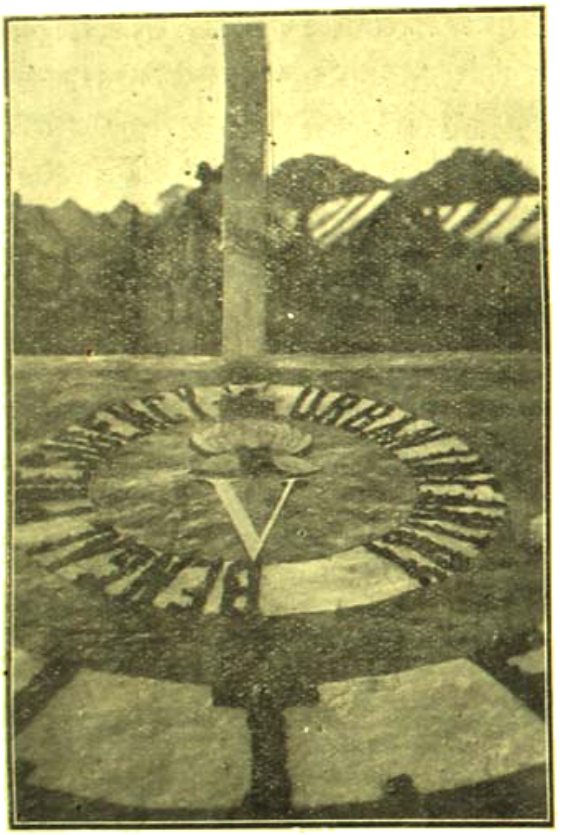

পতাকামূলে পদশোভিত কৌ

বি ব্রহ্ম প্যারেডের সময় যেরূপ কঠিনরূপে পরিশ্রম করাইয়াছেন, অবসর সময়ে তেমনি বিভিন্ন তাঁবুতে গমন করিয়া স্বাস্থ্য, সুবিধা-অসুবিধার সংবাদ লইয়া বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। প্যারেডের সময় তিনি যেমন কঠিন এবং কঠোর, অবকাশ সময়ে তিনি তেমনি অমায়িক এবং মধুর।

প্রত্যহ রাত্রিশেষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুগায়ক পরমেশ পাঞ্জুলীর সুললিত কণ্ঠে মধুর সুর বাজিয়া উঠিত। তিনি যেন ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতেন—

কে বলে তোমায় কাঙালিনী ওমা আমার ভারত রাণী।
তোমার মহিমা বিভব গরিমা কি কব মা নাহি জানি॥
নাই বা পরিলে হেমহার গলে মণি মুকুতার মালা,
নাই বা শোভিল চরণে তোমার সোনার বরণ ডালা;
জীর্ণ কুটীরে ছিন্ন বসনে তবু তুমি রাজরাণী···ইত্যাদি।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পরে নানারূপ আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত করা হইত। এ বিষয়ে আয়োজন এবং পরিবেশন করিতে ব্যাটালিয়ন্ হাবিলদার মেজর এস ব্যানার্জ্জি ছিলেন সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ। তাঁহার সুমিষ্ট ভাষা এবং অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় গীত, বাদ্য, নৃত্য, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক, যাদুবিদ্যা প্রভৃতির আয়োজনের কোনদিনই ত্রুটি হয় নাই। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পরে যদি এইরূপ আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিত।

২৯শে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি ও আসাম ডিষ্ট্রিক্টের জি-ও-সি মেজর-জেনারল্ লিওসে তাঁহার দুইজন ষ্টাফ-অফিসারের সহিত এই নবগঠিত পদাতিক সৈন্যদলকে পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অনেককে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করেন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যাহাতে এই শিক্ষিত এবং ভদ্র সৈন্যদল অদূর ভবিষ্যতে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

১লা জানুয়ারী ও-সির অধিনায়কত্বে আমরা ব্রীগেড্ প্যারেড্ গ্রাউণ্ডে প্রোক্ল্যামেশন-প্যারেড্ দেখিতে গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে ভবিষ্যতে আমরাও উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারি। যথাসময়ে বড়লাট এবং বাংলার লাট উভয়ে উপস্থিত হইবার পরে তোপধ্বনির পর যথারীতি কার্য্য আরম্ভ হইল। বৃটিশ এবং ভারতীয় বহু সৈন্য মার্চ্চ পাষ্ট (March Past) করিল; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইল সর্ব্বশেষের মিলিটারী মোটর লরীগুলির চলন-ভঙ্গিমা। দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে ইহারা যত আনন্দসূচক ও উৎসাহবর্দ্ধক করতালি পাইয়াছিল কোন সৈন্যদল তাহা পায় নাই। এইরূপ মার্চ্চ পাষ্ট যে কত কঠিন তাহা কেবল ভুক্তভোগীরাই বুঝিতে পারে।

২রা জানুয়ারী লেঃ বসু সৈনিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। লেঃ বসু গত বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সময় সমরক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় স্বীয় প্রতিভা ও কৃতিত্ব দেখাইয়া উচ্চপদ এবং প্রশংসা লাভ করেন। এতাবৎকাল ধরিয়া তিনি যে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার বিষয় শুনিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলাম। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি অনেক বিষয়ের আলোচনা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন যে, একতাবদ্ধ হইয়া আজ্ঞা পালন এবং কর্ত্তব্যকার্য্য নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা সৈনিক-গণের প্রকান্ত প্রয়োজন।

ঐ দিন অপরাহ্নে লেঃ বসুর অধিনায়কত্বে সকলে 'এমারেল্ড' এবং 'নরফোক' নামক দুইটী যুদ্ধজাহাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটে উপস্থিত হইবামাত্র ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া সকলে জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ দুইটী দেখাইবার জন্য ক্যাঃ চৌধুরী পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করিয়া রাখায় কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। প্রদর্শকের (Guide) নিকট নানা প্রকার যন্ত্রের, বিশেষত সুবৃহৎ কামানগুলির ব্যবহার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে যুগপৎ চমৎকৃত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। জলযুদ্ধের কি অপরূপ বৈজ্ঞানিক সাজ-সজ্জা।

৮ই জানুয়ারী রেজিমেণ্টাল্ স্পোর্টস্ হয়। এই উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট অফিস, সওদাগরী অফিস এবং অন্যান্য বহু অফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। এই সময়ে মিঃ ভূপতিভূষণ রায় এইস্থানে প্রদত্ত এবং আরও অনেকগুলি ছবি আগ্রহপূর্ব্বক তুলিয়া যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

৯ই জানুয়ারী ও-সির অধিনায়কত্বে রুট মার্চ্চ (route march) করিয়া আমরা দক্ষিণ কলিকাতা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। অত অল্প সময়ের মধ্যে সবের সৈন্যদল যে এত সুন্দরভাবে মার্চ্চ করিবে তাহা সম্পূর্ণ আশাতীত। নিম্নলিখিত রেজিমেণ্টাল্ সঙ্গীতটী সেদিন আমাদের সর্ব্ব-সময়ে সজীব ও সতেজ করিয়া রাখিয়াছিল।

চলরে চল চলরে চল, চলরে চলরে চলরে চল।
বীরদর্পে বিজয়গর্ব্বে আজিকে মোদের প্রাণ উতল॥
নাহিক গ্লানিমা আর মনের,
পতাকা পক্ষ 'আরবানের',
বক্ষে মোদের বান্ধবীরূপে রাজিছে পল্টনদল॥
জ্বলিছে প্রখর সূর্য্য,
বাজিছে সঘনে তূর্য্য,
আমরা বিজয়ী পক্ষ-রক্ষ-আরবান্ সেনাদল॥

রুট মার্চ্চ শেষ করিয়া দ্বিপ্রহরে শিবিরে ফিরিবামাত্র ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইল। ধূলা-বালি উড়িয়া চতুর্দ্দিক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল। বৃষ্টি নামিবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে নিজ নিজ তাঁবুতে আশ্রয় লইলেন। বৃষ্টি থামিলে নব-লব্ধ স্বাস্থ্য, শক্তি এবং উদ্যম লইয়া সকলে আনন্দিত মনে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং বাতাস কাঁপাইয়া মিলিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল—

বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহ বিধুর অধরে মিলন মধুর হাসি।
শুনিব বিরহ নীরব কণ্ঠে মিলন মধুর বাণী—
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী···

অলঙ্কারের শোভা

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

নীহার বলিছে, "দূর্ব্বে! আমি অলঙ্কার
কত না অঙ্গের শোভা বাড়াই তোমার।"
দূর্ব্বা বলে, "ক্ষণপরে তোমার মরণ,
আমার শাশ্বত শোভা শ্যামল বরণ।"

কারিকর

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

সুরথ গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে আঙিনার কূপ বাগিচায় কাজ করিতেছে। হাসি আর গুন্ গুন্ করে গান করা এই দুইটি যেন সর্বক্ষণ তাহার মুখে লাগিয়াই আছে। কেউ কখনও সুরথকে বিমর্ষ হইতে দেখে নাই। সুখ দুঃখ, বিরহ ব্যথা, অভাব অভিযোগ—সকল সময়ই তাহার শান্তমুখে স্নিগ্ধমধুর হাসিটুকু লাগিয়াই থাকে।

সুরথ খুব সকাল বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া চারা গাছগুলির গোড়ায় মাটি খুঁড়িয়া দিয়েছে আর মনের খুশীতে গাহিয়া চলিয়াছে—"সখি কে বলে পীরিতি ভাল। কাঁদিয়া জনম গেল—"

জিলোরী স্ত্রী কুসুমকামিনী পুকুর হইতে স্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে জলের কলসী বাঁকে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। আঙিনার স্বামীর গান শুনিয়া কুসুম আঙিনায় ঢুকিবার বাঁশের গেটকে একটা ঠুকুই করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সুরথ স্ত্রীর আগমন বুঝিতে পারিল না, আপন মনে গাহিতে গাহিতে কাজ করিয়া চলিল।

কুসুম আর পারিল না, স্বামীর ভুল সুরে ও ভুল গানে হাসিয়া উঠিল। সুরথ হাসির শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিল। সিক্তবস্ত্র পরিহিতা স্ত্রীকে সম্মুখে দেখিয়া চাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। কুসুম হাসি চাপিবার জন্য নীচের ঠোঁট দাঁতে চাপিয়া ধরিল। সুরথ দৃষ্টি সংবত করিতে পারিল না।

কুসুম কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে প্রশ্ন করিল, হাঁ করে দেখচ কি?

: দেখ-চি—দেখচি তোকে!

: কেন—আমি কি ফরপট্টি?

: না, তোরা অপ্সরার জাত।

: যুর পোড়ারমুখো!

: তবে রাক্ষেকন্যা!

: উঁহু।

: তুই আমার চাঁদের কণা!

: সোহাগে আর বাঁচিনে। সকালবেলায় উঠে কাজকর্ম্ম ত নেই; কেবল গান আর—

: আর কি রে?

: জানিনে! তোমার সঙ্গে কথা কইলে ত আমার চলবে না, ঢের কাজ পড়ে আছে।

: আরে যাচ্ছিস যে। জল দিয়ে যা। মাইরি, চারা গাছে জল না দিলে মরে যাবে সব। আজ তুই দিয়ে যে, কাল আমি নিশ্চয়ই জল আনব।

: অত লপের কাজ নেই। রাজার জল এনেচি; উনি তার ফুল বাগিচায় দেবেন! তারি ত আমার ফুল বাগিচা! আজ সবগুলি চারা উপড়িয়ে ফেলে আমি বেগুন আর মরিচের গাছ লাগাব!

: সত্যি বলচিস?

: সত্যি নয় ত কি! বেগুন আর মরিচ লাগালে তবু দু'পয়সা আয় হবে।

কুসুম জলের কলসীটা রাখিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

সুরথ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, উপড়ালেই হ'ল!

: দেখ তখন!

কুসুমকামিনী চলার গতিতে একটা রূপের ঢেউ তুলিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল।

স্বামীর গানের সুর তাহার অন্তরেও রূপের ও আনন্দের ঢেউ তোলে। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে কুসুম গাহিতে লাগিল,—

সখি কে বলে পীরিতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
কাঁদিয়া জনম গেল।
কুলবতী হয়ে কূলে দাঁড়ায়ে
যে ধনী পীরিতি করে
তুষের অনল যেন সাজায়ে
এমতি পুড়িয়া মরে।

সুরথ স্ত্রীর গান শুনিয়া উঠিয়া আসিল। গা টিপিয়া টিপিয়া বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ এক নবয় ভাবের উচ্ছ্বাসে স্ত্রীর সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান ধরিল। কুসুম তাড়াতাড়ি কুচের কাপড় সংবত করিয়া লজ্জাজড়িতকণ্ঠে বলিল, দুষ্টু কোথাকার!

সুরথ সুর ধরিয়া বলিল, সখি কে বলে পীরিতি ভাল!

: কি আমার পীরিতির ঠাকুর রে!

কুসুম লীলাচঞ্চল গতিতে সুরধুর হাতে দরিয়া দাঁড়াইল।

সুরথ গানের প্রথম চরণখানি গাহিতে গাহিতে বাগিচায় চলিয়া আসিল।

সুরথ অতি প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়া ফুলের বাগিচায় কাজ করে, বৎসামান্য কাজ শেষ করিতে তাহার বেশী দেরী হয় না। বাগিচার কাজ শেষ করিয়াই উঠানের এক ধারে কাদামাটি লইয়া বসে পুতুল গড়িতে। যদিও পুতুল গড়িয়া জীবিকার্জ্জন হয় না; তবু ইহাকেই সে

পেশা করিয়া লইয়াছে। পুতুল খেলিয়া এবং যে সামান্য জমি আছে তাহাতে দুই জনের পরচ চলে না কিন্তু চলে না চলে না করিয়াও দুই বছর চলিয়া গিয়াছে। এই না-চলার বিরুদ্ধে তাহাদের বড় রকম কোন বিদ্রোহ নাই। সকল অভাব অভিযোগকে চাপাইয়া গুঠে দাম্পত্য প্রেম।

মধুরা নদীর পাড়ে বিষ্ণুপুর গ্রাম। গ্রামের একপ্রান্তে, নদীর তীর ঘেঁষিয়া সুরথের ছোট বাড়ী! বাড়ীতে তিনটি মাত্র খড়-বিচালীর ছোট ছোট ঘর। পরিষ্কার ঝুটঝুটে বাড়ী—পবিত্রতা, স্নিগ্ধতা যেন সারা বাড়ী জুড়িয়া আছে।

সুরথ পুতুল পড়িবার মাটি ছানিতে ছানিতে গায়—

"বিধবার কপালের দুঃখু কাল্লে তো যায় না
সাত না বছরের কালে মানে মিছল বিয়া
তের না বছরের কালে পতি গেল মইয়া।খোয়া যাইয়া
ধর্ম্মে তো সইল না।

স্ত্রী কুসুমকামিনী রান্নাঘর হইতে উহুনী কাটিয়া বলে, সকালবেলায় কোন্ বিধবার দুঃখে কাঁদচ গা?

সুরথ হাসিয়া গায়—

খাবরে না পণ্ডিতের বংশে
বিধবার শাপে পো যাইয়া
ধর্ম্মে তো সইল না।

কুসুম রান্না-ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলে, বিধবার জন্যে যে পরিমাণ উতলা হয়েচ—

সুরথ হাসিয়া বলে, তোর জন্যে কম উতলা হইনি কিন্তু।

: সে আমার জানা আছে গো!

: রাধাকে নিয়েই যে কৃষ্ণপ্রেম, তুই না জানলে চলবে কেন!

: চঙ, দেখ—কৃষ্ণপ্রেম! কুসুম ভ্রূকুটি করিয়া সরিয়া গেল।

কুসুম উনুনের উপর হইতে ডালের কড়াইটা নামাইয়া ভাত র'াধিবার ডেগটা চড়াইয়া দিল। ভাতের জল ফুটাইতে দিয়া চাউল আনিবার জন্য হাঁড়িতে হাত দিয়া খানিক বোকা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরথ স্ত্রীর প্রতীক্ষায় একটু ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল—

"শোন রে ভাই লোকজন মেগে আইল বিজাপেল
শন সুতা গলায় দিয়া ঝালয়া বেরাজন।
বাইট হাত পানির নীচে কাউটারে চিত্ত কইয়া
লক্ষপের বের লাইগা খেলয়ে জীবন!

কুসুম ত্বর্ ত্বর্ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সুরথ গান থামাইয়া বলিল, কি হ'ল গো?

: কি হল গো! কেবল গান আর গান আর মাটি নিয়ে কেড়ামি!

সুরথ দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল!

: হে'স না বলচি—কের্ দাঁত বার ক'রে বোকার মত হাসচ!

: বলি আমার আঁধারে রাতের চাঁদের কপাল হল কি?

: এক মুঠি চাল নেই। আজ নিরম্বে কি!

সুরথ কুসুমের পাতলা তাম্বূলরঞ্জিত ওষ্ঠযুগলের প্রতি তৃষিতের মত তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

: পাগল নিয়ে আর পারি নে! চাল আর নেই, ঘরে মিলবে না, মুটি পয়সাও নেই যে দু-তিন মুঠি চাল কিনে আনব! হাসলে ত চলবে না, গায়ে কি?

: কেন, ওই মধুমাখা হাসি!

কুসুম ঝিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া বলিল, ন্যাকামি রেখে গরীব আমার বি বি করে! সত্যি বলচি, রোজগারের যে উপায় দেখচ না, ভেবে না সুরবন্ধু পড়েচে, কি গতি হবে?

সুরথ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে বলিল, সত্যি কি গতি হবে!

কুসুম চীৎকার ক'রে বলিল, আমায় চটিও না বলচি!

: তুই যদি চটিস্ তবেই ত এত বড় সমস্যাটা মিটে যায়। রাগ ক'রে শুয়ে থাকবি, মান ভাঙ্গাতে সূর্য্য যাবে পড়িয়ে ওপ্রান্তে, তারপর হইল আমাদের এক কালি চাঁদের হাসি, ছোট্ট আমাদের বাগান আর মাঠের ধারে মধুরা নদীর কলকলানি!

মাঠের কথা বলিতে বলিতে যেন সুরথের চোখের উপর সবুজ ধান ক্ষেতের বৃন্ত ভাসিয়া ওঠে। নদীর পাড় ঘেঁষিয়া মাঠের পর মাঠ—ছেঁটে শেষ করা যায় না। ধান গাছে শীষ গজাইয়াছে, বাতাসে কেমন হেলিয়া দুলিয়া হাসে। এক একটা বাতাসের ঝাপটায় যখন গাছগুলি পর পর হেলিয়া পড়ে তখন মনে হয় নাচের ছন্দে যেন যোড়শীরা যৌবনভারে শিথিল অবয়বে হেলিয়া পড়িয়াছে। নীলাকাশে মাথা মাথা সাদার মত গাছের কাস উড়িয়া বেড়ায়। সূক্ষ্মতম সুতাগুলি ধানগাছের শীষে লুটিয়া বসে।...

কুসুম বলিল, চল আমরা এখেন ছেড়ে চলে যাই। আর ভাল লাগে না আমার।

: আমারও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। মনে পড়ে, সামাজিক গোলমালে আমরা নেই তবু এরা আমাদের টেনে আনবার জন্যে কম চেষ্টা করেনি। ঝামেলা আর পোষায় না।

: আমার দিব্যে কলত, অপবাদ। কুসুমের কলঙ্কের কথায় চোখ ছল ছল করিয়া ওঠে! সে স্বামী-সোহাগিনী বলিয়া স্বামীর সঙ্গে গভীর রাত্রে নদীর ধারে হাত ধরিয়া বেড়ায় বলিয়া দুইজনে সুর মিলাইয়া গান গায় বলিয়া লোকে অনেক কিছু বিশেষণ জুড়িয়া নানা আখ্যায় ভূষিত করে। সে জন্য তাহার অভিযোগ নয়; অভিযোগ তাহার নাই,দুঃখ তাহার মিথ্যা কলঙ্কের।

: দুঃখ করিস্ না কুসুম। এদের ইতর মনের এই সাধনা। চল আমরা নির্জ্জন পাহাড়ে চলে যাই। ফলমূলে আমাদের ক্ষুধার বেশ দিন

চলে যাবে। কেউ কোন কথা বলবার থাকবে না, মনের আনন্দে প্রকৃতির বনলোতার বন্য হরিণ-হরিণীর মত সখা চকল হাস্য-লাস্যে খেলা ক'রে বেড়াব আর কলকণ্ঠে বর্ণাধারা, গুহা-উপত্যকা, বনস্থলীকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলব।

কুসুমকামিনী কোন জবাব দেয় না, কল্পনার হরিণ শোভায় তাহার চোখ বুজিয়া আসে, উপুড় হইয়া স্বামীর বা ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে।

সুরথ দেখাদেখিই একটা বড় করিয়া প্রতিমা গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। ভাল প্রতিমা গড়িতে পারিলে নৌপাল জমিদার নোটা টাকা দিয়া ক্রয় করিবেন। সুরথের আশা সফল হইয়াছে, জমিদারের জামাই প্রতিমাটি পছন্দ করিয়াছেন এবং অগ্রিম দুইটি টাকা দিয়াছেন।

সুরথ তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া অসুস্থ স্ত্রীকে বলিল, কয়েক দিনের মধ্যেই প্রতিমাটি শেষ হয়ে যাবে। জমিদারবাবুর জামাই তারী পছন্দ করেছেন। আমায় পরশু নিয়ে যেতে চান। বলেচি যাব! সত্যি তো এখানে প'ড়ে থেকে কি হবে? আমার পুরুপুরুষ ছিলেন কারিকর, ইংরেজী শিক্ষার লোভে পাঠশালাতে যাই, নতুবা আমিও বাপ-ঠাকুর্দার মত বড় ওস্তাদ হয়ে পারতাম।

: কত টাকা দেবে?

সুরথ জামা হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল, বায়না হয়ে গেল, এখন তোমার ওষুধ! বক্সিক ডেকে এসেচি, এবার এমন এক অষুধ দেবে যে দু-দিনে ঘর সেরে যাবে?

কুসুমকামিনী টাকা দুইটি লইয়া ছেলেমানুষের মত খেলা করিতে লাগিল। স্ত্রীর মুখে হাসি দেখিয়া সুরথের অন্তর আনন্দে ভরিয়া ওঠে।

কুসুম প্রশ্ন করিল, প্রতিমাটি কবে ওরা নেবে?

: কাল নেবে, বাকী কাজ ও রং-পরানোর কাজ সেখানে গিয়ে করতে হবে। জামাইবাবুর কয়েকজন বন্ধু আসবে; সে জন্যেই ত অত তাগিদ।

কুসুম হাসিমুখে চুপ করিয়া গেল। স্বামীর হাতখানি বুকে চাপিয়া স্বামির পায়ে ধীরে ধীরে বলিল, একটা গান গাও না। অনেক দিন তোমার গান শুনিনি।

সুরথ খুশী হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে মহুয়ার গান ধরে! বিরহী মহুয়ার গানে কুসুমের মনটা যেন কেমন কেমন করিয়া ওঠে! চোখের উপর যেন ভাসিয়া ওঠে মধেরঠাদ ও মহুয়ার কল্পিত ছবি!

কাল পূজা। সুরথের আর অবসর নাই। শেষ রাত্রে অসুস্থ স্ত্রীকে পথ্যাদি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিয়াছে, রাত্রি গভীর হইতে চলিল; বাড়ী যাইতে অবকাশ পায় নাই। শিল্পী সে, সৃষ্টির প্রেরণায় রোগিণীর কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল। খাওয়া-পরা, সুখ-দুঃখ সকল কথা ভুলিয়া একমনে ধ্যানমগ্ন মূর্তীর মত প্রতিমায় রঙ লাগাইয়াছে।

প্রতিমায় রঙ পরাণর কাজ যখন প্রায়-শেষ হইয়া আসে তখন জামাইবাবু ও তাঁহার কলিকাতার বন্ধুরা প্রতিমা দেখিতে আসেন। আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের প্রশংসায় যেন সুরথের প্রাণ আনন্দে গর্বে ভরিয়া ওঠে। হাঁ, এতদিনে তাহার প্রতিমা গড়িবার কাজ সার্থক হইয়াছে। আজ সে বাড়ীতে গিয়া কুসুমকে বলিতে পারিবে, কুসুম, তখন বলিনি আমি যে পুতুল গড়ি তায় কখন এই গ্রামেবাসীরা বুঝতে পারে না। সকলে কি আর এসব বুঝতে পারে! জান জামাইবাবুর বন্ধুরা আমার কত প্রশংসা করলেন, আমার তৈরী পুতুল কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লোক ডেকে দেখাবেন! এরা যে-সে লোক নয় কালাপানি পাড়ি দিয়ে হাকিম হয়ে এসেছেন (আই-সি-এস)!...

প্রতিমার কাজ যখন শেষ হইল তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামে তখন নিস্তব্ধ রাত। সুরথ রঙের বাটি, তুলিটুলি গুছাইয়া হাত ধুইয়া জামাটা গায়ে পরিল। বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল জামাইবাবুর বন্ধুদের মধ্যে কে যেন বলিয়াছিলেন, প্রতিমাটি দেবীমূর্তি হয় নাই, রক্তমাংসের এক যুবতীর প্রতিমূর্তি হইয়াছে। জীবন্ত যুবতীর মূর্তি! কথা কয়টি তাহার কানে খটখট করিয়া বাজিল। মানুষের মূর্তি কি করিয়া হইবে? সুরথ লণ্ঠনের আলোটা একটু চড়াইয়া দিয়া প্রতিমার মুখের দিকে চাহিল। প্রতিমার দিকে চাহিয়া সুরথ স্তম্ভিত হইয়া গেল! কি করিয়া সম্ভব হইল?

সুরথ ধপ্ করিয়া বাতিটা নীচে রাখিয়া ছুটিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিল। নিঝুম রাত্রি। গাঢ় আঁধার সারা বাড়ীময় তন্নতন্ন করিয়া খেলিয়া চলিয়াছে।

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া ধীরে ধীরে স্ত্রীকে ডাকিল! কোন সাড়া দিল না। রোগী হয় ত তাহার অধীর প্রতীক্ষায় অভিমানে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুরথ আস্তে আস্তে মাথাটা নত করিয়া স্ত্রীর পায়ের ওষ্ঠে একটা চুম্বন দিল!

সুরথ আঁতকিয়া উঠিল! হিম শীতল দেহ, নিশ্বাস পড়িতেছে না। সুরথ স্ত্রীকে দুই হাতে ঝাঁকুনি দিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—কেহ সাড়া দিল না, নিস্তব্ধ রাত্রির ঘনঘোর আর্ত ক্রন্দন গিয়া প্রতিধ্বনি করিল!

শোঁ শোঁ করিয়া যেন বাতাস বহিতেছে। উন্মত্ত ঘূর্ণাবেগে সুরথ চমকিয়া দাঁড়ায়, কান পাতিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। গভীর রাত্রি, প্রান্ত আকাশ, হিমকণাগুলি অব্যক্ত ব্যথায় ঝরিয়া পড়ে।

সুরথ আবার ছুটিয়া চলে, আবার থমকিয়া দাঁড়ায়।

উন্মাদের মত ঘণ্টের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কাল প্রত্যুষে পূজা! দেবীর পূজা হইবে, তিনি অন্তর্যামী কল্যাণময়ী! সুরথ একদৃষ্টে প্রতিমার দিকে চাহিয়া থাকে। হঠাৎ হাতের লাঠিখানা তুলিয়া প্রতিমার উপর ঘা মারিতে মারিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি দেবী দেবীর প্রতিমা আমি গড়েচি!

মাটির প্রতিমা ভাঙিয়া চুরিয়া মেঝের পড়িয়া গেল, সুরথ ক্ষিপ্তের মত লাঠি চালনা করিতে করিতে একসময় ক্লান্ত হইয়া পুতুলের উপর অজ্ঞান হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

মায়া-সঞ্চার

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

মানবের এ-সব একেবারেই ভাল লাগছিল না। তার মন জয়ন্ত-মিলনীর ব্যাপারেই ডুবে ছিল। সে তখন কথাটাকে বদলে অন্যদিকে নেবার জন্যে বললে: "মহিন, তুই তাহ'লে স্নান-টান সেরে নে—রাত্রে এসেছিস ট্রেনে।"

"ঠিক বলেছিস্, আগে শরীর-চর্চ্চা ক'রে নিই, তারপর পর-চর্চ্চা করব।"

মহিন স্নান-ঘরে চলে গেল।

"হ্যাঁ রে ভোলা, জয়ন্তর ব্যাপারটা কি বলতে পারিস?"

"ওই ত বললাম, পিরেটার করছে।"

"হুঁ!···আচ্ছা জয়ন্ত আজকাল নাকি বাড়ীতে বড় একটা আসে না। সেই পিরেটারেই—"

"পিরেটারেই নয়—বেশীর ভাগ সেই মীনার বাড়ীতেই থাকে।"

"তা তুই এ-সব করতে দিস কেন? তাকে···"

"তুই চার-মাস বাড়ী মাড়ালিনি—একেবারে কলকাতা ছেড়ে কোথায় ডুব মারলি—কেন? জবাব দিতে পারিস্?"

মানবের সমস্ত দেহটা যেন কে ইলেকট্রিক ব্যাটারিতে ঝাঁকি দিয়ে দিলে।

"আমার শরীরটা ভাল ছিল না, কিছুদিন চেঞ্জে ঘুরে এলাম।"

"জয়ন্তরও মনটা ভাল নেই—মীনার বাড়ীতে চেঞ্জের হাওয়া খাচ্ছে।"

"মিলনী কিছু বলে না?"

"বলতে পারলাম না। আমার সঙ্গে আজ ক-মাস দেখা হয় নি।"

"কাল থেকে সে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন?"

"হ্যাঁ, শুনলাম বাড়ীতে গিয়েছিল।"

"তুই একবার দেখা করলি নি কেন?"

"প্রয়োজনবোধ আমার হয় নি।"

"তা হবে কেন?"

"বন্ধুত্বটা তুই যা দেখিয়েছিস্ এমন আর কেউ দেখায় না। তুই যা না কেন, তোর ত ছেলেবেলার খেলুড়ী, ছোট বোনের মত, তুই যা না? আমি না হয় বন্ধুত্বর মর্য্যাদা রাখতে পারি নি—তাকে মীনার আস্তানায় তুলেছি·· তুই ছাড়িয়ে নিয়ে আয়—আমি কর্ম্মকর্ত্তাগিরি ছেড়ে দিচ্ছি।"

"ফট্ ক'রে আমিই বা সেখানে যাই কি ক'রে—ব্যাপারটা কি জানতে হবে ত?"

"তুই সেখানে গিয়ে বোনটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখলি না কেন?"

"কেবল ত সাবধান কেনই বলছিস্, তাতে মীনাসাটা কি হবে—বুদ্ধি পরামর্শ ক'রে এইটে কর, যাতে জয়ন্ত বাড়ীতে থাকে। এ কি অন্যায়!"

"অন্যায়টা যে কোন্ পক্ষে সেটা এখনও জানা যায় নি।

"তুই বলতে চাস্ যত অন্যায় সব আমার পক্ষে?"

"তোরও দেখছি মাথা বিগড়েছে! হচ্ছে তাদের কথা, তুই গায়ে মাখিস্ কেন?"

"জানিস্ ভোলা, ওদের কথা নিয়ে চায়ের দোকানে কাল রাত্তিরে কালী মিত্তির নানা কথা কইছিল। জয়ন্ত-মিলনীর কথা যে চায়ের দোকানে আলোচনা হবে, এ আমরা সহ্য করি কি ক'রে বল্?"

"তা হ'লে তারা prominent men-এর দলে উঠে গেছে। একটা কাজ করলি নি কেন?"

"কি কাজ?"

"মারামারি করলি নি কেন, অষ্টাদশ শতকের য়ুরোপের chivalry দেখাতে পারতিস। Eighteenth century য়ুরোপ আর twentieth century Bengal ও প্রায় সমানই।"

এমন সময় মহিন স্নান-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে: "ভোলাদা! আবার কবে থেকে Politic-এ dabble করতে আরম্ভ করলে?"

"সেদিন থেকে তোমরা নেশনের ব্যারিয়ার ভেঙে নতুন ধরণে ডিমোক্রাসির নমুনা এম্পায়ার পিয়েটারে

দেখাতে সুরু করেছ, সেই দিন থেকে আমি সুরু করিছি পলিটিক্স।"

"তাতে অন্যায় কি হয়েছে, এটা ত democratic age, democracy-ই ত এখন সব চেয়ে বড় practical philosophy. Demos এখন দেবতার জায়গা কেড়ে নিয়ে বসেছে।"

মানবের এ-সব কথা একটুও ভাল লাগছিল না। সে বললে: "নে তোদের তর্ক রাখ্—কি খাবি কি? তাই বল্।" ভোলা বললে, "এক গেলাস গরম জল—আর দুটো পাতিলেবুর রস—with a pinch of salt···পাকস্থলীটা ছেড়ে আছে তার একটু পাক খুলে দিতে হবে।"

মহিম বললে: "আমি একবার বিমল বোসের ওখানে যাব। সকাল-সকালই ফিরব।"

এমন সময় টেলিফোন বি: করলে। মানব উঠে গেল: "Hallow! who speaking—হ্যাঁ, আমি।"

"আমি আজ তিন দিন হ'ল কলকাতায় এসেছি। ভাল আছ সব?"

"আজকে? আজকে দেখা করতে পারব বলে ত মনে হচ্ছে না। কেন বল ত?"

"অসুখ? কেন, কি হয়েছে? ও···নিতান্তই দরকার? আজ যদি না পারি, কাল যাবার চেষ্টা করব।"

"সকালে? সকালে পারব না—বিকালে যাব।"

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আসতেই দেখলে রংরাজবাবু এসে বসে রয়েছেন।

মানব নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কখন এলেন? শরীর ভাল?"

"Mon amie, শরীর আমার বেশ ভালই আছে। তুমি চেঞ্জে গিয়েছিলে? কই, সারতে বিশেষ পেরেছ ব'লে ত মনে হয় না!"

ভোলা নেবু-গরমজল চুমুক দিতে দিতে বললে, "এর ওপর যদি মানব সারে—তাহ'লেই সেরেছে।"

"নে-নে থাম্, তোর সব কথাতেই দেখছি ইয়ারকি।"

"তোমার কাছে এলাম একটা বিশেষ খবর নিয়ে।"

ভোলা হাসতে হাসতে চঙ ক'রে বললে: "ও রংরাজ-বাবু, তাহ'লে মানবের কাছে দেবতাদের দূতসূত হয়ে এসেছেন! দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হবে না কি?"

"তার মানে কি ভোলা?"

"আজ্ঞে নল রাজাকে কলিতে পেয়েছে কি না?"

"কলিটা কে—তুমি?"

"আজ্ঞে ঠিক চিনেছেন, আমি একেবারে সাক্ষাৎ কলি—তবে যে ভোলা রায় সেজে মদ খেয়ে বেড়াই, সেটা আমার ছলনা। ওটা আমার স্বরূপ নয়, aesthetic রূপ—"

"Mon amie!"

মানব ভোলাকে বললে: "দেখ্ ভোলা, তুই এমন চচ্ছিস্ দিন্-কে-দিন্—কার সঙ্গে কি যে কথা ক'স্!"

"কলির চার-পো হয়ে আসছে কি-না, সেই জন্যে। তোমাদের রংরাজবাবুরা সত্য যুগ ফিরিয়ে আনবেন শীগ্‌গির, আমি চললাম মানব। তোকে যা বললুম, একটু ভেবে-চিন্তে দেখ্, বুঝলি?"

ভোলা রংরাজবাবুর পিছন দিকে গিয়ে—মুখ ভেঙচে চ'লে গেল। বললে—"Mon amie! আহা মন আমি!"

রংরাজবাবু তখন মানবকে বললেন:

"আঃ পাজীর-পাঝাড়া, মানুষের সম্মান রেখে কথা কইতে জানে না। ওই ত এই বুদ্ধি-শুদ্ধি দিয়ে জয়ন্তটার সর্ব্বনাশ করলে। অমন লেখা-পড়া জানা টাকা-ওয়ালা বড়মানুষের ছেলে—সেটাকে মদ খাওয়াতে শেখালে, যত অনাছিষ্টি কাণ্ড। Me voila, আমার দিকে তাকাও, শোন।"

"বলুন।"

"জয়ন্ত মিলনীকে ডিভোর্স করবে।"

মানব চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বললে: "ডিভোর্স! আপনি পাগল নাকি!"

তারপর হেসে উঠল, বললে: "তা, ডিভোর্স করবে কেন?"

"জয়ন্ত করবে না—মিলনী করবে।"

"দুটোই অসম্ভব। ডিভোর্স হবে না, হতে পারে না।"

"নিশ্চয়ই হতে পারে এবং হবেও।"

"আপনি কি বলছেন? মিলনী সর্ব্বেশ্বর রায়ের মেয়ে—"

"হ্যাঁ এবং প্রভাতী দেবী তার মা···এ ডিভোর্স না হয়ে পারে না। আর তোমার এতে interest আছে।"

মানবের সমস্ত দেহ ও মনে আবার কে যেন ইলেকট্রিক

ব্যাটারির চার্জ ক'রে দিলে। সে একটু শক্ত স্বরে বললে: "আমার interest—তার মানে?"

"এদের ডিভোর্সটা তুমি চাও কি-না—"

"আমি, আমি এদের ডিভোর্স চাইব, আপনি আমায় এ-সব কি বলছেন ঠিক ধরতে পারছি নি। আমি চাইব কেন?"

"শোন, মিলনীর মা প্রভাতীর বিশেষ ইচ্ছে ছিল যে, তোমার সঙ্গে মিলনীর বিয়ে হয়—এখন, জয়ন্তর অবস্থা জান?"

মানব বিরক্ত ভাবে বললে: "না।"

"জয়ন্তর ব্যাঙ্কে যা ছিল সব গেছে। জমিদারী বাঁধা—বাড়ী বাঁধা—এক পয়সার সঙ্গতি নেই, তার ওপর একটা থিয়েটারের মেয়ে নিয়ে এই রকম ক'রে বেড়াচ্ছে। ডিভোর্স হবার কোন বাধা নেই—মামলা উঠলেই adultery proof হয়ে যাবে—ডিভোর্স—একেবারে ডিক্রি নিসি—তখন মিলনীও স্বাধীন—জয়ন্তর যা অবস্থা এতে কোন ভদ্রলোকের মেয়ে তার সঙ্গে ঘর করতে পারে না।"

মানব অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে:

"কিন্তু আপনার এতে কি এমন স্বার্থ তা বুঝতে পারলাম না। মিলনীর মা হয় ত মেয়ের সুখ-দুঃখ বা ভবিষ্যৎ ভাবতে পারেন—মিলনীর পিতাও হয় ত এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে পারেন—আমরা এ সব নিয়ে আলোচনা ক'রে কি তাদের সম্বন্ধে অবিচার করছি না?"

"শোন মানব, তুমি মিলনীকে ভালবাসতে, বিয়ে করার কথাও উঠেছিল—এখন—"

"সে-সব গত কথার আলোচনা কেন রংরাজবাবু? জয়ন্ত আমার বন্ধু—শুধু বন্ধু নয়, সহোদরের সমান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তার সুখ-দুঃখের মধ্যে আমরা খানিকটা জড়িত। তার অন্তঃপুরের সঙ্গে আমার একটা অন্তরের আন্তরিক সম্পর্ক আছে। ডিভোর্সও যদি হয়—যদিও আমি যতদূর জানি, হবে না—যদিও তা হবার সত্যি কোন কারণ ঘটে থাকে তবে, তার মধ্যে, আপনি আমাকে টেনে আনতে চান কেন—এটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নি। আজ যদি জয়ন্ত-মিলনীর বিয়ে ভেঙে এই রকম একটা অবস্থা হয়, তাতে আপনি জানবেন আমার চেয়ে কষ্টবোধ তার অন্য কোন বন্ধুদের হবে না। আর আপনিও তাঁর পিতৃস্থানীয় বন্ধু—এ অবস্থায় আপনারও সেজন্যে বিশেষভাবেই দুঃখিত হওয়া উচিত।"

"আরে বাবা! দুঃখ ত হয়, দুঃখই ত করি, তাই ত করছি—কিন্তু সে সৎ তার জন্যই সহানুভূতি মানুষে করে, না হ'লে যে লক্ষ্মীছাড়া—উড়নচণ্ডে—তার জন্যে দুঃখ করা—বুঝলে-কি-না, Mon amie, মহাপাপ—মহাপাপ···ওই যে ভোলা—ওর মুখ দেখলে পাপ হয়···ওসব লোকের সংস্পর্শে এলে শ্রীভগবান স্বয়ং বিরূপ হন। মানুষ ত কোন্ ছার। অনাচারের সংসারের চেয়ে সংসার ত্যাগ ক'রে দেওয়ায় ধর্ম্ম হয়। এ সংসারে স্ত্রীকে অশ্রদ্ধা করার মত পাপ আর নেই।"

"আপনি কি ঠিক জানেন যে জয়ন্ত তার স্ত্রী মিলনীকে অশ্রদ্ধা করে? আর একটা কথা মিলনীর পিতা সর্ব্বেশ্বর রায়—তিনি কি বলেন? তাঁর এ বিষয়ে কি মত?"

"সর্ব্ব—সর্ব্ব কি বলবে—প্রভাতী যা বলেন, তাই হয়। সর্ব্ব ত প্রভাতীর প্রতিধ্বনি—তার আলোয় প্রতিভাত হয়। আর মিলনীরও তাই ইচ্ছে—"

মানব বিস্মিতের মত জিজ্ঞাসা করলে: "কি ইচ্ছে?"

"ডিভোর্স যাতে হয়।"

"ভাল, তাই হোক, আপনি আমাকে এর ভেতর জড়াবেন না। আমি এ সব হাঙ্গামার মধ্যে থাকতে চাই নে। থাকতে চাই নে শুধু নয়, আমি জয়ন্তর বন্ধু—তার যদি এই রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে—"

"ঘটে কি রে বাবা, বুদ্ধির দোষে সে এটা ঘটিয়েছে। Mon amie তোমাকে একটা গোপন কথা বলি। মিলনী যৌতুকের টাকা আর গয়নার প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা সব দিয়েছে, বুঝলে কি-না?"

মানব হঠাৎ এমনি জোরে হাহা-হাহা ক'রে হেসে উঠল যে রংরাজবাবু চমকে উঠলেন—একটু ভীত হলেন।

"কথাটা হাসবার নয় বাবা, কথাটা সত্যি—আমি বেশ ভাল রকম জানি।"

"ও! কিন্তু রংরাজবাবু! তাতে আপনার বা আমার ত কোন লোভ নেই।"

"আহা, তুমি বুঝতে পারছ না বাবাজী···"

"দু লাকই হোক, আর পাঁচ লাকই হোক···লাক্ আপনি ওদের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিন। আমার একটু কাজ আছে—আমাকে বেরুতে হবে।"

"আচ্ছা বাবা, কিন্তু আমি যা বললাম দেখো, এ অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।"

রংরাজ বাবু চলে গেলেন।

মানব একটা সিগারেট ধরিয়ে আপন মনে বললে :

"ভোলা যে বলে তা ঠিক : পৃথিবীর বেশীর ভাগই scoundrel—পেঙ্গুনীতে ভরা···"

রংরাজবাবু আবার তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বললেন :

"দেখ, আমি যে তোমার কাছে এসব বললাম, অথবা আমি যে এইজন্যেই এসেছিলাম তোমায় বলতে, এটা যেন সন্দ জানতে না পারে। Mon amie!"

"আজ্ঞে না, এ কথা প্রকাশ করার আমার কি দরকার বলুন। না আমি বলব না, আর আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হল ত নাও হতে পারে।"

"সেইটে তোমাকে caution—সাবধান ক'রে গেলাম। সংসারে সৎ লোকের প্রায়ই অভাব—ওই ভোলা—ভোলার মত পাজী আমি আর সংসারে দেখি নি। এরা পারে না হেন কর্ম নেই। ভাগ্যের কি সর্বনাশই না করলে!"

রংরাজ এইবার চলে গেলেন।

মানব মনে মনে বললে :

"ভোলার মত পাজী ত সংসারে দেখবেই না। কেন-না, ভোলা অত্যন্ত অপ্রিয় সত্য বলতে পারে। যেহেতু সে সর্বেশ্বর রায়ের মাসহারা খায় না—বন্ধু বলে, আর প্রভাতী দেবীর ভৃত্যের সুখসেবাও সে চাটে না। ভোলা ওইখানেই সে বড় পাজী। সে কথার ভুল কি?"

ভোলা তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এল।

"কি রে, ফিরে এলি যে?"

"ওই পাজীটা গেছে দেখে। আমি গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। ওটা আবার ফিরবে না ত?"

"না।"

"দেখ্ মানব, ওই লোকটার মত পাজী—scoundrel আমি আর দু-ভারতে দেখি নি—আমি যদি সর্বেশ্বর রায় হতাম—আমি ও-বেটাকে গুলি করে মারতাম।"

"কেন?"

"যাক্, ওর কথা নিয়ে আলোচনা করতেও ঘেন্না হয়।"

"তোর রংরাজবাবুর ওপর এত জাতক্রোধ কেন?"

"কেন? ওই যে বললুম—মনে হয় পাঁশ পেড়ে কাটি—এক ফোঁটা রক্তও যেন মাটীতে না পড়ে। রক্তবীজের ঝাড়। এই লোকগুলোই বাংলার সংসারে পাপ ঢুকিয়েছে। যখন-তখন শ্রীভগবানের নাম করে আর···থাক্···"

"কেন, কি হ'ল?"

"কিছু হয় নি মানব—ছেড়ে দে ওর কথা। জয়ন্তর সম্বন্ধে কি করা যায়? টাকাগুলো সব ত বরবাদ হয়ে গেল। এদিকে থিয়েটার যদি খুলতে হয় আরও টাকা চাই। তার ওপর ওই মীনা, যেটা নায়িকা সাজছে—সেটা ত পাঁচ হাজার টাকা বোনাস আগাম চায়, তবে সে প্লেতে নামবে। এখন একটা বুদ্ধি বিবেচনা ক'রে দেখ, যদি কোন উপায় থাকে···আমি ত একটা পোটো—আমি ত মানুষের মধ্যেই নয়। পোটোরা যে মানুষ নয় তা ত জানিস্।

"এতখানি বিনয় শিখলি কবে থেকে রে ভোলা···এত বড় সত্যি কথাটা বলে ফেললি?"

"তুই কি আজ আমায় নতুন দেখলি?"

"না।"

"তবে? দেখ্, আমি গড়তে পারি শুধু আর্ট—সংসার গড়বার ক্ষমতা আমার নেই—আমি জানি কোন্‌খানে আমার limitation—কোথায় থামতে হবে, তা আমি জানি।"

"তা আমায় কি করতে বলিস্—পাঁচ হাজার টাকা চাস? জয়ন্ত যদি টের পায় এ টাকা আমার কাছ থেকে নিয়েছিস্ তা চলে সে কি করবে জানিস্?"

"কি করবে?"

"তার বড় অভিমান, অভিমানে ঘা পড়বে, সে সহ্য করতে পারবে না। সব আরো খারাপ হবে।"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আদৌ এ থিয়েটারটা করতে দেওয়াই উচিত কি-না। টাকা সে এখন আর কোথাও পাবে না। কেন-না সব বন্ধক দিয়েছে। আমি কালী মিত্তিরকে বলেছিলাম, সে বলে second mortgage করার একটু সময় লাগবে—ধনীকে বোঝাতে হবে।"

"শোন, পাঁচ হাজার টাকা কেন, আমি তোকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছি—তোর নামে চেক্ দিই, তুই ভাঙিয়ে নিয়ে যা করতে হয় কর্। তবে থিয়েটার থেকে এ-টাকা তুলতে পারবি কি-না তা বলতে পারিনে। তবে তুলতে না পারলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। জয়ন্ত না জানতে পারে এ টাকা আমি দিয়েছি। একটা কথা কি জানিস

ভোলা, সংসারে কতক মানুষ আছে যে কাজে সফল হ'লে মাথা বিগড়য়, আর কতক মানুষ আছে সফল না হ'লে মাথা বিগড়য়। যে একখানা নাটক ষ্টেজে সফল হয়নি ব'লে এই রকম অব্যবসায়ীর মত টাকা নষ্ট করতে পারে সে খেয়ালী মানুষ—হয় ত সফল হ'লে ভাল হতে পারে। কিন্তু এইটেই আমার কাছে ঠেকছে—সে বাড়ীতে থাকে না··· খায় না···তার বউয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ করেছে। নাটক অভিনয় কি এত বড় জিনিষ যে, সংসার ছেড়ে অভিনয়ের জন্য মন-প্রাণ সমর্পণ করতে হবে! না ভোলা, এর ভেতর আরও কিছু আছে!"

"কি আছে?"

"পুরুষের পক্ষে মেয়েমানুষের মোহ, তার নেশার চেয়ে বড় নেশা আর নেই।"

"তোরও ও নেশা আছে না কি?"

"আছে না?"

"তবে বিয়ে করিস্ না কেন?"

মানব একটা নিঃশ্বাস নিজের অজ্ঞাতে ফেললে। ভোলা সেটা লক্ষ্য ক'রে বললে:

"কি রে, তোকেও রোগে ধরেছে বল্!"

"যাক, ও-কথা ছেড়ে দে—তোর টাকার কি আজই দরকার। তাহলে তোর নামে চেক্ দেবারই বা কি দরকার—আমি নিজের নামে টাকা বার করে নিয়ে তোকে দিয়ে দি। কিন্তু শোন্ ভোলা, জয়ন্ত কি নিলনী, কি আর কেউ যেন এ টাকার কথা জানতে না পারে। তুই ত জানিস্, আমার নিজের খরচ অত্যন্ত কম। এই টাকাটা সব খরচ করলেও আমার এমন বিশেষ কিছু কমে যাবে না। আমি এটা দিতে চাই—যদি জয়ন্তর এই নাটক অভিনয় সফল হয়—তার মনটা স্থির হয়। কিন্তু তুই যা বললি, তাতে আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে। শুধু নাটক অভিনয় অসফল হওয়া নয়; এর ভেতর আরও কোন কারণ আছে—সেই কারণের সঙ্গে ওই তোর মীনাও একটা কারণ জুটেছে।"

"সে কারণটা কি?"

"সে কারণটা কি—মনে ভাবছি।"

"কি ভেবেছিস?"

"ভাবছি, কিন্তু তোকে এখন সে কথা বলতে পারছি না।"

"কোন আপত্তি আছে?"

"আপত্তি নেই, কিন্তু বললে বিপত্তি হতে পারে। তাই এখন বলব না। শোন এখন নটা বেজেছে। তুই এখানে স্নান-টান সেরে নে। খাওয়া-দাওয়া কর, তারপর একসঙ্গে ব্যাঙ্কে যাব, সেখান থেকে তোকে টাকাটা দিয়ে দি। তুই নিয়ে যা। দেখ্ যদি অভিনয়টা সফল হয়।"

"ধর যদি অভিনয় সফল না হয়, তাহলে? জয়ন্ত কি কিরকম মনে করিস?"

"সবটাই মানুষের বুদ্ধি আর কাজের হাতে - তা বলতে ভরসা পাই নে। তবু সে যখন এত বড় ভার নিতে ভয় পায় নি—তখন আমরা বন্ধু, তার সফলতার জন্যে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।"

এমন সময় ইলা বাড়ীর ভেতর থেকে এসে বললে:

"দাদা, তোমার আজকে গাড়ীর দরকার আছে? আমি মাধুরীদের বাড়ী যাব তিনটার সময়।"

ভোলা রায়কে নমস্কার করে বললে: "এই যে ভোলাদা! কেমন আছেন?"

"তুমি ভাল আছ বোন্?"

"আমাকে আপনি paintings শেখালেন না? মাধুরীকে ত শেখান।"

"হয়েছে, ভোলা তোমায় painting শেখাবে? তা তোর গাড়ীর যদি দরকার হয় নিয়ে যা।"

"তুমি কি বেরুবে?"

"বেরুব। তাহ'লেও আমার গাড়ী না হ'লেও চলবে। আমি ট্রামে যাব এখন।"

"আচ্ছা। হাঁ ভোলাদা, আমাকে শেখাবেন কি-না বলুন?"

"সবাই কি সব শিখতে পারে দিদি! বড় পরিশ্রম করতে হয়। আঁকা শেখান যায়, কিন্তু রঙের খেলা শেখান যায় না। সেটা মানুষের মাথার ভিতর থাকে।···আচ্ছা, তোমার ইচ্ছা হয় আমি শেখাতে চেষ্টা করব।"

"আচ্ছা ইলা, তুই ক'রকম করবি। সিনারীর মাষ্টারও রাখবি, আবার ছবি-আঁকাও শিখবি—কোনটাই তোর হবে না।"

"ঠিক হবে। তুমি ভোলাদাকে বলে দাও।"

"আচ্ছা বলব। ওরে ভোলা, তোর আদুরে বোনের

আবদার যদি রাখতে পারিস ত দেখ্। ভোলাকে কিন্তু মাসে এক-শ ক'রে টাকা দিতে হবে।"

"সে তুমি জান, তুমি দেবে। আমি ছবি আঁকা শিখব।"

"আচ্ছা! আচ্ছা! শোন্ ইলাকে বলে দিবি, আমরা ক'জন খাব। তাড়া ক'রে করতে বলিস্। আমি ভোলার সঙ্গে এক জায়গায় যাব।"

"আচ্ছা।" —ব'লে ইলা বাড়ীর ভেতর চ'লে গেল।

"ভোলা, তুই তবে স্নান করে নে। মহিম এলে একসঙ্গে খেয়ে নেব। কিন্তু কাপড়-চোপড়?"

"তোর গায়ের জামা আমার একেবারে মশারির খোলের মত দেখাবে। এতেই হবে।"

"এক কাজ কর—তোর জামাটা cream colour, ওটাকে খুলে দে—ধনিয়া ওটা কেচে ইস্তিরি ক'রে রাখুক—আমার কাপড় একখানা পর—তুই আবার কোঁচান কাপড় পরিস নি। তাহোক্ সে যা-হয় হবে। আমি বাড়ীর ভেতরের স্নান-ঘরে যাই।"

ভোলা স্নান করতে গেল। মানবও বাড়ীর ভেতর চ'লে গেল। ক্রমশঃ

মহিষাসুর

শ্রীরামেন্দু দত্ত

দুর্গারে আর পূজবো নাকো দুর্গতির এই আটচালায়
পেটের দায়ে পোটো যেথায় তুলি ফেলে কাঠ চেলায়!
সকাল থেকে সাঁঝ অবধি
কবির বন্ধু বন্ধু-নারী
লক্ষ্মী আঁকে কোমর বাঁকে পরের হিসাব ;—তার চেলায়!

লক্ষ্মীমাতাও লক্ষ্মী মেয়ের মতন থাকেন ডান পাশে
তাঁর চেলাদের লক্ষ্মীছাড়া আদল্ দেখে লোক হাসে!
গণেশ ঠাকুর! লোকের ভিড়ে
চিন্‌বে কি এই শিল্পটিরে? •
ঋণং কৃত্বা ঘাইলে ঘৃত শুকায় ভুঁড়ি এক মাসে!

সরস্বতী সঙ্গে আসেন ; না আসিলেই পারেন তো—
কলম-পেষাই যাদের পেশা, খোদা তারেই মারেন তো!
এবার ভারী রেগেছি না
হয় তো যাবো ছাড়িয়ে সীনা
"আর্ট স্কুলিয়ে"ও যেতে পারি, আল্লা কিছু ছাড়েন তো!

কার্ত্তিকটি আসেন বটে, ময়ূর চ'ড়ে চমৎকার—
কুঁচিয়ে-পরা কাঁচি ধুতি, গুম্ফে অটো-দিল্‌বাহার!
দেবতাদের সেনাপতি
তাঁরই যখন এ দুর্গতি,
ভক্তরা তাঁর করবে কি আর, কিন্‌ছে নূতন মোটরকার!

দেখে শুনে ভাব্‌ছি না ঐ মহিষাসুর দাও ক'রে!
হুম্‌ড়ুমিয়ে বেড়াই তবু বুক ফুলিয়ে প্রাণ ভ'রে—
ধার্ম্মিক আর ঠাণ্ডা ছেলে
মাঝ গঙ্গায় দাও না ফেলে,
তুমি শুধু আর এসো না বধ করিতে বর্ষা ধ'রে!

দেশী তোড়ি * —ঢিমা তেতালা

না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা।
জীবন-প্রভাতে এলো বিদায় বেলা ॥

আঁচলের ফুলগুলি করুণ নয়ানে
নিরাশায় চেয়ে আছে মোর মুখপানে,
বাজিয়াছে বুকে যেন কার অবহেলা ॥

আঁধারের এলোকেশ দুহাতে জড়ায়ে
যেতে যেতে নিশিথিনী কাঁদে বন-ছায়ে,
বুঝি দুখনিশি মোর হবে না হবে না ভোর
ভিড়িবে না কূলে মোর বিরহের ভেলা ॥

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম্ স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

II । স সরা রমা মপা । পধা -ধমা মপা - ণদা । -মপা মজ্ঞাঃ মরঃ সণ্‌া । সা -া সা -া I
০ না মি০ টি০ তে০ আ০ ০০ শা০ ০ ০ ভা ঙি ল খে০ লা০

I । সরা রমা মপা । পা পদাঃ জ্ঞমঃ মপা । । ণপাঃ র্সঃ ণর্সা । ণধা -ণা -ধণাঃ -দপঃ II
০ জীব ন০ প্র০ ভা তে০ এ০ লো০ ০ বিদা য় বে০ লা০ ০ ০ ০০

---

* ত্রয়োদশ তোড়ির মধ্যে কতকগুলি চর্চ্চার অভাবে অপ্রচলিত হইয়া "মার্গ সঙ্গীত" শ্রেণীভুক্ত হইতে চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৩৪৩ সালের চৈত্র সংখ্যার ভারতবর্ষে 'খট্‌তো'ড়ি'র একখানা স্বরলিপি ও গান দিয়াছি। 'খট্ তোড়ি', 'মুলা তোড়ি', 'সহা তোড়ি' প্রভৃতি পাঁচটিকে মিশ্র তোড়ি, এবং 'দেশী তোড়ি', 'দরবারী তোড়ি', 'আশাবরী', 'গুর্জ্জরী' প্রভৃতি আটটিকে শুদ্ধ তোড়ি বলে। এবার 'দেশী তোড়ি'র একখানা স্বরলিপি দেওয়া হইল। ইহা আশাবরী ঠাটের।

'দেশী তোড়ি'র তিন প্রকার মত দেখা যায়। যথা ঃ—

১। আরোহী—স র ম প, ণ প র্স।
অবরোহী—র্স ণ দ প, র ম, র জ্ঞ, স র ণ, স, জ্ঞ র স।

২। দ্বিতীয় মতে আরোহীতে ধৈবত (তীব্র) ব্যবহার হয়।

৩। তৃতীয় মতে, দুই ধৈবতই ব্যবহার হয়।—স্বরলিপিকার

II । মপা পণা ণপা | পর্সা -া র্সা র্সা | । ণর্সা ণদা দণা | ণর্সা -া র্সা -া I

০ আঁচ লে০ র ফু ল্ ও লি ০ করু ণ ন য়া ০ নে ০

I । র্সর্রা র্রা -া | র্সর্রা র্সর্জ্ঞা র্সর্রা র্সর্রর্সণা | । ণর্সা র্সা র্সা | ণর্সর্রা -ণর্সা ণদ ণদা -পা I

০ নিরা শা য়্ চে০ য়ে০০ আ০ ছে০০ ০ মোর্ মু খ পা০০ ০০ নে ০ ০

I । পধা পমা মা | রা রমপাঃ পঃ পা | । র জ্ঞা সরা সণ্ | সা -া সা -া II

০ বাজি য়া ছে বু কে০০ যে ন ০ কার্ অ০ ব হে ০ লা ০

II । সরা ণ্সা ণ্সা | রা রমা রমা -া | । রমমা মপাঃ মঃ | পদা -ণা ণদ ণদা -পা I

০ আঁবা রে০ র০ এ লো কে০ শ্ ০ তুহা০ তে জ ড়া০ ০ য়ে ০ ০

I । পপধাঃ মঃ পা | পা পঃ ণদা মঃ পা | । রঃ জ্ঞা সরঃ ণ্ | সা -রঃ -জ্ঞঃ রসা -া I

০ যেতে০ যে তে নি শি ০ থি নী ০ কাঁ দে ব০ ন ছা ০ ০ য়ে০ ০

I । মপা পনদা ণপা | পসা র্সা দণা র্সা | । র্সর্রা র্সর্রা -র্জ্ঞঃ র্রর্সঃ |

০ বুঝি দু০ খ নি শি মো র্ ০ হবে না০ ০ হ

র্সর্রা র্সর্ণা ণর্সণর্সা ণদপা I

বে ০ না০০ ভো০০০ ০র্

I । মপা পণা ণর্সা | ণর্সা ণর্সদা মপমপা -া | । রজ্ঞা সরা ণ্ | সা -া সা -া II II

০ ভিড়ি বে না কু০ লে০০ মো০০০ র্ ০ বির হে০ র ভে ০ লা ০

বঙ্গের পাল-শিল্প

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ

প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্যমণ্ডিত গুপ্তযুগকে যেমন সচরাচর গ্রীস দেশীয় পেরিক্লিয়ান্ যুগের সহিত তুলনা করা হয় তেমনি

অর্দ্ধনারীশ্বর

মধ্যযুগে বঙ্গের পাল-অভ্যুত্থান পূর্ব্ব ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতিতে এক অনবদ্য রূপ প্রদান করিয়াছে।

ভারতেতিহাসে পালরাজ্য প্রতিষ্ঠা একটি স্মরণীয় ঘটনা; কেন না, জানিতে পারা যায় যে, বহু বৎসরের অনাচারিক অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য জনসাধারণ। সাগরবংশীয় গোপালকে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে দেশের শাসনকর্ত্তা

যমুনা

হিসাবে নির্ব্বাচিত করেন। ইহাদের অধীনে বঙ্গের ভাস্কর্য্য-শিল্পের উৎকর্ষসাধনই কেবলমাত্র হয় নাই, পাল সম্রাটের

রাজত্বকালীন বঙ্গ ও তৎসঙ্গে সমগ্র পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রচারিত হইয়া, শিল্প-জগতে এক নূতন রস-সৃষ্টির অবতারণা করে। এই

গঙ্গা

মহারাজ মহীপাল পালযুগের শিল্পকে নূতন মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল; তাহা তৎকালীন ভারতীয় জীবনের উপরেই কেবলমাত্র প্রভাব বিস্তার করে নাই, ইহা ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া সুদূর ব্রহ্মদেশে যবদ্বীপে এবং সুমাত্রায় নীত হইয়াছিল।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত গোপাল, ধর্ম্মপাল, দেবপাল প্রভৃতি পাল সম্রাটদের উৎসাহে বঙ্গের পাল-শিল্প সর্ব্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হইয়াছিল। পাল-সম্রাট দেবপালের রাজত্বকালে আমরা দুইজন প্রতিভাশালী শিল্পী ধীমান ও তৎপুত্র বীতপালের পরিচয় পাই। ভিক্ষু তারানাথ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দেবপালের রাজত্বের সময়ে বরেন্দ্র ভূমিতে নিপুণ দক্ষশিল্পী ধীমান ও তৎপুত্র বীতপাল ধাতুশিল্পে, ভাস্কর্য্যে, ক্ষোদিকার্য্যে বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। বীতপালের শিল্প রসাদেই বেশী ছিল এবং ধীমানের শিল্পপদ্ধতিকে 'পূর্ব্ব-বিভাগ' এবং বীতপালের পদ্ধতিকে 'মধ্যদেশ শিল্প বিভাগ' বলা হইত।

পালযুগের অধিকাংশ শিল্প নিদর্শনগুলি নিম্নলিখিত স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (১) নালন্দা, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, ভাগলপুর (বিহার), (২) দিনাজপুর, রাজসাহী, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম (বঙ্গদেশ), ও (৩) বিহিং (ময়ূরভঞ্জ)। নিম্নলিখিত মিউজিয়মগুলিতে উহা বেশীরভাগ সুরক্ষিত আছে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়ম (রাজসাহী), ভারতীয় যাদুঘর (কলিকাতা), ঢাকা মিউজিয়ম (ঢাকা), আড়িয়াল মিউজিয়ম (বিক্রমপুর), আশুতোষ মিউজিয়ম (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহ

সূর্য্য

(কলিকাতা), নাহার মিউজিয়ম (কলিকাতা), লক্ষ্ণৌ ও পাটনা মিউজিয়ম, ব্রিটিশ মিউজিয়ম (লণ্ডন), কেম্ব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুঁথি, মিউজি গিমে (প্যারিস), বার্লিন মিউজিয়ম, বোষ্টন মিউজিয়ম, মেট্রোপলিটান্ মিউজিয়ম (নিউ ইয়র্ক)।

পালশিল্পের মসৃণ কালো পাথরের মূর্ত্তিগুলিই প্রধান। মূর্ত্তিগুলির সৌন্দর্য্যাবলম্বতা ও কমনীয়তাই এই শিল্পের

কার্ত্তিকেয়

বিশেষত্ব। সাধারণতঃ মূর্ত্তিগুলির বক্ষ উন্মুক্ত, শুধু কটিদেশ বস্ত্রাবৃত এবং উহাও আবার মাত্র কয়েকটি রেখার সমাবেশে পূর্ণ। মূর্ত্তিগুলিতে মুকুল, অঙ্গদ, বলয়, কণ্ঠহার, মুক্তামালা, মেখলা, বাহুবন্ধ, মণিবন্ধ, কটিবন্ধ, নূপুর প্রভৃতি অসংখ্য অলঙ্কারে শোভিত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলির মুখাকৃতি সাধারণতঃ দীর্ঘ হয় এবং ওষ্ঠাধরের নিম্নগতি চওড়ায় মূর্ত্তিগুলির মুখে সাধারণতঃ একটি বিনম্র হাসি দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালের ভাগই নাসিকা উন্নত হয় না, উহার দুই পার্শ্বে প্রজাপতির শুঁড়ের মত ভ্রূ-যুগল উপরের দিকে উঠিয়া যাওয়ায় অর্দ্ধ-নিমিলীত চক্ষু দুইটিতে ঢুলু ঢুলু ভাব ফুটিয়া ওঠে।

প্রস্তর মূর্ত্তিগুলির এই একই শিল্পপদ্ধতি পালযুগের

হর-পার্ব্বতী

ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিগুলিতেও অনুসরণ করা হইয়াছিল। ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি সাধারণতঃ নালন্দা এবং চট্টগ্রামে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলির সুন্দর ও কমনীয় ভঙ্গীর প্রকাশ ভারতবর্ষের অন্যান্য ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিগুলিকে সহজেই ছাপাইয়া যায়। সুদূর পূর্ব্বখণ্ডে পালযুগের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তির সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া পাল-যুগের অধিকাংশ চিত্রাঙ্কনই কালের কবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যাহা আছে তাহার মধ্যে একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহীপালদেবের সময়কার 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথিখানিই প্রসিদ্ধ। এই পুঁথিখানির চিত্রগুলি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত এবং ইহা 'এশিয়াটিক সোসাইটির' গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বেশ-ভূষার অঙ্কনরীতি, অলঙ্কার যে পদ্ধতির সহিত আমরা পরিচিত উহার সহিত মিলিয়া যায়।

পাল-শিল্পের এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি দ্বারা সুদূর ব্রহ্মদেশ এবং নেপাল ও তিব্বত প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। উত্তর ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত প্রাচীন নগর পেগানের কুস্তি অকৃচি, চানজিয়ের ওন্‌মিন্ গুহামন্দিরের (একাদশ শতাব্দী)

বিষ্ণু (ধাতু-মূর্ত্তি)

সূর্য্য

মূর্ত্তিগুলির মুখ, হাত, পা দুইটি দীর্ঘ রেখার দুইপার্শ্বে তুলি দিয়া রঙের নিটোলটানে অঙ্কিত এবং ইহাতে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কমনীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত সমস্ত চিত্র বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহা ফ্রেস্কো ধরণে অঙ্কিত এবং মূর্ত্তিগুলির সহজ ও লাবণ্যমণ্ডিত ভঙ্গী ও তাহাদের দেহের অলঙ্কার-সজ্জা এবং ফ্রেস্কোচিত্রগুলি বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার বিষয়বস্তু, বর্ণবিন্যাস ও মূর্ত্তিরচনা পূর্ব্বোক্ত বঙ্গীয় শিল্পধারার অনুবর্ত্তী। হার্ভে সাহেবও 'ব্রহ্মের ইতিহাস'-এ লিখিয়াছেন, নিম্নাংউতে অবস্থিত চান্‌জিয় ওন্‌মিন্ মন্দিরের ফ্রেস্কো চিত্রের অঙ্কনরীতি নেপাল অথবা উত্তর বঙ্গের শিল্পীর বলিয়া মনে হয়। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দিন

পাগানের কুম্ভি অকৃচি মন্দিরে অঙ্কিত বৃক্ষের পরিকল্পনার সহিত অধুনা আবিষ্কৃত বাংলার পটগুলিতে অঙ্কিত পত্রগুচ্ছের সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলাম। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় অধুনা দক্ষিণবঙ্গে প্রাপ্ত দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্র-শাসনে অঙ্কিত যে চিত্রের প্রতিলিপি 'জর্ণাল অব দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টস্' পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন

বিষ্ণু

ডাক্তার আনন্দ কুমারস্বামীও ত্রয়োদশ শতাব্দীর পেগানের পদ্মপাণি ও দেবতার ফ্রেস্‌কোচিত্র আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, 'এই ফ্রেস্‌কো চিত্রাঙ্কণ-রীতির সহিত বাংলা ও নেপালের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের রক্ষিত পুঁথি (নেপাল ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ), এশিয়াটিক সোসাইটিতে

কামদেব

উহার চোখ এবং মুখের বিশেষ ভঙ্গিমা, দেহের সুঠাম গঠন এবং রেখাসমন্বয় বিশ্লেষণ করিলে বঙ্গীয় শিল্পের এই পদ্ধতি এবং সমসাময়িক পেগান মন্দিরের এই চিত্রাঙ্কন-রীতিতে রেখার সুস্পষ্টতা ও অঙ্কন-নিপুণতা যে একই ধারায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়।

রক্ষিত পুঁথি (নেপাল ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দ), ১৪৭৪ এবং ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কেম্ব্রিজে রক্ষিত পুঁথি (বাংলা একাদশ শতাব্দীর বোষ্টনে রক্ষিত পুঁথি) প্রভৃতি বিচার করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।" আবার ভিক্ষু তারানাথও তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দেবপালের সময় হইতেই নেপালের শিল্প

বঙ্গশিল্পের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই তিব্বতীয়েরা বাংলায় প্রবেশ করিতে থাকে এবং মহীপালদেবের রাজত্বের সময় বিক্রমশিলার প্রধান বৌদ্ধ ভিক্ষু অতীশ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য নেপাল ও তিব্বত গমন করেন। এই সময় হইতেই বোধ হয় বঙ্গশিল্প নেপাল ও তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। এলিস সেলি লিখিয়াছেন, "বাংলায় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তৈজসপত্রে মগধরীতি অনুযায়ী যে চিত্রাঙ্কন

মকরবাহিনী

হইত সেই চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি তিব্বত ও নেপালে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের গ্রন্থের ভূমিকায় মিঃ স্টেপলটন্ লিখিয়াছেন যে, একাদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় 'Pog-Sam-Jom-Zam' গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে, ভাস্কর্য্য এবং চিত্রে বঙ্গশিল্পীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার পরে নেপাল ও তিব্বতীয় শিল্পীগণ এবং সর্ব্বশেষে চীনা শিল্পী। আমরা নেপাল ও তিব্বতের মন্দির-গাত্রে লম্বমান চিত্র ও সমসাময়িক বঙ্গচিত্র বিশ্লেষণ করিলে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পর পালেরা মাত্র কয়েক পুরুষ বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পালরাজ মদনপালের সময় হইতেই বঙ্গদেশ বার বার বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে থাকে। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনেরা বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের

যে যন্ত্র

বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকে এবং ইহার ফলে বঙ্গশিল্পীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়েন। বর্ত্তমানে অনেকেই অনুমান করেন, কাংড়া উপত্যকার শিল্পীরা ইহাদেরই বংশধর। শ্রীযুক্ত জে. সি.

ক্রেফ্ট মহাশয়ের গ্রন্থে ইহার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাই। তিনি লিখিয়াছেন, "লেখক যখন পাঞ্জাব 'হিল-ষ্টেটে' ছিলেন তিনি পালবংশ সম্পর্কীয় একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও অপ্রত্যাশিত প্রবাদ শুনিতে পান যে, সুকেত, কাওন-পল, কাহুওয়ার, মুণ্ডি প্রভৃতি ষ্টেটের নৃপতিগণ বাংলার গৌড়রাজ-বংশোদ্ভূত। এই সব প্রাচীন রাজপুত রাজবংশের প্রবাদগুলি শক্তিশালী ও নির্ভুল বলিয়া পরিগণিত। কথিত আছে যে, কাহুওয়ার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'কাহন পাল' একদল ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া রাজ্যস্থাপনার্থ ঐ প্রদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় হইতে আসিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজবংশের কুমার ছিলেন।" ইহা ছাড়া গভর্ণমেণ্ট গেজেটিয়ারেও লিখিত আছে, তদ্দেশীয় অনেক নৃপতি পালবংশোদ্ভূত এবং তাঁহারা এখনও উহা বলিয়াই পরিচয় দেন। কাংড়া-শিল্পও বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহার বিষয়বস্তু, বর্ণবিন্যাস ও মূর্ত্তি-রচনা বঙ্গশিল্পের একই ধাঁচে গঠিত। যদিও ইহাতে রাজপুত-শিল্পের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা সম্ভবপর। কেন না, তদ্দেশে বসবাস করিয়া রাজপুত-শিল্পীর প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন ছিল, তথাপি তাঁহাদের চিত্রাঙ্কনে

মাতৃ-মূর্ত্তি

বঙ্গশিল্পের ধারা অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেন রাজগণের প্রভুত্ব ও অন্যান্য অনেক রাজনীতিক বিপ্লবে পরবর্ত্তীকালে বঙ্গের এই পালশিল্প সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়। *

হেমন্ত—কার্ত্তিক

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

উঠেছ কি ভোরবেলা ব্রত উদ্‌যাপন তরে
প্রাতঃস্নান সারিয়াছ ধূসর সাড়িটি পরে।
সযতনে গাঁথিয়াছ করবীর মালাখানি
ইষ্টদেবতার লাগি পূজারিণী হিমরাণি!

* ভারতীয় মিউজিয়ম, গুপ্তচর বিভাগ ও ঘরোয়া অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি সযত্নে সংরক্ষিত এবং যে কয়টি চিত্রখানি শ্রীপৃথ্বী নাহারের সৌজন্যে প্রকাশিত।

উপর্যাচিকা

শ্রীমতিলাল দাশ

প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিলাম—ভারতীয় হিন্দুদর্শনের মহিমা নিয়ে। ছুটি এল, মন পাখি চাইল; চাইল অবসর, অখণ্ড বিশ্রামের দিন, তাই মঁসিয়ে রিভেল বললেন—জেনেভা যেতে; সেখানে ওর কবিবন্ধু মঁসিয়ে বুঁলো থাকেন। কাউকে দিনগুলি কাবাপাঠে বিনোদনে, আর নিসর্গের চারুতা ভোগ করে।

প্যারি-লেক ব্লাঙ্ক দশটায় ধরল জেনেভায়। বুঁলো বলেছিলেন তাঁর এক বান্ধবী ভাল ইংরেজী জানেন—তিনি আমায় অভ্যর্থনা করতে আসবেন। কী জন্য পরিচয়পত্র? কি করি, নিজের ভারি সুটকেসটি একটি পোর্টারের মাথায় দিয়ে সিঁড়ি নামছি, একটি তরুণী ভারতীয় প্রথমে চুম্বকস্বরে প্রশ্ন করে বলল—"আপনিই মিঃ রায়?" সম্মতি জানানোয় মাথা নেড়ে। তরুণী বলল—"ক্ষমা করবেন, আমার একটু দেরী হয়েছে। তবে চলুন আপনার হোটেল নিকটেই আছে, এটা বেশ ভাল জায়গা।"

তরুণী কিশোরী—যৌবনের বিলাস তার বয়ঃসন্ধিকে সজ্জিত করবার বাসনায় তোড়ে তরে উঠেছে। তার মুখে চোখে এসেছে যৌবনের রহস্য, মুগ্ধ করল ওর ওপর আর আলাপ।

বললাম—"অনেক ধন্যবাদ! আমার ঠিকানাটা বলে দিন, আমি বুঁলোকে লিখে দিচ্ছি।"

তরুণী হাসল—"না, তা হয় না, বুঁলো আপনাকে আমার সঁপে দিয়েছেন, আপনাকে না পাইয়ে ছাড়ব না।"

দুজনে আলাপ করতে করতে চললাম, হোটেল ছিল কাছেই—দুজনে মিলে একটা পর পানও করা হল। তার পর লীনা—ওর আসল নামকে বাংলা করলে লীনার মতই শোনাবে—ড্রয়িং রুমে গেল। আমায় বলল—"তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন—"

রাস্তায় তখন লোকসমাগম নেই—বিশেষে নীলাকাশতলে দুটি তরুণ ও তরুণী, মন আনন্দে ভরে উঠল। হোটেলের পরিচারিকা বলল "দুজনের খাবার দেব?"

লীনা বলল সুন্দর করাসীতে—"না না, আমি খেয়েছি।"

আমি বললাম—"তাহলে যে আমার খাওয়াই হবে না।" আমার কৃপণ-চিত্ত তরুণীর অন্তে বদান্য হয়ে উঠছিল।

লীনা বলল—"আপনি খান—আমি বরং একটা গ্রেপফ্রুট খাচ্ছি।" শেষে এই রকমই হল।

খেতে খেতে ও ভারতবর্ষের গল্প তুলল—ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসা আছে—বইতে ও টেগোর-গান্ধি প্রভৃতির কথা পড়েছে—তা ছাড়া মিস মেয়োর বইও পড়েছে—তাই কৌতূহল ভরে ও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে বলল—"আপনারা মেয়েদের প্রতি অত্যাচার করেন?"

আমি ওর মুখের দিকে চাইলাম, সেখানে ব্যঙ্গ ছিল না। ও ভাবে আমাদের মেয়েরা খাঁচার পাখী, তাদের স্বাধীনতা নেই, তাদের জীবন দুঃখের একটানা স্রোত।

আমার বক্তৃতা ছুটল, সুরু-তরা বঙ্গ বাংলার বধূর—এবার কথা মনে জাগেছিল; বাংলার সেই শ্যামল মেয়ের কালো চোখ মনে ভাসছিল। এরা কষ্ট পাচ্ছে, তবু সে স্বামীর কল্যাণের জন্য ব্রতোপবাস করছে; তাই হয়ত অজ্ঞাতে আমার কথায় এসেছিল আন্তরিকতার উচ্ছ্বাস। লীনা মুগ্ধ হয়ে উঠল, ওর চোখে ফুটল কৃতজ্ঞতার স্নিগ্ধ মাধুরী, বলল—"আপনার কথায় আমার ভুল ভাঙ্গল।"

খাওয়া শেষ হলে হাস্যময়ী পরিচারিকাকে কিছু বেশী বখশিস দিলাম; ও খুশি হয়ে উঠে শুভরাত্রি জানাল আর বলল—"যে কদিন আছি, ওদের রেঁস্তরাঁয় খেলে ওরা ভারতীয় খাবার রাঁধার ব্যবস্থা দিয়ে আমার খুশি করবে।"

রক্তোপল নির্জন; নীল আকাশে উঠেছে তারার মেলা; তার নীচে জেনেভার সরোবরে পড়েছে তড়িতালোক—দূরে শৈলশিখরে জ্বলছে আলোর মালা; লীনা বলল—"ঘুমোতে যাবেন, না কফি খাবেন কোথাও কাবারেতে।"

ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু তরুণীর আহ্বান উপেক্ষা করা বীরোচিত হবে না; আর তাছাড়া আমরা ভারতীয় নারীর মর্য্যাদা দিই না একথা কিছু আগেই ওরা কাছেই শুনেছি। তাই আধ-ইচ্ছায় আধ-অনিচ্ছায় চললাম। ঘুমের পাশেই কাফির ঘর, নানা দেশের নর ও নারীর বিচিত্র সমাবেশে জীবনের কি ফূর্ত্ত লীলা-বিলাস—বেশীর ভাগই ঘুরলে ঘুরলে। লীনার সঙ্গী হিসাবে আমার মনেও জাগল যৌবনের আনন্দ, বিজয়ের উল্লাস।

পরিচারিকা আমল কাফি; তার পর কি পান করব জানতে চাইল। লীনার মুখের দিকে চাইলাম; ও বলল—"আপনি বোধ হয় সুরাপান করেন না?"

আমি সঙ্কোচে বললাম—"না।"

হাসতে হাসতে বলল—"তা জানি, আপনারা অতি ভীরু জাত—" তার পর পরিচারিকাকে বিদায় করল।

কাফি পানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ দেখা চলল। জিপসী নাচ হচ্ছিল, বেদিয়ারাও দেখছি তাদের অবদান ভদ্রসমাজে দিতে পারছে। ঘুরোপীয়েরা যেখানে মানিক পায় সেখান থেকে সেটা আহরণ করে; আমাদের মত আর্য্যামির জড়ং নেই বলে ওরা বেড়েই চলেছে।

"কেমন লাগছে?"

"ভালই।"

আনন্দের আতিশয্য বাড়ল ; লীনার জন্ম একপাত্র ভাক্ষাসব আনতে বললাম ; আমায় বলল—"খান না এটা, ঠিক মদ নয়, এটা আপেলের নির্যাসে।" আমার পিয়ার জাগল কৌতূহলোদ্দীপ্ত—আমিও পান করলাম।

তখন অনেক রাত হয়েছে, ফিরলাম। ওকে ওর বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হল ; পাশাপাশি চললাম—হয়ত সাক্ষ্য সব আড়াল খুব করেছিল। ও তার পেলব হাত দিল আমার গায়ে।

ওর মুখের সুরভি বাস, ওর অঙ্গের স্পন্দন, কিন্তু না—এরা রয়েছে তার কালো চোখ নিয়ে যেয়ে।

চোখে ভাসল—বাংলা দেশের কাজলা মেয়ের কাজল কালো চোখ।

২

পরদিন ঘুম ভাঙল বেলা ন'টায় ; পরিচারিকা বলল—"বুঁলো আমায় ডেকেছিলেন—ফোন তুলে নিবাদ।"

"কেমন কাটল রাত, লীনা তোমায় সাহায্য করেছিল ত ?"

"ধন্যবাদ, আপনার সৌজন্যে খুব কৃতজ্ঞ। লীনা সত্যই খুব ভাল—"

"হ্যাঁ, ভারতীয়কে ও খুব ভালবাসে ; বেশ, দুপুরে কোথাও যাচ্ছেন কি ?"

"না।"

"তাহলে আমুন গরীবখানায় মাধ্যাহ্নিক—"

"না না, আপনার অসুবিধা হবে।"

"মোটেই নয় ; তা হলে ঠিক রইল। বেলা একটা থেকে দেড়টার মধ্যে আপনি পৌঁছে যাবেন। ততক্ষণ ঘুরে নিন, লীনা সব, বেলজ দেখে নিন।"

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে চললাম রাষ্ট্রসংঘের কর্মকেন্দ্র দেখতে ; রাষ্ট্রসংঘের আদর্শ ও কল্পনা আমার খুব ভাল লাগে ; জগতে এতদিন ধরে কেবলই শোষণ চলছে। বুদ্ধিজীবী, শাস্ত্রজীবী, বর্মজীবী—আপনার স্বার্থের জন্য দিয়েছে জগৎ জুড়ে মিথ্যা শিক্ষা—সেই শিক্ষা ভুলাতে হবে। এইচ-জি-ওয়েলসের কথা মনে পড়ল—লোককে শিখাতে হবে নূতন ধর্ম।

রাষ্ট্রসংঘের বাড়ী ঘর তখনও সব তৈরি হয়নি ; দেখলাম নানা দেশ থেকে এসেছে নানা অবদান।

খুব ভাল লাগল আমার ; ওখান থেকে বাসে করে গেলাম বুঁলোর ওখানে—মাদাম বুঁলো দরজাতেই ছিলেন। মোটাম টিপটেই দরজা খুলে ড্রয়িং রুমে নিয়ে চললেন মাদাম—প্রৌঢ়া, তবুও ওর মুখে অপূর্ব কান্তি।

মঁসিয়ে বুঁলো নামলেন ; তার পর আহারে বসা গেল। মাদাম বললেন—"আপনার কি ভাল লাগবে জানিনে। এখানে একজন ভারতীয় আছেন, তাঁর জার্মান স্ত্রীর কাছ থেকে দু-চারটি ভারতীয় খাবার শিখেছি।"

মাদাম পোলোগ্না করেছিলেন, বেশ লাগল খেতে। ভারতীয়রা ঘরে মসলা দিয়ে খুব গুরুপাক—এটা বেশ সুপক্ক ও সুপাচ্য লাগল। বুঁলো বললেন—"আমি নূতন বই লিখছি—নূতন যুগের কাব্য—যারা বলে কবিতা মরছে তারা ভুল বলে—আমি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লিখি, তবু এগুলি লোকের ভাল লাগছে।"

আমি বললাম—"কবিতা ছিল অতীতের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, গদ্য এসে পদ্যকে রাজ্যচ্যুত করেছে।"

বুঁলো বললেন—"তা অনেকটা ঠিক। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন দরকার ছিল সুরের ও মিলের। মিল মনে রাখবার সুবিধে করে দিত। আজকাল গদ্যের অবাধ রাজত্ব।"

আমি ওঁকে খুসি করতে বললাম—"তবে গদ্যেও পদ্য লেখা যায়।"

মাদাম হাসলেন, বললেন—"তবে পদ্যও চলছে। ওঁর কবিতার প্রত্যেক চরণের জন্য উনি আমেরিকার কাগজ থেকে এক গিনি করে পান। লোকের ভাল না লাগলে এত দাম পাওয়া যেত না নিশ্চয়ই।"

আমি বললাম—"তা ঠিক, তবে সাহিত্যের এই ব্যবসাদারি—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদ্ভবের পথে বাধা দিচ্ছে।"

বুঁলো উত্তর দিলেন—"চরম গাণিতটা ঠিক ; শক্তিবানের লেখা ধনচিত্তের দাসীতে আপনার স্বাধীনতাকে ব্যক্ত করতে পারছে না।"

"য়ুরোপে প্রত্যেক জিনিসের মাপকাঠি অর্থ। একে আমি অন্যায় মনে করিনে। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতা হয়ত বেশি, তাই অর্থকে অবর্গ ভাবে। তার ফলে হচ্ছে আমাদের অর্থ-নৈতিক প্রতিরোধ। আমাদের কাজ চলছে না।"

মাদাম বললেন—'লীনাকে কেমন লাগল ?"

আমি বললাম—"চমৎকার মেয়ে !"

খাওয়া শেষ হল, উঠে ড্রয়িংরুমে বসা গেল। বুঁলো পাইপ ধরিয়ে বললেন—"ওর ইতিহাসটি চমৎকার ; জেকোস্লোভিকিয়ার তিনটি জাত জুড়ে পিঠুড়ি পাকিয়েছে। লীনারা সত্যিকারে জার্মান, এ মেয়েটিও প্রথম বয়সে হিটলারি দলে যোগ দিয়েছিল। এখন বুঝিয়ে পড়েছে ; ওরপক্ষ যেন আর্মানিতে পড়ে, এক জার্মান যুবককে বিয়ে করেছে, সেই যেন ওকে যেতে লেগে, ও জার্মানীতে কিছুতেই যাবে না।"

আমি বললাম—"ওর ভারতবর্ষের প্রতি খুব ভালবাসা।"

মাদাম হাসলেন, চোখে তার কৌতুকের মাধুর্য, বললেন—"কিন্তু একটু সাবধান, ও ভারতীয় রাজা মহারাজা বিয়ে করবে এই ওর মনের ধারণা, আপনাকে পেয়ে কোনও সুযোগ ঠাউরে না বসে।"

বুঁলো একটু চটলেন, বললেন—"না, না, ও জন্য নয়, ভারতকে ও শ্রদ্ধা করে। তাই যদি কোনও সত্যিকার ধরণী ভারতীয়ের সঙ্গে ওর মিল হয় তা মন্দ হয় না।"

মাদাম চকোলেটের বাক্স আগিয়ে দিলেন। নিলাম দু-একটি। বুঁলো ওঁর সদ্য প্রকাশিত একখানি বই দিলেন। নিজের হাতে একটি ফরাসী কবিতা লিখে দিলেন। কবিতাটি আমার এক বন্ধু অনুবাদ করেছিলেন—

পূবের রবির প্রিয় তুমি, কণ্ঠে জাগে নবীন কলরব,
একটি দিনের ক্ষণিক স্মৃতি রাখুক তবু পারিজাতের গন্ধ,

পূবের দেশে পল্লিবেরি রয়েছে ভাই নারীর আধীনতা।
বিশ কোড়া মানুষ একই মিথ্যে ভেদ জাগায় অনৈক্যতা।

বিমার মিলায় ; কবিবিলাসী কবি বললেন—"আপনাই অবসর পাবেন, আসবেন ; কিন্তু কাব্য আলোচনা করা যাবে, সন্ধ্যে আটটা থেকে রাত দশটা আমি গল্প করি।"

আমার চলতা পড়েছে এসেছে ; নমস্কার জানিয়ে চলে এলাম।

(৩)

লীনা এল পরদিন সন্ধ্যায়, বলল—"ছুটি আছে সামনের সোমবার, চলুন পাহাড়ে বেড়িয়ে আসবেন। শুধু সহর দেখলে, বাদুঘর আর কলাভবন দেখলে একটা জাতকে চেনা যায় না।"

ওর কথার যাদু আছে ; ওর আবেদন নিরস্তর জানে না। তাই সম্মতি দিতে হ'ল। সোমবার সকাল ছটায় রওনা হওয়া গেল। লোক মিলায় একটা ছোট মোটর, চলার সরোজের কালো রঙ পাড়ি দিয়ে, মনে জাগে কাঁপন। এ যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা, অসীম অন্তহীন পাথার যেন সামনে, আর তার মাঝে আমরা দুটি তরুণ ও তরুণী। ও যেন কলহংস-মুখর সরণী ; ওর মুখে কথার খই ফুটছে—পাড়ে দেখাচ্ছে এক একটা গির্জা, এক একটা বাড়ী, সবকে তার ইতিহাস ; মাঝে মাঝে বলছে কৌতুক কথা। পাহাড়ে যখন পৌঁছালাম তখন বেলা চারিটা।

যেকে সে পথে চলে সে পথ ছেড়ে আমরা একটা পায়ে চলার পথ ধরলাম।

আল পাহাড়ের একটি নমণীয়তম শাখা, আজও ভয়ত জাতি বা পৌর বলতে একে লজ্জা বোধ করে, তবু ভাল লাগল এই ছোট পাহাড়ের ছেলে-ভরা কোল। সরল তরুর বন বেষ্টি নেই, বহুবাড়ম্বরের আড়ম্বরে এর মন কল্পিত হয় না, এর গুহায় গুহায় যক্ষরক্ষ নেই, তবু আলিঙ্গনের চিরন্তন সুন্দর মহিমায় থাকে অনেক ঘরে—এ ছবির যেন সন্ধ্যা, খেলার সাথী।

আমরা একটা ছোট ঝরণার পাশে খেলায় ; ও খুলল ওর হাত-খরচের মানি থেকে খাবার। বাকিরে দিল কাগজের ঠোঙায় ; ঘুরেফেরে লোক আর তারতে লোক—মেয়েরা গৃহিণী। এ রূপ ওদের মোটে না, শুধু বহুপট ও রঙভূমির কিছু পরিবর্তন—সেটা বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ নয়।

লীনা খেতে খেতে বলল—"আমার বাবা ছিলেন বৈদিক পণ্ডিত, ওঁর কাছে আমি ভারতবর্ষের অনেক গল্প শুনেছি—"

আমি বললাম—"জার্মান জাত সংস্কৃত সাহিত্যের বড় অনুরাগী, জার্মান পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্যের সত সেবা করেন, ভারতবর্ষ তত করে না।"

"আমি ত শুনেছি ভারত এখনও কেতের পাকনে শালিত ; বাবা বলতেন—আর ওঁর চোখ সজল হয়ে উঠত ; বলতেন এত বড় ঋণ পৃথিবীর হয় নি ; তবে কোন্ দূর অতীতে শতদ্রুর তীরে যে ভাবধারা সৃষ্টি হয়েছিল আজও সেই ভাবধারা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত হয়ে আছে।"

"তা ঠিক, আমরা এখনও অত্যাহ পাতেরী মন্ত্র জপ করি ; আমাদের ক্রিয়াকর্মে এখনও বেদের মন্ত্র লাগে, কিন্তু—"

"এইটেই আমার দুঃখ, আপনারা কেন আমেরিকার ঘুরোপের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করতে। আপনাদের দেশে রয়েছে হীরার খনি, আর আপনারা কাচ—"

লীনার ভাষার বাধ ছিল না—ছিল বাধা, আন্তরিক ক্ষোভ। তাই সে আমার অন্তরকে স্পর্শ করল।

আমি বললাম—"এটা আমাদের Inferiority Complex—আমরা পিতৃধন হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাই আজি ভিক্ষা করতে। আর আমাদের দেশেও বিলেতি ডিগ্রি চলে, খেরো-দোষীরা চিপ পায় না!"

"আপনি ত নেবেন, আপনিই বা কেন প্যারিসে পিলিন দেবেন?"

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম। ওদের কাছ থেকে একটা জিনিষ শেখবার আছে—সেটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।"

"না না, ওকথা বলবেন না, যারা বেদ ব্যাখ্যার জন্য পদ পাঠ করেছিল, নিরুক্ত করেছিল, ব্যাকরণ করেছিল, তার উপর ভাষ্য টীকা করেছিল, সূত্র করেছিল, তারা জানে না বিশ্লেষণ? হাসালেন আপনি।"

ওর হাসিতে মুক্তা ঝরল, পাইন-শাখায় এল পাখীর ঝোড়া, কোন রঙীন দুটি পাখী, মিষ্টি তাদের সুর, তাদের কূজন মনে আনে মদন-মহোৎসবের গান। ও কাছে সরে এল, আমার হাঁটুর উপর শুয়ে পড়ল, বলল আমার মুখের দিকেই চেয়ে—"আমার মনে হয়, আমি আর জন্মে ভারতীয় ছিলাম, আমার চোখে ভাসছে ভারতের সুষমাময় পরিবেশের ছবি, সামগান জেগেছিল যে হিমালয়ের বনভবনে, তুষার কিরীটি সেই হিমালয় যেন চোখের উপর চলচ্চিত্রের মত। দেখছি গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-কাবেরী, কত বড় সে জাত, যারা বেদ লিখেছে, যারা উপনিষদের জন্ম দিয়েছে। ভারতবর্ষের ডাকে আমার মর্মে মর্মে সাড়া দেয়।" ওর গলার ওঠে আবেগ ও রক্তের দ্রুতি—আমি বিহ্বল হয়ে উঠি, আপন অজ্ঞাতেই সেই রক্ত-কোকনদে প্রীতির চিহ্ন মুদ্রিত করি।

লীনা উঠে বসল, তারপর আমার মুখের দিকে চাইল, অভিমানে বলল—"কিন্তু মিঃ রায়, এটা ভারতীয় অভ্যর্থনা নয়—"

আমি বললাম "জানি না, কিন্তু কাল থেকে নেই—আজ যেন মুখ ফিরিয়ে না লীনা!"

কথা কইল না, গোধূলির রক্তরাগ মাখছে আকাশে—মনে পড়ল গোধূলি লগ্নের কথা—মনে পড়ল গোধূলি লগ্নের প্রিয়া এলার কথা। বার বার করে বলেছিল—"তুমি আমায়, সে কথা ভুলো না।"

এ কি বিশ্বাসঘাতকতা? কে জানে, মন অস্থির হয়ে উঠল ; শান্ত হয়ে বললাম—"আমায় ক্ষমা করো লীনা।"

ও হাসল ; ওর সেই অপরূপ ভুবন-ভরণ হাসি। বলল—"এর ত ক্ষমা হয় না মিঃ রায়?"

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম ; লীনা কৌতুক করছে, না ব্যঙ্গ করছে! কে জানে—রহস্যময়ী নারী চরিত্রের তাল-নিকাশের কথা?

ভারতবর্ষ

চিত্রশিল্পী—শ্রীযুক্ত নিখিল মুখোপাধ্যায়

আলপনা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

"আমি আন্তরিকই দুঃখিত।"

"দুঃখই কি সব শেষ করে দেয়? আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি, আমার রক্তে ভারতের রক্ত এসেছে হয়ত কোনও অজানা পথে। ওর বনবনী, ওর গিরিপাহাড়, ওর বাসভূমি, ওর মরুপ্রান্তর আমায় ডাকছে; আমি ভারতবর্ষে যেতে চাই।"

ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্ত বললাম—"তাই চল লীনা, ভারতবর্ষ তোমায় আদর করে নেবে। তোমার সেবা দিয়ে, তোমার ভাব দিয়ে, তোমার আদর্শ দিয়ে তুমি জাগাবে ভারতবর্ষে নূতন জীবনের উৎস।"

লীনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; ওর কথায় এল স্পন্দন, ওর চোখে জাগল নর্ত্তন; বলল—"ঠিক মিঃ রায়, আমায় নিয়ে চলুন। আমি সত্যই ভারত-মায়ের হারানো দুহিতা।"

আবেশে এল ওর চোখে জল; আমি ওকে আদর করে হাত ধরে পাহাড় থেকে নামতে সুরু করলাম। ও কথা কইল না, উত্তেজনায় শুধু ওর হাত কাঁপছিল।

কিন্তু আমার কি তোমার সেবা গ্রহণ করবে? ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা করবে না?"

ওর কাঁপনের বেদনা আমার বুকে বেদনা জাগায়। আমি বললাম—"না লীনা, তুমি যেমন করে আমার দেশমাতাকে ভালবাস, অমন করে কেউ হয়ত দেশেও বাসে না। তুমি চল, তুমি হবে আমাদের ভাবের যাত্রী, আমাদের উৎসাহদাত্রী, তুমি হবে কল্যাণী তুমি হবে আনন্দময়ী বান্ধবী।"

লেকের পাশে এসে পড়েছি; জলে পড়েছে আলোর মালা, সেখানে কেউ নেই। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রতিচুম্বন করল, বলল—"কিন্তু বান্ধবী কেন বন্ধু? আমায় নেও করে তোমার সুখের সাথী, তোমার দুখের ব্যথী, তোমার কল্পনার লক্ষ্মী, তোমার স্নেহময়ী সেবিকা—তোমার আমরিণ প্রেয়সী।"

পাহাড়ের নীচে ডাকল বন-বোরগ, দূরে বাজল ছোট ইঞ্জিনের বাঁশী, আকাশে তারার মেলা, জলে আলোর খেলা, সবই নিরুপমানন্দ।

মাঝি ডাকল—"চলুন মঁসিয়ে।"

বললাম—"চলি।"

নৌকায় উঠলাম; যাওয়ার সময় সাবধান ছিল, এখন সে সাবধান আর রইল না। ও বিষণ্ণ প্রেমিকার মত পাশে এসে বসল; বসে আমার কালো চুলের বোঝা নাড়তে লাগল।

মাঝিকে বললাম—"মাঝি, গান গাও।"

আমি অত্যন্ত অবশ্যি অনুভব করলাম; মাঝির সামনে ওর ভুল ভাঙাতে চাইলাম। কিন্তু লজ্জা এসে কণ্ঠে বাধা দিল।

মাঝি চালাচ্ছে, ও হয়ত বুঝল—ও গাইল একটা ভক্তিমূলক গান, খেয়ো গাধীর গান।

যে গান বলছে—ওগো আমার দরদী সুর-বেদিয়া, হয়ত সেথা হল বন্ধের মত, তবু জাগল বুক-ভরা ভালবাসা, ও যেন চাঁদ আছে নীল আকাশে, নলিনী আছে কালো সলিলতলে।

মাঝির কণ্ঠে ছিল মাদকতা, বিস্তৃত সন্ধ্যায় সে সুর মনকে উৎফুল্ল করে তুলল।

মাঝিকে বখশিস দিয়ে তীরে উঠলাম। লীনা বলল—"তোমায় আমার আংটি দিই?"

আমি সাহেব সজ্ঞা করে বললাম, "লীনা, তুমি ভুল বুঝেছ, তুমি হবে আমার প্রিয়তমা বান্ধবী।"

"কেন, আমায় তুমি পছন্দ কর না?"

"তোমায় ভালবাসি লীনা, কিন্তু আমি বিবাহিত।"

আকাশে চাঁদ উঠেছিল; মেঘে ঢেকে গেল। আমরা দুজনেই নীরবে লেকের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম; জল চলল ছলছল কলকল।

কে?

শ্রীহেমমালা বসু

কে এসে দাঁড়াত সব আগে,
তার কথা শুধু মনে জাগে···
কার নয়নের দৃষ্টি, করিত অমিয় বৃষ্টি,
সে চাহনি কি মধুর লাগে!

হাসিতে ভরিয়া যায় মুখ,
আনন্দে নাচিয়া ওঠে প্রাণ;
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, কে বিরাজ করিত রে?
জীবন কে করিল শ্মশান!

নিমন্ত্রণ

প্রবোধকুমার সান্যাল

শাড়ীটা ঘুরিয়ে পরতে গিয়ে ডাঙা তক্তার খোঁচা লাগলো হাঁটুতে। নিতান্তই রক্ত বেরিয়ে গেল, আর তারই দাগ লাগলো শাড়ীখানায়। রক্তের চেয়ে শাড়ীর দাম বেশি। শাড়ীখানা তোলা ছিল এমনি কোনো অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণের জন্য। অপ্রত্যাশিত বৈকি, কে ভেবেছিল সাতাশ বছর বয়সে নন্দিনী বিয়ে করবে, আর সেই বিয়েতে পুরণো কলেজের বন্ধুদের করবে নিমন্ত্রণ। শাড়ীখানার দাম অনেক, এর পাটে পাটে ছিল কুমারীকালের নানা নিষ্ফল স্বপ্ন। বোটানিকাল্ গার্ডেনের চোরকাঁটা, মধুপুরের পথের রাঙা ধুলোর দাগ, পুরীর সমুদ্রের ওজোন্। হাঁটুটা জ্বালা করছে। রক্তটা সামান্য, জ্বালাটা বেশি। আজকের দিনের রক্তের দাগ থাকুক শাড়ীতে, আজকের জীবন-বিড়ম্বনা তার পক্ষে অমর হোক। শিলাবতী ভাবতে লাগলো, এই শাড়ীটা গায়ে জড়ালে সে যেন নতুন ক'রে নিজেকে সৃষ্টি করে, নতুন ক'রে ফিরে পায় তার কুমারীত্ব, তার নিষ্কলঙ্ক অতীতকাল।

সেনিওতা ছেঁড়া, ব্লাউসটাই বা ভদ্রসমাজের যোগ্য। তবু ত সব পুরণো। যেমন পুরণো তার এই অসন্তুষ্ট জীবন, যেমন পুরণো মৌখিক ভদ্রতা, যেমন পুরণো তার যন্ত্রণাদায়ক দিবাস্বপ্ন। এই সব প্রাচীনের হাত থেকে তার মুক্তি পাওয়া দরকার। এই যে ঘর, এই যে দেয়ালের কোণে জটাজটিল উইপোকার অভিযান, এই যে পুরাতন ইটকাঠের একটা বদ্ধ গন্ধ, আর এই অতি পরিচিত, অতি বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা, যার অন্ত নেই, যার প্রতিবিধান নেই—ঈশ্বর, এই প্রাচীনের হাত থেকে শিলাবতীকে মুক্তি দাও। ছেঁড়া সেনিজ হোক, পায়ে একটু আল্‌তা না জুটুক, হাঁটু দিয়ে পড়ুক দু' ফোঁটা রক্ত, কিন্তু অন্তত নতুন ক'রে সৃষ্টি করো দুর্ভাগ্যকে, ছানো বস্তু, এনে দাও চরম দুঃখের বন্যা। অন্তত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে শিলাবতী ঝাঁপিয়ে পড়ুক নতুন দুর্যোগে।

আল্‌তা একটু পাওয়া গেল না। রক্তহীন নিষ্প্রভ দুর্ভাগ্য-মাড়ানো দুখানা পা,—তার পা দুখানা দেখলেই মনে হ'তে পারে দারিদ্র্যের চিত্র, শিরা উঠে দাঁড়িয়েছে, মাংস পাতলা হয়েছে—জল ঘাঁটা, বাসনমাজা, ঝিগিরি করা দুখানা কুৎসিত পা। এই পায়ে আল্‌তার দাগ না দিলে উৎসবের আসরে চলতে লজ্জা করবে। কিন্তু লজ্জাই ত নারীর ভূষণ! যত কিছু লজ্জা,—স্বামীর অকর্মণ্যতার, শাশুড়ীর নীচতার, ননদের গোয়েন্দাগিরির, রুগ্নসন্তান প্রসবের, অনড় অনটন ও দারিদ্র্যের, সমাজের অচল জড়তার, পুরুষের কাপুরুষতার—যত কিছু লজ্জা সবই নারীর ভূষণ। নারীর লজ্জা জীবনে, নারীর লজ্জা মরণে। শিলাবতী ভাবলে, দরকারের সময়ে পায়ে একটু আল্‌তা নেই, ইডিয়ি করা একখানা ভালো শাড়ী নেই, কানের এক জোড়া ঝুমকো নেই,—এমনি ক'রে বাঁচা ভয়ঙ্কর, এমনি ক'রে মরা বিভীষিকাময়।

বাইরে থেকে উৎসবের আমন্ত্রণ তার ভিতরে জাগালো অসন্তোষ। তার অভাব-বোধটা খুঁচিয়ে বা'র ক'রে আনলো। বেশ ছিল সে। চারটি সন্তানের জননী, রুক্ষস্বভাব স্বামী, মুখভারকরা ষড়যন্ত্রপ্রিয় শাশুড়ী, ডাক্তারে ওষুধে গাদাগাদাপাতার ঝোলে, ময়লা বিছানায়, একান্নবর্তী অপোগণ্ডের দলে বেশ ছিল সে। নন্দিনীর বিয়ের সংবাদ এলো বিপ্লবের বার্তা নিয়ে, কুমারী জীবনের অনন্ত সুখস্বপ্ন নিয়ে, বঞ্চিত জীবনের অভিসম্পাত নিয়ে। কেন জুটলো না একটু আল্‌তা, কেন নেই পায়ে একজোড়া চটি, কেন গলায় নেই অন্তত দুভরি ওজনের একছড়া চেন্। মেয়েদের সম্মান আবরণে আর আভরণে। পুরুষের পৌরুষটাই তার—বড় পরিচয়, কিন্তু নারীত্বটা ত নারীর বাহ্য পরিচয় নয়। বয়স বাড়লে পুরুষের আদর বাড়ে, মেয়ের বেলায় উল্টো, দাম যায় কমে। যৌবনই ত মেয়েমানুষের ঐশ্বর্য্য, বয়সটার জন্যই ত তাদের যত কিছু সমাদর।

কেন গেল সেই বয়স। ঈশ্বর, তুমি বলতে পারো? কেন জোটে না একটু আলতা, কেন এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের শাড়ী বা'র করতে হয়, কেন ক্ষয়শীল অধিকারকে ধ'রে রাখার এমন চেষ্টা? এমন ঘর সে কামনা করেনি। ভাঙা কাঠের আয়নার কাছে শীলাবতী দাঁড়ালো—দাঁড়াভাঙা চিরুনী, তেল চট্‌চটে মাথার ফিতে, দুটো লোহার কাঁটা, 'পতি পরম গুরু' মার্কা সিঁদুর কৌটা—অর্থাৎ এই তার প্রসাধন সামগ্রী। পারা-ওঠা আয়নায় দেখা গেল তার মুখ। কোথায় সেই গৌরব? কেন ঠোঁট কালো হোলো, কেন হোলো দাঁতের গোড়ায় বয়সের দাগ, কেন জাগলো কপালে রেখা, কেন পাতলা হোলো মাথার চুল?

জীবন মথিত ক'রে প্রশ্ন উঠলো, হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে প্রশ্নটা ধক্ ধক্ করতে লাগলো। বি-এ পাস করার মুখে তার বিয়ে হোলো। উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ আশার চরম পরিণাম হোলো বিয়ে। মিশর দেশের মরুভূমি, প্রাচীন ইংলণ্ডের ডাইনীদের কাহিনী, মেরুপ্রদেশের অসভ্য জাতির জীবন-যাত্রা,—এদের ইতিহাসের পর ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গৃহস্থালী, দুরবস্থার ফ্রেমে সে গৃহস্থালী হতদান করে প্রতিদিন। প্রতিদিনই সে এক ধাপ ক'রে নামছে। উঠতে চেয়েছিল সে নিজেকে ছাড়িয়ে, সাধারণকে ডিঙিয়ে—সকলের মাথার উপর দিয়ে তার মাথাটা হবে দৃশ্যমান। প্রতিদিন সে যুদ্ধ করেছে, প্রতিদিনই তলিয়ে গেছে। ভালো খাওয়া নেই, ভালো হাওয়া নেই, মনের মতো পাওয়া নেই, তবু সে বেঁচে রইলো।

সাজগোজ একটুও হোলো না। শীলাবতী ব'সে রইলো। ঘরে রং-ওঠা চাবি-ভাঙা দুটো তোরঙ্গ, দুখানা ক্যালেণ্ডার, ছেলেমেয়েদের কয়েকটা দুরন্তপনার চিহ্ন, পারা-ভাঙা একটা আলমারী। কেরাণির স্ত্রী সে, তার পক্ষে নিমন্ত্রণে যাওয়া চলে না। লেখাপড়া শিখেছিল সে সামান্য কেরাণির স্ত্রী হবার জন্য, নোংরা ও রুগ্ন এক পাল ছেলেমেয়ের মা হবার জন্য। এই জীবন কি তার অভিপ্রেত ছিল? ষাট টাকার কেরাণির বউ—এক হাতে রান্না, অন্য হাতে বাটনা, অল্পবস্ত্রের আশায় অকর্মণ্য স্বামীর মন জুগিয়ে চলা, দুর্মুখ শাশুড়ীর বেতো পায়ে টারপিন্ মালিশ করা—এই জন্য কি সে হিটলিতে অত বেশি নম্বর পেয়েছিল?

আবার সে উঠলো। তার না গেলেই চলবে না। বহুদিন পরে এই একটা দিন মাত্র, আজ বাইরের আলো এসে পড়েছে তার জীবনে। দূরের থেকে তাকে কে যেন ডাক দিয়েছে, যেমন শরৎকালের আকাশ থেকে ডাক দিয়ে যায় শঙ্খচিল। আজ ফাটল দিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকেছে দিগন্তের আলো, যে আলো তার অন্ধ-তমের কেন্দ্রকে মাদকরসের মতো উত্তেজিত করেছে। শীলাবতী গিয়ে পুরণো একজোড়া চটি উদ্ধার করলো, মাথার চুলটা ফিরিয়ে নিলে সোজাসুজি, মুখখানা বহুলো ভিজে গামছায়। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেল শিকল ছিঁড়ে।

বাঁচলো। এমন একটা অখণ্ড মুক্তি তার অনেক কাল হাতে আসেনি। ভুলে যাও অভিশপ্ত আটটা বছর, ফিরে চলো কলেজে। পাঠ্য বইয়ের অক্ষরে অক্ষরে যৌবনের রঙ, বেঞ্চের কাঠের উপর ছুরি দিয়ে কাটা অজানা কোন্ ছাত্রীর হাতের দাগ, বন্ধুদের খোঁপায় কেমন একটা অদ্ভুত সোঁদাল গন্ধ। কলেজ থেকে বাড়ী ফেরা, দুটো রাস্তা বেশি ঘুরে যাওয়া, অবাধ অবারিত জীবন। মনে মনে রাজপুত্রকে ভাবা, মনে মনে সুভদ্রার রথচালনা, মনে মনে কদম্বের মূলে আত্ম-সমর্পণ। জনম জনম হাম ও-রূপ নেহারনু—সেই রূপ! শীলাবতী চলতে চলতে ভাবলো সেই রূপ! চৈত্র পূর্ণিমায় ছাদে শুয়ে আকাশের তারায় অনন্তো যে-রূপ, যে-রূপ দেখা যেতো গিরিডির মাঠে দাঁড়িয়ে দূরে পরেশনাথের নীল অরণ্যে, যে-রূপ ঝলমল ক'রে উঠতো কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর দিয়ে শরৎকালের শূন্যে।

অনেক দূর পথ। তা হোক, হাঁটতেই তার ভালো লাগছে। রুগ্ন শিশু যেমন প্রথম হাঁটতে গিয়ে টলমল করে, তেমনি ক'রে হাঁটা। পথকে অনুভব করা, পৃথিবীকে নূতন ক'রে উপভোগ, জীবনকে প্রতি পদে মাড়িয়ে চলা। হাঁটতে ভালো লাগছে, কারণ এমন ক'রে অনেক দিন হাঁটা হয়নি। আজ স্বামীকে অস্বীকার করতে ভালো লাগছে, সন্তানদের মন থেকে মুছে ফেলতে ইচ্ছে যাচ্ছে। কারো দুর্ভাগ্য কামনা করে না, অমঙ্গল সে চায় না—কিন্তু হে ঈশ্বর, তোমার এমন কোনো নিয়ম আছে, যে-নিয়মে তুমি স্বামী ও সন্তানদের প্রতি কর্তব্য ভোলাতে পারো?

এক পথ থেকে অন্য পথে চললো শীলাবতী। সন্ধ্যার বিলম্ব নেই। ট্রামগাড়ীর ভিতরে, কাপড়ের দোকানে,

ডাক্তারখানার, সিনেমার বারান্দায় আলো জ্বলছে। উৎসব-পীড়নাক্রান্ত নগরীর নৈশরূপ রঙে ও রসে যেন টলটল করছে। কিন্তু সে নিচে এর মধ্যে কোথায়? আলতাটুকু যার পায়ে ফোটেনি, সামান্য একখানা শাড়ী যার কালের গতির সঙ্গে রুচি মিলিয়ে চলতে পারেনি, তার এখানে কোথায় স্থান? মানুষটা ত আবহমানকালের পুনরাবৃত্তি, রুচি ও জীবনযাত্রার আদর্শটাই ত শুধু গতিশীল! শীলাবতী এর মধ্যে কোথায়? পরিচয়হীনতার একটা নগণ্য জীবের মতো সে কেন তলিয়ে গেল জনতার অনর্গল বিপুল প্রবাহের নীচে।

চাটতে চাটতে মিলিয়ে গেল শহর চোখের সুমুখ থেকে। বাতাসের আগে চললো কল্পনা। নূতন দেশে শীলাবতী উত্তীর্ণ। চারিদিকে মরুভূমি। সেই শস্যহীন ভূভাগের ভিতরে রাজপুতানার দুর্গ। দুর্গ থেকে কামান গর্জ্জে উঠলো। অদম্য রক্তপিপাসায় শত শত সেনা ছুটলো শত্রু নিপাতে; প্রাণের মূল্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেখানে বিকিয়ে চলেছে—সেই সংহারলীলার ক্ষেত্রে ভীমা ভয়ঙ্করী ঝান্সীরাণী এলেন অবতীর্ণ হয়ে। অতি ক্রুদ্ধ, হত্যার নেশায় অধীর উন্মত্ত। সমস্ত পাপ, সমস্ত অন্যায়কে বিনাশ কর। এক হাতে বল্গা অন্য হাতে তরবারী। এমনি ক'রে কি উল্লাসে উদ্দীপ্ত হয়েছিল ঝান্সীরাণীর মুখ, যেমন এই নৈশ নগরীর পথে যেতে যেতে শীলাবতীর চক্ষু ভয়ঙ্কর দীপ্তিতে জ্ব'লে উঠেছে? এমনি মুখ হয়েছিল কি দেবী সুভদ্রার? এক হাতে বল্গা অন্য হাতে তরবারী। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।

এমন একটা মুক্তির মধ্যে দিয়ে শীলাবতী ছুটলো—যেখানে বাঙালী স্বামীর নগণ্য পৌরুষ পৌঁছতে পারে না। এমন একটা শিকলছেঁড়া তীব্র স্বাধীনতা, যেখানে আঁচলধরা অপোগণ্ড বাঙালী সন্তান পথরোধ করতে সমর্থ নয়। চললো শীলাবতী হাবসীদের দেশে। অজানা অনাম্নী হিংস্র শ্বাপদময় অরণ্য, অরণ্যময় পর্ব্বত, পর্ব্বতের দূর দুর্গম গহ্বরের ভিতর থেকে কৃষ্ণকায়া প্রবাহিনী বন্য জন্তুর মতো তাড়না ক'রে আসছে। একা সেখানে শীলাবতী শিলাতলে আসীন। বনবিহারিণী, বিজনবাসিনী। তখনও মানব-সভ্যতার জন্ম হয়নি, তখনও পুরুষ নারীকে স্পর্শ করেনি। সমস্ত প্রকৃতির নগ্নকোষে প্রাণপিপাসার যে-চেতনা লুক্কায়িত, শীলাবতী তারই সন্ধানে। তারই সন্ধানে উত্তীর্ণ হোলো পর্ব্বতের পর পর্ব্বত। যেখানে আকাশ কথা বলে পর্ব্বতের কানে কানে, প্রথম সূর্য্যরশ্মিলেখা চুম্বন করে পৃথিবীর প্রথম প্রস্ফুটিত কুসুম-পল্লবে, যার শব্দে ভ্রমরের তন্দ্রা ভেঙে যায়—সেই পথ দিয়ে অলক্ষিত চরণে শীলাবতী চ'লে গেল।

বেদুইনের দেশে উত্তীর্ণ। তপ্তরৌদ্রে বালুময় মরুপথে চলে দলে দলে উটের দল। দূর-দিগন্তে নীলাভ পাংশু আবছায়ায় মরীচিকার সঙ্গে মিলে যায় দস্যুকবলিত বন্দিনীর লোহার শৃঙ্খলের আওয়াজ। লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে লুণ্ঠিতা শীলাবতী। উটের পিঠে যেরাটোপের ভিতরে বোরখা-পরা অজানা দেশের যাত্রী শীলাবতী। বেদুইন দস্যু প্রহরী, বিশাল, ভয়াল—হিংসায় যার জন্ম, হিংস্রতায় যার দীক্ষা, নিষ্ঠুরতা যার পেশা। এমন সময় বোরখার ভিতর দিয়ে দেখা গেল, বালুরাশি উড়িয়ে আসছে অস্ত্রধারী নাইটের দল। রক্তপাগল বেদুইনের সঙ্গে বাধলো সংগ্রাম। অনন্ত বালুরাশির মধ্যে মানুষের রক্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। তারপরে? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! অশ্বপৃষ্ঠে শীলাবতীকে নিয়ে মধ্যযুগের নাইট্ ছুটলো অজানা দেশ থেকে কোন্ অজানায়। বিজন জীবণ মানুষের দেশে—দিকে দিকে অতিকায় জানোয়ারের আনাগোনা, নূতন মানব সভ্যতার পত্তন সেখানে আজো হয়নি, জন্তুর চর্ব্বি জ্বালিয়ে পাষাণ-পুরীকে আলোকিত করা হয়, মানুষের কঙ্কাল সাজানো গুহার গর্ভে গর্ভে, অদৃশ্য বিশালকায় প্রহরীর ভয়াল করাল দৃষ্টি নারীর বুকের মধ্যে কেবল বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

প্রেতিনীর মতো গুহার রক্তপথে শীলাবতী সেখান থেকে পলায়ন করিল। আবার নূতনতর জীবন। যে-জীবন পরম পিপাসায় খরোখরো। যার আদি নেই, যার অন্ত নেই। পৃথিবীর পথে আবার অবারিত ছুটে চলা। যে দেশ আজো অনাবিষ্কৃত, যেখানে সমাজ সৃষ্টি হয়নি, সন্তানের দায়িত্ব যে দেশে জননী আজো বহন করে না। বল্কলধারী স্ত্রীপুরুষ, জানোয়ারের মাংসাস্থি কেবল খাদ্য, বৃক্ষের কাটলে যাদের আবাসস্থল—সেই সব বন্য নরনারীর মধ্যে কিম্বা অন্য কোথাও। মেরুর দেশে, বরফের গর্ভে, মৎস্যব্যবসায়ীদের পরিবারে, এস্কিমোদের সঙ্গে সঙ্গে।

শীলাবতী বড়ই ক্লান্ত। নিজের ভাগ্যকে পরীক্ষা করতে না পারার হতাশায় ক্লান্ত। একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব সে দেখতে পারলো না, সে দেখতে পারলো না দেশ-জোড়া একটা

ওলোট-পালট। একটা অন্ধ নিয়তির হাতের ক্রীড়নক হয়ে তার এই যে জীবনটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল, এর জন্য দায়ী কে? পায়ে তার একটু আলতা ছুটলো না বটে, কিন্তু যারা তার বুকের উপর ব'সে সমস্ত রক্তটা নিংড়ে নিল, তাদের কণ্ঠের রক্তে সে তার চরণ রাঙাতে পারলো না কেন? সে দরিদ্র ব'লে তার রাগ নয়, কিন্তু তার জীবন পরিপূর্ণ বিকশিত হ'তে পারলো না, তাই তার আত্মগ্লানি।

• • •

নন্দিনীর বাড়ীর বাগানে এসে শীলাবতীর ঘুম ভাঙলো। ঘুমই বটে, একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন। পথ অনেকটা দূর বটে, কিন্তু দুঃস্বপ্নটা স্থান ও কালকে বিস্মবিস্তৃত ক'রে দিয়েছিল। সময়টা কিছু না, মনের একটা কল্পনা মাত্র। এই ত সে নন্দিনীর বাড়ীর বাগানে বিবাহ উৎসবের মধ্যে এসে পড়লো।

পুরণো বন্ধুরা তাকে চিনতে পারলো। যৌবনই মেয়েদের পরিচয়, তার শারীরিক দৈন্যটা দেখে বন্ধুরা একবার মুখ চাওয়াচায়ি করলে। দৈন্যটা তার সর্ব্বাঙ্গে। ভালো শাড়ী নেই, আধুনিক অলঙ্কার নেই, পায়ে আল্‌তা নেই। তবু চিন্‌তে পারলো, আদর ক'রে নিয়ে গেল অন্দরে।

কার সঙ্গে নন্দিনীর বিয়ে? কি করে সে ভদ্রলোক? দেখতে কেমন? পরম্পরায় খবরটা শীলাবতীর কানে এলো। কলেজে ছেলেটি ছিল নন্দিনীর সহপাঠী। দু'জনেই এম-এর ছাত্র। প্রণয়টা পরস্পরের মধ্যে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধ'রে সেই প্রণয় নির্ঝরিণী থেকে নদীতে পরিণত হয়েছে, এখন দুই কূল প্লাবিত। এবার শাঁখ বাজলো।

পাত্রের নাম সুশীল সেন। অমনি শীলাবতী ঘুরে দাঁড়ালো। মাথায় পড়লো বজ্রাঘাত। সুশীল সেন? মানে, সেই সুশীল? শীলাবতীর বুকের ভিতরটা ঈর্ষায় যেন ধক্ ধক্ ক'রে উঠ্‌লো।

• • •

ঠিক মনে নেই, বোধ হয় প্রথম হেমন্তকাল। বাতাসটি মধুর, কিন্তু অল্প অল্প গায়ে কাঁটা দেয়। দেরাদুন থেকে নেমে আসার সময় হরিদ্বারের এক ধর্ম্মশালায়।

মা বাবা সঙ্গে ছিলেন।

কেউ বলে আগে থেকে ষড়যন্ত্র, কেউ বলে, না, অমনি হঠাৎ দেখা। যে-পথটা গেছে নতুন কন্‌খলের দিকে, সেই পথে গঙ্গার পাকা বাঁধের কাছে দু'জনে এসে দাঁড়ালো।

শীলাবতী বললে, কেন এলে তুমি?

সুশীল বললে, এলুম তীর্থে। তুমি যেখানে সেখানেই তীর্থ। তুমি জানো না যে, এ কিছুতেই সম্ভব নয়? মা-বাবা রাজি নন্?

তোমার মত আছে?

আমি তাঁদের অবাধ্য নই।

ফিরে গেল সে। ফিরে আর চাইল না। অন্তত উল্লাস হোতো তাকে কাছে পেয়ে। রক্তের ভিতরে একটা দুরন্ত কোলাহল মুখর হয়ে উঠতো। পুরুষ জানে কতটুকু? প্রিয়-জনের পদচিহ্ন ধ'রে নারীর বুকের তৃষ্ণা ব্যাকুল হয়ে পিছু পিছু ছুটে যায়,—পুরুষ কতটুকু জানে—নারীর সে কত আপন?

আবার দেখা বিশ্বকেশ্বর মন্দিরে। মন্দির-প্রাঙ্গণ জনহীন, পাশেই পর্ব্বতের সানুদেশে অরণ্য। এখানে ওখানে তপস্বীর আস্তানা। মধ্যাহ্নে নিশুতি, যাত্রীর সমাগম নেই।

সে বললে, যাবার আগে জানতে পারলুম না কোনোদিন জানা সম্ভব হোতো না। যা পাবার নয় তার জন্যেই কেবল মাথা কুটতে আসিনি। সাধ ছিল তোমার প্রসন্ন শুভকামনা নিয়ে যেতে পারবো। কেবল কি হাতই পাতবো, দিতে পারবো না কিছু? এই নাও, এই রইল তোমার পায়ের কাছে আমার বাঁশি, এই পীতবাস, এই আমার মোহনচূড়া। জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে এই সাধ রইলো, তুমি যেন সহজে আমার কাছে আসতে পারো, যেন বাধা না থাকে দুই দিক থেকে। কাঁদো কেন?

শীলাবতী বললে, ভাবছি জন্মান্তর।

আমার আশা আরো বড়, আমি ভাবছি এই জীবনেই নয় কেন? বেশ, আমি চললুম। যত দূরেই যাই যেন তোমারই কাছে পৌঁছতে পারি।

শীলাবতী হাত ধ'রে বললে, কোথায় যাচ্ছ?

কোথায়? যাচ্ছি দেশে, কল্‌কাতায়। সেখান থেকে যাবো বম্বে, বম্বে থেকে যাবো বিলেত, বিলেত থেকে পৃথিবী!

• • •

পায়ের শব্দে শীলাবতীর চমক ভাঙলো। এ কি, সে নিশ্চল হয়ে ব'সে রয়েছে তার পায়াভাঙা তক্তাখানার উপর! স্বামী ফিরেছেন অফিস থেকে।

স্বামী বললেন, কই, নিমন্ত্রণে যাওনি?

মুখের দিকে চেয়ে শীলাবতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, থাকগে, ভালো কাপড়-চোপড় নেই, ছেলেটারও অসুখ,—যাবার মন নেই।

শ্রান্ত হয়ে সে তক্তার উপর গা এলিয়ে শুয়ে পড়লো।

১

যৌবন কোথা ? যৌবন কই ? জীবন্ত যৌবন ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্তস্বর
আদর্শবাদী, প্রবল, তীক্ষ্ণ, কই সে পূর্ণ মন ?
শিব সুন্দর সত্য শুভঙ্কর !
অপরের দ্বারে মর্য্যাদা-হীন ভিক্ষা যাহারা যাচে,
প্রাণ-শক্তির ঝুটা উৎসবে উদ্বাহ যারা নাচে,
তুচ্ছ হুজুগে মাতিয়া যাহারা চীৎকার তুলিয়াছে
ভয় ভয় নাদে কাঁপাইয়া অম্বর
বাংলা দেশের যৌবন কি গো আজিকে তাদের কাছে ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্তস্বর।

২

অগ্নি ঝঞ্ঝা বন্যার মত দুর্দ্দান যৌবন !
বাংলা দেশের আছে যৌবন হেন ?
যদি থাকে তবে প্রতিপদে কেন শিকলের ঝন্ ঝন্ ?
সবারই পিঠেতে চাবুকের দাগ কেন ?
সারা দেশ জুড়ে শঙ্কার ছায়া ঘনাইছে দিবা রাতি,
ঝরিয়া পড়িছে আশার কুসুম, নিভিয়া যেতেছে বাতি
অথচ আমরা গৌরব করি —'আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি
ছোট নহি মোরা—নহি মোরা বর্ব্বর !'
যৌবন, হায়, সে কি করে শুধু রসনার মাতামাতি ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্তস্বর।

৩

বাংলা দেশের যৌবন আছে প্রমাণ কে দিবে তার ?
প্রাণ-প্রদীপ্ত কই সে যুবন্ বীর !
সূর্য্যের মত উদিত হইয়া নাশিবে অন্ধকার
বজ্র-কণ্ঠে কহিবে সুগম্ভীর—
হও আগুয়ান জীবন-যুদ্ধে এস এস চল ত্বরা
বীর্য্যবন্ত ভোগ্য বীরের ভোগ্য বসুন্ধরা
অপেক্ষা করে তাহারই লাগিয়া কমলা স্বয়ম্বরা
হস্তে বহিয়া বিজয়-মাল্য, বর।
বাংলা দেশের কোথা সেই বীর প্রদীপ্ত-প্রাণ-ভরা ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্তস্বর।

৪

বাক্যেই নহে কার্য্যে প্রমাণ করিবে শক্তি তার
কই সে সতেজ সুস্থ সে যৌবন ?
মন্ত্র-সাধনে সিদ্ধ হইবে যাহার পুরুষকার
তাহারই লাগিয়া করিবে জীবনপণ,
বাধার পাহাড় যার পদ-তলে গুঁড়াইয়া হবে ধূলি
আগাইয়া যাবে বজ্র-মুঠিতে বিজয়-পতাকা তুলি
স্কন্ধে বহিবে দারিদ্রভার—নহে ভিক্ষার ঝুলি—
কই সে যুবক—কই সে জাতিস্মর !
তারই আশা-পথ চাহিয়া রয়েছি সকল দুঃখ ভুলি,
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্তস্বর।

৫

ভারতবর্ষে বঙ্গদেশই ত যৌবন-প্রসবিনী
শুনিয়া এসেছি আকুল কর্ণ ভরি
সারা ভারতের জাত্যভিমান বাংলার কাছে ঋণী
ইতিহাসে লেখে, বিশ্বাসও তাহা করি।
কিন্তু আজিকে সেই বাংলার কোথা সেই যৌবন
জাগো যৌবন, থাকো যদি তুমি, খোলো তিমিরাবরণ
মিথ্যা ভস্মে আবৃত্তি রাখিবে বল আর কতক্ষণ
সত্য বহ্নি তব অবিনশ্বর !
যৌবন কোথা ? যৌবন কই ? জীবন্ত যৌবন ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্তস্বর।

৬

তুচ্ছ করিয়া জীবন মৃত্যু উচ্চে তুলিয়া শির
উর্দ্ধে রাখিয়া দেশের জাতির মান
ধন্য করিয়া বঙ্গদেশেরে জাগো আজি তুমি বীর
প্রণাম করিয়া গাহিব তোমারি গান।
স্বদেশের নামে স্বার্থের বোঝা করিয়া বেড়ায় ফেরি
প্রাণ চাহে না ত গান গাহিবারে সে ফেরিওলারে বেরি
থামাইয়া দাও এ আড়ম্বর চীৎকার তূরী-ভেরী
ধ্বংস কর এ মিথ্যা ভয়ঙ্কর।
বাংলা দেশের যৌবন তব জাগিবার কত দেরী ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্ত স্বর।

জীবনের যুদ্ধ

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

গুপ্তর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছি আমি এবং অনেকে।

গুপ্ত অবশ্য শিকারী। মস্ত বড় শিকারী। তাঁর রাইফেল কত হিংস্র জন্তুর যে ভবলীলা সাঙ্গ করেছে তার সংখ্যা নাই। এ শুধু তাঁর মুখের গল্প মাত্র নয়, এ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। এ গর্ব যে তিনি সত্যই করতে পারেন, তা তাঁর বাড়ীর বসবার ঘরখানি দেখলেই বেশ প্রমাণ হয়ে যায়।

বসবার ঘরের সাজসজ্জার প্রধান উপকরণই হ'ল তাঁর নানা জন্তুর নানা অঙ্গের অংশ। দেয়ালে ডানা বিস্তারিত বিচিত্র পাখীর শব, মেজেতে গণ্ডারের চামড়ার কার্পেট, দরজার দুপাশে সাদা হাতীর দাঁত জোড়া করান; আর ঘরের প্রতি কোণেটিতে মোটা হাতীর পা, না হয় গণ্ডারের পা। কেবল মাত্র বসবার জন্যই যা আছে সোফা এবং গদি আঁটা চেয়ার। তাও বেড়া—হরিণের বা চিতাবাঘের বা হয়ত বেঙ্গলের চামড়ায়। পা রাখবার স্থানটিতে পাওয়া যাবে বড় বড় ভালুক বা হয়ত বেঙ্গলের চামড়া আস্তীর্ণ। এক কথায়, তাঁর বাইরের ঘরখানিকে বাদুঘরের একটি অংশ-বিশেষ বলে ভুল করে নেওয়া কারও পক্ষে অসম্ভব নয়।

সেই ঘরে বসে চা-ই খাও বা অন্য যে-কোন আকর্ষণই থাকুক, মনটা আপনিই এই সব শিকারের বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। মানুষের অনুসন্ধিৎসু মনের গল্প শোনার ইচ্ছাটা সাধারণতই প্রবল। সুতরাং প্রত্যেকটি শিকার বস্তুর সঙ্গে জড়িত যে শিকার-কাহিনী তা জানবারও একটা স্বাভাবিক কৌতূহল মানুষের মনে আসে।

এই কৌতূহলের বশবর্তী বোধ হয় সব থেকে বেশী হয়েছিলাম আমি, কারণ আমারই মুখ থেকে গুপ্তর কাছে এই অনুরোধ ব্যক্ত হয়ে পড়ল যে, এত ত শিকার করেছেন, বাঘ, হাতী, গণ্ডার ইত্যাদি, তার একটা গল্প বলুন না শুনি।

আমার এ অনুরোধ সকলেরই মনঃপূত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কারণ সকলেই একবাক্যে আমার সেই অনুরোধের সমর্থন করলেন।

গুপ্ত বললেন—গল্প বলতে আমি রাজী আছি; কিন্তু কোন্ গল্পটা বলে দিন।

এই খানেই হ'ল সমস্যা। দশজনে দশ রকম মত প্রকাশ করলেন। কেউ বললেন, এই যে বাঘের চামড়াটা পড়ে রয়েছে, এই বাঘ শিকারের কাহিনীটি বলুন। কেউ বলেন, ঐ যে হাতীর বড় বড় দাঁত দাড়া করা রয়েছে তার গল্পটি বলুন। এইরূপ নানা বিরোধী অনুরোধ সমস্যার সমাধান না ঘটিয়ে তাকে আরও জটিল করে তুলল।

হঠাৎ খেয়াল বশে আমি বলে উঠলাম, নির্ধারণ করবার ভার সম্পূর্ণ আপনার উপর। যে কাহিনীটি আপনার মতে সব থেকে লোমহর্ষণ হবে, সেই কাহিনীটিই আমাদের আজ উপহার দিন।

গল্পের বিষয়গুলি কি, তা যখন আমাদের জানা নেই এবং তাঁর নিজের সবগুলিই জানা আছে, বাছাই করবার তার সম্পূর্ণ তাঁর উপর ছেড়ে দেওয়াই সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত। এ বাবস্থাতে আমরা বাস্তবিকই ঠকিনি। তার সত্যতা গল্পটা বলা হয়ে গেলে সকলেই বুঝতে পারবেন।

আমার এই প্রস্তাব সে সভার সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল। কাজেই গুপ্ত তাঁর কাহিনী বলতে সুরু করলেন। গল্পটা এখন তাঁর নিজের কথাতেই চলবে।

"চাকুরীর প্রথম জীবন। তখনও বিবাহপাশে আবদ্ধ হইনি। তাই মনে যেমন দুর্জয় সাহসও ছিল, জীবনটাকে তেমন কোন মূল্য দেবারও প্রয়োজন হত না।

থাক সে কথা। তুলনা আমার হেড-কোয়ার্টার্স। দক্ষিণে সুন্দরবনের জঙ্গলে বন পরিদর্শনে বেরিয়েছি। লক্ষ করে গিয়েছি, জলেশ্বর নদ ধরে সোজা দক্ষিণে। এই জলেশ্বর যে জায়গাটায় সমুদ্রের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে সেটার নাম হল হরিণমাটা। দুপাশে বিস্তীর্ণ চর, বালুর নয়, কাদা মাটির। জোয়ারের জল পেয়ে পেয়ে সে মাটিতে প্রচুর সবুজ ঘাস হয়েছে। আর সেই ঘাস খেতে সেখানে হরিণের ভিড় হয় অনেক। সেই জন্যই স্থানটির নাম হরিণমাটা। সেইখানে লঞ্চ নঙ্গর করেছি।

সেদিন বিকেলে বেলা মনটা বড় ছটফট করছিল। সারাদিন একঘেয়ে একই স্থানে লঞ্চে বসে কেটেছে। কোথাও বেড়িয়ে আসবার ইচ্ছাটা তাই প্রবল হয়ে উঠল। তখনও পক্কা দুই বেলা আছে। ডিঙ্গি বোটে করে বেড়িয়ে আসা যাক না নদীর ধারে ধারে—মন্দ কি?

লঞ্চের দুটো মাঝিকে ডিঙ্গি বোট নামাবার আদেশ দিয়ে নেমে পড়লাম কাবিনে হতে। শিকার করবার বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলেও রাইফেলটা সঙ্গে নিলাম। ওটা একটা অভ্যাসের মত হয়ে গিয়েছিল। এই জঙ্গলাকীর্ণ দেশে এটুকু সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তাও ছিল যথেষ্ট।

দুর দুরে হাওয়া। নদীতে ঢেউ নাই, যেন ঘুমাচ্ছে। আমরা বেশ আরামেই নদীর তীর ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

খানিক দূরে গিয়ে এক অতি মনোরম দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। যেখানে নদীর মোহনায় সবুজ ঘাসে ভূমির অনেকখানি বিস্তার জুড়ে—সেখানে অনেক গণ্ডা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। এইখানেই ভূমির একটু বর্ণনা করা দরকার। সুন্দরবনের সব নদীতেই জোয়ার-ভাঁটা খেলে। নদীর ধারে জোয়ার ও ভাঁটায় জলে রোজ যে অংশটি দিনে দুবার করে জলে নিমজ্জিত হয় এবং জাগে, সে অংশে কোন উদ্ভিদ জন্মায় না। সে জায়গা এমন কর্দমাক্ত যে, সেখানে হাঁটতে গেলে পা প্রায় হাঁটু অবধি

আবার ফুটে যায়। তারপর এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড থাকে যেখানে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার জোয়ার ভিন্ন জল দেখা যায় না। এই ভূমিই সবুজ ঘাসে ভরে গিয়েছে, তবে এখানেও কাদা। এর পরে জলের গাছ আরম্ভ হয়েছে, বেতের ঝাড়ই তার মধ্যে পায়। তারা এত ঘনিষ্ঠ যে তার ভিতরে সূর্য প্রবেশ করতে পারে না।

সেই হরিণের দল দেখে মাঝি দুজনের হঠাৎ হরিণের মাংস খাবার লোভটা অতি প্রবল হয়ে উঠল। তারা বললে, একটা হরিণ মারলে না হুজুর, কয়েকদিন আমাদের তাগো মাংস পদার্থ জোটে নি। বন্দুক ত হাতেই আছে।

বন্দুক যে হাতে ছিল সে কথা ঠিক এবং হরিণ শিকার করতে আসব ভেবে আসিনি, তা হলেও সে ইচ্ছাটা এখনই মনে পোষণ করা যেতে পারে। কিন্তু অন্তরায় ছিল। তখন ফেব্রুয়ারী, হরিণ মারা বারণ।

সে কথা তাদের বললাম। তবু কি তারা শোনে? তাদের অনুরোধ এবং উপরোধ শেষটা সত্যই আমার মতির পরিবর্তন ঘটাল। আমি বললাম যে মেরে হরিণ ত কিছুতেই নিতে পারি না, তবে যদি শিংওলা হরিণ দেখাতে পার, ত চেষ্টা করে দেখি!

সে কথা শুনে তাদের আর উৎসাহ দেখে কে? নিঃশব্দে ক্ষিপ্রগতিতে নদীর ধারে ধারে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম, সেই হরিণের দলের অভিমুখে। প্রায় সিকি মাইল এই ভাবে চলার পরে সত্যই তাদের ঢালুর জোরে একটা শিংযুক্ত হরিণ দেখা গেল।

আমরা ছিলাম নীচে জলের উপর। নদীর কোলের লম্বা ঘাস আমাদের সেই হরিণযূথ হতে প্রায় অদৃশ্য করে দিয়েছিল। তাদের গতিবিধি দেখে মনে হল, তারা আমাদের উপস্থিতির কোন আভাস পায় নি।

এ ক্ষেত্রে তাদের কথা আমার রাখতেই হয়। নৌকা থামাতে বললাম। শিংওলা হরিণটা আমার কাছ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে ছিল। তাতে ক্ষতি নাই, রাইফেলের গুলি এতদূর হতে লাগলেও কাজ দেবে। আমি বেশ ধীরভাবে সেই হরিণের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম।

বন্দুকের ধোঁয়া চোখের সামনে মিলিয়ে যাবার আগেই দেখা গেল যে হরিণের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে আর সেই শিংযুক্ত হরিণটা মাটিতে পড়ে গেছে। অব্যর্থ প্রমাণ যে গুলি লেগেছে। মাঝিরা উল্লাস করে উঠল।

কিন্তু পর মুহূর্তেই আর একটা কাণ্ড ঘ'টে মাঝিদের সে উল্লাসকে তখনই থামিয়ে দিলে। হরিণটা মাটি হতে উঠল, উঠে খুঁড়িয়ে তিন পায়ে ছুটতে আরম্ভ করল।

সঙ্গে সঙ্গে নৌকাতেও একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। মাঝি দুজনেই দুখানা দা নিয়ে নৌকা হতে ঝাঁপিয়ে তীরে পড়ল এবং সেই হরিণের পেছনে ছুটতে লাগল। তাদের মানা করলাম কেতে, কিন্তু ফল হল না। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে কে কার কথা শোনে?

তারা ছুটতে ছুটতে আমায় সংক্ষেপে বলল: হরিণ সমস্তই আমার কথা এবং একেবারে যে মরে যায় নি সেটা তাদের সৌভাগ্য। এখন যদি তারা তার মরবার আগেই নাগাল পায়, তা হলে তার জবাই-করা মাংস খাবারও সম্ভাবনা আছে। এই তখন সুযোগ কে ছাড়ে?

অগত্যা আমার নৌকা লাগলামই এখন কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল; একটা দাঁড় অগভীর জলে মাটিতে পুতে তার সঙ্গে নৌকাটাকে বাঁধলাম। একবার মনে আশঙ্কা হল যে এই হরিণের মাংস আর এক জাতীয় জীবেরও বিশেষ উপাদেয় খাদ্য এবং তারা বাটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে একটা বিপদ না ঘটায়। হয়ত নামা প্রয়োজন। কিন্তু নামলে হাঁটুসমান কাদা ভেঙ্গে করে হাঁটতে হবে, আবার স্নান করতে হবে। কত অসুবিধা, কত অসুবিধা। সে ক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে না নেমেই নৌকায় অপেক্ষা করব ঠিক করে নৌকায় বসে রইলাম। মাঝিরা গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আন্দাজে দশ বার মিনিট হয় ত কেটে থাকবে। সঙ্গে ঘড়ি ছিল না, ঠিক বলতে পারব না। হঠাৎ দুজন মাঝির যুগপৎ আকুল আর্তনাদ ও ক্রন্দন আমাকে জানিয়ে দিলে। বুঝলাম, ভাগ্য মন্দ, যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই ঘটেছে। অগত্যা সাহায্যের জন্য বাওয়া একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করে আমি রাইফেলের ম্যাগেজিনে বর্তমান গুলি ভরে পুরে নিয়ে তীরে লাফ দিয়ে নামলাম এবং সেই কর্দমাক্ত ভূমির উপর দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব সেই চীৎকারের স্থানের দিকে ছুটলাম।

তৃণভূমি অতিক্রম করে যখন কমের নিকটবর্তী হলাম, তখনও তাদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন তাদের ডাক দিলাম। সুখের বিষয় ডাক গলায় তাদের সাড়া পেলাম মাথার উপর থেকে। উপরে চেয়ে দেখি দুজনে দুই গাছের আগার ডালে উঠে বসে আছে, মুখে ভয়জনিত বিকারের চিহ্ন।

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে তারা বুঝিয়ে দিলে যে তারা বাঘ দেখেছে এবং তাদের তাড়া করেছে কিনা দেখবার আগেই তারা প্রাণভয়ে চীৎকার করেছে এবং ছুটে গাছে উঠেছে।

বাঘের উপস্থিতির সংবাদ শুনে আমার লোভ হল। কোন শিকারীর না হয়? তাদের বললাম—নেমে আয়। কোথায় বাঘ, দেখাবি চল্।

তারা বললে—না।

তাদের বললাম—ভয় কিসের? সঙ্গে ত বন্দুক আছে।

তাতেও তারা ভরসা পেল না। মোটেই নামতে চাইল না।

বেলা শেষ হতে আর বেশী দেরী ছিল না। দেরী করলে শিকার ফসকে যায়। কাজেই নিজে জুতো খুলে, যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে সতর্পণে গহন বনে প্রবেশ করলাম। উত্তেজনায় বুক দ্রুত চলতে সুরু করেছে, সব কটা ইন্দ্রিয় আমার অতি মাত্রায় সজাগ। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে প্রকৃতি যেমন করেই সাড়া দিয়ে উঠে।

খানিকক্ষণ এইরূপে ঘনসন্নিবিষ্ট বন অতিক্রম করে সামনে একটা জায়গা চোখে পড়ল, যেখানে বড় গাছ নাই, কেবল তৃণপূর্ণ ভূমি। এইরূপ তৃণপূর্ণ ভূমি জঙ্গলে স্থানে স্থানে থাকে। সেখানে দেখলাম অনেক হরিণ দাঁড়িয়ে। তাদের পৃষ্ঠ, আমি যেদিকে দাঁড়িয়ে তার অপরদিকে

নিবদ্ধ। তাদের দেহের মাংসপেশীগুলি শক্ত হয়ে রয়েছে, সর্বাঙ্গে চঞ্চলতার আভাস। অনুমান করে নেওয়া শক্ত হল না যে এইদিকে তারা ভয়ের আশঙ্কা করে এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে আছে—যখনই ভয়ের কারণ আসবে তখনই পালাতে হবে। আমি ধীরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরেই আমার সে অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হল এবং সৌড় দিয়ে সেই গভীর অরণ্যে বিলীন হয়ে গেল। এই কথাগুলি বলতে যত সময় লাগে তার চেয়ে ও অল্পসময়ের মধ্যে এই কাণ্ডটি ঘটে গেল। তখন বুঝতে পারলাম না কেন এমন ঘটল, কিন্তু পরমুহূর্তেই তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

সেই পরিষ্কার ভূমির অপরপার্শ্বে যেদিকে হরিণদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, সেখানে শুকনো পাতার ওপর একটা ভারি জিনিস টানলে যেমন একটা শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ শোনা গেল। সেদিকে চেয়ে দেখি গাছের ফাঁকে ফাঁকে ডোরা-কাটা দেহ আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে, আর মনে হল লাঙ্গুলটা একটা কিসের শব টানছে।

মনে মুহূর্তের মধ্যে অনেক চিন্তা খেলে গেল। বুঝতে বাকি রইল না যে এই পশুটিও আমার বান্ধবদের মতই হরিণশাবকলোলুপ হয়ে এই হরিণ দলের পিছু নিয়েছিল। তবে হরিণ বড় ক্ষিপ্রগতি, তাই সুবিধা করতে পারে নি। কিন্তু আমার গুলী হরিণটাকে আহত করে তার সহায়তা করেছিল। হরিণটা আহত হয়ে যখন ছুটেছিল, তখন বাঘিনীও তাকে যেমন ধরতে ছুটেছিল ইনিও সেই উদ্দেশ্যে ছুটেছিলেন। ফলে উভয়ের পথে সাক্ষাৎলাভ অবশ্যম্ভাবী এবং ঘটেও ছিল তাই। সেই কারণেই বাঘিনীর চিৎকার এবং বৃক্ষারোহণ এবং আমারও তাদের সাহায্য করতে এসে এখানে আগমন। ব্যাপার ত মন্দ নয়। দেহও একটু দেখা যাচ্ছে। এখনই কি ট্রিগারটা টিপব? বড় নেতে হচ্ছিল।

কিন্তু বুদ্ধিশক্তি তখনও আমার খুবই সজাগ ছিল। সে উপদেশ দিল সেটা করা ঠিক হবে না। কারণ অনেক। প্রথমত কোন জায়গায় গুলী লাগাতে পারব তার ঠিক নাই। ফলে বাঘকে যদি মারাত্মক রকম জখম না করতে পারি, বাঘ প্রতিশোধ নিতে চাইবেই। আমি খোলা মাঠেতে দাঁড়িয়ে। কাজেই প্রতিশোধ নেওয়া তার পক্ষে কিংবা শক্ত কাজ হবে না। সুতরাং ঠিক করলাম যে সেখানেই গাছের আড়ালে বসব, বন্দুক ঠিক রাখব এবং অপেক্ষা করব। যে মুহূর্তে বাঘের সমগ্র দেহ দৃষ্টি পথে আসবে এবং মারাত্মক স্থান লক্ষ্য করে গুলী-ছোঁড়া সম্ভব হবে, সেই মুহূর্তেই ট্রিগার টিপব।

অগত্যা বসলাম—বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক মিনিট, দু মিনিট, অনেক মিনিট যেন কাটল। আশ্চর্যের বিষয়, বাঘের আর কোন সাড়া শব্দ নাই। সমস্ত বন আশ্চর্য রকমের এক নীরবতায় নিমজ্জিত হল। ভারি অদ্ভুত লাগল।

মানুষের যে ইন্দ্রিয়বলে যদি কিছু থাকে তা তাই হঠাৎ আমার মধ্যে কাজ করে উঠল। দৃষ্টি আমার সামনের দিকে নিবদ্ধ। পেছনে ত দূরের কথা, আশে পাশে কি ঘটছে, আমার তা দেখবার বা জানবার কোন উপায় ছিল না। হঠাৎ আমার ডাইনের দিকে ফিরবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল। কি করণে জাগল, কেন জাগল, সেটা তখন ঠিক বুঝতে পারি নি। কিন্তু ইচ্ছা এত প্রবল যে তাকে না সম্মান করে থাকা গেল না। আর সম্মান করে নিতেও হয়েছিল ষোল আনা।

ডানদিকে চেয়ে দেখি একটা খুব নীচু ঝোপের অপরপার্শ্বে স্বয়ং বাঘ মহারাজ বসে। শিকারের ওপর লক্ষ্য দেবার আগে যে ভঙ্গিতে তারা বসে থাকে, ঠিক সেই ভঙ্গিতে বসে। আমার থেকে বেশী দূরে হবে না, বড় জোর আট দশ হাত দূরে। মুখের পা দুটো সামনে এগিয়ে দেওয়া, বুকটা প্রায় মাটির সঙ্গে লাগান, দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ দেহে পড়ছে।

আমি যখন দেখেছি, তখন ভাববার বা চিন্তা করবার সময় ছিল না। ঠিক শিকারের উপর লক্ষ দেবার পূর্বক্ষণ, আর এক কি দুই মুহূর্ত পরেই ঝোঁবহয় দেবে। এমন ক্ষেত্রে মানুষ নিজে ভাবতে পারে না, তার বুদ্ধি-শক্তি আপনিই সে কাজ নেয়ে নেয়; সে নিজে বেরুকে চালায় না, দেহ নিজেকেই চালিয়ে নেয়। আমারও হল তাই। কি ঘটে গেছে এবং এক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য, সেকথা ভেবে শেষ করবার আগেই আমার মন ও দেহ একযোগে তাদের কাজ করে ফেলে নিল। বন্দুক ডান পাশে ফিরিয়ে বাঘের মাথা লক্ষ্য করে গুলী টিপলাম।

লক্ষ্যটা আশ্চর্য রকম ঠিক হয়ে গিয়েছিল—ঠিক দু চোখের মাঝখানে কপালে গুলী ঢুকেছে। বাঘ লাফায় নি, শব্দ পর্যন্ত করতে পারে নি; কারণ সেটা করবার সময় হয় নি, তার আগেই রাইফেলের গুলী তার মস্তিষ্ক ভেদ করে তার প্রাণকে শেষ করে দিয়েছে। তা যদি না হত, তা হলে যে কি হত সেইটা ভেবে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সবে আমার মনটাকে ঠিক করে নেবার চেষ্টা করছি এমন সময় শুনি মাঝিদের পরস্পরনি এবং গলার আওয়াজ। বুঝলাম, বন্দুকের শব্দ শুনে হাঁক, সে কারণেই হাঁক, তারা আশ্বাস পেয়েছে এবং আমার দিকে আসছে। আমার পক্ষে সেটা খুবই প্রয়োজনীয়।

অনতিবিলম্বেই তারা আমার কাছে এসে পড়ল এবং কি যে ঘটেছে সে ভাল করে বুঝে নেবার আগেই তারা একটা ভারি উপভোগ্যের ব্যাপার ঘটিয়ে বসল। হাতে তাদের সেই গা। তারা তীরবেগে আমার কাছে ছুটে এসে আমার পাশেই একটা কটা রঙের জীবন্ত দেহ পড়ে থেকে, তার দিকেই সবেগে ছুটল।

আসলে তারা ভুল করেছে। বাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হওয়া সত্ত্বেও তাদের সেই হরিণের মাংসের লোভ এখনও বিসর্জন দেয় নি। বেশ পেটুক লোক বলতে হবে। তাই বন্দুকের শব্দ শুনেই তারা এই অভ্রান্ত অনুমান করে নিয়েছে যে অকুস্থলে হরিণকেই আমি ধরাশায়ী করতে সমর্থ হয়েছি। মানুষ অনেক ক্ষেত্রে যা ভাবে তাই দেখে। তাই বাঘের গায়ের কটা রঙের মাংসটুকু অবলম্বন করেই তারা মৃত বাঘের দেহকে হরিণের দেহরূপে ধরে নিয়ে দেখেছে; শুধু তাই নয়, বিশুদ্ধ মাংস পাবার লোভও তাদের ষোল আনা বর্তমান; তাই তার প্রাণ বের হবার আগেই তারা যাতে তাকে জবাই করতে পারে তার জন্য তার দিকে ধা নিয়ে ছুটেছে।

কিন্তু বৃদ্ধটার গল্পটা শেষ না হওয়ার আগেই নৌকাটা হেলে-দুলে এ ভ্রম তখনই দূর হয়ে গেল যে সেটা সেই হরিণ নয়, একেবারে আসল ডোরা-কাটা বাঘ। যেমনি সে উপলব্ধি হওয়া সেই সঙ্গে ঔক ভিঃ এর মত সব হাত দূরে ছিট্‌কে পড়ে তারা চিৎকার করে উঠ্‌ল।

আমি হেসে বলে উঠ্‌লাম—ওটা মরে গেছে রে, ভয় নেই।

সত্য প্রায় ডোবাবার জোগাড়। একেত সে হরিণের দেহটার খোঁজে বের হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মোটেই হয় না, বিশেষ ক'রে বিপদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন হাতে হাতে এমন করে মিলেছে। কাজেই মাঝিদের রাজি করিয়ে তিনজনে মিলে বাঘের মৃত দেহটাকে টেনে নৌকায় এনে তুল্‌লাম। মাঝিদের রাজী করান আর শক্ত হল না। প্রত্যক্ষ বাঘের মৃতদেহ তাদের হরিণ খাবার লোভকে এমন সহজেই নির্মূল করল।

সন্ধ্যে ফিরে এসে মাঝিদের মোটা রকম বক্‌শিস্ দিয়েছিলাম ভাল করে মাংস কিনে খাবার জন্যে।

এ গল্প শুনে আমরা সকলে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেছিলাম। আমার প্রস্তাব যে এমন সুফল বেয়ে আনে কেউ ভাবতে পারেন নি। কাজেই আমায় ধন্যবাদ দিয়ে এবং বিশেষ করে গুরুর নির্ভীক বিক্রমের তারিফ করে সেদিন আমাদের চায়ের পার্টি ভঙ্গ হয়েছিল।

হৃদয়তীর্থ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-আর-এস

শুধা'য়ো না নাম—জীবনের পথে একাকী আপন মনে
অনাদি পথিক চ'লেছি নিরন্তর—
ক্লান্তীন মরু পার হ'য়ে ফিরি দুর্গম বনে বনে—
প্রান্তরে মোর ভ'রে ওঠে অন্তর।
আকাশের মুখে অনিমেষ চোখে চাহি,
বাতাসের কানে আনমনা গান গাহি,
ভাবনা ভাসাই শরৎ-মেঘের সাথে,
অন্তরার সনে মাঝে মাঝে করি খেলা
পথ চ'লে মোর কেটে যায় সারা বেলা,—
হাতখানি রাখি সুদূরের বাঁকা হাতে।

চলিতে চলিতে ঘুগ্ধ নয়নে হেরি যে চলার পাশে
জীবনের পথে জমিয়া উঠিছে ভিড়;
নীড়-হারা যত মানুষের মন কি গভীর আশ্বাসে
বেঁধেছে যতনে স্নেহ ও প্রেমের নীড়।
নির্বাক্ রহি দাঁড়ায়ে হৃদয়-তীরে,
অবগাহি' উঠি প্রীতির তীর্থ-নীরে—
ধুয়ে যায় যত দেহ ও মনের ধূলি—
হৃদয়তীর্থে যতবার অবগাহি
শুধু মনে হয়—বন্ধন মোর নাহি—
হৃদয়-কোরকে শতদল যায় খুলি'।

অজানার লাগি অভিসার পথে শত তীর্থের স্নান,
হৃদয়ে নিবিড় হৃদয়ের স্পন্দন—
মিথ্যা নহে সে, মর্ত্যে সে দেয় সত্যের সন্ধান—
সুদূরের পথে সে ত নহে বন্ধন!
চলিতে চলিতে পথে তাই বারে বার
হৃদয়তীর্থে জানাই নমস্কার—
প্রেমের পরশে ভরিল চিত্তখানি;
যাত্রা-পথের শতেক তীর্থ-বারি—
স্মৃতির পাত্রে সঞ্চয় শুধু তারি—
জীবনের চলা ধন্য করিয়া মানি।

ফিলিপাইনে বাঙ্গালী পর্য্যটক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রাণী চেরী ফুলের দেশে কয়েক মাস ভ্রমণ করে ইয়োকোহামা থেকে ডলার লাইনের 'প্রেসিডেণ্ট হ্যাকসন' যোগে এবার রওনা হলাম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলার দিকে, জাহাজখানি বেশ বড়, ১৬,০০০ টনের। এতে চারটি বিভিন্ন শ্রেণী—প্রথম, দ্বিতীয়, টুরিষ্ট ও তৃতীয়। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর জন্যও পৃথক পৃথক বিছানাযুক্ত কেবিন এবং তাহাদের জন্যও একটি ছোট পাঠাগার ও তাসপাশা প্রভৃতি খেলবার ঘর আছে দেখলাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ইয়োকোহামা থেকে ম্যানিলা পর্য্যন্ত ভাড়া বাবদ আমাকে দিতে হল ৬২ ইয়েন (৫০৲ টাকার মত)। আমার কেবিনে একজন ভারতীয় শিখকে সঙ্গী পেলাম। তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঐ জাহাজেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ফিলিপিনো ব্যতীত আর সকলেই চীনা ও জাপানী। জাহাজে আমার দিনগুলো বেশ কাটতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই ফিলিপিনোদের সঙ্গে আলাপ হল ও পরিশেষে বিশেষ আলাপ ঘনিষ্ঠতাতেই পরিণতি লাভ করিল। এঁদের মধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কোন কলেজের ছাত্রী। কিছুদিনের জন্য বাড়ী যাচ্ছিলেন। এই ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ আনন্দ পেলাম না। তার জীবনযাত্রা, আচারব্যবহার ও হাব-ভাব—কিছুর সঙ্গে যেন প্রাচ্য-সংস্কৃতির কোন যোগাযোগ খুঁজে পেলাম না। তিনি যেন সম্পূর্ণরূপেই আমেরিকানাইসড্ হয়ে গিয়েছিলেন। যখনই তাঁকে আমার চোখে পড়ত—তখনই তাঁকে হয় লিপ্‌ষ্টিক্ ব্যবহার করতে নতুবা তাঁর কেশরাশি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখতাম।

ম্যানিলায় পৌঁছবার দিন দুই পূর্ব্বে আমাদের জাহাজখানি এক ভীষণ ঝড়ের সম্মুখীন হল। সেদিন প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত মূর্ত্তি দেখে আমি আতঙ্কিতই হয়েছিলাম। সারা দিন মেঘাচ্ছন্ন ও মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। জাহাজ তখন হংকং ও ম্যানিলার মধ্য পথে। চতুর্দ্দিকে কোথাও একটি পাহাড়ের চিহ্ন মাত্রও দৃষ্টিপথে এল না। সূর্য্য তখন অস্তমিত। চতুর্দ্দিক তখন

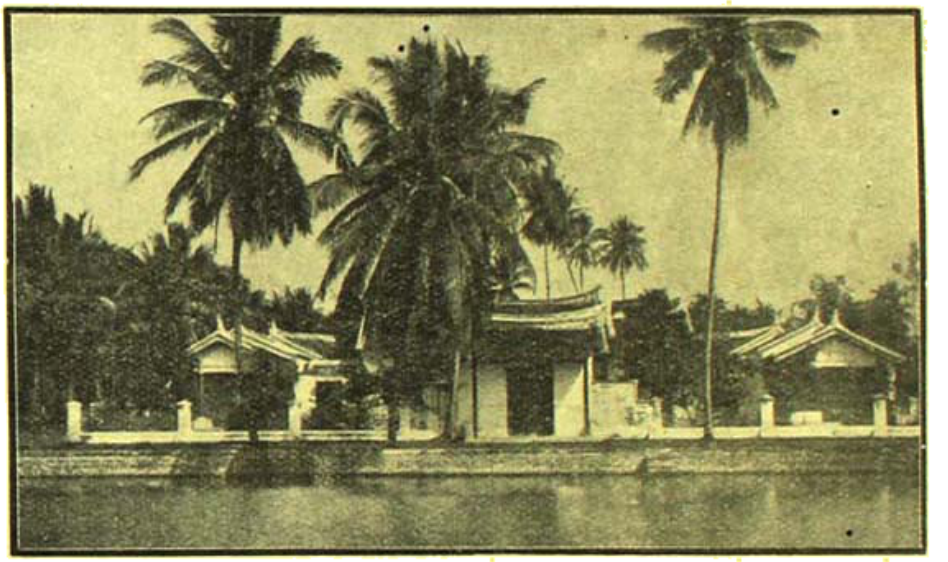

ম্যানিলা উপসাগরের কূলে ম্যানিলা সহর

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। এমনি সময় হঠাৎ একটা ঝাপটা বাতাস এল, মহাসাগরের মূর্ত্তিও যেন তখন পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। আমরা আসন্ন একটা ঝড়ের আশঙ্কা ক'রে যার যার ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। উত্তরোত্তর হাওয়াও বাড়তে সুরু করল—সে সঙ্গে আমাদের জাহাজখানিও বেশ দুলছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজের বিপদসূচক ঘণ্টা বেজে উঠল। আর কেউ বাইরে রইল না। সকলেই নিজের নিজের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেবিনে শুয়ে শুয়েই

পুরু কাচের জানালা দিয়ে পাহাড়ের মত বৃহদাকার ঢেউগুলি লক্ষ্য ক'রে অসহায় বালকের মত ভয়াতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। ঢেউগুলি যেন ডেকের উপর দিয়েই চ'লে যেতে লাগল। আমাদের জাহাজখানিকে যেন একটি তৃণখণ্ডের মত মনে হ'ল, পার্শ্ববর্ত্তী ঘর থেকে করুণ কান্নার সুর আমার ঘরে ভেসে আসছিল, যারা জীবনে কখনও ভগবান বলে বিশ্বাস করে নি—তাদেরও অনেককেই এই বিপদের সম্মুখীন হয়ে এবার উচ্চকণ্ঠে ভগবানের নাম করতে দেখা গেল। আমার অবস্থা তখন কাহিল, কিন্তু আমার চেয়েও কাহিল ছিল আমার সঙ্গী ভারতীয় বন্ধুটির। তিনি ত ভয়ে চক্ষুই মুদিত ক'রে নড়ার মত পড়েছিলেন। এই অবস্থায়ও জাহাজ

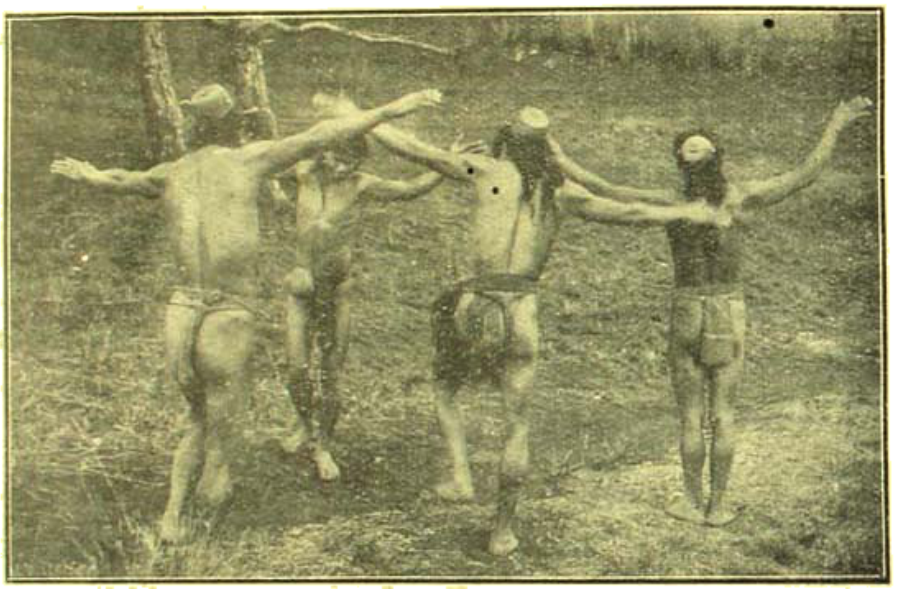

ফিলিপাইনে বানটক পর্ব্বতে অধিবাসীদের নৃত্য

চলতে সুরু করলে। প্রায় ছ ঘণ্টার পর ঝড় থামল—আস্তে আস্তে প্রশান্তের নামবীয় মূর্ত্তি শান্ত হ'ল—আর যাত্রীরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর। ক্রমাগত দশ দিন চলিবার পর আমাদের জাহাজ সন্ধ্যাকে এসে ম্যানিলা বন্দরে পৌছল। এই বন্দরে এখানে সেখানে আমেরিকানদের অনেকগুলি যুদ্ধ জাহাজ দেখলাম। ঐদিনই আমাদের জাহাজ ৭নং পিয়ারে এসে লাগল। এই পিয়ারটিই নাকি জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও সুন্দর। পিয়ারটি দ্বিতল বিল্ডিং—যাত্রীরা পিয়ার-এর দ্বিতলে অবতরণ করে। যাহোক, একজন কর্ম্মচারী এসে আমাদের ছাড়পত্র দেখে একে একে সকলকেই নামতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু রইলাম বাকী আমি ও কয়েকজন চীনা—যাদের ম্যানিলায় নামবার অনুমতি মিলল না—যদিও আমার সাথে ভিসা প্রভৃতি সবই ছিল। কেন অনুমতি পেলাম না—তা এক রহস্যই রয়ে গেল; কিছুক্ষণ পর পুলিশ পাহারায় আমরা লঞ্চে ক'রে অদূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে গেলাম—সেখানেই অন্যান্যের ন্যায় আমারও থাকবার বন্দোবস্ত হ'ল জেলে। জেলটি দ্বিতল বাড়ী, উভয় তলাতেই কয়েকটি ক'রে অপরিসর ঘর আছে লক্ষ্য করলাম, বিছানাপত্রের কোন বন্দোবস্ত ছিল না, থাকবার মধ্যে ছিল খান-কয়েক বেঞ্চ। দ্বিতলে এমনি একখানি বেঞ্চ দখল ক'রে নীচে গেলাম খেতে। খাবার আয়োজন দেখেই আমার ক্ষুধা কপালে উঠল। খাবার মধ্যে ছিল—একটি চীনা বাটিতে কিছু ঠাণ্ডা ভাত—তাও পর্য্যাপ্ত নয়—দুই টুকরা শুকনো মাছ ও একটি কলা। এমনি চমৎকার খাবার দেখে আমি নিঃশব্দেই উপরে চলে এলাম। অবশ্য যদিও আমি খেলাম না তথাপি এই জেল কর্ত্তৃপক্ষ আমার কাছ থেকে ঐ খাবারের মূল্য বাবদ একটি টাকা আদায় না ক'রে ছাড়লে না।

পরদিন প্রত্যূষে আমাকে অন্যান্যের সঙ্গে এমিগ্রেশন আপিসে হাজির করা হইল। পাসপোর্ট-অফিসার আমার ছাড়পত্রটি ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে আমাকে নামবার অনুমতি দিলেন এবং তদনুসারে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে আপিস পরিত্যাগের জন্য দাঁড়ালে ইউরোপীয় পোষাক-পরিহিত একজন উকিল ভদ্রলোক আমার কাছে উপস্থিত হয়ে পঁচিশ পেসো (১০০ সেন্টস্=১৷০) দাবী করল। দাবীর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললে যে উকিল হিসেবে আমার পক্ষ হয়ে আমার নামবার অনুমতির জন্য অনেক কষ্ট করেছেন; তদুত্তরে আমি তাকে একটি পয়সাও দিতে অস্বীকার করলাম ও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম যে আমি

আমার পক্ষ হয়ে কোন কথা বলবার জন্য কোন উকিলকে নিযুক্ত করিনি। এই কথা বলে যেতে উদ্যত হলে পাসপোর্ট-অফিসার আমায় পুনরায় ডেকে নামবার অনুমতি বাতিল ক'রে দিয়ে একটি অন্ধকার পূতিগন্ধময় ছোট্ট সেলে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানেই আমার বহুক্ষণ কেটে গেল ও ভাবলাম বোধ হয় আমার ঐ দেশভ্রমণের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিলুপ্ত হল। সন্ধ্যায় ঐ উকিল আবার আমার সঙ্গে ঐ জেলে দেখা করে বলল যে, তার দাবীর টাকা মেটালেই আমি নামবার অনুমতি পেতাম। ইতিপূর্ব্বে আমি জেল থেকে ফিলিপাইনে একমাত্র বাঙালী ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে ফোন ক'রে জানতে চাইলাম, তিনি আমার জন্য একটি জামিন দিতে পারেন কি-না। কিন্তু তার উত্তরে আমি নিরাশ হলাম, তাই অবশেষে আমায় ঐ উকিলের সাহায্যই নিতে হল। তাকে পঁচিশ পেসো ঘুষ দিয়ে আমি এবার ফিলিপাইনে অবতরণ করলাম। মানিলায় যে কয়দিন ছিলাম, সে কয়দিন ভারতীয় শিখদের স্থানীয় গুরুদ্বারাতেই অবস্থান করেছি।

এই গুরুদ্বারাটি নিজস্ব বাড়ী, কিছুদিন পূর্ব্বে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে এটি তৈরী হয়েছে। উপরের তলায় গ্রন্থজী রক্ষিত হয় ও সেখানেই প্রতি রবিবার মহাসমারোহে শিখদের প্রার্থনা হয় ও প্রসাদ বিতরিত হয়। এজন্য বহুদূর থেকেও শিখেরা এখানে আসে ও সমবেত হয়ে তাদের নিজেদের ও দেশের বিষয় আলোচনা করে। এই শিখদের সংখ্যা ফিলিপাইনে প্রায় তিন শ। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই পাহারাদারের কাজ করে, অথচ এই স্বল্পবেতনভুক পাহারাদাররাই একত্র হ'য়ে এত টাকা ব্যয়ে ঐ মন্দিরটি তৈরী করেছে, আবার এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রতিমাসে বহু টাকা খরচও করে। জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যে-কোন অসহায় ভারতবাসী এই মন্দিরে বিনা খরচে যত দিন ইচ্ছা থাকতে পারে। শুধু থাকাই নয়—তার খাবার বন্দোবস্তও এরাই করে। মানিলাতে আরও অনেক ভারতীয় আছেন, তাঁরা সকলেই ব্যবসায়ী—সিন্ধুপ্রদেশের লোক।

পরদিন কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র এই মন্দিরে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাদের অভিনন্দন জানালে। তাদের মধ্যে একজনের নামই আজ আমার স্মরণ আছে। তার নাম সোহন সিং। সে জীবনে কখনও ভারতবর্ষ দেখে নি। সে ওখানেই জন্মগ্রহণ করেছে, ওখানেই লালিতপালিত হচ্ছে, সে তখন এম্-এ পড়ত। সেই মানিলাতে "আন্তর্জ্জাতিক ছাত্র-সমিতি" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। সে খুব অমায়িক ভদ্রলোক, তার সঙ্গে আলাপ ক'রে আমি কতই না সুখী হয়েছি!

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, দুজন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে বেড়াতে

জাতীয় পোষাকে ফিলিপাইনবাসিনী

বার হব—এমনি সময় কয়েকজন ফিলিপিনো ও আমেরিকান খবরেরকাগজের প্রতিনিধি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। এঁরা আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ছাড়া ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক বিষয়েই প্রশ্ন করলেন; সেই সঙ্গে তাঁরা মহাত্মাজী ও কবিবরের সম্বন্ধেও অনেক প্রশ্নই করলেন—মহাত্মাজীর তখন কি অসুখ ছিল। তাই একদিন প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রগুলিতে বড় বড় হরফে

মহাত্মাজীর স্বাস্থ্য-সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল, এ সংবাদে তারাও বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিল। মহাত্মাজীর নাম এখানকার স্কুল পর্য্যন্তেও সুপরিচিত—অবশ্য লোকে তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানে না, শুধু জানে যে তিনি ভারতের

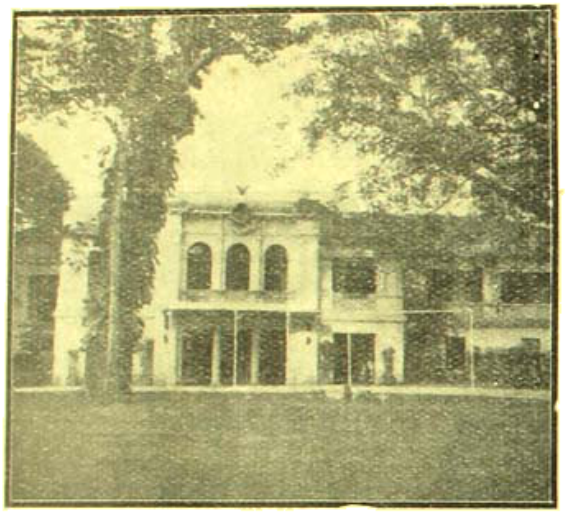

ম্যানিলায় ফিলিপাইন গণতন্ত্রের সভাপতির প্রাসাদ

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক যিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। আবার কেউ কেউ জানেন, তিনি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব, যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ জানেন—তাঁদের মধ্যেও অনেকেই তাঁর অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের মর্ম্মকথা বিস্তারিত ভাবে জানেন না। কবীন্দ্রের নাম শুধু শিক্ষিত সমাজেই সুপরিচিত—তাদের উপর তাঁর প্রভাবও অসীম—এমন কি মহাত্মাজীর প্রভাব থেকেও বেশী। শুধু এই দুজন ভারতীয় সন্তানের জন্যেই আমরা ভারতীয়রা এই দেশে শ্রদ্ধা পেতাম।

ম্যানিলা কয়েকশ' বৎসর ধরেই ফিলিপাইনের রাজধানী, শহরটি বেশ বড়—লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষের মত। শহরটি ঠিক ম্যানিলা উপসাগরের উপরেই। ফিলিপাইনে প্রায় চার হাজার দ্বীপ আছে—তার মধ্যে ঐ লুযান দ্বীপটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও এখানেই দেশের বড় বড় শহরগুলি গড়ে উঠেছে। ম্যানিলাও এই দ্বীপেই অবস্থিত। শহরের ভিতর দিয়ে একটি সরু নদী প্রবাহিত—নাম তার পেসিগ। এক একটি বড় কলের মত দেখায়। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও আদর্শ ঋতু প্রতি বৎসর হাজার হাজার বিদেশী ভ্রমণকারীকে আকর্ষণ করে। শহরটি ইতিহাসবিখ্যাত। এখানেই ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে স্পেনিয়ার্ড ও আমেরিকানদের মধ্যে যুদ্ধ হয় ও প্রায় চারশ বৎসর শাসনের পর স্পেনিয়ার্ডরা এখানে আমেরিকানদের হাতে পরাজিত হয়ে এদেশ পরিত্যাগ করে। স্পেনীয় শাসনকালে শহরটি প্রাচীরবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র শহর ছিল—অবশ্য তা আজও আছে। এর পুরাতন অট্টালিকা ও দুর্গ শুধু স্পেনীয় রাজত্বের অত্যাচার ও বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার মনে আছে, —যখন ফিলিপিনোরা স্পেনীয় শাসনের অত্যাচারের কথা আমার কাছে বলতেন—তখন তাঁরা ঘৃণায় ও রাগে শিউরে উঠতেন।

বর্ত্তমান শহরটি প্রাচীর-বেষ্টিত পুরাতন শহরের চতুর্দ্দিকে গড়ে উঠেছে। যাতায়াতের বেশ সুব্যবস্থা আছে। ট্রাম, বাস, তিন চাকার ছোট ট্যাক্সি ও কোলেসা আছে। ট্যাক্সির ভাড়া বেশ সস্তা, মাত্র ৫ সেণ্টাভোতে (১০০ সেণ্টাভো= ১ পেসো=দেড় টাকা) ট্যাক্সিতে প্রায় আধ মাইল যেতে পারা যায়। কোলেসা—দুই চাকার ঘোড়ার গাড়ী—একটি ঘোড়ায় টানে। শহরে দেখবার মত বিশেষ কিছু নেই, আছে

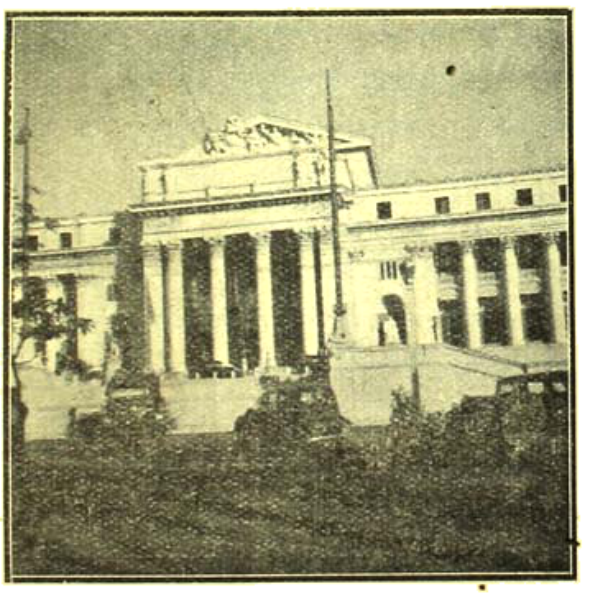

ফিলিপাইন গণতন্ত্রের ব্যবস্থা-পরিষদের গৃহ

মাত্র একটি ছোট্ট চিড়িয়াখানা ও একটি ক্ষুদ্র যাদুঘর। তবে ম্যাকোয়ারিয়ামটি যদিও ছোট, অনেক নূতন সামুদ্রিক জন্তু দেখা যায়, এই শহরের সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু—লুনেটা পার্ক। ইহা সমুদ্রের সম্মুখে একটি বিস্তৃত বাগান—

অনেক ফুল এর শোভা বর্দ্ধন করে আছে। সন্ধ্যাকালে যখন অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মি অদূরের পাহাড়শ্রেণীর উপর খেলা করে ও সমুদ্রবক্ষে যুদ্ধ-জাহাজগুলোয় বাতি জ্বলে ওঠে—আর এ-পারে ফুলের সুগন্ধি ভেসে বেড়ায় —তখন দর্শকমাত্রই এই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়, নিজেকে ভুলে যায়। এই সুবিস্তৃত বাগানের মধ্যস্থলে ফিলিপাইনের শ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক ডাঃ হোস্ রিজালের প্রস্তরমূর্ত্তি পার্কটির শোভা আরও বর্দ্ধন করেছে। এই মূর্ত্তিটি একে যেন একটি তীর্থস্থানে পরিণত করেছে। প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় এখানে অসংখ্য ফিলিপিনো এই দেশ-প্রেমিকের পদতলে এসে সমবেত হয় ও তাঁদের ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান ক'রে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে। এই স্বদেশ-প্রেমিক ফিলিপাইনের স্বাধীনতার জন্য তাঁর শেষ রক্তটুকু দান করেছিলেন। তিনি ১৮৯৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত হন ও সামরিক বিচারে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ঐ বৎসরেরই ৩০শে ডিসেম্বরের অতি প্রত্যূষে তাঁকে এই বাগানে গুলী করে হত্যা করা হয়। তখন ফিলিপাইনে স্পেনীয় শাসনের শেষ অধ্যায়। তিনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, নাট্যকার, কবি ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি বহু ভাষা জানতেন, তাঁর লেখনী তাঁকে ফিলিপাইনে অমর ক'রে রেখেছে। তাঁকে যেদিন উন্মুক্ত মুলেটা মাঠে হত্যা করা হয়—সেদিন মৃত্যুর পূর্ব্বে ইংরেজীতে একটি সুন্দর কবিতা লেখেন। সেই কবিতার একাংশ এই—

'I die while dawn's rich iris hues are
staining yet the sky,
Heralds of the freer day still hidden
from view'
Behind the night's dark mantle.
And should
The morning nigh
Need crimson, shed my heart's blood
quickly,
Freely let it dye
The newborn light with the glory of its
Ensanguined hue'.

সন্ধ্যার কূলায়ে

শ্রীকালিদাস রায়

রবি গেল অস্তাচলে। চিতাভস্ম-ধূমের তিমিরে
সন্ধ্যা এলো ঘনাইয়া আজি মোর অন্তরে বাহিরে।
রসবতী তটিনীর লাবণ্য মুহূর্ত্তে গেল ঘুচে,
দিগ্‌বধূর ওষ্ঠে ভালে রক্তরাগ কেবা দিল মুছে?
লুপ্ত গ্রামান্তের চিহ্ন, শশিহারা দিগন্তের পার,
মসীর পাথারে গৃহ লতা তরু সব একাকার।
আলোর বিদায়-গীতি বাজে শীর্ণ কূলায়ে কূলায়ে
ফুলেরা মূরছি পড়ে—তীরে নীরে নয়ন ঢুলায়ে।
দীপ্তি অভিনয় করে খদ্যোতেরা, ঝিল্লী ধরে গীতি
তমোঘন নিরাশারই হয় তায় শুধু পরিমিতি।
এই সন্ধ্যা-সাথে সেই যৌবনের সন্ধ্যাগুলি মোর;
তুলনা করিতে হায় ঝরস্রোতে বহে আঁখি লোর
সে সন্ধ্যা আসিত নিয়া কত আশা কত ভালবাসা,
জাগাত আমার প্রাণে উদ্দীপনা রসের পিপাসা।
সন্ধ্যা ছিল বন্দ্যা মোর প্রেমোল্লাসে করিত-নন্দিত,
অন্তরের অন্তরীক্ষ হ'তো কোটি নক্ষত্র-খচিত।
সন্ধ্যা হলো বন্ধ্যা আজি, গন্ধ নাই রজনীগন্ধায়
কমলে দুলায় ঘুমে কুমুদেরে আর না জাগায়।
ভিড় করে মূঢ় মনে ভবিষ্যের কত ছায়া ভীতি
তার সাথে যোগ দেয় অতীতের যত মায়া স্মৃতি।
যে কথা ভাবিতে গেলে প্রাণমন শিহরিয়া উঠে,
সে কথাই বার বার জনতার বাধা ঠেলে ফুটে!
আজ এ সন্ধ্যায় শুনি শ্রীমন্দিরে বাজে ঘণ্টা শাঁখ,
মনে হয় যেন ওরা মুহুর্মুহুঃ ওপারের ডাক।

চক্রাবর্ত্ত

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি এইচ্-ডি

(পুরীচক্র, পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জগন্নাথ মন্দির হইতে গুণ্ডিচা মন্দির পর্য্যন্ত প্রশস্ত এক রাস্তা বিস্তৃত, দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল হইবে। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব বলরাম ও সুভদ্রা সহ রথে চড়িয়া এই বড়দাণ্ডের উপর দিয়াই গুণ্ডিচা মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। গুণ্ডিচা শব্দটি একটু অদ্ভুত শুনায়; শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এই যে গুণ্ডিচা নামে কাঠের গুঁড়ি। আদৌ এই মন্দির কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং গেজেটীয়র-কার শ্রীযুক্ত ওমালি সাহেবও অনুরূপ মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন (শ্রীযুক্ত সরকার কৃত "পুরীর কথা" ১২৭-২৮ পৃষ্ঠা)। আদৌ যাহাই থাকুক, বর্ত্তমানে গুণ্ডিচা মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত—চূড়াবিহীন সাদাসিধা মন্দির। জগন্নাথদেব বলরাম ও সুভদ্রাসহ রথযাত্রাকালে এই স্থানে নয় দিন অবস্থান করেন। আমরা প্রায়-অন্ধকার সেই মন্দিরগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রদীপের সাহায্যে জগন্নাথের শূন্য রত্নবেদী দর্শন ও স্পর্শ করিলাম এবং গুণ্ডিচা মন্দির তহবিলে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া বাহির হইলাম। দেখিলাম মন্দিরের বাহিরের দেয়ালে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত লোকের নাম লেখা রহিয়াছে! যিনিই গুণ্ডিচা মন্দির পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন, তিনিই মন্দিরের দেয়ালকে Visitor's Book করিয়া কাঠকয়লা সহযোগে নিজের নাম, ধাম এবং পরিদর্শনের তারিখ তাহার উপর লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। হাতে যতদূর নাগাল পাওয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তো নাম লেখা হইয়াছেই, উহা উর্দ্ধেও নাম লেখা দেখিয়া বুঝিলাম সঙ্গীর স্কন্ধারূঢ় হইয়া ঐ নামগুলি লিখিত হইয়া থাকিবে! গুণ্ডিচা মন্দিরের গায়ে নাম থাকার জন্য ইহারা সকলেই স্বর্গে গিয়াছেন বা যাইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

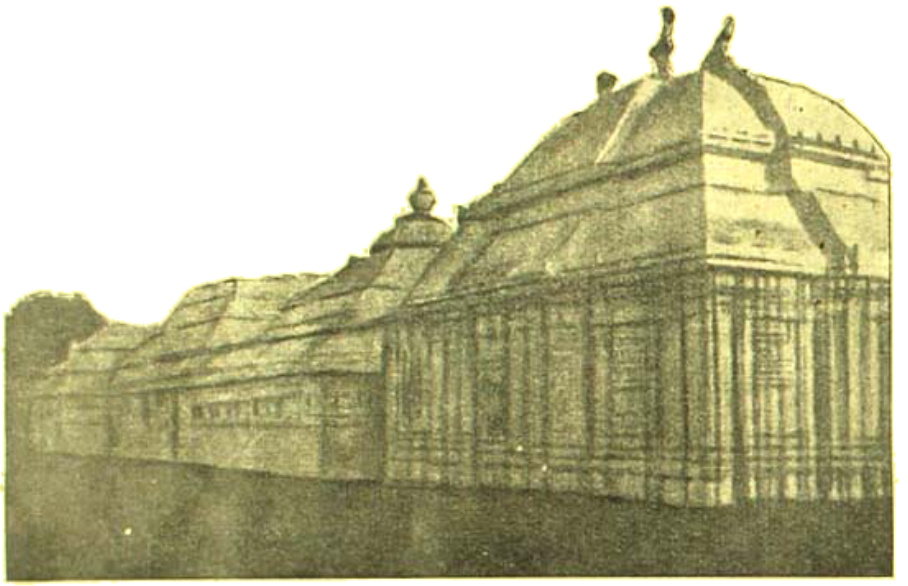

গুণ্ডিচা মন্দির (শ্রীযুত গুরুদাস সরকার কৃত 'পুরীর কথা' হইতে)

অরুণস্তম্ভ (সাক্ষীগোপাল)

গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি চার-পাঁচ ফিট উচ্চ অনতিবৃহৎ মঞ্চের উপর দুইখানি পদচিহ্ন স্থাপিত। ছড়িদার বলিল—মহাপ্রভু চৈতন্যের পদচিহ্ন। শুনিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ছড়িদার বলিল—বহু অজ্ঞাতনামা সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া স্বহস্তে ঝাড়ু ধরিয়া এই প্রাঙ্গণ মার্জ্জন করেন, এই পদচিহ্নতলে গড়াগড়ি দেন। মনে পড়িয়া গেল চৈতন্যদেবের স্বহস্তে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের কথা—মনে পড়িয়া গেল ভক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধ—যাহাতে তিনি এই পদচিহ্নদ্বয়কে চৈতন্যের বিস্মৃত সমাধির নিদর্শন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের মনোরম বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া কিছুদিন পুরীতে কাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থানের পর একদিন চৈতন্যদেব কাশীমিশ্র, পড়িছা পাত্র এবং রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া আনিলেন :—

এই মতে নানা রঙ্গে দিন কথো গেল।
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছা পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥
তিন জনায় পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন সেবা মাগি নিল॥

প্রভুর অভিপ্রায় অবগত হইবামাত্র পাত্র মহাশয় একশত ঘট ও একশত ঝাড়ু আনিয়া উপস্থিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভু দলবল সহ গুণ্ডিচা মার্জ্জনে গেলেন। চৈতন্যদেব যে কেবল স্বপ্নবিলাসী ভাববিভোর প্রেমের-পাগল ছিলেন না—বহুলোককে সংহত দলবদ্ধ করিয়া হাতেকলমে খাটাইবার এবং নিজেও খাটিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ রকমের ছিল, এই গুণ্ডিচা মার্জ্জন বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। বৃন্দাবনদাসবিবৃত নগর-সঙ্কীর্ত্তন ও কাজিদলন বিবরণেও দেখা যায়, দলবদ্ধ জনতাকে এক লক্ষ্যে পরিচালিত করিবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রথম যৌবনেও চৈতন্য দিয়াছিলেন। এই প্রকাণ্ড মন্দির ও তাহার প্রাঙ্গণ দুইবার ঝাঁট দিয়া, ছাদ পর্য্যন্ত জল দিয়া ধুইয়া—

এই মত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন॥*

বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ নাকি চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত রথের পূর্ব্বে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনোৎসব অদ্যাপি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সকলেই জানেন চৈতন্যের স্মৃতিতে অদ্যাপি পুরীতীর্থ পূর্ণ; কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ সকলে নীরব। যেন এক মহানীরবতার ষড়যন্ত্র! চৈতন্যদেব অংশই হউন আর পূর্ণই হউন, আর শুধু মাত্র ভগবদ্ভক্তই হউন, তিনি মানব দেহধারী ছিলেন—ভগবদ্বুদ্ধিতে কেহ তাঁহার সহিত ব্যবহার করিলে তিনি বিশেষ বিরক্ত হইতেন। গুণ্ডিচা-মার্জ্জনকালে একজন সরলস্বভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুণ্ডিচার জল চালিবার ছলে চৈতন্যের পায়ে জল ঢালিয়া তাহা পান করিয়াছিলেন। দেখিয়া চৈতন্যদেব অস্থির হইয়া পড়িলেন :—

হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণযুগে দিল অর্ঘ্য জল।
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল।

এইখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুইটি ছত্রে নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া চৈতন্যচরিত্রকে অনেকখানি খাটো করিয়াছেন, যথা :—

যদ্যপি গোসাঞি তারে হৈয়াছে সন্তোষ।
শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ॥

অর্থাৎ পাদোদক পান করাতে চৈতন্য মনে মনে খুসীই হইয়াছিলেন, শুধু লোকশিক্ষার জন্য বাহিরে রাগ দেখাইলেন! বর্ত্তমান দীনহীন লেখক শাক্ত। চৈতন্যের ভিতর বাহিরে এতখানি প্রভেদ ছিল এবং ঈশ্বরবুদ্ধিতে

* এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুইবার প্রণালিকা শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন—অর্থ ড্রেন।

পর দুই প্রণালিকায় জল ভরি নিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল।
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বাহিরায়।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলায়।

এমন সুন্দর শব্দটি থাকিতে বিদেশী ড্রেন শব্দটির অথবা পাঁওতা পাঃপ্রণালীর কোন প্রয়োজন আছে কি

স্তবাদি করিলে চৈতন্য মনে মনে খুসী হইয়া বাহিরে রাগ দেখাইতেন, এই অধম শাক্তও এইরূপ কল্পনা করিতে কিন্তু মনে ব্যথা অনুভব করিতেছে। অন্তরাত্মা বার বার মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—"না না, ইহা কৃষ্ণদাস কবিরাজাদি ভক্তের হৃদয়দৌর্ব্বল্যজনিত নিজ মনগড়া বিকৃত চৈতন্য-প্রতিমা মাত্র, ইহা কখনই স্বচ্ছ চৈতন্যের স্বরূপ হইতে পারে না।"

মহাপ্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই ব্যবহারে বিষম বিরক্ত হইয়া স্বরূপদামোদরকে জানাইলেন :—

স্বরূপ গোসাঞি আনি কহিল তাহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়ীয়ার ব্যবহারে॥
ঈশ্বর মন্দিরে মোর পাদ ধোয়াইল।
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল॥
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার গৌড়ীয়া করে এতেক কৈল্লতি॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি তারে ঘাড়ে হাত দিঞা।
ঠেলা মারি পুরীর বাহির কৈল লঞা॥
পুন আসি প্রভুর পায় করিল টিপ্পন।
অজ্ঞ অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায়॥
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা।
সারি করি দুই পাশে সবা বসাইলা।

কাজেই এই মানববুদ্ধি মানবদেহধারী চৈতন্যদেবের দেহের কি হইল, ইহা জানিতে সকলেরই কৌতূহল হয়। অদ্যাপি পঞ্জিকাতে চৈতন্যপর বহু বৈষ্ণবের তিরোভাব তিথি লিখিত হয় এবং উহা বৈষ্ণবগণের পর্ব্বদিন বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ চৈতন্য কোন্ তিথিতে তিরোহিত হইলেন, তাঁহার সমাধি কোথায় অবস্থিত, কিছুই নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। আসন্ন্যাস আত্মগোপনকারী চৈতন্যদেব এমনভাবেই আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে তাঁহার তিরোভাব সম্বন্ধে কোন কথাই নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। সমগ্র পুরীতীর্থে চৈতন্যের নিজস্ব আর কোন স্মৃতিচিহ্ন নাই—একমাত্র তাঁহার প্রিয় গুণ্ডিচা-মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহার এই দুইখানি চরণ-চিহ্ন ছাড়া।

কৃষ্ণদাসকবিরাজ বা বৃন্দাবনদাস বা কবিকর্ণপুর বা মুরারি গুপ্ত, কেহই চৈতন্যের তিরোভাব-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। শুধু জয়ানন্দ ও লোচনদাস তাঁহাদের "চৈতন্য-মঙ্গল" কাব্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। এই উভয় গ্রন্থকারই বৃন্দাবনদাসের অব্যবহিত পরবর্ত্তী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের যে সংস্করণ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদনে অনেক বৎসর আগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহা অপ্রাপ্য। ঐ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের অনেক পুঁথি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংগ্রহে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছে।* ঢাকা মিউজিয়মের সংগ্রহেও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের একখানি চমৎকার খণ্ডিত পুঁথি আছে। এই সমস্ত উপাদান অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্রায়তন মূল্যবান প্রাচীন কাব্যখানির নূতন সংস্করণ হওয়া উচিত। চৈতন্যের তিরোভাবসূচক পয়ারগুলি জয়ানন্দের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

যম গিয়া ব্রহ্মার নিকট নিবেদন জানাইল, তাহার যমালয় শূন্য হইয়াছে, চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতাপে তাবৎ পাপী উদ্ধার পাইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মা তখন চৈতন্যকে লীলা সম্বরণ করিতে অনুরোধ জানাইতে চৈতন্যের আশ্রমে চলিলেন :—

ইন্দ্র শঙ্কর সঙ্গে চলিলা আপনি।
সকল দেবতা মেলি করিয়া (করিলা ?) ধরণী॥
নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাশ্রমে।*
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে॥
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠ পুরী॥
• • • •
আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায়ে আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা গৌড়দেশে।
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে॥

* মুদ্রিত পুথিতে আছে "টোটাগ্রামে", ভূমিকার ।• পৃষ্ঠায় আছে "টোটাশ্রমে"। কিরূপ অসতর্কতায় ও অপরিশ্রমে নকলনবীশের উপর নির্ভর করিয়া আধিযুগে প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদিত হইত, ইহা তাহারই নিদর্শন।

নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পরিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্ব কথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥
নানা-বর্ণে দিব্য মাল্য আইল কোথা হইতে।
কথো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে॥
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ।
গরুড়ধ্বজে রথে প্রভু করি আরোহণ॥
মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জগৎ দীপ ছাড়ি॥

মুদ্রিত পুস্তকের এই শেষাংশের পাঠে গোলযোগ আছে বোধ হয়। "আষাঢ় বঞ্চিত রথ" কথা কয়টির মধ্যে 'বঞ্চিত' শব্দটি অর্থশূন্য বোধ হয়। তাহার পরে, রথযাত্রা শেষ না হইতেই অদ্বৈত গৌড়দেশে চলিলেন, ইহা যেন সঙ্গত ও সম্ভবপর মনে হয় না। মোট কথা এই অংশের পাঠে নানা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। প্রাপ্ত সমস্তখানি পুস্তক মিলাইয়া এই অংশের আদর্শ পাঠ উদ্ধৃত হওয়া উচিত। যাহা হউক, "আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে" ছত্রের প্রকৃত পাঠ যদি এই হয় যে—"আষাঢ়ে বাঞ্ছিত রথবিজয়া নাচিতে" তবে ধরা যায় যে রথদ্বিতীয়া দিন চৈতন্যের প্রথামত রথাগ্রে নৃত্য করিতে চৈতন্য বাঁ পায়ে আঘাত পান। নৃত্যান্তে তাঁহার অভ্যাসমত দলবলসহ নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি করেন। ষষ্ঠীর দিন, অর্থাৎ আঘাতপ্রাপ্তি হইতে পঞ্চম দিনে পায়ের আঘাত গুরুতর বেদনাপ্রাপ্ত হয় এবং চৈতন্য নিজের আশ্রমে শয্যাগত থাকিতে বাধ্য হন। সপ্তমী দিন দশদণ্ড রাত্রিকালে অর্থাৎ রাত্রি দশটার সময় তাঁহার তিরোভাব ঘটে। কোথায় তাঁহার দেহ সমাহিত হয়, এই বিষয়ে জয়ানন্দ কোন কথাই বলেন নাই, রোগশয্যাও টোটায় অর্থাৎ নিজের আশ্রমেই ছিল, এমনি বুঝা যায়।

এখন দেখা যাক, এই সম্বন্ধে লোচন দাস কি বলেন।

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ—১১৬-১১৭ পৃষ্ঠা।

অইমতে মহাপ্রভুর উৎকল বিহার।
উৎকল বিহার কথা অনেক বিস্তার॥
বিস্তারিতে পুস্তক যে হয়ে অনেক।
সংক্ষেপে কহিল কথা শুন সর্ব্বলোক॥
হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবন কথা কহে বাঞ্ছিত অন্তরে॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু॥
সত্বরে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজ জন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে মন্দির ভিতর উত্তরিল॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥
তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥
এ যোগ বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
শুন্য বাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন।
শুন্য বাড়ী মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥
এ বোল শুনিঞা ভক্ত করে হাহাকার।
শ্রীমুখ চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের চারিখানি সম্পূর্ণ পুথি আছে। এই স্থানটির পাঠ পরীক্ষা করিতে

লোচনদাসের এই বিবরণ পড়িয়া মনে হয়, জগানন্দ অসুস্থতার বিবরণ ভাল করিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু তিরোভাবের পূর্ণ বিবরণ দেন নাই। আবার লোচনদাস তিরোভাবের বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু অসুস্থতার উল্লেখমাত্র করেন নাই। এই দুই সমসাময়িক লেখকের বিবরণ মিলাইয়া চৈতন্যদেবের শেষ কয়দিনের নিম্নরূপ বিবরণ সঙ্কলন করা সম্ভবপর।

রথ দ্বিতীয়ায় রথাগ্রে নৃত্য করিতে চৈতন্যদেব বামপদে আঘাত প্রাপ্ত হন। ঐ আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি পরবর্তী নরেন্দ্র সরোবরে জল-ক্রীড়া করেন। পরের কয়েক দিন সঙ্কীর্তন ও নৃত্যাদি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ষষ্ঠীর দিন বেদনা এত বাড়িল যে নিজের আশ্রমে কাশীমিশ্রের ঘরে শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রোগ শয্যায় শুইয়া থাকা এবং জগন্নাথের অদর্শন তাঁহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সপ্তমীর দিন পায়ের বেদনা এবং জ্বরগ্রস্ত শরীর লইয়াই দুই মাইল হাঁটিয়া তিনি জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। কাশীমিশ্রের ঘর জগন্নাথ-মন্দিরের নিকট, সম্ভবতঃ পশ্চিমে বা দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। রথযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা এই সময় গুণ্ডিচা মন্দিরে। তথায় পৌঁছিতে তাঁহাকে সেই আষাঢ় মাসের বিষম গরমের মধ্যে অসুস্থ শরীরে প্রায় দুই মাইল হাঁটিতে হইয়াছিল। তৃতীয় প্রহরে গুণ্ডিচা বাড়ীতে পৌঁছিয়া তিনি জগন্নাথ দর্শনের জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। জগন্নাথ মূর্তি দেখিলেই জগন্নাথকে আলিঙ্গনের ইচ্ছা চৈতন্যদেবের অসম্বরণীয় হইয়া উঠিত। এই জন্য স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় তিনি দূর হইতে জগন্নাথ দর্শন করিতেন। আজ অসুস্থ শরীরে মন্দিরের অন্ধকারে শ্রীমূর্তির দিকে চাহিয়া তিনি জগন্নাথ মূর্তি দেখিতে পাইলেন না। অসম্বরণীয় ভাবাবেগে অমনি তিনি বেদীর উপর উঠিয়া জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। "তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।" শরীরের দশ দুয়ারে কপাট পড়িয়া গেল, —চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইল, মহাভাবে চৈতন্যদেব অচেতন হইয়া গেলেন। লোকের ভিড় নিবারণ করিতে মন্দির প্রাঙ্গণের কপাট লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় দশটায়—

মায়ার শরীর তথায় রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জন্মমরীণ ছাড়ি।*

গুণ্ডিচা মন্দির প্রাঙ্গণে চৈতন্যের দেহ সমাহিত হইল। পরে কপাট খুলিয়া সমবেত ভক্তগণকে জানান হইল, চৈতন্য জগন্নাথ আলিঙ্গন করিতে গিয়া জগন্নাথে লীন হইয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ অতিলৌকিকে অতি সহজে বিশ্বাস করেন—তাই জগন্নাথে লীন হইবার প্রবাদই চৈতন্য সম্বন্ধে প্রবল হইয়া রহিয়াছে। চৈতন্যের নবনীতকোমল ভাবঘন যে দেহখানি বর্ণনা করিতে বৈষ্ণব কবিগণ উপমা খুঁজিয়া পাইতেন না, সেই অনুপম দেহ যে সমাধিতে সমাহিত আছে, চৈতন্যের পদচিহ্নদ্বয় দ্বারা যে সমাধি নির্দ্দিষ্ট—সেই সমাধি তাই অদ্যাবধি বৈষ্ণব সমাজে অজ্ঞাত অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'প্রবাসী'র এক প্রবন্ধে প্রথম এই মত প্রকাশ করেন যে, চৈতন্যের পদচিহ্নদ্বয় চৈতন্যের অজ্ঞাত সমাধির নিদর্শন। সমস্ত বিচার করিয়া আমি সানন্দে সেন মহাশয়ের মতই সমর্থন করিলাম। চৈতন্যের জগন্নাথে লীনত্ব প্রবাদে যে সকল শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব বিশ্বাস করেন, আমার এই সমর্থন যদি তাঁহাদের মনোবেদনার কারণ হয়, তবে তাঁহারা আমাকে

পুঁথিগুলি খুলিয়া দেখি, এই পুঁথিগুলির কোনখানিতেও এই স্থানটি নাই। একখানি মাত্র পুঁথিতে চৈতন্য-নিত্যানন্দের তিরোভাব প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাহার পাঠ একেবারে ছিন্ন ও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে লেখা আছে যোগারণ্যে চৈতন্য জগন্নাথে এবং নিত্যানন্দ বলরামে লীন হইয়া গেলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে লোচনদাসের যে সকল পুরাণ পুঁথি আছে সেইগুলির সাহায্যে ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সংস্করণের এই অংশের পাঠ পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। ভক্তিভূষণ মহাশয় কোন্ পুঁথি অবলম্বনে নিজ সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার কোন পরিচয় ভূমিকায় দেন নাই। প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনে অবলম্বিত পুঁথির পরিচয় সর্ব্বাগ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথির তালিকায় দেখিলাম, পরিষদের ২৩২ নং পুঁথিতে ৬ পাতা মাত্র। চৈতন্যের তিরোধান বর্ণিত আছে পাঠ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের প্রদত্ত পাঠের অনুরূপ।

* চৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন ৩১শে জুলাই তিরোহিত হন। কাজেই তিরোভাবের সময় তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর ৪ মাস ১৩ অথবা ১৭ দিন হইয়াছিল।

যেন ক্ষমা করেন। আমাদের বড় আদরের নিমাই এইস্থানে সমাহিত আছেন মনে করিয়া তাঁহার সান্নিধ্যের বেদনাময় আনন্দ যেটুকু পাই, তিনি জগন্নাথে সশরীর লীন হইয়াছেন মনে করিয়া সেই আনন্দ পাই না—বরং অপ্রাপ্যরূপে একেবারে হারাইবার দারুণ নৈরাশ্যে হৃদয় অন্ধকার হইয়া যায়। আমার এই পৌত্তলিকতার জন্য সাত্ত্বিক বৈষ্ণবগণের নিকট পুনঃ পুনঃ করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

ইহার পরে আর কিছু লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। গুণ্ডিচা মন্দির দেখা সমাপ্ত করিয়া নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দেখিয়া জগন্নাথ মন্দিরে যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জগন্নাথ দর্শনের সময়ের তখনও বিলম্ব আছে জানিয়া গাড়ী ফিরাইয়া পুরীর পশ্চিম-প্রান্তে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি এবং গোবর্দ্ধন মঠ দেখিলাম। গোবর্দ্ধন মঠে কিছু হাতের লেখা পুঁথি আছে দেখিলাম। ফিরিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরে পুরাপুরি জগন্নাথ দেখিয়া ও পরিক্রম করিয়া বোর্ডিংএ ফিরিলাম। পরদিন প্রভাতে পাণ্ডাকে ১৲ দক্ষিণা এবং ছড়িদারকে ॥০ বক্‌শিস্ দিয়া ৮টা ৩৫ মিনিটের ট্রেণে ভুবনেশ্বর রওনা হইলাম। কণারকের রাস্তা তখনও খোলে নাই বলিয়া কণারক যাওয়া হইল না।

বিধাতা ললাটে এই ত লিখন দিয়েচে আঁকি

শ্রীকিতীশ ভট্টাচার্য্য

২

দুখের পেয়ালা হবে রে পূর্ণ,
রবে না বাকি ;
বিধাতা ললাটে এই ত লিখন,
দিয়েচে আঁকি।
বেদনার-রাঙা তীব্র গরল,
কর কর পান ব্যথা-বিহ্বল !
হউক সজল, অশ্রু-বাষ্পে,
মলিন আঁখি।
বিধাতা ললাটে এই ত লিখন
দিয়েচে আঁকি !!

শুষ্ক-জীবনে ফুটিবে না ফুল,
মিলিবে কাঁটা ;
মিলিবে না জল, তুষার-দাহনে,
এ বুক-ফাটা !
পদে পদে তোর হবে পথ ভুল,
অকূল-সাগরে মিলিবে না কূল
আশা মরীচিকা ছলিবে কেবল,
জানিস নাকি ?
বিধাতা ললাটে এই ত লিখন
দিয়েচে আঁকি !!

নারদ ঋষির মর্ত্যের সঙ্গে সংযোগটা কিছু বেশী, দেশে দেশে, ঘরে ঘরে তাহার সম্বন্ধ। তাই যাওয়া-আসাটাও কিছু ঘন ঘনই ঘটিয়া থাকে। এবার ঋষি সম্প্রতি মর্ত্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন তাহাতে স্বর্গধামে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নারদ কুবেরকে ধরিয়াছেন, স্বর্গে একটি ফিল্ম কোম্পানী খুলিতে হইবে। কুবের প্রথমে রাজি হন নাই, তারপর অনেক হিসাব নিকাশ দেখাইয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহাকে রাজি করান গিয়াছে।

তাড়কা বধ

বিশ্বকর্মাকে আমেরিকা ঘুরিয়া আসিতে পাঠান হইয়াছে এবং কৈলাসে একটি নিভৃত শৈলশিখরে ষ্টুডিও নির্মাণ সুরু হইয়াছে।

এই সংবাদে স্বর্গের দিকে দিকে হর্ষধ্বনি উঠিতে লাগিল। নারদ যাহাতে লাগেন তাহার একটা ব্যবস্থা না করিয়া ছাড়েন না। দেখিতে দেখিতে সকল ব্যবস্থা হইল। যন্ত্র আসিল, যন্ত্রী আসিল। পৃথিবীর বাছা বাছা বিশেষজ্ঞের স্বর্গগমনে মর্ত্যে হাহাকার উঠিল। ভালো ভালো অভিনেতা অভিনেত্রী সকল দেশ হইতে বাছিয়া আনা হইল। বিশ্বকর্মার কর্মকুশলতার সকল বিষয়ের ব্যবস্থা হইল, নারদ মর্ত্যে দেখিয়া গিয়াছেন ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ চিত্রাবতরণ করিতেছেন। তাঁহার পরামর্শে একদল দেব-দেবীও সাজিলেন—তাঁহারা চিত্রাবতরণ করিবেন।

সমস্ত স্থির হইল—এখন প্রয়োজন উপযুক্ত কাহিনী। এক ঘরোয়া বৈঠকে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। খ্যাত, অখ্যাত, বিখ্যাত, সুখ্যাত, পরিখ্যাত অপখ্যাত যত লেখকলেখিকা স্বর্গ মর্ত্য পাতালে ছিলেন সকলের নাম উচ্চারিত হইল, কিন্তু দারুণ ভোটাভুটিতে কোনটিই টিকিল না। এত নামের মধ্যে আদি কবির নামটাই কাহারও মনে পড়ে নাই। অবশেষে মিস্ সরস্বতী দেবী প্রস্তাব করিলেন—বাল্মীকির রামায়ণ।

নারদ শুনিয়া হাসিয়া আর বাঁচেন না। লেখক ত্রিকালের বৃদ্ধ, ততোধিক পচা পুরাতন রামায়ণের কাহিনী। তবু বাল্মীকির নামের কিছু দাম আছে বিচার করিয়াই রামায়ণের প্রতি কৃপা করা হইল। স্থির হইল চিত্রনাট্যকার কিছু রদবদল করিয়া উহা কালোপযোগী করিয়া লইলেই চলিবে।

চিত্রগুপ্ত তাহার পাহাড়প্রমাণ পতিয়ান খুঁজিয়া এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের নাম বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার উপর চিত্রনাট্য রচনার ভার পড়িল। রামায়ণের গল্পটি চিত্রোপযোগী করিতে কিছু বর্তমানের ছাঁদ না দিলে মনোরম হইবে না। চিত্রনাট্যকারকে সে স্বাধীনতা দেওয়া হইল।

যথাসময়ে স্বর্গধামের দেওয়ালে দেওয়ালে শৈলে শৈলে পোষ্টার পড়িল, প্রচারপত্র প্রকাশিত হইল। বহুল প্রচারের জন্য মর্ত্যেও কিছু আসিল। আমরাও জানিলাম—কুবের ফিল্ম কর্পোরেশনের নবতম অবদান "নবরামায়ণ" বিচিত্র ভূমিকা সমাবেশে শীঘ্রই আত্ম-প্রকাশ করিবে।

ষ্টুডিও হইতে মাঝে মাঝে যে সব সংবাদ আসিতে লাগিল তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহ হইলাম যে, "নব-রামায়ণ" একালের একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র হইবে।

যথাকালে ট্রেডশোর নিমন্ত্রণ আসিল। আমাদের কাগজের অফিসে সিনেমা-সম্পাদক—সদ্য বিবাহ করিয়াছেন। তিনি স্বর্গারোহণে রাজি হইলেন না। আর কেহই ভরসা করিল না। অগত্যা আমিই রাজি হইলাম। প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিয়া রাখি—গিয়া দেখিলাম, স্বর্গ যায়গাটা বিশেষ খারাপ নয়, কলিকাতার অপেক্ষা তো নয়ই। আর রাজি হইয়াছিলাম বলিয়াই তো আজ সেই বিচিত্র চিত্রের কথা আপনাদের কাছে বলিতে পারিতেছি।

প্রেক্ষা-গৃহে সেদিন অধিক জন বা দেবসমাগম হয় নাই। জন বা জীবিত ভূলোকবাসী বলিতে আমি একা ছিলাম। আর অল্প অল্প লোকবাসী সাংবাদিক ও অন্যান্য গণ্যমান্য দেবদেবী ছিলেন। দাড়িওয়ালা কয়েকজন ঋষিও পিছন-দিকের সিটে বসিয়াছিলেন দেখিয়াছিলাম।

প্রেক্ষা-গৃহে চন্দ্র কিরণ দিতেছিলেন। চন্দ্র অস্তমিত হইলেন, ঘোর অন্ধকারের মাঝে বিদ্যুৎ ঝলিল, ছবি ফুটিল। দেখিলাম হান্টিং শার্টে রাম বন্দুক লইয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে অনেক লোকজন, কিন্তু উহার মধ্যে লক্ষ্মণকে চিনিলাম না। রাম তাড়কাবধে আসিয়াছেন। বহু গোলযোগের মধ্যে তাড়কাবধ সমাধা হইল। লোকজন আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। যে ব্রাহ্মণ রামকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন তাহার মুখেও হাসি ফুটিল। একটা লোক জঙ্গল হইতে হিড় হিড় করিয়া তাড়কাকে টানিয়া বাহির করিল।

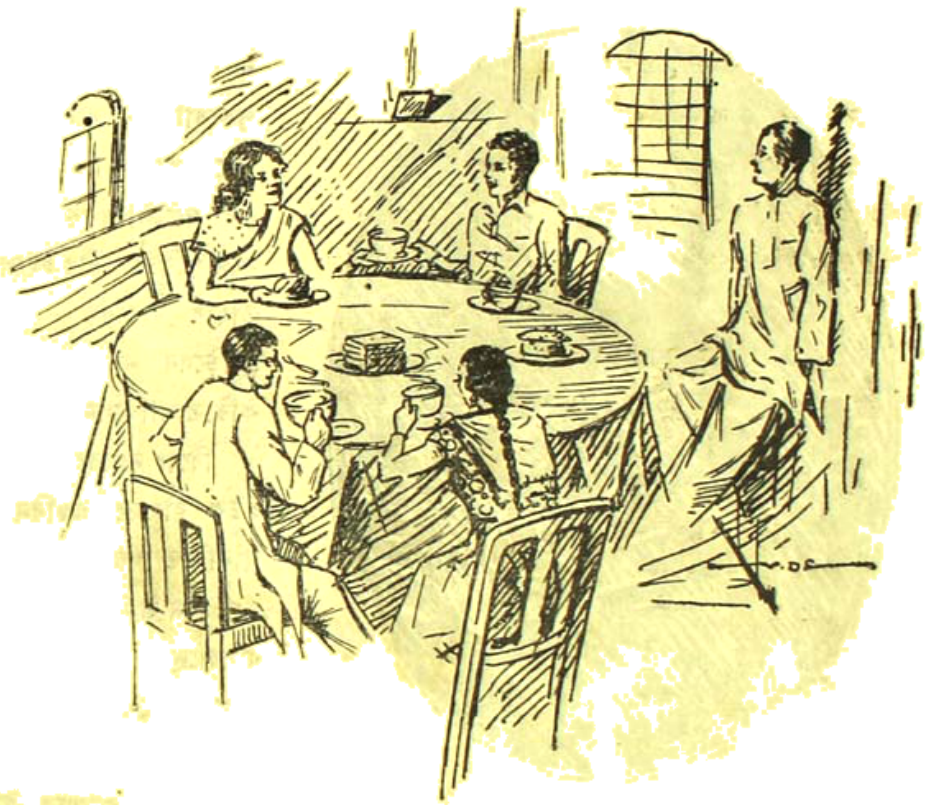

প্রেম-চক্র

দেখিলাম একটা কেঁদো বাঘ। সে নাকি উক্ত ব্রাহ্মণের একটি ছাগল মারিয়াছিল।

নিকটে জমিদারবাড়ী। জমিদার রাজা জনক রায় রামকে মহাসমাদরে নিজগৃহে স্থান দিলেন। সেখানে একটি লিক্‌লিকে রোগাপানা যুবক—গায়ে ঢোলা হাতার পাঞ্জাবী, চোখে চশমা—আধ আধ উদাস ভাব, দিনকয়েক পূর্বে আশ্রয় নিয়াছে। সঙ্গে ছিল চিত্রাঙ্কিতা জনকরাজার ভাগিনেয়ী। পরে শুনিলাম ঐ রোগাপানা ছোঁড়াই লক্ষ্মণকুমার; বন্ধু চিত্রাঙ্কিতের সঙ্গে তাহার মামাবাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে।

রামের সঙ্গে দেখা হইতেই রাম বলিয়া উঠিলেন—আরে, তুই এখানে ?

লক্ষ্মণ রীতিমত বিরক্ত হইল, বলিল—ভদ্রলোকের বাড়ী একটু ভদ্রভাবে কথাবার্তা কইতে শেখ। জানো এখানে সব শিক্ষিতা মহিলারা রয়েছেন। কি ভাববেন তাঁরা শুনলে! কেবল গোঁয়ার ভাব—বনে বনেই ঘুরে বেড়াও বন্দুক নিয়ে, বাণই তোমার মানায় ভালো। এটা ভদ্রসমাজ।

রাম এতটুকু হইয়া গেলেন। শিক্ষিত ভাই লক্ষ্মণ তাহার দাদাকে শিক্ষা দিয়া গেল।

ধনুর্ভঙ্গধ্বনি শুনা গেল এবং পর মুহূর্তে

জনক রাজার এক পালিতা কন্যা—নাম সীতা, যেমন নরম প্রকৃতি তেমনি লাজুক। সে এই কবি লক্ষ্মণকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মণের ভালো লাগে উর্ম্মিলাকে। যেন বিদ্যুতের চোখে জ্বালা ধরাইয়া দেয়। এক মুখে দশটা কথা বলে। জমিদার-কন্যার এলিগ্যান্স আছে, লক্ষ্মণ তাহার মূল্য জানে, তাহার সাহিত্যিক বর্ণনা ওর কণ্ঠস্থ।

লক্ষ্মণকে উর্ম্মিলা নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে উহাকে করুণা করে, ভালোবাসে না, শ্রদ্ধা করে না। পুরুষ হইবে সংযমে অটুট, দৃঢ়তায় হিমাচল—নতুবা তাহার চরণে আত্ম বিলাইয়া প্রণাম করিয়া, তাহাকে সারা মনপ্রাণে শ্রদ্ধা করিয়া ভালোবাসিয়া মন ভরিবে কেন? সেই দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব লক্ষ্মণ রক্ষা করিয়া চলিতে জানে না।

বৃদ্ধ জনক রায় রামচন্দ্রকে তাহার উভয় কন্যা, চিত্রাঙ্কিত ও লক্ষ্মণের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। লক্ষ্মণ যে রামচন্দ্রের ভাই তাহাও জানা গেল না। সিনারিও লেখকের কৃতিত্ব আছে দেখিলাম। এরূপ না হইলে কি আর আধুনিক ভাই।

রামচন্দ্র গম্ভীরপ্রকৃতি, বেশী কথা বলিতে ভালোবাসেন না। শিকারী মানুষ, স্মার্ট এবং ম্যানলি—যাহাকে বলে পুরুষোচিত—স্নেহে, কণ্ঠে, ব্যবহারে, সীতাকে তাহার ভালো লাগিল। তাহার লাজুক প্রকৃতিটা বেশ স্নিগ্ধকর এবং স্বল্প আলাপও ব্যবহার মনোরম মনে হইল। রামচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় গভীর হইলে জনক জানিতে পারিলেন দশরথ তাহার বাল্যবন্ধু। সুতরাং রাঘবগণকে তিনি সহজে ছাড়িলেন না। রামচন্দ্র দিনকয়েক বিদেহ নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বিদেহ নগরের জলহাওয়ার গুণেই হউক বা স্বভাববলেই হউক রামচন্দ্র একদিন দৃঢ়তা হারাইয়া সীতাকে মনোভাব জানাইতে গিয়া তিরস্কৃত হইলেন এবং অপর ঘটনায় বুঝিতে পারিলেন উর্ম্মিলা তাহার পুরুষ প্রকৃতিটাকে ভালোবাসিয়া বসিয়াছে। উর্ম্মিলা ছন্ ছন্ করিয়া বেড়ায়। সারা পরিবেশটি সে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে এমনই তাহার চলা বলার ভঙ্গিমা। দেখিয়া প্রথম অবধি মনে হইতেছিল ইনি এবার আর কাব্যের উপেক্ষিতা থাকিতে রাজি নহেন। মনে মনে চিত্রনাট্যকারকে সাধুবাদ দিলাম—তাহার মৌলিক মত প্রবর্তনের জন্য। বাল্মীকির একটা মারাত্মক ভুল শুধরাইয়া দিয়াছেন বটে! রামচন্দ্র জানিতে পারিয়া জনক রায়ের নিকট উর্ম্মিলার পাণিপ্রার্থী হইলেন। জনকও রামের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—রাম একবার মাত্র স্টার্টার চাপিয়া মোটরবাইকে স্টার্ট দিতে পারেন, একা একটা বাঘ মারিতে পারেন, শুনা গেল রামচন্দ্র নাকি নিজে ভালো উড়িতেও পারেন (pilot), অতএব এ হেন শৌর্যবীর্যশালী পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কে দ্বিধা করে। বিশেষ দশরথ তাঁহার বাল্যবন্ধু—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম।

এদিকে চিত্রাঙ্কিত সমস্ত ঘটনা চক্ষুর উপর পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। যে গোলটেবিলে রাম লক্ষ্মণ সীতা উর্ম্মিলা ও তিনি চা পান করিতে বসেন তাহা হইতে নিজেকে সরাইয়া নিলে উহা একটি প্রেমচক্রে পরিণত হয়—সে চক্রটি বিষম বেগে ঘুরিতেছে—আর তন্মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র সীতার দিকে, সীতা লক্ষ্মণের দিকে, লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার দিকে আর উর্ম্মিলা রামচন্দ্রের দিকে ভয়ঙ্কর গতিতে ছুটিতেছেন। দেখিয়া দেখিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া চিত্রাঙ্কিত চিত্রাঙ্কিতের মত নিস্পন্দ ও স্তব্ধ হইয়া গেলেন, এ গতির তো বিরাম নাই, শেষ নাই। কি জটিল তত্ত্ব! এমনভাবে ঠোট ধরিয়া ছট পাকাইতে বাল্মীকির মাথার জটাও পরাস্ত হইয়াছে—আর বর্ত্তমান চিত্রনাট্যকার কিরূপ কৌশলে এমন পরিস্থিতির সৃজন করিয়াছেন। মৌলিকতা আছে বটে, না হলে আর এ যুগ!

মাসিমার কাছে রামচন্দ্রের পেটের খবর শুনিতে পাইয়া ভাগিনের চিত্রাঙ্কিত কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইল এবং কবি লক্ষ্মণকুমারকে একদিন শ্রান্ত রোষকণ্ঠে ডাকিয়া লইয়া সমগ্র অবস্থা সংবিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিল—উর্ম্মিলা একটা মানুষই নহে, সে বর্ব্বর, ইতর—প্রেমের মর্য্যাদা সে কি বুঝিবে! তবে হ্যাঁ, সীতা একটা মেয়ে বটে, যাকে বলে হ্যাঁ, একেবারে ইয়ে—তাই। স্ত্রীসুলভ লাজুকতায়, অন্তরের সৌন্দর্য্যে, প্রেমের গভীরতায় সে একেবারে খাঁটি স্বর্গের পারিজাত! (উপমাটায় মর্ত্যলোকের গন্ধ থাকিয়া গিয়াছে—কারণ বোধ হয় চিত্রনাট্যকার সদ্য সদ্য মর্ত্যলোক হইতে আসিয়াছেন)। সীতা মনে প্রাণে লক্ষ্মণকেই ভালোবাসে—অথচ রাম চাহেন সীতাকে। সীতাকে যদি লক্ষ্মণ লুকিয়া নেয় তবে রামকে উচিত-সাজা দেওয়া হইবে। লক্ষ্মণ শেষের কথায় রাজি হইলেন। এমন না হইলে আর এ যুগের লক্ষ্মণ ভাই! চিত্রনাট্যকারকে দশবার সাধুবাদ দিলাম—অবশ্য মনে মনে—কারণ তখন লিখিবার সুযোগ পাই নাই।

অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার পর যাহা হইল তাহাতে মোটামাট বুঝা গেল, রামচন্দ্র ও উর্ম্মিলার এবং লক্ষ্মণ ও সীতার উদ্বাহ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল।

অথ বিমানকাণ্ড। নব-রামায়ণে বোধ হয় এই একটি নূতন কাণ্ড ঘটিয়াছে, অথবা অন্য কাণ্ড লণ্ডভণ্ড করিয়া এই কাণ্ড সংযোজনা করা হইয়াছে, সঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, দেখিলাম বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া রামচন্দ্র উর্ম্মিলাকে লইয়া বিমান যানে সিংহলযাত্রার আয়োজন করিতেছেন। কিষ্কিন্ধ্যার বানরের ব্যবসায় না কি করিবেন—সিংহলে হইবে তাহার হেড-অফিস। বিবাহ করিয়াছেন, এখন একটা কাজ-কারবার কিছু না করিলে চলে না—না এইরূপ একটা কি কথা লইয়া পিতার সঙ্গে বচসা হইয়া রামচন্দ্র শেষে বানরের ব্যবসায় করিবেন স্থির করিয়াছেন।

কেবল বিমানঘাটির ছবি পর্দায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—ইহার মধ্যে অন্ধকার অডিটরিয়ামে "হা সীতা—হা রাম—হায় রে আমার সাধের রামায়ণ" বলিয়া ক্রন্দনধ্বনি শুনা গেল এবং পরমুহূর্তে কি গুরুপতনের শব্দ হইল। চন্দ্র জ্বলিয়া উঠিলেন। ছবি বন্ধ হইয়া গেল, দেখা গেল, কুঞ্চিতাঞ্চল অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া টপ্‌টপ্ ধারায় জল গড়াইতেছে। আর এক জন মূর্চ্ছা গিয়াছেন। বাল্মীকিকে রত্নাকর বা ঋষি কোনরূপেই দেখা ছিল না—শুনিলাম তিনি মূর্চ্ছা গিয়াছেন—তিনিই বাল্মীকি। পবন বাতাস ঘুরিলেন, বরুণ শৈত্য সম্পাদন করিলেন—তবুও পূর্ণ জ্ঞান হইল না—কেবল মাঝে মাঝে বিলাপ স্বর উঠিল—হায় রে আমার রামায়ণ!

রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, উত্তররামচরিত প্রভৃতির গ্রন্থকারেরাও অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

শো বন্ধ হইয়া গেল। জানান হইল, মহর্ষি বাল্মীকির অসুস্থতানিবন্ধন আজ শো আর হইবে না। অপর দিবসের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আর যাই নাই। সেই দিনই কর্তৃপক্ষের কানে কানে বলিয়া আসিয়াছিলাম—যেটুকু দেখিলাম তাহাতেই বুঝা গেল, সকল দিক দিয়াই ছবিটি প্রথম শ্রেণীর মধ্যেও শ্রেষ্ঠ হইবে। চিত্রনাট্যকারকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইতে বলিয়া আসিলাম।

ফিরিবার পথে শরৎচন্দ্রের ওখানে একবার গিয়াছিলাম। দেখিয়া চিনিলেন, এটা ওটা নানাপ্রকার গল্প করিলেন। পরে কথায় কথায় "নব-রামায়ণ"-এর কথা উঠিল। সকল শুনিয়া শরৎচন্দ্র বাল্মীকির জন্য উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করিলেন এবং শেষে আমাকে বলিলেন—আমার কমল, সাবিত্রী, কমললতাদের তো তোমাদের হাতেই রেখে এসেছি। দেখো যেন তাদের নিয়ে এমন কেলেঙ্কারী না ঘটে।

ভরসা দিতে পারিলাম না—যে পরিমাণে পথে ঘাটে ফিল্ম কোম্পানী গজাইতেছে! একটা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ঝুলন

রায় শ্রীযগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

প্রবন্ধ

হিন্দুদের পূজাপার্বণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কৃষিকার্যের সঙ্গে তাহাদের কিছু-না-কিছু যোগ আছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কাজেই আমাদের আমোদ-প্রমোদ পূজাপার্বণ কৃষিকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয়। রাবণবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে অকালবোধন করিতে হউক বা না হউক, আমাদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা শরতেই সম্পন্ন হয়। রাবণবধের প্রয়োজনীয়তা থাক বা না থাক, ঐ সময়ে কৃষিজীবিগণের প্রচুর অবসর। সেইজন্য উৎসবের দেশব্যাপী আয়োজন। দুর্গাপূজার নাম সেইজন্য দুর্গোৎসব। অন্য কোনও পূজার এরূপ আনন্দসহ নামকরণ হয় নাই। দুর্গোৎসবের পরে পরপর লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, কার্তিকপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, নবান্ন প্রভৃতি।

বৈষ্ণবরা তাঁহাদের উৎসবের পরিকল্পনায় আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতিকে তাঁহারা ধর্মকর্মের সঙ্গে গাঁথিয়া লইয়াছেন। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ বৈষ্ণবরা ধর্মের প্রয়োজনে কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রকে ভূতিয়া দিয়াছেন। যাঁহাদের দেবতা অখিলরসামৃত মূর্তি, ভজন যাঁহাদের রমা কাচিৎ উপাসনা, সাধ্য যাঁহাদের প্রেম—তাঁহাদের সৌন্দর্যবোধ কিছু প্রবল থাকিবে, ইহাই ত আশা করা যায়। বৈষ্ণবদের তিনটি প্রধান উৎসব তিন চন্দ্রমা-শালিনী পূর্ণিমা রজনীতে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাবণী পূর্ণিমায় ঝুলন, শারদীয়া পূর্ণিমায় রাস, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হোলি। ভগবানের এই তিনটি লীলাই মনোমুগ্ধকর। প্রত্যেকটিতেই আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়। সৌন্দর্য আনন্দের একটি অপরিহার্য উপাদান। সৌন্দর্যকে বাদ দিলে আনন্দের অনেকখানি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভক্ত ভগবানকে দেখেন প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে। সে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়াতীত, অতীন্দ্রিয়, নয়নমনের অগোচর, তাহাতে ব্রহ্মবিদ পরমহংসগণ তৃপ্ত হউন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা শ্রুতিকর্ণ-রসায়ন, আপামর সাধারণ সকলের পক্ষেই মধুর। স্বভাবশোভাও সকলের উপভোগ্য, সকলেরই অধিগম্য। কাজেই এই স্বভাবশোভার মধ্যে ভগবানকে পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যদি ভগবদ্-ভক্তির উদ্দীপনা জোগাইতে না পারে, তবে আর কিসে পারিবে? আকাশে যখন রামধনু ওঠে, তখন মনে পড়ে সেই মোহনচূড়া। উপাস্য তখন নবমেঘের অন্তরালে রূপায়িত হইয়া উঠেন সেই ইন্দ্রধনুর অপরূপ রঙের বাহারে!

আকাশ চাহিতে কিবা
ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা।

—জ্ঞানদাস

যমুনার কালো জলে চাঁদের আলো পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছে। অমনি ভক্তের মনে পড়িয়া গেল, কৃষ্ণের কালো অঙ্গে সোনার অলঙ্কারের কথা।

অতরুণ বরুণ কিরণে অঙ্গ তর তর
কালিন্দী জলে যৈছে চান্দকি চলনা।

—নয়নানন্দ

নীল আকাশে মেঘ করিয়াছে, তাহাতে বিদ্যুৎ খেলিতেছে। গোধূলি বেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে বকের সারি সেই আকাশের বুকে মালা দুলাইয়াছে। (অতরুতোরণপ্রভাং—কালিদাস) এমন সময় পূর্বাকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখা দিলেন। এ চিত্র কেমন লাগে? এই সৌন্দর্য স্মরণ করাইয়া দেয় না কি সেই ভগবানকেই, যাঁর নীলকান্তোপম অঙ্গে পীতবসন ঝলমল করিতেছে, যাঁহার সুপ্রসর বক্ষে মালতীর মালা দুলিতেছে, যাঁহার ললাটে চন্দনবিন্দু শোভা পাইতেছে?

উজোর হার উর পীত বসন ধর
ভাল হি চন্দন বিন্দু।
মিলিত বলাকিনী তড়িত জড়িত ঘন
উপরে উজোরল ইন্দু॥

—ঘনশ্যাম দাস

কেহ কেহ বলেন, বাংলা কবিতায় স্বভাব শোভার বর্ণনা নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা পড়িলে সে ধারণা বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না। ঝুলন লীলায় বর্ষার শোভা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সৌন্দর্যানুভূতির যে কোনও ত্রুটি আছে এমন বোধ হয় না। বর্ষার বর্ণনা বর্ষাভিসারেও আছে, স্বপ্নদর্শনেও আছে।

বর্ষাভিসারে শ্রীমতী অভিসারে যাইতেছেন প্রকৃতির দারুণ বিপ্লবের মধ্যে :

দশদিশ দামিনী দহন বিথার
হেরইতে উচকই লোচন তার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে মরি যাত ॥

—গোবিন্দদাস

সখীরা অনেক নিষেধ করিল। কিন্তু অভিসার ব্যাহত হইল না। শ্রীমতী বলিলেন :

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গগনে গরজে ঘন ঘোর।

—কবিশেখর

শ্রীমতী প্রাণবন্ধুকে স্বপ্নে দেখিলেন সে এক বর্ষার রজনীতে। স্বর্গে মর্ত্যে স্বপনের গুপ্ত আনাগোনা' বর্ষার নিবিড় নিশীথেই সবচেয়ে বেশী হয় বোধ হয়। মনে পড়ে, ইংরেজ কবি স্বপ্নের নিভৃত নিকেতন নির্মাণ করিয়াছেন বর্ষার বারিধারার মাঝখানে, নিঝুম রাত, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, দূরে কুকুর ডাকিতেছে একঘেয়ে রবে, প্রতিধ্বনি মিলাইতেছে দূর আকাশের কোলে।* এই ত স্বপ্নের বিলাসভূমি। শ্রীরাধিকাও স্বপ্ন দেখিতেছেন এক শ্রাবণ রজনীতে। গুরু গুরু মেঘ ডাকিতেছে, মন্দ মন্দ বৃষ্টিপাত হইতেছে, রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। দূরে পর্বতের উপর ময়ূরের কেকাধ্বনি শোনা যাইতেছে, ভেকের দল বর্ষার উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।

* * *

শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁ ঝাঁ ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেনকালে ॥

—জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব কবিরা শাঙন ঘন বিভাবরীর মোহে মুগ্ধ। কি মিলনে, কি বিরহে কবিমাত্রেরই মনে পড়ে বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ। যমুনার কূল, বনভূমি তমালচ্ছায়ায় জ্ঞানায়মান, রাত্রি সমাগত, মেঘে মেঘে গগন ছাইয়া গিয়াছে—কি চমৎকার পরিবেশ! রাধামাধবের নিভৃত কেলি-বিলাসের এমন সুন্দর উদ্দীপনময়ী প্রাকৃতিক অবস্থা আর হইতে পারে না। জয়দেবেরও বহুপূর্বে কালিদাস নির্বাসিত যক্ষকে এমনই এক বাদল ঘন সন্ধ্যায় বিরহের অশ্রুতে প্লাবিত করিয়াছিলেন। আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘাড়ম্বর দেখিয়া বিরহী যক্ষ ব্যাকুল, বিচলিত, বিভ্রান্ত হইয়াছিল। এমন প্রত্যাসন্ন শ্রাবণের বাদল দিনে প্রণয়িনী যাহার কণ্ঠলগ্না, সে ভাগ্যবানের হৃদয়ও কাতর হইয়া উঠে, সুদূর প্রোষিত কান্তের ত কথাই নাই! এই আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘ-বর্ষার বর্ণনা দেখিয়া আমার মনে হয় কবিকুলতিলক বাংলা দেশের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। বাংলা দেশ নহিলে পদ্মলা আষাঢ়ের স্নিগ্ধ মাধুরী আর কোথায়ও এমনভাবে অনুভব করা যাইত কি? যাহা হউক, কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে মিলন ও বিরহের উদ্দীপনা রূপে বর্ষাকে প্রেমের দেউলে চির-প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতিও এই বর্ষার ছবি এমন করিয়া আঁকিয়াছেন যে তাহার তুলনা মেলা কঠিন।

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘন দামিনি ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই ॥

বিরহ-বর্ণনায় এই বর্ষার সমাবেশ আরও সুন্দর হইয়াছে। শ্রীমতী আজ একাকিনী নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে কাটাইতেছেন। 'দোসর জন নাহি-সঙ্গ।' এমন সময়ে বর্ষা নামিল। 'বরিষা পরবেশ পিয়া গেও দূর দেশ বিপু ভেল মঝু অনঙ্গ।' প্রিয়সঙ্গ লালসা প্রবল হইল।

* Spenser : Fury Queene, Canto I.

সজনি আজু শুভ-দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
চেরি ছিউ নিকসয়ে মোয়॥

প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রিয় যে কাছে নাই এমন বর্ষার নিশিতে, এ দুঃখের কি আর অবধি আছে?

সখি হে হামার দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

এই 'শূন্য মন্দির' কথাটির মধ্যে যেন জগতের হাহাকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে!

ঝম্পি ঘনগর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্থ পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া॥

চারিদিকে মেঘ ঝাঁপিয়াছে ও মুহুর্মুহু গর্জন করিতেছে। ভুবন ভরিয়া বর্ষণ নামিয়াছে। আমার প্রাণকান্ত প্রবাসে রহিয়াছে আর দারুণ অনঙ্গ আমার প্রতি খরতর শর বর্ষণ করিতেছে। (ঐ বারিধারা আমাকে কন্দর্প শরে জর্জরিত করিতেছে।)

কুলিশ কত শত পাত মুদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

এমন সুন্দরবোধ আর কোনও দেশের কবিতায় নাই। এরূপ শব্দচিত্র কোনও ভাষায় কখনও অঙ্কিত হয় নাই। 'হরি বিনে' এই দীর্ঘ দিন-রজনী কেমন করিয়া অতিবাহিত করিব? বিল্বমঙ্গল ঠাকুর আর এক দিন এমনই কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন:

অমূল্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

হে হরি, তোমার অদর্শনে এই অধন্য দিনগুলি কিরূপে কাটাইব! হায় হায়! কিন্তু বিরহের এই দীর্ঘ দিনগুলি কেমন করিয়া যাপন করিব?

যাক্ আজ বিরহের কথা আর বলিব না। কুলনলীলার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিরা যে মিলনের সুর গাহিয়াছেন, তাহারই এক আধটি তান যদি ধরিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যমুনার কূলে, বটতরুর ডালে নবীন লতা দিয়া সুন্দর একটি হিন্দোলা খাটানো হইয়াছে। তাহাতে নানাবিধ বর্ষার কুসুম দিয়া মনোহর সজ্জা করা হইয়াছে। ভ্রমরকুল ঝাঁকে ঝাঁকে সেই কুসুমপুঞ্জে পড়িতেছে, উড়িতেছে, গুন গুন করিতেছে। শুকপিকপাপিয়া সেই হিন্দোলা ঘিরিয়া ঘিরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে ও কলধ্বনি করিতেছে:

হিন্দোলা রচিত কুসুমপুঞ্জ
অলিকুল তাহে বিহরে গুঞ্জ
সারি শুক পিক বেঢ়ল কুঞ্জ
ঘেরি ঘেরি ঘেরি বোল রি।—

আজ পূর্ণিমা রজনী—'চাঁদ উজোর রাতিয়া'। মাঝে মাঝে মেঘ আসিয়া সে স্নিগ্ধ জোছনাকে মৃদুতর, স্নিগ্ধতর করিয়া দিতেছে—'গগন হি মগন স-ঘন রজনীকর আনন্দে করত নেহারি।' শুধু যে মেঘের দল আকাশের নীল সরোবরে সাঁতার দিতেছে আর তাহার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ উঁকি দিতেছেন, তাহা নহে। অল্প অল্প বৃষ্টিও হইতেছে:

বুন্দ সুন্দর নেনি নেনি।

এই 'নেনি নেনি' বৃষ্টির বালাই যাই! প্রাচীন সাহিত্যে কোথায়ও এই পিশ্ পিশ্ করা ইলশে গুঁড়ির বর্ণনা দেখিতে পাই না! কিন্তু কুলনলীলার পক্ষে এমনই এক বর্ষার রাত্রি চাই—ঝড়ঝঞ্ঝা দুর্যোগ চাই না।

বারিদ গরজি গরজি সব ঘেরল
বুন্দ বুন্দ করি করু পাত।
কহ শিবরাম মলয়াচল দুহুঁ পর
মৃদু মৃদু করতহি বাত॥

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির সঙ্গে মলয় সমীরণ বহিতেছে। ময়ূর কেকাধ্বনি করিতেছে, চকোর-চাতক-শুক-পিক মধুর গান করিতেছে, অলি-ঝঙ্কারে কানন ভরিয়াছে। নদীর কূলে

কূলে ব্যাঙ ডাকিতেছে, আর সেই ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিশাইয়া গগনে গুরু গুরু দেয়া ডাকিতেছে।

বদত মোর চকোর চাতক
কীর কোইল অলিগণি।
রটত ধরণী— তোয়ে দাদুরী
অম্বুদাম্বরে গরজনি॥ —বিদ্যাপতি

'পরম মুগ্ধ শিরোমণি' অখিল কলাগুরু কৃষ্ণচন্দ্র এমনই দিনে ঝুলনায় বসিয়াছেন। সখীগণ ক্রীড়াসঙ্কুচিতা রাধাকেও তুলিয়া দিলেন। তখন সেই লতার ভুজি ধরিয়া সখীরা দোলা দিতে লাগিলেন। ইহাই নওল-নওলী কৃষ্ণরাধিকার ঝুলন।

কিয়ে অপরূপ ঝুলন কেলি,
শ্যাম হৃদয়ে হৃদয় মেলি
রাধা রহু লাগি। —উদ্ধবদাস

শ্রীমতী ঝুলনার ঝোঁকে দন্ত চমকাইতে লাগিলেন, নায়কশ্রেষ্ঠ তত্ত তাঁহাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন।

ঝুলনা-ঝমকে চমকে রাই
বিহসি মাধব ধরল তাই
আনন্দে অবশ পরশ পাই
চাপি করত কোলে রি। —কৃষ্ণদাস

কিছুক্ষণ পরে তিনি দোলনার দুলুনীতে অভ্যস্ত হইলেন। কিন্তু সখীরা যখনই কৌতুকে 'অতিহঁ বেগে' দোলা চালাইতেছেন, তখনই শ্রীমতী উৎকণ্ঠিত হইয়া সখীগণকে অনুনয় করিতেছেন, 'তোমরা একটু ধীরে-ধীরে ঝুলাও পাছে আমার প্রাণবঁধু পড়িয়া যান।

ঝুলায়ত সখীগণ করতালি দিয়া।
সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া॥ —জগন্নাথদাস

বৈষ্ণব কবিরা বর্ষার ছন্দে ঝুলন-প্রীতি রচনা করিয়া পরম উপভোগের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু লীলার মাধুর্য সকলের প্রাণে সমান আনন্দ দান করে না। শ্রীরাধামাধব কোন এক অতীত যুগে বর্ষার ঘনায়মান সন্ধ্যায় ঝুলনায় ঝুলিয়াছিলেন, শুধু এইটুকুমাত্র শ্রবণ করিয়া যাঁহারা ভগবল্লীলারসে অবগাহন করিতে পারেন না, তাঁহাদের সন্ধানী চিত্ত তত্ত্বের দিকে ধাবিত হয়। তাঁহারা লীলার ফুলপাতা সরাইয়া ফলের অনুসন্ধান করেন। তাঁহাদের তৃপ্তি-বিধানের জন্য লীলার মধ্যে তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যলীলা তিনটি। একটি রাসলীলা। ইহাতে তত্ত্ব হিসাবে আছে বিশ্বের অফুরন্ত আনন্দের উৎসব। রাস অর্থই প্রকৃষ্ট রস। রস এব রাসঃ! রাস অর্থে অখণ্ড আনন্দ। সেই ভূমা আনন্দের প্রতীক হইল রাসের নৃত্য। রাসের আর এক অর্থ অবশ্য চক্রাকারে নৃত্য। চক্রধারীর রাসমণ্ডলী বা রাসচক্র আনন্দের সীমাহীন পৌনঃপুনিকতা, অনন্ত বিস্তৃত পুলকোচ্ছ্বাস। বিশ্বের যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু আনন্দের সবই তাঁহারই বিকাশ। আনন্দাদ্ধি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

তাঁহার আর একটি লীলা হোলি। হোলিলীলার তত্ত্ব তাহার বাহিরের লাল রঙেই ঘোষিত হইয়াছে। হোলি বা দোল ফাগের উৎসব। যাহার হৃদয় অনুরাগে অরুণ হয় না, ফাল্গুনের অবীর পুলক যাহার প্রাণে অনুরাগের ফাগ মাখাইয়া দেয় না, তাহার পক্ষে হোলি উৎসব ব্যর্থ। বিজয়া দশমী যেমন শাক্তদিগের পক্ষে এক পরম মৈত্রীর মিলন মহোৎসব, হোলিও তেমনই বৈষ্ণবদের এক সার্বজনীন মহা মিলনক্ষেত্র। প্রীতির পিচকারী যখন লাগে লাগে ছুটে, তখন গালাগালিও কটু না হইয়া উপভোগের সামগ্রী হয়। 'স্তুতি নিন্দা সকলই মধুর।'

ঝুলন লীলা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও অনাদিকাল হইতে ইহার ইঙ্গিত রহিয়াছে। ভগবানের আন্দোলন লীলা সমস্ত ছন্দ, সমস্ত গতি, সমস্ত জীবপ্রবাহের উত্থান-পতনের প্রতীক। বিশ্বে যে ছন্দ অনন্ত মাধুর্যে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই আভাস ঝুলনে পাওয়া যায়। ছন্দ নহিলে বিশ্ব যে এক মুহূর্ত চলে না! সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছন্দে চলিতেছে, যদি সে ছন্দের ব্যতিক্রম কখনও ঘটে, তবে দিনরাত্রির ক্রমভঙ্গ হইবে, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পরস্পর পরস্পরের পথ রোধ করিয়া চুরমার হইবে। সমস্ত বিশ্বে সঙ্গীতের, কাব্যের প্রধান সম্পদ্, সুষমা, গৌরব তাহার বিচিত্র ছন্দ। সঙ্গীত, কাব্য না হইলেও মানুষ বাঁচিতে পারে, কিন্তু প্রাণের স্পন্দন পর্যন্ত সবই যে ছন্দ। সে ছন্দচ্যুতি যখন ঘটে, তখন প্রাণ নিষ্কৃতি লাভ করে মরণে, গতি মূর্ছিত হয় পাষাণের চিরস্তব্ধ স্থাবরতায়। নীহারিকাপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের কীট-পতঙ্গ অণুপরমাণু পর্যন্ত সবই ছন্দে সুরে সৌন্দর্যে বাঁধা। তাহারই সূত্রডুরি ধরিয়া আনন্দময়কে আমরা দোলাই ঝুলনে।

মা-হারা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কোন্ গ্রামে মা বেড়াও ঘুরে— কোন্ গ্রামে বা থাক ?
মা-হারা এই হতভাগায় চিন্‌তে পার নাক ?
দেখ্ দেখি মা ভাল ক'রে তাকিয়ে আমার পানে,
স্থির নয়নের দৃষ্টি জাগে তোমারি সন্ধানে :
মানুষ বদল হলে পরেও মুখের আদল দেখে
মা চিনে নেয় আপন ছেলে সে নেয় মারে ডেকে।
তুমি যে মা— তোমার কাছে শক্ত গোপন করা,
মা যদি চায় ছেলে যে তার আপনি দেবে ধরা !
মুখের দিকে চাইলে মায়ের জাগ্‌বে ব্যথা প্রাণে,
এড়িয়ে তারে মা জননী লুকাবি কোন্ খানে ?

কত আমায় ভুলাবি বন্—মেঘচরা মাঠে—
একলা বেড়াই সারা দুপুর, সূর্য্য বসেন পাটে ;
রোদ্ পড়ে যায় তোর আঙিনায়, সন্ধ্যা আসে নেমে ;
একলা পথের হাঁটনী আমার হঠাৎ আসে থেমে ;
ম্লান গোধূলির ছায়ায় ভাসে মায়ের মুখের ছায়া
চোখ এত কিসের হ্যা গো ?—এননি মায়ের মায়া—
ভুলিয়ে রেখে আপন ছেলে কিসের অন্বেষণে
মা তুই এমন ব্যাকুল হয়ে বেড়াস বনে বনে ?

সকাল হতে নাহি হতে দেখি দুয়ার খুলে,
ঘুম থেকে মা জাগিয়ে আমায় খেল্‌নাপাতি ভুলে,
শিয়রে মোর জ্বালিয়ে রেখে মাটির প্রদীপখানি
হ্যা মা তুমি কোথায় গেলে—কিছুই নাহি জানি !!
নদীর জলে বন্যা আসে ঘূর্ণিঘোলা জল
সেই জলে মা নাইতে এসে চলি কি নিতল ?
কূল ছাপিয়ে জল ওঠে না, সেই সে কূলের কাছে
আলতা-রাঙা পা দুখানির চিহ্ন আজও আছে,
ওপার থেকে এপারে কে ডাক্‌লে নিশি ভোরে
ছেলের মায়া ত্যাগ করে না আসতে হল তোরে,
নদীর ধারে খুঁজে বেড়াই দেখি কাশের বনে
আকুল হাওয়ার বৈরাগী সুর উঠ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে,
শঙ্খচিলের ডানার ভরে মন উড়ে যায় দূরে,
তোর দেখা বল্ মিলবে কোথায় ? কোন্ সে গোপনপুরে ?
সেথায় বুঝি বন্দিনী তুই ? শান্তি চারিধারে
পাহারা দেয় সজাগ হয়ে পাষাণ কারাগারে।

বল্ না মাগো কোথায় আছিস্, কোন্ ঠিকানা তার
বন-কাপাসীর দখিনপাড়ায় ? চিত্রা নদীর ধার ?
কাশ কুসুমের কোমল হাসি শুভ্র দুধের ফেনা
কূলে কূলে উঠছে ফুলে যায় না ক' ঠিক চেনা—
মায়ের শুভ্র আঁচল না কি কাশ কুসুমের হাসি
সেইখানে কি লুকিয়ে আছিস, হায় গো সর্ব্বনাশী।
ঘাটের কূলে বটের মূলে নৌকা বাঁধা আছে
নেওটা ছেলে হেলেদুলে চল্‌ছে মায়ের পাছে,
জলভরা তার কল্‌সী—থেকে চল্‌কে পড়ে জল
কিসের ব্যথায় মা জননীর নয়ন ছল্‌ছল ?
আন্‌মনে মা চলছে পথে মন চলে কোন্‌খানে
সেইখানে কি লুকিয়ে আছিস ? কিসের ব্যথা প্রাণে ?
মাঠের পরে মাঠ চলেছে গ্রামের পরে গ্রাম
নৌকা চলে বৈঠা চলে হেলার অবিশ্রাম।
গলায়-দড়ের নীলকুঠি তার আধভাঙা সব বাড়ী
রইল বামে চণ্ডীতলা রুদ্রনগর ছাড়ি—
পশ্চিমে ওই যায় দেখা যায় আকাশ নামে দূরে
অস্ত রবি সোনার রঙে ছোপায় সুবলপুরে।
ডাইনে আমার সোনার গাঁয়ে বাঁধব কি মোর তরী
খুঁজলে যদি না পাই তোরে সেই ভয়ে মা মরি।
ভয় করে মা সন্ধ জাগে যদিই না পাই দেখা,
কেমন ক'রে আস্‌ব ফিরে বল্ মা একা একা।
আয় ফিরে আয় আপন ঘরে অভিমানী মা
ঘরের আঁধার সরিয়ে ঘুচাও মনের কালিমা।
দিন যামিনী থাক্‌ব এবার তোমার আঁচল ধরে
নয়ন ছাড়া করব না মা, ছাড়বি কেমন ক'রে ?
কোলে তোমার রাখব মাথা, চাইব মুখের পানে
আদর করিস সোহাগ করিস, ঘুমপাড়ানি গানে ;
ঘুম পাড়িয়ে দিস না যেন এবার জাগার পালা
নয়ন জলে ব্যথার পূজা—প্রাণের প্রদীপ জ্বালা।

মাধবের সংসার

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

মাধব গরীব হলেও সংসারটী তার বেশ শান্তিতে পূর্ণ ছিল, অভাব অভিযোগ হয়ত তাহার কিছু কিছু ছিল, কিন্তু মাধব আদৌ তাহা গ্রাহ্য করত না।

পাড়ার সকলের বাড়ীর যেমন হয় মাধবেরও তাই, বাপের পুঁজি, খোপলার বেড়া ও খোলপাতার ছাউনির দুইখানা ঘর। কিন্তু ঠাঁনে, ঘর ও বাড়ীর চারিদিক সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাধবের স্ত্রীর প্রখর দৃষ্টির জন্য কোথায়ও এতটুকু ময়লা জমবার উপায় ছিল না।

বাড়ীর নীচে খরস্রোতা কপোতাক্ষ নদী, জোয়ারের সময় কপোতাক্ষ পূর্ণ যৌবন ভরে ছোট-বড় ঢেউগুলি বুকে নিয়ে ফুলে ফুলে তাহার দুই কূলে আছড়ে পড়ে, আর ভাঁটায় তাহার সেই পূর্ণ যৌবনের কোন চিহ্ন থাকে না, সেই দুই কূল প্লাবিত জলরাশি কোথায় যায় কে জানে? মনে হয় যেন কপোতাক্ষ একেবারে শুকিয়ে গেছে।

এই জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে মাধবের সংসার-যাত্রা। পরিপূর্ণ জোয়ারের শেষ দিকটায় মাধব তাহার সেই বৃহৎ বেড়াজালনৌকার উপর রেখে গাছে বাঁধা শেকলটী খোলে আর চেঁচিয়ে ডাকে, "রাঙাবৌ, ও রাঙাবৌ, দেরি করিস না, জল থর্ থর্ করছে, এখুনি ভাঁটার টান পড়বে।"

রাঙাবৌ তার একহাতে গামছায় বাঁধা ভাত-তরকারি ও অপর হাতে আঙুলের মালসাটা নৌকায় রেখে বলে, "খোকাকে আবার করে এলে না?"

মাধব রাঙাবৌয়ের হাতে বৈঠাখানা দিয়ে বলে, "নৌকাটা ধ'রে থাক, যেন সরে না যায়।"

নৌকায় গিয়ে এসে মাধব ব'লে, 'জানিস রাঙাবৌ, খোকার মা তোর চাইতে কতটা হবে, বেটী ভারি দুষ্টু, হয়েছে, কেমন ক'রে হাসে মুখের দিক চেয়ে, ইচ্ছে হয় না ফেলে কাজে যাই, কষ্টে-সিষ্টে দাতটা বছর কাটিয়ে দিতে পারলে তখন খোকা আমার সঙ্গে জালে যাবে।"

রাঙাবৌ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, "যাঃ রে, জালে যাবে কি? পাঠশালে পড়বে না?"

মাধব সহসে রাঙাবৌয়ের হাত থেকে বৈঠাখানা কেড়ে নিয়ে বলে, "আচ্ছা, ও আগে বাঁচুক, তার পর তোর ছেলেকে দুই পণ্ডিত করিস। এখন যরে যা, খোকা একলা আছে।"

রাঙাবৌ নৌকা থেকে নেমে ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে বলে, "ভাত-তরকারি কম ক'রে দিইছি, সব খেয়ো কিন্তু, জলে ফেলো না।"

মাধব ছোট একটু 'আচ্ছা' বলে নৌকার পাড়ি ধ'রে, মাঝ নদীতে গিয়ে ফিরে চেয়ে দেখে রাঙাবৌ তারই দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

মাধব চেঁচিয়ে বলে, "হাঁ ক'রে দেখছিস কি? দেখে তোর আর আশ মেটে না, না!"

রাঙাবৌ লজ্জায় ছুটে যায় বাড়ীর দিকে।

সংসার ছোট হলেও রাঙাবৌয়ের একটুও অবসর ছিল না, সে পরম উৎসাহে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল সকল রকম কাজের মধ্যে, তার না ছিল ক্লান্তি, না ছিল অবসাদ।

দুপুরবেলায় রান্নাঘরের কাজ শেষ ক'রে রাঙাবৌ নদীর ঘাট থেকে বাসন মেজে ও কাপড় কেচে ফিরবার সময় একবার ভাল ক'রে জলের দিক চেয়ে দেখে জোয়ারের টান কিরকম আর দেরি কত। আপন মনে বলে, "ওঃ বেলা শেষ না হলে আজ যেগছি জোয়ার ফিরবে না।" রাঙা-বৌয়ের সুন্দর মুখখানা যেন বিষাদের ছায়ায় মলিন হয়ে ওঠে, তার স্বামী যে ভাঁটার সময়টায় মাছ ধ'রে ও জোয়ারের প্রথম দিকটায় ঘাটে এসে নৌকা লাগায়। আজ সে অনেক দেরি।

বোটা জালের তৈরি দোলনার ভিতর ছেলেটাকে শুইয়ে দিয়ে রাঙা-বৌ ক্ষিপ্র হস্তে জাল বোনে, আর ভাবে তার ছোট বেলার কথা—কত ছোট বয়সে সে এ বাড়ীতে এসেছিল, তার শ্বশুর-শাশুড়ী কত স্নেহ যত্ন তাকে করতেন, বেশী বড় হতে না হতে তাঁরা একে একে এই সংসারের ভার তার ঘাড়ে চাপিয়ে চলে গেলেন। সময় সময় তার বড় ইচ্ছা হয় সে কিছু দিনের জন্য বাপের বাড়ী গিয়ে কাটিয়ে দেয় কিন্তু তার স্বামীর যে তাকে না হলে একদিনও চলে না, তার স্বামী ত সংসারের কোন খবরই রাখে না। শৈশবের স্মৃতিগুলি একে একে তার মনের মাঝে যখন জমাট হয়ে ওঠে তখন সে নিজেকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে, সে ভুলে যায় যে, সে এখন বড় হয়ে একটা সংসারের ভার মাথায় নিয়ে চলেছে, সেই ত তার বাপ মায়ের প্রথম সন্তান, বড় মানুষের। তারা দুই বোন ও এক ভাই, ভাই-বোনেরা হয়ত এখন যে যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বাড়ীর নীচে ছোট নদীতে ভাই-বোন ও পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশে কত খেলা তারা করত। সাঁতার দিয়ে কে কত দূর এপার ওপার করতে পারে, এক ডুবে কে কতখানি যেতে পারে, এই নিয়ে তারা কত ঝগড়া ও মারামারিই না করেছে। দোলনার খাঁচিত শিশুটী কেঁদে উঠতে রাঙাবৌয়ের চিন্তাসূত্র বার ছিন্ন হয়ে যায়, সে ব্যস্ত হয়ে ছেলেটীকে কোলে নিয়ে স্তন্য দেয় ও আপন মনে বলে, "এইবার একদিন স্বামীপুত্র সঙ্গে নিয়ে নিশ্চয়ই বাবা মাকে দেখে আসব, কতই বা দূর, চার ঘাক জল পুরা যাইতে হয় না।"

LIBRARY

শ্রাবণের শতধারা নেমে এসেছে ধরণীর বুকে, [illegible] আনন্দে আত্মহারা হয়ে দুই কূল প্লাবিত করে ছুটে চলে [illegible] অজানার সন্ধানে, তার না আছে শ্রান্তি, না আছে বিরাম। কপোতাক্ষর দুই পার্শ্ব জনপদ আজ জলমগ্ন।

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে মাধব কখনও কর্ত্তব্যচ্যুত হয় নাই। সন্ধ্যার পর

মাধব তাহার নির্দিষ্ট স্থানে নদীর এ পার থেকে ওপার পর্য্যন্ত টাঙান শক্ত দৃঢ় বেড়াজালের একটা পাশ বেঁধে অপর সমস্ত অংশটা নদীগর্ভে স্রোতের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বৈঠা হাতে নৌকার পথুইয়ের উপর ধীর স্থির-ভাবে বসে থাকে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা মাধবের অনাবৃত মস্তক ও দেহ সিক্ত ক'রে দেয়, কিন্তু সে একটুও গ্রাহ্য না ক'রে জালের দড়ি দাছাটী ধরে ধীরু জালের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকে কখন তার জাল গুটিয়ে মাছগুলা নৌকায় তুলতে হবে। বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে মাধবের যখন বৈঠ ধরে তখন সে নৌকাখানা চড়ায় লক্ষ্যে রেখে জালের দড়িগাছটী হাতে নিয়ে ছইয়ের ভিতর ঘরে আগুনের মালসায় হাত-পা ভাল ক'রে সেঁকে এক ছিলিম তামাক খেয়ে পুনরায় নিজের স্থান অধিকার করে। এইত তার রোজদিন কার্য্যতালিকা।

সমস্ত রাত মাছ ধরার পর আজও মাধব প্রাতের বাজারে কেনা-বেচা শেষ ক'রে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে বৈঠার সাহায্যে উজানের টানে নৌকা-খানা তীর বেগে ছুটিয়ে দিল বাড়ীর দিকে। মনে হয় তার প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে স্ত্রী-পুত্রের অদর্শনে।

ঘাটে নৌকা লাগাতেই মাধব ব্যস্ত হয়ে উঠল একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনে, তার অনুমান করতে দেরী হল না যে, কোলাহল চলেছে তারই বাড়ীর উঠানে! একটা অজানা আশঙ্কায় তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সে বিলম্বের দেরি না ক'রে শেকলটা পায়ের সঙ্গে বেঁধে ছুটে চলল বাড়ীর দিকে।

উঠানে পৌঁছে মাধব চীৎকার করে বললে, "রাঙাবৌ, আমার খোকা কোথায় রে?"

মুহূর্ত্তের স্তব্ধতা মাধবের আশ্বাসে মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

রাঙাবৌয়ের পরিহিত বস্ত্রখানি ছিন্ন ভিন্ন, মাথার চুল এলো মেলো, নয়ন রক্তবর্ণ, খোকাকে কোলে নিয়ে সে বসেছিল উঠানের এক পাশে, মাধবের ডাকে রাঙাবৌ ছুটে গিয়ে খোকাকে মাধবের কোলে ফেলে দিয়ে তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

মাধব রাঙাবৌয়ের ঐ রকমের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বললে, "চুপ করিস না রাঙাবৌ, কি হয়েছে সব খুলে বল্, তুই ঘর ছেড়ে উঠানে কেন?"

রাঙাবৌ বললে, "এরা আমায় ঘরে যেতে দিচ্ছে না, সেই কাল রাত্রি থেকে দাওয়ায় বসে, এখন সকলের হুকুম আমাকে উঠানে থাকতে হবে।"

মাধব সিকট চীৎকার করে বললে, "হুকুমদার কে? একবার এগিয়ে আয়, মাথাটা ভেঙে চাড় করে দি।"

মাধবের চীৎকারে জনতার মধ্যে থেকে পাড়ার মোড়ল হারু খড়াই মাধবের দিকে এগিয়ে এসে বললে, "হুকুম দিয়েছি আমি, শোন্ মাধা, বুড় হলেও তোর মত দুই-বলটা জোড়ার চীৎকারে হারু মোড়ল ভয় পায় না। তুই আর ঐ বৌ নিয়ে ঘর করতে পারবি না, শান্ত হয়ে সব কথা শোন্, কাল রাত্রিতে তোর ঘরে পাঁচ-সাত জন লোক তোর বৌকে টানতে টানতে নদীর ঘাট পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, তোর বৌয়ের চীৎকারে আমরা সব লাঠি টাঙ্গি নিয়ে হাজির হলাম, জানিস মাধা, একটা হাঁক দিতেই বাচ্চাধনরা নৌকায় উঠে পাড়ি মারলে। আঁধার রাত, মুষলধারে বৃষ্টি, কাউকে চিনতে পারলাম না। তার পর শুনলাম, তোর টাকার থলেটা না কি নিয়ে গেছে। এখন তুইই বল না মাধা, ঐ বৌ নিয়ে তুই ঘর করবি কি ক'রে?"

মাধবের সমস্ত শরীর রাগে থর থর ক'রে কাঁপছিল, সে কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "বৌয়ের অপরাধ কি চ'ল, হারু খুড়?"

হারু খড়াই মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, "জানিস্ মাধা, যত দিন বেঁচে আছি, সমাজে অনাচার ঢুকতে দেব না। তোর বৌয়ের কোন দোষ নাই, একথা আমি কেন, সবাই বলবে, খুব শক্ত বৌ, দাপট ক'রে দস্যুদস্যি ও চীৎকার না করলে পাড়ার কেউ জানতে পারত না। কিন্তু জানিস মাধা, সমাজে সে বিশৃঙ্খলা করবে না, পরপুরুষ তোর বৌকে জোর করে ধরে ঘরের বার করেছিল, কাজেই ও বৌকে আর এখন ঘরে নেওয়া চলে না। কথায় বলে, ভেসেলের হাঁড়ি আর ঘরের বৌ বাইরের লোক ছুঁলে নষ্ট হয়ে যায়, আর ব্যবহার করা চলে না।"

মাধব উত্তেজিত হয়ে বললে, "শোন হারু খুড়া, আমার বৌকে আমি খুব ভাল করেই জানি, নয় বছর বয়সে ও আমার ঘরে এসেছে, ও ইচ্ছা করে অপরের সঙ্গে ঘর থেকে বেরুবার মতলব করেনি, তুমি নিজে বলছ ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তোমার সমাজের বিচার জানি না, আমি আমার বৌকে ত্যাগ করতে পারব না।" একটু থেমে মাধব চক্ষুর ইঙ্গিতে রাঙাবৌয়ের দিকে চেয়ে বললে, "ছেলেকে নিয়ে ঘরে চল্ রাঙাবৌ, যারা লোকের কথায় ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা কোনকালে!"

হারু খড়াই কাঁধের গামছাখানা কোমরে বেঁধে নিয়ে আরও দুই পা এগিয়ে এসে যথেষ্ট উত্তেজনার স্বরে বললে, "খবরদার মাধা, সমাজকে অমান্য করে বৌকে ঘরে নিলে তোর ভাল হবে না, তোর গুরু, পুরুত, ধোপা, নাপিত, এমন কি হুঁকা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেব। হাঁ, আরও স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, এর জন্য তোকে গ্রাম ছাড়তে হবে। আমার যে কথা সেই কাজ।"

মাধব অবজ্ঞার সঙ্গে বললে, "সে জানি খুড়, তারা জোর করে আমার বৌকে বেইজ্জতের চেষ্টায় ছিল, তাদের তুমি কিছু করতে পারলে না, তুমি যত কিছু অত্যাচার করবে আমার উপর, কিন্তু খুড়, যখন যা কিছু কর সাবধান হয়ে করো, মাধবের লাঠির জোর একটুকুও কমেনি, প্রাণের মায়া থাকে ত তোমার দলবল নিয়ে এখন ঘরে পড়।"

উত্তেজনার সঙ্গে মাধব বললে, "চল্ রাঙাবৌ, ছেলেকে নিয়ে ঘরে চল্।"

রাঙাবৌ ধীর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে সজল চোখে বললে, "না, আমি ঘরে যাব না, আমার জন্য ওরা তোমায় গ্রাম ছাড়া করবে, অত্যাচার করবে, তোমার অপমান আমি সইতে পারব না। খোকাকে দেখো। চোখের নিমিষে রাঙাবৌ মাধবের পায়ের ধুলা মাথায় নিয়ে ছুটল পরপ্রান্তে কপোতাক্ষীর দিকে, ক্ষিপ্র স্বরে মাধব তার সংজ্ঞাহীন ছেলেটাকে তুলে ঘরে এনে শুইয়ে দিলে।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অমিতকুমার রায়

বর্ষার বাজার

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

বোলতা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

কৌতুক উপভোগ করবার লোভটুকু সংবরণ করতে না পেরে যাঁরা কোনদিন বোলতার চাকে ঢিল ছুঁড়েছেন, তাঁরা বেশ ভালভাবেই জানেন, বোলতা আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও আত্মরক্ষার্থ তাদের প্রকৃতিগত অস্ত্রের আক্রমণের প্রতিরোধ করা শক্তিশালী মানুষের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়। অনেক সময় ক্ষীণকায় দেহ, বোলতার হুলের বিষে স্থূলকায়ে পরিণত হ'য়ে

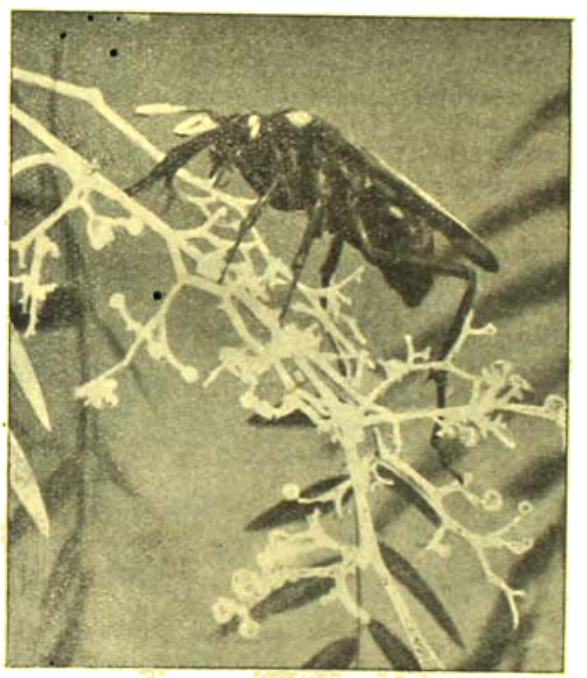

উদ্যমবিহীন অবস্থায় শিকারী-বোলতা মধুপানে রত ;
এর এ অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্তন হয়

ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। বোলতা সাধারণত নিরীহ শান্ত প্রকৃতির—অকারণে কারও কোন অনিষ্ট করে না।

প্রত্যেক শ্রেণীর বোলতার মধ্যে কোন না কোন প্রভেদ আছে ; বোলতার এরূপ শ্রেণীর সংখ্যা দশ সহস্র। সামাজিক জীবন অর্থাৎ একত্রে বহুসংখ্যক বোলতার বসবাস খুব কম শ্রেণীর বোলতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। মাত্র আটশত শ্রেণীর বোলতা সামাজিকভাবে জীবন যাপন ক'রতে অভ্যস্ত। বেশীর ভাগ শ্রেণীর বোলতা নির্জ্জনবাস পছন্দ করে।

মস্তক, বক্ষ ও উদর নিয়ে বোলতার শরীর গঠিত। মস্তক ও বক্ষের সন্ধিস্থলের নিকট বক্ষের উপর একজোড়া পা এবং বক্ষের নীচের দিকে খুব কাছাকাছি দু-জোড়া পা, মোট ছয়টি পা ; তার মধ্যে শেষের দুটি পা অন্যান্য পা অপেক্ষা বেশী লম্বা। প্রত্যেক পায়ের শেষের দিকে চিরুণীর দাঁতের মত ছোট ছোট কাঁটা বোলতার গৃহনির্ম্মাণ ও অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ সহায়তা ক'রে থাকে। মাথার দু-পাশে আছে তাদের একজোড়া উজ্জ্বল কাচের মত স্বচ্ছ চোখ—আর এই চোখের আকৃতি অদ্ভুতরকমে লম্বা। দুই চোখের ঠিক মাঝখান থেকে বার হ'য়েছে একজোড়া শুঁড়। বোলতার দু-জোড়া ডানা প্রজাপতির ডানা অপেক্ষা আকারে ছোট হ'লেও বেশ মজবুত। প্রজাপতি অপেক্ষা দ্রুত উড়ে যেতে পারে। ডানাগুলো সূক্ষ্ম শিরা দিয়ে তৈরী কাঠামোর ওপর আলোক-সঞ্চারী চামড়ার দ্বারা আবৃত। নীচের দিককার ডানাগুলো উপর দিকের ডানা অপেক্ষা ছোট এবং উপরের ডানার ঠিক নীচে ছোট ডানাগুলো দেহের সঙ্গে বেশ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন।

সামাজিকভাবে জীবনধারণ ক'রে এইরূপ বোলতার কথা বলতে গেলেই হলদে-রংয়ের একশ্রেণীর সামাজিক বোলতার কথা মনে পড়ে। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও হলদে বোলতা প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।

শীতকালে রাণী-বোলতাকে নির্জ্জনে দেওয়ালের ফাটলে বা অন্য কোথাও ঘুমিয়ে কাটাতে দেখা যায়। বসন্তকালে রাণী-বোলতাগুলো শুক্‌নো গাছের ডালের উপর ব'সে তাদের দৃঢ় চোয়ালের সাহায্যে গাছের সূক্ষ্ম বাকল কুরে কুরে গুঁড়ো ক'রে সংগ্রহ করতে থাকে। তারপর মুখ থেকে এক রকম

লালা বার ক'রে সেই কাঠের গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে পাতলা ছাই-রংয়ের কাগজের মত একরকম জিনিষ প্রস্তুত করে। এইটাই হয় বোলতাদের গৃহনির্ম্মাণের মূল উপাদান।

গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাণী-বোলতাগুলো গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে মন দেয়। গরমের সময় আমরা যখন অলস ভাবে দিবা-নিদ্রার সুযোগ খুঁজি সেই সময় দেখতে পাই কড়িকাঠের আশে পাশে চলছে বোলতা গৃহনির্ম্মাণের নিরাপদ স্থান খোঁজবার জন্য ব্যস্ত রয়েছে।

রাণী-বোলতাই গৃহনির্ম্মাণ ও সন্তান প্রতিপালন কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করে। অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-বোলতারা নানা ভাবে রাণী-বোলতাকে সাহায্য করে থাকে। গৃহ-নির্ম্মাণের সময় আমরা দু' একটী বোলতাকেই এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে দেখি। পুরুষ-বোলতাদের আমরা গ্রীষ্মকালে দেখতে পাই না। শীতের প্রকোপে তারা শীতকালে মারা যায়। সন্তানদের জন্মদান ছাড়া পুরুষ-বোলতাদের আর কোন কাজ থাকে না।

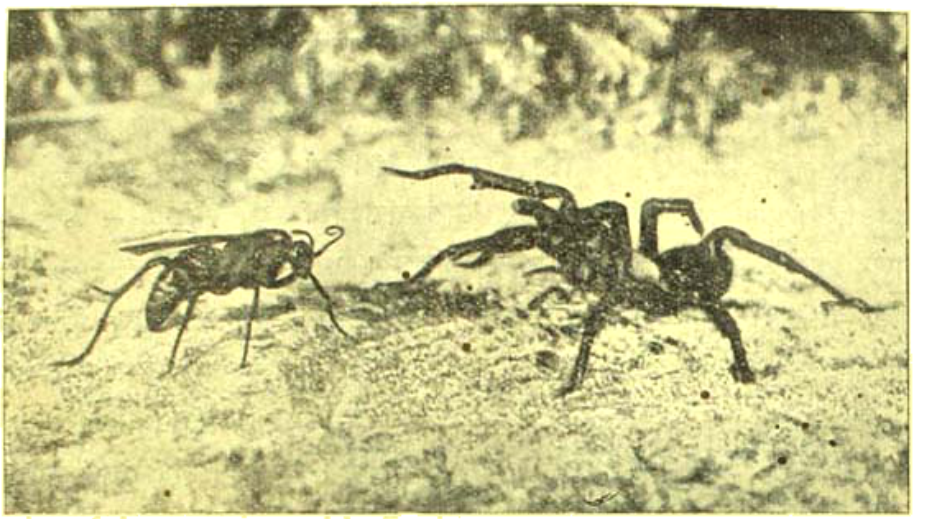

২ শিকারের পথে বোলতা ও মাকড়সার হঠাৎ সাক্ষাৎ। উভয়েই বেশ শক্তিশালী—একজনের বিষাক্ত হুল অপরের সুদৃঢ় চোয়াল, কিন্তু বোলতার কাছে মাকড়সা সহজেই পরাজয় স্বীকার করে

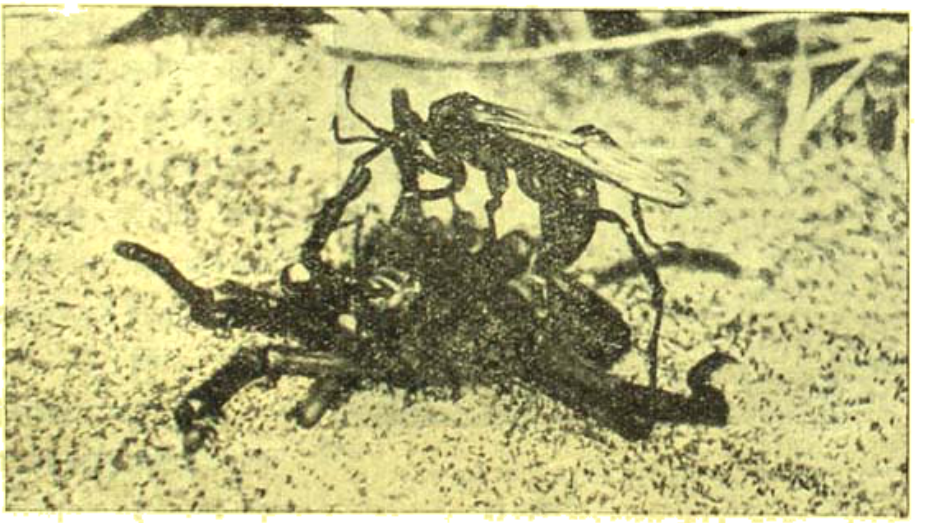

বোলতার এই অকস্মাৎ আবির্ভাবে মাকড়সা বিহ্বল হ'য়ে পড়ায় বোলতা চকিতের মধ্যে বিষাক্ত হুল সাহায্যে শিকারের সর্ব্বদেহে বিষ প্রবেশ করাচ্ছে। ক্ষণিকের মধ্যে শিকার জড় অবস্থায় পরিণত হয়

প্রথমে রাণী-বোলতা কাঠের গুঁড়ো আর লালা মিশিয়ে একটা লম্বা সরু কাঠির মত ক'রে সেটা নির্ব্বাচিত স্থানে লাগিয়ে দেয়। এইটাই তাদের হয় গৃহের ভিত। এই ভিত যাতে দৃঢ় হয় তার জন্য এরা বিশেষ যত্ন নেয়। এই জাতীয় বোলতার চাক দেখলে মনে হয় যেন একটা বাটীকে উপুড় ক'রে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাটীর উপুড়-করা অবস্থার মত সেই কাঠির নীচের দিক থেকে তারা ঘরের ছাদ তৈরী ক'রে নিয়ে ওপর থেকে নীচের দিকে মড়চুজের মত দেখতে চারটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করে। প্রকোষ্ঠের প্রবেশ-পথ নীচের দিক থেকেই ক'রে থাকে।

মানুষের কাগজ তৈরীর কল্পনা করবার বহু যুগ পূর্ব্ব থেকেই বোলতা তাদের তৈরী কাগজ দিয়ে গৃহনির্ম্মাণ ক'রে আসছে। এমনি সূক্ষ্ম উপাদানে তৈরী হ'লেও তাদের

গৃহ ঝড়-ঝাপটা থেকে কেমন ক'রে যে রক্ষা পায় তা ভাবলে আশ্চর্য্য না হ'য়ে থাকতে পারা যায় না।

মৌমাছি ও বোলতার চাকের মধ্যে বেশ প্রভেদ আছে। মৌমাছিরা চাক তৈরী করে মোমজাতীয় পদার্থের দ্বারা, আর বোলতারা চা ক-নি র্মা ণ ক রে পূর্ব্বোল্লিখিত কাগজের মত জিনিষ দিয়ে। কয়েক প্রকারের বোলতা আবার মাটি দিয়েও গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে থাকে। মৌমাছিরা চাকের পাশ দিয়ে তাদের চাকে প্রবেশ করে, কিন্তু বোলতাদের প্রবেশ-পথ নীচের দিক থেকে।

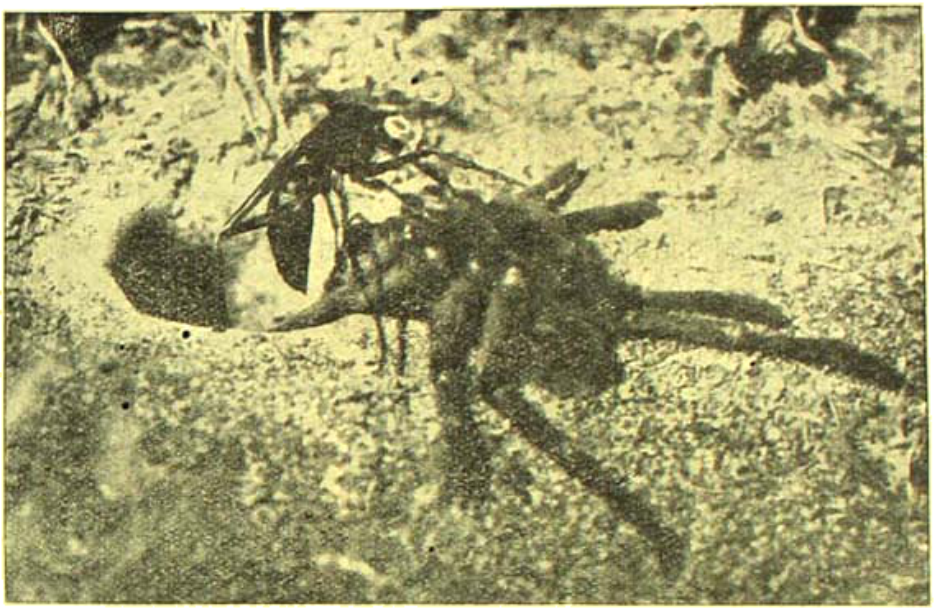

মৃত অবস্থায় জীবিত মাকড়সাকে পরীক্ষা ক'রে পিছন হেঁটে বোলতা শিকারকে নিজ-গৃহে টেনে এনেছে

গৃহনির্ম্মাণ শেষ হ'লে রাণী-বোলতা তাদের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ফুলের পরাগ ও মধু রেখে ডিম প্রসব ক'রে গৃহের মুখগুলো পাতলা শাদা আবরণ দিয়ে বন্ধ ক'রে দেয়।

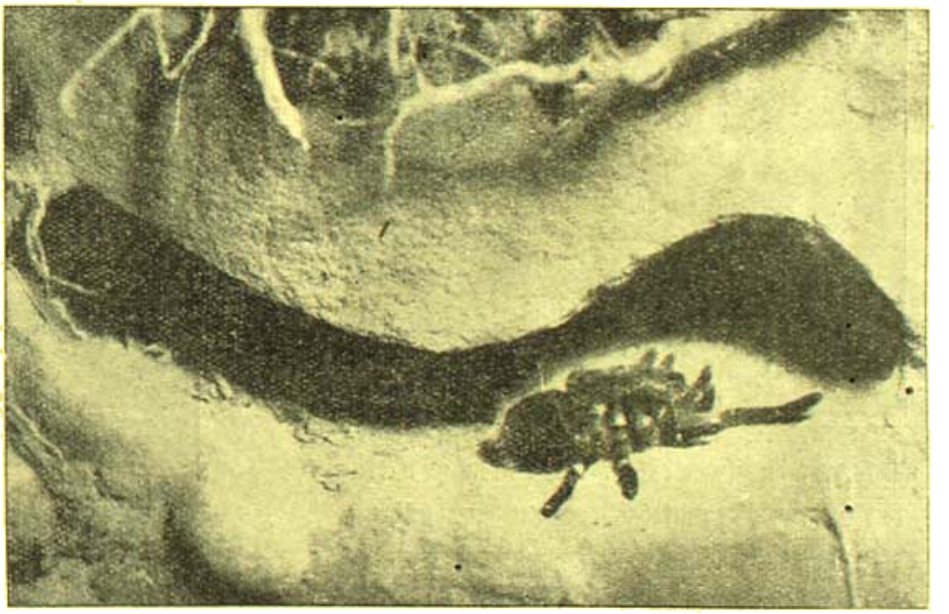

গৃহ-অভ্যন্তরে স্থিত মাকড়সার উপর বোলতা ডিম প্রসব ক'রে গৃহের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করে। এইভাবে মাকড়সার সমাধিলাভ হয়

মৃত অবস্থায় বোলতা-কীটগুলো দেখতে শাদা ফ্যাকাশে এবং প্রাণহীন ব'লেই মনে হয়। স্ত্রী জাতীয় বোলতা-কীটগুলো খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থা কে। কা র্য্য ক্ষ ম হ'লেই তারা মধু-সংগ্রহ সন্তান-প্রতিপালন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের ভা র লয়। সেই সময় রাণী-বোলতা কেবলমাত্র ডিম প্রসব করা ছাড়া অন্যান্য কাজ থেকে অবসর নেয়। গ্রীষ্মের শেষ দিকে স্ত্রী-বোলতাদের সাহায্যে ক্ষুদ্র চাক এক বৃহৎ পরিবার-যুক্ত চাকে পরিণত হয়। পুরুষ-বোলতাগুলো স্বভাবত অলস প্রকৃতির; তারা শীতের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাক থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেয়। সাধারণত একটি চাকে একের বেশী ডিম প্রসবকারী রাণী-বোলতাকে দেখতে পাওয়া যায় না।

বোলতাদের মধ্যে কেবলমাত্র স্ত্রী-বোলতাদেরই হুল

আছে। শত্রুকে আক্রমণ করবার সময় তারা তাড়াতাড়ি অনেক ক্ষেত্রে হুল ফুটিয়ে দিয়ে আর হুল বার করবার সময় পায় না—শত্রুর দেহে হুল রেখে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়। কর্ম্মরত স্ত্রী-বোলতারা কার্য্যকালে একরকম শব্দ করে। গ্রীষ্মকালে জলাভাবের সময় এরা ডানার সাহায্যে যে-কোন জলাশয় হ'তে জল বহন ক'রে এনে চাকের ওপর জল ছিটিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক উষ্ণতা রক্ষা করে।

বোলতারা সাধারণত নিরামিষভোজী, কিন্তু এদের মধ্যে কয়েক শ্রেণীর বোলতাকে আমিষভোজী ব'লে শোনা যায়। নিরামিষভোজী বোলতা ফুলের মধু, ফলের রস পান

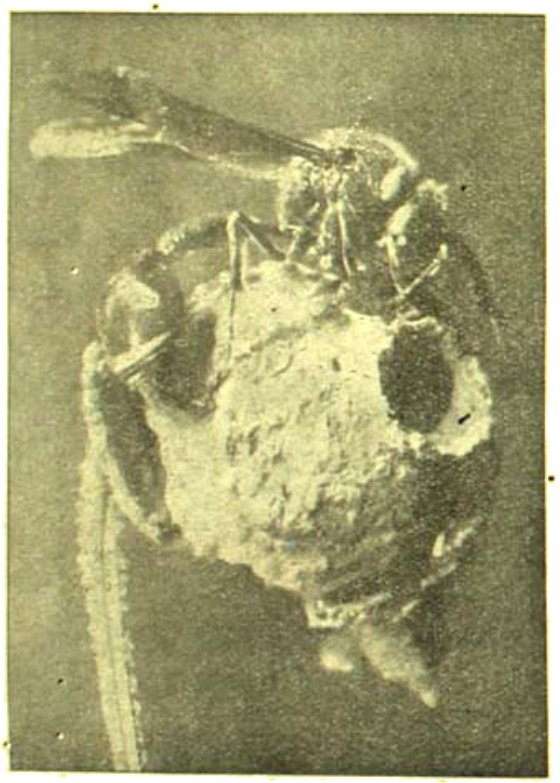

মাটি দিয়ে কলসীর আকারে তৈরী একশ্রেণী বোলতার গৃহ। চোয়াল দিয়ে গৃহং ছিদ্র ক'রে বোলতা-কীট বের হ'য়ে এসেছে। ছিদ্রের নীচে মাছি-বোলতা যে গৃহের প্রবেশপথ রুদ্ধ ক'রেছিল তা এখনও রুদ্ধ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে

ক'রে জীবনধারণ করে। অনেক সময় এদের রসগোল্লার গামলাতে ব'সে রস পান করতেও দেখা যায়।

ভীমরুল বা ভীম-বোলতা আর এক শ্রেণীর বোলতা। সব দেশেই এরা অত্যন্ত হিংস্রপ্রকৃতির ব'লে পরিচিত। আমাদের দেশেও এই শ্রেণীর বোলতা যথেষ্ট দেখা যায়। এরা সাধারণ বোলতা অপেক্ষা অনেক বড়। রং গাঢ় খয়ের রংয়ের মত—উদরের ওপর চওড়া হলদে ডোরা আছে। এদের গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী হলদে বোলতারই মত। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে ভীম-বোলতার একযোগে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ কিরূপ ভয়াবহ তা অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। তবে বিনা কারণে এরা কারো কোন অনিষ্ট করে না। এদের বিষের ক্রিয়া বড়ই ভীষণ। একসঙ্গে অনেকগুলি ভীম-বোলতা যদি কাউকেও হুল ফুটোয় তাহ'লে তার অবস্থা খুব সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়ায়। এমন কি জীবনান্ত পর্য্যন্ত হয়েছে শোনা যায়।

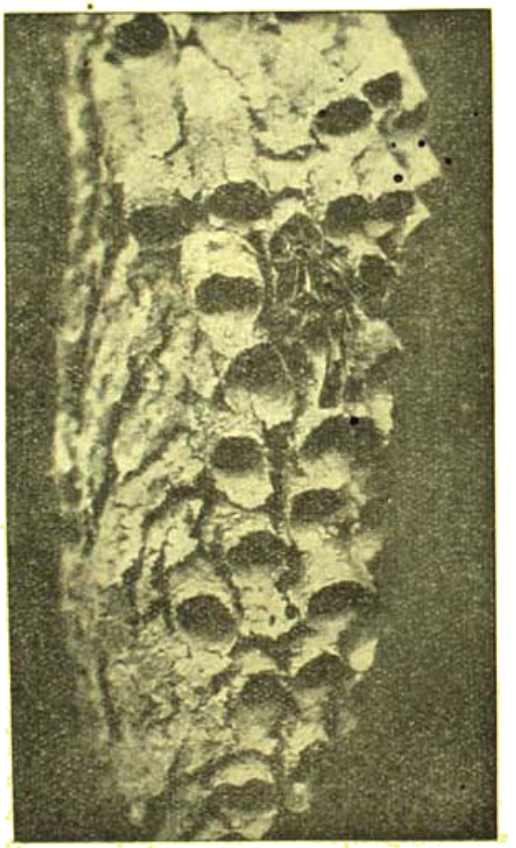

মাটির লম্বা লম্বা নল দিয়ে গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যস্ত আর একশ্রেণীর বোলতা

আমেরিকাতে দশ শ্রেণীর হিংস্র ভীমরুল বা ভীম-বোলতা দেখতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর বোলতাগুলো অধিকাংশই আমিষভোজী। কীটপতঙ্গের রস পান ক'রে তারা জীবন-ধারণ করে। এই বোলতাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর বোলতা আবার নিজেদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ ক'রতে পারে না। প্রতি-বাসী বোলতাদের চাকে গিয়ে বাস করাই তাদের স্বভাব।

কীট-শিকারী আর এক শ্রেণীর বোলতার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা সব আর বোলতার মত চাক তৈরী করে না। মাটি দিয়ে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাই

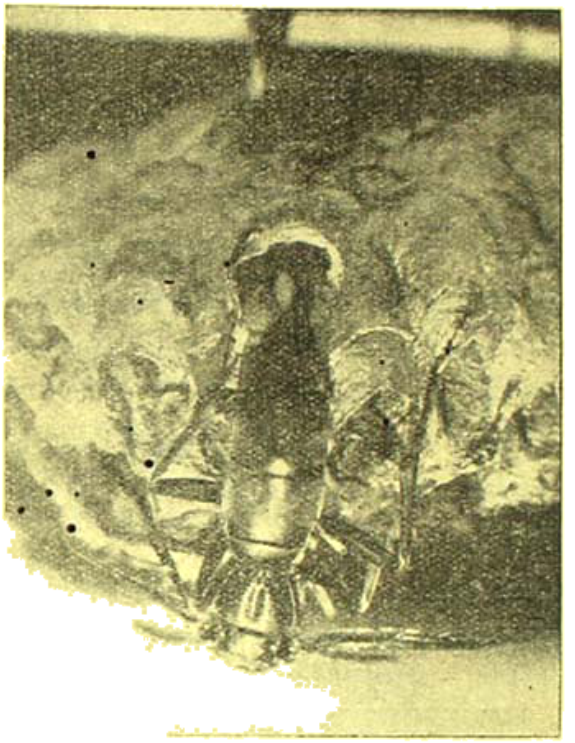

এই শ্রেণীর বোলতা কাদা দিয়ে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে বোলতা থালা আকারে ডিম প্রসব করছে

এদের বিশেষত্ব। নির্ম্মাণ কার্য্যে অন্য বোলতাদের মতই এদের রাণী-বোলতারা শিল্পীর কাজ ক'রে থাকে। পলি মাটি দিয়ে এরা প্রথমে পাশা-পাশি লম্বা দুই কুঠরী ঘর তৈরী করে। তারপর আড়া-আড়িভাবে মাঝে দেওয়াল তুলে তাকে ছয় কুঠরী ঘরে পরিণত করে। ঘরের ছাদ মাটি দিয়ে তৈরী ক'রে নিয়ে তারা শিকার সন্ধানে বার হ'য়ে যায়।

লম্বা লম্বা সবুজ পোকার শরীরে হুল ফুটিয়ে জ্ঞানশূন্য ক'রে তারা তাদের ঘরে নিয়ে আসে। শিকারকে গৃহে বহন ক'রে আনবার কৌশল এদের এতই চমৎকার যে, আশ্চর্য্য না হ'য়ে থাকা যায় না।

পোকাটিকে ঘরের ভেতর সাবধানে রাখা হ'লে তার ওপর রাণী-বোলতা সাদা ডিম পেড়ে ঘরের প্রবেশ-পথ বন্ধ ক'রে অপর শিকারের খোঁজে চলে যায়। এইরূপে জীবিত পোকাগুলো অসহায় অবস্থায় চিরদিনের জন্য বোলতার গৃহে সমাধিলাভ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত কুঠরীগুলো পোকা ও ডিম দ্বারা পূর্ণ না হচ্ছে, ততক্ষণ রাণী-বোলতার কাজের একটুও বিরাম থাকে না।

তিন দিন ডিমে তা দেবার পর,—ডিম থেকে নির্গত বোলতা-কীট সাত দিন সবুজ পোকা খেয়ে জীবনধারণ করে। পরে এ কীট নিজের চারদিকে প্রচুর পরিমাণে রেশমের জাল বুনে শীতকাল অতিবাহিত করে। এই ভাবে তারা কীট-অবস্থা অতিক্রম ক'রে বসন্তকালে পূর্ণ বোলতার আকারে মাটীর ঘর থেকে বার হ'য়ে আসে।

এই শ্রেণীর বোলতা সন্তানদের জীবনধারণের জন্যই কেবল পতঙ্গ শিকার ক'রে থাকে। নতুবা এই জাতীয় পূর্ণবয়স্ক বোলতারা সকলেই নিরামিষভোজী।

আর এক শ্রেণীর কীট-শিকারী বোলতা দেখতে পাওয়া যায় তা'দের কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ ও দীর্ঘ। রাস্তা ভাল

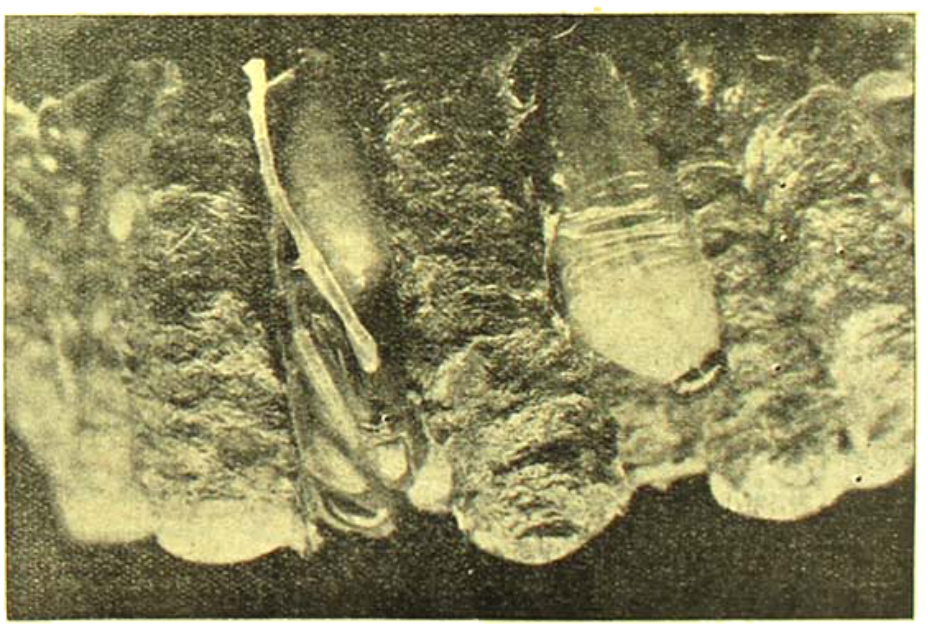

৩য় অবস্থায় বোলতা-কীট—চিত্রে পঙ্গুপের পা, চোখ, এবং অস্পষ্টভাবে ডানা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে

থাকলে রাণী-বোলতারা মাটির ওপর পিছন-হেঁটে শিকার টেনে আনে। পরে শিকারের ওপর ডিম প্রসব

Sand Wasp নামে আর এক শ্রেণীর বোলতার দেহের আকৃতি

করা হ'লে ঘরের প্রবেশ-পথ বন্ধ ক'রে দেয়। রাস্তার ওপর শিকার টেনে আনবার চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্যে এরা এক আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন ক'রে থাকে। ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রো দিয়ে তারা আগাগোড়া সমস্ত চিহ্ন সাবধানে মুছে দেয়। কারণ মধুরকণ্ঠী রংয়ের একরকম বোলতা নিতান্ত অলস প্রকৃতির ব'লে তারা গৃহনির্ম্মাণ করে না। নিজেদের ডানা জলে ভিজিয়ে এনে অপরের বাসা নরম ক'রে তার ভেতর প্রবেশ করে ও সংসার পেতে বসে। এদের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কীট-শিকারী বোলতাকে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হয়। এমন কি, তারা শিকার অন্বেষণ করবার সময়ও বার বার নিজের বাসার খোঁজ নিয়ে যায়।

শিকারী-শ্রেণীর বোলতার মধ্যে মাকড়সা-হত্যাকারী বোলতার শিকার ধরবার কৌশল এবং সাহস বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বড় আকারের এক শ্রেণীর বিষাক্ত মাকড়সার সন্ধানে তারা ঘুরে' বেড়ায়। ঐ রকম মাকড়সার সাক্ষাৎ মিললে বোলতা আক্রমণের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে।

উভয় পক্ষই শক্তিশালী—একজনের আক্রমণের অস্ত্র বিষাক্ত হুল,—অপরের সুদৃঢ় চোয়াল। উভয়ের সাক্ষাতে মনে হয় যেন উভয়েই নিজ নিজ শত্রুকে হত্যা করবার শক্তি রাখে—কিন্তু বৃহদাকার মাকড়সা বোলতার এই অকস্মাৎ দর্শনে কেমন যেন বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। বোলতা কিন্তু নিজেদের স্বভাবজাত কৌশল কখনও হারায় না। বিদ্যুৎ-গতিতে এরা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে' তার বিষাক্ত হুল বার বার ফুটিয়ে দেয়। আত্মরক্ষায় অসমর্থ হতভাগ্য মাকড়সা এইভাবে বোলতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। শিকারী-বোলতাদের সময় সময় মাথার ওপর ভর দিয়ে নরম কাদা মাটি থেকে, ছোট ছোট মাটীর তাল সংগ্রহ করতে দেখা যায়। গৃহ-নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ হ'লে, এই ছোট মাটির তালগুলো ছাদের চারদিকে বেশ সুসজ্জিত-ভাবে বসিয়ে দেয়। পূর্ব্বোল্লিখিত শিকারী-বোলতার মত আমাদের দেশেও "কুমরে" পোকা এক শ্রেণীর বোলতা দেখতে পাওয়া যায়।

দেহের গঠন, গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি ও শিকার ধরবার কৌশলও পূর্ব্ববর্ণিত শিকারী বোলতাদেরই অনুরূপ।

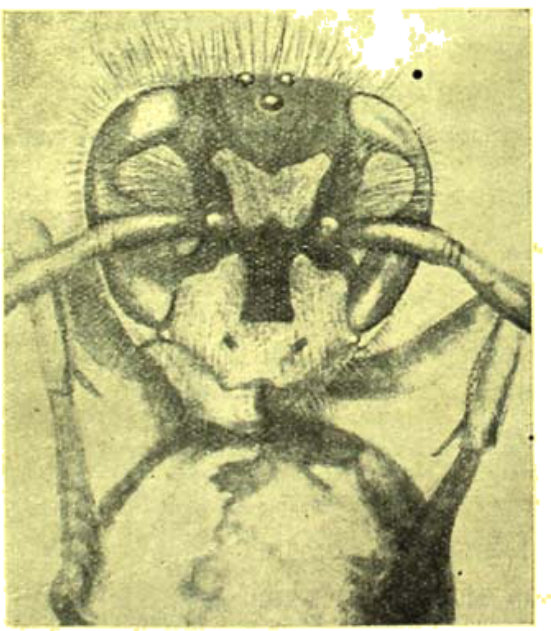

বোলতার মাথার সম্মুখভাগ—দু'জোড়া চোখ ও শুঁড় এবং কপালে ছোট ছোট তিনটি গোল গোল যা দেখা যায় তাকেও চোখ বলা হয়

পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বাড়ীর কবাট, জানালার আশেপাশে' এদেরকে গৃহনির্ম্মাণ করতে দেখা যায়।

সেইজন্য এদের গৃহনির্ম্মাণ, কীট-শিকার এবং শিকার আনবার কৌশল আমাদের বেশ চোখে পড়ে।

আমেরিকার Pipe-organ-বোলতা মাটি দিয়ে গৃহ-নির্ম্মাণ করার জন্য বোলতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ব'লে পরিচিত। নিরাপদ স্থানে সাধারণত মাটির দেওয়ালের গায়ে অনেকখানি স্থান মাটি মাখিয়ে তার ওপরে লম্বা লম্বা মাটির নল প্রস্তুত করে। তাদের নির্ম্মিত চাকগুলি বেশ বড় ও দর্শনযোগ্য হয়। মাটির নলগুলি কাগজের মত পাতলা হ'লেও ঝড় বৃষ্টি সহজে ক্ষতি করতে পারে না। এক একটি নলের ভেতর মাটির দেওয়াল তুলে খাদ্য সহযোগে ডিম প্রসব করে।

কলস-আকারে গৃহনির্ম্মাণ করে—এরকম আর এক শ্রেণীর বোলতা পাওয়া যায়। Jug-maker নামে এরা পরিচিত। এদের বাসগৃহ সাধারণত গাছের ডালে দেখতে পাওয়া যায়।

পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীর বুদ্ধিবিকাশের কোন লক্ষণ সচরাচর চোখে পড়ে না। তাদের যা স্বভাব-জাত কৌশল তাই তাদের জ্ঞানভাণ্ডারের সঞ্চিত ধন। নব নব জ্ঞান উন্মেষের প্রাচুর্য্য না থাকলেও আমরা আজ ভেবে আশ্চর্য্য হই, আদিম যুগে মানব যখন লতাপাতার আচ্ছাদনে বাস করত সেই সময় এই নগণ্য পতঙ্গ কেমন নিপুণতার সঙ্গে তার বাসগৃহ নির্ম্মাণ ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করত।

শ্রী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

G. A. ROOM

২

তুমিই সুষমা, তুমি লাবণ্য, পরিপূর্ণতা তুমিই আনো।
তুমিই মোহিনী অমৃতদাত্রী 'রসঃ বৈ সঃ' এ মন্ত্র জানো।
খনির মাঝারে তুমি মণিরূপা, দুর্লভ কর ত্যক্ত ভূমি,
মৃগের নাভিতে তুমি কস্তুরী, শুক্তির বুকে মুক্তা তুমি।
মরুতে রেখেছ মরীচিকা তুমি, মেরুতে তুমিই অরোরা বুঝি
ছেনী ও তুলিতে ঝরণা রূপের, কালীর দাগেতে কালের পুঁজি।
পূর্ণচন্দ্রে তুমি কৌমুদী, সুরপুরে তুমি সুরেশ্বরী,—
তুমিই ঋদ্ধি, তুমিই সিদ্ধি, তোমারেই আমি প্রণাম করি।

কত কাচ তুমি কাঞ্চনে মোড়ো, বিশ্বিরে কর শ্রীমণ্ডিত,
তোমারি কৃপায় নির্গুণ গুণী, পণ্ডিত হয় অপণ্ডিতও।
ইঙ্গিতে তব গর্ব্বে খর্ব্ব নূপুর পরিয়া পঙ্গু পায়ে
দানিশবন্দী মিনার উপরে তাণ্ডব নাচ নাচিতে চাহে।
লোভে বত্রিশ সিংহাসনের কত অভাজন উঠিছে ঘামি'
কত শিখণ্ডী গাণ্ডীব ধরি টঙ্কার দিতে অগ্রগামী।
হাউই চাহিছে ধূমকেতু হতে, কাণ্ড দেখিয়া বসিয়া ভাবি'
বিক্রমহীন বিক্রম করে নব-রত্নের বরণ দাবী।

৩

তুমিই অণিমা, তুমিই গরিমা, কল্পনা মহামনার সাথী,
ভুবনেশ্বরী গলায় পরেছ পদ্মবীজের মালিকা গাথি।
মরালে গমন, শিখীরে নৃত্য, বিদ্যুতে দিলে অবাধ গতি,
তুমি যেথা নাই সে দেশ সে ভূমি অভিশপ্ত ও অভাগা অতি।
শ্রীহর্ষের আর হর্ষ থাকে না, বিশালা যে হয় শূন্য পুরী
কমলে কামিনী হারা কালিদহে কাঁদে পথ চায় কমল কুঁড়ি।
স্বদেশে বিদেশে ঘরে ও বাহিরে যেথা যাই তুমি সঙ্গে থেকো
ভক্তে তোমার করুণা করিয়া শ্রীহীন করো না, মিনতি রেখো।

নারিকেলের কথা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

পূজার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, অমনি পুরাতন কত কথা মনে পড়ে। বালকাবস্থায় আনন্দের কত উৎস ছিল, কত ধারায় তাহা বহিয়া চলিত, কত সাধারণ বস্তুকেও তাহার আনন্দস্পর্শ দিয়া পূত করিয়া লইত, তাহা আজ ভাবিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। বয়সের বিচারে আজ যাহা সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা হইতেও নানা আনন্দলাভ করা যাইত। তখন দুরুহ দিক দেখিবার, কার্যকারণতত্ত্ব সমস্ত বুঝিবার বয়স হয় নাই, সময়ও ছিল না, যাহাতে মিলনানন্দ মিলিয়া আছে তাহার মধ্যে যাহাতে নিজের আনন্দলাভ হয় তাহা লইয়াই তখন ব্যস্ত ; সুতরাং এখন পুরাতন দিনের কথা মনে পড়ে বটে কিন্তু তাহার সহিত কোনওরূপ গ্লানি জড়িত নাই।

নারিকেল উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের নানা দিক দিয়া ক্রিয়াকলাপ ফুটিয়া উঠিত। দিনের গতির সহিত নারিকেলের সম্পর্ক ঠ ছিলই, তাহা ছাড়া পূজা আসিয়া পড়িলে তাহাকে নানারূপে দেখিতে পাইতাম। বোধনের সময় বিল্বতরুমূলে ঘটা দিয়া ঘিরিয়া ঘটস্থাপনা করা হইত, সেই সময় নবপত্র ডাব ঘটার বেড়ায় সুরক্ষিত থাকিত ; ষষ্ঠদিনের নিবেদনার্ঘ্য আর অবশ্যকের ফুল মিলিয়া, সেই ডাবটী আমাদের উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা পাইত, আবার জলকলস, সঙ্গীব ডাব আর কদলীবৃক্ষ মঙ্গলসূচনা করিয়া পূজাবাড়ীর সম্মুখে স্থাপিত হইত। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের প্রতিমার নির্মাণ হইত, পঞ্চপল্লব, পুষ্পমালা, তরুকারিবিলিত সঙ্গীব ডাব লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

ডাবের ঢাবে লইয়া বিপদে পড়া যাইত। তত্ত্ব ছাড়িত না, ঐ ডাব পাইলে তত্ত্ব অবশ্যই হইবে। আবার করা যাইত কলাপাতা লইয়া। গাছ কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য পাড়ার আত্মনির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবক জুটিয়া যাইত। তাহার ভিতর হইতে পাতা সংগ্রহ করিয়া বাঁশী তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা অতিশয় প্রবল। প্রতিযোগিতা লাগিয়া যাইত, কে কর্মকর্তাদের দৃষ্টি এড়াইয়া এই কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিবে। অজনা কজনার মধ্যে প্রায়ই রজ্জু যুক্ত কোনও পাতী আসিয়া বিষম তাড়না ও প্রহারের মধ্যেও পাছের পাতা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিত। আশঙ্কা প্রায়ই লোকের কাছে পরাজয় স্বীকার করিত এবং কোনও উৎসাহী বা সাহসী বালক পূজা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ডাবের সদ্ব্যবহার করিয়া ফেলিত।

পূজার বাড়ীতে নারিকেলের ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। নারিকেলের নাড়ু, রসরা, চিনিরপুলি, মনোহরা প্রভৃতি পূজার উপকরণ হইতে কাঙ্গালী বিদায়, এমন কি, লক্ষপতি ধনীর পাতে পড়িত ; পূজার মিষ্টান্নের মধ্যে প্রায়ই অন্য কোনও বস্তুর স্থান থাকিত না।

নারিকেল নাড়ু লইয়া সময় সময় মহাহাঙ্গামা ভোগ করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ পূজা বাড়ীতে উহা সকল সময় সংগ্রহ করা কঠিন হইত। যাহা আমাদের মত লোকের জন্য, অর্থাৎ নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যাহারা সকল সময় পূজা বাড়ীর মাঠ সরগরম রাখে বা রসাপ্লুত হইয়া আসিয়া কিছু ভোজের জন্য বিরক্ত করে, তাহাদের স্পেশাল নাড়ু জুটিত। সেই নাড়ু দুপুরে পাতে পড়িলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে টিকিয়া যাইত। সত্য সত্যই এই নাড়ু লইয়া আমাদের দাঁতের শক্তি পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। বিদ্রূপচ্ছলে একবার এক বন্ধুকে ছুঁড়িয়া মারা হইয়াছিল, তাহার কপালে লাগিয়া রক্তপাত হইবার উপক্রম হয়। স্বাদের কথা না বলিলেও চলে। ঠিক কটু কষায় এবং সময় সময় অম্ল রসও পাওয়া যাইত, আজ বিচার করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তখন তাহা পাইয়াই কত আনন্দ হইয়াছে ; প্রত্যেকের ভাগে একএকটী পড়িলে তাহার আনন্দ রাখিবার স্থান ছিল না। রসরা প্রায়ই ভাগ্যবানের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত, আমরা দেখিয়াছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন নারিকেল তেলের স্বাদ পাওয়া যাইত। কারণ পূজার হাঙ্গামা চুকিবার পূর্ব্বে কাজ সারিয়া রাখিবার আশায় কর্ত্রীরা রসরাগুলি আগে তৈয়ারী করিয়া রাখেন। তৈয়ারি করিবার "পাক" যথারীতি না হইলে, নারিকেল তৈলের গন্ধ ভাসিয়া ওঠে।

এই গন্ধযুক্ত রসরা পাওয়ার অনেক আনন্দ ছিল, কারণ "শেষ পাতের" উহাই সন্দেশ। এক বার দেখিয়াছি জনৈক ব্রাহ্মণ ভোজনে বসিয়াছেন। সমস্ত ব্যঞ্জনাদি পূর্ণমাত্রা সেবনের পর যখন রসরা পরিবেশন হইতেছিল তখন পরিবেষ্টা দুইটা করিয়া পাতে দিবার পর আর দিবে কি-না বারে বারে প্রশ্ন করিতেছিল। ভোক্তা উত্তর দিবার কষ্ট গ্রহণ না করিয়া উচ্ছিষ্ট দুইটা রসরা পরিবেষ্টার হাঁড়ির মধ্যে তুলিয়া দিলেন। সকলেই গোলমাল করিয়া উঠিলেন, গৃহকর্ত্তা তখন সেই পাত্র সমেত রসরা তাঁহার সম্মুখে বসাইয়া দিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ নির্ব্বিঘ্নে প্রায় তিন চার সের পরিমাণ গন্ধযুক্ত রসরা সেবন করিয়া আসনত্যাগ করিলেন। এরূপ "খাইয়ে" তখন প্রায়ই দেখিতাম ; আর বয়োবৃদ্ধের নিকট শুনিতাম, তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই সকল ভোজনবিলাসী শিশু-মাত্র।

এই রসরা আর নাড়ু পূজার নৈবেদ্যের প্রধান অঙ্গ। সকল নৈবেদ্য সন্দেশযুক্ত হইলে বাহুল্য ঘটে। তাহা ছাড়া নারিকেলজাত মিষ্টান্ন শুচি বা "শুদ্ধ", সে কারণে এই নাড়ু রসরার প্রচলন। পুরোহিত ঠাকুর এই নাড়ুর কি ব্যবস্থা করেন জানিবার আগ্রহ হইত। নিশ্চয়ই দান করিয়া নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহা না হইলে পূজার শেষে ঐ সকল বস্তু যে অগাধ হইত, তাহা অনুমান করিতে পারি।

নারিকেল ছাড়া পূজাবাড়ীর অত্যাবশ্যকীয় বস্তু হইলেও দরিদ্র হিন্দু গৃহস্থের পরম বন্ধু। বিজয়ার প্রণাম আলিঙ্গন প্রভৃতি ব্যাপারে মিষ্টমুখ করিবার রীতি রাজরাজার আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জানি না,

বিজয়ার আনন্দে বিহ্বল বালকেরা কি খাইয়া সীতাদেবীর নিকট মিষ্টমুখ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহা যে ছাপা বা রসকরা নয়, তাহা আমার স্থির বিশ্বাস। সেই দিনই যদি ঐ দরের যুদ্ধের পর ছাপা রসকরা পাইতে হইত, তাহা হইলে তাহার পর বৎসর এই বাৎসরিক উৎসব আর পুনরভিনয় করিত না, এজন্যের গৃহস্থ রক্ষা পাইত। পূজার ছাপা অপরিষ্কৃত চিনির রূপান্তর, তাহাতে নারিকেলের ছিটাফোঁটা থাকে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন গৃহে বিজয়া উপলক্ষ্যে নানারকম মিষ্টান্নের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু দরিদ্রের গৃহের এই ছাপা সম্বল। সকলের আবার ইহার এক এক্সপানা পূর্ণ দিবার শক্তি থাকে না।

পূজাবাড়ীর চাকী আসিতে আসিতে নারিকেল পাতার প্রয়োজন হইয়া পড়িত। কারিগরেরা কত শীঘ্র উহা হইতে চাটাই প্রস্তুত করিত, আমরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতাম। তাহার অনুকরণ করিয়া পাটী বুনিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি। অনভিজ্ঞ ও অপটু হাতে তাহা সমাধা করা সম্ভব হইত না ; অর্দ্ধসমাপ্ত ছাড়িয়া দিয়া অন্য কাজে যাইতে পাইলে আনন্দ পাইতাম।

নারিকেলের পাতা চাঁচিয়া কাঠি বাহির করা আমাদের এক কাজ ছিল। বাণ্ডিলের মধ্যে কতগুলি করিয়া পাতা লইয়া পাড়া হইতে পাড়ান্তরে যাইবার সময় যাত্রাদলের বীরের পৃষ্ঠে তূণে ভরা তীরের সহিত বগলের পাতার গুচ্ছকে তুলনা করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। কাঠি সংগ্রহ হইলে বড় চুমুরের খোল পড়িত ; তীরন্দেবের শরসজ্জার মত তাহাকে ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া তাহা দ্বারা রথ এবং অন্যান্য নানাপ্রকারের যান তৈয়ারী করা হইত। ইহার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা ছিল।

আমরা তখন নারিকেল পাতার ডাঁটা বা বেগলো হইতে খড়্গ, চেঁকি, তলোয়ার, হাঁড়িকাঠ প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার অবসর পাইয়াছি। বড়দের অনুকরণে যাত্রা করিয়া যুদ্ধ বাধিলে ঐ তলোয়ার যে আত্মরক্ষা, মানরক্ষা এবং মুখরক্ষা করিয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। এ সকলে কত আনন্দ ছিল, আজ তাহা মনে করাও কঠিন।

ডাব, ডাবের শাঁস, মুনা, মুনার হুধ, শাঁস—সকল জিনিষের প্রতি লক্ষ্য ছিল। সঙ্গীদের কিন্তু [illegible] ডাব চুরি করিয়া খাইলে দোষ হয় না। ধরা পড়িলে খুব বেশী মারা হইলে মালিকের ধমক পর্য্যন্তই হওয়া। ডাব চোরের মধ্যে নাকি এমন পাকা ব্যবস্থা আছে যে, ধরা পড়িয়া কখনি খাইলে আবার চুরি করিতে হয় এবং গৃহস্থকে জব্দ করিতে হয়। মনে মনে ইহা মানি নাই, তথাপি ডাব চুরির দয়াদচা করিয়াছি। সঙ্গীদের নিকট গল্প শুনিতাম, এক ডাব চোর গাছতলায় ধরা পড়িয়া বলিল, সে অপরাধ করে নাই। তখন এরূপ কথোপকথন হইল।

মালিক : তবে এখানে কেন এলি ?

চোর : ঘুমতে ঘুমতে।

মা : গাছে উঠলি কেন রে ?

চো : পথ ভুলে।

মা : ডাব পাড়লি কেন ?

চো : ঐটাই ত আশ্চর্য্যি। দিন, মশাই, দুটো ডাব নিয়ে ছেড়ে দিন।

এই নাকি খুব চতুর বিচার। খুব "জ্ঞান ছেলেকে" আমি ডাব চুরি করিতে দেখিয়াছি। অন্য উপায় না পাকাতে লোহার শিকের ছাতি ঠুকিয়া "মুখ করিয়া" ডাব খাইতেও দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য, ইহার অংশ কপালে মিলিয়াছে—তবে তিরস্কারের মত।

ডাবের শাঁসের লোভ ত্যাগ করা বড় কঠিন। বড়রা জল খাইবে, শাঁসে ছোটদের দাবী ; ইহাই তাহাদের ধারণা। এক পিতা রোজই ডাব খাইয়া ভিতরে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করিয়া শাঁস উঠাইয়া পরে চুমুক দিয়া শাঁস খাইয়া লইতেন। তাঁহার একটী ছোট কন্যার তাহাতে মুখ ভোটানো ডাব কেবল বদন করিবার ভার ছিল। সে আর না পারিয়া বাড়ীর ভৃত্যকে একদিন বলিল, নারিকেলের "মুখ" যেন "শিলির মত" হয়। কারণটা জানিতে চাহিয়া ভৃত্য শুনিল যে, "তা হ'লে বাবা আঙুল দিয়ে শাঁস নেতে পারবেন না। তিনি চলে গেলে ডাবটা কেটে আমরা খাবো। এই শাঁসের লোভ পাঠক।

শহরের ছেলেরা জানে না নারিকেলমালার কিরূপ খড়ম হইতে পারে। দুটী মালার মধ্যে দড়ি দিয়া এ দড়ি হাতে করিয়া ধরা হয়। তাহার পর পায়ের বুড়া আঙুলের ফাঁকে ঐ দড়ি পরিয়া আমরা প্রতিযোগিতায় দৌড় দিয়াছি। নূতন পরিষ্কার পর পায়ের তলায় লাগুন দেখা হইত, কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিবার সময় কোথায় ; দৌড়ই লাগিয়া কত পড়িয়াছি, কিন্তু কে তাহার হিসাব রাখে !

পূজার বাড়ীতে নারিকেলের কাঠি বা কাঁটার ব্যবহার যে কত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে কি ? পূজার বাড়ী অর্থাৎ মায়ের আগমনে তাহা শুচি হইয়াছে, তাহাকে অপরিষ্কার রাখা যায় না ; লোকের হাতে কাঁটা চলিতেছে। এই কাঁটার যে কত পরিচয় তা এখনও জানা যায় নাই। লোক মুখে শুনিয়াছি, সাহিত্যে পড়িয়াছি, এই সম্মার্জ্জনী নাকি অনেক দুর্ভাগ্যকে শাসনে রাখিয়াছে। সমর্থ হস্তে পড়িলে ইহার প্রতাপ দুর্ব্বার। পরিষ্কার চাঁচা কাঠি খেলার ছলে পরস্পরকে মারিয়া দেখিয়াছি, পিঠ সরু করিয়া কাটিয়া যায় ; সুতরাং মুখে যে খুব তীক্ষ্ণ তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু আজ এই সম্মার্জ্জনীর দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। তুলসীর ঘাটে শিবু খাহাকে বাজে একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে সেই ডাকিনী ওরফে নেড়া একটা খেজুরের ডাল দিয়া ব্রহ্ম কাঁট দিত। আজ-কাল "নেড়ার রাজ্য" শহর ও শহরতলীতে আর নারিকেল কাঠির কদর নাই। সেখানে খেজুরপাতার সংখের কাঁটা হইয়াছে, বুরুষ আসিয়াছে, আর অকর্ম্মণ্য কতগুলা ঝরঝরে গাছের ঝাঁটা দিয়া কাঁটার কাজ চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। তুলসীর ঘাটে নারিকেল গাছ ছিল কি-না পরশুরাম জানান নাই। কিন্তু থাক্ আর নাই থাক্, নেড়া বুদ্ধিমতী, তাই পুরু হইতেই খেজুরের ডাল সম্বল করিয়া কাঁটা দেওয়ার ফাঁকে শিবুর তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়াছিল। তখনকার মত হাওয়ায় সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দেখিতেছি এখন সেই নেড়ার পদ্ধতি ঘরে ঘরে বিরাজমান।

নারিকেল খোলের হুঁকা লইয়া আমার এক মহা সমস্যা ছিল। কতগুলা দেখিতাম একটু যত্ন করিয়া বসাইয়া দিলে, তাহারা বেশ সোজা হইয়া থাকিত, অথচ কতগুলাকে ফরের কোণে লইয়া গিয়া অনেক কষ্টে ঠেসান দিয়া রাখিতে হইত। বয়স্কদের ব্যাপার, যাহারা ইচ্ছামত বসিতে বা দাঁড়াইতে পারে, তাহাদের অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল; কিন্তু অপরে তাহা স্বীকার করিত না। শ্মশানকালীর জিব বড়, না, রক্ষাকালীর জিব বড়—এই প্রশ্ন এতদিন যেমন বালক ইন্দ্রনাথ আর শ্রীকান্তকে বিব্রত করিয়াছিল, ঐ দুই জাতীয় হুঁকার মধ্যে কোন্‌টী ভাল, তাহা আমাকে সর্ব্বদাই সন্দেহের মধ্যে রাখিত। নারিকেলের হুঁকার নানারূপ আভরণ পরাইয়া খোলের মান বাড়িয়াছে; মালিকের মর্য্যাদাবৃদ্ধি হইয়াছে। যাহারা নিজের দেহে বা বাড়ীর ছেলেমেয়েদের তৈল মাখাইবার সময় পান না, তাহারা হুঁকায় তেল মাখাইতে যে সময় ও শ্রম ব্যয় করিতেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম।

কয়লাক্ষেত্রে যাঁহারা চুরি করিয়া তামাকু সেবন করিতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের নারিকেল ছোবড়ার সদ্ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। এক ঘরের মধ্যে খেলা হইতেছিল, তামাকু সেবনের জন্য যে সকল মালমশলার প্রয়োজন অর্থাৎ ভাঙ্গা কলিকা, তামাকু এবং দিয়াশলাই—সবই সঞ্চিত ছিল, কিন্তু তামাক ধরাইবার কয়লা ইত্যাদি ছিল না।

এক ছিলিম ধরাইবার যখন সময় উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে, তখনও সকলে তাস খেলায় মত্ত, কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, উহাদের মধ্যে একজন পাশোয়ের উপর দিয়া বসিয়া বসিয়া বিড়ালের মত মাটী অথবা বিকল্পে পাশোয় আঁচড়াইতেছে। বিড়ালে করিলে তাহার সদুদ্দেশ্য তখনই বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু মানুষে কি বিড়ালের প্রাপ্ত হইল? অতঃ আচরণে ত পার্থক্য দেখিতেছি না, শেষ পর্য্যন্ত যে কি দাঁড়াইবে তাহা আমার সমস্যা ঠেকিল। আরও ভাবিলাম, শাস্ত্রীয় বচন "নরন যদি না হইলে বিড়ালে আঁচড়ায় না": মানুষে বিড়ালে ঐখানে প্রভেদ বুঝিলাম। মানুষ বলিয়াই পাশোয়ের মত শক্ত বস্তু আঁচড়াইতেছে! কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য যে কি, তখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। চক্ষে না দেখিলে আমি এই কঠোর পরিশ্রমের অর্থ বুঝিতে পারিতাম না। অবশেষে দেখিলাম, কতগুলি নারিকেলের শোঁয়া উঠাইয়া "সুতী" পাকাইতেছে; তখন বুঝিলাম শীঘ্রই কলিকা ধরানো হইবে। তাহাদের কথোপকথনে বুঝিলাম, পাশোষখানা পুরাতন হইলেও ছেঁড়া ছিল না, কিন্তু কয়দিন তামাকু সেবনের উৎসাহে পাশোষখানা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে; এখন খালি তলার দড়ির বোনা অংশটা বাকী। আশঙ্কা হইল, পূজার বাকী দিনটাতেই তাহার নিকটও ভোগ দিতে হইবে, বা তাহার এক-চতুর্থাংশ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। নারিকেল বড়ি যে ধূমপায়ীদের পরম বন্ধু, তাহা এখনও শহরে প্রতি বিড়ি-সিগারেটের দোকানে দেখা যায়।

সন্দেহমোচন হইল কেন ঐ ঘরেই খেলা বসে। Necessity is the mother of invention—এ কথার এমন জাজ্বল্য প্রমাণ আর দেখা যায় না। এখন ঐ পাশোষ বসাইয়া না দিলে যে কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা লইয়া গভীর তর্ক বিতর্ক আলোচনা চলিতে লাগিল, মীমাংসা যে কি হইল তাহা জানা নাই।

শুনিতে পাই নারিকেল গাছ না কি ভারতের কোন্ সমুদ্র উপকূলে প্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল এবং উহা হইতে ভরা নারিকেল সমুদ্রজলে ভাসিতে ভাসিতে নানা দেশে গিয়া নূতন আবাস দেখিয়া লইয়াছে। কিন্তু কি করিয়া ভারতখণ্ডেই প্রথম জন্মলাভ করিল, তাহার উত্তর কেহ দিলেন না। শাস্ত্রীয় লোকেরা ইহার সদুত্তর দেন, বৈজ্ঞানিক লোকেরা আপত্তি করেন। শোনা যায়, বিশ্বামিত্র ঋষি দেবতাদের সহিত টেক্কাটেক্কি করিয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে চান এবং মানুষ তৈয়ারী করিবার প্রচেষ্টা তাঁহার প্রায় ফলবতী হইয়াছিল। মানুষের মাথা তৈয়ারী হইয়াছে, দেবতাদের আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধিলাভ করিতেছে, তাঁহাদের চরেরা প্রতিমুহূর্ত্তে আসিয়া জানাইতেছে কতদূর অগ্রসর হইল, এবং দেবতাদের বোধ হয় সভায় সে বিষয়ে ঘন ঘন আলোচনা হইতেছে। যখন দেখা গেল, বিশ্বামিত্রকে রোধ করিবার আর শক্তি নাই এবং দেবতাদের এ বিভ্রাটের পরিচয় বহুদূর আছে, তখন তাঁহারা দাবী মানিয়া লইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপনা হইল—"Their bugle sang truce" বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার অসম্মান হইতে পারে না, তাহাতে তিনি সেই বিবর্ত্তমূলক নরমুণ্ডকে জগতের এক অতি প্রয়োজনীয় ফলে পরিণত করিয়া গেলেন। সে সময়ে বিশ্বামিত্র আর দেবতাদের লড়াইয়ের গল্প খুব মুখরোচক বা শ্রুতিসুখকর ছিল; কারণ দেবতাদের মধ্যে অধিকাংশই যে শক্তিহীন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট গণনায় তাঁহারা তেত্রিশ কোটী; অবশ্য এ আদমসুমারি যখন লওয়া হইয়াছিল, তাহার পর কত দশ-বর্ষ কাটিয়া গিয়াছে এবং এখন কত শত কোটীতে তাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন তাহার হিসাব আর নাই;—কিন্তু এত দেবতা যে একা বিশ্বামিত্র ঋষির নিকট হারিতেছেন, ইহাতে খুব আনন্দ পাইতাম। কয়েকটী দেবদেবী ছাড়া যে সকলেই শক্তিহীন বা হীনা তাহা বুঝিতে পারিতাম; তাহা না হইলে আমাদের বিদ্যালয়ের এত কম ছুটি হইবে কেন? যে কয়জন বলশালী, এবং আমাদের সেক্রেটারী মহাশয় বা হেডমাষ্টার মহাশয়ের ঘাড় ভাঙিবার শক্তি রাখেন, তাহাতেই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য বিদ্যালয়ের ছুটি দেওয়া হয়। যে সকল দেবতাকে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা সহজেই উপেক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট পরাজিত হইবেন তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে। দেবতাদের এই অপমান আমাদের নিকট খুব উপভোগের বস্তু ছিল।

দেবতাদের কথায় আমার association of ideas ছুটিয়া উঠিল; মনে পড়া উচিত ছিল সাঁচীর কথার সঙ্গে, "মেতা"র সঙ্গে। তাহাই হইয়াছে তাকিনী মেতার সঙ্গে কোনও দেবীর কথা মনে পড়ে নাই; তাহাতে দেবী ক্ষুণ্ণিতা হইতে পারিতেন; এখন আর সে ভয় নাই। যে দেবীর কথা মনে পড়িল তিনি সম্মার্জ্জনীদম্মিতা, তাঁহাকে সকলেই নিশ্চয়ই এতক্ষণে চিনিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাকে ভয় করে না, এমন জীব আমার জানা নাই। তিনি "সুরানাং সিন্ধুবিস্তাধেরাণাং মুনিবরসুজনরানাং"

সকলেরই চক্ষে মহাত্রাসের বস্তু। উহাদের দর্পে ধরা সন্ত্রাসিতা। দেবী অস্ত্র বাহন ছাড়িয়া দর্পহারিণী, হস্তে কলস আর সম্মার্জ্জনী। পূজাবাড়ীতে কলস দেখিয়াছি, সম্মার্জ্জনী দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন জীবের অধিকারে। এখানে একাধারে সব। অশরীরীরূপে কোথাও আসিয়া আবির্ভূতা হইলে অস্ত্র শীতল হইয়া যায়। "মাতা"র রূপ যিনি ধ্যান করিয়া পাইয়াছিলেন, তিনি কত বড় কবি তাহা জানি না, কিন্তু তিনি খুব বড় (স্যানিটারী) অফিসার) : গরুড়, উচ্চৈঃশ্রবা, ঘুষিক, দণ্ড, এমন কি, ঐরাবত প্রভৃতি বাহন দ্রুত চলে, যদি "মাতার অনুগ্রহ" হইতে রক্ষা পাইতে হয়, সর্ব্বতগতি থামিতে হইবে। ধীরে ধীরে মায়ের এক অস্ত্র সম্মার্জ্জনী চালনা করিয়া ঝাঁট দিতে হইবে এবং অপর হস্তের কলসের জল দ্বারা সব ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। মায়ের এই শিক্ষা যাহাদের উপর কাজ করে তাহাদের মায়ের ভূতের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা আছে। মানবপৃষ্ঠে সম্মার্জ্জনী পড়িলে আরও নানারূপ রোগ ছুটিয়া যাইবার পর প্রায়ই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দেবীর শিক্ষা বিফল না হইলে অমঙ্গলের আশঙ্কা দূর হয়।

যে সময়ের কথা বিবৃত করিতেছি, তাহার মাত্র কয় বৎসর পূর্ব্বে নারিকেল আমাদের এক অত্যন্তের বস্তু ছিল। সকল পড়াই আপত্তিকর, কারণ অনেক কবিতার মধ্যে একটী মাত্র কবিতার সার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা আর কিছুই নয়—"লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে"—এত কষ্ট করিয়া, লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া "দুঃখে মরিবার" উপায় উদ্ভাবন করিবার প্রবৃত্তি কখনও ছিল না, সুতরাং যখন কবি মনোমোহন বসুর পদ্য আমাকে পড়িতে বাধ্য করা হইল তখন সুখী হইতে পারি নাই ; এখন দেখি, সেই কয়টী সহজ পংক্তিতে এত মূল্যবান্ কথা আছে যাহা দিয়া কয়েক কাগজ খরচ করিলেও সমস্ত প্রকাশ করা সম্ভব নহে :—

চমৎকার ! বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশল
দীর্ঘতরু-শিরে ফল, তার মাঝে জল !
সে জল সম্পূর্ণ ঢাকা দেখা নাহি যায়
কৃষ্ণ বর্ণ খোসার বিচিত্র কৌটায়।
পাছে সুধা-নীর নষ্ট হয় অকারণ ;
তাই দিয়াছেন বিধি পুরু আবরণ।
আহা মরি স্বভাবের সেই গুপ্ত বারি ;
বিধিমতে মানবের কত হিতকারী।
রবি-করে হবে ভরে উত্তপ্ত শরীর ;
তপ্ত বায়ু বহে, তপ্ত জলাশয়ে নীর।
পথশ্রমে হবে ক্লান্ত, ভ্রান্ত পান্থজন ;
পিপাসায় শুষ্ক তালু, আকুল জীবন ;
সে সময় পায় যদি নেয়াপাতি ডাব ;
দাবানলে মুক্তিলাভ হয় যেন ভাব !
পানে যেন প্রাণে হয় সুধার সঞ্চার !
হেন সুশীতল জল কোথা পাব আর !

ইহা কেবল নেয়াপাতি ডাবের জলের জন্যই লিখিত। মানুষের বুদ্ধিতে ডাব, দুরমো, খুনে, কোবড়া, খোলা, শাঁস, তেল প্রভৃতি সকল বস্তুই কাজে লাগিয়াছে—অবশেষে বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছে নারিকেল ছোবড়ার কয়লা বিষাক্ত গ্যাস হইতে রক্ষা পাইবার মুখোস তৈয়ারী করিতে হইলে একান্ত প্রয়োজন।

—শিল্প ও সৃষ্টি—

শ্রীমতী কমলারাণী মিত্র

দুঃখ তোমার ললাটে আঁকিব
মহিমার নব জয়-টিকা,
হৃদয়-সুষমা নিঙাড়ি লিখিব
তব সৌরব-নাম-লিখা।
আনন্দঘন প্রীতি রসধারে
সিঞ্চিব তোমা নিতি বারে বারে,
চিত্ত-প্রদীপে শুভ সমারোহে
জ্বালিব তোমার দীপশিখা।

তোমার ভ্রূকুটি ভ্রূক-কটাক্ষে
যে রোষ-বহ্নি ওঠে জ্বলি',
যে-নিঠুর-পায়ে আশা ভরসার
শেষ-আশ্বাস যাও দলি'
শক্তি মাধুরী-বৈভবে,
মহিমার গুরু-গৌরবে
উজ্জ্বলতম সার্থকরূপে
তব রূপ-জ্যোতি র'বে জ্বলি'॥

ইউরোপের চিঠি

অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, পিএচ-ডি

প্রবন্ধ

আমি প্যারিসে পৌঁচেছি। জেনেভায় আমার দিনগুলি কাটছিল ভাল। রেলফ্‌স্ পরিবারে বাস ক'রে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের আনন্দ বেশ উপভোগ করেছিলাম। দু-তিনটী বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলাম বলেই জেনেভায় বহু বন্ধু হয়েছিল। দেশাক পরিবারে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই মিলিত হয়েছিলাম। সমস্ত পরিবারটীর ভারতবর্ষের ওপর কি শ্রদ্ধা! কেন না, তাঁদের প্রিয় স্বরবেদ (এনায়েত খাঁ) ভারতীয়। এ পরিবারে একটী শ্রদ্ধার ভাব আছে ভারতীয় আদর্শের ওপর। এ শ্রদ্ধা এতদূর যে এনায়েত খাঁর মৃত্যুর পর এরা তাঁর স্মৃতিকে রক্ষা করছেন, যেমন গুরু বা উপদেশকের স্মৃতিকে আমরা রক্ষা করি। দেশাক পরিবার শান্তির ও প্রীতির আবহাওয়ায় পূর্ণ। সমস্ত পরিবারেরই একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে। এরূপ প্রীতিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও এঁদের অন্তর-জীবনের গভীরতা দেখলেই মনে হয় এটা এনায়েতেরই দান।

প্যারিসে আসা মাত্রই সুফী সম্প্রদায়ের সম্পাদিকা আমাকে একদিন তাঁর বাড়ীতে আহ্বান করলেন—দেশাক তাঁকে পত্র দিয়েছিলেন। এঁর নাম মিস্ Good Enough. প্যারিস আসবার দুদিন পরে তিনি তাঁর পরিচারিকাকে পাঠিয়ে আমার সব সংবাদ নিলেন ও আহ্বান করলেন একদিন দশটা-এগারটার ভেতর যেতে। আমি স্বীকৃতি ও ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র লিখলাম।

মিস্ Good Enough থাকেন প্যারিস থেকে অন্তত সাত মাইল দূরে। আমি ঠিক সময়েই ট্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। পরিচারিকাটী এসে আমাকে নিয়ে গেল; কিন্তু মিস্ Good Enough-এর সম্বন্ধে কিছুই বললে না। বাড়ীতে যখন প্রবেশ করলাম, তখন কাউকেই দেখতে পেলাম না। বাড়ীটী উদ্যান-সংলগ্ন। আমার খুব ভাল লাগল, একটা গভীর নীরবতা বিরাজ করছিল। তার ভেতর কেমন একটী শান্তি।

পরিচারিকাটী আমাকে একটী ঘরে নিয়ে গেল এবং দূর থেকে আমায় একটী ঘর দেখিয়ে বলল—মিস্ Good Enough ওই প্রকোষ্ঠেই আছেন। কড়া নাড়তেই দরজাটী খুলে গেল। মিস্ Good Enough তাঁর আসন থেকে উঠে করমর্দ্দন করে আমায় বসালেন। কোন কথা বললেন না। তিনি ছিলেন ধ্যানস্থ, আবার ধ্যান করতে বসলেন। আমিও নীরব হয়ে বসে রইলাম। আমিও ধীরে ধীরে ধ্যানমগ্ন হলাম। পরস্পর কোন আলাপই হলো না। আলাপের ইচ্ছাও হলো না। এমনি আবহাওয়া — মিস্ Good Enough সৃষ্টি করেছিলেন যে, নীরবতার ভেতর দিয়ে একটী গভীর প্রশান্তি ও সুখ হৃদয় স্পর্শ করছিল। যেখানে বাক্ ও চিন্তা শান্ত, সেখানেই ভাব-বিনিময় হয় গভীরভাবে। মৌনতাই পরম তপস্যা। অপরূপ চিত্তস্বাচ্ছন্দ্য আমি সেদিন অনুভব করেছিলাম।

এরূপ ভাবে আমরা বসেছিলাম প্রায় দেড় ঘণ্টা। ধ্যান অবস্থাটী ভেঙ্গে যেতেই আমি উঠে পড়লাম। মিস্ Good Enough করমর্দ্দন করলেন কিন্তু কোন কথাই বললেন না। তখন কথা বলবার কোন ইচ্ছা কারও ছিল না। অথচ পরস্পর হৃদয়ের শ্রদ্ধা বিনিময় এতটুকুও কম হয়নি—বরং আরও আন্তরিকতার সঙ্গেই হয়েছিল। আমি বের হয়ে পড়লাম, মিস্ Good Enough তখনও বসেছিলেন তাঁর ঘরে। পরিচারিকা এসে আমাকে ট্রামে পৌঁছে দিয়ে গেল। আমি যখন ফিরছিলেম, তখন আমার মনে হয়েছিল, ইউরোপে একটা বড় সুন্দর অভিজ্ঞতা হল। এরূপ অভিজ্ঞতা এদেশে আমার আর হয় নি। মিস্ Good Enough-কে আর একদিন Sorbonne-এ দেখেছিলেম। তিনি আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর ভেতর কোন অসাধারণত্ব দেখতে পাই নি।

মরমীরা (mystics) যাকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বলেন, মিস্ Good Enough-এর ভেতর তার স্পষ্ট বিকাশ দেখতে পেয়েছিলাম। এ মার্গে ইউরোপের বহু লোক

বিচরণ করেন। অন্তত এ বিষয়টীকেও তাঁরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করেন। বর্তমানে ইউরোপে চেতনার এরূপ অবস্থিতিতে অনেকেই আকৃষ্ট। যাঁরা মনে করেন ইউরোপে অধ্যাত্ম দৃষ্টির অভাব, তাঁরা ভুল করেন। বিশেষত যুদ্ধের পর ইউরোপে অধ্যাত্ম শক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে বহু লোক যত্ন করছে। এটা শুধু সাধারণ লোকের ভেতর আবদ্ধ নয়—বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিও এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। এটা খুবই স্বাভাবিক। ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়েই মানুষ ধাবিত হয় একটা অজানার দিকে, যেখানে সে আকাঙ্ক্ষা করে বিমল শান্তি ও জীবনের শুভ্র বিকাশ। জীবনের ঘোরতর দ্বন্দ্বে অদৃশ্য আলোর ছায়াপাত হয় অন্তরে, তাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

প্যারিসে এসে অধ্যাপক লেভীর সঙ্গে দেখা করলাম তাঁর বাড়ী গিয়ে। সানন্দে তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। আমাকে Sorbonne নিয়ে এসে রেক্টর ও অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। লেভী তাঁর ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউটে নিয়ে গেলেন এবং পুস্তকাগারটী দেখালেন। আমাকে Sorbonne-এ বক্তৃতা দেবার জন্যে আহ্বান করলেন। রেক্টর অধ্যাপক বার্গশঁ'-র কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এক পত্র দিলেন।

Sorbonne খুব বড় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। এখানে ভারতীয় ও এসিয়ার সব দেশের সংস্কৃতির চর্চ্চা হয়। অধ্যাপক লেভী ভারতীয় ও এসিয়ার সংস্কৃতির অধ্যাপক। অধ্যাপক লেভী প্রধানত ভারতীয় সংস্কৃতির অধ্যাপনা করেন। মানুষটী বিনয়ে ভরা, সদা হাস্যময়, এত বড় পণ্ডিত, অথচ এত সরল।*

রেক্টর-এর পত্র নিয়ে আমি অধ্যাপক বার্গশঁ'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বার্গশঁ' বড় কারও সঙ্গে দেখা করেন না, শরীর অসুস্থ। বাতব্যাধিতে কাতর। রেক্টরের পত্রখানি পাঠিয়ে দিলে উত্তর এল, বেলা তিনটের সময় তিনি আমার সঙ্গে সানন্দে দেখা করবেন। আমি তিনটের পুনরায় গেলাম। মিসেস্ বার্গশঁ' এসে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

বার্গশঁ' তখনও অসুস্থ ছিলেন—উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করতে পারলেন না। আমি তাঁর পার্শ্বে বসলাম্। তাঁকে দেখে মনে হ'ল—লোকটী অত্যন্ত শক্তি-সম্পন্ন। শান্তির চেয়ে তাঁর মুখে শক্তির পরিচয় পরিস্ফুট।

অধ্যাপকের প্রকোষ্ঠে রাশি রাশি পুস্তক। সামনে দেওয়ালে একটা ছবি,—মেরীর কোলে যীশু। অধ্যাপক সেই ছবির দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট ক'রে বললেন, "আমার দর্শনের মূল আমি ওখানে পেয়েছি। মাতা রূপ নিয়েছে পুত্রে (the mother is repeated in the son)"। গতি ও শক্তিবাদী। সৃষ্টি গতিপ্রবাহ, এর আদি-অন্ত নেই। জীবনধারার কোথাও শেষ নেই। সন্তান মাতারই পুনরাবৃত্তি। বার্গশঁ' মনে করেন, ক্রিশ্চিয়ানিটির প্রধান কথা জীবনবাদ। যদিও ইউরোপে ক্রিশ্চিয়ানিটিকে প্ল্যাটোর ছায়ারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। প্ল্যাটোর অতীন্দ্রিয়ের রাজত্বের কথা উঠ্‌লে বললেন, "এরূপ অতীন্দ্রিয়-বোধ ও অতীন্দ্রিয় রাজ্য থাকলেও, তাও জীবনের গতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত—জীবনের এক রমণীয় পরিচ্ছেদের প্রকাশ। জীবনের গতি কিন্তু তাকেও অতিক্রম ক'রে যায়।" বার্গশঁ' স্থিতিবাদকে একেবারেই তুচ্ছ জ্ঞান করেন। স্থিতিবাদ আমাদের বুদ্ধিরই সৃষ্টি, তত্ত্বে এর স্থান নেই—তত্ত্ব গতি। গতির আংশিক রূপ দেখে তাতেই লিপ্ত থাকার অভ্যাস থেকেই হয় স্থিতিবাদের উৎপত্তি।

প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক বললেন, "আমার দর্শনের ভিত্তি মিস্‌টিসিজ্‌ম্"। St. John on the Cross-নামক পুস্তক থেকে তিনি ক্রিশ্চিয়ানিটিকে বুঝতে পেরেছেন। তাকেই অবলম্বন ক'রে তাঁর দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে।

St. John ছিলেন মরমী প্রেমিক। প্রেমই তাঁর মতে তত্ত্ববোধের ও তত্ত্বাস্বাদনের প্রধান উপায়। এই প্রেমেই দেয় অনন্ত জীবনধারার ও আনন্দের আস্বাদ। প্রেম জীবন, জীবনই প্রেম। জীবনের সুষমা প্রেমে। প্রেম ও জীবন অভিন্ন।

বার্গশঁ' এই জীবন ও প্রেমের অনুভূতির ওপর তাঁর দর্শন রচনা করেছেন। প্রাণতত্ত্বের সংবেদ থেকে তার রচনা আরম্ভ হয়েছে। আমি অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলাম "মরমী (mystics)-দের ভিতর একটী বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা কালের জ্ঞানকে অতিক্রম করতে চান।

---

* লেভীর মৃত্যুর পর অধ্যাপক সুসে তাঁর স্থান অধিকার করেছেন। লেভীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারিয়েছে।

মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌-এর এই আকর্ষণ। তাঁরা কালের সংবেগ ও সংকোচ অতিক্রম ক'রে পরমতত্ত্বকে অনুভব করেন। কাল নিত্য হ'লে তা কিরূপে সম্ভব? আপনার দৃষ্টিতে এরূপ অনুভূতি অসম্ভব—কারণ জীবন-প্রবাহের শেষ নেই। শেষটা জানাই তো আপনার পক্ষে শুধু অসম্ভব নয়, অনাবশ্যকও বটে।"

অধ্যাপক বললেন, "আপনি ইউরোপীয় নরনীদের ভিতর থেকে দু-একজনের নাম করুন যাঁরা এরূপ কালের অতীত সত্তার অনুভূতিতে তৃপ্ত।"

আমি Meister Eckhart ও Ruysbroeck-এর নাম করলাম। অধ্যাপক বললেন, "হাঁ, ওঁদের চিন্তার ধারা অনুরূপ; কিন্তু যাকে ওঁরা কালের অতীত অবস্থা বলেন, সেটা একটা গতির ভিতর একটা স্থিতি (equilibrium), সেটা গতির অবস্থাবিশেষ, কিন্তু গতিহীন নয়। গতি অত্যন্ত বেশী হ'লে স্থিতি ভাবাপন্ন হয়—যেমন, ধ্যানে,—তখন ওরূপ অবস্থা দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু সেখানেও গতি আছে। প্রেমের ভিতর দিয়েও এরূপ অবস্থাবিশেষ লাভ হয় কিন্তু এরূপ অবস্থা স্থায়ী হয় না। এ জন্যেই মিস্‌টিকদের ভিতর কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্র-অপসারিণী গতি দেখতে পাওয়া যায়। ধ্যানের গতিও গতি; কর্ম্মের গতিও শক্তি। ধ্যানের পর গতির বেগ হয় অত্যন্ত বেশী। মিস্‌টিকরা যেমন ধ্যানী, তেমনি কর্ম্মীও বটে। এত শক্তি আর কারুর মধ্যে দেখতে পাইনে। এতেই মনে হয় চেতনার উচ্চস্তরে গতির অভাব হয় না। এ বিশ্বাস আমার এসেছে, বিশেষ ক'রে, ক্যাথলিকদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তাদের ভিতর কাজ করবার কি শক্তি! তাঁরা ধ্যানী বলেই এত বড় কর্ম্মী। ধ্যানে শক্তি সঞ্চয় করে।"

অধ্যাপক বার্গশঁ'-এ কথাগুলি খুব উৎসাহের ও উদ্দীপনার সঙ্গে বললেন। আমি ও মিসেস্‌ বার্গশঁ' মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম। দেখলাম, তিনি মিস্‌টিক্‌স্‌-দের অনুভূতিতে খুব বিশ্বাস করেন এবং তাঁদের ওপর খুব শ্রদ্ধান্বিত। বার্গশঁ'র মধ্যে একটা গভীর অনুভবশক্তি আছে। এই অনুভব-শক্তিই দিয়েছে তাঁর দর্শনের রূপ। তার দৃষ্টির বিশেষত্ব বিশ্বকেন্দ্রহীনতা (cosmic pointlessness)। মানুষের দৃষ্টি চিরকালই খুঁজেছে তার সত্তার কেন্দ্র। মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বকেন্দ্রে, বিশ্বাত্মিতের সঙ্গে এক হওয়া। কিন্তু বার্গশঁ'র মতে জীবন কেন্দ্রহীন—চলাই তার স্বভাব, কোন কেন্দ্র থেকেই তার উৎপত্তি নয়, কোন কেন্দ্রেই সে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। এই কেন্দ্রহীনতার বোধ যখন আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়, তখনই আমরা জীবনের স্বৈরগতিকে বুঝতে পারি। আমাদের বুদ্ধি ধর্ম্ম এই সচকল জীবন-প্রবাহকে বুঝতে না পেরেই বৈচিত্র্যকে বরণ করতে পারে না, সৃষ্টির নব নব রচনার মাধুর্য্য অনুভব করতে পারে না এবং তার অবিরাম উৎসের সঙ্গে পরিচিত হয় না। সৃজন-শক্তিতেই তিনি এত আকৃষ্ট যে, সৃষ্টির অপরূপ বৈচিত্র্যে তিনি মুগ্ধ নন্‌। শক্তির উচ্ছ্বাস বার্গশঁ'কে এত পূর্ণ করেছে যে, তাঁর দৃষ্টিতে শান্তি ও সমতা স্থান পায় নি। সৃষ্টির পিছনে আছে যে প্রাণের সমতা সে বিষয়ে তিনি অবহিত নন। শক্তির বাক্যাবস্থার ওপর তাঁর দৃষ্টি, শক্তির অব্যক্ত অবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। এরূপ অবস্থাকে তিনি স্বীকার করেন না। বিশ্ব-প্রাণের গতিছন্দে আপ্লুত যিনি, স্বভাবতই তিনি এ ছন্দ যেখানে লয় হচ্ছে, সেখানকার অনুসন্ধানে তৎপর নন।

বার্গশঁ' আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি শূন্যের উপাসনা করেন?" আমি বললাম, "হিন্দুরা আনন্দের উপাসনা করেন।' এই ব'লে তৈত্তিরীয় উপনিষদের আনন্দ শ্রুতিটীর ইংরেজী তর্জ্জমা ক'রে শুনিয়ে দিলাম। তিনি আনন্দ প্রকাশ ক'রে বললেন, "আমি পূর্ব্বে হিন্দুর উপাসনা সম্বন্ধে এরূপ শুনিনি। আমার বড় ভাল লাগল।" আমি বললাম, "সাধারণভাবে বলা হয়, বৌদ্ধেরা শূন্যের উপাসনা করেন; কিন্তু সে শূন্য সত্যি ক'রে void নয়—অতিমানস-তত্ত্ব—যা বুদ্ধিতে ধৃত হয় না। শূন্য বা পূর্ণ হিন্দু ও বৌদ্ধদের মতে পরতত্ত্বের জ্ঞাপক হতে পারে না, কারণ এ ধারণাও মানসিক ধারণা; অব্যক্ত অতিমানসতত্ত্বকে বোঝানর ভাষা নেই বলেই তাকে বলা হয় শূন্য বা পূর্ণ।" তিনি বললেন, "আমার হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। আমার বন্ধুদের কাছে শুনে একটা ধারণা হয়েছে। তা বোধ হয় খুব ঠিক নয়।" আমি বললাম, "হিন্দুরা প্রাচীনকাল থেকে বলেছেন, তত্ত্ব-সংবেদ বুদ্ধির দ্বারা হয় না; বোধি (intuition) দিতে পারে পরিচয়।" অধ্যাপক সন্তুষ্ট হলেন, বললেন, "জানেন তো, আমারও সেই ধারণা।" আমি উত্তর

করলাম, "দার্শনিকেরা এত সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করেন যে, এখানেও তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। সকলেই অনুভূতির কথা একরকমই বললেন না। মনে হয়, মানুষের সত্তার নানা স্তর থেকে হয় অনুভূতির বিকাশ।" বার্গশঁ বললেন, "মানুষ বিশেষ ক'রে বুদ্ধিধর্মী। বুদ্ধির স্বভাবই বিশ্লেষণ ক'রে দেখা। অনুভূতির স্তর থেকে নেমেই যখন মানুষ তাকে বুঝতে চায়, তখনই তার নানারূপ দেখতে পায়। ভাষাও বুদ্ধির অনুগমন করে—তাই অনুভূতিকে বোঝা এত কঠিন। অনুভূতির স্তরে দাঁড়িয়ে তাকে বুদ্ধির ভাষায় ত বোঝা যায় না বা-প্রকাশ করা যায় না।" আমি বললাম, "মানুষের ভিতর বুদ্ধির স্থান এত বড় হয়ে আছে যে, আপনার জীবনবাদের কথা কইতে গিয়েও তাকেই করতে হয়েছে আশ্রয়। যত দিন না অভিব্যক্তি-ধারায় মানুষের অনুভব তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট হবে, তত দিন মতভেদের অবকাশ থাকবে। নরনারীদের ভিতরও যে ভেদের কথা শুনতে পাওয়া যায়, তার কারণও সত্তার সকল পরিচ্ছেদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়ার সম্ভাবনা হয় নি।" অধ্যাপক সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আর বললেন, "মানুষের অনুভব-শক্তি বাড়িয়ে চলতে হবে। যত তার বুদ্ধি হবে ততই মানুষ জীবনের রূপকে বুঝতে পারবে। মানুষ বুদ্ধির জগতে এত লিপ্ত যে কদাচিৎ কোন শুভমুহূর্তে যদি এই বুদ্ধির অধিকার থেকে সে মুক্ত হয়, তখনই অনুভূতির স্পর্শ পেয়ে সেইদিকেই ধাবিত হবে। অধ্যাপক মনে করেন, এরূপ অনুভব-শক্তিকে বৃদ্ধি করবার জন্য আবশ্যক,—জীবনের স্বত স্ফূর্তিকে অলিপ্ত হয়ে আস্বাদন করা। এই অভ্যাসের ফলে জীবনের স্বৈরগতির সঙ্গে একবার পরিচয় হ'লে তা আর কখনও নষ্ট হয় না। আমাদের বুদ্ধির নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তা পুনরায় আপনা থেকেই কার্যকরী হয়ে ওঠে। জীবনের সংবাদ, জীবনই দিয়ে দেয়। এরূপে জীবনের ভিতর অবিরাম চেষ্টা আছে বুদ্ধির বোধকে অতিক্রম ক'রে, তার স্বরূপকে জানিয়ে দেবার জন্যে।"

কথাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক বললেন, "ভারতবর্ষের চিন্তাধারায় শক্তিবাদের কথা পাওয়া যায় না। ক্রিশ্চিয়ানিটির স্পর্শে এসে ইদানীং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভিতর শক্তিবাদের কথা পরিস্ফুট হয়েছে।" আমি বললাম, "ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তার বৈচিত্র্য আছে; একই মতবাদ সকলেই মেনে নেয় নি। এ-কথা বললে ঠিক হবে না যে, শক্তিবাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোন পরিচয় হয় নি। তন্ত্রাচার্য্যেরা শক্তিবাদ প্রচার করেছেন—যদিও অনুভূতির স্তরবিশেষে তাঁরাও আকৃষ্ট হয়েছেন স্থিতির দিকে কিন্তু স্থিতি সাধারণত ইন্টেলেক্টের জগৎ নয় বা সম্বন্ধাত্মক বিশ্ব নয়; ইহা পরমস্থিতি—যাকে স্থিতি বলাও ঠিক হবে না, কারণ এও মানসানুভূতি বা বুদ্ধির বাহিরের তত্ত্ব। ইহা তত্ত্ব। তন্ত্রাচার্য্যেরা এ দৃষ্টিকে ত্যাগ করেন নি, কিন্তু তাঁদের সাধন-প্রণালীর ভিতর শক্তিবাদ পরিস্ফুট। শক্তি ও গতির সত্তার সম্বন্ধে এত কথা বোধ হয় কোন দেশের চিন্তার মধ্যে স্থান পায় নি। কিন্তু সেগুলি অতীন্দ্রিয় বলেই, তা সাধারণ দার্শনিক চিন্তার ভেতর ধরা পড়ে নি। কিন্তু তার একটা বিজ্ঞান আছে, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয়।"

"আপনি যে রামকৃষ্ণের কথা বললেন, তাঁর সাধনায় শক্তির স্থান ছিল অতি উচ্চে; ক্রিশ্চিয়ানিটি থেকে তিনি শক্তির সন্ধান পেয়েছেন একথা বললে তাঁকে ঠিক বোঝা যাবে না। তাঁর শক্তিদীক্ষা তন্ত্রমতেই হয়েছিল; তন্ত্রমার্গের সাধনায় তিনি পেয়েছিলেন পরম দীপ্তি। তন্ত্রের সাধনা এমনি যে তা জাগিয়ে তোলে আমাদের সত্তার পূর্ণ স্বরূপকে। তার ভিতর দিয়ে শক্তির গভীর জ্ঞান আমরা পাই। ইতিহাস বলে, রামকৃষ্ণ খৃষ্টধর্ম্মের মার্গেও সাধনা করেছিলেন। কিন্তু যদি আমরা বুঝি তিনি জীবনের বিকাশের পথ পেয়েছিলেন এখানে, তবে ভুল হবে। বস্তুত ভারতীয় শক্তি সাধনার পরিধি এত বড় যে, কোন লোক এতে অভ্যস্ত হলে তার আর কোন সাধনার বাকী থাকে না। সত্তার সকল স্তরে শক্তি সাধক ইচ্ছামত বিচরণ করতে পারে।"

"রামকৃষ্ণকে অবলম্বন ক'রে যে নিখন প্রস্তুত হয়েছে, তা ক্রিশ্চিয়ানিটির আদর্শে রচিত হয়নি। ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সমষ্টিগত আদর্শ ভারতবর্ষের আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারের ইতিহাস এর প্রধান স্মারক।"

অধ্যাপক বার্গশঁ ক্রিশ্চিয়ানিটিকে জীবনবাদের এত বড় আদর্শ করেন যে, তিনি ভাবেন যে, যেখানেই আছে ধর্ম্মের মধ্যে শক্তির ভাব, সেখানেই হয়তো আছে খৃষ্টধর্ম্মের আদর্শের প্রেরণা।*

* "Two Essays on Religion and Morality" গ্রন্থে বার্গশঁ তাঁর এ মতবাদের উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক বার্গশঁর ন্যায় পাশ্চাত্য দেশে অনেকেই মনে করেন, ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তার ভিতর শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা নেই ব'লে ভারতবর্ষের জীবন-ধারা নবীন নবীন বিকাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। এ কথাটী প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় আজকাল আমাদেরও দেশে নবীনদের মুখে। বিস্ময়ের বিষয় এই, ভারতবর্ষে যখন মুক্তিবাদ প্রচারিত হয়েছিল, তখন ভারতবর্ষ শক্তিবিকাশের পরাকাষ্ঠা দেখেছে। যেমন বৌদ্ধযুগ, এবং শঙ্করের যুগ। যে শ্রদ্ধা, শান্তি, সংযম প্রতিষ্ঠা হ'লে মুক্তির পথে মানুষ ধাবিত হতে পারে তাতে মানুষের শক্তি যে পরিমাণ প্রতিষ্ঠা হয়, অন্য কিছুতেই তা হয় না। শক্তিকে তত্ত্ব বলে ধারণা করা হোক, আর নাই হোক—একথা অত্যন্ত সত্য যে, পূর্ণ শক্তিমান না হ'লে চেতনার বিশ্বাতীত রূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় না। একথা প্রায়ই ভুলে যাই যে, শক্তির অতীত হতে না পারলে শক্তিকে অধিকৃত করা যায় না। শক্তির অতীত তত্ত্বে মানুষ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই সে হয় শক্তিমান। এরূপ তত্ত্বে যখনই প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভারতে আচার্য্যদের, তখনই তাঁরা সমাজ, জাতির অভ্যুদয়ের পথ দেখিয়ে গৌরবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ-কাল যারা ভারতের শক্তিহীনতার কথা বলেন, তাঁদের ইউরোপের শক্তিবাদের পরিণতির দিকে তাকানো উচিত। শক্তির মূলে দাঁড়াতে পারলে শক্তিকে অধিকার ক'রে তবে শোভন পরিণাম সম্ভব। ভারতে শক্তিবাদের মূলে এই সত্যটী রয়েছে। শক্তি ত চাইই, কিন্তু তাকে শুদ্ধ ক'রে দিব্য ক'রে প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের কথা প্রায় শেষ হতে না হতে একজন মহিলা এলেন। আমি অধ্যাপকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম। অধ্যাপক বললেন, "আপনার সঙ্গে কথা কয়ে' ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক ভুল ভেঙ্গে গেল। আমি নমস্কার ক'রে ও ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মিসেস্ বার্গশঁ আমাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

মিসেস বার্গশঁ অত্যন্ত ভদ্র, ধীর ও শান্ত। আমাদের প্রায় দু-ঘণ্টাব্যাপী কথোপকথনে তিনি কোন কথাই বলেন নি। আসবার সময় বললেন, "যদি আরও কিছু দিন থাকেন, আবার একদিন আসবেন। আমাকে পত্র লিখলে আমি অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো। আমি ধন্যবাদ জানালাম। নমস্কার ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। সামনে ছিল একটী উদ্যান—বেশ হাওয়া দিচ্ছিল। আমি উদ্যানে প্রবেশ ক'রে একখানি বেঞ্চিতে বসলাম। অধ্যাপক বার্গশঁর কথা স্বতই মনে হতে লাগল। তিনি একজন বড় আর্টিষ্ট, কথা বলার শক্তি তাঁর অদ্ভুত। শব্দবিন্যাস চমৎকার। তাঁর শক্তি ও সজীবতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি প্রাণশক্তির আধার। বয়সে বৃদ্ধ, তবুও তাঁর জীবনীশক্তির বেগ বেশ অনুভব করা যায়। প্রত্যেক মানুষের দর্শন তাঁর স্বরূপ ও স্বভাবের আলেখ্য। বার্গশঁর মধ্যে এ সত্যটী মূর্ত্ত।

বর্ষণ-মুখর-রাতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বাদলের বরিষণে তোমারে পড়েছে মনে গভীর নিশায়,
বিজলী চমকে ঘন কাজল মেঘের মাঝে নভো নীলিমায়।

ঝরোখার ধারে বসি চেয়ে আছি দূরপানে ব্যাকুল নয়নে,
হে মোর পথিক বধূ! আঁধার কুটীর কাঁদে বিরহ লগনে।
দেহের দেউলে মোর নিবে গেছে স্মর-দীপ, ভেঙে গেছে হিয়া,
ধূলায়ে পড়েছে গেহে পরাণের পারাবত তোমারে স্মরিয়া।
রেখে গেছ উপায়ন—প্রেম-মাখা একাবলী মোর মনোপুরে
পথের ধূলায়ে প্রিয়া পাথেয় করিয়া একা চলে গেছ দূরে।

স্মরণ সুদূর পারে তোমার আঁচলখানি এ বাদল রাতে
হয় তো বেপথু এবে স্বপননদীর তটে সমীরণ সাথে!
হয় তো সে পথ দিয়া মেঘেরা উড়িয়া যায় তব পানে চাহি,
প্রাণের বিহগদল পরাগত হোলো প্রেম-স্রোতে অবগাহি।
বরষা ফুরায়ে যাবে, আমার নয়নধারা বহিবে নীরবে,
যতদিন স্মৃতি তব জীবনের পাদপীঠে কুসুমিত র'বে।

কুসুমিত

শিল্পী—কাশীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা

—"দাগর বেলায় ঢেউ করে কানাকানি"

শিল্পী—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, বারভাঙ্গা

ব্যবস্থাপরিষদের ইউরোপীয়ান দল—

বিখ্যাত ইংরেজলেখক Aldous Huxly তাঁহার 'Jesting Plate' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন 'But if I were a member of I. C. S. or if I held shares in a Calcutta jute mill (I wish I did) I should believe in all sincerity that British rule had been an unmixed blessing to India and that the Indians were quite incapable of governing themselves'. অর্থাৎ 'আমি যদি একজন আই-সি-এস্ অফিসার হইতাম অথবা কলিকাতার কোন চটকলে আমার অংশ থাকিত তবে আমিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতাম, ইংরেজ শাসনে ভারতের লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় নাই এবং ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।' ভাক্‌সলীর এই বক্তব্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ইংরেজ বণিকগণ কেন বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষপাতী। তাঁহারা বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যকালে ইঁহাদের আত্মগত্য ও ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধার বহু পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহারা জানেন, কংগ্রেসীদল বা প্রজাদল কোন কারণেই কোটি কোটি দরিদ্রের দুর্ভাগ্য কামেম করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন, প্রগতিশীল মন্ত্রিমণ্ডলী ব্রিটিশ বণিকদের পক্ষে বিপজ্জনক হইবে, আর বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী—তাঁহাদের স্বার্থ যতই অযৌক্তিক হউক এবং কৃষক ও দরিদ্রের পক্ষে যতই দুর্ভোগজনক হউক—তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীকে সমর্থন করিবার তাঁহাদের কারণ এই। আজ তাঁহারা গণতন্ত্রের নামে গাঢ় মসীলেপন করিয়া নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া এই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলীকে কল্যাণকামী বলিয়া সমর্থন করিলেন; কিন্তু সেদিন জাতীয় আদর্শে ও জাতীয় স্বার্থে পুষ্ট সত্যকার দেশহিতৈষী মন্ত্রিমণ্ডলী দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবে সেদিন তাঁহারা কি করিবেন?

হিন্দীবিরোধী আন্দোলন—

পণ্ডিত জহরলাল যখন সংশোধিত ফৌজদারী ও ইহার সমতুল্য আইনগুলির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—যে মন্ত্রিমণ্ডলীকে পূর্ব্ববর্ত্তিত আইনের সাহায্যে দেশ শাসন করিতে হয় তাহাদের টিকিয়া থাকার কোন অর্থ নাই, তখন কেহ কল্পনা করিতেও পারেন নাই যে, কংগ্রেস-পরিচালিত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শেষে অনুরূপ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত রাজাগোপাল যে শেষে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন দমন করিবার জন্য সংশোধিত ফৌজদারী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন তাহা আমাদের ধারণারও অতীত ছিল। রাজাজীর আরও দু-একটি কার্য্যের জন্য কংগ্রেসের সুনাম নষ্ট হইয়াছে। এই সংশোধিত ফৌজদারী আইন প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যাহার করা দূরে থাক, অথচ এই আইন প্রয়োগের ফটা দেখিয়া দেশবাসী আশ্চর্য্যান্বিত।

দরিদ্র ও বেকার সমস্যার সমাধান—

বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মেঘনাদ সাহা শুধু তাঁহার গবেষণা কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকেন না, দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপকারের কথাও চিন্তা করিয়া থাকেন। প্রথম জীবন হইতেই তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে বহু জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। তিনি সম্প্রতি দেশে শিল্প-বিস্তার সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদান করিলাম। তিনি বলিয়াছেন—"গত আদম সুমারী অনুসারে ভারতের শতকরা ৬৬ জন লোক কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ১১ জন শিল্পকার্য্য করে ও বাকী সকলে ব্যবসা উপলক্ষে সহরে থাকে। অবশিষ্ট ২৩ জনের কতক পল্লীশিল্প দ্বারা জীবিকাক্ষন করে, বাকী অপরের গলগ্রহ। উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য আরম্ভ

হইলে শতকরা ৩০ জন সমস্ত জাতির জন্য প্রচুর খাদ্যশস্যাদি উৎপন্ন করিতে পারিবে, সকলে সুলভে খাদ্যদ্রব্যাদি পাইবে; কিন্তু তাহাতেও দেশের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূর হইবে না। শতকরা ৬৬ জন কৃষকের মধ্যে ৩৬ জন বেকার হইবে; সুতরাং সেই সকল বেকার লোকের জন্য শিল্প চাই। উন্নত প্রণালীর জীবন-যাত্রা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সকলেই চাহে খাদ্যদ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য, উত্তম পোষাক পরিচ্ছদ, মনোরম ঘর বাড়ী, নিজের ও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা, বেশী পরিশ্রম না করা, দুঃখের চিন্তা দূর, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি। এই সমস্ত পাইতে হইলে কৃষিজাতের প্রাচুর্য্যবৃদ্ধি ও শিল্প-দ্রব্যাদির উৎপন্নের পরিমাণ ১০ হইতে ২০ গুণ বাড়াইতে হইবে। তাহার যথোচিত ব্যবস্থা চাই—তজ্জন্য যাহারা পল্লীগ্রামে কৃষিকার্য্য করে তাহাদের অধিকাংশকে সহরে আসিয়া শিল্প-কার্য্যাদিতে লাগাইয়া দিতে হইবে। বহু শিল্প-সহর গড়িয়া পল্লীগ্রামের বেকার লোকদিগকে ঐ সমস্ত সহরে আনিতে হইবে। তখনই পল্লীর উন্নতি হইবে। • • • বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা মানব বহু প্রকার উন্নত জীবন-যাত্রার প্রণালী আয়ত্ত করিতে পারে এবং জাগতিক অবস্থাকে অত্যধিক উজ্জ্বলও করিতে পারে। এই ধারণা লইয়াই বর্ত্তমান যুগে মানুষের কর্ম্মশক্তি স্ফুরিত হয়। প্রগতির যে প্রেরণা বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মপ্রবর্ত্তক—বেশী দিনের কথা কি—একশত বৎসর পূর্ব্বেও তাহা ছিল না। তখন ছিল গোঁড়ামি—তাহা ভবিষ্যতকে ভীষণ দুঃখময় করিয়া চিত্রিত করিত এবং পৃথিবী ধ্বংসমুখাগত বা মানব-সমাজ বিপ্লবে নিমজ্জমান হইবে বলিয়া ভীতি জন্মাইত। বর্ত্তমান যুগের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের, ইংলণ্ডের বা জার্ম্মানীর লোকেরা যে-ভাবে চলিতেছে তাহা দেখা এবং সেই সব দেশে কি ভাবে শিল্পাদি উৎপন্ন হয়, তাহা জানা আবশ্যক।"

বিহারে বাঙ্গালী সমস্যা—

বিহারে বাঙ্গালীদের বাসের অসুবিধা দৃষ্ট হওয়ায় যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তৎসম্পর্কে হাজারীবাগের বাঙ্গালী সমিতিতে সম্প্রতি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে—(১) ভারতীয় জাতীয়তার উন্নতি সাধন জন্য 'ডোমিসাইল সার্টিফিকেট' প্রথা রহিত করা উচিত (২) সরকারী চাকরিতে সকল ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার থাকা উচিত। প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা দ্বারা প্রার্থী-নির্ব্বাচন করা উচিত—কেবল শতকরা কয়েকটি পদ অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্টভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে (৩) গুণানুসারে সকলকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা উচিত। স্কুল ও কলেজে যে সকল ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে, বাঙ্গালা ভাষা তন্মধ্যে একটি ভাষা হওয়া উচিত ও বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান করা উচিত ও (৪) ব্যবসায় ও বাণিজ্যে জাতিধর্ম্ম হিসাবে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নহে। যে প্রস্তাব চারিটি উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহা পাঠ করিলেই বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালী-অধিবাসীদিগের অসুবিধা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের বিশ্বাস, কংগ্রেসের মধ্যস্থতায় শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হইবে।

বাঙ্গালায় কংগ্রেসের কার্য্যতালিকা—

কংগ্রেস যদি মন্ত্রিসভা গঠন করিতেন, তাহা হইলে কিরূপ কার্য্যতালিকানুসারে তাঁহারা কার্য্য করিতেন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা যাহাতে এই তালিকা-নুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হন, সে জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। তালিকাটি এইরূপ—(১) প্রাচীন ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা ও রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন, (২) জমিদারের সর্ব্ববিধ আবওয়াব, খরচা ও বেগার বন্ধ। খাজনা ব্যতীত অন্য দাবী অবৈধ বলিয়া ঘোষণা, (৩) খাজনা ও কর বিশেষ-ভাবে হ্রাস, (৪) কৃষির আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য—অবশ্য নিম্নতম কর স্থির করা হইবে, (৫) ভূমিকর রাঁধিয়া দেওয়া, (৬) গ্রামবাসীদিগের ঋণভার এবং বাকী খাজনা ও বাকী রাজস্বের ভার লাঘব, (৭) সর্ব্ববিধ পীড়নমূলক আইনলোপ, (৮) রাজনীতিক বন্দী ও আটকবন্দীদিগকে মুক্তিদান, (৯) আইনঅমান্য আন্দোলনের সময় সরকারে বাজেয়াপ্ত এবং সরকার কর্ত্তৃক বিক্রীত জমি ও সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, (১০) শ্রমজীবীদিগের জন্য বেতন হ্রাস না করিয়া দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা; তাহাদিগের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়-নির্ব্বাহের উপযুক্ত বেতনদানের ব্যবস্থা, (১১) মাদক দ্রব্য-বর্জ্জন, (১২) বেকারদিগের সাহায্যের ব্যবস্থা, (১৩)

সরকারের শাসন ব্যয় এবং কর্ম্মচারীদিগের উচ্চ বেতন ও ভাতা হ্রাস, (১৪) শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা প্রদানের দ্বারা শিক্ষা বিষয়ে আর্থিক অবস্থায় এবং অন্যান্য বিষয়ে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে উন্নত সম্প্রদায়ের পর্য্যায়ভুক্ত করা, (১৫) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা সরকারী চাকরীতে লোক নিয়োগ ; তপশীলভুক্ত ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, (১৬) উচ্ছেদ করিবার পরিবর্ত্তে অন্য পন্থায় বাকী খাজনা আদায়—(সিভিল কোর্ট আদায়ের ন্যায়), (১৭) কৃষকদিগের উপর কর ধার্য্য না করিয়া অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন, (১৮) কৃষিজাত পদার্থের মূল্যবৃদ্ধি, (১৯) পাট সম্পর্কিত রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষক ও শ্রমিকদিগের নৈতিক ও বাস্তব উন্নতি সাধনের জন্য পৃথককরণ, (২০) সমগ্র প্রদেশে সেচের সুবিধা বৃদ্ধি, (২১) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সংস্কার এবং ব্যবহারিক শিক্ষার উন্নতি সাধন এবং (২২) সাম্প্রদায়িক শান্তি ও ঐক্যসাধন।

উড়িষ্যায় কৃতী বাঙ্গালী—

ডাক্তার যোগেশচন্দ্র বাগচী উড়িষ্যার সেরাইকেলা রাজ্যে পঁচিশ বৎসর চীফ মেডিকেল অফিসার পদে নিযুক্ত ছিলেন। পঁচিশ বৎসর পরে তিনি উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রাজচিকিৎসক ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির কাজে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল এবং ৩১ বৎসর ধরিয়া তিনি সেরাইকেলা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সহরের অধিবাসীগণের তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি তাঁহাদের আহ্বানে উপর্য্যুপরি পাঁচ বৎসর ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ অধিকার করিয়াছিলেন। সেরাইকেলা রাজদরবার হইতে তাঁহাকে সম্মানের চিহ্নস্বরূপ প্রথম শ্রেণীর বহুরোঙ্গা পদক অর্পণ করা হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি বহু প্রশংসাপত্র ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তার যোগেশচন্দ্র বাগচীর নিবাস ছিল নদীয়া জেলায়। তিনি গত ২২শে জুলাই ৫৮ বৎসর বয়সে রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

ডাক্তার যোগেশচন্দ্র বাগচী

ডক্টর নবগোপাল দাস—

সিভিলিয়ান ডক্টর নবগোপাল দাস পি-এচ-ডি মহাশয় সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বেকার-সমস্যা-অফিসার নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংসে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে বেকারদিগকে কি ভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, ডক্টর দাস তাহা স্থির করিয়া দিবেন। বাঙ্গালায় বেকারের সংখ্যা কিরূপ এবং বেকার-দিগের প্রয়োজন কিরূপ তাহার একটা হিসাব তাঁহাকে

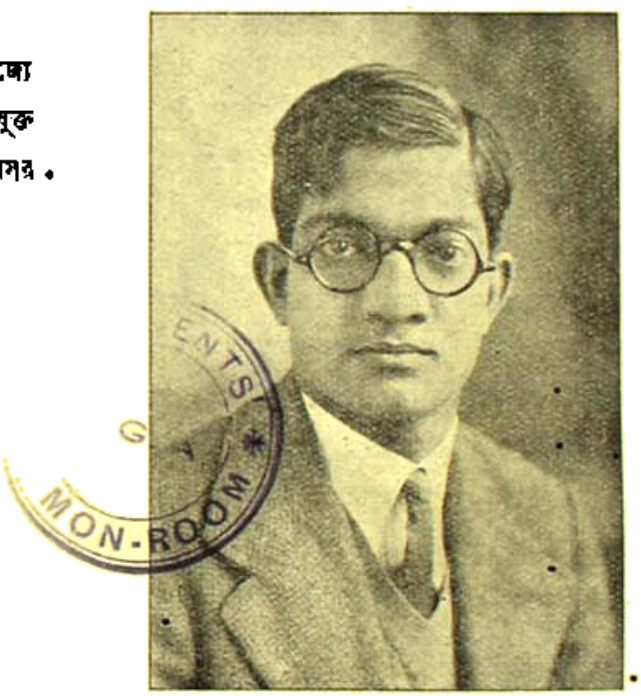

ডক্টর নবগোপাল দাস

প্রস্তুত করিতে হইবে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র—১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আই-সি-এস পাশ করিয়া আসিয়াই তিনি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থার কথা সার আঁটো নিমাদারকে জানাইবার ভার পাইয়াছিলেন। আমরা ডক্টর দাসের কার্য্যের সাফল্য কামনা করি।

পরলোকে প্রতাপচন্দ্র শেঠ—

বিগত ২৮শে জুলাই বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ী প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৬৭ সালে ইঁহার জন্ম হয়। মাত্র দশ বৎসর বয়সে পিতার অকাল-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য-বিড়ম্বিত জীবনে বালক প্রতাপচন্দ্রের মনে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের সংকল্প

প্রতাপচন্দ্র শেঠ

জাগরূক হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণের সহযোগিতায় পি, শেঠ এণ্ড কোং নামে প্রথমে একটি ছাপাখানা খোলেন ও ব্লক নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রতাপচন্দ্র ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে বহু মূল্যের যন্ত্রপাতি আনাইয়া দমদমের সন্নিকটে সিঁথি গ্রামে একটি বিস্কুটের কারখানা খোলেন। বিলাতি বিস্কুটের সহিত প্রতিযোগিতায় 'লিলি বিস্কুট' শীঘ্রই ভারতের সর্ব্বত্র জনপ্রিয়তা লাভ করে। মানবতার দিক দিয়াও প্রতাপচন্দ্রের চরিত্রে বহু সদ্‌গুণ ছিল। পরদুঃখকাতর, স্বভাব-বিনয়ী, জনহিতকর কার্য্যে অগ্রণী—প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালা দেশে তুলার চাষ—

বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে বহু কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় লম্বা আঁশ যুক্ত তুলার চাষ ইতিপূর্ব্বে ছিল না। কয়েকটি জেলায় যে তুলা উৎপন্ন হয়, তাহার আঁশ লম্বা নহে। সম্প্রতি বাঙ্গালার কাপড়-কলওয়ালা সমিতি বাঙ্গালায় তুলা চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ হইতেছে। মুর্শিদাবাদে নবাব বাহাদুরের বাগানে ৫০ বিঘা জমিতে তুলার চাষ হইতেছে। তাহা ছাড়া কয়েকজন জমিদারও তাঁহাদের জমিদারীতে তুলার বীজ বিতরণ করিয়াছেন। বীজ ছাড়ান তুলা এদেশে ২৫ টাকা মণ পর্য্যন্ত বিক্রীত হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের বহু জিলায় বহু পতিত জমি পড়িয়া আছে; কৃষি-বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেই সকল পতিত জমিতে ভাল তুলার চাষ হইতে পারে। বাঙ্গালায় তুলার চাহিদা যথেষ্ট; কাপড়ের কলগুলিতে শুধু ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে তুলা আমদানী করা হয় না, বিদেশ হইতেও তুলা আমদানি করা হইয়া থাকে। এ অবস্থায় বাঙ্গালায় তুলার চাষ বাড়িলে একদিকে যেমন নিরন্ন কৃষকের সুবিধা হইবে, অন্যদিকে তেমনই তুলার দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে দেশী কাপড়ের দামও কমিয়া যাইবে। বাঙ্গালার সকল জেলার জমিদারেরা যদি এ বিষয়ে অবহিত হইয়া কৃষকগণকে উপযুক্ত স্থানে তুলার চাষ করিতে প্ররোচিত করেন, তবেই তাহা বাঙ্গালার পক্ষে শোভন হইবে।

ভারতবন্ধুর দান—

স্যর উইলিয়ম ডীকন্স্‌ও বৃটিশ প্রজা; তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া প্রাচীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একমাত্র হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সাহায্যেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি দুইটি ভারতীয় বালককে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের উভয়ের মৃত্যু হওয়ায় তিনি মেক্সিকোর দুইটি বালককে দত্তকরূপে

গ্রহণ করেন। তাহাদিগকে তিনি তাঁহার সম্পত্তির কতক অংশ দান করিয়া গিয়াছেন। চীনে মাদ্ আধিপত্যের উচ্ছেদ সাধনের জন্য ডাক্তার সানইয়াৎ সেনকে তিনি ১০ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। একটি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুকালে তিনি ৯০ হাজার পাউণ্ড প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে তিনি বিলাতে 'ব্যারনেট' হইয়াছিলেন; কিন্তু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে উপাধি ত্যাগ করিয়া তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রজা হইয়াছিলেন। তাঁহার উইল লইয়া হয়ত সেজন্য গণ্ডগোল উপস্থিত হইতে পারে। আমরা এই বিদেশী ভারতবন্ধুর মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি এবং আশা করি তাঁহার উইলের নির্দ্দিষ্ট অর্থে ভারতে একটি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

ভারতের বাহিরে বাঙ্গালী—

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুত এ-কে-পাল মহাশয় সম্প্রতি এডেন উপসাগরের শীর ও মাকলার সুলতানের অধীনে তামাকু-বিশেষজ্ঞের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি পাশ করিয়া তিনি পুনায় কৃষি-গবেষণাগারে দুই বৎসর কৃষি-শিক্ষা করিয়া আই-এ-আর-এ উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি ঢাকায় সরকারী কৃষি-গবেষণাক্ষেত্রে কাজ পাইয়াছিলেন ও তথায় বাঙ্গালার গাছ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন। ভারতের বাহিরে একজন বাঙ্গালীর এই সম্মানজনক পদলাভ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়।

বীরেন্দ্রনাথ রায়—

প্রবীণ সংবাদপত্রসেবী বীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় গত ১৫ই ভাদ্র রাত্রিকালে ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে গত ৩০ বৎসরকাল তিনি 'বেঙ্গলী', 'সার্ভেণ্ট', 'ফরোয়ার্ড', 'এম্পায়ার' প্রভৃতি বহু সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন; তাঁহার কার্য্যে কেহ কখনও অসন্তুষ্ট হইতেন না—এমনই তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল। ফরিদপুর জেলার উলপুর নিবাসী ত্রৈলোক্যনাথ রায়ের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্র—

ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্নত ধরণের কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও ভারতবাসীর মনে এখনও এক ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, বিলাতে না গেলে বিদ্যাশিক্ষার যেন সমাপ্তি হয় না। এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন না? তাহা করেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হয় না। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ১৬৮০ জন ছাত্রছাত্রী বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে বিদ্যাশিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ছাত্রী ছিলেন ১২৬ জন। তাহা ছাড়া বহু ছাত্র বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করিতে গিয়াছিলেন। এই যে দলে দলে ভারতীয় ছাত্র বিলাতে শিক্ষা লাভ করিতে যায়—ইহার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? এ দেশে বিলাতে না গিয়াও স্যর গুরুদাস বা স্যর আশুতোষ হওয়া যায়। বিলাতে গিয়া যুবকগণ অধিকাংশ স্থলে কু-শিক্ষাই লাভ করিয়া আসেন; অনেকে আবার এমন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসেন, যাহা পরবর্ত্তী জীবনে কখনও কোন কাজে লাগে না। ভারতবাসী কবে এই মোহ হইতে মুক্ত হইবেন জানি না। দেশভ্রমণের উপকারিতা ও উপযোগিতা আছে; শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যদি ভারতীয় ছাত্রেরা বিলাতে বেড়াইতে যান, তবে যে তাঁহারা লাভবান হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে এতগুলি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থাকিতে বিদেশে পড়িতে যাওয়ার কোন সার্থকতা নাই।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ—

সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা পরিষদে এক নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিবার আয়োজন করিয়াছেন। নানাকারণে সংবাদপত্র-সমূহকে মধ্যে মধ্যে সরকারের অনেক গোপনীয় কাগজপত্র-প্রকাশ করিয়া দিতে হয়। ভবিষ্যতে সংবাদপত্রসমূহ যাহাতে তাহা করিতে না পারে, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট 'সরকারী দলিল বিল' নামক একটি আইন প্রবর্ত্তন করিয়া কলিকাতা

গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ আইন অমান্য করা হইলে ছাপাখানা পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে। এতকাল পর্য্যন্ত এই আইনের কোন প্রয়োজন ছিল না—এখনই বা তাহা হইল কেন? গুপ্ত সরকারী-দলিল প্রকাশ করিলে সংবাদপত্রসমূহের জন্য আইনেও দণ্ড হইতে পারে, হঠাৎ সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনেরই বা প্রয়োজন কি?

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলন—

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিন সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মৌলবী এ-কে-ফজলুল হক সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সম্মিলনে আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতি বহু নেতা উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অনেক স্থানে মাসিক মাত্র চারি টাকা বেতনে কার্য্য করিয়া থাকেন; তাঁহাদের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করা যে অবিলম্বে প্রয়োজন, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই সম্মিলন কি সত্যই তাঁহাদের কোন উপকার করে? বহুসংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষকের পক্ষেই এই সম্মিলনে যোগদান করা সম্ভবপর হয় না। এই সম্মিলনে ত বহু সরকারপক্ষীয় লোকের সমাগম হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা কি এদেশে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী? বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট দরিদ্র কৃষকের উপর করভার চাপাইয়া প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা ফলবতী হয় নাই। এখন কি ভাবে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি হইবে তাহাই বিবেচ্য।

জাপান ও রবীন্দ্রনাথ—

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী সমরনায়কগণ প্রসিদ্ধ জাপানী কবি নোগুচি দ্বারা কবীন্দ্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক পত্র লিখাইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা জাপান কর্ত্তৃক চীন আক্রমণের যৌক্তিকতা রবীন্দ্রনাথকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; নোগুচির উদ্দেশ্য ছিল যে এই আক্রমণ দ্বারা সমগ্র প্রাচ্যে এক বৃহত্তর শক্তির প্রতিষ্ঠার কথা রবীন্দ্রনাথকে বুঝান হইলে রবীন্দ্রনাথ জাপানের এই বর্ব্বরতাপূর্ণ আক্রমণ সমর্থন করিবেন। কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ নোগুচির পত্রের উত্তরে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে জাপানের সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই শান্তির কথা। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি জানি একদিন আপনার (জাপান) দেশবাসীদের মোহ ঘুচিবে এবং রণোন্মত্ত সমরনায়কগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত আপনাদের সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ তাহাদের শত শত বৎসর ধরিয়া দূর করিতে হইবে। তাঁহারা বুঝিতে পারিবে, আজ জাপানের সৌম্যগুণ যে দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, সেই ক্ষতির তুলনায় চীনের প্রতি অভিযান নিতান্ত তুচ্ছ। চীন অজেয়। চিয়াং কাইসেকের নির্ভীক নেতৃত্বে তাহার সভ্যতা অতুল সম্পদের নিদর্শন দেখাইতেছে। অভূতপূর্ব্ব ঐক্যবদ্ধ চীনবাসীদের নেতার প্রতি অটুট অনুরক্তি আজ চীনের নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছে। অকস্মাৎ এক প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াও চীন প্রবল পরাক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছে; তাহার পূর্ণ জাগ্রত চেতনা সাময়িক পরাজয়ে কিছুতেই দমিত হইবে না। নিছক পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত জাপানের ক্ষাত্রশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান চীন আজ জাপান অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের পরিচয় দিতেছে। চীন মহান—উদারচেতা জাপানী মনীষী ওকাকুরা কেন যে আমাকে পরম উৎসাহভরে এই কথা বলিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ যেরূপ সুস্পষ্ট বুঝিতেছি পূর্ব্বে আর কখনও তেমন বুঝি নাই। * * * *

অদূর ভবিষ্যতেই যেন চীন ও জাপান পরস্পর মিলিত হইয়া মর্ম্মপীড়াকর অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলে। খাঁটি এসিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবে, কবিরা পুনরায় শান্তির গীতি গাহিবেন এবং যে মানবসমাজে বৈজ্ঞানিক-মারণাস্ত্রে ব্যাপক ভ্রাতৃ-হত্যার স্থান নাই, সেই মানবসমাজে পুনরায় তাঁহাদের আত্মা ঘোষণা করিতে লজ্জিত হইবেন না।" ইহাই রবীন্দ্রনাথের কথা,—ভারতের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া এইরূপই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—ভারতের সংস্কৃতি চিরদিনই জগতকে এই অহিংসার বাণী শিক্ষা

দিয়াছে—ভারতের বুদ্ধ চীন ও জাপানে এই শিক্ষাই প্রচার করিয়াছিলেন। আজ সাম্রাজ্যমদগর্ব্বিত রণোন্মত্ত জাপান যদি এ কথায় কর্ণপাত না করে, তবে তাহার ফলে তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

অধ্যাপক নন্দলাল গাঙ্গুলী—

নাগপুরের অধ্যাপক শ্রীযুত নন্দলাল গাঙ্গুলী মহাশয় সম্প্রতি জব্বলপুর রবার্টসন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা প্রীত হইলাম। ১৯ বৎসর পূর্ব্বে নন্দলালবাবু নাগপুরে অধ্যাপক হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিজ অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতা দ্বারা উন্নতিলাভ করিয়াছেন। তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন এবং ছাত্রদের শারীরচর্চ্চা বোর্ডের সভাপতিরূপে ছাত্রদের শারীরিক উন্নতিবিধানে অবহিত ছিলেন। তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করিতেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় জব্বলপুরে অধ্যক্ষপদ লাভ করেন নাই। আমরা বাঙ্গালার বাহিরে একজন বাঙ্গালীর এই সম্মানলাভে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

পরলোকে সুনৃতরঞ্জন গুপ্ত—

ঢাকা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'শিক্ষা-সমাচার' সম্পাদক সুনৃতরঞ্জনগুপ্ত গত ১২ই ভাদ্র মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তাঁহার পিতা খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী অবিনাশচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর গত ৮ বৎসরকাল তিনি শিক্ষা-সমাচারের সম্পাদকের কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। আমরা এই উৎসাহী কর্ম্মীর অকালমৃত্যুতে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—

আজীবন শিক্ষাব্রতী, খ্যাতনামা অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ৭ই সেপ্টেম্বর সকালে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি ৪২ বৎসর কাল বিদ্যাসাগর কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তন্মধ্যে শেষ ৯ বৎসর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রিপণ কলেজে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। ইংরেজী ও দর্শন উভয় শাস্ত্রেই তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল; তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। জ্ঞানরঞ্জনবাবু ভারতীয় খৃষ্টান ছিলেন। তাঁহার পিতা রেভারেণ্ড প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যখন হুগলী জেলার সোনারটেবরীতে বাস করিতেন, সেই সময় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে

জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার জন্ম হয়। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলিজিয়েট স্কুল হইতে তিনি এণ্ট্রান্স, ১৮৮৪তে এফ-এ, ১৮৮৬তে বি-এ ও ১৮৮৯তে এম-এ পাশ করেন। এম-এ পরীক্ষায় তিনি দর্শন শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা তাঁহাকে বিদেশ যাইবার জন্য বৃত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। দুই বৎসর কাল ডাফ কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৬ বৎসর কাল তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং বহুদিন তিনি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সিনেট সভার সদস্য ছিলেন। তিনি ভারতীয় খৃষ্টান সমাজের নেতা ছিলেন এবং সকল প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি উদারনীতিক হইলেও সকল প্রকার অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন। তিনি ইংরেজীতে অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও তিনি সকলের সহিত সমানভাবে মিশিতেন এবং সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রগণের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সে-কালের একজন আদর্শ অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতীর যে অভাব হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে জননেতার চেষ্টায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রজাগণের সকল অসুবিধা দূর না হইলেও কতক পরিমাণে যে দূর হইবে তাহা বলা যায়। যাহাতে এই আইনে বড়লাট তাঁহার সম্মতি না দেন, সে জন্য জমিদারগণ নানাপ্রকার আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। নিম্নলিখিত বিষয়ে নূতন আইনে প্রজাদিগের সুবিধা হইয়াছে—(১) প্রজাগণকে খারিজ ফী বা সেলামী আর দিতে হইবে না, (২) জমিদারের অগ্রক্রয়ের অধিকার অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা আইন ছিল যে জমিদার ক্রয় করিতে চাহিলে প্রজা আর কাহাকেও জমি বেচিতে পারিত না, তাহা উঠিয়া গেল। জমির অন্যান্য অংশীদারগণের অগ্রক্রয়ের অধিকার হইল। (৩) আদালতে দরখাস্ত করিয়া সরিকগণ নিজ নিজ অংশ খারিজ করাইয়া লইতে পারিবে। এইজন্য মাত্র এক টাকা ফি লাগিবে। (৪) টাকায় দুই আনা সুদে এক আনা সুদ দিতে হইবে—ক্ষতিপূরণের জন্য চারি আনা সুদে দুই আনা দিতে হইবে (৫) জমিদারগণ সার্টিফিকেটে খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না। (৬) মোকররী জমায় ইস্তকা দিবার নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। (৭) হিসাবানা, মাপট, আবওয়াব প্রভৃতি কোনরূপ বাজে আদায় লইলে জমিদার বা তাঁহার কর্ম্মচারীরা দণ্ডনীয় হইবে। (৮) জমি নদী শিকস্তি হইয়া ২০ বৎসরের মধ্যে পুনরুত্থিত হইলে প্রজা ৩ বৎসরের খাজনা দিয়া তাহা দখল পাইবে। (৯) সুদবন্ধকী ও পাইখাস্তাদী বন্ধকী ১৫ বৎসরের অধিক থাকিবে না। ১৫ বৎসর গত হইলে তাহা পরিশোধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ও আদালতের দরখাস্তের ফলে খাতক তাহা দখল পাইবে। নূতন আইন কিছুদিন চলিলে পর ইহা দ্বারা প্রজা সত্যই লাভবান হইবে কি-না তাহা জানা যাইবে। তবে কতকগুলি বিষয়ে যে প্রজার সুবিধাবৃদ্ধি করিয়া জমিদারের অতিরিক্ত আয়ের পথ বন্ধ করা হইয়াছে, তাহা উপরের ধারাগুলি পড়িলেই বুঝা যায়। কৃষক ও শ্রমিকদিগের উন্নতিবিধান করা না হইলে এ যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে আত্মরক্ষা করিয়া বাস করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—

কলিকাতার খ্যাতনামা কবিরাজ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় সম্প্রতি মাত্র ৭৩ বৎসর বয়সে

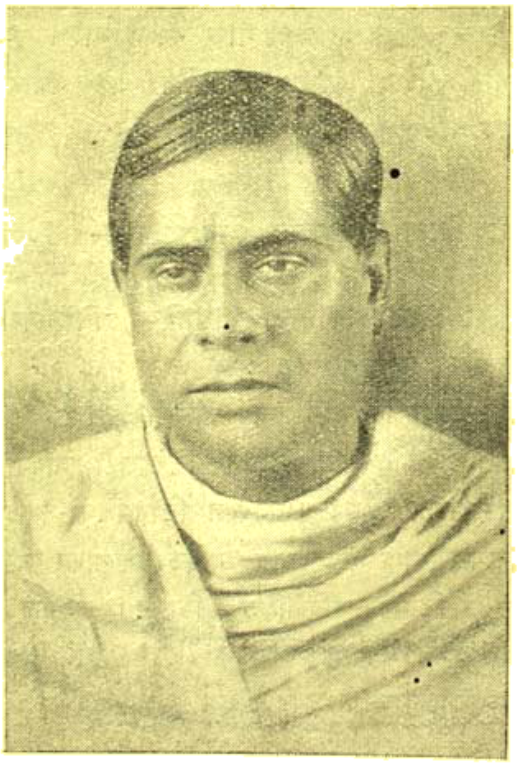

কবিরাজ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়

কাশীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার হাতিশালা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি দর্শন, ইংরেজী ও কমার্স তিনটি

বিভাগে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন এবং বহুদিন গভর্ণমেণ্ট কমার্সিয়াল ইনিষ্টিটিউটে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং 'রসজলনিধি' গ্রন্থ রচনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদের বহুপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা প্রচারিত হওয়ায় আমেরিকা-চিকাগোর কেমিক্যাল সোসাইটী তাঁহাকে তথায় গিয়া রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তথায় গমন করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলা দেশে একজন বহুবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতের অভাব হইল।

বিদ্যালয়ে রন্ধনোৎসব—

আজকাল বাঙ্গলা দেশে বহুসংখ্যক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়টিতে লেখাপড়া শিক্ষা ব্যতীত গৃহকার্য্যে, বিশেষত রন্ধন কার্য্যে নিপুণা হইতে হয়। আজকাল সকল গৃহস্থ গৃহেও উড়িষ্যাবাসী পাচকের আধিক্য দৃষ্ট হয়। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতার রামময় শীল শিশু পাঠশালায় লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি রবিবারে রন্ধন কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সম্প্রতি উক্ত পাঠশালায় একটি বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইয়াছিল; তাহাতে দুই শতাধিক লোককে ভূরিভোজনে তৃপ্ত করা হইয়াছে। ছাত্রীরা কুটনা কুটা, বাটনা বাটা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কাজই নিজেরা করিয়াছিল। তাহাদের কাজ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাহাতে তৃপ্ত হইয়াছেন। এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ কর্ম্ম অতি অল্প স্থানেই দেখা যায়। শিক্ষয়িত্রীরা ছাত্রীদের গৃহস্থালীর সকল কাজই শিক্ষা দিয়া থাকেন। সকল বালিকাবিদ্যালয়েই রামময় শীল পাঠশালার এই আদর্শ অনুসৃত হওয়া উচিত।

রামময় শীল শিশু পাঠশালা

লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা জানি না। বোধ হয় সেরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। বালিকাদিগকে সুগৃহিণী হইতে

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক সম্মিলন—

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল-বঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নাটোরের

রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় উক্ত সম্মিলনের মূল সভাপতি হইয়াছিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। কবিরাজ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি-

গণনাথ সেন

রূপে সমাগত চিকিৎসকগণকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সম্মিলনের সঙ্গে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত এম-কে-জ্যাকেরিয়া

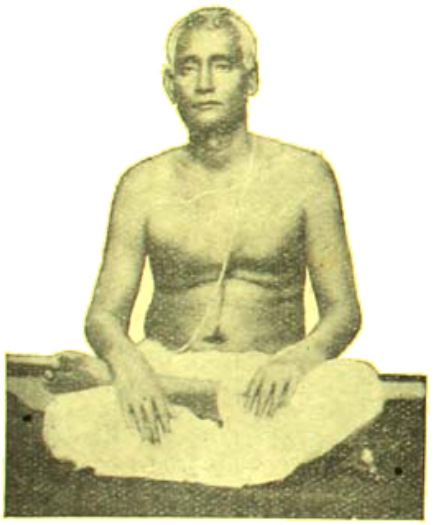

প্রমথনাথ রায়

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের নিকট প্রদর্শনীটি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। কবিরাজগণ যে সকল গাছগাছড়া, লতাপাতা বা ধাতব দ্রব্য ঔষধে ব্যবহার করেন, সেগুলি বিশেষভাবে প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। কি ভাবে ঔষধ প্রস্তুত হয় ও তাহার উপকারিতা কি—তাহাও তথায় সকলকে বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মূল-সভাপতি ছাড়াও ৮টি বিভিন্ন বিভাগে ৮ জন আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসককে সভাপতি করা হইয়াছিল। কবিরাজ শ্রীযুত বিমলকালী ভট্টাচার্য্য প্রদর্শনী সম্পর্কিত সকল

ইন্দুভূষণ সেন

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দেশের লোকের কবিরাজী চিকিৎসার উপর পূর্ব্বাপেক্ষা আস্থা অনেক বাড়িয়াছে বটে, দেশের সকলেই যাহাতে এই চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, কবিরাজগণের সে জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। আমরা আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক সম্মিলনীর উদ্যোক্তাদিগের এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

বিহারে বাঙ্গালী সম্মানিত—

বিহারে বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যা সত্ত্বেও সম্প্রতি বিহারের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশে বিহার গভর্ণমেণ্ট শ্রীযুত মদনগোপাল মিত্রকে হাজারীবাগে রিফর্ম্মেটারী স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন জানিয়া আমরা প্রীত হইলাম। মিত্র মহাশয় পূর্ব্বে আগ্রার দয়ালবাগ টেকনিকাল

কলেজে এঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিহার গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। বিহারে যদি এইভাবে যোগ্যতার সমাদর করা হয় এবং বাঙ্গালী বলিয়া কোন যোগ্য ব্যক্তি উপেক্ষিত না হন, তাহা হইলে বিহারে বাঙ্গালী সমস্যার সুসমাধান হইবে এবং বিহার প্রবাসী বাঙ্গালীদের অভিযোগের কোন কারণ থাকিবে না।

ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—

রাষ্ট্রগুরু স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৫শে ভাদ্র রবিবার সকালে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে পরলোকগত

ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

হইয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভবশঙ্করবাবু ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা মায়া দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার একটি ১৩ বৎসর বয়স্কা কন্যা আছে। ভবশঙ্করবাবু যৌবনে রিপন কলেজে শিক্ষালাভের পর পিতার সহিত বিলাত গিয়াছিলেন এবং কিছুদিন 'বেঙ্গলী' পত্রের ম্যানেজারের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ১৪ বৎসর কাল যোগ্যতার সহিত বারাকপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় বারাকপুরেই বাস করিতেন এবং সেখানেই তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। তিনি রিপন কলেজের অন্যতম ট্রাষ্টি ও গভর্ণিং বডির সেক্রেটারী ছিলেন। পতিহীনা মায়া দেবীকে ও তাঁহার কন্যাকে তাঁহাদের এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। ভবশঙ্করবাবুর মৃত্যুতে আমরা স্বজনবিয়োগবেদনা অনুভব করিতেছি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে শান্তি দান করুন।

কুমারী রেণুকা সাহা—

প্রফেসার এনায়েৎ খাঁর শিষ্যা কুমারী রেণুকা সাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত গত নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীতে সেতার বাজাইয়া মহিলা প্রতি-

কুমারী রেণুকা সাহা

যোগীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতাতেও কয়েকটি স্থানে সেতার বাদ্য দ্বারা দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

চীনে মেডিকেল মিশন—

ভারতীয় কংগ্রেসের চেষ্টায় পাঁচ জন ভারতীয় চিকিৎসক চীনদেশে আহত সৈনিকগণের সেবাকার্য্য গ্রহণের জন্য

সম্প্রতি চীনদেশে গমন করিয়াছেন। তাঁহারা সঙ্গে করিয়া বত্রিশ হাজার কলেরা-বীজের টিউব এবং বহু টাইফয়েড ও প্লেগের বীজের টিউব লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এক বৎসর কাল চীনদেশে বাস করিয়া রেডক্রস সোসাইটীর অধীনে কাজ করিবেন। ঐ দলে আছেন, ডাক্তার এম্, অটল, ডাক্তার চোপকার, ডাক্তার কটনিস, ডাক্তার মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার বি, কে, বসু। এই মহান সেবাকার্য্যের জন্য যাঁহারা বিদেশে গমন করিলেন, তাঁহারা জাতির ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহাদের যাত্রা ভয়যুক্ত হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের প্রশংসনীয় কার্য্য—

মাদ্রাজের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা শতকরা বার্ষিক তিন টাকা সুদে দেড় কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা দেশের মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন। ঐ টাকা দ্বারা ইলেকট্রিক পরিকল্পনা, সেচ কার্য্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে ও কৃষকগণকে ঋণ দান প্রভৃতি করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। যে সকল প্রদেশের কংগ্রেস-মন্ত্রীরা টাকার অভাবের কথা বলিয়া কার্য্যপ্রসার করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা মাদ্রাজের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবেন সন্দেহ নাই। একদিকে যেমন ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া কংগ্রেস-মন্ত্রীরা নূতন আদর্শ দেখাইয়াছেন, জনহিতকর কার্য্যের জন্য এইরূপ ঋণগ্রহণ করিয়া তাঁহারা অপর একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাঙ্গালা দেশ আজ বন্যার প্রকোপে বিধ্বস্ত; এখানকার মন্ত্রীরা কি ঐ ভাবে ঋণ গ্রহণ করিয়া বন্যাপীড়িতদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না?

লোকশিক্ষা সংসদ—

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে বিশ্বভারতী হইতে লোকশিক্ষা সংসদ গঠিত হইয়া গ্রামে গ্রামে শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। আমাদের দেশে লেখা-পড়া-জানা লোকের সংখ্যা কত কম—তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। লোকশিক্ষার প্রবর্ত্তনের দ্বারা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি সহজে বৃদ্ধি করা যায়। পৃথিবীর সকল দেশেই প্রাপ্তবয়স্কদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। যাহারা বালাকালে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে না, পরে যাহাতে তাহারা শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হয়, লোকশিক্ষা-সংসদ ব্যাপকভাবে তাহার ব্যবস্থা করিলে দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে। আমরা বিশ্বভারতীর এই প্রচেষ্টা সমর্থন করি এবং দেশবাসী সকল শিক্ষিত যুবককে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এই সংসদের সহিত সহযোগিতা করিয়া এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হন।

উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২১শে ভাদ্র রবিবার ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া

উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা ব্যথিত হইলাম। ইংরেজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ভবানীপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় তারাপ্রসন্নবাবু সেকালের সাব-জজ ছিলেন এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অল্প বয়সেই উপেন্দ্রবাবু সাংবাদিকের কার্য্যে ব্রতী হন এবং 'বঙ্গনিবাসী' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। নিজ ব্যয়েই তিনি তাহা পরিচালনা

করিতেন। পরে 'ভারত-সংবাদ' ও 'শিল্পসখা' নামক দুইখানি সাময়িক পত্রও তাঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি 'ন্যাশনাল গার্জ্জেন' ও 'পাওয়ার' নামক দুইখানি ইংরেজী সাময়িকপত্রেরও সম্পাদক ছিলেন। তৎকালে উক্ত পত্র দুইয়ের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী' তাঁহাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে অমর করিয়া রাখিবে। কিছুদিন তিনি 'ভারতবর্ষ'-এর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। উপেন্দ্রবাবু 'ভারতবর্ষ'-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উপেন্দ্রকৃষ্ণের দুই পুত্র, এক কন্যা ও দুই জামাতা বর্ত্তমান। শেষ বয়সে তিনি সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করিতেন। তাঁহার বড় জামাতা প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী জ্যোতি বাচস্পতি, কনিষ্ঠ জামাতা হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় আলিপুরের উকিল এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র পান্নালাল ছোট আদালতের উকিল। আমরা তাঁহার দুই পুত্র পান্নালাল ও মনিলালকে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার নূতন নিয়ম—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার দুইটি নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নূতন নিয়ম দুইটি নিম্নে প্রদান করিলাম—"(১) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিতে হইলে পরীক্ষার্থীকে নিম্নহারে নম্বর রাখিতে হইবে—(ক) মাতৃভাষা ও ইংরেজীতে মোট নম্বরের শতকরা ৩৬ ভাগ, (খ) অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়ে শতকরা ৩০ ভাগ, (গ) সমস্ত অবশ্যপাঠ্য বিষয়ে মোট নম্বরের গড়ে শতকরা ৩৬ ভাগ। (২) যে সমস্ত পরীক্ষার্থী গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর পাইবে তাহারা প্রথম বিভাগে, যাহারা শতকরা ৫০ নম্বর পাইবে তাহারা দ্বিতীয় বিভাগে ও অপরাপর পাশ ছাত্রগণ তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোন পরীক্ষার্থী অবশ্য পাঠ্য বিষয়ে পাশ করে ও গড়ে তাহার পাশের নম্বর থাকে, তবে অতিরিক্ত বিষয়ে সে শতকরা ৩০এর অধিক যত নম্বর পাইবে, তাহা তাহার মোট নম্বরের সহিত যোগ হইবে এবং ঐ মোট নম্বর অনুসারে তাহার বিভাগ ও স্থান ঠিক হইবে।"

মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীর সংখ্যা—

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল যখন ভারতবর্ষে নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন হয়, তখন বাঙ্গালা দেশে মোট ২৬ শত ৯১ জন রাজবন্দী আটক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ১০ শত ৪৮ জন কারাগারে বা বন্দীশিবিরে, ৮ শত ৫৩ জন পল্লীগ্রামে, ১ শত ৮২ জন স্বগৃহে, ৪ শত ৪৮ জন অপেক্ষাকৃত কম নিষেধাজ্ঞার অধীনে, ১ শত ২৪ জন বন্দী-শিক্ষাশিবিরে এবং ১৬ জন তিন আইনে বন্দী ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সকলকেই মুক্তি দান করিয়াছেন। ইংরাজিতে একটি প্রবচন আছে "একেবারে না হওয়ার অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া ভাল"—আমরাও তাহাই বলি। তবে এই মুক্তির জন্য মহাত্মা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র প্রভৃতিকে কম চেষ্টা করিতে হয় নাই।

বঙ্গীয় জ্যোতিষী সম্মিলন—

আমাদের পঞ্জিকাসংস্কার যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, আমরা এ কথা পাঠকবর্গকে ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার জ্ঞাপন করিয়াছি। পঞ্জিকাসংস্কারের চেষ্টাও ক্রমে বলবতী হইতেছে। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় বাঙ্গালার জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীদিগের এক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। খ্যাতনামা জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীযুত রাধাবল্লভ স্মৃতিপুরাণজ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং বয়োবৃদ্ধ মনীষী শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই সম্মিলনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তারকেশ্বরের নূতন মোহান্ত দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রম তীর্থগুরুরূপে সম্মিলনে যোগদান করিয়া সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য মোহান্ত মহারাজ বাঙ্গালী, বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং সুপণ্ডিত। তিনি একটু চেষ্টা করিলে হয় ত পঞ্জিকাসংস্কার অতি সহজেই হইতে পারে। সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ ও তাঁহার মত একজন লোককে সম্মিলনে আনিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সম্মিলনের চেষ্টায় যদি পঞ্জিকা সংস্কার আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে তদ্দ্বারা হিন্দুমাত্রই উপকৃত হইবেন। খ্যাতনামা জ্যোতিষী শ্রীযুত দিগিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ ও শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ নন্দীর চেষ্টার ফলেই এই সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ—

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কি করিয়া মিলন ঘটিতে পারে আজিকার দিনে ভারতের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের মনেই সেই চিন্তা দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সহিত মোসলেম লীগের দলপতি মিঃ মোহম্মদ আলী জিন্নার এ বিষয়ে চিঠিতে ও সাক্ষাতে বহু আলোচনা হয়। কিছুদিন পূর্বে তাঁহাদের পত্রগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে সাধারণ লোকেও জিন্না সাহেবের মিলনেচ্ছার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন। কংগ্রেসের পক্ষে এই মিলন-চেষ্টা আদৌ সঙ্গত হইয়াছে কি-না সন্দেহ। কেন না, মোসলেম ভারতে মোসলেম লীগই একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখপাত্র প্রতিষ্ঠান নয়। ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, মুসলমানদের মধ্যেও তেমনই অসংখ্য সম্প্রদায় ও দল আছে। সুতরাং মোসলেম লীগকে কখনই মোসলেম ভারতের মুখপাত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যে-কোন মুসলমান ইচ্ছা মাত্রেই লীগের সদস্য হইতে পারে না। অপর পক্ষে যে-কোন ভারতবাসী কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া লইলেই ইহার সভ্য হইতে পারেন। কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যার তুলনায় মোসলেম লীগের সদস্যের সংখ্যা নগণ্য। তাহা ছাড়া, লীগের উদ্দেশ্য মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধন, আর কংগ্রেসের উদ্দেশ্য জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে ভারতবাসীর কল্যাণসাধন করা। কংগ্রেস অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ভারতের জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে; অপর পক্ষে লীগ অদ্যাপি স্বসম্প্রদায়ের জন্যও এমন কিছু করেন নাই বা করিতে পারেন নাই যাহার জোরে মোসলেম ভারত তাহাকে তাহার মুখপাত্র বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী হইবে এবং সমস্ত হয়ও নাই, তাহা বহু স্বরাজকামী উদারপ্রকৃতি মুসলমানের বিভিন্ন বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে জানা গিয়াছে। কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য অনেক কিছুই করিয়াছে। খিলাফত আন্দোলন হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও জাঞ্জিবারের মুসলমান ব্যবসায়ীদের জন্য কংগ্রেসের আন্দোলন দেশবাসীর অজানা নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লীগের পক্ষে কংগ্রেসের সমকক্ষতা দাবী অসঙ্গত। লীগ কেবল নিজের সম্প্রদায়ের জন্য সরকারী চাকরির সংখ্যা বাড়াইবার আন্দোলনই চালাইতেছে। অথচ এই সত্যটা তাহারা ভুলিয়া যাইতেছে যে, সরকারী চাকরিতে যোগ্যতা উপেক্ষা করিয়া কেবল অযোগ্যদের দিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে রাষ্ট্রের কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত রূপে পরিচালনে বাধার সৃষ্টি হইবে। এমন কি, যোগ্যতার প্রতিযোগিতা না থাকিলে মোসলেম সম্প্রদায়ের মধ্যেও উপযুক্ত যোগ্য লোকের ক্রমশ অভাব ঘটিবে। সম্প্রতি কংগ্রেস মুসলমানদের তুষ্ট করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকারী চাকরি বণ্টনে যে পক্ষপাত-উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিন্দনীয়। সরকারী চাকরির শতকরা ষাটটি মুসলমানদের আর বিশটি অনুন্নত সম্প্রদায়কে এবং বাকী বিশটি হিন্দু, খৃষ্টান ও বৌদ্ধদের মধ্যে বণ্টিত হইতে সম্মতি দিয়া কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতি অবিচারই করিয়াছে বলিয়া বহু মনীষী মত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি ভাই পরমানন্দ এই ব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িক তৃতীয় রোয়েদাদ বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন, দেশের শোণিত পাত করিয়া যে হিন্দু সমাজ বঙ্গদেশ দেশের সেবা করিয়াছে, যাহারা জনসাধারণের মঙ্গলার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, হাসপাতাল ও বহু প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াছে, তাহারা অবশিষ্ট দলে পড়িল!

টাইমস পত্রও বাঙ্গলার হিন্দুদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে; ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ের সদস্য ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ও উচ্চ বর্ণের হিন্দুদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ চাকরি বণ্টনে মত দিয়া কংগ্রেস হিন্দুসমাজের প্রতি যে নির্মম অবহেলা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতেও কি তাঁহারা মুসলমানদের সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন? বোধ হয় না, কারণ আব্দারে ছেলেকে যতই 'নাই' দেওয়া যায় ততই তাহার আব্দারের সীমা আরও বৃদ্ধি পায়।

করবৃদ্ধির প্রস্তাবে খাতেদারবর্গের আতঙ্ক—

সিন্ধু প্রদেশের সরকার আবার করবৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সিন্ধোর তালুকের অন্তর্গত মীর আল্লাবক্স এবং আরও কয়েকজন খাতেদার মহাত্মা গান্ধীর নিকট একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। খাতেদারগণ নানা করভারে নাজেহাল হইতে বসিলেও প্রত্যেকবার জমি জরিপ করিবার পরেই কর বৃদ্ধি করা হইয়া আসিতেছে। জমি জরিপের অর্থ ই কর বৃদ্ধি বলিয়া তাহারা ধরিয়া লইয়াছে এবং তাহারা এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে যে, অন্যান্য প্রদেশে যখন জনমতের উপর ভিত্তি করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনার চেষ্টা করা হইতেছে তখন সিন্ধু প্রদেশে কংগ্রেসী দল আল্লাবক্স মন্ত্রিমণ্ডলীর সহযোগে প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে নূতন কর ধার্য্য করিয়া জনমতকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা

মৌলবী একরামুদ্দীন

প্রবন্ধ

মায়ের মুখে যে ভাষা শিখা যায়, অর্থাৎ দেশের সাধারণ লোকে বর্ত্তমানে মুখের কথায় যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাই মাতৃভাষা। এক প্রদেশের একজন লোক হয়ত এক ভাষায়, অন্য লোক অন্য ভাষায় এবং তৃতীয় লোক তৃতীয় ভাষায় কথা কয়, তাহা হইলে কোনটা মাতৃভাষা হইবে? এরূপ স্থলে সেই প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক যে ভাষায় মনের ভাব জানায়, তাহাই সে প্রদেশের মাতৃভাষা।

পূর্ব্বের মাতৃভাষা হয়ত অন্যভাষা—বর্ত্তমান মাতৃভাষা নয়। তাহা হইলে তুমি সেই ভাষায় জ্ঞানার্জ্জন করিতে পার, কিন্তু সাংসারিক চলিত কার্য্যকর্ম্মের জন্য তাহাকে মাতৃভাষা বলিয়া চালাইতে চাহিওনা। তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে পথে গিয়াছেন, এখন যদি সেইপথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে পথে চলিবার প্রয়াস পাইও না, তোমার চরণ ক্ষতবিক্ষত হইবে, তুমি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে না।

জোর করিয়া প্রণয় হয় না—বৈকুণ্ঠে ফুলের বাগান জন্মে না—এক গাছে অন্য ফল ধরে না। যেমন লঙ্কা ছুঁচে মোটা সুতা অমূলক, সোনার পাথর বাটী অসম্ভব, ফুলের মুখে ঝাল নাম অবান্তর, তেমনি একটা অচলিত ভাষাকে মাতৃভাষার স্থানে দেওয়া অপার্দিব। যেমন কিলাইয়া পাকাইলে কাঁঠাল ইচড়ে-পাকা হয়, অসময় প্রসব করাইলে ভ্রূণ হত্যা হয়, ব্যবহারপান্ননভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিচারাসনে বসাইলে বিচারবিভ্রাট হয়, সেইরূপ অপ্রচলিত ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলে মাতৃভাষা পঙ্গু হইয়া পড়ে।

ঐরূপ অস্বাভাবিক চেষ্টার ফল কি হইতে পারে, তাহা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিব। বঙ্গদেশীয় কোন যুবক পার্শী ও উর্দ্দু ভাষা শিখিয়া বাড়ী হইতে কিছু দূরে স্কুলের মৌলবী অর্থাৎ পার্সীশিক্ষক ছিলেন। তাঁহার মাতৃভাষা বাংলা হইলেও তিনি উর্দ্দু ছাড়া কথা কহিতেন না, হউক না কেন তাঁহার শ্রোতা উর্দ্দু ভাষায় অনভিজ্ঞ। তাঁহার অগ্রজ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, পরদিন তাঁহার বাড়ী ফিরিবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি বাড়ী না ফিরিয়া মৌলবী সাহেবকে বাংলায় চিঠি দিলেন, "আবশ্যক হওয়ায় আমি এখান হইতে আজমীর যাইতেছি—তোমার বড় ভাইজানকে বলিয়া দিবে।" সেই দিন বাড়ী হইতে কোন বাংলাভাষী আত্মীয় তাঁহার নিকট আসায় মৌলবীসাহেব উর্দ্দুতে তাঁহাকে বলিলেন, "বড় ভাই আজমের গেয়ে বড়া তাবীনে কহ, দেনা।" মৌলবীসাহেব শুদ্ধ উর্দ্দু বলিলেও শ্রোতা উর্দ্দু ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকায় বুঝিলেন, "বড় ভাই আজ মরে গিয়েছেন—বড় তাবির (অর্থাৎ তাইয়ের) বেকা দিতে হবে।" শ্রোতা মৌলবীসাহেবের কথার যে অর্থ বুঝিয়াছিলেন, বাটীতে আসিয়া তাহাই বলিলেন। গৃহকর্ত্তার মৃত্যুসংবাদে বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

মুখের কথায় মনের ভাব বিনিময়ের জন্যই মাতৃভাষা। মনোভাব প্রকাশ করিবার সময় বক্তা যদি এক ভাষায় একটি শব্দ ব্যবহার করে এবং শ্রোতা যদি অন্য ভাষায় তাহার অন্য অর্থ বুঝে—তাহা হইলে মনোভাব-বিনিময় কিরূপে হইতে পারে? মাতৃভাষার কোন শব্দ এক জিনিষকে বুঝায় এবং অন্য ভাষায় সেই শব্দ অন্য জিনিষকে বুঝায়। আদেশকারী প্রভু মাতৃভাষাভাষী পালনকারী ভৃত্যকে অন্য ভাষায় একজিনিষ আনিতে আদেশ দিয়াছেন; সে অন্য জিনিষ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তুমি কোন জিনিষ খরিদ করিবার জন্য অন্য ভাষায় তাহার নাম বলিয়া দূরস্থিত দোকানদারকে মূল্যসহ মর্ডার পাঠাইলে মাতৃভাষাভাষী দোকানদার মূল্য লইয়া মাতৃভাষায় সেই নাম যে জিনিষকে বুঝায়, তাহাই তোমাকে পাঠাইল। এরূপ ঘটনাও হইতে দেখিয়াছি। এইরূপ অসুবিধার জন্য যে প্রদেশের যা মাতৃভাষা তাহা ছাড়া অন্য ভাষা সেই দেশে চালাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

বাংলা দেশের মাতৃভাষা কি? অতি প্রাচীনকালে তাহা কি ছিল ঠিক জানা যায় না, তবে আর্য্যদের ভারতবর্ষে আসিবার পর প্রথম প্রথম তাহা সম্ভবতঃ সংস্কৃত ছিল। মূল সংস্কৃত হইতে সাধারণের মধ্যে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হইল এবং কালে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া বাংলা হইল। বাংলা দেশে মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে বাংলা ভাষাই হিন্দুদের মাতৃভাষা ছিল। মুসলমান বাংলায় আসিয়া হিন্দুদের মধ্যে বাস করিতে লাগিল এবং প্রতিবাসীদের সহিত আদান প্রদান করিতে লাগিল। মুসলমান বাহুবলে হিন্দুর রাজ্য অধিকার করিয়াছিল মাত্র, তাহার ভাষা জয় করিতে পারে নাই; তাহার ভাষা বাংলাই থাকিয়া গেল।

একটা পুরাতন জাতির মধ্যে নূতন জাতির বাসস্থান স্থাপিত হইলে পুরাতন জাতির সহিত মনোভাব প্রকাশের জন্য একটা ভাষা দরকার। কিন্তু মনোভাব প্রকাশের জন্য একটা নূতন ভাষা সৃষ্টি হইতে পারে না—হয় পুরাতন জাতি নূতন জাতির ভাষায় কিম্বা নূতন জাতি পুরাতন জাতির ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবে। কিন্তু বিস্তীর্ণ ভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে পোস্তের ন্যায় খুব কম সংখ্যক মুসলমান আসিয়া বাংলাদেশে অগণ্য হিন্দুর মধ্যে রাজত্বস্থাপন করিয়াছিলেন। অসংখ্য হিন্দুর মধ্যে মুষ্টিমেয় মুসলমান—এরূপ অবস্থায় হিন্দুর পক্ষে মুসলমানের মাতৃভাষা গ্রহণ করা কি সম্ভব? কখনই না।

প্রবাসের জন্ত মুষ্টিমেয় কতজন মুসলমানের স্বদেশ হইতে সঙ্গে চাকর আনা সম্ভবপর? হয়ত প্রত্যেক অবারোহী সৈন্ত অশ্বের জন্ত বাংলাদেশে সঙ্গে লস্কর আনিয়া থাকিবে কিন্তু এদেশে বাসস্থাপন করিবার পর সাধারণ হুকুম পালনের জন্ত এবং সংসারের অত্যাবশ্যকীয় তরকারি সংগ্রহের জন্ত অনেককে নিরুপায় হিন্দু চাকর রাখিতে হইয়াছিল এবং হিন্দু দোকানদারের নিকট জিনিসপত্র খরিদ করিতে হইয়াছিল।

বাংলাভাষী হিন্দু চাকর, হিন্দু দোকানদার, হিন্দু প্রতিবাসীর নিকট তাহাদের মনোভাব প্রকাশের আবশ্যক হইয়াছিল এবং উহাদের সহিত কথাবার্তা কহিয়া তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া উহাদের মাতৃভাষা বাংলা শিখিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া অনেক হিন্দু মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং আজকাল যেমন খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুগণ খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের মাতৃভাষা ছাড়িতে পারেন না, তখনকার মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হিন্দুগণও নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়িতে পারেন নাই। তাহাদের বংশধরগণও পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মাতৃভাষা সহজেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন; তাহাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া অন্ত ভাষা গ্রহণ করিবার কোন সঙ্গত কারণ হয় নাই। নবাগত মুসলমানদের সহিত আদান প্রদানের ফলে মনের উপযুক্ত ভাব প্রকাশক দুই চারিটি বিদেশী শব্দ মাতৃভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু তাহাতে মাতৃভাষা কলুষিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিভূষিত হইয়াছে।

আমরা দেখাইলাম যে মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে বাংলা দেশে যাংলা-ভাষাই প্রচলিত ছিল, মুসলমান আসিবার পরেও তাহা পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ হয় নাই। এবার দেখাই এ দেশের চলিত মাতৃভাষা কি তাহাই দেখাইব। আমি সরকারী কাজের উপলক্ষে বাংলার নানাস্থানে ঘুরিয়াছি, কিন্তু এ দেশের মুসলমানকে বাংলা ভিন্ন অন্ত ভাষা ব্যবহার করিতে খুব কমই দেখিয়াছি—এত কম যে হাজার করা পাঁচজন বলিলে অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু অত্যুক্তি নহে। অন্ত ভাষা ব্যবহার করে এরূপ মুসলমান, রাজধানী বা প্রধান প্রধান শহরে কিছু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু গ্রামের মধ্যে আরও কম। প্রধান প্রধান শহরেও যাহাদের মাতৃভাষা বাংলা নহে, তাহারা দুই-এক পুরুষের মধ্যে অন্ত প্রদেশ হইতে আসিয়া বাংলায় বাস করিতেছে।

আরও বাংলার মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাংলা, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, বাংলার মুসলমানের লেখা পুস্তক ও মুসলমান সম্পাদিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র। মুসলমান লেখকের মধ্যে খ্যাতনামা লিপিকরের সংখ্যা খুব কম—অধিকাংশেই প্রায় সাধারণ লেখক। মুসলমান সাধারণ লেখকের রচনার পাঠকও সাধারণতঃ মুসলমান। যে সকল মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা, তাহারাই সাধারণতঃ ইহার পাঠক। মুসলমান-সাধারণের মাতৃভাষা বাংলা না হইলে মুসলমানের লেখা সংবাদপত্র এতদিন বাঁচিয়া জীবিত থাকিত না এবং মুসলমানের লেখা পুস্তকও ক্রমাগত প্রকাশ হইত না। মুসলমান হকেরা ও বেসে বাংলার নানা জেলায় মুসলমান ছাত্র থাকে, তাহাদের সকলেরই মাতৃভাষা প্রায় বাংলা। কেহ যদি বলেন যে, বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা নহে, তাহা হইলে অন্ত কেহ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন, আমি বিশ্বাস করিব না। কেমন করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অবিশ্বাস করিব?

সুতরাং বাংলাই যে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননী। সুতরাং মুসলমানের সংস্কৃত শেখা দোষ হওয়া দূরের কথা, আমরা তাহার ভাল রকম ব্যুৎপত্তি লাভের জন্ত অত্যাবশ্যকীয়। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জাতীয় আরবী ভিন্ন অন্ত ভাষা শিখিতেও দোষ নাই এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে-কোন ভাষার জ্ঞান লাভ করিলে শিক্ষিতের ধর্ম্মের কোন হানি হয় না।

বিশেষতঃ হিন্দু আমাদের প্রতিবাসী; তাহাদের মাতৃভাষা আমাদেরও মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় আমাদের জ্ঞানলাভ জন্ত হিন্দুদের দেবদেবীর পরিচয় আমাদের সবিশেষ দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্য পুস্তকে হিন্দুদের দেবীর কথা আছে বলিয়া তাহা অপাঠ্য হইতে পারে না বরং সুপাঠ্য বটে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা, শ্রুতি, স্মৃতি, উপনিষদাদি প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থ পড়িলে আমাদের প্রতিবাসীর, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং পাতঞ্জলাদি দর্শন শাস্ত্রের পুস্তক পড়িলে প্রাচীন দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। শুধু সংস্কৃত সাহিত্য নয়, সৌরাণিক ধর্ম্ম এবং দর্শন ভাল রকম না জানিলে মাতৃভাষাতেও লেখক জ্ঞান লাভে সমর্থ নহে।

বিশেষতঃ পুরাকালে সাহিত্য ও দর্শনে হিন্দু জাতি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুর প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনের রসাস্বাদন করিবার জন্ত সমগ্র জগতের জ্ঞানপিপাসুগণ লালায়িত। যাহা মাতৃভূমির গৌরবের বিষয় তাহা হইতে মুসলমান বঞ্চিত থাকিতে চাহেন কি?

ভারতবর্ষকে মুসলমানের মাতৃভূমি বলিলাম বলিয়া কোন মুসলমান দোষ গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদের অনেকের পূর্ব্ব পুরুষের মাতৃভূমি হয়ত ভারতবর্ষ ছিল না কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহাদের বাসস্থান—হয়ত জন্মস্থানও ভারতবর্ষ বটে, সুতরাং ভারতবর্ষকে তাঁহাদের মাতৃভূমি বলাই সঙ্গত। হিন্দু ছাড়া অন্যান্য কোন কোন জাতিও জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলে। সুতরাং ভারতবর্ষ কিম্বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ মুসলমানের জন্মভূমি হইলে তাহাকে তাহার জন্মভূমি বলিলে দোষ হইতে পারে না।

কোন কোন লোকের এমন রুচিবাই আছে যে, তিনি হাজার চেষ্টা করিয়াও অপবিত্র হয়েন না, কিন্তু সামান্ত কারণে বা বিনা কারণে তাঁহার যাহা ছোঁয়া অশুচি হইয়াছে মনে করিয়া দিনের মধ্যে বিশ বার স্নান করিয়া শুচি হইয়াছেন মনে করেন। মুসলমান ধর্ম্ম এমন বাতিকগ্রস্ত হইতে পারে না যে, মাতৃভূমিকে বন্দনা করিলেই "প্রাণ খোল—প্রাণ খোল" বলিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবে। মুসলমানধর্ম্ম কাচের গেলাস নয় যে ঢেলা মারিলেই ঝাঝিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

"বন্দেমাতরম্" গানের উপরের চারি ছত্রে কোন হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ মুসলমান ধর্ম্মের আত্মসম্মান রক্ষা করিতে শুধু উপরের চারি ছত্র গ্রহণ করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া

মেঘের খেলা

শিল্পী—নীরোদ রায়, পৌহাটী

(উপরে) যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীর মন্ত্রী বিদ্যালক্ষ্মী পণ্ডিত প্রেমে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ ও চার্লস্ ইউনিভার্সিটির
প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রফেসর লেসনি (বামে) কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন
(নীচে) মাদাম হরথি হের্ হিটলার সহ সালেটিনবুর্গে হের্ রিবেনট্রপ প্রভৃতি কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন

সম্পূর্ণ প্রস্তাবই করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমান ও হিন্দু উভয়েই তাহাতে স্বীকার না হওয়া গর্হিত কাজ করিয়াছেন।

কোন কোন মুসলমানের মতে একত্র আসা ও খাওয়া অন্য কোন বন্ধনীর নহেন। সত্য বটে একত্র আসাই সকলকে প্রতিপাদের দোষা কিন্তু সাধারণ বন্ধন সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। মুসলমানের মুরুব্বন এবং হিন্দুকে ভাঙ্গা নষ্ট করিয়া নমস্কার করিতে কোন দোষ নাই, আর মাতৃভূমিকে বন্দনা করিলেই বহুবিধ ভঙ্গ কাজ করা হইল—এ কেমন কথা? যাহাদের রাজনৈতিক মত আছে তাহারা দলগতভাবে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিবেন না—ইহারা অনেক "বন্দে মেতে—বন্দে মেতে" বলিয়া চিৎকার করিয়া গলা ফাটাইতে থাকেন তাহাদের উদ্দেশ্য ভাল নহে। আলিগড়ের মুসলমান ছাত্রদের কি বন্দেমাতরম নাই? আমরা তাহাদের সমবাহারের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা বন্দেমাতরমকে বন্ধ করিতে না শিখিয়ে বেরিয়েন্টেড হইতে পারিব না এবং বেরিয়েন্টেড হইতে না পারিলে স্বরাজের উদ্ধার হইবে না।

তোমার ছোঁয়ায় তনু শতদল উঠলো সোহাগে দুলে

শ্রীঅনুরাধা দেবী

উনিশ বছরে এত কথা আমি শিখেছি কেমন ক'রে?
মেয়েরা ওসব আপনি শেখে গো, নয় তো কেতাব প'ড়ে।
এগারো ছাড়িয়ে বারোর কোঠায় বাড়ায় যেমনি পা,
না জানি কিসের ছোঁয়ায় শিউরে উঠ্‌লো অমনি গা।
ধীরে ধীরে সারা দেহটা ছাপিয়ে মালতী লতার মত,
সবুজ শাড়ির আঁচল আড়ালে ফুট্‌লো কমল কত!
বালিকা তখন নই আর আমি, বুঝতে শিখেছি নিজে;
পলে পলে মন ভাঙে গড়ে কত অজানা স্বপন কি যে!
তার আগে সেটা কখনো ভাবিনি, কখনো জাগে নি মনে;
নানারূপে তাই ভেসে ওঠে বুকে সতত সংগোপনে।

পনেরো যখন হয় নি পূর্ণ, চোদ্দ হ'য়েছে শেষ,
হঠাৎ মনের কল দোলায় লাগলো সুরের রেশ।
ছাপিয়ে উঠ্‌লো গায়ে পায়ে সে কি অভিনব অবয়ব;
বুকের তলায় মধুর তোলে নানা খাঁটি কথারব।
কত কথা জাগে, কত ভাবভাষা, কত না জানার ছায়া;
ভয়ে যায় মন। হাতছানি দেয় অচেনা শিহর মায়া!
অতি অকারণ কোলাহল ক'রে ফিরেছি আপন মনে,
সোনালি আশার প্রদীপ জ্বলেছে নিরালা নিথর ক্ষণে।
পুতুল খেলায় সখীদের নিয়ে ছিলেম আপনা ভুলে,
অবাধ উতল হাসি কলরবে খেয়েছি দোঁহা ভুলে।

তার পর যেন হঠাৎ কখন আমার আঁখির পাতে,
চুম্বনে দিলে প্রেমের কাজল সুখশয্যার রাতে।
শুধু চাহিতে দিলে মনের দেউলে শত শত দ্বার খুলে',
তোমার ছোঁয়ায় তনু শতদল উঠ্‌লো সোহাগে দুলে।

ইস্ ইস্, থামো, অনেক হ'য়েছে, চাইনে পুরস্কার।
নোবেল প্রাইজ? সামলালো দায়, তোমায় নমস্কার!
পাকুরা ক'খানা ভেঙে যাবে ওগো, দিওনা অমন জোর,
এবার একটু ঘুমো ও লক্ষ্মী, রাত হ'য়ে এলো ভোর।

ষষ্ঠ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের ধারা

শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ

প্রবন্ধ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্বর্ণময় দিনগুলি অতীত হইয়া গেল। মগধের রাজসিংহাসন হইতে বিচ্ছুরিত রশ্মির মোহিনী মায়া আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তুর্কি এবং কিরণগুলির একতা রক্ষা করিতে পারিল না, গৌরব রবি অস্তমিত হইল।

ইতিহাসের প্রত্যেক ফলকে বাংলা দেশ সৌষ্ঠবশীলকরোজ্জ্বলে যে লিপি লিখিয়াছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহারই এক অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। অতীত কাল হইতেই বিক্ষিপ্ত উপাদানসমূহে বাংলার যে ইতিহাস পাওয়া যায়, বিভিন্ন দেশের শতানুগতিক ইতিহাসের মত সে যেন রাজা আর সম্রাটের ইতিহাস নহে। দুর্জয় গতিতে রঘু তাহার দিগ্বিজয়ী বাহিনী লইয়া আসিয়াছে, বাধা দিয়াছে বঙ্গের জনসাধারণ।[১] কবির রচিত আলেখ্য ইতিহাসের ছায়াপাত অল্পকল্প বলিয়া মনে হইলেও আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ী রাজ চক্রকে চূড়ান্ত পদ্ধতিতে প্রতিহত করিবার প্রয়াসে বঙ্গের জনসাধারণ ইতিহাসে প্রখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের সমরাভিযানের তরবারিকে উপেক্ষা করিয়া সমতট আজও বিশিষ্ট। হিমাচলের তুহিনবিগলিত ধারায় পবিত্র দেহ বঙ্গবাসী সন্তানসন্ততি এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারায় বাসুদেব করিয়া যুগে যুগে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সামরিক পরাধীনতা, তমসাচ্ছন্ন রাত্রি ও প্রাতুষের কুহেলিকারাশি ভেদ করিয়া সুসন্ধানপথের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ জ্যোতির্ময়ী রূপে নির্গত হইয়া আসিয়াছেন।

সার্ধ শতবর্ষের পরাধীনতার পর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী এবনই একটি যুগ। পশ্চিম রাজ্য-সীমান্তের বহিরাগত বৈরীদলের বারম্বার আক্রমণে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত পতিত ধূলিলুণ্ঠিত ভাগ্যলক্ষ্মীকে সাময়িকভাবে উদ্ধার করিলেও আর অধিক দিন সে সাম্রাজ্য টিকিতে পারিল না। বাংলা তাহার সমস্ত নিজস্ব সত্তা লইয়া এত কাল স্বমহিমায় বর্তিয়াছিল, এইবার তাহার সুযোগ আসিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম তপন উদিত হইয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্তগমবার্তা ঘোষিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কুলুমেলের নবজীবনের বাণীও ঘোষণা করিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তমান দিনগুলিতে বাংলার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের সঙ্গে এযুগের ইতিহাসের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য রহিয়াছে। বিদেশাগত রাজপুরুষগণই বাংলার সমভূমিকে নিজস্ব করিয়া লইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসে এই দেশকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন।

গুপ্তসাম্রাজ্যের নাগপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন বঙ্গের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান মহারাজ বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসন।[২] ৫০৭-৮ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত এই তাম্রশাসন হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্যালিক মোহপাশ মুক্ত হইয়া বাংলাদেশের স্বপ্রতিষ্ঠা হইবার প্রচেষ্টা ফলবতী হইয়া উঠিতেছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের উপরিকগণের মহারাজ উপাধি গ্রহণ হইতে যেমন সুদূর বঙ্গের গুপ্তাধিকারের শিথিলতা অনুমিত হইতে পারে, তেমনি মহারাজ বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনে তাঁহার কাম্যোজ অধিরাজ বলিয়া স্বীকৃত হওয়াও গুপ্ত মগধ সিংহাসনের বশ্যে অধিকার লোপ বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে। মূল গুপ্তবংশের অবস্থা এসময়ে নিতান্তই শোচনীয়। ৫১০ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত ইরাণের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তদানীন্তন গুপ্তসম্রাট ভানুগুপ্ত রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধে বিব্রত ছিলেন।[৩] প্রায় সমকালে পূর্ব্বদেশে গুপ্ত নামা জনৈক মহারাজের অধিরাজরূপে গণ্য হওয়ায় মূল বংশের সহিত বৈন্যগুপ্তের সম্বন্ধ নির্ণয় অধিকতর প্রমাণ সাপেক্ষ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু গুপ্তান্তক নামে হইতে তাঁহার গুপ্ত রাজবংশের সহিত সম্পর্ক অনুমান বিশেষ প্রমাণক বলিয়া মনে হয় না।

এতদ্ সম্পর্কে অদ্যাবধি প্রাপ্ত প্রমাণাবলী বাতীত একখানি বৌদ্ধ অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক গ্রন্থ বিশেষ আলোক নিক্ষেপ করিতেছে। পুথিখানির নাম আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প। ইংরেজী ১৯২৩ খৃঃ অব্দে ত্রিবাঙ্কুর গ্রন্থমালায় আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প প্রথম প্রকাশিত হয়।[৪] অধুনা পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন তিব্বত হইতে উহার একখানি তিব্বতীয় অনুলিপি সংগ্রহ করিবার পর স্বর্গত পণ্ডিত জয়স্বাল কর্তৃক An Imperial History of India নামীয় একখণ্ড গ্রন্থে উহার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিগুলির সমন্বয়ে একখানি ইতিহাস রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।[৫] আচার্য্য জয়স্বালের প্রচেষ্টা হইতে গ্রন্থখানির বিপুল ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার কথা অনুভূত হইলেও তাঁহার দেওয়া সকল ইঙ্গিতই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

১। বঙ্গান্ উদ্ধায়তসমনেতানৌ সাধনোদ্যতান্
নিচখানজয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোন্তরেষ্বসূন্।

২। Fleet : Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. iii., p. 140.

৩। প্রবাসী, ১৩৪০, Indian Historical Quarterly, 1930 pp. 45-60.

৪। Mazumdar ; Early History of Bengal.

৫। Trivendrum Sanskrit Series, No. lxxxiv, pp. 579-656.

আধুনিক ঐতিহাসিক ব্যবহারের পক্ষে গ্রন্থখানি বহুল দোষমুক্ত সন্দেহ নাই। বস্তুত সর্ব্বাংশে উল্লিখিত বিবরণে বর্ণিত বা কিছু ঐতিহাসিকতা থাকিয়া থাকে তাহাও বর্ণনৈতিক ইন্দ্রজাল ও গ্রন্থকারের নানাবিধ দুর্জ্ঞেয় বিবৃতিভঙ্গিতে এমন আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে, কোনও রূপ উপকরণকে প্রকৃত ইতিহাস সৃষ্টির পর্য্যায়ে ব্যবহার করিতে হইলে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত মন্থব্যাদি করিতে হইবে, নচেৎ বিষম ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু তৎকালীন ইতিহাস রচনার উপাদান যেহেতু নিতান্তই সামান্য, কয়েকখানি তাম্র ও শিলালেখ, অসংখ্য অর্থহীন মুদ্রা, বৈদেশিক পর্য্যটনকারী ভ্রমণকারীগণের রচিত খানকয়েক ইতিবৃত্ত আদি যেহেতু কোন সুসম্বদ্ধ ইতিহাসের পর্য্যাপ্ত উপকরণ হইতে পারে না, সেই জন্যই খেয়ালী গ্রন্থকারের দুর্জ্ঞেয় ইঙ্গিতের ও বর্ণিত আখ্যায়িকাসমূহের আপাতদৃষ্ট অসম্বদ্ধতার জন্য একেবারে উপেক্ষা করিয়া দেওয়া সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।[১]

বিশেষত গুপ্তরাজ-পণ্ডিতের শেষে মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে যেখানে মগধ হইতে বিভিন্ন গৌরগণের পলায়ন হইয়া উঠিবার বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, উহা বিশেষ মূল্যবান বলিয়াই প্রতীত হয়। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মঞ্জুশ্রীমূলকল্প হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহাতে প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান রহিয়াছে।

রাজন্যসমূহকে উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহাদের নামের আগুকর কিম্বা প্রতিশব্দ মাত্র ব্যবহারের দরুণ তথ্যান্বেষীদিগকে বিশেষ বিব্রত হইতে হয়। এই হেঁয়ালিপনাকে ব্যবহার মূলকল্পের অন্যতম ত্রুটি। গুপ্ত-রাজবংশ-পন্থী অনেক স্থানে "উঁ"-তে আসিয়া গ্রন্থকার বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে এক অভিনব বিবরণ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—

ততঃ পরেণ বিখ্যাতেষ্বাদ্যন্তোক্তেষতে।
মহাবিক্রম নাম্নেহো গৌড়া রৌদ্র চেতসঃ॥[২]

গৌড় কোন্ দেশ? গৌড়গণ কাহারা? তৎপর ঈশানবর্ম্মার[৩] হাড়াহাগ্রামে প্রাপ্ত শিলালেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, গৌড়গণ সাগরতীরের অধিবাসী ছিলেন।

তৎপর সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উচ্চাভিলাষী পরাক্রান্ত গৌড়সম্রাট শশাঙ্কের অধীনে গৌড়গণ পশ্চিমে সুদূর কান্যকুব্জ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ-দেশান্তর্গত আধুনিক গঞ্জাম পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল। প্রায় এই সময় হইতেই সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী জাতীয় জীবনের এক নবচেতনার অভ্যুত্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। যেন একটা নিদ্রাচ্ছন্ন জাতির মহাজাগরণ, জীবনের সর্ব্বতোমুখী প্রকাশগুলির বিস্ময়কর স্ফুরণ। বহুকের ভারতবর্ষ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব-প্রতিষ্ঠার স্ফুরণে বাংলা যে জাতীয় ধারায় আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহারই শক্তিতে রচিত হইয়াছিল বৃহত্তর বঙ্গদেশ, বিপুল সাম্রাজ্য, অপূর্ব্ব শিল্প, বৈচিত্র্যময় সাহিত্য ও অচিন্তনীয় নৌবাণিজ্য। সাহিত্যের গৌড়ী রীতি, লিপির গৌড়ীয় ধারা, বাস্তু, ভাস্কর্য্য ও বিশেষ করিয়া মৃন্মূর্ত্তিকাময় শিল্পে বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশের মত রাজনীতিতেও বাংলার প্রতিভার এক বিচিত্র প্রকাশের সন্ধান পাওয়া যায়। যেখানে অতিক্রম করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহ ও সাম্রাজ্য বিস্তারে জাতি যে অধিকতর প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল সংশ্লিষ্ট রাজন্যগণের রাজনৈতিক খলিলগুলি হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং সমসাময়িক যুগে গৌড় বলিতে শুধু গৌড় বিষয়কে নির্দ্দেশই বুঝাইত না। এতাবৎকাল প্রমাণসহকারে ইতিহাসে সর্ব্ব প্রথম শশাঙ্ককেই গৌড়দেশের রাজা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।[৪] কিন্তু ইউয়ান-চোয়াঙ্গের মতে শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের রাজা।[৫] আবার তাঁহারই মতে কর্ণ-সুবর্ণ বর্ত্তমান বাংলার ভৌগলিক পরিবেশের মধ্যে ৭৪০ লি পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র—সমুদ্রের সহিত কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের সুদীর্ঘ ব্যবধান সমতট ও তাম্রলিপ্তি রাজ্যান্তর্গত। শশাঙ্ক নিশ্চয়ই তাম্রলিপ্তিরও অধীশ্বর ছিলেন। তাহাড়া শিলালেখ হইতেও জানা যায়, গৌড়গণের অধিকার সমুদ্রতীরের পশ্চাদ্ভূমি পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। গৌড় নামীয় কোন রাজ্যের অস্তিত্বের কথা চৈনিক পরিব্রাজক জ্ঞাত ছিলেন না, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বাংলাদেশের চারিটি বিভাগের কথাই জানিতে পারা যায়, পূর্ব্বোল্লিখিত কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট ব্যতিত চতুর্থটি পুণ্ড্রবর্দ্ধন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্কের অন্যতম রাজধানী বলিয়া মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে উল্লিখিত হইয়াছে।[৬] মাত্র সমতট সম্পর্কেই কিঞ্চিৎ সন্দেহ ব্যতিত বলিতে পারা যায় যে, কল্পের তদানিন্তন সমগ্র ভূভাগই শশাঙ্কের অধীন ছিল ও সমতট গৌড়নামে খ্যাত ছিল। সম্ভবত এই চারিটি (স্বয়ং শাসিত?) সুসংহত সমন্বিত বিশাল বঙ্গদেশই ছিল বৃহত্তর গৌড়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে ইউয়ান-চোয়াঙ্গের নিকট গৌড়সেনের অস্তিত্ব অজ্ঞাত। এই হেতু মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর 'গৌড়তন্ত্র' এই নামে গৌড়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।[৭] কেন্দ্রীয় শাসনকর্ত্তার মৃত্যুর পরও বাংলায় চৈনিক পরিব্রাজক কোন অরাজকতা দেখেন নাই, কিন্তু দেশ হর্ষবর্দ্ধনেরও অধীনস্থ হয় নাই। এই সকল বিবরণ হইতে ইহা মনে করিলে হয়ত বিশেষ ত্রুটি হইবে না যে, গৌড় বলিতে সমগ্র বঙ্গীয় রাজ্যসমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত দেশ, রাজনৈতিক কারণে যাহারা কোনও এক নেতার অধীনে একত্রিত হইয়াছিল। ইহাই মূলকল্পের গৌড়তন্ত্র, এবং সেই নেতার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই হেতুই সমগ্র দেশে অরাজকতা দেখা দেয় নাই। এই অনুমান সত্য হইলে রাজনৈতিক চেতনার দিক হইতেও বাংলার এই যুক্তরাষ্ট্র (federation) এক অচিন্তনীয় ব্যাপার বলিয়া স্বীকার না করিবার উপায় থাকিবে না।

১। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প, Trivendrum, পৃ: ৬৩১।

২। Epigraphica Indica, vol. xiv, p. 117.

৩। Dr. R. C. Majumdar: Early History of Bengal; স্বর্গত. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার ইতিহাস। রায় রমাপ্রসাদ চন্দ্র বাহাদুরের গৌড়রাজমালা।

৪। Wyatters on Uan-chewang.

৫। আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে (ত্রিবান্দ্রাম) পৃ: ৬৩৮। ৬। ঐ, পৃ: ৬৬৬।

গুপ্তাধিকৃত পৌড়মণ্ডলের মধ্যে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি-আদি হইতে জাত ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের কালনির্দ্ধারণের জন্য, অক্ষরতত্ত্ব বিচার ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। বৈন্যগুপ্তের তাম্রলিপির আবিষ্কার স্থলের (ত্রিপুরা জিলার নিকটস্থ শুলাইপর গ্রাম) অবস্থিতি হইতে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গীয় রাজা বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন।[১] নালন্দায় বৈন্যগুপ্তের নামাঙ্কিত মুদ্রা কতদিন হইল আবিষ্কৃত হইলেও ইহার পাঠ অদ্যাবধি প্রকাশিত না হওয়ায় ইহাকে নালন্দা পর্য্যন্ত বৈন্যগুপ্তের রাজ্যের বিস্তৃতির প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে নাই। কিন্তু অদ্য এই প্রবন্ধের খসড়া রচিত হইবার পর মহাস্থানে আবিষ্কৃত মহারাজ গোপচন্দ্রের যে তাম্রশাসনের পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে,[২] উহাতে এ যুগের ইতিহাসে এক নূতন আলোকসম্পাত হইয়াছে। এই শাসনে উল্লিখিত বন্ধমান বিষয়াধিপতি সামন্তরাজ বিজয় সেন ও বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনে দূতকরূপে বর্ণিত মহারাজ বিজয় সেন একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। নালন্দায় আবিষ্কৃত শিলমোহর, মহাস্থান তাম্রশাসন ও বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসন হইতে বৈন্যগুপ্তকে সমগ্র বঙ্গদেশ (পৌড়) ব্যাপী অধিরাজ বলিয়া মনে করা আর কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত পাজিটারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারে ঘরিদপুর তাম্রশাসনোক্ত মহারাজাধিরাজগণের কাল খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থাংশ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।[৩] উঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী অন্য কোনও রাজার নাম আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এই অনুমান নিভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। পণ্ডিত ডাঁহ্ন বনার্জ্জির মতে ইঁহারা নিতান্তই পূর্ব্ববঙ্গীয় নৃপতি ছিলেন।[৪] কিন্তু ডাঁহ্ন বনার্জ্জি ইঁহাদের মধ্যে গোপচন্দ্র ও মঞ্জুশ্রীমূলোক্ত গোপাখ্যকে এক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।[৫] মূলকল্পোক্ত গোপাখ্য (৩১৭ পৃঃ) ও গৌড়রাজ গোপালক (৩১১ পৃঃ) একই ব্যক্তি। গৌড়-রাজ গোপালক, যে 'অ'কারান্তকে শৈশবে কক্ষে করিয়া রাখিয়াছিলেন,[৬] তাঁহার মৃত্যুর পর অরাজকতার কালে সেই শিশু তনৈক ভাববর্ত্ত কর্ত্তৃক দূরে চলিয়াছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর 'অ'কারান্ত কর্ত্তৃক মগধের সিংহাসনাভিষেক ঘটনা কালে মূলকল্পে তাঁহাকেই গোপাখ্য বলিয়াছিলেন। ডাঁহ্ন বনার্জ্জির মত ও মঞ্জুশ্রীমূলের প্রমাণানুসারে গোপচন্দ্রকে গৌড়েশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অদ্যকার মহাস্থান শাসন আবিষ্কারের পর তাঁহাকে আর কেবল মাত্র পূর্ব্ববঙ্গীয় রাজা বলিয়া বর্ণনা করা চলিবে না।

গোপচন্দ্র[৭] যে ধর্ম্মাদিত্যের পর তাঁহারই রাজ্যাংশের অধিকারী হইয়াছিলেন ইহাতে মতদ্বৈধ নাই এবং অনেকের মতে ইঁহারা একই বংশজাত।[৮]

ধর্ম্মাদিত্য ও বৈন্যগুপ্তের মত প্রায়ই মনে হয় মহারাজরূপেই অভিহিত ছিলেন এবং পণ্ডিতগণের মতে তিনিই প্রথম গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশাংশের উপর মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া সার্ব্বভৌম রাজারূপে পরিচিত হইবার প্রয়াস পান। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বৈন্যগুপ্ত করিদপুর শাসনাবলী হইতে জাত মহারাজাধিরাজগণ ও শশাঙ্ক একই বংশজাত।[৯] মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে আবিষ্কৃত গোপচন্দ্রের শাসন হইতে মহারাজ বিজয় সেনের নামের সাদৃশ্যকে অন্তত গোপচন্দ্রের সহিত বৈন্যগুপ্তের নিকট-সম্বন্ধ প্রমাণিত হইতেছে। ভবিষ্যতের আবিষ্কৃত প্রমাণাবলীতে ডক্টর ভট্টশালীর অনুমান যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে ধর্ম্মাদিত্যের নাম 'গোপালকের' পূর্ব্বপামী গৌড়-রাজগণের নামের প্রথম আক্ষরসমূহ হইতে অনুমান করা না গেলেও লিপিকরপ্রমাদে 'ধ'—'গ' এ (গোপালকের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি) পরিণত হইবার সহজ সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা যায় না।

ধর্ম্মাদিত্য তিন বৎসর মহারাজরূপে রাজত্ব করিবার পর কোনও সময় মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক প্রয়াসের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায় যে, উহা বস্তুত আকস্মিক নহে। মহারাজাধিরাজ ভানুগুপ্তের পর আর কোনও গুপ্তনামা মহারাজাধিরাজের উল্লেখ একমাত্র দ্বিতীয় গুপ্তরাজ বংশের বিষ্ণু অন্য কোনও দলিলে পাওয়া যায় না। মূল রাজবংশের তিনিই বোধহয় শেষ সকলরাজ একচ্ছত্র নরপতি। ৫১০ খৃঃ অব্দের পরে কোনও সময়ে তাঁহার মৃত্যুর পর হয় ত বা তনাইনদর তাম্রশাসন হইতে জাত বৈন্যগুপ্ত মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। মূলকল্পের মতে জনৈক জনশ্রিত রাজার নামের আক্ষর ছিল 'ত'।[১০] তিনি চিরঞ্জীব ছিলেন। "ভানুগুপ্ত কি বার্দ্ধক্যহীনতাবশত বৈন্যগুপ্তকে প্রতিভূরূপে পূর্ব্ব দেশ শাসন করিতে দিয়াছিলেন? গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর দুর্জ্জয় কেশ যশোধর্ম্মদেব যখন বিজয়াভিযানে লৌহিত্য[১১] পর্য্যন্ত ভূভাগ বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন সেই ৫৩০ খৃঃ অব্দে সম্ভবত ধর্ম্মাদিত্যই বৈন্যগুপ্তের মত পৌড়ুদেশের সামন্তরাজ ও উপরিকরূপের অধিরাজ ছিলেন। এই চরম অভিযানের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি নিশ্চিতই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, গৌড়দেশীয় নৃপতিগণ বৈন্যগুপ্তের সময় হইতেই প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বাধীন হইয়া পড়িলেও এতকাল পূর্ণ সার্ব্বভৌম উপাধি গ্রহণ করেন নাই, এইবার ছত্রভঙ্গি যাগযজ্ঞে সম্ভবত মিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে ইঁহারা মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিতে আর কোন অন্তরায়

১। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক—The History of North-Eastern India. 182-3.

২। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৬, প্রথম সংখ্যা।

(শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদার)

৩। Ind. Ant., 1910. ৪। কাক-Hist. of N.-E. India. ১৮৭, ৫। ঐ, ৭২, ৬। মূলকল্প ১৩৭৭ ৭। Ind., Ant 1910. বসাক—Hist. of N.-E. India. ১৮১.

৮। Epigraphica. Indica . vol.No. 11, 84.

৯। Epigraphica. Indica. Vol. xviii, II, p. 84.

১০। মূলকল্প, ৩৩১।

১১। Fleet : C. I. I., vol. iii.

দেখিলেন না। যশোধর্ম্মদেব লৌহিত্য তীর পর্য্যন্ত অভিযান করিলেও এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের দত্তপালকে উৎপাত করিলেও সম্ভবত ধর্ম্মাদিত্যের মূলশক্তি-কেন্দ্রে আঘাত করেন নাই এবং দিগ্বিজয়ান্তে দেশে প্রত্যাগত হইয়া যখন তিনি ইয়াশের প্রস্তরস্তম্ভে দিগ্বিজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করাইতেছিলেন তখনই হয়ত সমগ্র বঙ্গদেশকে তাঁহার প্রভাব মুক্ত করিয়া ধর্ম্মাদিত্য আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষিত করিয়াছিলেন।

এই সূত্রে দুইটি কথা বলিতে হইবে। বিষ্ণুগুপ্ত নামীয় যে মুদ্রার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্তবংশীয় রাজগণের মুদ্রার তালিকায় তাঁহার বিক্রমচন্দ্রাদিত্য পাঠে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মাদিত্যও হইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অধুনা ধর্ম্মাদিত্য নামীয় গৌড়-রাজের কথা জানিতে পারায় নূতন করিয়া মুদ্রার লেখাই পাঠ করিলে উহাকে স্পষ্টই ধর্ম্মাদিত্যপড়িতে ইচ্ছা হয়। মনে হয়, ধর্ম্মাদিত্য সার্ব্বভৌম উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজনামে মুদ্রা অঙ্কিত করাইবার কালে তাঁহার গুপ্ত নাম বিষ্ণুগুপ্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন ও যশোধর্ম্মের প্রভাব হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনকে মুক্ত করিয়া আপনার কোনও সন্তানকে তথায় উপরিক মহারাজরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পঞ্চম দামোদরপুর তাম্রশাসনের লেখকগণ সম্ভবত নূতন সম্রাটকে তাঁহার গুপ্ত নামেই অভিহিত করা সমীচীন মনে করিয়াছিলেন, কারণ এতদ্বৎ সাক্ষাৎভাবে গুপ্ত সম্রাটগণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় দামোদরপুরে উহাই প্রচলনে (tradition) দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সম্মিলিত গৌড়দেশের ধর্ম্মাদিত্যই সম্ভবত প্রথম সম্রাট। ৫৩৩ খৃঃ অব্দের দুর্য্যোগের পর প্রকৃতপ্রস্তাবে বঙ্গে অধিকার রক্ষা করিবার মত কোনও কেন্দ্রীয় গুপ্ত সম্রাটের অস্তিত্ব সম্ভবে কিম্বা আরও পশ্চিমে কোথাও ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সুতরাং ধর্ম্মাদিত্যের মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণের সময় হইতেই বাংলার এই নবযুগের সূত্রপাত হইল। এই নবীন বাংলাই উত্তরোত্তর শ্রী ও সম্পদসমন্বিত হইয়া উত্তরকালে শশাঙ্কে কান্যকুব্জ ও ধর্ম্মপালে সুদূর গুর্জ্জর পর্য্যন্ত সুবিশাল গৌড় সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। মধ্যে সাময়িক ছেদসম্বলিত বাংলার এই দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাসে এক ও অখণ্ড বাংলার সর্ব্বতোমুখী স্ফুরণের একেক ইতিহাস মাত্র।

দ্বিতীয় তাম্রশাসন ও ৫৪৩ খৃঃ অব্দের দামোদরপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অনুসরণে প্রাপ্ত সুসম্বদ্ধ রাজ্যশাসনপ্রণালী ভিন্ন ধর্ম্মাদিত্য সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। সম্ভবত মহারাজাধিরাজ উপাধিগ্রহণ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের এক স্বল্প উত্তরাধিকার-সূত্রে (?) গোপচন্দ্রে সংক্রামিত করিয়া দীর্ঘকাল স্বচ্ছন্দে শাসনভার বহন করিয়া ৫৫০ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি কোনও সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

গোপচন্দ্র সম্ভবত ধর্ম্মাদিত্যের পুত্র বা পুত্রস্থানীয় উত্তরাধিকারী। গুপ্তনাম ও বিক্রমের মোহ গৌড়-সম্রাট-পরিবার হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ পরবর্ত্তী মাগধ গুপ্তবংশের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা আদিত্যসেনেরও ঐ মোহ ছিল না। গুপ্তবংশাবতংস হইলেও গৌড় সম্রাটগণ জন্মভূমি গৌড়দেশকেই আপন মাতৃভূমি জ্ঞানে সেবা করিয়া গিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শূরে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবগণের মতই তাঁহারা বাঙালী, তথা গৌড়ীয় হইয়া গিয়াছিলেন।

গোপচন্দ্রের শাসনকালে বাংলায় কোন অন্তর্বিপ্লবের সংবাদ পাওয়া যায় না, অন্যদিকে সম্ভবত তাঁহার রাজ্যকালেই সাম্রাজ্যবিস্তারের স্বপ্নে বিভোর হইয়া গৌড়গণ প্রতিবেশী মৌখরী রাজ্যগুলি আক্রমণ করিয়াছিল।[১] আক্রমণ ফলপ্রসূ হইল না। শ্রেষ্ঠ মৌখরী প্রস্তরখণ্ডে শায়িত হইয়া আসিল, কিন্তু নবোন্মেষিত যৌবনের দুর্জ্জয় শক্তি অবসন্নিত হইল না, গৌড়ী সেনা সুদূর চালুক্য সাম্রাজ্যের[২] দ্বারদেশে করাঘাত করিয়া দক্ষিণ রাজ-পুরুষকে ত্রস্ত করিয়া তুলিল। এ সংগ্রামে হয়ত বা মাত্র দিগ্বিজয়ের লোভ, হয়ত বা উদ্ভূত যৌবনের স্রোত রোধ করিতে না পারিয়া একটা কিছু করিবার মোহে—কে জানে হয়ত বা কোন ফল লাভও হইয়াছিল, গ্রহণযোগ্য প্রমাণাভাবে যাহা আমরা বলিতেও পারি না।

ইহাই ইতিহাস। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের মতে গোপচন্দ্র একজন স্বপ্নদ্রষ্টা নরপতি।[৩] দীর্ঘ একবিংশ বৎসরের রাজত্বের পর আনুমানিক ৫৫৭ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সমাচারদেব মনোঙ্কিত চতুর্থ দামোদরপুর তাম্রশাসন ও কতিপয় মুদ্রাব্যতীত তাঁহার ইতিহাস রচনার আর কে কত উপকরণ না মিলিলেও অক্ষর বিচারে মনে হয় তিনি গোপচন্দ্রের পরে উত্তরাধিকারী সূত্রে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন—হয়ত বা গোপচন্দ্রের পুত্র বা পুত্রস্থানীয় কোন আত্মীয়। তিনিও দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন—তাম্রশাসন হইতে তাঁহার রাজ্যকালেও কোন অন্তর্বিপ্লবের সংবাদ পাওয়া যায় না।

আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গোপচন্দ্রের পরবর্ত্তী ইতিহাসে এক নূতন আলোকসম্পাত করিতেছে। সেই আলোকে গোপচন্দ্রের পর গৌড়মণ্ডলে এক বিপ্লবের সন্ধান পাওয়া যায়—যে বিপ্লব বৈদেশিক আক্রমণজাত।

গোপচন্দ্রের রাজত্বকালে কোন গোলযোগের সন্ধান না পাইলেও—তৎকর্ত্তৃক এক রাজপুত্রের বৈশবে স্বল্প ঘটিয়াছিল আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

আক্রমণকারী রাজার নাম মূলকল্প হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। ঐ পুস্তকে প্রভাবিষ্ণু নামী বহু বীরের উল্লেখ হইতে মনে হয়, উহা একটি উপাধি কি গ্রন্থকারের প্রিয় কোন বিশেষক। প্রভাবিষ্ণু গৌড় আক্রমণ করিয়া ভাগবতকে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলে নবাভিষিক্ত রাজা ভাগবত গোপচন্দ্র কর্ত্তৃক আবদ্ধ শিশুকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু ভাগবতের অদৃষ্টে অধিক দিন

১। ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী: Political History of Ancient India.

২। Allen Catalogue of the Gupta Coins.

৩। Ep. Ind., vol. xiv,—p 110. ff.

৪। V. A Smith: Early History of India.

৫। মূলকল্প—৯৩।

গৌড়রাজ্য ভোগ দিতে পারে নাই। তিন বৎসর পরেই তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে গৌড়ের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন তাঁহার নামের আড়ম্বর হইল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বিবরণ পড়া হইতে মনে হয়, সমাচারদেবের সিংহাসন ত্যাগে তিন বৎসর বিলম্বিত হইয়াছিল এবং সেনাপতি কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া তিনি ব্রাহ্মণ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের গৌড়রাজ্যে প্রাধান্যলাভে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই; প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ পরে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বেদজ্ঞ ও জ্ঞান ধর্ম্মাচরণীগণের পীড়ন এই ব্রাহ্মণপ্রভাবের মূল বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে।

অতিরিক্ত এই বিষয় সম্বন্ধে কক্ষে নাগাগণের অনুশাসনের প্রথম বিবরণ পাওয়া যায়। মনে হয়, পার্শ্ববর্ত্তী কোনও রাজ্যখণ্ডে আধ্যাবর্ত্তব্যাপী বিস্তৃত নগ্ন সংঘের কোনও এক অংশ গৌড়ের তাম্রল তৃণপল্লবাদিত বৃক্ষতলের মোহে মুগ্ধ হইয়াছিল; এইবার পরাজিত হইয়াও তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। উহার কালে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাহাদের নায়ক ভবনাগ গৌড়ের এক অংশ জয় করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। মূলকরের এই উক্তি যমুনোপরাট তাম্রশাসন হইতে সমর্থিত হইতেছে।

প্রত্যাবিষ্ট ও তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধীনতা পাশ মুক্ত হইয়া গৌড় আবার স্বাধীন হইল। সমাচারদেবের দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসরব্যাপী রাজত্বের কথা তাঁহার নামাঙ্কিত তাম্রলিপি হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায়।

সপ্তম শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে কোনও সময় তাঁহার রাজত্বের অবসান হইয়াছিল। আর বিলম্ব নহে, শশাঙ্কের 'গৌড়তন্ত্রের' যাঁহারা আধ্যাদাতে কোনও বহিঃশত্রু প্রবেশ করিল না। ৭০৩ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি কোনও সময় মহাপ্রতিহারবংশের "নাগাবলোক", ধর্ম্মচক্রিতের গৌড়-রাজ নরেন্দ্রগুপ্ত বা শশাঙ্ক, ইউয়ানচোয়াঙ্গের কর্ণসুবর্ণাধিপতি শশাঙ্ক, কান্যকুব্জ-বিজয়ী শশাঙ্ক আকলিঙ্গবিজয়ী গৌড়তন্ত্রের অধীশ্বর শশাঙ্ক সিংহাসন আরোহণ করিলেন। বঙ্গেতিহাসের আর এক নবপর্য্যায় আরম্ভ হইল।

পুস্তকে

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

তুমি এই বইখানি দিয়াছিলে পড়িবারে
বহু দিন কি ভেবেছিল ভাল!
তোমার চিঠির স্পর্শ আখরে আখরে মাখা
কত কথা ওই আঁখি কালো।
পড়িতে পড়িতে ভাবি তুলায়ে নয়ন মোর
অক্ষর রচিত উর্ণ জালে,
যে ফাঁদে পড়েছে ধরা তোমার মুগ্ধ হিয়া
সে বাঁধনে আমারে জড়ালে।
যত পড়ি লাগে ভাল, তোমারে নিকটে পাই,
কেতাবের কথা যাই ভুলে,
অক্ষরের ফুলে ভুলে মক্ষিকার মত আসি
মধুকণা নাই যেন তুলে।
সে মধু পরাগে তব ছিল যেন সঙ্গোপনে
পুষ্পপুটে রেখেছিলে ঢেলে,
পুঁথিটির পত্র হ'তে লক্ষ প্রজাপতি সম
উড়ে এস কল্পপক্ষ মেলে।
প্রতি ছত্র পরিণত হয় যেন পরিচ্ছেদে
প্রতি পৃষ্ঠা পুঁথি হ'য়ে যায়,
কেতাব ফেলিয়া দিয়া রচি নব উপন্যাস
আঁখি বুদি—তোমায় আমায়।
নায়ক নায়িকা মোহে অলিখিত গীতিকাব্যে
স্বপ্নলোকে অভিনয় তার,
রঙ্গমঞ্চে নটনটী তুমি আর আমি শুধু
রঙ্গালয়ে ঘটনা তাহার।
ইহকাল পরকাল কত জন্মজন্মান্তর
সেথায় করেছে যেন ভিড়,
অভিনেতা অভিনেত্রী আদি অন্তহীন কালে
বিরহ-মিলনে সুনিবিড়।
লোকে লোকে ঘুরে ঘুরে আলো আর অন্ধকারে
গেঁথে চলে জীবনের মালা,
অফুরন্ত দৃশ্যপট অনন্ত বৈচিত্র্যময়
চিরন্তন যুগলের পালা।
ক্ষুদ্র এই পুস্তিকায় তুমি কি করেছ পাঠ
অপূর্ণ কাহিনী আমাদের?
আমারে পড়িতে দিয়া বুঝাইলে লীলাচ্ছলে
এ-পুঁথির বাকী আছে ঢের?
এস তবে এস কাছে আঁখি মোর হাতে হাত
শুধু ব'সে থাক চুপ করি,
নীরবে নিঃশব্দে মোরা কায়মনে অনুভবে
এই শূন্য পুঁথিটিরে ভরি।
যদি প্রাণ চায় তব একটি চুম্বন পরে
যবনিকা পড়ুক হেথায়,
ত্রিদিব-সঙ্গীত সনে খুলুক সে যবনিকা
নব জন্মে নূতন অধ্যায়।

বন্যার বর্ণন

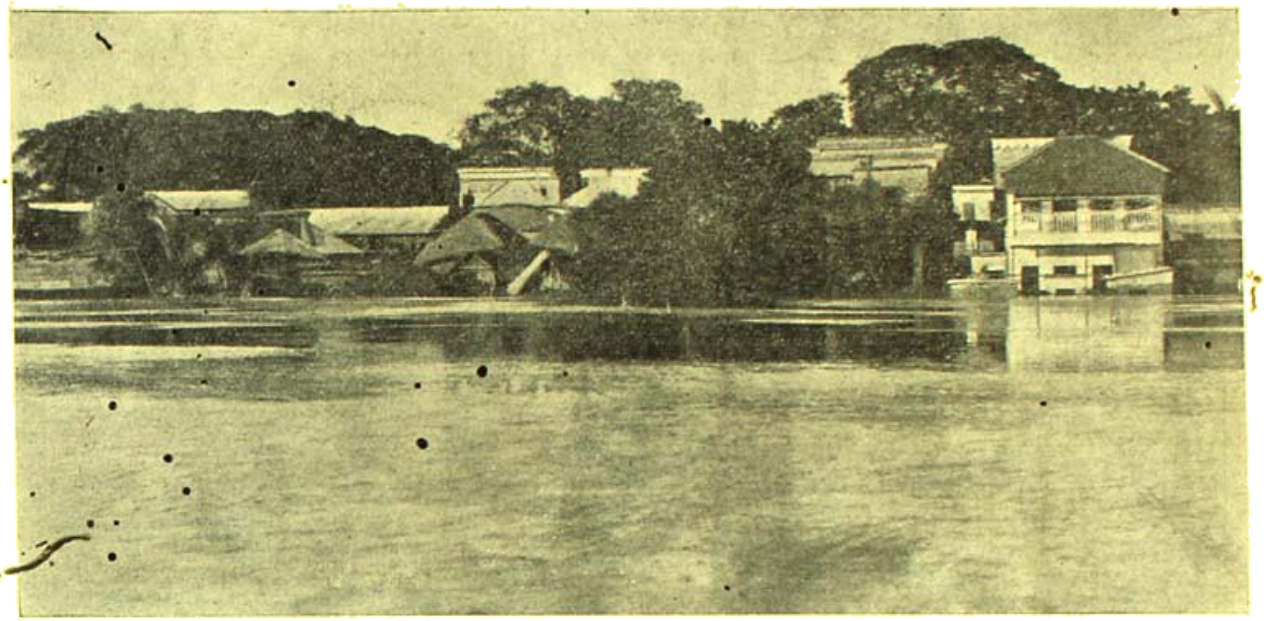

যশোহরে ইছামতি কাপোতাক্ষ নদের বন্যায় শিবাবেশ্যাচা বাজার জলমগ্ন

অমৃতবাজারের প্রাঙ্গণ দৃশ্য ; সমগ্র গ্রাম জলমগ্ন

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ধর্মঘট

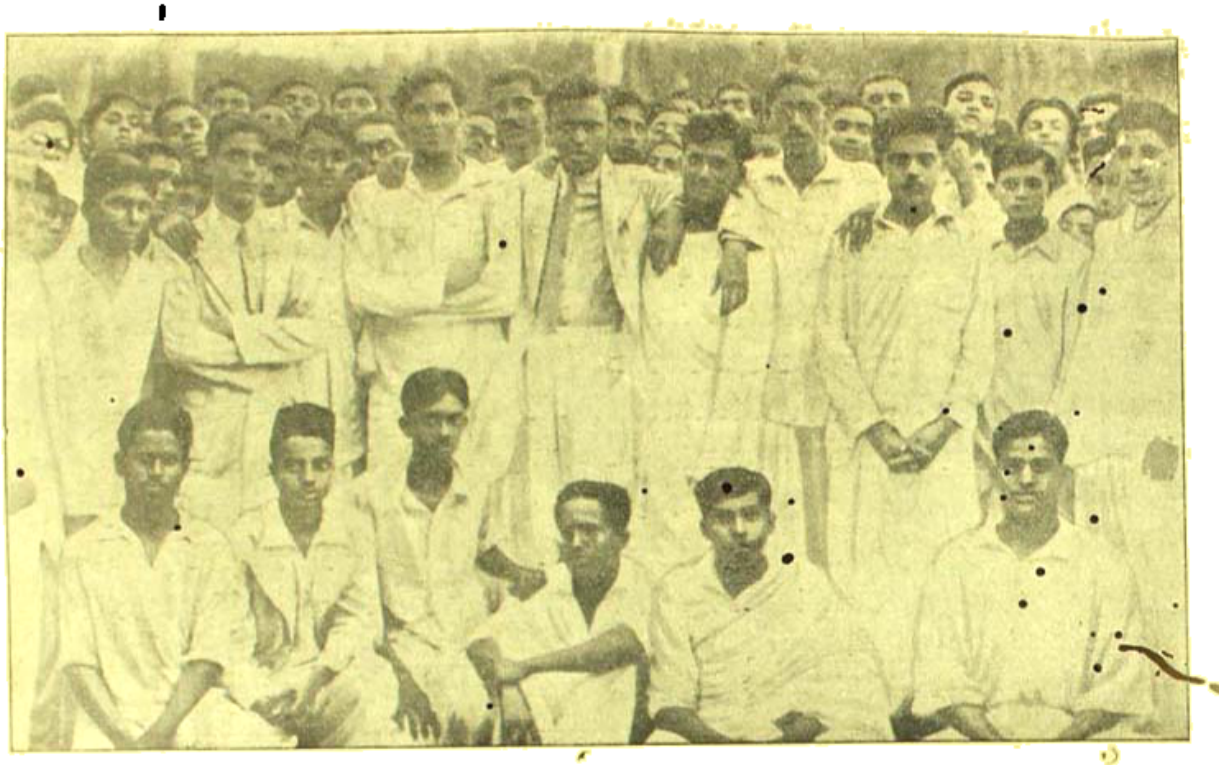

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের মৃত ছাত্রবৃন্দ : ঐক্যের মুক্তির পর

কলিকাতা কলেজ ধর্মঘট। রাষ্ট্রপতির ব্রাতুলপুত্র পুলিশের লাঠি-চালনার প্রতিবাদসভায় সভাপতিত্ব করিতেছেন

অষ্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

ব্রিসবেনে ১০ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা ৪-৩ গোলে অমীমাংসিত হ'য়ে শেষ হয়েছে। প্রথমার্দ্ধে আই এফ এ দলের দ্রুততা, নৈপুণ্য ও আদান-প্রদান বিপক্ষদল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতীয়রা ছ'টি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করে। প্রথমার্দ্ধে কোন গোল হয় না।

দ্বিতীয়ার্দ্ধের চতুর্থ মিনিটে সুন্দর আদান-প্রদানের পর সুরমহম্মদের পাশ থেকে রহিম প্রথম গোল দেয়। এক মিনিট পরেই করুণা ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় গোল করে। একটু পরে অষ্ট্রেলিয়া হেড ক'রে একটি গোল শোধ দিতে পারে। উনিশ মিনিটে সুরমহম্মদ অতি দর্শনীয় একটি গোল দেয়।

সুরমহম্মদ | কে ভট্টাচার্য্য | রহিম

অষ্ট্রেলিয়া ভীষণ চেপে ধরে এবং পঁচিশ, ছাব্বিশ ও আটাশ মিনিটে পর পর তিনটি গোল দেয়। পুনরায় ভারতীয় দল খেলার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে এবং তেইশ মিনিটে লামস্‌ডেন চতুর্থ গোলটি দিলে ফল সমান সমান হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় গোলটি অবিসম্বাদী অফসাইড থেকে হয় এবং বল গোল লাইন অতিক্রম না করতেই চতুর্থ গোলটির নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। কে দত্ত ঐ বিষয়ে রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেন, 'the matter was now beyond all decision'.

ভারতীয়দের খেলার দ্রুতগতি বিশেষ দর্শনীয় হয়েছে, তারা সর্ট পাশিং করে খেলেছে।

আই এফ এ :—কে দত্ত ; রেবেলো ও ভূষা খাঁ ; নন্দি, বি সেন ও প্রেমলাল ; সুরমহম্মদ, রহিম, আর লামস্‌ডেন, কে ভট্টাচার্য্য (ক্যাপটেন) ও প্রসাদ।

তৃতীয় টেষ্ট পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় খেলার মোট ফলাফল :

খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র	পক্ষে	বিপক্ষে
১০	৫	৪	১	৪১	৩৩

গোলদাতা :—লামস্‌ডেন ১৮, রহিম ১৩, কে ভট্টাচার্য্য ৬, প্রসাদ ২, সুরমহম্মদ ২।

আই এফ এ দলের বিজয় ঃ

আই এফ এ ৭-৬ গোলে কুইন্সল্যাণ্ডকে হারিয়েছে। লিগাতে এটি তাদের দ্বিতীয় বিজয়। প্রথমার্দ্ধে তারা ৫-১ গোলে অগ্রগামী থাকে। ভট্টাচার্য্যের অপূর্ব্ব কৌশলপূর্ণ আদান-প্রদানের জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পায়ে আঘাত পেয়ে অবসর নিলে, জৌসেক তার স্থলে খেলে তখন খেলার গতি বদলে যায়, কুইন্সল্যাণ্ডের পক্ষে ৭টির মধ্যে ৬টি গোল দেয় মাত্র সাত মিনিটে একটি পেনাল্টি থেকে। ভারতীয়রা সকল বিভাগেই উৎকর্ষতা দেখিয়েছে। রহিম ৪টি ও লামস্‌ডেন ৩টি গোল করে। খেলা হয়েছিল রাত্রি আটটায় ফ্লাড লাইটে।

আই এফ এ দল ৫-২ গোলে ইপিসউইচ্‌ দলকে হারিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় তৃতীয়বার বিজয়ী হয়েছে। ইপিসউইচ্‌ দলে

ছেন ইণ্টার-ষ্টেট ও পাঁচজন ইণ্টার-ক্যাসনাল খেলোয়াড় ছিল। এই বিশেষ শক্তিশালী দলটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দলই উৎকৃষ্ট খেলেছিল। হুরমহম্মদ প্রথম, লামস্‌ডেন দ্বিতীয় ও রহিম তৃতীয় গোল করলে প্রথমার্দ্ধে ভারতীয়রা ৩-১ গোলে অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমে অষ্ট্রেলিয়াদের আক্রমণ বেগ প্রবল হলেও তারা কিন্তু গোল করতে পারে না। লামস্‌ডেন পুনঃ পুনঃ বিপক্ষ গোলে হানা দেয় এবং শেষ দু'টি গোল সে-ই দেয়।

আই এফ এ : কে দত্ত ; রেবেলো ও দাশগুপ্ত, নন্দি, বি সেন ও বিমল মুখোপাধ্যায় ; হুরমহম্মদ, রহিম, লামস্‌ডেন, প্রেমলাল ও সতু চৌধুরী।

আই এফ এর চতুর্থ বিজয় হয়েছে কুইন্সল্যাণ্ডকে দ্বিতীয় খেলায় ৫-২ গোলে হারিয়ে। গোল দেয় লামস্‌ডেন প্রথম দু'টি, ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় দু'টি, ও রহিম শেষ একটি। সকল বিভাগেই ভারতীয়রা উৎকৃষ্ট খেলে এবং তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতি দৃষ্ট হয়। বিশ্রী আবহাওয়া, শক্ত মাঠ ও খেলার সময়ের বৃদ্ধির অসুবিধা অনেকাংশে তারা অতিক্রম করতে পেরেছে ব'লে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রথম গোলটি পেনালটি থেকে হয়। দু'টি গোলই ইয়ং শোধ দেয়।

আই এফ এ : কে দত্ত ; রেবেলো ও দাশগুপ্ত ; বি মুখার্জ্জি, বি সেন ও প্রেমলাল ; হুরমহম্মদ, রহিম, লামস্‌ডেন, কে ভট্টাচার্য্য ও এস চৌধুরী।

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার ফুটবল টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড থেকে যে অবৈতনিক খেলোয়াড় দল অষ্ট্রেলিয়ায় পূর্ব্বে খেলতে যায়, তাদের টেষ্ট খেলার ফলাফল হয়েছিল :—

প্রথম টেষ্ট :—অষ্ট্রেলিয়া ৫ : ইংলণ্ড ৪

দ্বিতীয় টেষ্ট :—ইংলণ্ড ৪ : অষ্ট্রেলিয়া ০

তৃতীয় টেষ্ট :—অষ্ট্রেলিয়া ৪ : ইংলণ্ড ৩

অষ্ট্রেলিয়া ২-১ ম্যাচে জয়ী হয়েছিল।

কুচবিহার কাপ ঃ

ই বি আর দল ৩-০ গোলে ভবানীপুরকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হয়েছে। ই বি আর ১৯৩০ সালে প্রথম বার এই কাপ বিজয়ী হয়েছিল। গত বৎসর টাউন ক্লাব বিজয়ী ছিল। সামাদ ১টি ও এন মজুমদার ২টি গোল দেয়। মজুমদারের একটি গোল অফসাইড থেকে হয়। প্রথম দিনের খেলা শূন্য গোলে ড্র হয়েছিল।

রোনাল্ডসে শীল্ড ঃ

ঢাকা কার্ম্ম ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ওয়ারীকে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হয়েছে।

বেল কাপ ঃ

ই বি আর ওয়াণ্ডার হাউস ২-১ গোলে রেঞ্জার্সকে পরাজিত ক'রে বেল কাপ বিজয়ী হয়েছে।

রাখবা ইণ্টার-ক্যাসনাল বিজয়ী ইংলণ্ড দল—স্কটল্যাণ্ডকে ১১-৮ পয়েণ্টে পরাজিত করেছে ছবি—কে সান্যাল

রোভার্স কাপ ঃ

বাঙ্গালোর মুসলিম ১৯৩৮ সালেও রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়েছে আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড হাইল্যাণ্ডার্সকে ৩-২ গোলে হারিয়ে।

খেলার গতি অনুযায়ী আর্গাইল দলেরই জয়ী হওয়া উচিত ছিল। অধিকাংশ সময় তারা দশজনে খেলতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ, ইন্-সাইড লেফ্‌ট ক্যাম্পবেল সতর্কিত হ'য়ে রেফারির সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করে এবং তজ্জন্য মাঠ থেকে বিতাড়িত হয়। শেষ দশ মিনিট এরূপ ভীষণ প্রতিযোগিতা

হয়, যা' বোম্বাইয়ে বহুদিন দৃষ্ট হয় নি। আর্গাইল মুসলিম রক্ষণভাগকে বিপর্য্যস্ত উদ্‌ব্যস্ত ক'রে তোলে ঝড়ের গতিতে, তাদের দুটি অত্যাশ্চর্য্য সট্ স্বল্পান্তরে রেগে দিয়ে আসে এবং একটি সামান্তর জন্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

বাঁশী বাজবার ঠিক পূর্ব্বে দেখা যায় যে, পাঁচ ছয় জন আর্গাইল বিপক্ষ গোল লাইনের সুমুখে গোল দিতে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হয়েছে।

মুসলিম দলের খেলা তুলনায় নিকৃষ্ট হ'লেও, তারা গোলের সুযোগ বেশী কার্য্যকরী হওয়ায় জয়ী হয়েছে। গোল দিয়েছে করিম, কাদের আলি ও স্বামীনাথন্।

গতবার বাঙ্গালোর মুসলিম ১-০ গোলে কলিকাতার মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছিল।

বাঙ্গালোর মুসলিম ফাইনালে উঠেছে—বি বি এণ্ড সি আইকে ৩-২, দিল্লী কম্পানিয়নকে ৩-০, হাওড়া ইউনিয়নকে ১-১, ১-০, লিন্‌কল্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে। আর্গাইল্‌স্ ফাইনালে পৌছিয়েছে—আফ্‌গান ফুটবল ক্লাবকে ৩-০, ইয়ং গোয়ান্সকে ১-০, দিল্লী ইয়ংমেনকে ২-১, চেশায়র্সকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।

হাডিঞ্জ বার্থডে শীল্ড ঃ

মেডিকেল কলেজ ২-০ গোলে বঙ্গবাসী কলেজকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

সন্তরণ ঃ

২রা সেপ্টেম্বর, ৯টা ২২ মিনিটে রবীন চট্টোপাধ্যায় অবিরাম দীর্ঘ সন্তরণে রেকর্ড স্থাপন উদ্দেশ্যে এলাহাবাদের নৌকাঘাট থেকে কাশীর অসিলাট পর্য্যন্ত সন্তরণ করেছেন। এই ১৮৩ মাইল জলপথ অতিক্রম করতে সময় লেগেছে ৫৩ ঘণ্টা ২৮ মিনিট। তাঁকে বিরল দুর্য্যোগের মধ্যে সন্তরণ করতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘ অবিরাম সন্তরণের রেকর্ড, লস এঞ্জেলসে পেড্রো ক্যাণ্ডিডোর কিঞ্চিদধিক ৮৭ ঘণ্টায় ২১০ মাইল সন্তরণ।

কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায়—পত মিটার সন্তরণে নিজ রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছে। সময় —১ মিঃ ২৮২ সেঃ

রবীন চট্টোপাধ্যায়

ব্রাডম্যানের ক্রিকেট জীবন ঃ

ব্রাডম্যান তাঁর 'My Cricketing Life' নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, "কেউ আমাকে ক্রিকেট খেলতে শিক্ষা দেয় নি। আমি কখনও কারো কাছে শিক্ষা নিই নি, আমি নিজেই শিখেছি।" ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাসেক্স বোলার মরিস টেট তাঁকে অষ্ট্রেলিয়াতে বলেছিলেন,—'Don, learn to play a straighter bat before you come to England. If you don't, you will never get many runs.' এই বইতে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে নানা উল্লেখ আছে; হ্যামণ্ড সম্বন্ধে লিখেছেন, হ্যামণ্ড সর্ব্বোৎকৃষ্ট অল্ রাউণ্ডার।

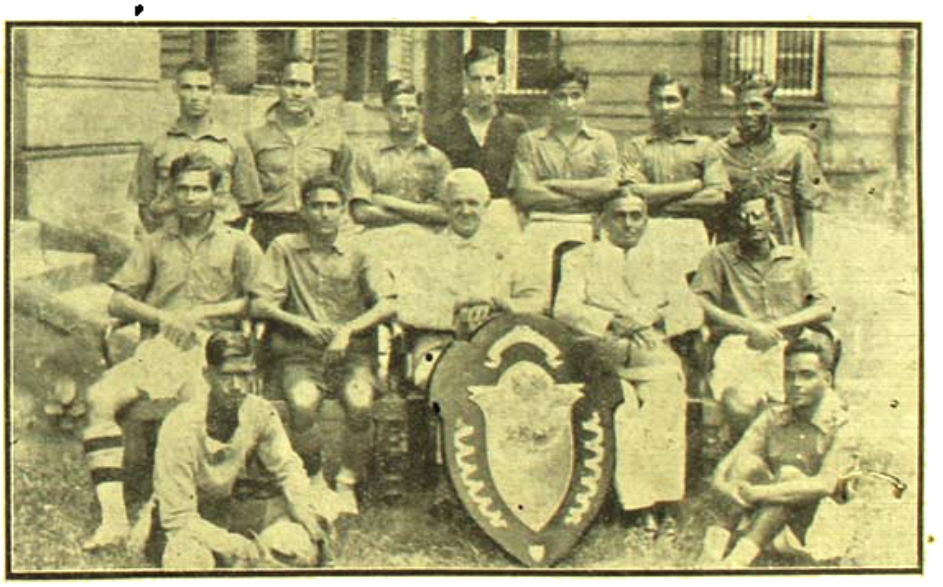

হাডিঞ্জ বার্থডে শীল্ড বিজয়ী মেডিকেল কলেজ দল মধ্যে প্রিন্সিপাল লেঃ কঃ বরুড

ছবি—জে কে সন্তাল

ব্রেডম্যান সম্বন্ধে বলেছেন, উইকেটের নিকটে সে চমৎকার কিন্তার। বডি লাইন বোলিং সম্বন্ধে,—"Those who

মেটাল বক্সিং ক্লাব স্পোর্টসের কিছুর বোর্ড ডাইভিং প্রতিযোগিতার বিজয়ী অমিয় বসু। দ্বিতীয়—ও সিং। বোর্ড ডাইভিং বিজয়ী আশু বসু। বামে। ছবি—ও কে সাহানী

are in charge of the welfare of cricket must preserve its traditional beauty by confining the rivalry to bat and ball."

ব্রাডম্যানের পিতৃ চুতার ব্যবসায়ী। তাঁর তিনটি বোন ও একটি ভাই আছে, তারা বেশ লম্বা—তাঁর মতন ছোট নয়।

হাসনাবাদ বক্সিং স্পোর্টসের ১০০, ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল বিজয়ী দুর্গাপদ

জবাকুসুম কাপ ঃ

পুলিস ১০০ গোলে; ব্রবার্ট হাডসন দলকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

লক্ষ্মীবিলাস শীল্ড ঃ

বেঙ্গল কেমিক্যাল ৪০০ গোলে কাষ্টমস্ রিক্রিয়েশনকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। গতবার বি জি প্রেস বিজয়ী ছিল।

মহিলা বাস্কেট বল লীগ ঃ

মেয়েদের প্রথম বিভাগের বাস্কেট বল লীগ চ্যাম্পিয়নসিপ এবারও ওয়াণ্ডারার্স হয়েছে ১৪ পয়েণ্ট পেয়ে। ইয়ং বার্ড ১২ ও গ্রেস ক্লাব ১০ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে।

দ্বিতীয় বিভাগ 'এ' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গ্রেস ক্লাব এবং 'বি' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চক্রধরপুর অর্ডিন্যান্স ব্লকে মীমাংসা খেলায় পরাজিত করে।

সীড্‌নে বার্ণস্ ঃ

পুরাকালের ইংলণ্ডের টেষ্ট বীর সীড্‌নে বার্ণস্ ছেষট্টি বৎসর বয়সে এখনও শক্ত আছেন। এ বৎসর ত্রিজনর্থ স্বপ্‌সাধার ক্লাবের হ'য়ে ১৮টি খেলায় তিনি ৩০২ উইকেট এভারেজ ৬৮ রানে নিয়েছেন। এখনও সপ্তাহের প্রত্যেক দিন খেলেন এবং দু'দিন বৈকালে একাদিক্রমে বল করেন।

প্রথম টেষ্ট সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মতামত ঃ

অষ্ট্রেলিয়ায় ফুটবল প্রথম টেষ্ট সম্বন্ধে সেখানের কয়েকটি সংবাদপত্রের মতামত থেকে দেখা যায়, ভারতীয়রা পরাজিত হ'লেও তাদের নূতন ধরণের ক্রীড়াকৌশল দেখে সে দেশবাসী বিস্মিত হয়েছে।

Courier-Mail—*** The result was a triumph for the more robust type of Australian fooball pitted against speedy, tricky, but more conventional positional play.

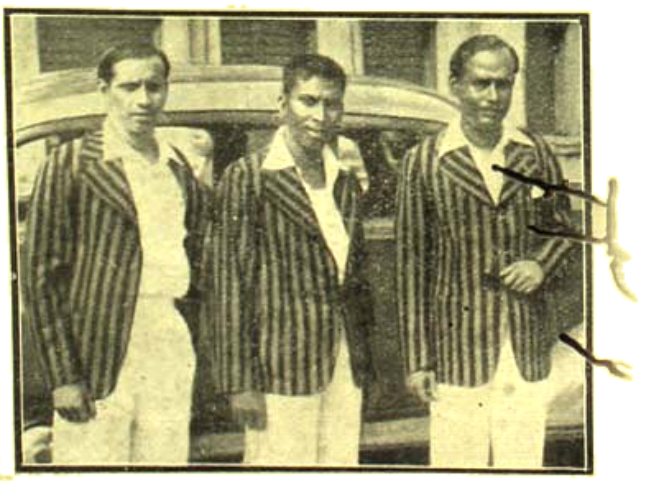

প্রফুল্লকুমার সোম (চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু) মধ্যে, নরেন সোম (জীবন রক্ষক) বামে, বি কে দাস (ডাইরেক্টর) দক্ষিণে, মোটর বোটে লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করেছে, সেখানে প্রফুল্লকুমার ইংলিশ চ্যানেল পার হ'তে চেষ্টা করবে

উলি সর্ব্বসমেত ৫৯,২৮৪ রান করেছেন, ২০৬০ উইকেট নিয়েছেন এবং ৯০০ শত ক্যাচ্ করেছেন। স্যর পেলহাম্ ওয়ার্ণার উলি সম্বন্ধে বলেছেন, one of the immortals of cricket.

অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের দ্বিতীয় পরাজয় ঃ

সাধারণ খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের বিলাতে দ্বিতীয় পরাজয় ঘটেছে স্যর ল্যাভেলন-গোয়ার একাদশের কাছে ১০ উইকেটে। অষ্ট্রেলিয়া—৩০৬ (বার্ণস ৯০, ওয়েট ৭৭, ম্যাককাব ৭৮) ও ১০২ ; ল্যাভেলন গোয়ার—৩৬৩ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড ;—হার্ডষ্টাফ ১০৮, হাটন ৬৩, লেম্যান ৫১) ও ৬৬ (০ উইকেট)

সতের বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ খেলায় ১৯২১ সালে সি আই থর্ণটনের একাদশ ৩৩ রানে ডব্লিউ আর্ম্মষ্ট্রংয়ের দলকে হারায় স্মরণযোগ্য।

টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ার হারের সংখ্যা মাত্র চারটি —লর্ডসে ১৯০৪, ওভালে ১৯০৮ ও ১৯২৬ ও ট্রেণ্টব্রীজে ১৯৩০ সালে।

ডেভিস্ কাপ ঃ

আমেরিকা এবারও ডেভিস কাপ বিজয়ী হলো অষ্ট্রেলিয়াকে ৩-২ ম্যাচে পরাজিত করে।

ফলাফল :—

ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা) ৬-২, ৬-৩, ৪-৬, ৭-৫ গেমে জন্ এম্ উইচ্‌কে হারিয়েছেন।

আর এস রিগস্ (আমেরিকা) ৪-৬, ৬-০, ৮-৬, ৬-১ গেমে এ কে কুইষ্টকে পরাজিত করেছেন।

ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা) ৮-৬, ৬-১, ৬-২ গেমে এ কে কুইষ্টকে হারিয়েছেন।

জন্ ব্রম্ উইচ্ (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৪-৬, ৬-০, ৬-২ গেমে আর এস রিগ্‌স্‌কে পরাজিত করেছেন।

ডবলসে এ কে কুইষ্ট ও জন্ ব্রম্ উইচ্ (অষ্ট্রেলিয়া) ০-৬, ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ গেমে ডোনাল্ড বাজ ও আর মেকোকে (আমেরিকা) হারিয়েছেন।

মাউথ ব্যাব হার্ডকোর্ট টেনিস বিজয়ী মাদ্রে। এস বি জিটকে ৬-২, ৬-৪ গেমে পরাজিত করে তৃতীয় বার চ্যাম্পিয়ন বিজয়ী হয়েছেন

ছবি- কে কে সাঙ্গাল

ইণ্টার-কলেজ মহিলা বাস্কেট বল ঃ

ইণ্টার-কলেজ মহিলা

ইউনিভার্সিটি বক্-আউট চার জনের প্রতিযোগিতার বিজয়ী সেণ্ট জেভিয়ার্স (দক্ষিণে) ও দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী (বামে)।

ইণ্টার-কলেজ বাট্‌লীগ প্রতিযোগিতা বিজয়ীও হয়েছিল এবার সেণ্ট জেভিয়ার্স দল ছবি—কে কে সাঙ্গাল

স্পোর্টস্ এসোসিয়েশন এ বৎসর মেয়েদের বাস্কেট বল লীগ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। পাঁচটি দল যোগদান করেছিল।

কৃষ্ণা সেন
(ক্যাপটেন—ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন্)

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়নসিপ পেয়েছে। তাদের পক্ষে ৮৫ এবং বিপক্ষে ১৬ গোল হয়েছে। স্কটিশ ও আশুতোষ ৫ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয়, বিদ্যাসাগর ২ পেয়ে চতুর্থ এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ০ পয়েণ্ট পেয়ে শেষ স্থান অধিকার করেছে।

আই এফ এর তৃতীয় টেষ্ট বিজয়

নিউ ক্যাসেলে ১৭ই সেপ্টেম্বর তৃতীয় টেষ্টে আই এফ এ ৩-২ গোলে জয়ী হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে এগার মিনিটের সময় প্রথম গোল করে বুটেন। লামস্‌ডেন উনিশ মিনিটে শোধ দেয়। অর্দ্ধ সময়ে ১-১ গোল থাকে। বিরামের পর লামস্‌ডেন তৃতীয় মিনিটে পেনালটি থেকে গোল করে। নবম মিনিটে ভট্টাচার্য্য দর্শনীয় একটি গোল দেয়। পঁচিশ মিনিটে রহিমের সুন্দর সট বারে লেগে ভিতরে চলে যায়। এবার অষ্ট্রেলিয়ারা চেপে ধরে, কে দত্ত উইলকিন্‌সনের সুন্দর সট ফেরায় কর্ণার ক'রে।

এবার দ্বিতীয়ার্দ্ধেই আই এফ এ দল কৃতকার্য্য হ'তে পেরেছে। সেখানে অধিক সময় খেলার নিয়মের জন্য শেষার্দ্ধেই আই এফ এ দল দম না থাকায় হারছিল। তাদের অসাধারণ ক্ষিপ্রগতি, অনায়াসে বল কাটাবার অপূর্ব্ব কৌশল, নিখুঁত আদান-প্রদানের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া দলের খেলার তুলনাই হয় নি।

কে দত্ত চমৎকার গোল রক্ষা করেছে, রেবেলো ও দাশগুপ্ত এবং বি সেন রক্ষণ কার্য্য বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। ফরওয়ার্ড লাইনে শক্তি ও বুদ্ধি জুগিয়েছে করুণা। 'মিকি মাউস' প্রসাদ অষ্ট্রেলিয়ার দর্শকদের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠ্‌ছে দিনের পর দিন, তার দ্রুতগতি, কৌশল ও পায়ের কায়দার জন্য। লামস্‌ডেন গোলের সম্মুখে এ দিন বেশ খেলেছে। রহিম বল পেলেই বিপদের সৃষ্টি করেছে।

সুবিজ্ঞ সমালোচকদের মতে ভারতবর্ষ এ টেষ্টে ইংলণ্ডের অবৈতনিক ফুটবল দল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ক্রীড়া কৌশল দেখিয়েছে।

টেষ্টের ফল সমান সমান হ'লো। আগামী শনিবার ২৪শে সেপ্টেম্বর সিডনেতে এবং পরের শনিবার মেলবোর্ণের টেষ্টের ফলাফলের উপর উভয় পক্ষেরই 'রবাব' নির্ভর করছে।

আই এফ এ : কে দত্ত; রেবেলো ও দাশগুপ্ত; নন্দি, বি সেন, প্রেমলাল; সুরমহম্মদ, রহিম, আর লামস্‌ডেন, কে ভট্টাচার্য্য ও প্রসাদ।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পপুস্তক "মিহি ও মোটা কাহিনী"—১৷৷০
সুলোচনা দেবী প্রণীত সঙ্গীত গ্রন্থ "গীতি স্মৃতি"—৷৷০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত উপন্যাস "মণিমালিনীর খনি"—১৷৷০
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত ছেলেদের উপন্যাস "অজানা দেশের পথে"—১৲
শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত ছেলেদের বই "হরেক রকম"—৷৷০
শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "স্নেহের ঋণ"—১৷০
শ্রী[illegible] দাস সম্পাদিত রোমাঞ্চ সিরিজের "মরণের মায়াজাল"—৷৵০
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত "মেঘদূত" মূল ও পদ্যানুবাদ—৷৵০
শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত ছেলেদের সংগ্রহগ্রন্থ "আরতি"—১৷০
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত রাষ্ট্রনেতাদের জীবনী "সাহসীর জয়যাত্রা"—১৷০
শ্রীমতী শিখরবাসিনী দেবী প্রণীত কবিতাপুস্তক "ফুলহার"—১৷০
শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী প্রণীত রাধাস্বামী কথামৃতমালার "বেদের কথা"—৷৵০
স্বামী অমলানন্দ গিরি প্রণীত "গুরুতত্ত্ব কৌমুদী"—৷৷০
শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী অনূদিত "বৈয়াসিক ন্যায়মালা" প্রথম খণ্ড—১৷৷০
শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র গল্পপুস্তক "সত্যপ্রিয়া"—৷৵০
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "শেষ উত্তর"—২৷৷০
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা"—১৷৷০
শ্রীভীমাপদ ঘোষ সম্পাদিত বার্ষিক "শিশুসাথী"—১৷৷০

সম্পাদক—রায় জলধর সেন বাহাদুর | সহঃ সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

শিল্পী—[illegible]

পল্লী জীবন

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অগ্রহায়ণ—১৩৪৫

প্রথম খণ্ড | ষড়বিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা

অধ্যাপক—শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

একদা এই ভারতবর্ষ প্রাচ্য বিবিধ দর্শনতত্ত্বের অনুশীলনে অসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীর সমগ্র মনীষিসমাজকে উপকৃত আনন্দিত ও বিস্মিত করিয়াছিল। সেই প্রাচীনকালে যে দার্শনিক যে দর্শনতত্ত্বের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিতেন, সেই দার্শনিক সেই দর্শনতত্ত্বকেই পরম সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেন। নিজ দর্শনতত্ত্বে একনিষ্ঠতা হেতু পরকীয় দর্শনতত্ত্ব-সাতিশয় যুক্তিপূর্ণ হইলেও তাহাতে সবিশেষ আস্থা স্থাপন করিতেন না। পরন্তু যে কোনও উপায়ে উহার প্রতিবাদ করিয়াই আত্মপ্রসাদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। এই জন্যই প্রাচীন দর্শনগ্রন্থসমূহের মধ্যে এক দর্শনে অপর দর্শনের মতবাদ অতি তীব্রভাবে খণ্ডিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দর্শনই কোনও না কোনও অংশে অন্য দর্শন অপেক্ষা বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। এক দর্শনের সকল সিদ্ধান্তগুলিই নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে বিরোধিসিদ্ধান্তপ্রতিপাদক অপর দর্শনের মতবাদ কোনও মতেই জনসমাজে স্থিতিলাভ করিতে পারে না, এই কারণেও নিজ নিজ দর্শনসিদ্ধান্ত জনসমাজে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে দার্শনিকগণ নিজ নিজ গ্রন্থে অন্যান্য দর্শনের মতবাদ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রবল বিজিগীষাবৃত্তিই উহার কারণ নহে, নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যথার্থ তত্ত্বের দৃঢ় প্রচার মানসেই প্রাচীন দার্শনিকগণ ঐ রীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

প্রাচীন দার্শনিকদিগের মধ্যে কেবল দর্শনের প্রতিপাদ্য বস্তুতত্ত্ব লইয়াই যে পরস্পর অল্পাধিক পার্থক্য ছিল এমন নহে, পরন্তু ইষ্টদেবতা ও আচার প্রভৃতি লইয়াও উহাদের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য ছিল। আমরা এস্থলে দার্শনিকগণের বিভিন্ন আচার প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের আলোচনা না করিয়া কেবল তাহাদিগের ইষ্টদেবতা সম্বন্ধেই দুই একটী কথার আলোচনা করিব।

দার্শনিকপ্রবর হরিভদ্রসূরির ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থের

গুণরত্নসূরিকৃত টীকা গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নৈয়ায়িকসম্প্রদায় শৈব ছিলেন, শিবই তাঁহাদের ইষ্টদেবতা। গুণরত্নসূরি বলেন—'এই নৈয়ায়িকসম্প্রদায় প্রাতঃকালে হস্তপাদাদি শৌচ সম্পাদন করিয়া শিবের ধ্যান-করতঃ ভস্ম দ্বারা তিন বার অঙ্গ স্পর্শ করেন। গুরুকে প্রণাম করিবার সময় শিষ্য কৃতাঞ্জলি হইয়া 'ওঁ নমঃ শিবায়' এইরূপ বলেন, গুরুও সেইরূপ 'শিবায় নমঃ' এইরূপ প্রতিবচন প্রয়োগ করেন'।

কিছু পরে যাইয়া টীকাকার স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, 'নৈয়ায়িকসম্প্রদায় সর্বদা শিবভক্ত বলিয়া তাহারা শৈব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং বৈশেষিকগণ পাশুপতনামে আখ্যাত হয়েন। সেই কারণেই নৈয়ায়িক দর্শন শৈবদর্শন এবং বৈশেষিক দর্শন পাশুপতদর্শন বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে'।

ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় মূলগ্রন্থেও দেখা যায়—'যিনি সৃষ্টি ও সংহারের কর্তা বিভু নিত্য এক সর্বজ্ঞ এবং নিত্য জ্ঞানের আধার, সেই শিবই অক্ষপাদমতে (গৌতম ন্যায়মতে) দেবতা'। ঐরূপ অন্যান্য দার্শনিকদিগের ইষ্টদেবতার নির্দেশও ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

বৌদ্ধসম্প্রদায়ের দেবতা সুগত বা বুদ্ধদেব। ঐ সুগত বা বুদ্ধদেব যে একজনই ছিলেন বা রহিয়াছেন, ইহা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে; গুণরত্নসূরির টীকায় 'বিপশ্চী' প্রভৃতি 'শাক্যসিংহ' পর্যন্ত প্রধানতঃ সাতজন বুদ্ধের নির্দেশ পাওয়া যায়। অন্যত্র অধিকসংখ্যক বুদ্ধেরও নির্দেশ আছে।

সাংখ্যদর্শনের দেবতা সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখা যায়; তাহা এই—সাংখ্য দুই প্রকার, সেশ্বর সাংখ্য ও নিরীশ্বর সাংখ্য। মহর্ষি কপিল যে সাংখ্যতন্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন, উহা বর্তমানে যে সূত্রাকারে নিবদ্ধ পাওয়া যায় তাহাতে অথবা সাংখ্যের বহিতন্ত্রানুযায়ী ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রামাণিক সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার করা হয় নাই। সাংখ্যসূত্রে 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' প্রভৃতি সূত্রদ্বারা স্পষ্টতঃ উহা খণ্ডিতই হইয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাগ্রন্থেও 'পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।' এই বলিয়া সৃষ্টির অনুরোধে ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা পরোক্ষভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে। কাজেই কাপিল সাংখ্য নিরীশ্বর সাংখ্য।

এক সম্প্রদায় বলেন যে ঐ নিরীশ্বর কাপিল সাংখ্যের কোনও ইষ্টদেবতা নাই।

পতঞ্জলির সাংখ্যে পঙ্গু ও অন্ধের তুল্য পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগসাধনের জন্য এবং যোগমার্গে 'ঈশ্বরপ্রণিধানের' আবশ্যকতার অনুরোধে 'ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ' এই বলিয়া একটী ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়া লওয়া হইয়াছে। এই জন্য পাতঞ্জল সাংখ্য সেশ্বর সাংখ্য। ঐ সেশ্বর পাতঞ্জল সাংখ্যে ঈশ্বরই দেবতা। ঐ বিষয় হরিভদ্রসূরি স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। গুণরত্নসূরিও বলেন—কতিপয় সাংখ্য দার্শনিকের ঈশ্বরই দেবতা। অপর কতিপয় সাংখ্য দার্শনিক নিরীশ্বরবাদী। যাহারা নিরীশ্বরবাদী, তাহাদের নারায়ণই দেবতা। শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবার সময় 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এইরূপ বলেন, গুরুও 'নারায়ণায় নমঃ' এই বলিয়া প্রতিবচন প্রয়োগ করেন। ঐ গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এক সম্প্রদায় নিরীশ্বর সাংখ্যে দেবতা স্বীকার করেন না এবং অপর সম্প্রদায় নিরীশ্বর সাংখ্যবাদেও নারায়ণকে দেবতা স্বীকার করেন।

জৈন দার্শনিকদিগের দেবতা বিবিধ বিশেষণযুক্ত ভগবান্ জিনেন্দ্র। বৈশেষিক মতে নৈয়ায়িকের শিবদেবতাই পশুপতি নামে দেবতা। ন্যায়দর্শনের দেবতানির্দ্দেশের সময় উহাকে শিব নামে গ্রহণ করা হইয়াছে, আর বৈশেষিক মতের দেবতা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া উহাকেই পশুপতি নামে গ্রহণ করা হইয়াছে এইমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ঐ উভয় দর্শনের দেবতার কোনও পার্থক্য নাই। এইজন্য হরিভদ্রসূরি বলেন—

'নৈয়ায়িকগণের সহিত বৈশেষিকদিগের দেবতা বিষয়ে কোনও প্রভেদ নাই, তত্ত্ববিষয়ে ভেদ আছে, অতএব ঐ তত্ত্ববিষয়ে ভেদ দেখাইতেছি।'

প্রশস্তপাদভাষ্যের শেষ ভাগে দেখা যায়,—

'ভগবান্ কণাদ যোগাচার বিভূতিদ্বারা মহেশ্বরকে তুষ্ট করিয়া বৈশেষিকদর্শন নির্মাণ করেন'।

এইরূপে ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থ আলোচনা করিলে যে বিভিন্ন দার্শনিকসম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতার কথা জানিতে পারা যায় উহা সবিশেষ প্রমাণসিদ্ধ ইষ্টবস্তুরূপে বলা যায় না। কারণ যে গুণরত্নসূরির টীকায় ঐ বিষয়গুলি সুবিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তিনি নিজেই ঐ টীকার এক অংশে বলিয়াছেন যে, আমি যেমন শুনিয়াছি ও যেমন দেখিয়াছি এস্থানে সেইরূপই ইহা বর্ণনা করিলাম। উহার বিশেষ তথ্য তত্তদ্‌গ্রন্থ হইতে জানিবে।

ঐ কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গুপরুহরি নিজের প্রদর্শিত ঐ বিষয়গুলির উপর জিজ্ঞাসু জনসমাজের বিশ্বাস কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিয়াছেন। অতএব তিনি যে শিবকে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের দেবতা বলিয়া ন্যায়দর্শনকে শৈবদর্শন নামে আখ্যাত করিয়াছেন, উহা যুক্তিযুক্ত বা শ্রীদাপসিদ্ধ কিনা, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ দেখা যায়—গৌতমের ন্যায়সূত্রের প্রারম্ভে বিশেষ করিয়া কোনও দেবতার নমস্কারাদি করা হয় নাই। গৌতমের ন্যায়সূত্র ন্যায়দর্শনের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। শ্রুতিতেও ন্যায়শাস্ত্রের নামোল্লেখ থাকায় ন্যায়সূত্রই ন্যায়শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রথম গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত হইবার পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধা উপস্থিত হইলেও উহার পূর্ববর্তী কোনও ন্যায়গ্রন্থ যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন ঐ ন্যায়সূত্রকেই ন্যায়শাস্ত্রের সর্বপ্রথম গ্রন্থ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। শ্রুতি যে সময়ের ন্যায়শাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন সে সময়ে ন্যায়শাস্ত্র এইরূপ গ্রন্থাকারে বর্ত্তমান ছিল ইহা কোনও প্রবল প্রমাণ দ্বারা স্থির করা যায় না। ঐ ন্যায়সূত্রের আরম্ভে গ্রন্থকার স্পষ্টরূপে কোনও দেবতার উল্লেখ করিয়া মঙ্গলাচরণ করেন নাই। পরবর্ত্তী টীকাকারগণ ভগবদ্বাচক প্রমাণ শব্দের উপন্যাস দ্বারাই ঐ গ্রন্থারম্ভের প্রাথমিক মঙ্গলাচরণ উপপাদন করিয়াছেন। যদি নৈয়ায়িক সম্প্রদায় শৈব হইবেন, তবে ন্যায়সূত্রকার গৌতম এবং তাহার সূত্রের ব্যাখ্যাতা বাৎস্যায়ন প্রভৃতি যে স্বীয় সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা শিবকে স্মরণ না করিয়াই সূত্র ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিলেন এবং নৈয়ায়িক-পরমাচার্য্য উদয়নাচার্য্য স্পষ্টরূপে শিবদেবতার প্রণতি না করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের প্রারম্ভে কেবল 'সৎ' শব্দ ও অস্পষ্টার্থ ঈশ শব্দ প্রয়োগ করিয়াই মঙ্গলাচরণ সিদ্ধ করিলেন ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

ইহার উত্তরে যদি এই কথা বলা যায় যে ন্যায়সূত্রকার ও ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার গ্রন্থের প্রারম্ভে বাচনিক শিবদেবতার নমস্কার না করিলেও কায়িক মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ নমস্কারের মধ্যে শিবের কায়িক ও মানসিক নমস্কার যে করেন নাই ইহা কিরূপে নিশ্চয় করা যায়। অতএব সূত্রকার ও ভাষ্যকার যে গ্রন্থারম্ভে স্পষ্টাক্ষরে শিবদেবতার বাচনিক নমস্কার করেন নাই, তাহাতেই 'নৈয়ায়িক শৈব নহেন' ইহা স্থির করা চলে না।

ইহাতে বিরুদ্ধবাদী বলেন যে সূত্রকার ও ভাষ্যকার সম্বন্ধে ঐরূপ বলিবার সুযোগ আছে বটে, কিন্তু নৈয়ায়িকচূড়ামণি বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন যখন ঐ ন্যায়সূত্রের বৃত্তিগ্রন্থ রচনা করিতে উদ্যত হইয়া দেবতার স্মরণ করিলেন, তখন প্রথমতই তিনি অতি ভক্তি সহকারে 'সজলজলদ-শ্যামলতনু ব্রজবধূজনের অপূর্ব্বানন্দধনি শ্রীকৃষ্ণেরই' স্মরণ করিলেন। পরেও কিন্তু মুখ্যরূপে ত্রিপুরারি শিবের প্রণাম না করিয়া তাহাকে তিনি অতি গৌণভাবে গ্রহণ করিয়া 'ভবানীর চরণনখদীধিতিকেই চিন্তা করিয়াছেন'। যথাক্রমে ঐ শ্লোক দুইটী এই—

বপুর্নীলালক্ষ্মীজিতবলনকোটির্জলধরু-
র্জনানানন্দং কমপি কমনীয়ং বিরচয়ন্।
ন কোঽপি প্রেমাণং প্রথয়তু মনোমন্থিরচর-
দ্বিলোকীলোকানাং সজলজলদশ্যামলতনুঃ ॥ ১ ॥
মযূরাঃ কুর্বন্তু প্রথমভিনবানিন্দিতালকুকারকুত্যা
সখা-দীধূভানোরতিকুটিলতরাঃ চূর্ণয়ন্তীনভিখ্যাম্।
মানবাম্ভোকনব্রজিপুবহুশিরোরত্নভাস্বদ্বিশেষঃ
ভূয়ো ভবাং বিদধাতু চরণনখরুচঃ ভাবয়ামো ভবানীম্ ॥ ২ ॥

ঐ দুইটী শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকের তৃতীয় চরণটী ভবানীর চরণনখদীধিতির বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে; উহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই—'মহাদেব ভবানীর ভক্ত-ভজনের জন্য ভবানীর চরণে নত হইয়াছেন, কাজেই ভবানীর চরণনখের দীধিতি মহাদেবের শিরের ভূষণরূপে পরিণত হইয়াছে।' দেবতার স্বরূপবর্ণনা স্মৃতি হইলেও কোনও শৈবের পক্ষে ইষ্টদেব শিবকে ঐভাবে ভবানীর চরণপ্রান্তে নত করিয়া তাহার চরণনখের দীধিতিকে শিবের শিরোভূষণরূপে বর্ণনা করা খুব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। বিশ্বনাথ যদি শৈব হইয়াও প্রথমতঃ শিব দেবতাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রণতি ও উক্তরূপে নিজ ইষ্টদেবতা শিবের বর্ণনাকে সমীচীন মনে করিয়া থাকেন, তবে বলিতে হইবে যে নিজ ইষ্টদেবতার শক্তি বিষয়ে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। আরও দেখা যায় যে ঐ বিশ্বনাথই যখন 'রাজীব-দৃগ্ বশংবদ' হইয়া ভাষাপরিচ্ছেদ বা কারিকাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি শিবকে একেবারেই বাদ দিয়া পরমেশ্বররূপে একমাত্র 'নূতনজলধররুচি শ্রীকৃষ্ণকেই' প্রণাম করিলেন।

তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সেই বিশ্বনাথই যখন ঐ কারিকাবলীর টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন প্রথমতঃ 'ভবো ভবতু ভবানী' বলিয়া শিবেরই স্মরণ করিলেন। অতএব তিনি যে শৈব, এ কথা বলিবার পক্ষে কি বাধা থাকিতে পারে। উক্ত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মূলে তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন এবং টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর প্রারম্ভও বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথ একমাত্র শিবেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। কারণ 'ভবো ভবতু ভবানী' বলিয়া শিবের স্মরণের পরেই নানাবিধ বিচিত্রার্থ শব্দসম্ভার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর কথা উল্লেখ করিয়া তাহারই বক্ষে মুক্তামালার ন্যায় সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর ন্যাস করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তিন স্থানে তিন রীতিতে দেবতার স্মরণ করিয়াছেন। একস্থলে তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছেন, অপর দুই স্থলের একস্থলে প্রথম মহাদেবকে স্মরণ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছেন এবং অন্যস্থলে প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া পরে মহাদেবকে স্মরণ করিয়াছেন। ইহাতে তাহাকে শৈব বলা অপেক্ষা বৈষ্ণব বলাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ ভাষাপরিচ্ছেদের মূল গ্রন্থে যখন তিনি একই মাত্র দেবতার প্রণাম করিয়াছেন, তখন শিবকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন। এই ত গেল বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের কথা।

নৈয়ায়িকপ্রবর হরিদাস ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তির বোধ-সৌকর্য্যার্থে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের কারিকাংশের যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, তাহার প্রারম্ভে তিনি বালরূপী 'গোপতনয়' শ্রীকৃষ্ণেরই স্পষ্টরূপে প্রণাম করিয়াছেন।

নৈয়ায়িকপ্রবর রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার রঘুনাথশিরোমণি-কৃত পদার্থতত্ত্বনিরূপণের টীকার প্রারম্ভে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ন্যায় প্রথমতঃ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও পরে কামহন্তা মহাদেবকে স্মরণ করিয়াছেন।

রামতর্কালঙ্কার আত্মতত্ত্ববিবেকের দীধিতি গ্রন্থের টীকা করিতে গিয়া 'শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্ব'ই আশ্রয় করিয়াছেন।

রাধামোহনগোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতি নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি বহু ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও স্মৃতিগ্রন্থের উপাদেয় টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ বিদ্যাবাচস্পতি স্বকৃত ন্যায়সূত্রবিবরণের প্রারম্ভে 'নত্বা শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জং' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রণতিই করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষখণ্ডের তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্যও 'নত্বা নন্দ-তনূরুমুন্দরপদং' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই প্রণাম করিয়াছেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কার স্বতন্ত্রভাবে ন্যায়শাস্ত্রীয়-পঞ্চলক্ষণবোধের জন্য যে তর্কামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে প্রথমে 'শ্রীবিষ্ণুচরণাম্বুজ'ই স্মরণ করিয়াছেন। এ অবস্থায়ও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়কে একনিষ্ঠ শৈব বলা কতদূর সমীচীন তাহা শৈববাদী সম্প্রদায়ই বিবেচনা করিতে পারেন।

এ বিষয়ে শৈববাদী সম্প্রদায় বলেন—যে সকল ন্যায়-শাস্ত্রীয় গ্রন্থকারের ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শিরোরত্নস্বরূপ, যে সকল গ্রন্থকেই প্রধানতঃ ঐ সম্প্রদায় প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং যে সকল উপাদেয় গ্রন্থরাজির আবির্ভাব ও প্রভাববশতই ন্যায়শাস্ত্র সুসমৃদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আজও ভারতবর্ষের অসীম গৌরব ঘোষণা করিতেছে, ঐ জাতীয় কতিপয় গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহার গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবরূপে প্রসিদ্ধ শিব দেবতাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থেরই আলোচনা করা যাউক।

নব্যন্যায়শাস্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গঙ্গেশোপাধ্যায় তত্ত্ব-চিন্তামণি গ্রন্থের প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণশ্লোক নিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা ভগবান্ শিবেরই নমস্কারসূচক। ঐ শ্লোকের অন্তিম অংশ উল্লেখ করিলেই উহা সম্যকরূপে প্রতীত হইবে। যথা,—

'নমস্তস্মৈ কস্মৈচিদমিতমহিম্নে পুরভিদে'

এস্থানে 'পুরভিদ্' শব্দের অর্থ ত্রিপুরারি মহাদেব, অন্য কোনও দেবতা নহে। অতএব নব্যন্যায়শাস্ত্রের মূল পুরুষ গঙ্গেশোপাধ্যায় যখন ভগবান্ ত্রিপুরারি মহাদেবকে নমস্কার করিয়াই গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন, তখন ইহা দ্বারাই নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শৈবত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। ইহাতেও কিন্তু প্রতিপক্ষগণ ঐ কল্প স্বীকার করিতে রাজী নহেন; তাহারা বলেন যে ইহাও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শৈবত্ব সাধনে যথেষ্ট প্রমাণ নহে, কারণ 'পুরভিদ্' শব্দের অর্থ আপাততঃ ত্রিপুরারি মহাদেব প্রতীত হইলেও 'পুরং শরীরং ভিনত্তি' এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিয়া যিনি মুক্তিদান করিয়া শরীরের একান্ত বিচ্ছেদ সাধন করেন, তাহাকেও পুরভিদ্ শব্দ দ্বারা বুঝাইতে পারে। যিনি বৈষ্ণব তিনি বিষ্ণুকে, যিনি শৈব তিনি শিবকে, যিনি শাক্ত

তিনি শক্তিকে এবং যিনি অন্য যে দেবতার উপাসক তিনি সেই দেবতাকেই মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব ইহা দ্বারাও নৈয়ায়িকের শৈবত্ব ব্যবস্থাপন করা সুসম্ভব নহে।

তার্কিকশিরোমণি দীধিতিকার রঘুনাথ যে অনুমান-তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির প্রারম্ভে—

'ওঁ নমঃ সর্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥'

এইরূপ নমস্কারশ্লোক নিবদ্ধ করিয়াছেন, উহাতে রঘুনাথের দেবতা বিষয়ে কোনও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিপন্ন হয় না। ঐ শ্লোক সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ পক্ষে সম্বতার্থ করিয়া লইতে পারেন। অতএব উহা দ্বারাও একতর পক্ষ স্থির করা অসম্ভব।

মহামনীষী মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রত্যক্ষ-খণ্ডের দীধিতিব্যাখ্যার প্রারম্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছেন, সেইরূপ অনুমানদীধিতিব্যাখ্যার প্রারম্ভে 'অভিবন্দ্য মুহুঃ সনাদরাৎ পদপাথোজযুগং পুরদ্বিষঃ' এই বলিয়া 'পুরদ্বিষ্' শব্দ দ্বারা দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতেও মহাসমস্যারই সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যক্ষখণ্ডের গদাধরকৃত নমস্কারের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে হয় 'পুরদ্বিষ্' শব্দের অর্থ মুক্তিদাতা স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা না হইলে 'পুরদ্বিষ্' শব্দের স্থানে 'মুরদ্বিষ' শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। অতএব উহাও নৈয়ায়িকগণের শৈবত্বসাধনপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নহে।

এখন দেখিতে হইবে যে উদ্যোতকর, বাচস্পতিমিশ্র, উদয়নাচার্য্য, বর্দ্ধমানোপাধ্যায় ও জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িক-শিরোমণিগণের গ্রন্থে একতর পক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।

সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নৈয়ায়িকচূড়ামণি ন্যায়নিবন্ধ ও তাৎপর্য্য টীকার নির্ম্মাতা বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়নিবন্ধের প্রারম্ভে কোনও দেবতারই বাচনিক নমস্কার করেন নাই। তাৎপর্য্য টীকার প্রারম্ভেও দেবী সরস্বতীর প্রণাম করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়নিবন্ধের অন্তিম ভাগে—

'সংসারজলধিসেতৌ বৃষকেতৌ সকলদুঃখশমহেতৌ।
এতস্য ফলমখিলমর্পিতমেতেন শ্রীয়তামীশঃ।

এই বলিয়া 'বৃষকেতু' শব্দ দ্বারা শিবেরই আশ্রয় লইয়াছেন।

নৈয়ায়িকচূড়ামণি বর্দ্ধমানোপাধ্যায় যখন উদয়নকৃত তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির টীকা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে শিবের নাম করিয়াই তদীয় বিলক্ষণ স্বরূপ বর্ণনাপূর্ব্বক বন্দনা করিয়াছেন। যথা—

'অজ্ঞানাং পরিমানমিন্দুকলিকা দত্তে শিরস্তস্ত্রিয়ঃ
স্বান্যপ্রবিতঃ শিবো হৃদি শিরোরঙ্গে সরিদ্ভাতি।
যং পশ্যন্তি নিরন্তরারমনসঃ সংসারবন্ধোজ্ঝিতং
তং কঞ্চে ধৃতকৃত্তিবল্লিফণিকঃ কারুণ্যসিন্ধুং শিবম্।'

শিব শব্দের অর্থান্তরসম্ভাবনা থাকিলেও প্রথমাংশে যে স্বরূপের বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাতে এই শিব শব্দের অর্থ মহাদেব ত্রিপুরারি ব্যতীত অন্য কেহ হইতে পারে না। ন্যায়-বার্ত্তিককার উদ্যোতকরাচার্য্য ন্যায়বার্ত্তিকের প্রারম্ভে বাচনিক কোনও দেবতার নমস্কার করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের শেষভাগে পঞ্চম অধ্যায়ের সমাপ্তিপুষ্পিকায় 'পাশুপতাচার্য্য' বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। যথা—'ইতি শ্রীপরমর্ষিভারদ্বাজ-পাশুপতাচার্য্য-শ্রীমদুদ্যোতকরাচার্য্য-কৃতৌ ন্যায়বার্ত্তিকে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ'; অতএব উদ্যোত-করাচার্য্য যে শৈব ছিলেন, ইহাও কথঞ্চিৎ প্রমাণ করা যাইতে পারে।

ন্যায়পরমাচার্য্য উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের প্রারম্ভে ঈশ শব্দ দ্বারা যে দেবতার প্রচ্ছন্নভাবে স্মরণ করিয়াছেন, তিনি যে শিব ব্যতীত আর কেহই নহেন, তাহা তদীয় পরবর্ত্তী গ্রন্থাংশ আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। ঐ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থেই উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—'শব্দোল্লেখ-কলঙ্কিতিঃ কিমপরৈস্তন্ত্রে প্রমাণং শিবঃ'। এখানে অপর সকলকে বাদ দিয়া একমাত্র শিবকেই প্রমাণ পুরুষ বলিয়া ব্যবস্থাপন করায় উদয়ন যে শৈব ছিলেন ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে দার্শনিকপ্রবর মাধবাচার্য্য অক্ষপাদ দর্শনে ঈশ্বর প্রমাণ করিবার প্রসঙ্গে 'এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে' এইরূপ শ্রুতির উল্লেখ করিয়া ন্যায়মতে শিবই যে ঈশ্বরপদবাচ্য ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন। ন্যায়মঞ্জরী-গ্রন্থকার জয়ন্তভট্ট ন্যায়সূত্রের বিবরণরূপ ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে স্পষ্টরূপে শম্ভু ও শম্ভুশক্তি ভবানীকেই প্রণাম করিয়াছেন।

এইরূপ আলোচনাদ্বারা সুপ্রসিদ্ধ কতিপয় প্রাচীন নৈয়ায়িক শৈব বলিয়া সিদ্ধ হইলেও পরবর্ত্তী বিশ্বনাথ রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার জগদীশ ও গদাধর প্রভৃতির গ্রন্থারম্ভে বিষ্ণু

উপাস্যতা দেখিয়া নিতান্তই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, নৈয়ায়িকগণ শৈব কি বৈষ্ণব ?

আমরা কিন্তু নৈয়ায়িক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দার্শনিকের নির্দ্দিষ্টরূপে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত এক এক দেবতা স্বীকার করিতে রাজী নহি। যিনি নৈয়ায়িক তিনি শৈব বা শাক্ত যে কোনওরূপ হইতে পারেন। নৈয়ায়িককে যে শৈবই হইতে হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই। অতএব নৈয়ায়িক কোনও স্থলে শৈব এবং কোনও স্থলে বৈষ্ণব বা কোনও স্থলে অন্যান্য দেবতার উপাসকও হইতে পারেন।

কেহ কেহ আবার বলেন যে গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকার যাহাকে নমস্কার করিবেন, তাহাকেই যদি সেই গ্রন্থকারের ইষ্টদেবতা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তবে বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চানন ও রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতির ইষ্টদেবতা শিব ও বিষ্ণু উভয়কেই স্বীকার করিতে হয়। কারণ উহারা নিজ নিজ গ্রন্থে শিব ও বিষ্ণু এই দুই জনকেই নমস্কার করিয়াছেন। অধিকন্তু আবার বিশ্বনাথ ভগশক্তি ভবানীকেও বাদ দেন নাই।

অতএব গ্রন্থারম্ভে প্রথম দ্বারাই গ্রন্থকারের বা তৎ-সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা নির্দ্ধারণ করা একান্ত অসম্ভব। তবে একই গ্রন্থকার একই গ্রন্থে বা বিভিন্ন গ্রন্থে যে বিভিন্ন দেবতার নমস্কার করিয়াছেন, উহা বিভিন্ন উদ্দেশ্যসিদ্ধিমূলক বলিয়া উপপাদন করা যাইতে পারে।

প্রাচীন প্রসিদ্ধ প্রমাণ দেখা যায়, 'আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেজ্জ্ঞানমিচ্ছেজ্জ্ঞনার্দ্দনাৎ জ্ঞানঞ্চ। শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তি-মিচ্ছেজ্জ্ঞনার্দ্দনাৎ' অর্থাৎ সূর্য্যের নিকট আরোগ্য, অগ্নির নিকট ধন, শিবের নিকট জ্ঞান ও জনার্দ্দন বিষ্ণুর নিকট মুক্তি কামনা করিবে।

যিনি শৈব তিনিও মুক্তিকামী হইলে বিষ্ণুর আশ্রয় লইবেন, আর যিনি বৈষ্ণব তিনিও জ্ঞানকামী হইলে শঙ্করের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, কুসুমাঞ্জলি-কারিকার টীকাকার হরিদাস ভট্টাচার্য্য ও প্রত্যক্ষদীধিতির টীকাকার গদাধরভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যখন ভাষাপরিচ্ছেদ প্রভৃতি-গ্রন্থনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন হয়ত তাহা-দিগের চিত্তে মুক্তিকামনা প্রবল হইয়াছিল, এই জন্যই মুক্তির দেবতা বিষ্ণুর আশ্রয় লইয়াছিলেন। আবার যখন ঐ বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননই কারিকাবলীর টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে বসিলেন তখন টীকাগ্রন্থ নির্ম্মাণে বিশিষ্ট জ্ঞানের উপযোগিতা মনে করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞানকামনায় 'ভবের জন্য' ভব বা শিবকেই আশ্রয় করিলেন। সেখানেও তিনি মূল গ্রন্থনির্ম্মাণকালীন মুক্তি-কামনাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকামনা করেন নাই, কাজেই পরবর্ত্তী শ্লোকেই আবার 'বিকোর্বক্ষসি বিশ্বনাথকৃতিনা সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী, বিষ্ণস্তা মনসো মুদং বিতনুতাং সদ্যুক্তিরেষা চিরম্' বলিয়া বিষ্ণুকেও স্মরণ করিয়াছেন। গদাধর ভট্টাচার্য্যও অনুমানদীধিতির ব্যাখ্যানির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া শিরোমণির অতি দুর্বোধ সন্দর্ভের ব্যাখ্যা কার্য্যে জ্ঞানেরই বিশেষ উপযোগিতা নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানদাতা শঙ্করেরই নমস্কার করিয়াছেন। অতএব একই ব্যক্তির বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক বিভিন্ন ফলপ্রদ শাস্ত্রানুশিষ্ট শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতির নমস্কার দ্বারাই যে গ্রন্থকারের শৈবত্ব বা বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না ইহা বলা যাইতে পারে।

আমরা এমন বহু নৈয়ায়িকের কথা জানি, যাঁহারা কুল-পরম্পরাক্রমে বিষ্ণুরই উপাসক। বিষ্ণুই তাঁহাদের ইষ্টদেবতা। আবার এমনও অনেক নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন ও আছেন যাঁহারা একান্ত শৈব। একমাত্র শিবকেই তাঁহারা সর্ব্বার্থ-সাধক মনে করিতেন বা করিয়া থাকেন। ঐরূপ আবার শাক্তসম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন ও আছেন। অতএব নিজ নিজ ইষ্টদেবতার সহিত দর্শন বিশেষের আলোচনা বা পাণ্ডিত্যের নিয়মিত সম্বন্ধ আছে, ইহা আমরা কোনও মতেই স্বীকার করিতে পারি না। কারণ উহার বিরুদ্ধে বহু যুক্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক যে দার্শনিকপ্রবর গুণরত্নসূরি প্রভৃতির গ্রন্থে যে ন্যায়দর্শনের শৈবদর্শন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, ইহার কারণ কি ? আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে দর্শনে যে দেবতাকে ঈশ্বররূপে ব্যবস্থাপন করা হইয়াছে, সেই দর্শনকে সেই দেবতার দর্শন বলা হইয়াছে। ন্যায়দর্শনের মতানুযায়ী কোনও কোনও গ্রন্থে শিবকেই ঈশ্বররূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের 'শক্যোন্মেষকলঙ্কিতঃ কিমপরৈরস্মে প্রমাণং শিবঃ' এই অংশ এবং মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে অক্ষপাদদর্শনের 'এষ এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতত্বে' এই অংশ উল্লেখ করা যাইতে পারে। আরও কারণ এই যে, বহু প্রাচীন কালে যে সকল

নৈয়ায়িক পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উদয়নাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্র গঙ্গেশোপাধ্যায় বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থকর্ত্তা জয়ন্তভট্ট প্রভৃতির নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; তাঁহারা সকলেই প্রায় সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে শিবকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং নিজ নিজ অভিমত সিদ্ধির জন্য তাঁহারই আশ্রয় লইয়াছেন। এই দুই কারণেই বোধহয় ন্যায়দর্শনকে শৈবদর্শন বলা হয়।

ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন এই উভয় দর্শনেরই ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ত্ব অভিন্ন প্রকার, কেবলমাত্র ঐ দুই দর্শনের প্রমাণাদি কতিপয় তত্ত্ব সম্বন্ধেই মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ঈশ্বররূপে অভিমত শিবের সংজ্ঞা লইয়া যেমন ন্যায়দর্শনকে শৈবদর্শন বলা যায়, ঐরূপ শিবেরই পশুপতি সংজ্ঞা লইয়া বৈশেষিক দর্শনকে পাশুপত দর্শন বলা যাইতে পারে। ঐ যুক্তি অনুসারে উক্ত দুইটী সংজ্ঞার বিনিময় করিয়াও ব্যবহার করা সম্ভবপর।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, অক্ষপাদপ্রভৃতি মুনিগণ যে যে দেবতার শক্তির আবেশে আবিষ্ট হইয়া ন্যায়প্রভৃতি দর্শনসমূহের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সেই দেবতার সংজ্ঞা অবলম্বন করিয়াই সেই সেই দর্শন নিজ নিজ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। পুরাণ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহর্ষি অক্ষপাদ শিবশক্তি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করিয়াছিলেন, মহর্ষি কণাদ ও শিবশক্তির আবেশে আবিষ্ট হইয়াই বৈশেষিক দর্শন নির্ম্মাণ করেন, অতএব ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন শিবের সংজ্ঞা লইয়াই যথাক্রমে শৈবদর্শন ও পাশুপত দর্শন। ঐ যুক্তি আমরা সমীচীন মনে করি না, কারণ অক্ষপাদ ও কণাদ শিবশক্তির আবেশে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন নির্ম্মাণ করিয়াছেন এই কথা আমরা যে পুরাণাংশের আলোচনায় জানিতে পারি, সেই পুরাণাংশেই কপিলাদি মহর্ষিগণও যে শিবশক্তির আবেশে আবিষ্ট হইয়াই সাংখ্যাদি দর্শন শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ইহাই জানিতে পারা যায়। যথা—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পার্ব্বতীর প্রতি শিব বলিতেছেন—

'প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সম্প্রোক্তানি ততঃ পরম্।
কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ
পৌডুলেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন বৈ।'

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ন্যায়দর্শনকে শৈবদর্শন ও বৈশেষিক দর্শনকে পাশুপত দর্শন বলিতে হইলে সাংখ্যাদি দর্শনকেও শৈবদর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু কাপিলাদি দর্শনকে কেহ কোথায়ও শৈবদর্শন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনকে যথাক্রমে শৈবদর্শন ও পাশুপত দর্শন বলিবার পক্ষে আমরা ইতঃপূর্ব্বে নিঃসন্দিগ্ধভাবে যে যুক্তির উপন্যাস করিয়াছি, তাহাই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে বাস্তবিক পক্ষে নৈয়ায়িকগণ শৈব হইলেও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্লাবনে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, তৎপরবর্ত্তী কতিপয় গ্রন্থকারই শৈব হইয়াও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির আতিশয্যে নিজ নিজ গ্রন্থে শিবকে ছাড়িয়া বিষ্ণুর প্রণাম করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারের মধ্যে কেহই ঐরূপ করেন নাই। এ কথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কারণ পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, আমাদের পরিচিত এমন বিলক্ষণ বহু সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন ও আছেন, যাঁহারা প্রকৃতই বৈষ্ণব বা শাক্ত কিন্তু শৈব নহেন। অতএব নৈয়ায়িকের দেবতা শিবই হইবেন একথা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক।

গুণরত্নসূরিকৃত টীকায় যে নৈয়ায়িকগণকে শৈব বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য যদি এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায় যে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিক্রমে ন্যায়দর্শন শৈবদর্শন বলিয়া সিদ্ধ হইলে ঐ শৈব অর্থাৎ শৈবদর্শন যাঁহারা জানেন বা অধ্যয়ন করেন এই অর্থে শৈব শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া সকল নৈয়ায়িকের বিশেষণরূপেই ঐ শৈব শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শিব যাহার দেবতা এই অর্থে শিব শব্দের পর অণ্ বা ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া যে শৈব শব্দ নিষ্পন্ন হয় ঐ শৈব শব্দটী সকল নৈয়ায়িকের বিশেষণরূপে প্রয়োগ করিতে আমরা রাজী নহি, যেহেতু সকল নৈয়ায়িকেরই ইষ্টদেবতা শিব নহেন। সমগ্র নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের বিশেষণরূপে উক্ত ব্যুৎপত্তিযুক্ত শৈবশব্দ প্রয়োগ করিলে উহাকে আমরা ভ্রান্তির অন্যতম বিলাস বলিয়া উপেক্ষাই করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—হে নৈয়ায়িকের দেবতা! তুমি যে হও সে হও, তোমাকে নমস্কার। তুমি শিবরূপী হও, বিষ্ণুরূপী হও, শক্তিরূপী হও বা নীরূপ হও, তোমারই করুণায় আবার ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগের মত ন্যায়শাস্ত্রীয় প্রতিভা প্রকাশিত হইয়া ভারতবর্ষকে সমগ্র পৃথিবীর নিকট বরণীয় করুক। হে সর্ব্বশক্তিময় দেবতা! তোমাকে আবার নমস্কার !!

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

(১৬)

সদর দরজায় দারোগান থাকিত। অন্য দিকের একটি দরজা খুলিয়া লতা বাহির হইয়া পড়িল; বড় রাস্তা ধরিয়া সোজা একদিকে ছুটিয়া চলিল। কোথায় যাইবে, কি করিবে, পথে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবে, কিছুই সে জানিত না। এইটুকু কেবল তার মনে হইয়াছিল, এই রাত্রির মধ্যে এই বাড়ী হইতে যতদূর সে পারে চলিয়া যাইবে। তারপর—মাথার উপরে দেবতা আছেন—সত্যই যদি থাকেন—যা করেন হইবে। কত দূর গিয়া তার মনে পড়িল, পুঁটলীটিও সে ফেলিয়া আসিয়াছে! ভাবিয়াছিল, সামান্য সম্বল যাহা আছে তাহা লইয়া চুঁচড়ায় পূর্ব্বপরিচিত কাহারও অথবা অগত্যা তাহার মামীর আশ্রয়ই আপাততঃ গ্রহণ করিবে। তারপর একটু ভাবিয়া চিন্তিল, কি হিতৈষী কাহারও পরামর্শমত ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবে। কিন্তু হায়, এখন সে যে একেবারেই নিঃসম্বল! পরিধানে ঐ একখানি বস্ত্র মাত্র, একটি কপর্দ্দকও হাতে নাই। একখানি পত্র কাহাকেও লিখিবে, পথ চলিতে না পারিলে চার-পাঁচটি পয়সাও গাড়ীভাড়ায় খরচ করিবে, সে সম্ভাবনাও নাই। কি করিবে? কি উপায় হইবে? সমস্ত শরীর তার ঝিম ঝিম করিয়া অবশ হইয়া আসিল—পাও আর চলে না। একটি গাছতলায় তখন সে বসিয়া পড়িল। গাছের গুঁড়িতে মাথাটা রাখিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইতেই একটি পাহারাওয়ালা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তরুণ বয়স্কা এক নারী সে, এই নিশুতি রাত্রিতে একা কোথায় যাইতেছে, কোথা হইতে আসিল, নাম পরিচয় কি, সদুত্তর কিছু না পাওয়ায় পাহারাওয়ালা তাহাকে থানায় লইয়া গেল—সে রাত্রির মত গারদ-ঘরে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। তবু একটু আশ্রয় ত তখনকার মত মিলিল। লতা যেন একটু স্বস্তিই ইহাতে বোধ করিল। শরীরও একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহতলেই শুইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে দারোগাবাবু যখন আফিস-ঘরে আসিয়া বসিলেন, লতাকে আনিয়া হাজির করা হইল। দারোগাবাবু চাহিয়া দেখিলেন—বিস্ময়ে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পাহারাওয়ালা কোথায় কি অবস্থায় তাহাকে পাইয়াছে, পাইয়া থানায় লইয়া আসিয়াছে, সব বলিল। দারোগাবাবু ডায়েরী বহিতে সব লিখিয়া লইলেন। তারপর লতার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আপনি কে? দেখে ত ভদ্রঘরের মেয়ে ব'লেই মনে হচ্ছে।"

মৃদু স্বরে লতা উত্তর করিল, "হাঁ, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

"নাম কি আপনার?"

"কনকলতা দেবী।"

"স্বামী?"

হাতে লোহা এবং সীমন্তে সিন্দুর চিহ্ন দেখিয়া দারোগা অনুমান করিয়াছিলেন, নারী বিবাহিতা এবং সধবা।

একটু ইতস্তত করিয়া লতা উত্তর করিল, "স্বামী নিরুদ্দেশ।"

"নাম কি তাঁর?"

"নাম—নাম—শ্রীমোহনলাল চক্রবর্ত্তী।"

"আপনার আর কে আছেন?"

"কেউ নাই।"

"কোথায় থাকেন আপনি?"

লতা কহিল, "এক বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ ক'রতাম।"

"থাকাও সেইখেনে হ'ত?"

"হাঁ।"

"তা সেই বাড়ী ছেড়ে রাত দুপুরের পর একা কোথায় যাচ্ছিলেন?"

চক্ষে জল আসিল; কোনও মতে আত্মসম্বরণ করিয়া লতা কহিল, "সেখানে—থাকবার সুবিধা হ'ল না, তাই চ'লে এসেছি।"

"চলে এলেন—একা এই রাত্তিরে—একদম নিঃসম্বল অবস্থায়—তার মানে? শুনলাম, একখানি কাপড় কি একটি পয়সাও আপনার সঙ্গে ছিল না!"

"না।"

"তার মানে?"

"আমি—আমি—পালিয়ে এসেছি। রাত পোয়ান অবধি থাকবারও সুবিধে হ'ল না।"

"কেন? বাড়ীর কোনও লোক—আপনার ওপর—এই—এই—অত্যাচার কিছু ক'রবার চেষ্টা ক'রেছিল?"

"না।"

"তবে—রাত্তিরে একা পালিয়ে এলেন—হাঁ, ব'লছেন, যে কারণেই হ'ক রাত পোয়ান অবধি থাকবার সুবিধে হ'ল না—আসতে পারেন, কিন্তু একেবারে এইরকম নিঃসম্বল অবস্থায়—তাও কি হয় কখনও?"

লতা উত্তর করিল, "সম্বল কিছু ছিল। কিন্তু পুঁটলীটি আসবার সময় তাড়াতাড়িতে ফেলে এসেছি।"

দারোগাবাবু একটু হাসিলেন—কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় হইল না! কহিলেন, "পালিয়ে যখন এলেন, অন্য কোথাও যাবেন বলে ত বেরিয়েছিলেন?"

"হাঁ। ভেবেছিলাম—এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে উঠব।"

"সে আত্মীয় কোথায় থাকেন? এই ক'লকেতায় কোথাও?"

"না, বাইরে।"

"বাইরে! কতদূর হবে? হেঁটে যাওয়া যায়?"

"না, রেলে ক'রে যেতে হয়!"

"কি ক'রে তবে যেতেন? পালিয়ে এলেন রেলভাড়া ক'রে কোথাও যাবেন ব'লে! এ অবস্থায় সম্বল কেউ ফেলে আসে? এমন কিছুও ঘটেনি ব'লছেন, যাতে ক'রে কোনও মতে ছুটে আপনাকে এমনি ভাবে বেরিয়ে প'ড়তে হ'ল যে গুছিয়ে পুঁটলীপাটলী ক'রে কিছু নিয়ে আসবেন সে অবসর হ'ল না।"

ধীরে ধীরে লতা কহিল, "মনটা তখন বড় অস্থির ছিল।"

"হাঁ, নিশ্চয় ছিল—সেটা বুঝি। নইলে রাত্তির ক'রে কেন পালিয়ে আসবেন?—কিন্তু ভেবে চিন্তে, রাতপোয়ান অবধি থাকবার সুবিধে হবে না এইটে বেশ বুঝে, রেলে ক'রে কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে যাবেন এটাও মনে মনে ঠিক ক'রে চ'লে এলেন, আর পথের সম্বলটা সঙ্গে নিয়ে আসতেই কেবল ভুলে গেলেন?"

লতা নিরুত্তর। নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল, একদিকে একটু ঘুরিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিল। দারোগাবাবুর একটু দুঃখও হইল। সবই সম্ভব। তবে এরূপ অশ্রুপাতও সমদক্ষ নারী অনেকে করিতে পারে, করিয়াও থাকে।

কিছু কাল চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "এখানে কোন্ বাড়ীতে আপনি ছিলেন রাঁধুনীর কাছে?"

"সে ব'লতে পারব না।"

"পারব না—মানে?"

"ব'লতে চাই না আমি।"

"কেন?"

"পালিয়ে এসেছি—আমি চাইনে যে আপনারা গিয়ে খোঁজখবর কিছু করেন, একটা জানাজানি সেখানে হয়।"

"পালিয়ে কেন এলেন? কি হয়েছিল?"

"তাও ব'লতে চাইনে।"

"ব'লতেই আপনাকে হবে। না ব'লে চ'লবে না।"

"আমি ব'লব না।"

"বটে!" দারোগাবাবু ভ্রূকুটি করিলেন।

একটু কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "হাঁ, আপনার স্বামীর নাম কি ব'লেন না—মোহনলাল চক্রবর্তী?"

"হাঁ।"

"এই ক' বছর যাবৎ তিনি নিরুদ্দেশ?"

"বছর চারেক হবে?"

"তাঁর বাড়ী কোথায় ছিল?"

"এই ক'লকেতায় তিনি থাকতেন।"

"কোথায় থাকতেন? কোন্ ঠিকানায়?"

"সে একটা মেসে না হোটেলে থাকতেন, এখন উঠে গেছে।"

"দেশ গাঁ?—তাঁর পিতার নাম?"

"পিতার নাম ছিল—হরলাল চক্রবর্তী।"

"দেশ গাঁ?"

"জানি না।"

"জানেন না! সে কি? বিয়ের পর তবে কোথায় আপনাকে নিয়ে তিনি যান?"

"নিয়ে কোথাও যান না। বাবার কাছেই থাকতাম।"

"আপনার বাবা কে ছিলেন? কোথায় থাকতেন? কি ক'রতেন? দেশ বা কোথায় ছিল?"

লতা আর কূলকিনারা কিছু পাইতেছিল না। অতি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে একটিবার চাহিয়া কহিল, "দেখুন, দয়া ক'রে আমাকে মাফ ক'রবেন। ও সব কিছুই আমি ব'লতে পারব না। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চ'লে যাই।"

কঠোরস্বরে দারোগা কহিলেন, "না, সে আর পারি না। হাঁ, আর একটি কথা। আপনার স্বামী যে মেসে ছিলেন, তার ঠিকানাটা বোধ হয় আপনার জানা আছে?"

"আছে।"

"তাও ব'লবেন না?"

"না।"

নীরবে ভ্রূকুটি করিয়া দারোগাবাবু কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। শেষে কহিলেন, "দেখুন, আপনার সব কথাগুলো বড় অদ্ভুত রকম লাগছে। বড় একটা রহস্য কিছু আছে—যার কোনও সূত্রই ধরতে পারছি নি। যা সব আপনি ব'লেন, একটা কথাও তার সত্যি ব'লে এখন আর মনে হচ্ছে না।"

"তবে—কি সত্যি ব'লে মনে করেন?"

"মনে অনেক কথাই হ'তে পারে। তবে ঠিক কি তাই, আমাদের জানতে হবে। না জেনে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না, দেওয়া অতি বিপদ্‌জনক হ'তে পারে।"

"বিপদ্‌জনক—? কেন, কি আপনারা ভাবছেন?"

"ভাবতে—কিছুই এখনও ঠিক পারছি নি। তবে ভাবতে হবে। আপনি কে, পূর্ব্ব ইতিহাস আপনার কি, কোথায় ছিলেন, কোত্থেকে কোথায় একা এমনভাবে যাচ্ছিলেন, সব আমাদের জানতে হবে। আর যদ্দিন না জানতে পারি—"

"তদ্দিন—"

"তদ্দিন আপনাকে আটকে রাখতে হবে। আজ দুপুরে কোর্টে আপনাকে নিয়ে যাব। ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম নিয়ে কোনও জেলে আপনাকে রাখব। তারপর অনুসন্ধান ক'রে সব বের ক'রতে হবে।"

"কি ক'রে ক'রবেন? প্রাণ গেলেও আমি কিছু ব'লব না। কোথায় কার কাছে কি অনুসন্ধান ক'রবেন?"

হাসিয়া দারোগাবাবু কহিলেন, "সে অনেক উপায় আমাদের আছে। আপনার ফটো তুলে, কোথায় কি অবস্থায় কাল রাত্তিরে আপনাকে পাওয়া গেল, সব জানিয়ে খবরের কাগজে বের ক'রব। চেনা লোক কেউ না কেউ এসে সনাক্ত আপনাকে ক'রবেই।"

কি সর্ব্বনাশ! এমন উপায়! বিশুষ্ক বিবর্ণ মুখে অতি শঙ্কিত দৃষ্টিতে লতা একবার চাহিল—তারপর কাঁদিয়া গিয়া দারোগাবাবুর পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

"দয়া করুন! দোহাই আপনার! আপনি আমার বাবার মত—অনাথা মেয়ে ব'লে একটু দয়া করুন। একেবারে আমার সর্ব্বনাশ ক'রবেন না! ছবি তুলে দিন আর নাই দিন, কালকার ঘটনা কাগজে বেরোলেই আমার সর্ব্বনাশ হবে। বড় অভাগী আমি, কিন্তু আমার দুঃখের কথা কাউকে ব'লবার নয়। জানাজানি যদি একটা হয়—আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া আর গতি আমার কিছু থাকবে না। তাতেও দুঃখ কিছু ছিল না। কিন্তু—কিন্তু—একটা ছেলে র'য়েছে—তাকে দেখবে, মানুষ ক'রে তুলবে, কেউ আর এমন নেই।"

"ছেলে! ছেলে কোথায় আছে? কার কাছে?"

"আমার মার কাছে—কাশীতে। তিনিও এক বাড়ীতে রেঁধে দুটি খান। মাইনে কিছু পান না, খোরাকী আর থাকবার একটু দায়গা কেবল পেয়েছেন—ছেলেটিকে কি খাওয়াবেন?"

"কাশীতে—কোথায়—কার বাড়ীতে তিনি আছেন?"

পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া লতা কহিলেন, "দোহাই আপনার! দয়া করুন—আর কিছু সুধোবেন না—ব'লতে পারব না। ব'লেই সব জানাজানি হবে। লুকোন কিছু থাকবে না। দেখুন, বড় অভাগী আমি—একেবারে অসহায় নিরাশ্রয়। ভাগ্যের ফেরে আবার এমন একটা সঙ্কটে জড়িয়ে পড়েছি—সে আর কাউকে ব'লবার নয়। বিশ্বাস করুন, মাথার উপরে ধর্ম্ম আছেন, দেবতা আছেন—ছেলের মা আমি, সেই ধর্ম্মের নামে দেবতার নামে দিব্যি ক'রে ব'লছি, অসৎ দুষ্ট আমি নই—যা সন্দেহ হয় ত ক'রছেন—কোনও বিপ্লব দলের মেয়েও আমি নই—তার কোনও সম্পর্কেও রাত্তিরে গুকা এতাবে পথে বেরোইনি। কি ক'রে আর বোঝাব জানি না, বোঝাতে

হ'লে ম'রে আমাকে বোঝাতে হবে, আমি যা ব'লছি সব সত্যি। কিন্তু—কিন্তু—মরতে আমি চাই নে—ঐ ছেলেটাকে ফেলে ম'রতে আমি যে পারিনে। ঘটো ভুলে বিজ্ঞাপন দেবেন ব'লছেন—এটা জানবেন, তা দেখে সনাক্ত ক'রতে যে আসবে, জীবিত আমাকে দেখতে পাবে না।"

উবুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে দারোগাবাবুর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু-প্লাবিত মুখখানি লতা তাহার উপরে রাখিল।

দারোগাবাবুরও চক্ষে তখন জল আসিল—রুমালে মুছিয়া কহিলেন—"উঠুন—আর কাঁদবেন না। বামুনের মেয়ে ব'লছেন, আমার পায়ের উপরে ওভাবে জড়িয়ে প'ড়ে থাকবেন না।"

পা ছাড়িয়া দিয়া লতা একটু সরিয়া বসিল। হাঁটুর উপরে দুই হাতে ঢাকা মুখখানি রাখিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দারোগাবাবু কহিলেন, "শুনুন, একটু স্থির হ'ন। হাঁ—হ'তে পারে—কিছুই অসম্ভব এ পৃথিবীতে নয়—হ'তে পারে, অপরাধ এমন কিছু করেন নি—অথচ ঘটনাচক্রে এমন সঙ্কটে প'ড়েছেন, যাতে ক'রে আত্মগোপন ক'রেই আপনাকে থাকতে হবে, নইলে সত্যিই বড় একটা কিছু অনিষ্ট আপনার হতে পারে। তবে—আমিই বা কি করি বলুন? থানায় আপনাকে আনা হ'য়েছে, ডায়রী লেখা হ'য়েছে—সবাই এরা সব দেখছে, জানছে। সন্তোষজনক একটা কৈফিয়ৎ কিছু না দেখিয়ে কি ক'রে আপনাকে ছেড়ে দিই? সে দায়িত্ব আমি নিতে আর পারি না, কোর্টে নিয়ে আপনাকে হাজির আমাকে ক'রতেই হবে। ম্যাজিস্ট্রেটই বা তখন এই রকম কিছু একটা কৈফিয়ৎ ছাড়া কি ব'লে বেকসুর আপনাকে ছেড়ে দেবেন?"

"তাহ'লে কি হবে? উপায় কি আর কিছুই নেই?"

একটু ভাবিয়া দারোগাবাবু কহিলেন, "হাঁ, যে অবস্থায় যে কারণেই একা আজ এভাবে পথে এসে দাঁড়াতে হ'ক, বেশ বুঝতে পারছি, আপনি সম্ভ্রান্ত, অন্তত শিক্ষিত কোনও ভদ্রঘরের কন্যা, নিজেও শিক্ষিতা, অতি বুদ্ধিমতী—বেশ একটু উচ্চচিন্তাও বটেন। আপনাকে বেশ জানেন, সম্ভ্রান্ত এমন লোকও এই ক'লকেতার কেউ কেউ হয়ত থাকতে পারেন। এমন কারও নাম ক'রতে পারেন, যাঁকে আপনি বিশ্বাস ক'রতে পারেন, আর আপনার খুঁটিনাটি পরিচয় কিছু না নিয়েও কেবল যাঁর কথার উপরে নির্ভর ক'রে যাঁর জামিনে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি?"

একটু ভাবিয়া লতা কহিল, "আছেন একজন—আমাকে বেশ জানেন।—এখানকার একজন বড়লোকই তিনি, হয় ত নাম শুনেও থাকবেন। আমার জামিন হ'তে রাজি তিনি হ'তে পারেন। আর আমার অনিচ্ছায় আমার পরিচয় প্রকাশ ক'রে অনর্থক বিপন্ন আমাকে ক'রতে চাইবেন, এমনও মনে হয় না।"

"কে তিনি বলুন?"

"ব্যারিষ্টার সুকেশ চৌধুরী।"

"ব্যারিষ্টার সুকেশ চৌধুরী? বলেন কি? তিনি আপনাকে জানেন! এখানকার অতি বড় একজন নামজাদা লোক যে তিনি!—সব রকম বড় বড় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন—দেশের বড় একজন নায়কই যে তিনি এখন হ'য়ে উঠেছেন। বটে! তিনি আপনাকে জানেন! কোথায় কি ভাবে পরিচয় হয়?"

একটু কি ভাবিয়া লতা উত্তর করিল, "এইটুকু অন্তত ব'লতে পারি—তাঁকেও বোধ হয় এটা আপনাদের ব'লতে হবে। আমার মামার বাড়ীতে আমি থাকতাম, আমার সেই মামার বাড়ী তাঁদেরই গাঁয়ে, তাঁদেরই বাড়ীর কাছে।"

"বটে! আচ্ছা, এখুনি তাঁকে ফোন ক'রছি তবে।" বলিয়াই দারোগাবাবু উঠিলেন। লতা কহিল, "কেবল লতা ব'লেই সবাই আমাকে ডাকে, সেই নামটাই ব'লবেন।"

পাশের ঘরেই ফোন ছিল। একটু পরেই দারোগাবাবু ফিরিয়া আসিলেন—কহিলেন, "হাঁ, সুকেশ চৌধুরী আপনাকে চেনেন বটে—এখুনি আসছেন, ভবানীপুরেই তিনি থাকেন। আপনি উঠে স্থির হ'য়ে ঐ চৌকিতে বসুন। যান, চোখ মুখটা বরং একটু ধুয়ে মুছে আসুন গে।"

লতা বাহিরে গেল। চক্ষু মুখ ধুইয়া আঁচলে মুছিয়া এক-পাশে একখানি বেঞ্চির উপরে আসিয়া বসিল। দারোগাবাবু একবার চাহিয়া দেখিলেন—কিছু আর বলিলেন না।

পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সুকেশ চৌধুরী আসিয়া পৌঁছিলেন। লতা উঠিয়া নমস্কার করিল। স্মিতমুখে ঈষৎ শিরঃসঞ্চালনে সেই নমস্কার স্বীকার করিয়া লইয়া দারোগাবাবুর সম্মুখে তিনি বসিলেন। সব কথা শুনিয়া

একটু হাসিয়া লতার দিকে একবার চাহিলেন, কহিলেন, "না, ওকে বেশ জানি। গত তিন-চার বছর দেশে আমাদের বাড়ীর কাছেই ওর মামার বাড়ীতে থাকত—ও, ওর মা, আর ছোট একটি ছেলে। থাকবার সুবিধে শেষে আর হ'ল না, তাই এই মাস তিনেক বোধ হয় হ'ল, কাশী যায়। সেখানে মাস্টার মেরে দুজনেই শুনেছি রাঁধুনীর কাজ আরম্ভ করে। ও যে বাড়ীতে কাজ ক'রত, তাদের সঙ্গেই বোধ হয় এখানে এসেছে। কেমন, তাই নয় লতা?"

"হাঁ।"

"যে বাড়ীতে কাজ ক'রত, তাঁদের আমি বেশ জানি।"

লতা চমকিয়া উঠিল। সুকেশবাবুও একবার তার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"হাঁ, বিন্দী আমাদের ওখানেই গিয়েছে—তোমার সঙ্গেও নাকি দেখা হয়েছিল। তার কাছেই সব শুনলাম। ওরা আমার খুব জানাশুনো লোকই বটে। তবে—" বলিতে বলিতে দারোগাবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তবে হঠাৎ কাল রাত্তিরবেলায় কেন পালিয়ে এসেছে—সেটা ঠিক বুঝতে পারছিনি। যাই হ'ক, এখানে কিছু ব'লতে চায় না, ও যখন তাঁদের নাম পরিচয়ও কিছু জানাতে চায় না, এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির কোনও দরকার আমি দেখি না। মেয়েটি খুব ভাল, নিঃসংকোচে আমি ওর জামিন হ'তে পারি। হাঁ, একেবারে এখান থেকেই ওকে discharge ক'রে দ'একদিন ছেড়ে। বোধ হয় আপনারা দিতে পারবেন না? পারেন কি?"

"না, মাফ ক'রবেন মিষ্টার চৌধুরী, সেটা আর এখন সম্ভব হয় না।—কোর্টে ওকে আর একবার উপস্থিত হতেই হবে। সুযোগজনক একটা কৈফিয়ৎ ত আজই কিছু দেওয়া যাচ্ছে না। আপাতত আপনার জামিনেই ওকে থাকতে হবে, আর সে জামিন কোর্টই মঞ্জুর ক'রতে পারেন, তার পর একটা formal enquiry আর report—কিছু আটকাবে না তাতে, যা হয় ক'রে দেওয়া যাবে। তখন একেবারে খালাস পাবেন।"

লতার দিকে ফিরিয়া সুকেশবাবু তখন কহিলেন, "তা হ'লে যদ্দিন না পুরো খালাসের হুকুম হয়, আমার হেফাজতেই কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে লতা। কারণ একটা দায়িত্ব আমাকে নিতে হ'চ্ছে, কে জানে যদি আবার কোর্টে তোমাকে হাজির করাতে হয়—কি বল?"

একটু ভাবিয়া লতা উত্তর করিল, "হাঁ, বুঝতে পারছি। কিন্তু কোথায় থাকব? আপনার বাড়ীতে—"

"না, সেটা তোমার পক্ষে সুবিধে হবে ব'লে মনে ক'রবে না। অন্য কোথাও—হাঁ, একজন ভদ্রমহিলা, এই লেডী ডাক্তার তিনি—আমার বিশেষ পরিচিতা আর শ্রদ্ধার পাত্রীও বটে। তাঁর কাছে আপাতত তোমাকে রেখে দিতে পারি। নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেশ নিরাপদেই তাঁর ওখানে থাকতে পারবে।"

"তাই থাকব।"

দারোগাবাবু কহিলেন, "তাহ'লে এখানে আর ওঁকে আটকে রাখতে চাইনে। আপনিই সঙ্গে নিয়ে যান। এই—বেলা বারটা তক আলিপুরে ওঁকে নিয়ে যাবেন।" যত শীঘ্র সম্ভব জামিনের অর্ডার করিয়ে দেব।"

"Thanks! তাহ'লে উঠি এখন।"

"আসুন।—নমস্কার।"

"নমস্কার।—এস লতা।"

লতা উঠিল। দারোগাবাবুকে নমস্কার করিয়া সুকেশবাবুর সঙ্গে তাঁহার গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

যথাসময়ে লতাকে লইয়া আলিপুরের ফৌজদারী আদালতে তিনি উপস্থিত হইলেন। জামিন মঞ্জুর হইল। ফিরিয়া আবার লতাকে লইয়া তিনি সেই লেডী ডাক্তারের গৃহে গেলেন। যথাপ্রয়োজন বন্দোবস্ত সব করিয়া দিয়া সেখানে রাখিয়া আসিলেন।

ক্রমশঃ

ছাপাকল ও সংকেত-লিপি

(প্রবন্ধ)

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কোন রকম ছাপা জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৭৪ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ছাপার আবির্ভাব হলো চীন দেশে কাঠের ফলক খোদাই করা হয়েছে। সুং বংশের প্রতিষ্ঠাতার উদ্যোগে চীনের অনেকগুলি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এইভাবে প্রথম ছাপা হলো। তার পরেই এর প্রচলন ঢুকলো জাপানে—৭৬৪ থেকে ৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তখনকার জাপ সম্রাজ্ঞী শিয়াটোকুর ইচ্ছাক্রমে জাপানের সমস্ত কারা ও চংএ বিতরণের উদ্দেশ্যে একলক্ষ কাগজে "বৌদ্ধ-ধারণী" এভাবে কাঠের ফলকে ছাপা হলো। এই সময়ও ছাপার নিদর্শন নাকি আজও কিছু কিছু তাদের দেশে পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীর শেষভাগে চীন ও জাপান ক্রমে কাঠের ফলককে বিদায় দিয়ে ধাতু-অক্ষরের সৃষ্টি করলেন। এর বহু বৎসর পরে কোরিয়ার ধাতু-অক্ষরে ছাপার কাজ সুরু হলো ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে—তাঁর প্রথম ছাপা বইখানি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

এইভাবে প্রাচ্যে মুদ্রাক্ষর-প্রচলনের বহুশতাব্দী পরে সর্বপ্রথম ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্যে কাঠের মুদ্রা-ব্যবহার দেখা গেল। সেই প্রথম যুগে মুদ্রিত জার্মানির ২০খানি এবং নেদারল্যাণ্ডের ১০খানি পুস্তক ইউরোপের বিভিন্ন সহরের গ্রন্থাগারে আজ পর্যন্ত রক্ষিত আছে। ইউরোপে ধাতু-অক্ষরের প্রথম আবির্ভাব হলো ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে। জার্মেনির মেনজ্ সহরের গাটেনবুর্গ হলেন তার উদ্ভাবন-কর্তা। ল্যাটিন-অক্ষরে তাঁর ছাপা বাইবেলখানিই হচ্ছে ইউরোপের সর্বপ্রথম ছাপা বই। ক্রমে ইউরোপের বিভিন্ন সহর থেকে বিভিন্ন ভাষার হরফ প্রস্তুত হতে লাগলো। এইভাবে (১) মেনজ্ সহর থেকে ফাষ্ট এবং স্কোফার ক্রীক হরফে সিসিরোর গ্রন্থ সর্বপ্রথম ছাপালেন ১৪৫৭ সালে; (২) ক্যাক্সটন্ করলেন ইংরেজি হরফ ১৪৭৪ সালে; ইংরেজির প্রথম ছাপা বই হলো—"The Recuyell of the Histories of Troye"; (৩) প্রথম হিব্রু এলো ১৪৭৫ সালে, জার্মেনির একটি ইহুদি পরিবারের চেষ্টায় সমগ্র হিব্রু বাইবেলখানা ছাপা হলো ১৪৮৮ সালে; (৪) গ্রীকদের হরফে ক্রাকো সহর থেকে প্রথম ছাপা হলো 'স্তবমালা'র একখানি পুস্তক ১৪৯১ সালে; (৫) ইটালীয় হরফে ভেনিস সহরের এল্ডাস্ মানুটাস্ ১৪৯৫ সালে কবি ভার্জিলের একখানি গ্রন্থ ছাপালেন; (৬) আরবী হরফ সর্বপ্রথম দেখা গেল ১৪৯৪ সালে ইটালিতে। ভেনিস সহর থেকে তার প্রথম কোরাণ ছাপা হলো ১৫১৮ সালে; (৭) রুশীয় ভাষায় সর্বপ্রথম ছাপা হয় বাইবেলের কতকাংশ ১৫১৭-১৯ সালের মধ্যে প্রাগ সহরে; (৮) ইথিওপীয় ভাষায় তার প্রথম বই ছাপা হলো রোম সহরে ১৫১৩ সালে; (৯) সিরীয় হরফে প্রথম ছাপা হলো আলের নগরে ১৫৯৮ সালে; (১০) আর্মেনিয়ার কতকগুলি স্তব ছাপা হলো প্রথম ১৫০৭ সালে রোম সহরে; (১১) এথেলো-স্যাক্সন হরফ প্রস্তুত করলেন লোনডে ১৫৬৭ সালে; (১২) আইরিশ হরফ কুইন এলিজাবেথ দান করলেন ডাবলিনের গুফারনি সাহেবকে ১৫৭১ সালে এবং সেই বৎসরেই তার প্রথম ব্যবহার আরম্ভ হলো; (১৩) কপ্টিক হরফ প্রথম ব্যবহৃত হলো ইঙ্গোলস্টাড্ সহরে ১৬১১ সালে; (১৪) কপ্টিক ও সামারিটন হরফ প্রথম পাওয়া যায় ১৬৩৬ সালে; (১৫) গথিক ও স্কাণ্ডিনেভীয় হরফ প্রথমে প্রস্তুত করলেন ক্লানসিস্ ফুনিয়াস্ ১৭৭৭ সালে; (১৬) এউরবান হরফ প্রস্তুত করলেন উইলিয়াম ক্যাপটন ১৭৩৩ সালে।

এইভাবে নানা বর্ণমালার উদ্ভাবনায় বহিও মুদ্রাক্ষর-শিল্প ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চললো—তথাপি ১৮১১ সাল পর্যন্ত সে কর্ম-প্রগতির দ্রুতগতির সঙ্গে কিছুতেই সমানে তালে পা ফেলতে পারছিল না, কেননা এতদিন পর্যন্ত নিছক হাতের সাহায্যেই ছাপার যা কিছু কাজ চলে আসছিল—বন্ধশক্তি তাকে সাহায্য করতে পারেনি। এই বৎসর জার্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারিক কোনিগ সর্বপ্রথম তাঁর বাষ্প-চালিত মুদ্রাযন্ত্র পৃথিবীকে দান করলেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবাদপত্র 'টাইম্স্' কাগজখানি ঐ বছরে সর্বপ্রথম ছাপা হয়। প্রতি ঘণ্টায় ১৮০০ সংখ্যা ছাপার যত শক্তি তার হলো। কিন্তু যান্ত্রিক-জগৎ যে উদ্দাম গতিতে ছুটেছে—তাতে প্রাচীন যা-কিছু প্রতি নিয়তই তার কাছে নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই আজ ১৮০০ ছাপার স্থানে প্রতি ঘণ্টায় ছাপা সম্ভব হচ্ছে ১২০,০০০ সংখ্যা। এর সঙ্গে মুদ্রা-জগতের আরও কটি দান—টাইপ-রাইটার—মনোটাইপ ও লাইনোটাইপ—যান্ত্রিক-জগতের তিনটি অমূল্য নিধি। এই নির্বাক হিতৈষীগুলির জন্মকথার অল্পবিস্তর আলোচনা এইবার আমরা করবো।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কুইন আনির রাজত্বকালে হেনরি মিল টাইপরাইটার নির্মাণের সর্বপ্রথম চেষ্টা করে যান। দ্বিতীয় চেষ্টা হয় ফ্রান্সে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। তৃতীয় চেষ্টা হয় আমেরিকায় ১৮২৯ সালে। তার পর চেষ্টা করেন ফ্রান্সের আর একজন যন্ত্রবিৎ জেঁভিয়ার প্রোদিন ১৮৩৩ সালে। এইভাবে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু প্রথই আবিষ্কৃত ও নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু তার বধা থেকে দুর্বল শৈশবের ইতিহাস ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। এই ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দেই জোন প্রাউটের যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর মার্কিন বৈজ্ঞানিক ক্রিষ্টোফার শোলসের পরিকল্পনায় যে যন্ত্রটি নির্মিত হয় তাই ক্রমে রেমিংটন কোম্পানির বর্তমান যন্ত্ররূপে পরিণত হয়েছে। ১৮৮৩ সালে মিঃ ওয়েনারের এক নূতন পরিকল্পনা নিয়ে আণ্ডারউড কোম্পানি আর একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন। সিপি-কৌশলের

অতি-আধুনিক উৎকর্ষে এ দুটি যন্ত্রে বর্তমান। অবশ্য নামমাত্র গ্রহণ করে দেশে কুলে অনেকগুলি যন্ত্রই আজ পর্যন্ত বাজারে প্রচলিত হয়েছে।

তার পর বলো ও লাইনো টাইপের কথা। ১৮৮৭ সালে টাস্কলট ম্যানহাইম নামে একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক মনোটাইপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। এই দু বৎসর পরে অটমার মারগেন্থেলার লাইনোটাইপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। ইনি একজন জার্মান যন্ত্র-শিল্পী—থাকতেন আমেরিকায়। এই যন্ত্র দুটির উদ্ভাবন করে তাঁরা মুদ্রণ-জগতকে মহামূল্য সম্পত্তিই দিয়ে গেছেন। কেন না, এ পর্যন্ত ছাপার হরফগুলি হাতের সাহায্যেই একটির পর একটি করে সাজাতে হতো—যার ফলে কাজের গতিবেগ হতো মন্থর—আর ছাপাইকারের শ্রম ও ভ্রমের অন্ত থাকতো না। কিন্তু আজ যন্ত্রই যেন মানুষ হয়ে উঠেছে; যান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে টাইপ যন্ত্রের চাবি টেপা মাত্র অক্ষরের পর অক্ষর পাশাপাশি সারিবেঁধে রচনায় সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে—দেখতে না দেখতে ধরণের থেকে মুক্তি পেয়ে তার পরিবেশের জন্য-লেখা পৃথিবীর আলোয় সুপ্রকাশ হয়।

তারপর সাঙ্কেত-লিপির কথা। পৃথিবীর কোন্ যুগে এবং কোন্ দেশে যে সাঙ্কেত-লিপির প্রথম সৃষ্টি হয়—তার কোন ইতিহাসই পাওয়া যায় না। কতকগুলি ঘটনার উপর নির্ভর করে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে সাঙ্কেত-লিপির অস্তিত্ব ছিল। খ্রীষ্ট এলিজাবেথের সময় ডাঃ টিলি ব্রাইট ও পেটার বেল তাঁদের নিজ নিজ পদ্ধতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ১৭৯০ সালে শেলটন যে নূতন পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন সেটির সাহায্যে তাঁর ছোট-বাক্যখানি লিখে গেছেন। টেলরের সাঙ্কেত-লিপিই প্রথম সর্বোৎকৃষ্ট বলে গণ্য হয়। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, সুইডেন এবং স্পেনে এই পদ্ধতিই তালমাফিক হয়ে যাবতীয় হয়ে থাকে। ম্যাসন যে নীতির প্রবর্তন করেন—পরবর্তী হাতে তা অহরিত পরিবর্তিত হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর পরে বারবারের যে নীতি প্রবর্তিত হয়, সেটির পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করে। ১৮৩৭ সালে পিটম্যানের পদ্ধতি প্রকাশিত হয়। ফরাসিদের কাছে এই পদ্ধতিই আজ সর্বাধিক ব্যবহৃত। পৃথিবীর প্রায় পঁচিশটি বিভিন্ন ভাষায় এই পদ্ধতিটি রূপান্তরিত হয়েছে। এর পর গ্রেগ, অক্সফোর্ড, গেবল, লেপেটন প্রভৃতি অনুরূপ অনেকগুলি পদ্ধতিও প্রচলিত হয়েছে।

তারপর বাংলা সাঙ্কেত-লিপির কথকথা। ১৩১৮ সালে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "স্বরাক্ষর-বর্ণমালা" লিখবার সাহায্যে সাধারণ্যে প্রকাশিত করেন। কলকাতার শ্রীসুকুমার চৌধুরী এই দ্বিজেন্দ্র-রীতিকে প্রয়োজন মতে পরিবর্তিত করে নিয়ে একটি নূতন প্রথার রূপ দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। তারপর ১৩৩২ সালে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ ইংরেজি পিটম্যান-এর অনুকরণে বাংলা সাঙ্কেতের আর একটি প্রথার সৃষ্টি করেন। কলিকাতার শ্রীশশিভূষণ দাস এ বিষয়ে গবেষণার ফলে আর একটি নীতি উদ্ভাবন করেছেন। গ্রেগ-এর অনুসরণে বর্তমান প্রবন্ধের লেখকও সম্প্রতি একটি নূতন প্রথার প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি বাংলা সাঙ্কেত-লিপির যথেষ্ট লেপলিকের সৃষ্টি সম্ভব হয় নি—কারণ ছাপানো বই এবং সাধারণ শিক্ষালয়ের অভাব। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মী ধনকুবেরদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট না হলে কোন ব্যাপক ফললাভের সম্ভাবনা নেই।

বাংলা অক্ষর ও ছাপাখানার ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। হালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম ছাপানো বই। ১৭৭৮ সালে চুঁচুড়ার ছাপাখানায় এই বই ছাপা হয়। তারপর উইলিয়ম কেরী সাহেব ১৭৯৯ সালে শ্রীরামপুরে একটি বাংলা ছাপাখানা স্থাপন করেন; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক প্রথম এইখানেই ছাপা হয়। বাংলা অক্ষর গঠনের বহু প্রকার জটিলতা নিয়ে অদ্যাবধি সেকেলে বহর প্রায় একভাবেই চলে এসেছে। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার সংগ্রাম ক্ষেত্রে ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ভাষার সংস্কার যে এক অপরিহার্য প্রয়োজন—একথা যেন আমরা ভুলে না যাই। পরিবর্তন-বিরোধী মন নিয়ে যদি আমরা নিশ্চিন্ত সুবিরতায় বসে থাকি তাহলে কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে দাঁড়াতে পারে এমন ভাষা কোন কালেই গড়ে উঠবে না। আজ শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা লাইনো-টাইপ ও অক্ষর সংস্কারের জন্য যে চিন্তা, শ্রম ও সময় দান করেছেন—তার যথাযথ উপলব্ধিতাকে এখনি গ্রহণ করে যোগ্য প্রতিদান হয়ত যেন এখনই দিতে পারবে না, কিন্তু তাঁদের বহু যুগের অবগুণ্ঠন পরিয়ে ফেলে তিনি যে ভবিষ্যৎ-সংস্কারের পথ মুক্ত করে দিয়েছেন—শুধু সেই কথাই স্মরণ করে যেন আজ তাঁকে বরণমাল্য দেবে।"

তারপর বাংলা লিপন-যন্ত্র বা টাইপরাইটারের কথা। ১৯২৮ সালে এরমনসিং বানকুড়ার শ্রীদয়ারঞ্জন মজুমদার প্রথম বাংলা টাইপ রাইটার আবিষ্কার করেন। তারপর যন্ত্রের করেক পরে রেমিংটন কোম্পানির কল বাজারে বেরোয়। যন্ত্র-দুটিতে উৎকর্ষ-সাধনের যথেষ্ট অবকাশই রয়েছে। অবশ্য তার জন্য বাংলা অক্ষরগঠনের জটিলতা বড় কম দায়ী নয়। মণীষিগণের চিন্তার ফলে যতদিন না বাংলা অক্ষরের এই জটিলতা-দায়কে দূর হয়—ততদিন পর্যন্ত বাংলা ছাপাকলের দ্রুতগতি কোনমতেই সম্ভব হবে না।

এ সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিবর্তনের যে রূপ-কল্পনা আমাদের আছে তারই কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

[্ ে ৈ ো ৌ] স্বরচিহ্নগুলিকে পরিবর্তন করে। ী এর মত ব্যঞ্জনের দক্ষিণ ভাগে ব্যবহারের উপযোগী চিহ্নের উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা।

যুক্তাক্ষর নীতির পরিবর্তন করে ইউরোপীয় ভাষার মত পাশাপাশি লেখার সুবিধা সৃষ্টি করা।

"পদ-অন্বয়ে" স্বার্থকতাকে কতটা পর্যন্ত ছাড় দেওয়া চলে, তার হিসাব নির্ণয় করা।

দ্বিরুক্তির অবসান করা।

বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব'এর মধ্যে আকৃতিগত কোন পার্থক্য নির্ধারণ করা।

মিশ্র সংযোগে মূল অক্ষরের আমূল পরিবর্তন-নীতি ত্যাগ করা; যেমন—ক্ষ—ক্ষ; জ্ঞ—জ্ঞ; হ্ম—হ্ম ইত্যাদি।

এই সমস্ত সমস্যা মণীষিগণের চিন্তাকলে যদি না দূর হয়—তাহলে বর্ণ-চক্রবর্তী জগতের দরবারে প্রবেশের পক্ষতি বা অধিকার বাংলা ভাষা কি করে পাবে? আমাদের দুঃ বিষাদ, প্রাচীনের প্রতি মিথ্যা মমতার আবরণে ভুল-সংস্কারের দাবীকে আমরা চিরকালই বঞ্চিত করে রাখতে পারি না।

শ্রীমধুসূদন

বনফুল

চতুর্দশ দৃশ্য

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যৌবন সীমা পার হইয়াছেন—বয়স ৪১ বৎসর হইবে। গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। একটি গ্রন্থ সম্মুখে খোলা—চতুর্দিকে আরও নানা পুস্তক স্তূপীকৃত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তন্ময় হইয়া কখনও পড়িতেছেন—কখনও লিখিতেছেন। সহসা দ্বার ঠেলিয়া মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পরিধানে নিখুঁত সাহেবি পরিচ্ছদ। তাঁহার হাতে একখানি পুস্তক। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ।

মধু। Good evening—Pundit!

বিদ্যাসাগর। এস এস মধু—বস! কোথায় বসতে দিই তোমাকে! তুমি সাহেব মানুষ। ওরে ছিরু—

মধু। Please don't trouble yourself. এই ত বেশ বসেছি।

কৌতূহলে উপবেশন করিলেন

বিদ্যাসাগর। তোমার হাতে ওখানা কি?

মধু। বীরাঙ্গনা কাব্য। নতুন লিখেছি এখানা। একটা দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছি—ক্ষমা করবে ত?

বিদ্যাসাগর। কি বল ত!

মধু। (হাসিয়া) বইখানা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। (বইখানা খুলিয়া পড়িলেন) "বঙ্গকুলচূড়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের নাম এই কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া কাব্যকার ইহা উক্ত মহাত্মভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল।"

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) তুমি আর লোক পেলে না!

মধু। লোক অনেক আছে—কিন্তু তোমার মত লোক আর নেই। There is only one বঙ্গকুলচূড়া।

বিদ্যাসাগর। তুমি কবি মানুষ, অনেক কিছু অলীক বস্তু কল্পনা ক'রে থাক। তোমার সঙ্গে তর্কে ত পারব না।

মধু। তোমাকে বিরক্ত করলাম না ত! এ সব হচ্ছে কি?

বিদ্যাসাগর। লিখছি। (একটু পরে) তোমার বিলেত যাওয়ার কি হ'ল?

মধু। প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। দিঘিরপুরের বাড়ীটা বিক্রি করে ফেললাম।

বিদ্যাসাগর। কে কিনছে? হরিমোহন?

মধু। হ্যাঁ। আর বাকী সম্পত্তিও একজনের কাছে পত্তনি দিয়ে যাচ্ছি। সে কিছু টাকা সেলামি আমাকে অগ্রিম দেবে—তাছাড়া মাসে মাসে হেনরিয়েটাকে দেড়শ ক'রে টাকা দেবে। ওতেই চলে যাবে ওদের এখানকার খরচ। ওরা এখানে রইলো, একটু খবর-টবর নিও।

বিদ্যাসাগর। সব ঠিক ক'রে ফেলেছ তাহলে! তোমার মেঘনাদবধ ত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুচ্ছে—নয়?

মধু। হ্যাঁ। Bhudeb has introduced 'মেঘনাদ' in his school! Hemchandra, a real B. A., is editing the second edition.

বিদ্যাসাগর। তা জানি। (হাসিয়া) তোমার অমিত্রাক্ষর এখনও বাগাতে পারি নি ঠিক—কেমন যেন আটকে আটকে যায়। তোমার 'ব্রজাঙ্গনা' খাসা হয়েছে, দিব্যি গড় গড় ক'রে পড়া যায়—কোন ঘোর-প্যাঁচ নেই! বাঙলা সাহিত্যে তুমি যে একজন অসাধারণ কবি এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই আর! প্রথমে তোমার প্রতি অবিচার করেছিলাম আমি। মানে—

মধু। My dear Vid., you are great! I prize your opinion above all others because your admiration is honest and you are above flattering any man.

বিদ্যাসাগর। যা খুশি ব'লে যাও—কবিদের মুখ বন্ধ করার ত সাধ্য নেই! কিন্তু একটা কথা ভাবছি, এত টাকা-কড়ি খরচ ক'রে বিলেত যাচ্ছ—শেষ পর্যন্ত সুবিধে হবে ত?

মধু। বাঃ—সুবিধে হবে না? ব্যারিষ্টার হ'ব—

that will open a bigger scope for me—টাকা রোজগার করতে হবে—I can't rot in poverty!

বিদ্যাসাগর। কিন্তু মুস্কিল এই যে, টাকা রোজগার করার চেয়ে খরচ করার দিকেই তোমার ঝোঁকটা বেশী! টাকা এখনও যা রোজগার করছ, বুঝে সমঝে চললে তাতেই যথেষ্ট কুলিয়ে যায়। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক করে দিয়েছিলাম তোমাকে—কিছু আয় বাড়তো তাতে, কিন্তু তুমি হট্ করে ছেড়ে দিলে!

মধু। আমি পারলাম না। দক্ষিণারঞ্জন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ—সবাই আমাকে অনুরোধ করেছিলেন—কিন্তু আমি পারলাম না। It was impossible for me to carry on—রেখে ঢেকে ওরম ক'রে লেখা আমার কর্ম্ম নয়—I am not a journalist by nature. Citizen কাগজে লিখে কি বিপদে পড়েছিলাম জান ত!

বিদ্যাসাগর। জানি ত সব! কিন্তু পেট্রিয়ট চলিবার মত একটা ভাল লোকও যে দরকার। কালীপ্রসন্ন আমার ওপর ভার দিয়েছে—একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে! কৃষ্ণদাস পালকেই শেষ পর্য্যন্ত দিতে হবে দেখছি। হরিশ মারা যাওয়ার পর থেকে কাগজটাতে অভদ্রতা লেগেছে। গিরীশ আর হরিশের স্মৃতিচিহ্ন ওই কাগজখানি! ওটা নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। ভাল কথা, শুনছি নাকি নীলকর সাহেব ব্যাটারা হরিশের বিধবার নামেও মোকদ্দমা করে ডিগ্রী করছে!

মধু। শুনেছি! These planters are demons, (হাসিয়া) যদিও আমার প্রথম শ্বশুর একজন planter ছিলেন—I mean Rebecas' father—তবু ওদের সম্বন্ধে আমি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারি না। The Rogues!

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) তুমি যে নীলদর্পণের অনুবাদক একথাটা বেশ জানাজানি হয়ে গেছে।

মধু। তা খুব জানি! ওপরওলার কাছ থেকে গুঁতোও খেয়েছি এর জন্যে। But I don't care. I am sick of this horrid service! আমার বিলেত যাওয়ার আর একটা কারণও এই! I want an independent profession.

বিদ্যাসাগর। কিন্তু লং সাহেবের মনের জোরটা দেখলে একবার। জেলে গেল তবু কিছুতেই তোমার নাম প্রকাশ করলে না! সাহেব জাতের গুণই এই। একেবারে ইস্পাত!

মধু। আমাদের কালীপ্রসন্ন সিংহও কম ইস্পাত নয়! লং সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা জমাৎ করে ফেলে দিলে আদালতে!

বিদ্যাসাগর। (সোৎসাহে) সে কথা একশ' বার! সন্ধদোষে যদি বিগড়ে না যায় ও ছোকরার দ্বারা দেশের অনেক উপকার হবে! ওর একটা মহৎ কীর্ত্তি হ'ল মহাভারতের অনুবাদ। অনেক টাকা খরচ করেছে। ভাল ভাল পণ্ডিতদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করছে—এ কি সোজা কথা! ওর 'হুতোম' কিন্তু সুবিধে হয় নি।

মধু। মহাভারতের পেছনে তুমি রয়েছ যে! হুঁতোম্ is too realistic.

বিদ্যাসাগর। মহাভারতের আমি আর কি করেছি—জোগাড়-যন্ত্র করে দিয়েছি মাত্র।

মধু। আচ্ছা, তোমার চেহারাটা কেমন যেন শুক্‌নো দেখাচ্ছে, শরীরটা ভাল নেই নাকি?

বিদ্যাসাগর। মেরি কারপেণ্টারের সঙ্গে উত্তরপাড়ায় যাবার সময় সেই যে গাড়ী থেকে পড়ে গেছলাম—তার পর থেকে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাছাড়া (হাসিয়া) চালকলা খেকো এ বামুনের চেহারা কোন কালেই কন্দর্প-কান্তি ছিল না!

মধু। কে বললে? In your youth, তুমি সত্যিই কন্দর্পকান্তি ছিলে। Look at your portrait by Hudson.

বিদ্যাসাগর। আবার কবিত্ব সুরু করলে তুমি! থাম! তার চেয়ে তোমার 'বীরাঙ্গনা' থেকে কিছু পড় দেখি, শোনা যাক। বীরাঙ্গনা কি নিয়ে লিখেছ?

মধু। এ কাব্যখানা পত্রাকারে লেখা হচ্ছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে কতকগুলি নারী-চরিত্র নিয়েছি—তারা যেন তাদের স্বামী অথবা প্রেমাস্পদকে পত্র লিখে নিজেদের মনোভাব জানাচ্ছে। Ovid-এর Heroic Epistle-এর ধরণে লিখেছি আর কি।

বিদ্যাসাগর। পড় ত—শুনি।

মধুসূদন পড়িতে লাগিলেন ও বিদ্যাসাগর চক্ষু বুজিয়া শুনিতে লাগিলেন

মধু। প্রথমটাই শোন—দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা।

বননিবাসিনী দাসী নহে রাজপদে
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, অবলামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলা-রাশি, হা নাথ, আকাশে
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর-বনে
অমনি চমকি ভাবি মদকল করী
বিবিধ রতন অঙ্গে পশিছে আশ্রমে
পদাতিক, বাজীরাজি সুরথ সাগ্নপি
কিঙ্কর কিঙ্করী সহ। আশার ছলনে
প্রিয়ংবদা অনসূয়া ডাকি সবিস্ময়ে
কহি, হেদে দেখ সই, এতদিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে।
ওই দেখ ধূলারাশি উঠিছে গগনে
ওই শোন কোলাহল। পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে!

বিদ্যাসাগর। অতি উত্তম হয়েছে! আমার ভয় হচ্ছে, তোমার এ শকুন্তলা পড়বার পর আমার শকুন্তলা আর কি কেউ পড়বে। (হাস্য)

মধু। বল কি! Your prose is unparalleled! যতদিন বাঙলা সাহিত্য থাকবে ততদিন বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা স-গৌরবে বিরাজ করবে। You are another কণ্ব!

বিদ্যাসাগর। তোমার একটা দোষ কি জান? অতিশয়োক্তি। সব জিনিষই অত্যন্ত বেশী বাড়িয়ে তোলা কেমন তোমার একটা বদ রোগ। তোমার তিলোত্তমা আর মেঘনাদবধে উপমা আর অলঙ্কারের ভীড় ঠেলে এগোনই মুস্কিল।

মধু। তবু লোকে এগিয়েছে ত! My misson is fulfilled—আমার যা করবার আমি করেছি!

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) করেছ মানে! যা-তা কাণ্ড করেছ তুমি। একটা দুর্দ্ধর্ষ নাদিরশার মত এসে তুমি আমাদের হৃদয়-ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছ জোর ক'রে। 'বিদ্যোৎসাহিনী' তোমাকে সাধে অভিনন্দিত করেছে? করতে বাধ্য হয়েছে। ওদের রুচির কিন্তু প্রশংসা করতে পারলাম না। দিলে কি-না রূপোর একটা পান-পাত্র। ছাঃ! রূপোর দোয়াত কলম দিলে ঢের বেশী সুরুচিসঙ্গত হত।

মধু। আমি কিন্তু ঢের বেশী অভিনন্দিত হয়েছি সেদিন চীনেবাজারে?

বিদ্যাসাগর। (সবিস্ময়ে) চীনেবাজারে!

মধু। হ্যাঁ! সেখানে সেদিন এক দোকানদার দেখি নিবিষ্টচিত্তে ব'সে মেঘনাদবধ পড়ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি পড়ছেন মশায়? 'একখানি নূতন কাব্য।' বললাম—কাব্য! বাঙলা ভাষায় ভাল কবিতাই নেই—কাব্য হবে কোথা থেকে! দোকানী কি উত্তর দিলে শুনবে? বললে—সে কি মশায়, মাত্র এই একখানি কাব্যই ত যে-কোন জাতির ভাষাকে গৌরবান্বিত করতে পারে!

বিদ্যাসাগর। (সোৎসাহে) বটে! তারপর?

মধু। তারপর তাকে বললাম—আচ্ছা, একটু পড়ে শোনান ত দেখি! সে আমার সায়েবি পোষাক দেখে বললে—এর ভাষা বোধ হয় আপনি বুঝতে পারবেন না। বললাম—চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি। তখন সে খানিকটা পড়ে শোনালে। তারপর তার হাত থেকে বইখানা নিয়ে আমিও খানিকটা পড়ে শোনালাম তাকে! তারপর জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা এই অমিত্রাক্ষর বাঙলায় চলবে কি? সে মহা উৎসাহে বললে—খুব চলবে মশাই—এ বাঙলার নূতন সৃষ্টি—মনে হয় এ-ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছন্দ। আমি তাকে আত্মপরিচয় না দিয়ে সরে পড়লাম—but I was puffed up like a balloon!

বিদ্যাসাগর। ছুছুন্দরিবধ কাব্য দেখেছ? (হাসিলেন)

মধু। দেখেছি? ঢাকার জগবন্ধু ভদ্র লিখেছে—বেশ লিখেছে। He has imitated me nicely! বেহার থেকেও কে একজন—নামটা ঠিক মনে আসছে না—হিন্দিতে অমিত্রাক্ষর লিখেছে। কিন্তু তেমন নাকি সুবিধে হয় নি।

বিদ্যাসাগর। দেখ, আমার সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে—মেঘনাদবধ লিখতে লিখতে কি করে তুমি ব্রজাঙ্গনা লিখলে! একেবারে অন্য সুর!

মধু। ওটা শিখেছি ভূদেবের ফরমাসে। ভূদেব একদিন আমাকে বললে—'ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি করতে পার?' তারই ফল 'ব্রজাঙ্গনা'। ভাল লেগেছে তোমার?

বিদ্যাসাগর। চমৎকার! (হাসিয়া)। তোমার অমিত্রাক্ষর এখনও ঠিক বাগিয়ে উঠতে পারি নি! (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) যাক্—বিলেত চললে তাহলে!

মধু। হ্যাঁ—ছেলেবেলা থেকে সাধ বিলেত যাব। And go I must. কল্পনানেত্রে আমি যেন বিলেতটাকে দেখতে পাচ্ছি। টাসোর Jerusalem Delivered-এ Crusader-রা Jerusalem-এর কাছাকাছি এসে যেমন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। আমার মনের অবস্থাও অনেকটা তাই—

Wing'd is each heart and winged every heel
They fly, yet notice not how fast they fly—

জাহাজে উঠলে যেন আমি বাঁচি—I am impatient.

বিদ্যাসাগর। তা'ত দেখতে পাচ্ছি। তোমার বন্ধু বেশ বিশ্বাসী লোক ত!

মধু। দিগম্বর মিত্তির, বঙ্কিমনাথ মিত্তিরের মত লোক জামিন হয়েছে। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত।

বিদ্যাসাগর। দেখো—শেষকালে বিপদে না পড়তে হয় ভবিষ্যতে।

মধু। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে। এখন কিন্তু বিপদে পড়েছি।—সেইজন্যই এসেছি তোমার কাছে। কিছু টাকা চাই।

বিদ্যাসাগর। টাকা? কিসের টাকা?

মধু। ধার চাই।

বিদ্যাসাগর। (সজোরে মাথা নাড়িয়া) আমার আর টাকা নেই—ধার দিতে পারব না। বিধবা-বিবাহ দিতে দিতে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। তার উপর ট্রেনিং স্কুলের ভার পড়েছে আমার উপর—আমার আর টাকা নেই। এদেশের লোক মিলেমিশে ত কিছু করবে না। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী আর মাধব ধর আমাদের ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে এক ট্রেনিং একাডেমি খুলে বসেছে। মনে পড়ে কিছুকাল আগে হীরাবুলবুল বলে এক বেহার ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করা নিয়ে রাজেন মল্লিক-টল্লিক মিলে ধোঁট পাকিয়ে সিঁদুরেপটিতে হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ খুলে বসে? মনে নেই তোমার?

মধু। আমি বোধ হয় তখন মাদ্রাজে—

বিদ্যাসাগর। তা হবে। এই দলাদলিতেই দেশটা গেল! আমি আর ক'দিক সামলাই বল। সামর্থ্যই বা আমার কতটুকু? কিসের জন্যে টাকা চাই তোমার?

মধু। খুচরো দেনা অনেকগুলো জমে আছে। সেগুলো শোধ করতে হবে ত before I sail.

বিদ্যাসাগর। আমার কাছে আর টাকা নেই।

মধু। (সানুনয়ে) My dear Vid—

বিদ্যাসাগর। নেই টাকা—দেব কোথা থেকে—চুরি করব?

মধু। You can work wonders if you like! টাকা না পেলে আমি অপমানিত হব। You are a noble man and therefore I appeal to you! বন্ধু বিলেত যাওয়ার আগে আমাকে আরও কিছু দেবে বলেছে। সে টাকা পেলে আমি তোমাকে দিয়ে যাব।

বিদ্যাসাগর। মুস্কিলে ফেললে দেখছি—টাকা কই—

মধু। দাও ভাই! হাতযোড় করে বলছি তোমাকে—নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তোমার কাছে এসেছি। (হাতযোড় করিলেন)

বিদ্যাসাগর। (বিচলিত হইয়া) আহা, হা—ওকি কর তুমি! কিছুদিন আগে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় তোমার 'আত্ম-বিলাপ' পড়ে মনে হয়েছিল যে, বুঝি তোমার অনুতাপ হয়েছে—এবার থেকে ভালভাবে চলবে! কিন্তু দেখছি—

মধু। Believe me—ভাল-খারাপ আমি কিছু বুঝি না। যখন যা প্রয়োজন তাই খরচ করি। You know necessity knows no law!

বিদ্যাসাগর। কিন্তু তোমার necessity যে রাজকীয় necessity, এই হয়েছে মুস্কিল কি না। কত টাকা চাই তোমার?

মধু। I need a lot! তুমি কত দিতে পারবে তাই বল।

বিদ্যাসাগর। আমার হাতে কিছু নেই—

মধু। কিছু নেই?

বিদ্যাসাগর। না—

মধু। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) But I counted upon your greatness—কেন জানি না, তোমাকে আমার নিজের লোক বলে মনে হয়। তাই তোমার কাছে এসে অসঙ্কত আবদার করি। রাগ করো না আমার ওপর। I am a helpless creature. কেন জানি না, কিছুতেই কূলোতে পারি না। বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে যদি ফিরতে পারি—I shall role in wealth and I shall help you in all your noble projects. (উঠিয়া) আচ্ছা, যাই তা হলে—good night.

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু চকল হইয়া উঠিলেন ও ক্ষণপরেই একটি চেক্ বুহি বাহির করিয়া একটা চেক্ কাটিলেন

বিদ্যাসাগর। ছিরু—

শ্রীমন্ত নামক ভৃত্য আসিয়া প্রবেশ করিল

ওই যে সায়েব এখুনি গেল—তাকে এই কাগজখানা দিয়ে আয় ত—দৌড়ে যা—

শ্রীমন্ত চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর আবার গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। দহসা ঝড়ের মত মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন

মধু। You are great—you are great—you are great my dear Vidyasagar—you are simply great.

বিদ্যাসাগরকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। ছাড় ছাড়—কি যে কর। দোয়াত-টোয়াত সব উল্টে দেবে না কি!

মধু। সত্যিই তুমি সাগর—করুণাসাগর!

বিদ্যাসাগর। চেকটা কিন্তু পরশুর আগে ভাঙিও না—ব্যাঙ্কে একদম খালি! এর মধ্যে টাকাটা জমা করে দেব!

মধুসূদন একবার চেকটার দিকে চকিতে চাহিয়া নির্বাক বিস্ময়ে বিদ্যাসাগরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

চতুর্থ বিভূতি

পঞ্চদশ দৃশ্য

কলিকাতায় ভোলানাথ দত্তের বাড়ীতে ভোলানাথ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় কথোপকথনে নিরত। ইঁহারা উহাদের যে যৌবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে।

সময় ১৮৭৯ খৃঃ অব্দ—মে মাস

ভূদেব। মধু তাহলে ব্যারিস্টার হয়ে এল শেষ পর্য্যন্ত!

ভোলানাথ। নিশ্চয়—ও যা ধরবে তা করবে—এই ওর স্বভাব।

ভূদেব। বিলেতে নাকি টাকার জন্যে মহা বিপদে পড়েছিল?

ভোলানাথ। ভয়ানক! টাকার অভাবে বিলেত থেকে ফ্রান্সে চলে আসে। সেখানেও দিন চলা মুস্কিল হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর টাকা ধার ক'রে পাঠায়, তবে উদ্ধার হয়! আশ্চর্য্য লোক আমাদের দেশের! যাদের টাকা দেওয়ার কথা ছিল কেউ দিলে না। মধুর স্ত্রী-পরিবারের অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠল! শেষে তারা সুদ্ধ কোনরকমে পাথেয় সংগ্রহ ক'রে বিলেত গিয়ে হাজির হ'ল মধুর কাছে! বোঝ একবার ব্যাপারখানা! Then the fat was in the fire! একে তারই সেখানে অনটন—তার উপর এরাও গিয়ে ছুটল! হিতৈষীরা মধুর চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দিতেন না শুনেছি। বিদ্যাসাগর টাকা না পাঠালে মধুকে জেলে যেতে হত!

ভূদেব। জেলে? সে কি!

ভোলানাথ। ঋণের দায়ে! সেখানে না খেয়ে যে ওরা কতদিন কাটিয়েছে তার ঠিক নেই। ফ্রান্সে পাড়া-প্রতিবেশীরা নাকি লুকিয়ে ওদের ঘরে খাবার রেখে যেত শুনেছি। Look at their greatness! আর আমাদের দেশের লোক তার বিষয়টি মেরে দিয়ে গ্যাট হয়ে বসে রইল! সত্যি ভাবলেও দুঃখ হয়।

ভূদেব। এ সব ত আমি জানতাম না।

ভোলানাথ। আরে, আমিই কি জানতাম। এক বিদ্যাসাগরকে ছাড়া ও কাউকেই লেখেনি এ সব কথা। এদিকে ওর self respect জ্ঞান ভয়ানক প্রবল কি-না!

ভূদেব। যাক্—ব্যারিস্টারি ওর হচ্ছে কেমন?

ভোলানাথ। চুঁচ্ছে নব্য নয়, কিন্তু মধুকে ত জানই—ওর টাকার অভাব কোনদিন ঘুচবে না।

ভূদেব। কেন, কি করছে ও?

ভোলানাথ। বা চিরকাল করে আসছে—বাবুয়ানি। স্পেনসেস্ হোটেলে লর্ডের মত বাস করছে—আর যা রোজগার করছে দু'হাতে ওড়াচ্ছে। ছেলে-মেয়ে পরিবার সব ফ্রান্সে রয়েছে—তাদেরও মাসে মাসে তিন-চার শ' টাকা পাঠাতে হয়। আর হোটেলেও ওর নিজের খরচ মাসে পাঁচ-ছ শ' টাকার কম হবে না। বেশী হতে পারে।

ভূদেব। হোটেলে থাকবার দরকার কি?

ভোলানাথ। দরকার কি! Don't judge Madhu with our standard'—he is a far more superior being! বিদ্যাসাগরও বলেছিল—দরকার কি! বিলেত থেকে আসবার ঠিক আগে বিদ্যাসাগর মুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে খানকয়েক ঘর সায়েবি কায়দায় সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিল—ভেবেছিল ওপাড়ায় বাসা করলে শস্তায় হবে। মধু কিন্তু জাহাজ থেকে নেবে সোজা গিয়ে হোটেলে উঠল—কিছুতেই সেখান থেকে নড়ল না। এখন সেখানে কেচ্ছা ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড চলছে! মধুর ত এখন দেশ-জোড়া খ্যাতি—দলে দলে বন্ধুবান্ধব যাচ্ছে—খানা খাচ্ছে—মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ওর সেলার সর্ব্বদাই নাকি উন্মুক্ত! এমন কি, শুনেছি নাকি ওর মুন্সিকে পর্য্যন্ত ডেকে ও মদ খাওয়ায়।

ভূদেব। তাই না কি? খুব মদ খাচ্ছে ও?

ভোলানাথ। সেদিন ললিত ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে বাথ্‌রুমে বসে' জিবে লঙ্কা ঘসছে। ললিত জিগ্যেস করলে, এ কি করছ হে? মধু বললে—মদ খেয়ে খেয়ে জিব অসাড় হয়ে গেছে—স্পষ্ট উচ্চারণ হচ্ছে না! আন্দাজ কর তাহলে! ওর গলার স্বরও কেমন যেন বদলে গেছে—কেমন যেন একটা চেরা আওয়াজ—সে রকম মিষ্টি সুর আর নেই ওর!

ভূদেব। বিলেত যাওয়ার এই পরিণাম তাহলে?

ভোলানাথ। বিলেত গিয়ে লাভ কিছু কম হয় নি। ব্যারিষ্টার ত হয়েছে!—তাছাড়া ফরাসী, ইটালী, জার্ম্মাণ এ তিনটে ভাষা রীতিমত শিখে এসেছে। কবিতা লিখতে পারে প্রত্যেকটাতে। সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু—এগুলো ত আগেই জানত। এতগুলো ভাষা এদেশে কেউ জানে না। সেদিন এক মজার ব্যাপার হয়েছে।

ভূদেব। কি?

ভোলানাথ। ডাক্তার দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যের ছেলে সুরেন্দ্র—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে বিলেত যাচ্ছে। সেদিন তাকে নিয়ে ডাক্তারবাবু, মনোমোহন ঘোষ আর বিদ্যাসাগর গেছে মধুর সঙ্গে দেখা করতে। Jh B. A. Surendra stood first in Latin—এই শুনে মধু তাকে পরীক্ষা করতে বসল। Horace খুলে দিয়ে বললে—এই passage-টা পড়ে বুঝিয়ে দাও দেখি! সুরেন্দ্র বুঝি ভাল করে পারে নি। তাই দেখে মধু মনোমোহনকে বললে—যত কুলী চালান দিচ্ছ তুমি বিলেতে হে! সুরেন্দ্রের মত ছেলেকে যে ও কথা বলতে পারে তার self-confidence কতখানি বোঝ!

ভূদেব। ও ত চিরকালই ওই রকম! নতুন বই-টই কিছু লিখেছে আর?

ভোলানাথ। বাঃ—'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'—দেখ নি? It is a masterpiece! মধুই বাঙলা ভাষায় প্রথম সনেটও লিখলে! এই যে এইখানেই আছে বইখানা—বিলেতে বসে লিখেছে।

শেলফ্ হইতে বইখানা পাড়িলেন

এই দেখ। There are fine pieces of different varieties.

ভূদেব। (বইখানা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন) এ সব বিলেতে বসে লিখেছে ও? অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কীর্ত্তিবাস, বউ কথা কও, কেউটিয়া সাপ, শ্যামাপাখী, পুরুরবা—বিলেতে গিয়েও মনটা তাহলে ওর সম্পূর্ণ দিশিই ছিল দেখছি!

ভোলানাথ। ওই ত ওর বিশেষত্ব—বাইরে ও সায়েব—মনটা কিন্তু ওর বরাবরই পুরো বাঙালী। এখনও হোটেলে শুনেছি হরিমোহনের বাড়ী থেকে ও বোতলে করে মুগের ডাল আনিয়ে খায়। গৌর যখন এখানে আসে তখন তার বাড়ীতে রুটি আর ঘণ্ট ত ওঁর বাঁধা বরাদ্দ শুনেছি।

ভূদেব। (চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী উল্টাইতেছিলেন—বলিলেন) বাঃ—এই কবিতাটি ত সুন্দর।

ভোলানাথ। কোন্‌টা? পদ্ম ত—

ভূদেব। (পড়িতে লাগিলেন)

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা'সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি
পর-ধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পর-দেশে ভিক্ষা-বৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়মন
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি
খেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কানন।

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে
'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি
এ-ভিখারি দশা তবে কেন তোর আজি।
যা ফিরি অজান তুই যারে ফিরি ঘরে,'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে : পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে!

ভোলানাথ। (সগর্ব্বে) He has a regular field-day in the arena of Bengali literature.—

ভূদেব। এ কবিতা যে লিখেছে সে কি ক'রে সারেবি হোটেলে বসে মদ আর খানা খায়—এ আমি ভাবতেই পারি না!

ভোলানাথ। ও একটা অদ্ভুত লোক। অদ্ভুত! এদিকে ঋণে জর্জ্জরিত অথচ হাতে যখন টাকা থাকে তখন মুঠো মুঠো খরচ করবে। খানসামাকে বকশিস দেবে দশ টাকা—গাড়ী ভাড়া দেবে এক মোহর—এর কোন মানে হয়! Really he makes no distinction between his own money and others' money! টাকা is টাকা—সে যারই হোক—খরচ কর—এই হচ্ছে ওর idea!

ভূদেব। ওর প্র্যাকটিস্ হচ্ছে কেমন?

ভোলানাথ। চলছে মন্দ নয়—কিন্তু ব্যারিষ্টারি ওর বেশী দিন চলবে না।

ভূদেব। কেন?

ভোলানাথ। ও রকম করলে কি কখনও প্র্যাক্‌টিস্ হয়? ও জজেদের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক করবে—কবিতা আওড়াবে! জ্যাকসন সায়েবকে সবাই ভয় করে। জ্যাকসন সায়েব একচোখে monocle লাগিয়ে যখন কারো দিকে তাকায় বুকের রক্ত জল হয়ে যায় তার। কিন্তু মধু does not care him.

ভূদেব। কি করে মধু?

ভোলানাথ। জ্যাকসন সায়েব এক চোখে গোল চশমা পরে যেই মধুর দিকে চাইবে অমনি মধুও তার spring-এর চশমা নাকের ওপর লাগিয়ে সমানে চেয়ে থাকবে তার দিকে। তর্ক ত প্রায়ই করে শুনেছি। তাছাড়া ভয়ানক চীৎকার করে কোর্টে—গলার স্বরও ওর কর্কশ হয়ে গেছে আজকাল। একদিন জ্যাকসন সায়েব নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "The court orders you to plead slowly—the court has ears." মধু তৎক্ষণাৎ বলে বসল—'But pretty too long my Lord!' এ-রকম করলে কতদিন চলবে? আমি ওকে নানা করেছি অনেকবার—শোনে না কিছুতে—ও বলে—Michael can never brook anybody's bullying! জ্যাকসনের সঙ্গে ওর আদায় কাঁচকলায়! ওর হাইকোর্টে ঢোকার সময় ওই জ্যাকসনই ত বাগড়া দিয়েছিল! অনেক সুপারিশ অনেক testimonial জোগাড় করে তবে ও Bar-এ join করতে পায়। একটু মানিয়ে চলা ত উচিত—মধু কিন্তু তা কিছুতে করবে না।

ভূদেব। অনেক দিন দেখি নি তাকে—চল একদিন দেখা করে আসি।

ভোলানাথ। বেশ ত চল না—সে ত ওই চায়! বন্ধুবান্ধব—বিশেষত, সাহিত্যরসিক কেউ গেলে ও মক্কেল-টক্কেল ফেলে তাদেরই সঙ্গে আড্ডা দিতে সুরু করে দেবে।

ভূদেব। চেহারা কেমন হয়েছে আজকাল?

ভোলানাথ। সে চেহারা আর নেই! বেশ মোটা হয়েছে—ভুঁড়ি হয়েছে—খুব গৌর, দু'দিকে দাড়ী। সে মধু আর নেই। ওর মেয়ে শর্ম্মিষ্ঠার সেদিন বিয়ে হয়ে গেল।

ভূদেব। মেয়ের নাম শর্ম্মিষ্ঠা রেখেছে না কি?

ভোলানাথ। ছেলের নাম—Michael Milton Dutt—ডাকনাম মেঘনাদ! আর ছোট ছেলের নাম Albert Napoleon Dutt! বল কেন, সবই অদ্ভুত ওর।

নেপথ্যে। ভোলানাথ বাড়ী আছো হে!

মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বাহিরটায় মধুসূদন ধর।
পুরা সাহেবি পোষাক—হাতে একটা সিগারেট

মধু। Hallo—is it ভূদেব? You have changed a lot and so have I. Very glad to see you!

তাহার সহিত শেক হ্যাণ্ড করিলেন

তারপর ভোলানাথ, ক'দিন ছুটি তোমার? ছুটিতে এসেছ শুনে এলাম। I did not expect our illustrious Bhudeb here.

ভূদেব। আমারও ছুটি এখন। তবে আজই আমি চুঁচড়ায় ফিরব।

ভোলানাথ। হঠাৎ তুমি আর্য্যপল্লী ছেড়ে অনার্য্য পল্লীতে এসে হাজির হলে যে!

ভূদেব। আর্য্যপল্লী মানে?

ভোলানাথ। মানে, মধুকেই জিগ্যেস কর! একদিন ওকে ওর কোন এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিল—কোন্ পাড়ায় আছো হে? মধু উত্তর দিয়েছিল—বামুনপাড়ায়! গ্রামের মধ্যে সেরা পাড়াটা যেমন বামুনপাড়া, তেমনি কলকাতার বামুনপাড়া হচ্ছে সাহেব পাড়া—অর্থাৎ সেরা পাড়া! তারপর ব্রাহ্মণপ্রিয়, হঠাৎ পদধূলি দানের অর্থ কি!

মধু। (হাসিয়া) অর্থের সন্ধানেই বেরিয়েছি—I must have some money. শুনলাম তুমি এসেছ, তাই তোমার কাছে এলাম।

ভূদেব বিস্মিত হইয়া মধুর পানে চাহিয়া রহিলেন

ভোলানাথ। হঠাৎ টাকার কি দরকার পড়ল এখন?

মধু। আমার স্ত্রী সপুত্রকন্যা হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে ভাই, কোন খবর না দিয়ে। মহা মুস্কিল!

ভোলানাথ। তাই না কি? এ রকম করার মানে?

মধু। It is my fault—সময় মত টাকা পাঠাতে পারি নি! She has practically begged her way back—একথা কাউকে বলো না যেন। It will damage my prestige. ও দেশে টাকা না থাকলে একদিনও টেকা মুস্কিল!

ভোলানাথ। টাকা পাঠাও নি কেন তুমি?

মধু। For a very simple reason—ছিল না। I tried my utmost to borrow, but I failed. Even Vid failed me.

ভূদেব। সপরিবারে কি হোটেলেই থাকবে না কি?

মধু। সে ত অসম্ভব—it will go against my prestige. লাউডন ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী দেখেছি—it is a palace-like building—I would like to settle there—৬০০৲ টাকা ভাড়া চায়—but still I must have it and fix it up immediately. টাকা দিতে পার কিছু?

ভোলানাথ। মধু, তুমি যদি এই rate-এ চল, কোথায় এর পরিণতি ভেবে দেখেছ?

মধু। (হাসিয়া) যে রেটেই চলি ভাই—I know I shall end in a grave. That is certain.

ভোলানাথ। এত টাকা কিসে তোমার লাগে—তাই আমি ভাবি। রোজগার, করছ সব করছ অর্থাৎ—still you are in want!

মধু। My dear Bholanath, please be convinced once for all. ভদ্রভাবে থাকতে গেলে অনেক টাকা লাগে। মানুষেরই টাকার প্রয়োজন—পশুর টাকার প্রয়োজন হয় না। Can you tell me why should one cringe and live shabbily? এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সামান্য কেঁচোর মত কাটিয়ে যাওয়াতে কি বাহাদুরিটা আছে বলতে পারো আমায়? What right have I not to enjoy this wonderful gift of God—this life?

ভূদেব। মতে মিলছে না ভাই—my angle of vision is quite different.

মধু। I know—live according to your angle of vision by all means, but let me live according to mine.

ভোলানাথ। কিন্তু এমন ভাবে টাকা ধার ক'রে—

মধু। ধার করি—কারণ হাতে টাকা থাকে না। এই হতভাগা দেশে জন্মেছি বলেই হাতে টাকা থাকে না। In any civilised country a man of my abilities would have lived more decently.

ভূদেব। যাক্—ও সব অপ্রিয় আলোচনা থাক। We will never agree on this point.—আমাদের বাড়ীতে একদিন এসো।

মধু। নিশ্চয়ই যাব।

ভোলানাথ। এখন আমাকে কি করতে হবে বল!

মধু। ভাই, ওই বাড়ীটার একটা ব্যবস্থা করে দেবে চল।

ভোলানাথ। ওর চেয়ে শস্তা গোছের একটা কিছু দেখলে হত না!

মধু। (অধীর ভাবে) No, no, no—my dear. I must have that house. It will fit in with my prestige and suit me admirably.

ভোলানাথ। (নিরুপায় ভাবে) চল্।

সকলে বাহির হইয়া গেলেন

ষোড়শ দৃশ্য

বেলিয়াঘাটার রোডে মধুসূদনের বাসা। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। মধুসূদনের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে। নানাবিধ ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত। অর্থাভাবে লাউডন ষ্ট্রীটের উদ্যান বাটিকা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে। এখানেও যে ঘরটিতে মধুসূদন বসিয়া রহিয়াছেন—তাহা সাহেবি কায়দায় মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। মূল্যবান সংস্করণের বহু গ্রন্থ শেলফে রহিয়াছে। ঘরখানির চতুর্দিকে হোমার, দান্তে, তাসো, মিল্টন্, শেক্সপীয়র, মিল্টন্ প্রভৃতি মহাকবিগণের bust (কোনটা প্রস্তর নির্মিত, কোনটা ধাতু নির্মিত)। মধুসূদন সম্প্রতি ঢাকা হইতে ফিরিয়াছেন। একটি কুশন দেওয়া চেয়ারে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। পাশেই একটি টেবিলে ব্র্যাণ্ডির বোতল। মধুসূদনের দৃষ্টি বহুদূরে নিবদ্ধ। পিছন দিকের একটি দ্বার দিয়া হেনরিয়েটা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও মুখটি অবসন্ন—দৃষ্টি শঙ্কিত। তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া মধুসূদনের স্কন্ধে হাত রাখিলেন। মধুসূদন কোন সাড়াশব্দ দিলেন না—তেমনি নীরবে বসিয়া রহিলেন

হেনরিয়েটা। এমন ভাবে চুপ ক'রে বসে আছ কেন? কি ভাবছ?

মধুসূদন কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন। গলার স্বর বিকৃত

মধু। কত কি ভাবছি! চোখের সামনে নানা ছবি আসছে আর যাচ্ছে। ঢাকার কথা মনে হচ্ছে—তারা আমার সায়েবি পোষাক দেখে দুঃখ করেছিল। ভাবছি, লোকে খোসাটাকে এত বড় করে দেখে কেন! (একটু থামিয়া) এঁরা দুঃখিত হলেন আমার পোষাক দেখে, আর বিলেতে গোরাদের কারের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন, আমি সংস্কৃতে কথা বলতে পারি না দেখে! Strange!

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন

এলোমেলো কত কথাই মনে হচ্ছে! মনে পড়ছে, পঞ্চকোটের সেই দিনগুলো—সেই কোল ভীল সাঁওতাল মেয়েদের কালো কালো দেহে নিটোল স্বাস্থ্য—মাথায় জবা-ফুল গোঁজা—মাদলের তালে তালে নৃত্য করছে! (একটু পরে) মনে পড়ছে, কানন-কুন্তলা সাগরদাঁড়িকে—সেই বিশাল বাদামগাছটা আমি যেন দেখতে পাচ্ছি! সেই বটগাছটাও—যার তলায় বসে ছেলেবেলায় রামায়ণ পড়তাম। বটগাছটা এখনও বেঁচে আছে—শ্যামল সতেজ তার পাতাগুলি প্রাণরসে টলমল করছে দেখে এলাম! সব ঠিক আছে—আমিই ফুরিয়ে গেলাম! Men end so quickly!

হেনরিয়েটা। ফুরিয়ে গেলে? Don't say that dear.

মধু। ফুরিয়ে গেলাম হেনরিয়েটা! Finished—every thing is finished! Why are you worrying, my dear? Nothing is permanent—everything will end sooner or later.

হেনরিয়েটা। Don't talk of the end.

মধু। (হাসিয়া) Well, I won't.

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

But I cannot kill my thoughts! যতক্ষণ বেঁচে আছি ভাবতে হবে—this brain is a terrible machine!

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া বলিয়া উঠিলেন

Did I not fight my utmost, Henrietta? কত কি করলাম! বিলেত গেলাম—ব্যারিষ্টার হলাম—হাইকোর্টে চাকরি নিলাম—আবার ব্যারিস্টারি করলাম—পঞ্চকোটে চাকরি নিয়ে গেলাম—ফের ব্যারিস্টারি করছি!

হেনরিয়েটা। সব ঠিক হয়ে যাবে আবার!

মধু। ঠিক হয়ে যাবে? (হাসিয়া) I envy your optimism!

হেনরিয়েটা। কেন, এমন করছ তুমি আজ? শরীরটা কি তোমার বেশী খারাপ লাগছে?

মধু। I am not sorry for myself—তোমাদের কোন ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না—এইটেই আমার দুঃখ! শর্মিষ্ঠার বিয়েটা দিয়ে দিয়েছি—I have done a

great duty—I hope Lord will make her happy. (সহসা) মহারাণী স্বর্ণময়ী কি সুন্দর গাউনটা দিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠাকে—মনে আছে তোমার? It was lovely!

আবার চুপ করিয়া গেলেন

হেনরিয়েটা। (সস্নেহে তাঁহার মাথার চুলে হাত বুলাইতে লাগিলেন) শরীরটা কি তোমার বেশী খারাপ লাগছে আজ?

মধু। যা হয়েছে তার চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে! টাকার যা হয়েছে, পেটে ভাত হয়েছে, গিলে হয়েছে, লিভার হয়েছে—রক্ত বমি করছি। এখনও অন্ধ হয়ে যাই নি!—this much is wanting! Milton became blind—হোমারকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করতে হয়েছিল—Virgil, Ovid, Dante were exiled—টাসো, বানিয়ন্ were imprisoned! I don't expect a better lot. I shall die the gloriously miserable death of a poet. এইটুকুই শুধু দুঃখ যে তুমিও আমার সঙ্গে কষ্ট পেলে! You have shared my miseries but cannot share my glories. Future generation will remember poet Madhusudan but not Henrietta who inspired him. This idea is terrible. (সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া) Why did you stick on to me—you foolish woman! রেবেকা আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচে গেল—দেবকী slipped away from my fatal grasp—why did you stick on?

হেনরিয়েটা। (অসহায়ভাবে) এমন করছ কেন তুমি? একটু স্থির হও—সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধুসূদন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিলেন

মধু। সব ঠিক হয়ে যাবে—ঠিক! (সহসা) সত্যি ক'রে বল ত Henrietta—were you happy with me? পেছনে দাঁড়িয়ে আছো কেন? এদিকে এসো না—

হেনরিয়েটা সম্মুখের দিকে আসিলেন

হেনরিয়েটা। Need I say that in so many words! লাউডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যে সুখে ছিলাম আমরা তেমন সুখ কজনের ভাগ্যে ঘটে? প্রকাণ্ড বাড়ী—গাড়ী—আমাদের বুড় গাড়ীখানাকে লোকে grand carriage বলত! We employed the cook of Prince Dwarkanath Tagore! আমাদের সুখে রাখবার জন্যে তুমি কি না করেছ!

মধু। Wait, wait, you will get time enough to live on memories. Don't exhaust them now! (সহসা হেনরিয়েটার গায়ে হাত দিয়া) এ কি, জ্বরে যে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে! কখন থেকে জ্বর হয়েছে আবার?

হেনরিয়েটা। না, জ্বর হয় নি আবার—ও কিছু নয়।

মধু। কিছু নয় কি! ডাক্তার পামারকে খবর পাঠাই কাকে দিয়ে?

হেনরিয়েটা। Don't worry for me! আচ্ছা, তোমার বন্ধুরা বলছেন, Kaviraji treatment may do you good. Why not try it—my dear?

মধু। I cannot degrade myself.

বাহিরে একটা কোলাহল ও কথা শোনা যাইতে লাগিল

হেনরিয়েটা। What's this? I think—

বয়-ভৃত্যের প্রবেশ

বয়। বিল নিয়ে এসেছে কয়েকজন লোক—ভেতরে আসতে চাইছে—গালাগালি দিচ্ছে!

হেনরিয়েটা। এখন যেতে বল! বল, সায়েবের শরীর খারাপ!

বয় চলিয়া গেল

মধু। Henrietta, this is hell. (সহসা উঠিয়া) Please let me go—I shall plead guilty—I shall tell them that I am a pauper now. এক কপর্দ্দকও আমার কাছে আর নেই—তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাও মেরে ফেল—অপমান আর ক'রো না—আর সহ্য করতে পারি না আমি।

হেনরিয়েটা। Please don't go—please—

তাঁহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিলেন। মধুসূদন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি মুখ তুলিলেন—

মুখে বিচিত্র হাসি!

মধু। Am I not playing my part well! Splendid—isn't it? (সহসা) যাও, তুমি শোও গে যাও—জ্বর গায়ে বসে থাকবার দরকার নেই। Give me the bottle of Brandy and Dante's Inferno.

হেনরিয়েটা। Please don't excite yourself!

মধু। (অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক দিয়া) Don't contradict! যা বলছি শোন।

হেনরিয়েটা ভয়ে ভয়ে মধুর আদেশ পালন করিলেন—ব্রাণ্ডি ও ইন্‌কার্নো আনাইয়া দিলেন

হেনরিয়েটা। আমার যা দু-একখানা সৌখীন কাপড় গয়না এখনও বাকী আছে—সব বিক্রি করে দাও। আমাদের এই আসবাবপত্র যা-কিছু আছে সব বিক্রি করে দাও—ঋণ শোধ করে ফেল—তুমি সুস্থ হও—আবার সব হবে!

মধু। (মিনতি করিয়া) Please, leave me alone—যাও ওঘরে গিয়ে শুয়ে পড়—you are ill, my dear. Go—

হেনরিয়েটা চলিয়া গেলেন—মধুসূদন নির্জ্জলা ব্রাণ্ডি খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া ইন্‌কার্নো-খানা খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিলেন।

বয় আসিয়া প্রবেশ করিল ও একখানি কার্ড দিল

(কার্ডখানি দেখিয়া) সায়েবকে আসতে বল!

ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ আসিয়া প্রবেশ করিলেন ও যথারীতি অভিবাদন করিলেন

Good afternoon মধু—এস! I hope you have not come to remind me of my debts!

মনোমোহন। (সহাস্যে) Oh, no.

মধু। (সহসা) উঃ—বিদ্যাসাগর, উমেশ আর স্বর্ণময়ীর ঋণটাও যদি শোধ ক'রে যেতে পারতাম! ওঁদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় আমার—অথচ they are the people I respect most.

আবার মদ্যপান করিলেন

Will you have a drop, মধু?

মনোমোহন। No, thanks. কিন্তু আপনি এ করছেন কি?, চারদিকে কপাট জানলা বন্ধ করে দিয়ে নির্জ্জলা মদ খাচ্ছেন!

মধু। (সহাস্যে) There is no doubt about it.

মনোমোহন। এর পরিণাম কি জানেন?

মধু। জানি না? গলায় ছুরি বসালেও পারতাম—but this is a process equally sure but less painful.

মনোমোহন। (হাসিয়া) আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। দিনকতক একটু নিরালায় থাকুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধু। (আর একপাত্র পান করিয়া) হেনরিয়েটাও এতক্ষণ ঠিক ওই কথাই বলছিল আমাকে। সে মেয়েমানুষ, তার মুখে ওসব কথা মানায়। But you are not only a man but a clever barrister—you should not talk nonsense.

মনোমোহন। কি আশ্চর্য্য! এমন মরীয়া হয়ে উঠেছেন কেন আপনি?

মধু। Do you think I want to die? Do you think I want to leave this beautiful world? No. But the fact is there is no way out of it. তা ছাড়া আমার এখন বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। Why should I drag on this miserable existence any more? Why should I?

মনোমোহন। বাঃ—বাঁচতে হবে বই কি আপনাকে—we cannot afford to lose a genius like you.

মধু। But the genius is dead long ago. আমি এখন তার প্রেতাত্মা—genius in another sense of the word! A dead volcano.

মনোমোহন। কি যে বলেন আপনি!

মধু। ঠিকই বলছি—আমার বেঁচে থাকার আর কোন সার্থকতা নেই। (একটু পরে) অনেক আগেই আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল।

মনোমোহন। কেন?

মধু। 'সধবার একাদশী' পড়েছ? দীনবন্ধু has become popular at my cost! By the bye, where is বঙ্কিম? He is the coming light—I would like to see him.

মনোমোহন। দীনবন্ধুর কথা আপনি যা বলছেন তা ঠিক নয়। সধবার একাদশীর নিমচাঁদ যে আপনি তাকে বললে?

মধু। কে আবার বলবে! Am I a fool?

মনোমোহন। না, না, ওটা আপনার ভুল। দীনবন্ধু নিজে সে কথা অস্বীকার করেছেন। বলেছেন মধু কি কখনও নিম হয়?

মধু। দেখ ভাই, আমিও কিছুদিন আগে 'একেই

কি বলে সভ্যতা' লিখেছি এবং আমিও ব্যক্তিবিশেষকেই লক্ষ্য ক'রে লিখেছি। But do you think I would admit it publicly? Certainly not! আমি দীনবন্ধুর ওপরে রাগ করি নি—I appreciate the satire—I admit he has got a powerful pen—but still it hurts! কেমন আছে সে আজকাল? শুনেছিলাম সে-ও অসুস্থ—

মনোমোহন। তার ডায়াবিটিস হয়েছে শুনেছি।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন

মধু। (সহসা) আমি কি সত্যিই নিজের মত?

মনোমোহন। Far from it! ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা আপনার লেখাগুলোই পড়বে—আপনাকে ত আর দেখতে পাবে না এইটেই দুঃখ। I wonder how your biographers will paint you.

মধু। আমার চরিত্রের বলো প্রশংসা করবার মত কিছুই নেই—I am reckless, tactless, thoughtless and everything-less!

মনোমোহন। বলেন কি! এক বিদ্যাসাগর ছাড়া আপনার মত মহাপুরুষ লোক ত আমি আর দেখি নি!

মধু। You are a darling মনু। But don't try to delude me. I understand you and thank you.

মনোমোহন। This is no delusion. I have seen it with my own eyes যে, আপনার দারুণ অভাবের সময় আপনি মুঠো মুঠো টাকা দান করেছেন—গরীব মক্কেলের কাছ থেকে এক পয়সা ফি নেন নি—চক্ষু লজ্জার খাতিরে বড়লোক মক্কেলের কাছ থেকেও নেন নি! এই সেদিনও নিতান্ত অভাবের মধ্যেও আপনি আপনার পাঠশালার পণ্ডিতকে কুড়িটা টাকা স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিলেন। যখন দ্বারকাবাবু হাইকোর্টের Justice হলেন—everybody became jealous—but you became overjoyed and gave a grand dinner. কাল, হুগলী জেজুরগাঁয়ের রাধাকিশোর ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তিনি আপনার কথা বলছিলেন—

মধু। কি বলছিলেন?

মনোমোহন। বলছিলেন—সেবার অত পেটেখুটে আমার মোকদ্দমাটা করলেন উনি—কিন্তু কি দিতে গেলাম কিছুতেই নিলেন না। অনেক পীড়াপীড়ি করাতে শেষটা বললেন—নিতান্তই কিছু যদি দিতে চাও—একটা Burgundy, half a dozen beer আর একশ মালদহের আম পাঠিয়ে দিও। সেদিন এক বাবুন সখী-সংবাদ গান শুনিয়ে আপনার কাছে কাল আদায় করে নিয়ে গেল! Are these not facts?

মধু। ব্রাহ্মণ গেয়েছিল কিন্তু সুন্দর। সখী-সংবাদের অমন গান বড়-একটা শোনা যায় না।

মনোমোহন। আপনার মত লোকের কখনও টাকা হতে পারে!

মধু। আমি ত টাকা চাই না—আমি সুখে থাকতে চাই। কিন্তু এ জীবনে তা আর হ'ল না—কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল!

মনোমোহন। সব হবে আবার—আপনি একটু সামলে উঠুন। বৌদি কোথা? ছেলেরা কোথা?

মধু। ছেলেরা বাইরে গেছে—they have gone to Floyd. তোমার বৌদির জ্বর। ডাক্তার পামারকে খবর দিতে পার?

মনোমোহন। নিশ্চয় পারি! খুব বেশী জ্বর নাকি? কোথা আছেন তিনি?

মধু। পাশের ঘরেই আছে—যাও না দেখে এস—তোমার সঙ্গে ত কোন formality নেই। বয়টাকে ডেকে একটা খবর দিয়ে—যাও।

মনোমোহন ভিতরের দিকে গেলেন। নেপথ্যে 'বয়' 'বয়' ডাক শোনা গেল। মধুসূদন আবার পানিকটা মদ্যপান করিলেন ও ইন্‌কানো পানার পাতা উলটাইতে লাগিলেন। সহসা গোবর্দ্ধন দত্ত নামক এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিল। ইনি একজন গাওনাদার

গোবর্দ্ধন। নমস্কার দত্ত সাহেব!

মধু। একি, গোবর্দ্ধন যে! এস।

গোবর্দ্ধন। আপনার চাকরটা ঢুকতেই দেয় না—এ ত এক মুস্কিল! সে ভেতরে যেতেই ঢুকে পড়লাম আমি! আপনার অসুখ নাকি?

মধু। হাঁ—ভাল নেই শরীরটা? তীর পর খবর কি?

গোবর্দ্ধন। খবর ভালই।

মধু। দিগম্বর ভাল আছে?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে হাঁ, (একটু ইতস্তত করিয়া) টাকাটার কোন ব্যবস্থা হ'ল?

মধু। কিচ্ছু হয় নি।

গোবর্দ্ধন। অনেক দিন ধরে পড়ে রয়েছে টাকাটা—

মধু। (সহাস্যে) এই সমস্ত ফার্নিচারই ত তুমি দিয়েছিলে—না?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। এইগুলোই তুলে নিয়ে যাও and release me! ওই bust-গুলোও নিয়ে যাও—অনেক দাম দিয়ে বিলেত থেকে কিনে এনেছিলাম এগুলো—ওই বইগুলোও—সব নিয়ে যাও—সব নিয়ে যাও—কিছু টাকা তবু তোমার উশুল হবে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে? Take them all!

গোবর্দ্ধন। (সঙ্কুচিত হইয়া) আজ্ঞে সে কি হয়! টাকা হলে দেবেন এখন পরে। আমি শুধু এমনি খবর নিতে এসেছিলাম। যাই তা হলে—নমস্কার!

প্রস্থোদ্যত

মধু। ওহে শোন শোন—আমার কতকগুলো অপ্রকাশিত কবিতা আছে। নেবে? নাও ত দিতে পারি। বিক্রি করলে কিছু পেতে পার!

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে না। টাকা পরে যখন হয় দেবেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না ওর জন্যে—

চলিয়া গেলেন

মধু। অনুগ্রহ! গোবর্দ্ধনের মত লোকও অনুগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে আমাকে! O God, how long am I to suffer this? O Almighty God in Heaven—please end my miseries!

মনোমোহন ঘোষ পুনঃপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি কাগজ—

মনোমোহন। আচ্ছা, আপনি এ কি কাণ্ড আরম্ভ করেছেন বলুন দেখি!

মধু। কি?

মনোমোহন। আপনি এ কবিতা লিখেছেন কেন? বৌদিদি এই কবিতাটা পড়ছিলেন আর কাঁদছিলেন! ছি, ছি ভারি অন্যায় আপনার!

মধু। কি কবিতা?

মনোমোহন। এই যে—এটা নাকি আপনার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে পড়েছিল—শর্ম্মিষ্ঠা কুড়িয়ে পেয়েছে।

মধু। কই দেখি! আজকাল কোথায় যে কি ফেলি মনে থাকে না আমার! অথচ I had a powerful memory once! রেভারেণ্ড গোপাল মিত্তিরের গ্রীক বইখানা এনে কোথায় যে হারালাম! কি কবিতা দেখি!

মনোমোহন। এই দেখুন—

কবিতাটি মধুসূদনকে দিলেন

মধু। ও—এটা waste paper basket-এ ছিল! অথচ আমি এটা চতুর্দ্দিকে খুঁজছি। পড় ত কবিতাটা—read it aloud.

মনোমোহন। Excuse me—ও আমি পড়তে পারব না।

মধু। আমি পড়ি তা হলে—নাও।

চেয়ারে বিকৃত করে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি,—জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

মনোমোহন। এ কবিতাটা লেখা কি আপনার উচিত হয়েছে!

মধু। Why not? I am digging my own grave. Why shall I not write my own epitaph too?—যাক্ ছেড়ে দাও ওসব। হেনরিয়েটাকে, কেমন দেখলে?

মনোমোহন। খুব জ্বর—

মধু। ডাক্তার পামারকে ভাই একবার—

মনোমোহন। ব্যস্ত হবেন না আপনি—আমি খবর করছি তার।

'ঝর' আসিয়া প্রবেশ করিল ও একটি ডাকের চিঠি দিয়া গেল

মধু। (পত্রখানি পড়িতে পড়িতে) তাহলে ত ভালই হ'ল!

মনোমোহন। কি ?

মধু। উত্তরপাড়া থেকে জয়কৃষ্ণ মুকুজ্যে চিঠি লিখেছে। তাকে চিঠি লিখেছিলাম যদি সে তাদের লাইব্রেরি ঘরটায় কিছুদিনের জন্যে থাকতে দেয় আমাকে। He has welcomed me.—একটু change-ও হবে—তাছাড়া পাওনাদারদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি ভাই! I want a little respite!

মনোমোহন। এ ত খুব ভাল কথা।

মধু। তুমি তাহলে সব ব্যবস্থা করে দাও ভাই! কালই একটা বজরা জোগাড় কর—আর দেরী ক'রো না। আর ডাক্তার পামারকে একবার পাঠিয়ে দাও আজ—হেনরিয়েটাকে দেখে যাক্! You just go—আর দেরী ক'রো না! বুঝলে?

মনোমোহন। আচ্ছা—চললাম তাহলে! Good bye.

মধু। Good bye.

মনোমোহন চলিয়া গেলে মধুসূদন কবিতাটার দিকে খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন

I wonder, if they will put it up on my grave! (একটু পরে) The curtain will soon be rung down and the show will be over! Funny!

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

সুন্দর কথা লিখে গেছে শেক্‌স্‌পীয়র—All the world's a stage! (সহসা) Bye the bye—stage-এর কথায় মনে পড়ল শরৎ ঘোষকে 'মায়াকানন'টা লিখে দেব বলেছিলাম—শেষই করতে পারছি না বইখানা! অথচ টাকা দিয়ে গেছে বেচারা।

ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

গৌরদাসের অনেকদিন খবর পাই নি। ভোলানাথও আসে না আজকাল। ভূদেবের চিঠিটাই বা কোথা ফেললাম—'হেক্টার বধ' পেয়ে সুন্দর একখানা চিঠি লিখেছিল ও আমাকে!

টেবিলের দেরাজটা খুলিয়া খুঁজিতে লাগিলেন

কোথায় যে কি ফেলি—কিচ্ছু মনে থাকে না! everything is top-y-turvy—সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার!

পাশের ঘরে কান্নার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল

ও কি! হেনরিয়েটা কাঁদছে নাকি! হেনরিয়েটা—হেনরিয়েটা! হেনরিয়েটা!—

প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন

শেষ দৃশ্য

বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সম্মুখে বঙ্গদর্শনের ফাইল। বঙ্কিমচন্দ্রের এক হাতে সড়সির নল অন্য হাতে লেখনী। রাত্রিকাল। সহসা দুয়ার ঠেলিয়া মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে সাহেবি পোষাক—বদলে একখানা বই। মধুসূদনকে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়া আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন

বঙ্কিম। আসুন, আসুন—আপনি এ সময়ে হঠাৎ! বসুন!

মধু। (উপবেশনান্তে) তোমাকে দেখতে ভারি ইচ্ছে হ'ল! লিখছিলে না কি! কি লিখছ?

বঙ্কিম। বঙ্গদর্শনের জন্যে লিখছি—

মধু। Good—তোমার 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' পড়েছি—চমৎকার হয়েছে—চমৎকার! তোমার বঙ্গদর্শনও সুন্দর হচ্ছে! You have created real romances in our literature. I congratulate you. আমার এই বইগুলো তোমায় দিতে এলাম—I hope you will take care of them.—দেখ, জীবনে অনেক কিছু করব মনে করেছিলাম। আরও ঢের ভাল কাব্য লেখবার ইচ্ছে ছিল আমার—ভাল গদ্যও লেখা করব ভেবেছিলাম—শিশুপাঠ্য পুস্তক লেখবারও আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার। কিছুই আর হয়ে উঠল না। তোমার ওপর আমার অনেক আশা। I hope you will do what I could not.

বঙ্কিম। আপনার অসুখ শুনেছিলাম?

মধু। (সহাস্যে) I have been cured now. I am going out for a long change.

বঙ্কিম। কোথায়?

মধু। ঠিক জানি না।

বঙ্কিম। ফিরবেন কবে?

মধু। তাও ঠিক জানি না। এবার উঠি—সময় নেই বেশী আমার—God bless you my boy—keep the flag flying—Good bye.

ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন

(নেপথ্যে) বঙ্কিমবাবু বাড়ী আছেন না কি ?

বঙ্কিম। আছি—আসুন।

জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন

ভদ্রলোক। খবর শুনেছেন ? আপনাদের কবি মাইকেল মধুসূদন মারা গেছেন আজ !

বঙ্কিম। (সবিস্ময়ে) মারা গেছেন ? মাথা খারাপ হ'ল নাকি আপনার ?

ভদ্রলোক। এইমাত্র কোলকাতা থেকে একজন লোক এল তারই মুখে শুনলাম ! আজই মারা গেছেন—আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে। উত্তরপাড়ার জয়কেষ্ট মুকুজ্যেদের লাইব্রেরীতে ছিলেন—সেখানে বাড়াবাড়ি হওয়াতে আলিপুর হাসপাতালে আনা হয় তাঁকে। সেখানেই মারা গেছেন !

বঙ্কিম। (হাসিয়া) একেবারে বাজে গুজব।

ভদ্রলোক। কি যে আপনি বলেন মশায় ! শুধু তিনি নয় তাঁর বেনসাহেবও মারা গেছেন—তিনিও দুগ-ছিলেন। তবে তিনি হাসপাতালে মরেন নি—বেনেটোলার বাড়ীতে মরেছেন—স্বামীর আগেই মারা গেছেন শুনলাম।

বঙ্কিম। মশাই, আপনি আসবার ঠিক আগে এই বইগুলো (সবিস্ময়ে) —কই বইগুলো কোথা গেল—তাই ত —বইগুলো এইখানে ছিল যে—এ কি !

খুঁজিতে লাগিলেন

ভদ্রলোক। কি বই ?

বঙ্কিম। এইখানে ছিল যে বইগুলো—কি আশ্চর্য্য !

ভদ্রলোক। বই পরে খুঁজবেন—আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন। অত বড় একজন কবি—কি কষ্টেই যে মারা গেছেন শুনলে চোখের জল রাখা যায় না !

বইগুলি দেখিতে না পাইয়া বঙ্কিম নির্ব্বাক বিস্ময়ে খোলা দরজাটার দিকে চাহিয়া রহিলেন—যে দ্বারপথে মধুসূদন এইমাত্র ঝড়ের মত বেগে বাহির হইয়া গিয়াছেন। ভদ্রলোকও নির্ব্বাক বিস্ময়ে বঙ্কিমের দিকে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে তিনি বলিলেন

বঙ্কিম। মধুসূদন মরে নি—মরতে পারে না—অসম্ভব।

যবনিকা

স্ত্রীধন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

দুর্জ্জয় কনরাড,
উইলিবর্গ দুর্গ ঘেরিয়া
রোধিয়াছে ঘাট বাট।
ফুরালো রসদ রণসম্ভার,
দুর্গেতে থাকা চলে না ক' আর,
সন্ধি সর্ত্ত এসেছে রাজার,
—পড়িতেছে সন্ধাট।

২

দূতে নরপতি ক'ন
দুর্গের কারও জীবন ভিক্ষা—
দিতে তিনি রাজি ন'ন।
প্রতিহিংসায় কে করিবে রোধ
রক্তই লবে রক্তের শোধ,
মৃত্যু-বেদীতে বলির সংখ্যা
হইবেই অগণন।

৩

ফুরাইল আশা ভবে—
রাজা কন ডাকি মৃত্যুর লাগি
প্রস্তুত হও সবে।
অনশনে মরা কাপুরুষ প্রায়
সৈন্যকে নয়, অস্ত্রে সাজায়,
মরিবেই যবে বীরের মতন
লড়িয়া মরিতে হবে।

৪

রাজ্ঞী চতুরা অতি,
শুধু নারীদের দুর্গ ত্যাগের
চাহিলেন অনুমতি।
সম্রাট তবু দিলেন আদেশ—
তাঁহাদের নাই শস্ত্রের লেশ
আপনার ধন রত্ন সহিত—
তাঁদের অবাধ গতি।

৫

ঘর চুপে চুপে কয়,
ও দুর্গ মণি রত্নেতে ভরা
বুঝি সব ব'হে লয়।
অলঙ্কারেই রমণীর শোভ,
অন্য কিছুতে নাই তত ক্ষোভ
কত ভার ওরা বহিতে যে পারে
পাইবেন পরিচয়।

৬

মুক্ত দুর্গ দ্বার।
রমণীর দল সারি দিয়া আসে
স্কন্ধেতে গুরুভার।
দেখে সম্রাট বিস্ময়ে চাহি
স্কন্ধেতে স্বামী আর কিছু নাহি,
নিদারুণ ক্লেশে পুরাঙ্গনারা
পরিখা পূরিছে পার।

৭

বলিলেন মহারাণী
হে রাজাধিরাজ স্বামীই মোদের
শ্রেষ্ঠ রত্ন জানি।
স্কন্ধে করিয়া সেই ধন—
তোমার আদেশে করছি বহন,
হে দাতা দয়ালু হও চিরজীবী
মোদের আশীর্ব্বাণী।

৮

সম্রাট আসি' আগে;
বলেন জননী দন্তী তনয়
তোমাদের ক্ষমা মাগে।
যেথায় নিবসে হেন সতী নারী
সে দেশ জয়ের আমি অধিকারী!
ভাবিয়া হৃদয় উথলিয়া ওঠে—
গর্ব্বে ও অনুরাগে।

৯

উঠিতেছে কোলাহল,
বিশ্ববিজয়ী বীরের চক্ষু
অশ্রুতে ঢলঢল।
উড়াও পতাকা, কামান সাজাও,
সজোরে সমর বাদ্য বাজাও
প্রচারিত হোক দিকে দিকে এই
কাহিনী সুমঙ্গল।

১০

কোনও ভয় নাহি আর,
সম্মানসহ মুক্তি মিলিল
দুর্গের সবাকার।
বীর রমণীরা জয় দিয়া যায়
সযতনে সেনা অস্ত্র নোয়ায়,
সজ্জিত চতুরঙ্গ বাহিনী
জানায় নমস্কার।

দেখা হল ফাল্গুনে

শ্রীনিশানাথ মুখোপাধ্যায় বি-এসসি, ডিপ-এড্

এক

ফাল্গুন মাস। ইটের লম্বর শেষ হইয়াছে, এখন বসন্তের পালা কিন্তু বসন্ত এখনও আসিয়া পৌঁছাইতে পারে নাই, কাজেই ইটও চার্জ সুকাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতেছে না—তাহার প্রকোপ এখনও সর্বত্র বর্তমান। এদিকে জীবজন্তুসকল তাহার স্বাপটে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে আর বসন্তকে মেরি করিয়া আসিবার জন্য গালি পাড়িতেছে। অতি-বুদ্ধদের এখনও পায়ে পট্ বাঁধিয়া ও ফ্লানেলের শার্টের উপর বালাপোষ জড়াইয়া তবে বাড়ীর বাহির হইতে হয়, সপ্তাহে দুই দিন স্নান করিবার সময়েও এক বালতি গরম জলের দরকার পড়ে—তাহারাই পাপাত্ম করিতেছে সব চেয়ে বেশি।

বেলা তখন বারটা। প্রকাশ স্নানের ঘর হইতে বাহির হইতেই তাহার মামীমা নির্মলা দেবী বলিলেন, 'ওরে! খুকীদের স্কুল থেকে দরোয়ান তোর নামে একটা চিঠি এনেছে, বাইরে গিয়ে নিয়ে আয়।'

খুকী ওরফে মলিনা প্রকাশের মামাত বোন—সে আনন্দময়ী গার্লস্ হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী।

কিছুক্ষণ পরে প্রকাশ বাড়ীর বাহিরে আসিতেই গার্লস্ স্কুলের দরোয়ান সেলাম করিয়া তাহার হাতে খামে-আঁটা একখানি পত্র দিল।

প্রকাশ খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

Anandamoyee Girls' High School

Bhagalpur

Dated ২৩।২।৩৮

প্রিয় প্রকাশ,

কাল আমাদের স্কুলে প্রাইজ। এই উপলক্ষে মেয়েরা কয়েকটি গান গাহিবে ও বিসর্জন নাটক মে করিবে। Opening song হইবে সেই গানটা—'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'। তুমি এ ক'দিন এখানে না থাকায় আমার বড় অসুবিধা হইয়াছে। মলিনার নিকট শুনিলাম যে, তুমি আজ সকালে ফিরিয়া আসিয়াছ। আজ দুপুরে একবার আসিয়া মেয়েদের একটু coach করিয়া দিয়া যাও। দরোয়ান মারফৎ বলিয়া পাঠাইবে যে কখন আসিতেছ। ভাল আছ আশা করি। স্নেহাশিস নিবে। ইতি

তোমাদের বীরাদি

পত্র পড়িয়া প্রকাশ দরোয়ানকে বলিল, 'বীরাদিকো বোলো—হাম তুরন্ত আতে হৈ।'

'বহুত্ আচ্ছা হুজুর'—বলিয়া দরোয়ান সেলাম করিয়া প্রস্থান করিতেই প্রকাশ ভিতরে গিয়া রান্নাঘরের দিকে তাকাইয়া মামীমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "মামীমা, শিগ্‌গীর আমায় ভাত দিন, এখুনি আবার বেরুতে হবে।'

প্রকাশের গলা শুনিয়া নির্মলা দেবী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, কেন রে, এখুনি আবার কোথায় যাবি? খুকীদের স্কুলের দরোয়ান কিসের চিঠি এনেছিল রে?"

—"চিঠি বীরাদি দিয়েছেন। কাল তাদের স্কুলে প্রাইজ, আমাকে গিয়ে একটা গান শিখিয়ে দিয়ে আসতে হবে?"

দুই

প্রকাশ ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর মামা-বাড়ীর নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ভাগলপুর কলেজে আই-এসসি পড়িতে থাকে। তাহার মামা বীরেনবাবু ভাগলপুর কলেজের ফিজিক্সের প্রফেসর। আই-এসসি-তে ফার্স্ট হইয়া সে এবার এই কলেজ হইতেই বি-এসসি পরীক্ষা দিয়াছে।

প্রকাশ ভাত পাইবার পর ফ্লানেলের পাঞ্জাবীটি গায়ে দিয়া সাইকেলে চড়িয়া গার্লস্ স্কুলের দিকে রওনা হইল।

শ্রীমতী বীরা বসু গার্লস্ স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস। এই পরেরটুকু মেয়ে। তিনি প্রকাশকে ছোট 'ভাইয়ের মতই দেখেন, কলেজে স্কুলে প্রাইজ বইবার সময় এবং অন্যান্য সময় যে কয়েকজন লোকের সাহায্য লওয়ার দরকার হয়, প্রকাশ তাহাদের মধ্যে একজন।

স্কুলের গেট হইতেই মেয়েদের মিলিত স্বরের রেশ তাহার কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কোরাসে গান হইতেছে। সে ধীরে ধীরে সাইকেল হইতে নামিয়া হেড মিষ্ট্রেসের ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বীরা বসু দূর হইতে প্রকাশকে দেখিতে পাইয়া গান থামাইয়া নিজের ঘরে আসিয়া বলিলেন, 'যাক্, তুমি এসে পড়েছ ভালই হল, এখন গানটা আর পাইগুলো একটু ঠিক করে দাও। যদিও আর সময় নেই, তবু তোমার মত ওস্তাদের কাছে অল্প-কিছু শিক্ষা পেলেও মেয়েরা অনেকটা ভাল করতে পারবে।

তার পর বীরা বসু ও প্রকাশ দুজনে গান ও পার্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে হেড মিষ্ট্রেস নিজের ঘরে চলিয়া আসিতেই মেয়েরা নিজেদের ভিতর গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। নূতন ম্যাট্রিকুলেট-কল্পা শুভা বলিল, 'ওরে ঐ লোকটাই সেদিন দোকানে আমার পাশে হাত দিয়েছিল, লোকটি কে ভাই?'

অরুণা বলিল, 'জানিস নে, ও যে ম—'

মলিনা দেখিল যে অরুণা যদি তাহার পরিচয় দিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার দাদার পায়ে হাত দিবার সময় গল্পই আর শুনিতে পাওয়া যাইবে না, তাই সে ইঙ্গিতে অরুণাকে চুপ করিতে বলিয়া গুন্তাকে বলিল, 'কি হয়েছিল ভাই গুন্তা? তোর পায়ে হাত দিতে গিয়েছিল কেন রে?

গুন্তা বলিতে লাগিল, 'সে ভাই এক মজার ব্যাপার। এখানে ঐ যে সুহাগঞ্জে 'সু ষ্টোর্স' আছে না, সেই দোকানে সেদিন বাবার সঙ্গে এক জোড়া জুতো কিনতে গিয়েছিলাম। তা ভাই সে দোকানে জুতো দেখাবার জন্য কোন চাকরবাকর নেই, তাঁরা বিক্রেতাই জুতো বের করে দেখান। ঐ লোকটিই এক জোড়া জুতো বের করে দিলেন। কিছুতেই আমার পা ঢোকে না, আমি বাবাকে বললাম যে ছোট হয়েছে। উনি বললেন, না ছোট হয়নি, এইটেই ঠিক সিট্ করেছে—বলে একটা সু-হর্ণ্ দিয়ে আমার পায়ের গোড়ালির কাছটা ধরে সু-হর্ণ্ দিয়ে পা'টা ঢুকিয়ে দিলেন। এত তাড়াতাড়ি এ ব্যাপারটা হয়ে গেল যে, আমি বারণ করবার বা পা সরিয়ে নেবার সময়ই পেলাম না, যখন সম্বিলাভ তখন পা জুতোর ভেতর ঢুকে গেছে। ওঁরা দোকান করেছেন কিন্তু লোক রাখেন না কেন? আমার ভাই তখন এমন লজ্জা করছিল!'

মেয়েরা এতক্ষণ চুপ করিয়া গুন্তার কথা শুনিতেছিল। তাহার কথা শেষ হইতেই মিনতি মলিনার দিকে তাকাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ রে মলিনা! তোর দাদা গুন্তার পা ধরে ফেললে? আচ্ছা গুন্তা, প্রকাশদা যখন তোর পায়ে হাত দিল তখন বোধ হয় মনে মনে বলছিল, 'বেহি পদপল্লব মুদারম্।'

গুন্তা বলিল, 'উনি মলিনার দাদা বুঝি?'

অরুণা বলিল 'হ্যাঁ, মলিনার পিসতুতো ভাই, খুব ভাল ছেলে। তবে, ও জুতোর দোকানটা প্রকাশদার নয়, ওটি ওর এক বন্ধু কিরণবাবুর দোকান। তিনি ব্যাচেলর, তিনি বলেন যে বাঙালীরা পরিশ্রম করতে জানে না বলেই ব্যবসায় লোস যায়, তাই তিনি কোন চাকরবাকর রাখেননি নিজে ও নিজের ভাই, ভাগ্নে সব মিলেই দোকান চালান। তোর বেশটি কপাল ভাল; জুতো কিনতে গিয়ে য়ুনিভার্সিটির উজ্জ্বল রত্ন প্রকাশচন্দ্রের পদ-সেবা লাভ করে গেছে!'

এইরূপে চট্টা তামাসা চলিতেছে এমন সময় মীরা দেবী প্রকাশকে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

প্রকাশ গুন্তাকে সেখানে দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, সেদিন কিরণের দোকানে 'আঃ ছাড়ুন ছাড়ুন!' বলিয়া কিরূপ জুতা সমেত পা ছড়াইয়া লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।

—"প্রকাশ, ওকে পড় অরপাদের নাচের।" বলিয়া মীরা দেবী যে মেয়েরা গান গাহিবে তাহাদের সার বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া দিলেন।

প্রকাশ মেয়েদের বলিল, "তোমরা আমার সঙ্গে সুরে গাইতে থাক।" বলিয়া সুরু করিল—

"জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা—"

মীরা দেবী, অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী এবং আর আর মেয়েরা যখন গাহিতে শুনিতে লাগিল। মীরা দেবী আগামী কল্য গানটীর সাফল্যের কথা ভাবিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ওস্তাদের মুখিকার সুরে তখন মেয়েদের মিলিত কণ্ঠের সুললিত সুরে ধ্বনিত হইতেছিল—

'তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয় গাথা—"

গান শেষ হইবার পর প্রকাশ মীরা দেবীর ঘরে আসিয়া বিশ্রাম লইতেছে এবং গুন্তার রূপ ও গুণের বিষয় ভাবিতেছে এমন সময় পিছন হইতে ধারা পাইয়া চমকাইয়া পিছনে তাকাইতেই দেখিল সুরেশ ও অবনী। সুরেশ বলিল, 'কি রে তুই কখন এলি? একা চুপচাপ বসে কি ভাবছিস্?' প্রকাশ বলিল, 'এসেছি অনেকক্ষণ। এইমাত্র মেয়েদের একটা গান শিখিয়ে এলাম।"

অবনী বলিল, 'মীরাদি কই? ষ্টেজ টাঙাবার কি ব্যবস্থা করেছেন দেখি?' বলিয়া সে মীরাদির খোঁজে এঘর ওঘর করিতে লাগিল।

প্রকাশ বুঝিল যে তাহারা আসিয়াছে ষ্টেজ বাঁধিবার জন্য।

অবনী মীরাদিকে খুঁজিয়া আনিতেই সকলে মাঠে গিয়া ষ্টেজ বাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া গেল। সুরেশ ও অবনীকে ষ্টেজ বাঁধিবার কাজে নিযুক্ত করিয়া মীরা দেবী প্রকাশকে লইয়া 'বিসর্জন' নাটক রিহার্সাল দিবার জন্য মেয়েদের নিকট চলিয়া গেলেন।

তিন

পরদিন সন্ধ্যার সময় পুরবার বিতরণ হইয়া গেলে 'বিসর্জন' নাটক আরম্ভ হইল। নাট্যাভিনয় হইবে বলিয়া প্রাইজের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল সন্ধ্যায়। সুরেশ ষ্টেজ ম্যানেজ করিবার ভার লইয়াছিল, আর প্রকাশের উপর পড়ে প্রম্পট করিবার ভার।

তখনও যে আরম্ভ হয় নাই। সাজঘরে মেয়েরা জটলা করিয়া কেহ সাবান দিয়া মুখ ধুইতেছে, কেহ বা মুখে ক্রিম অকপাইচ্ মাখিতেছে এমন সময় মলিনা হাসি হাসি মুখে বলিল, 'বুঝেছিস গুন্তা, কাল প্রকাশ-দা বাড়ী গিয়ে তোর খুব সুখ্যাতি করছিল।'

ডালিম বলিল, 'কি রে মলিনা! তোর দাদা কিসের সুখ্যাতি করছিল রে! রূপের, না গুণের?'

মলিনা একবার দেখিয়া লইল যে ষ্টেজারের মধ্যে কেহ সেখানে নাই তখন সে বলিল, 'সে ত ভাই জানি না! দাদা গুন্তাকে দেখে একেবারে মশ্‌গুল!

গুন্তা তখন মুখে সাবান মাখিয়া ঘষিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, সে সেই অবস্থাতেই বলিল, "আঃ মাঃ ফাজলামো করিস না বলছি, এখুনি তোর কান মলে দেব।"

মলিনা হাসিয়া জবাব দিল, 'তা ভাই, দাদার যার দিস্, কিন্তু আমি যা শুনেছি তাই বলছি।' বলিয়া অন্য মেয়েদের দিকে তাকাইয়া বলিতে

লাগিল, 'কালকের সেই গানটা বাড়ী গিয়ে বাবা আমার গাইতিস, তবে কথাগুলো একটু অদল-বদল করে নিস, ঐ যেমনটায় আছে যা,

'তুমি শুভ্র মনে জাগো, তব শুভ্র আসিস যাগে
গায়ে তব জল গাগা—'

কি সব বাজে, আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম যে গাওয়া গাইছে—

'শুভ্র নাম ছন্দে জাগে
তব করুণা চিত্ত মাগে
খেয়েছ তুমি মোর মাথা—'

শুভার তখন ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে রাগে ও লজ্জায় রাঙা হইয়া মলিনার গায়ে একটি চিমটি কাটিল।

মলিনা 'উহু' না করিয়া স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিল, 'বেশ্ ভাই, শুভার অনেক হচ্ছে কি না, অথচ তোদের কাছে বেপাতে হবে যে তার রাগ হয়েছে তাই চিমটি আমার কাটলো কটে, কিন্তু এত আস্তে যে আমার লাগো ত ঘুমের কথা, বরং—'

মন্তাজে ফেরেরা সশব্দে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং শুভার মুখ আরও রাঙা হইয়া উঠিল।

কৈলাসের হাসির শব্দে মীরা দেবী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'এই, তোরা অত হাসচিস কেন? ঘুম ভাঙলো হল? আয় এবার পেট করে ভেল পরিয়ে দিই।' এই বলিয়া আর একজন শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে তিনি মেয়েদের একে একে সাজাইতে লাগিলেন।

চার

ফাল্গুন মাস প্রায় শেষ হইতে চলিল। কলেজের মৃদু মধুর বাতাস শীতের জড়তা নাশ করিয়া নিজের কল্যাণময় হস্ত চারিদিকে বুলাইয়া দিতেছে। বুড়াদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের আর গায়ে পটু বাঁধিয়া বা গায়ে বালাপোষ জড়াইয়া বাড়ীর বাহির হইতে হয় না। ছেলে-ছোকরাদের সুলোচার ও র‍্যাপার টাঙে উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার সেই কাবুলীদের মত কাপড় পরিয়া, ঢিলা হাতা পাঞ্জাবী গায়ে, গায় ঘুড়িয়া লম্বা জুলফি নাচাইয়া সদর্পে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তরুণীরা অবশ্য ব্লাউস ও র‍্যাপার ছাড়িয়া বিকালে বা দুপুরে কফিরও বাড়ী বেড়াইতে যাইবার জন্য আবার সিল্কের শাড়ী ও ব্লাউস বাহির করিয়াছে। বুড়ারা আবার পুরাদমে নিজেদের আজ্ঞার আর-কালকার ছেলে-ছোকরাদের নিন্দায় মাতিয়া উঠিয়াছে।

এমন ফাল্গুনে দিনে একদিন রবিবার সকালে ভাগলপুরের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় আলবোলা টানিতে টানিতে একটি চিঠি বোধ হয় লিখিতেছেন, এমন সময় পত্নী আভা দেবী এক বাটি দুধ আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া সম্মুখের চৌকায় বসিয়া পড়িলেন।

কৈলাসচন্দ্র রায় লিখিবার কাগজ ও ব্লটিংপেপার সরাইয়া রাখিয়া দিয়া বলিলেন, 'প্রিয়ে! কহ কিবা সমাচার?'

আভা দেবী বলিয়া উঠিলেন, 'চং দেখে আর বাঁচিনে। বলি, বত বয়স বাড়চে রসিকতাও তত বাড়চে, না?'

—'বয়স আর এমন কি বেশী, এই তো সবে বিয়াল্লিশ, আর বা ছাড়ে, বয়স বাড়বার সঙ্গেই ত রস ঘনীভূত হবে? তুমি কিছু বলতে চাও—না, বসে পড়লে আমায় শুধু তোমার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করবার জন্য?'

আভা দেবী দেখিলেন যে তাঁর স্বামীকে রসিকতা-করা হইতে কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিবেন না, কোনকালে পারেনও নাই; তাই আর কিছু না বলিয়া বলিলেন, 'দেখ, তোমায় বলবো-বলবো করে বলাই হয় নি, তুমি ঠাকুরপোকে লেখো এইবার শুভার বিয়ের জন্য, বড়-সড় হচ্ছে, এইবার বিয়েটা দিয়ে দেওয়া উচিত।'

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, 'আরে এই কথা বলবার জন্য তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ? শুভার বিয়ের ত সব ঠিকই হয়ে আছে, একদিন দিলেই হবে; তার জন্য তাড়াতাড়ি কি, আরও কিছু দিন যাক না।'

—'না না, তুমি বোঝ না, মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখছে, শেষে যদি আবার অমত করে বসে?'

—'শুভা ত সে রকম মেয়ে নয়, সে ত জানেই যে তার বর ঠিক হয়ে আছে, সে কি আবার অন্য কারো জন্যে পড়বে না কি!'

—'শুভার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মনু যদি শেষে শুভাকে বিয়ে করতে না চায়, তখন? সে ত আজকালকার ছেলে, যদি তার বাপের কথা না শোনে? তাকে ত দেখেচি সেই ছোটটি, তখন ত সবে তার পাঁচ বছর বয়স, কে জানে কেমন হয়েছে দেখতে, তখন ত বেশ চেহারা ছিল। তুমি চিঠি একটা লিখে দাও, আমিও একটা লিখে দিচ্ছি।'

কৈলাসচন্দ্র এ ক্ষেত্রে পত্নীর পরামর্শ মতই চলিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'হাঁ, এ একটা কথা বটে, আচ্ছা আমি আর চিঠি লিখে দিচ্ছি। আমরা ভাগলপুরে ত প্রায় দু মাস হল এসেচি, এর মধ্যে তো তাকে কিছুই দেখা হয় নি। মনু ত এবার বি-এ এগ্জামিন দিয়েচে।'

আভা দেবী স্বামীকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'আজকাল শুভারও কিসের পরিবর্তন হয়েছে দেখতে পাই, সে রকম ফুর্তি নেই। বড় হয়েছে ত, এখন কি আর ঐ অঙ্ক আর সংস্কৃতের বই ওর ভাল লাগে? কোথায় বিয়ে-থা হবে স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্না, আমোদ আহ্লাদ করবে, তা নয়, 'এ প্লাস বি ইজটু এ স্কয়ার প্লাস টু এ ফ্যাক্টর মাইনস্ বি ফ্যাক্টর' আবার এলিজাবেথ কখন রাণী হল, আরঙ্গজীব কাকে ভালো বাসলো—এই সব কি, ওর ভাল লাগে? ওকে তার রাজার রাণী করে দাও তবে ত তার ভাল লাগবে! এ বয়সে মেয়েদের প্রেম, ভালবাসা ছাড়া আর কি পছন্দ হয়, শুনি?'

কৈলাসচন্দ্র স্মিতমুখে বলিলেন, 'তুমি সবাইকে তোমার মতই ভাব কি-না! তোমাকে যখন আমার রাণী করেছিলাম তখন নূরজাহানের মতই তোমার দাপট ছিল। কি পরদেশাই তুমি করিয়ে নিয়েছিলে আমায় দিয়ে!'

—'কি মিথ্যে কথাই তুমি বলতে শিখেছ!' বলিয়া একটি কোপ কটাক্ষ হানিয়া দুধের খালি বাটিটি লইয়া আভা দেবী চলিয়া গেলেন।

পত্নী চলিয়া যাইতেই কৈলাসচন্দ্রের পুরাতন দিনের ঘটনা স্মৃতিপথে

আপনার মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, 'আজার চলিবার ভঙ্গীটুকু এখনও ঠিক সেই রকমই আছে।' তারপর দুতাকে ডাকিয়া কলিকাটি বসাইয়া দিতে বলিয়া পুনরায় রায় লিখিতে সুরু করিলেন।

পাঁচ

এইখানে ঘোড়ার কথা কিছু বলা প্রয়োজন। প্রায় উনিশ-কুড়ি বছর পূর্বে কৈলাসচন্দ্র এবং তাঁহার সতীর্থ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বিমলকুমার, দুইজনে বি-এ পাশ করিয়া এম-এ ও ল' পড়িতে লাগিলেন। কৈলাসের সহিত বিমলের যখন প্রথম বন্ধুত্ব আরম্ভ হয় তখন দুইজনেই কিছুদিন কলেজে পড়িতে আসিয়া হোষ্টেলের একই ঘরে বাস করিতে থাকেন। দুইজনেই মুরিব্বাদিটির নাম-করা ছাত্র, কাজেই বন্ধুত্ব ক্রমশ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। কৈলাস এম-এ পড়িতে পড়িতেই ডেপুটির পদ পাইয়া কর্মস্থানে চলিয়া গেলেন এবং বিমল এম-এ ও ল পাশ করিয়া পরে ছাপরায় ওকালতি করিতে লাগিলেন। বিমলের প্র্যাকটিস আরম্ভ করিবার একবৎসর পরে কৈলাস ছাপরায় সেরেস্তা অফিসার হইয়া বদলি হইয়া আসিলেন।

এই সময় দুই বন্ধুপত্নীর মধ্যেও সখিত্ব স্থাপিত হইল। বিমলের তখন একটি পুত্র, বয়স পাঁচ-ছয় বৎসর ও কৈলাসের একটি মেয়ে, বয়স এক বৎসর। বিমলের ছেলে নবু যেমন দেখিতে সুশ্রী, কৈলাসের মেয়েটিও খুব সুন্দর, ফুলের মত দেখিতে। সেই সময়েই তাঁহাদের মধ্যে ঠিক হইয়া যায় যে এই দুইটিতে বিবাহ দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সখিত্ব চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিবেন।

তারপর একবৎসর পরেই কৈলাস অন্য স্থানে বদলি হইয়া যান। তাহার পর পনর বৎসর ধরিয়া নানা জায়গা ঘুরিয়া সম্প্রতি ভাগলপুরে এস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন।

ওদিকে বিমলকুমার নিজের প্রতিভা বলে এখন ছাপরার মধ্যে একজন নামজাদা উকিল। এই কয়েক বৎসরে কৈলাসের সহিত বিমলের বিশেষ দেখা শোনা হয় নাই, তবে দুই বন্ধু ও দুই সখীর মধ্যে প্রায়ই চিঠি-পত্র লেখালেখি হয়। প্রায় তিন-চারি বৎসর পূর্বে বিমল সস্ত্রীক যখন একবার পুরী গিয়াছিলেন তখন কৈলাস ছিলেন কটকের এস. ডি. ও.। সে সময় পুরী ফেরত কটকে তাঁহারা কয়েক দিন কাটাইয়া আসিয়াছিলেন। বিমলের স্ত্রী শুভ্রাকে দেখিয়া তাহার রূপ ও গুণের সুখ্যাতি করিয়া বলিয়া ছিলেন, 'মা লক্ষ্মীর আমার নবুর সঙ্গে রাজ-যোটক মিল হবে।'

কৈলাস ও আভাদেবী নবুকে আর কখনও দেখেন নাই। অনেকবার বিমলকে লিখিয়াছিলেন তাহাকে একবার তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য, কিন্তু নবুর সেখানে যাইবার কোন সুযোগ ঘটিয়া ওঠে নাই।

বিমল বলিয়াছিলেন যে, নবু বি-এ পরীক্ষা দিলেই তাহার বিবাহ দিবেন এবং এই বৎসর সে বি-এ পরীক্ষা দিয়াছে, কাজেই আভা দেবী স্বামীকে বলিলেন সেখানে চিঠি দিবার জন্য এবং নিজেও তাহার সখীকে চিঠি লিখিবেন ঠিক করিলেন।

ছয়

আনন্দময়ী গার্লস স্কুলে প্রাইজ দইবার দুই দিন পরেই ভাগলপুরে এক প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ প্রদর্শনী এ অঞ্চলে আর কখনও হয় নাই। নানা জায়গা হইতে শিল্প ও অন্যান্য জিনিষে হল ভর্তি হইয়া গিয়াছে। গার্লস স্কুলের একটি হলে মেয়েদের আঁকা ছবি এবং সূতা ও রেশমের মূর্তি বা কারুকার্য্য খচিত শিল্পাদি সাজানো রহিয়াছে। কলেজের হলে ঢিবে বেতার সংক্রান্ত সব জিনিষ ও যন্ত্রে এম-রে দেখানো হয়। বেতারে এ ঠিক টেলীগ্রাম' না দেখাইয়া তাহার বদলে তাতে বেল বাজানো হইয়া থাকে।

কলেজের হলে, জিনিষের তদারকের জন্য নরেনবাবুর স্ত্রীর অসুখ থাকায় ঐ দুটি জিনিষ দর্শকদের দেখাইয়া বুঝাইয়া দিবার ভার প্রকাশের উপর ভার পড়িয়াছে।

দিনের বেলা হলে যখন ভীড় করিয়া লোক জমা হয় তখন প্রকাশ বেলটিকে বাজাইয়া বুঝাইয়া দেয় যে, বেলটির ব্যাটারির সহিত সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া তাহা বাজিতেছে, আবার কোন লোক যখন থাকে না তখন নিজের একখানি চেয়ারে বসিয়া সে বিশ্রাম লইতে থাকে।

সেদিন হলের সামনে তখন ভীড় না থাকায় সে চুপ করিয়া বসিয়া অনেক কিছুই ভাবিতেছিল। আনন্দময়ী গার্লস স্কুলের প্রাইজের পর দিনকয়েক তাহাদের বন্ধুমহলে মেয়েদের নাম এবং কিরেটারী লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে শুভার অভিনয়, অঙ্গভঙ্গী এবং গানের সুখ্যাতি করিয়াছিল। যখনই কেহ শুভার প্রশংসা করে তখনই প্রকাশ বলে, 'কে লিখিয়েছে দেখতে হবে ত?' সব ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল 'বিসর্জন' নাটকের কিছু অংশ শেষ হইবার পর সে একবার শুভাকে বলিয়াছিল, 'আপর্ণার পার্ট চমৎকার হচ্ছে, শুভাওয়ারফুল!' শুভা একটু হাসিয়া উত্তর দেয়, 'আপনি নিজে একজন সু-অভিনেতা কি-না, তাই সকলকেই ভাল মনে করেন।'

প্রকাশ বলে, 'আমি তার অভিনেতা তোমায় কে বললে, বলিনা বুঝি?'

—তা কেন, আমি বুঝি জানি না, ঐ ত কয়েক দিন হল আপনি কলেজে 'মেঘারপতন' প্লেতে মহাবত খাঁর ভূমিকা দিয়েছিলেন, আমরা সে দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর 'আপনার আপত্তি আমার বেশ লেগেছিল' বলিতে গিয়া 'আপনাকে আমার বেশ লেগেছিল' বলিয়া ফেলিয়াই তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া ওঠে। একে তাহার সুন্দর মুখ, তায় জিব অভ্রাইড, ও সিঁদুরের পেস্ট-এ মুখখানি সুন্দরতর হইয়াছিল এবং লজ্জায় রাঙা হওয়ায় তাহা সুন্দরতমে পরিণত হইয়া ওঠে।

আজ প্রকাশের মনে হইতে লাগিল, 'এই শুভা মেয়েটি যদি আমার বিয়ে হত তাহলে কি সুখীই হতে পারতাম। কিন্তু তা কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়—বাবা, মা ত কিছুতেই রাজী হবেন না—এমন সময় সামনে তাকাইতেই দেখিতে পাইল শুভা সেই দিকেই আসিতেছে।

শুভা কলেজের হলের নিকট আসিতেই প্রকাশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি, এগজিবিসন দেখতে এসেছ নাকি?'

শুভা হঠাৎ প্রকাশকে সেখানে দেখিতে পাইয়া প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, পরে বলিল, 'না। আমাদের স্কুলের যে ইল আছে তাতে অনেকের অনেকটি মেয়েকে মীরাদি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন ইলে থাকবার জন্য, আর তাছাড়া আমি একজন লেডি ভলান্টিয়ার, আপনি এখানে?'

—"আমাদের ফিজিক্সের প্রফেসর নরেনবাবু অসুস্থ, কাজেই আমার ওপর এই বেতার ও এক্স-রে দেখাবার ভার পড়েছে?

—"আমি এখন কালে যাচ্ছি, আজ সন্ধ্যার পর আসবো কয়েকজন, আমাদের এক্স-রে দেখাবেন ত?'

—"নিশ্চয় দেখাব, ঐ জন্যই ত আছি।'

—"আচ্ছা এখন যাই।' বলিয়া সে চলিয়া গেল।

প্রকাশ মনে মনে বলিল যে আজ তাহার এক্স-রে দেখানো সার্থক হইবে।

রাত্রি আটটার সময় শুভা তাহাদের ইলের অন্যান্য মেয়ের সহিত কলেজের ইলে আসিয়া প্রকাশকে বলিল, 'কই, কোথায় আমাদের এক্স-রে!'

প্রকাশ তাহাদেরই প্রতীক্ষায় ছিল। সে প্রথমে বেতার যন্ত্র দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, রেডিওতে গান প্রভৃতি যারা আমরা শুনিতে পাই তাহা এইরূপেই ধরা পড়ে। তারপর সে এক্স-রে যন্ত্রের সামনে গিয়া প্রথমে যন্ত্রের ভিতর চাকা লাগিয়া, বাক্সের ভিতর চশমা পুরিয়া যখন সেই যন্ত্রটির সামনে ধরিল তখন গ্রাউণ্ড গ্লাসের পর্দায় জলে ও বাক্স ভেদ করিয়া কেবল মাত্র চাকা, জলের ধাতুর বোতাম ও চশমার ফ্রেমটি দেখা যাইতে লাগিল। বাক্স বা জল দেখা গেল না। শুভা ও অন্যান্য মেয়েরা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তারপর প্রকাশ যখন নিজের হাতটি জলের সামনে ধরিল তখন সাংঘাতিক কেলেঙ্কারি করিয়া কেবলমাত্র তাহার হাতের হাড়গুলি দেখা যাইতে লাগিল। ইহাতে তাহারা আরও আশ্চর্য্য হইল এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের হাতের হাড় দেখিতে চাহিল।

প্রকাশ ইতস্তত করিয়া বলিল, 'তোমাদের সকলেরও ঠিক আমার মতই হাতের হাড় দেখা যাবে, কেবল তফাৎ এই যে, তোমাদের চুড়ীগুলিও দেখা যাবে। মনে হবে যেন ঐ হাড়গুলি কয়েকটি দাগা পাশে রয়েছে।

মেয়েরা দাঁড়াল না, তাহারা নিজেদের হাতের হাড় দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কাজেই প্রকাশ একে একে সব মেয়েরই হাতের হাড় দেখিয়া দিল।

শুভা ও তাহার বন্ধুর দল চলিয়া যাইতেই প্রকাশ মনে মনে বলিল, 'শুভার হাতখানি কি সুন্দর ও নরম। এই এক্স-রে মেশিনের ওপর দাঁড়ায় ও তার হাতের হাড় দুইটির ছায়ার বিশেষ কোন পার্থক্য বোঝা যাবে না। কিন্তু ঐ হাড়ের ছায়া না দেখে যদি আসল হাত দুটি নিয়ে তুলনা করা যায় তাহলে দুটি হাতে কতই না প্রভেদ!

৯।৪

জাফলপুরে মহিলাদের একটি সমিতি আছে। আনন্দময়ী গার্লস স্কুলে প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার বিকালে সমিতির অধিবেশন হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী ইহার সভাপতি। এই সমিতিতে মহিলাদের সহিত তাঁহাদের মেয়েরাও আসিয়া থাকে, কাজেই যে দিন সমিতির অধিবেশন হয় সেদিন সমবেত স্ত্রীলোকেরা তিনটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন এবং প্রত্যেক দল এক একটি হল অধিকার করিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে থাকেন।

এই তিনটি দলের মধ্যে প্রধান দলে থাকেন মেয়েদের মায়েরা অর্থাৎ যাঁদের জন্য এই সমিতির উৎপত্তি। এই দলের মধ্যে স্কুলে কাজকর্ম বিশেষ কিছুই হইত না। মেয়েদের মধ্যে মামুলি কথাবার্ত্তা যাহা হইতে পারে তাহাই হইত, অর্থাৎ আজ কি কি রান্না হইল, তোমার জামাই কবে আসিবে, অমুকের মেয়েকে তার বর নেয় না কেন? এই সবই বেশির ভাগ আলোচনা হইত। আর হইবেই বা না কেন, কারণ ইঁহাদের মধ্যে বেশির ভাগই অশিক্ষিতা। যাঁহারা শিক্ষিতা আছেন তাঁহারা আবার নিজের নিজের স্বামীর পদমর্য্যাদার কারণ সকলের সঙ্গে ভাব করিয়া মিশিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন না; তাঁহারা নিজেদের ভিতর কয়েক জনের সহিত মিশিতেন আর তাঁহাদের আলোচনা বিশেষতঃ হাল ফ্যাশনের শাড়ী ব্লাউস ও গহনা লইয়াই হইত।

কিন্তু যেদিন হইতে আভা দেবী এই সমিতির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিতা হইলেন সেদিন হইতেই ইহার কার্য্যপ্রণালী বদলাইয়া গেল। তিনি সকলের সহিত সমানভাবে মিশিতেন এবং কথাবার্ত্তা কহিতেন; সকলকেই তিনি নিজের লোক বলিয়াই মনে করিতেন। উপরন্তু তাঁহার পোষাকের জাঁকজমক ছিল না। ডালিমের মতই রঙ তাঁহার কাটিয়া পড়িতেছে অথচ অহঙ্কারে বলিয়া তাঁহার কোন জিনিষ নাই। কোথায় কোন মজলী বিবাহে শাড়ী চড়িয়া বেহায়াপনা করিতেছে, কোথায় অমিয়ার পিসিমা কাহার সহিত প্রেম ভিক্ষা করিতেছে, এই সব আলোচনা তিনি হইতে দিতেন না। আভা দেবী বলিতেন যে পৃথিবীতে অনেক লোকের বাস এবং সকলেই একরকম হইতে পারে না, কেহ বা ভাল, কেহ বা মন্দ। সমিতির সভ্যাদের উচিত ঐ সব মন্দ লোকদের ঘৃণা না করিয়া তাহারা যাহাতে ভাল হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা। আভা দেবী আসিবার পর সমিতির মধ্যে একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনি প্রত্যেক অধিবেশনের দিন পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য কিছু-নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। বিষয়গুলি এমনভাবে নির্ব্বাচন করিতেন যাহাতে সেই বিষয়ের আলোচনা হইলে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলারা উপকৃত হইতে পারেন।

দ্বিতীয় দলটি ছিল উপরোক্ত মহিলাদিগের কিশোরী বা যুবতী কন্যাদের, যাহারা সম্প্রতি বিবাহিতা হইয়াছে। তাঁহাদের মনে নিজেদের সুখের কথা ছাড়া আর কিছু বহত না। তাহাদের নিকট পৃথিবী এখন রঙীন, অন্য কিছুই লক্ষ্য করিবার নাই। কেবল মাত্র সে নিজে ও তাহার স্বামী, এই দুজনের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা, মান-অভিমান

ভাবেরা এই গুলিই তাহাদের এখন প্রধান বন্ধু। যে সব মেয়ের স্বামী এইখানেই থাকে বা আছে তাহারা সপ্তাহের ছুটীর তাহাদের রঙীন পৃথিবীর কাহিনী, প্রত্যেকেই ভাবে তাহার মত স্বামীভাগ্য আর কারও নাই, পৃথিবীতে সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। আবার যাহাদের স্বামী বিদেশে, তাহারা দেয় চিঠি। এই সব চিঠিতে ছত্রে ছত্রে স্ত্রীকে সম্বোধন করিবার এতগুলি প্রতিশব্দ পাওয়া যায় যাহা কোন অভিধানে, এমন কি রাজশেখর বসু- সম্পাদিত চলন্তিকাতেও পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র সদ্যবিবাহিত যুবকেরাই এই কথাগুলি জানে এবং ব্যবহার করে।

তৃতীয় দলটি মহিলাদের প্রাপ্তবয়স্কা অবিবাহিতা কন্যাদের। ইহাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হয় কোন্ মেয়ে কি রকম অহঙ্কারী, ভাল অঙ্ক জানে অথচ জিজ্ঞাসা করিলে মেলে কখনও বুঝাইয়া দেয় না; কে কি রকম স্বামী পাইলে তবেই বিবাহে করিবে; আজকালকার ছেলেরা কি অসভ্য, বাসের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে; ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতে গেলে দূর হইতে অনেকের পানে পাটনা হয়।

মহিলা-সমিতির আজিকার নির্ব্বাচিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইতে হইতে গল্প চলিতে চলিতে আভা দেবী বলিলেন, 'আমরা প্রায়ই দেখতে পাই যে, আজকাল যে সব মেয়ে স্কুলে বা কলেজে পড়ে তারা রান্নাবান্না কিছুই জানে না এবং তাদের বিয়ের পর সংসারের সকল ভার ঠাকুর-চাকরের উপরই ছেড়ে দিতে হয়।'

নির্ম্মলা দেবী বলিলেন, 'সেটা হয় অনেক কারণে। কোন কোন মেয়ে আছে যাদের কোন কাজ করতে বললেই স্কুলের পড়ার চাপের দুহাতাতে কিছু করতে চায় না, আবার কোন কোন বা আছেন যাঁরা মনে করেন মেয়ে তাঁর স্কুলে পড়ছে, সব শিক্ষাই তাহলে হয়ে গেল।

একজন বলিলেন, 'কিন্তু আমাদের মেয়েরা স্কুলেও পড়ে, বাড়ীর কাজও সব করে। তাদের শেখাতে গেলে ত আমাদেরই শেখাতে হবে। আমরা যদি জোর করে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে না নিই তাহলে তারা শিখবে কোথা থেকে?'

নির্ম্মলা বলিলেন, 'সে ত নিশ্চয়ই। স্কুলে আর কতটুকু শিক্ষাই বা তারা পায়। স্কুলে মেয়েদের যা শেখানো হয় তার ভেতর অল্পই তার জীবনে কাজে আসে। মেয়েরা আই-এ পাশই করুক আর বি-এ পাশই করুক, তাকে বিয়ে করে সংসার করতেই হবে, ছেলেপুলে মানুষ করতে হবে, সেবাকার্য্য আরও সংসারের কাজ করতে হবে। কিন্তু সন্তান-পালন, রান্নাবান্না, কম আয়ে কি করে সংসার চালানো যেতে পারে—এ সব কি স্কুলে কখনও শেখানো হয়? যেগুলি বিশেষ দরকার সেই-গুলিই তাদের শেখানো হয় না। আমাদের উচিত মেয়েদের স্কুলে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ঐগুলি শেখানো।

একজন উকিলের স্ত্রী বলিলেন, 'তাহলে মেয়েদের স্কুলে না পড়িয়ে বাড়ীতে কেবল ঐ সব শেখানোই হয়।'

নির্ম্মলা ইহার উত্তরে বলিলেন, 'তা হয় না। মেয়েকে স্কুলে দিতেই হবে। এর দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, বিয়ের আগে মেয়েরা আজকাল এইটেই জিজ্ঞাসা করে যে, পাত্রী কতদূর লেখাপড়া শিখেছে, গান জানে কি-না—তারা ভুলেও জিজ্ঞাসা করে না, অমুক তরকারি রাঁধতে জানে কি-না, ছেঁড়া কাপড় রিপু করতে পারে কি-না, দরকার হলে বাসন মাজতে পারে কি-না—সব ছেলেই ত আর বড়-লোক নয়, আর স্কুলে-পড়া সব মেয়েরই বড়লোকের ঘরে বিয়ে হবে না; আর তাছাড়া, আমার মনে হয়, স্বামী-পুত্রকে যে নিজের হাতে রেঁধে না খাইয়ে ঠকুর রাখে, তার মেয়ে-জন্মই বৃথা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মেয়েদের লেখা-পড়া শেখার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। ছেলে-পুলেরা যতদিন বাইরের কাজে পড়বার মত বড় হয়ে না ওঠে ততদিন তারা মায়ের কাছেই শিক্ষালাভ করে থাকে, যে মায়েরা নিজেরা শিক্ষিতা নহেন তাঁরা সন্তানকে পেখাবেন কি করে?'

আভা দেবী একমনে বসিয়া ইঁহাদের আলোচনা শুনিতেছিলেন। তিনি যতই নির্ম্মলার যুক্তিগুলি শুনিতেছিলেন ততই তাঁহার উপর তাঁহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া উঠিতেছিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, নির্ম্মলা দেবীকে সহকর্ম্মীরূপে পাইয়া তিনি সমিতির অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন।

রাত্রি হইয়া যাওয়ার সভা ভঙ্গ হইতেই আভা দেবী সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাইবার সময় নির্ম্মলা দেবীকে বলিলেন, 'আপনি একবার সময় পেলে আমাদের বাড়ী এলে আমি বড় খুসী হব। আপনার যুক্তিগুলি শোনবার মত, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার আলোচনা করবার ইচ্ছে আছে।'

নির্ম্মলা দেবী হাসিয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দান করিলেন।

আট

মেয়েদের এক-রে দেখাইবার পরদিন, ইলের নিকট শুভার সহিত দেখা হইতেই প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কাল কেমন দেখলে?'

শুভা উত্তর করিল, 'দেখ! কি আশ্চর্য্য! মাংস চামড়া ভেদ করে হাড়গুলো কি করে দেখা যায়?'

—'ঐ আলোর ওই ত গুণ, সব ভেদ করে হাড় দেখা যায় বলেই মানুষের কত রোগ আজ ধরা পড়ছে এ কলের সাহায্যে, আর তার চিকিৎসাও হচ্ছে।'

তারপর প্রকাশ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'দেখ, আমার একটা কাজ করে দেবে?'

শুভা বলিল, 'কি কাজ বলুন।'

—'এমন কিছু বিশেষ শক্ত নয়, অন্তত তোমার পক্ষে? তোমাদের ইলে মেয়েদের বোনা যে সব শিল্প কাজ হয়েছে তাতে তোমার বোনা একটি প্রজাপতি রয়েছে দেখলাম। ঐ প্রজাপতিটি অতি সুন্দর হয়েছে। আমাকে যদি একটা প্রজাপতি বুনে দাও ত বড় ভাল হয়।'

—'ওঃ এই কাজ। বেশ ত, বুনে দেব।'

প্রকাশ সত্যই মনে মনে শুভার সহিতই বিবাহের কল্পনা করিত কিন্তু সে জানে যে তার বাবা-মা এ বিবাহে কিছুতেই সম্মত হইবেন না; তাই সে শুভার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ তাহার হাতের একটি বোনা জিনিস

কাছে রাখিতে চায় এবং যদি শুভা বুনিয়া দিতে রাজী হয় এই ভাবিয়া আগে হইতেই, দশ আনা দাম করিয়া রাখিয়াছিল। সে পকেট হইতে একটি সিল্কের রুমাল বাহির করিয়া শুভার হাতে দিয়া বলিল, 'এই রুমালে সব আঁকা আছে, তুমি খালি সুতোর সাহায্যে ফুটিয়ে তুলবে।'

শুভা রুমালের পাট খুলিয়া দেখিতে পাইল যে তাহার একটি কোণে পেন্সিল দিয়া একটি প্রজাপতি আঁকা। প্রজাপতির ডানা দুটি শরীরের সহিত জোড়া নহে, একটু বিচ্ছিন্ন এবং একটি ডানায় লেখা আছে পি ও অপরটিতে এস্. ইহা দেখিয়া শুভা একটু গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রজাপতির ডানা দুটি কাটা কেন, আর পি. ও এস্. এর মানে?'

প্রকাশ বলিল, 'তা আমি বলতে পারব না।'

শুভা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল।

শুভাকে গম্ভীর হইতে দেখিয়া প্রকাশ ভাবিল, কাজটা হয়ত একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে, সেইজন্য সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, 'থাকুক, ওটা ফিরিয়ে দাও, আমি মলিনাকে দিয়ে সেলাই করিয়ে নেব।'

—'না, আমিই করে দেব, আমার কাছেই থাক।' এই বলিয়া রুমালখানি কোমরে গুঁজিয়া শুভা প্রস্থান করিবার জন্য পিছন ফিরিতেই প্রকাশ বলিল, 'কবে দেবে?'

—'কাল।'

'কালকেই? মধ্যেই হয়ে যাবে?'

—'এটুকু সেলাই করতে আর কতক্ষণ লাগবে! দু ঘণ্টার বেশী নয়, কাল ঠিক পাবেন।'

শুভা চলিতে চলিতে ভাবিল যে মলিনার কথা তাহার ঠাট্টা বলিয়াই মনে হইত কিন্তু এখন দেখিতেছে যে প্রকাশ সত্যই তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু বোধ হয় প্রকাশ জানে, যে শুভার অঙ্গত বিয়ের ঠিক হইয়া আছে তাই প্রজাপতির ডানা কাটা এবং ডানায় প্রকাশ ও শুভার নামের আদ্যক্ষর। এই সব ভাবিতে ভাবিতে শুভা মনে মনে একটু হাসিল মাত্র।

সেদিন রাত্রে নিজের ঘরে বসিয়া শুভা প্রজাপতিটিকে ফুটাইয়া তুলিল। অক্ষর দুইটি লাল রঙের সুতায় সেলাই করিয়া যখন শেষ করিল তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে।

শুভা রুমাল লইয়া চলিয়া যাইবার পরদিন বিকালে প্রকাশ অধীর আগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিছু পরে শুভা আসিয়া পাটকরা রুমালখানি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, 'এই নিন্ আপনার রুমাল। ভাবেন, কাল প্রায় সমস্ত রাত ঘুমতে পারিনি?'

—'কেন, সমস্ত রাতই লেগেছিল এটা সেলাই করতে? তবে যে বলেছিলে দু ঘণ্টার হয়ে যাবে!'

—'তা ত হয়ে যায়ই, তবে এ কাজটা কি আর দু ঘণ্টার হয়, কত পরিশ্রম এতে, সুতো সেলাইতেই ত কত সময় কেটে গেল!'

প্রকাশ রুমালখানি খুলিয়া দেখিল যেন জীবন্ত একটি প্রজাপতি এখুনি উড়িয়া আসিয়া রুমালের উপর বসিয়াছে, ডানা দুটি তার কাটা নয়, নিপুণভাবে জুড়িয়া সেলাই করা, দেখিলে মনে হয়, এখুনি হয়ত উড়িয়া আবার অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে। ডানা দুইটির উপর গোর লাল রঙের সুতায় সুন্দরভাবে সেলাই করা পি এবং এস্।

প্রকাশ মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, 'চমৎকার হয়েছে, ধন্যবাদ এর জন্য। কিন্তু ডানা দুটি এর কাটা ছিল, সে দুটি জুড়ে দিলে কেন?'

শুভা বলিল, 'ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই, এটা রেখে দেবেন। ডানা দুটো জোড়াই থাক, কেটে দিয়ে কেন ওকে কষ্ট দেবেন? ওর কাটা ডানার যন্ত্রণা দেখে আপনার কষ্ট হবে না? ভয় নেই, উড়ে পালাবে না, ও পোষা প্রজাপতি!'

এই বলিয়া শুভা একটু হাসিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

যতক্ষণ তাহাকে দেখা যায় ততক্ষণ তাহার পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া প্রকাশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রুমালখানি বুকে চাপিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নয়

সেদিন শনিবার। মলিনাদের সকালে স্কুল থাকায় দুপুরে ছুটি। অন্য দিন দুপুরে মলিনার ছুটি থাকে না এবং রবিবারে স্বামী বাড়ীতে থাকেন, তাজেই সেদিন দুপুরে নির্মলা দেবী মলিনাকে লইয়া আশা দেবীর বাড়ীতে গেলেন।

আশা দেবীর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া তাঁহারা দেখিলেন, আশা দেবী কাজে ব্যস্ত এবং শুভা তাঁহার সাহায্য করিতেছে।

নির্মলা দেবীদের আসিতে দেখিয়া আশা দেবী হাসিমুখে তাঁহাদের আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, 'আসুন, আসুন, এইখানেই বসুন, আমার কাজ শিগগীরই হয়ে যাবে।' এই বলিয়া মেয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'একটা আসন বিছিয়ে দিয়ে তুমি মলিনাকে নিয়ে তোমার ঘরে গিয়ে গল্প করোগে, যেটুকু বাকি আছে আমি একাই করে নিতে পারবো।'

শুভা নির্মলা দেবীকে বসিবার আসন দিয়া মলিনার হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল।

নির্মলা আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি তৈরি করছেন?'

আশা দেবী হাসি মুখে বলিলেন, 'পেয়ারার জেলি। উষি বড় ভাল বাসেন। বাজারে শিশি করে যে সব চাটনি বিক্রি হয় তা উনি খেতে চান না; এই জেলি খেতে বড় ভালবাসেন, তাই মাঝে মাঝে আমায় তৈরি করতে হয়।

নির্মলা বলিলেন, 'এ ত খুব ভাল কথা। ওদের যা খেতে ভাল লাগবে তা আমাদের তৈরি করে দিতে হবে বই কি।'

এই বলিয়া কি করিয়া জেলি তৈয়ারি করিতে হয় তাহা আশা দেবীর নিকট জানিয়া লইলেন। জেলি তৈয়ারি হইয়া গেলে আশা দেবী নির্মলাকে লইয়া অন্য ঘরে গিয়া বসিলেন।

তাহাদের মধ্যে সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। কিরূপে অল্পবয়সী ছেলেদের সব ঠিক দিয়া চলিতে করা যাইতে পারে সে বিষয়েও কথাবার্তা হইতে লাগিল।

কথার ছলায় আশা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মলিনা ত শুভার সঙ্গেই পড়ে, আসছে বার ত ম্যাট্রিক দেবে, ওকে কি কলেজে দেবেন, না বিয়ের কিছু ঠিক ঠাক হয়েছে?'

নির্মলা বলিলেন, 'এখনও কিছুই ঠিক হয় নি, আমি ত বিয়ে দেবার জন্য ঠিক প্রাণই বলি; কিন্তু উনি বলেন পাশটা করুক না, তার পর দেখা যাবে। শুভাকে আপনি নিশ্চয়ই করবেন দেবেন? বেশ মেয়েটি আপনার। আমার বড় ইচ্ছে ছিল আমার ভায়ে প্রকাশের সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাব করি কিন্তু তা আমার হবার যো নেই; প্রকাশের আবার অন্য ভায়েরা বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন আমার বলাই।'

আশা দেবী বলিলেন, 'শুভারও বিয়ে অনেকদিন থেকেই ঠিক হয়ে আছে, বোধ হয় এই বোশেখেই হবে।'

—'কোথায় ঠিক করলেন?'

—'ওঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আছেন, তাঁর ছেলের যখন ৬ বছর বয়স তখন শুভার বয়স এক বছর; সেই সময়েই ওঁরা দুই বন্ধু এবং আমরা দুই বন্ধু এদের বিয়ে দেব বলে প্রতিশ্রুত হই। ছেলেটি খুব ভাল, অবশ্য তাকে এই চৌদ্দ-পনর বছর দেখিনি; কিন্তু তার বাপ-মার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। কয়েকদিন হল চিঠি লিখেছি, আবার ইচ্ছে এই বোশেখেই বিয়ে দেওয়া, মেয়ে বড় হয়েছে এখন বিয়ে দেওয়াই ভাল।'

—'কোথায় সম্বন্ধ হয়েছে, কোন্ ছেলে বলুন ত?'

—'ছেলের বাবা ব্যারিস্টার উকিল, বাম বিমলকুমার বসু, ছেলের ভাল নাম জানিনে, তাকে তার বাপ-মা নবু বলে ডাকে।'

এই কথা শুনিয়া নির্মলা আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন, 'ওমা! ঐ তো আমার ভায়ে প্রকাশ, ওর বাবাই ত ব্যারিস্টার উকিল, আমার বলাই! প্রকাশ তো এখানেই আছে।'

আশা দেবী বিস্ময় বলিয়া উঠিলেন, 'নবু আপনার ভায়ে? সে এখানে আছে নাকি, কই তা তো আমরা জানিনে!'

নির্মলা দেবী তখন বলিলেন, 'প্রকাশকে তার বাবা-মা ছাড়া আর কেউ নবু বলিয়া ডাকে না এবং তার মামা প্রফেসর বলিয়াই সে এইখানেই পড়ে।' তার পর তিনি বলিলেন, 'বেশ্বুর কি আশ্চর্য, প্রকাশ ও শুভা দুজনাই দুজনাকে দেখেছে, প্রকাশ তাদের স্কুলে গ্রাইজের সময় গান শিখিয়ে এসেছে অথচ দুজনার কেউই জানে না যে, এই দুইজনার মধ্যেই বিয়ের কথা অনেক দিন থেকেই পাকাপাকি হয়ে রয়েছে!'

আশা দেবী বলিলেন, 'প্রকাশ শুভাকে চেনে বুঝি?' বলিয়াই তিনি শুভাকে ডাকিলেন।

ওদিকে শুভা আর মলিনাতে তখন যে গুলিয়া কথাবার্তা হইতেছিল। শুভা বলিতেছিল, 'তাই মলিনা, আমার যদি কোন দাদা থাকতো, তাহলে তোকে বৌদি করে ঘরে এনে চিরকালের জন্য ঘরে রাখতাম।' আর মলিনা বলিতেছিল, 'তোর যখন দাদা নেই তখন তা ত আর হবার যো নেই; কিন্তু ভাই, আমার দাদা থাকতেও যে তোকে বৌদি করে আনতে পারতিনে, দাদার আবার কোথায় কোন্ এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে আছে অনেক দিন থেকে।' শুভা বলিল, 'তাই নাকি? আমারও ঠিক ঐ রকমই।' বলিয়া আরও বলিতে যাইবে এমন সময়ে মায়ের ডাক শুনিতে পাইয়া সখীকে লইয়া নীচে আসিতেই আশা দেবী হাসিহাসি মুখে বলিলেন, 'হ্যাঁ রে, তুই মলিনার দাদা প্রকাশকে চিনিস?'

শুভা বলিল, 'প্রকাশবাবুকে খুব চিনি। তিনিই ত গ্রাইজের সময় গান শিখিয়েছিলেন, coach করেছিলেন, তিনি না শেখালে কি আমার গান আর পার্ট অত ভাল হত?'

—'প্রকাশ কে, তা জানিস?'

—'কেন, মলিনার পিসতুত ভাই।'

—'মলিনার পিসতুত ভাই ও বটই, কিন্তু ঐ প্রকাশই নবু, বিমল ঠাকুরপোর ছেলে, তোর—'

ইহা শুনিয়াই শুভা ছুটিয়া তর তর করিয়া উপরে চলিয়া গেল। মলিনা তাহাদের নিকট হইতে সমস্ত ব্যাপার জানিয়া লইয়া উল্লাস করিয়া গিয়া আনন্দের আতিশয্যে সখীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'বৌদি?'

শুভা কেবলমাত্র বলিল, 'ঠাকুরঝি!'

এমন সময়ে কৈলাসচন্দ্র কাছারি হইতে হঠাৎ বাড়ী ফিরিয়া আসায় আশা দেবী নির্মলাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বামীকে এই সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার ঘরে যাইতেই কৈলাস বলিয়া উঠিলেন—'আশ্চর্য! নবু এখানে আছে এবং তাকে দেখেছিও কতবার, অথচ চিনতে পারি নি!'

আশা দেবী বলিলেন, 'তুমি কি ক'রে জানলে? আমি ত এখুনই তার মামীর কাছে সব শুনলাম, তার মামী বেড়াতে এসেছেন আমাদের বাড়ী।'

কৈলাসচন্দ্র তখন একখানি চিঠি দেখাইয়া বলিলেন, 'আজ দুপুরের ডাকে বিমলের চিঠি পেলাম; সে লিখেছে যে নবু অর্থাৎ প্রকাশ এখানে আছে এবং সে বীরেনবাবুর ভায়ে। বিমল ও তোমার সখী দুজনাই সাত-আট দিনের মধ্যে এখানে আসছেন। তাঁদেরও ইচ্ছে যে বোশেখেই যেন বিয়ে হয়। যাক তুমি একবার বীরেনবাবুর বাড়ী যাও, নবুকে ধরে নিয়ে এসো।'

আশা দেবী ফিরিয়া আসিয়া নির্মলা ও মলিনাকে মিষ্টি মুখ করাইয়া নিজেদের মোটরেই নবুকে আনিবার জন্য তাহাদের সহিত বাহির হইলেন।

শুভা বাড়ীতেই রহিয়া গেল।

দশ

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া প্রকাশ চুল আঁচড়াইতেছে এবং গুন্ গুন্ করিয়া ইমন রাগিণীর একটি সুর ভাঁজিতেছে এমন সময় বন্ধু মলিনা ঘরে প্রবেশ করিয়া স্মিতহাস্যে বলিল, 'দাদা, তোমার যদি একটা সুখবর দিই ত আমায় কি দেবে বল!'

প্রকাশ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আগে শুনি তোর সুখবরটা কি। যদি সুখবরই হয়, তা হলে তোকে একজোড়া ব্রেসলেট, না হয় তোর যা পছন্দ তাই দেব।'

—'তোমার বিয়ের সব ঠিক করে এলাম।'

—'কার সঙ্গে রে!'

—'ঐ যার সঙ্গে কিতে হলে তুমি সুখী হও তার সঙ্গে অর্থাৎ শুভার সঙ্গে।'

—'তা কি করে হবে রে? আমার ত পাত্রী ঠিক হয়ে আছে।'

—'তোমার যেখানে ঠিক হয়ে আছে সেখানে অন্য একটা পাত্র ঠিক করে দিলেই হবে, সে আমি পিসেমশাইকে বলে ঠিক করে নেব।'

—'তোর এ সুখবর আমি আগেই জানতে পেরেছি, এই দেখ, বাবার চিঠি।' এই বলিয়া দুপুরের ডাকে পাওয়া বাবার চিঠিখানি আগাইয়া দিতেই মল্লিনা বলিল 'ও, তুমি আগেই জানতে পেরেছ; তাহলে তোমাকে আশ্চর্য্য করে দেওয়া গেল না। যাও এখন চল, শুভার মা এসেছেন তোমায় নিয়ে যাবার জন্য, চল শিগগির।'

—'হুঁই, কাকীমা এসেছেন নাকি?'

—'আর কাকীমা নয়, দুদিন পরেই তোমার শাশুড়ী অর্থাৎ—কাকী বাবু কিরে হবু 'মা' হবেন!'

—'কাজলামি করিস নে, আয়।' বলিয়া প্রকাশ কাকীমার সহিত দেখা করিতে চলিল।

প্রকাশ আশা দেবীকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাকে একে পুরাণো কথা সব বলিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, 'চল বাবা আমার সঙ্গে, তোমার কাকাবাবু তোমায় দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছেন। তাঁকে আবার এখুনি কমিশনারের বাড়ী যেতে হবে, তাই নিজে আসতে পারলেন না।'

প্রকাশকে লইয়া আশা দেবী বাড়ী ফিরিতেই কৈলাস আসিয়া হাসিমুখে তাহাদের আগাইয়া লইলেন।

কৈলাস বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য, তোমাকে ত আগেও দেখেছি, কিন্তু চিনতে পারি নি—তুমি যখন আমাদের যেখেছিলে তখন তোমার পাঁচ-ছ বছর বয়স, তুমি ও আমাদের চিনতে পারবেই না, কিন্তু আমাদের চিনতে পারা উচিত ছিল।' তারপর পুনরায় বলিলেন, 'শুনেছিলাম তুমি পাটনায় পড়ছ।'

প্রকাশ বলিল, 'পাটনায় পড়তে গিয়েছিলাম, কিন্তু মামা ছাড়লেন না, তিনি আবার আমায় এখানে নিয়ে এলেন বি-এস-সি পড়বার জন্য।'

—'তুমি কি জানতে না যে আমিই এখানে বদলি হয়ে এসেছি?'

—'আপনিই যে এসেছেন তা জানতাম না। আপনি কটকে এস-ডি-ও এই জানতাম।'

—'কটক থেকে আমি পুরুলিয়া যাই, সেখান থেকে এখানে এসেছি। যাক, তুমি ওঘরে গল্প করো, আমাকে একবার বেরুতে হবে। তুমি রোজ আসবে, লজ্জা করো না।' এই বলিয়া কৈলাস বাহির হইয়া গেলেন।

আশা দেবী প্রকাশকে ভিতরে লইয়া গিয়া শুভাকে ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু শুভা আসিল না দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া প্রকাশকে বলিলেন, 'যাও বাবা, ঐ ঘরে শুভা আছে, গল্প করোগে যাও; আমি ততক্ষণ জলখাবারের বন্দোবস্ত করিগে যাই।'

আশা দেবী সেখান হইতে চলিয়া যাইতেই প্রকাশ ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল শুভা একটি ফেতের চেয়ারে হেলান দিয়া একটি বই দিয়া মুখ আড়াল করিয়া বসিয়া আছে। শুভাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া প্রকাশ বলিল, 'এ কি! তুমি ও রকম করে বসে আছ? তোমাদের বাড়ী অতিথি এলাম, খুব অতিথি সৎকার করছ ত!'

শুভা বইটি সরাইয়া বলিল, 'অতিথি সৎকার না-ই ত করছেন।'

—'তা তো করছিলেন, কিন্তু তোমার ওপর তার সেবার ভারই ত তোমায় ডাকছিলেন; তুমি এলে না দেখে আমাকেই পাঠিয়ে দিলেন তোর করে অতিথি সৎকার আবার করে নেবার জন্য!'

তারপর, ও দিকে চা জলখাবার তৈয়ারি হইতে যেমন অনেক দেরি হইতে লাগিল তেমনই এদিকে দু'জনার লজ্জার বাঁধন কাটিয়া গিয়া নানারূপ গল্পে দুজনে মাতিয়া উঠিল।

শুভা একসময় জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, আপনি ত জানতেন আপনার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে একটি মেয়ের সঙ্গে, তবুও যে বড় আপনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়েছিলেন!'

প্রকাশ একটুও অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, 'ও কথাটা আমিও ত তোমায় জিজ্ঞাসা করতে পারি।'

—'না, পারেন না।'

—'কেন?'

—'তার কারণ, আমি আগেই আপনার পরিচয় পেয়ে সব বুঝতে পেরেছিলাম; তা না হলে আপনি কি মনে করেন আমি একা একা কখনও আপনার ছেলে যেতাম? আর আপনি ঝগড়ামাত্রই রুমালে প্রজাপতি ছুটিয়ে তুলবার জন্য রাজি হতাম?'

—'তুমি কি করে জানলে সে আমিই সেই—'

—'সে আমি অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছি। সে দিন আপনি প্রথম আমাদের স্কুলে গিয়ে গান শিখিয়ে এসেছিলেন সেইদিনই আমি আপনার সকল পরিচয় জানতে পেরেছিলাম।'

প্রকাশ একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল এবং পরে বলিল, 'এখন বুঝতে পারছি কেন তুমি প্রজাপতির ডানা গুটি জুড়ে দিয়েছিলে।' তাহার পর একটু থামিয়া সে আবার বলিল, 'কেন, আমি তোমার সঙ্গে অমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলাম শুনবে?'

—'কেন?'

—'বেতারে শুধু বেলাই বাজে না যা গান ও বক্তৃতাই শোনা যায় না, ঐ বেতারের গুণেই বোধ হয় আমার মনেও সাড়া পড়ে গিয়েছিল যাতে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তুমিই আমার আপনার জন এবং ঐ জন্যই আমি তোমার সঙ্গে ওরূপভাবে মিশতে পেরেছিলাম।'

প্রকাশের সাফাই শুনিয়া শুভা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই সময়েই আশা দেবী বাহির হইতে প্রকাশকে ডাকিলেন।

প্রকাশ চা জলখাবার খাইয়া কাকীমাকে আর একবার প্রণাম করিয়া এবং প্রহার আদিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া বাড়ী ফিরিল।

সেদিন রাত্রি তখন দশটা। ক্ষুদ্র নিজের ঘরে বিসয়া সাগ্রহে তাহার কোন প্রিয় বন্ধুকে পত্র লিখিতেছে। প্রকাশ নিজের ঘরে বসিয়া যাহা কখনও করে নাই তাহাই করিতেছে, অর্থাৎ—কবিতা লিখিতেছে, আর কৈলাসচন্দ্র তখন আভা দেবীকে কিছুদিন পূর্বে দুইয়ের দোকানের ঘটনার বিবরণ দিয়া বলিতেছিলেন, তোমার ছেলে আমার তোমাদের ছাড়িয়ে গেল, সে আগেই—

—'তোমার লজ্জা করে না, তুমি বাপ হয়ে ঐ কথা বলতে?' বলিয়াই আভা দেবী হাসিয়া ফেলিলেন।

কৈলাসচন্দ্র পত্নীর চইয়া বলিলেন, 'বাপ হয়ে ও কথা বলতে পেরে বুঝি? তবে থাক। তাহলে তোমার কথাই বলি—'

কার্য্য-কারণ তত্ত্ব

ডক্টর শ্রীসুরেশ দেব, ডি-এস্‌সি

প্রবন্ধ

অনেক দিন আগে (১২৮৩ সালে) অধুনা বিলুপ্ত বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় সেই সময়ের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার বাঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ" বিষয়ে একটি সুন্দর ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। প্রবন্ধটি তিনি আরম্ভ করেন এই ব'লে, "ক্ষুদ্রতম বিশ্বব্যাপারই কার্য্য-কারণসূত্রে গ্রথিত। অগ্নি দহিতেছে, নাসত ছিন্নোগে লতাপল্লব সঞ্চালিত হইতেছে ইত্যাদি যাহা কিছু জগন্মণ্ডলে ঘটিতেছে, সে সকলই কার্য্য-কারণের দৃষ্টান্তস্থল।" প্রবন্ধটি শেষ করবার সময় এই সিদ্ধান্তটির ওপর আরও জোর দিয়ে আবার বলেন, "সমুদয় বিশ্বব্যাপারই কার্য্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত অর্থাৎ জগন্মণ্ডলস্থিত প্রত্যেক ঘটনারই একটি একটি কারণ আছে।" কেন যে এই অদ্ভুত "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ" প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকবে সে সম্বন্ধে তিনি দুটি প্রমাণ উল্লেখ করেছিলেন। তাঁরই লেখা আবার উদ্ধৃত ক'রে বলি—"ইহার প্রথম প্রমাণ এই যে, অনুসন্ধান দ্বারা অদ্যাপি কোথায়ও কার্য্য কারণ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় নাই।··· কোনও পরিজ্ঞাত স্থলেই বিনা কারণে কোন একটি ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় নাই। এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, কারণ বিনা কোন ঘটনা ঘটিতে পারে ইহা আমরা ভাবিতেও পারি না।"

মানুষ জগৎসত্তার পরিচয় পায় মন দিয়ে—তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। যে রাজা তার মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যের সমস্তই ছেড়ে দেয় সে যেমন রাজ্যের সত্যকার সংবাদ পায় না, মন্ত্রীরা যা দেখায় তাই সে দেখে, আমাদেরও ঠিক তেমনি জগতের পরিচয়ের জন্যে যখন সম্পূর্ণভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে তখন তার সত্যকার পরিচয় সে পায় না। যা পায় তা তার ইন্দ্রিয় দ্বারা রঞ্জিত এমন একটা কিছু যার মূল আর যেখানেই থাক, বাইরের জগতে নেই। আমাদের সমস্ত অনুসন্ধান সমস্ত অভিজ্ঞতার অন্তরালে এই ব্যাপারটি আত্মগোপন ক'রে থেকে জগতের যে রূপ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষীভূত করে তার মধ্যে থেকে objectivity-কে প্রায় পরিপূর্ণ ভাবেই দূরে রেখে দেয়। এইদিক দিয়ে বিচার করলে এই বলতে হয় যে, আমাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতা আমাদের নিজেদের দিয়েই অসম্ভব রকম সীমাবদ্ধ। এই রকম নিজেরই গণ্ডী দিয়ে সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর ক'রে বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে সর্ব্বগ্রাহী সিদ্ধান্ত গঠন খুব যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয় না। তাছাড়া, আমরা যা ভাবতেও পারি না এমন জিনিষের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয় এই কথাটি স্বীকার ক'রে নেওয়া অন্ততঃ বিজ্ঞানের আজকালকার দিনে আর সম্ভব নয়। আপেক্ষিক তত্ত্বের চতুর্থ মান (fourth dimension) আমাদের ভাবনার মধ্যে আসে না কিন্তু একে অস্বীকার করার দুঃসাহস এখনকার দিনে কোনো বিজ্ঞানবিদের আছে কি-না সন্দেহ। অতএব যে দুটি প্রধান যুক্তির ওপর "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ" স্থাপিত—শেষ পর্য্যন্ত বিচারের ভার কাঁধে নেবার সময় সে দুটি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বসে।

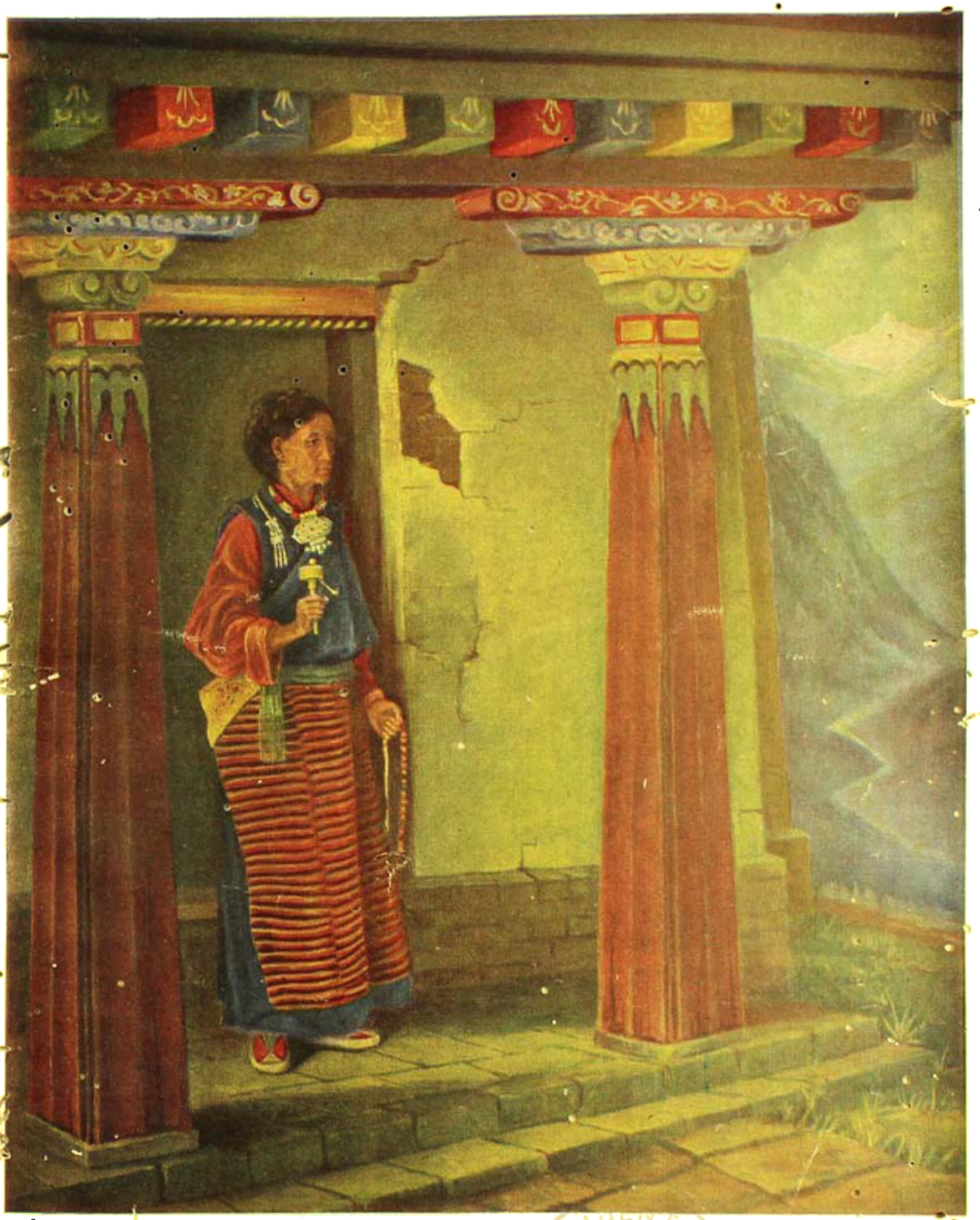

কিন্তু একথা মানতেই হয় যে, যুক্তি দিয়ে কোনও সুবিধা না করতে পারলেও "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ" আমাদের সমস্ত বুদ্ধিসত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দার্শনিকতা বাদ দিলেও আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব প্রতি পদক্ষেপে দেখতে পাওয়া যায়। এর প্রভাব কত ব্যাপক তা তখনই আমরা ধরতে পারি যখন দেখি যে আমাদের পাগলামীর মধ্যেও একে এড়িয়ে চলতে পারি না। মাঝ পথে বিপদে পড়লে ভাবতে বসি, যাত্রা করবার সময় হাঁচি পড়েছিল কি-না; শূন্য কলসী দরজায় রাখা ছিল কি-না ইত্যাদি। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা আবার এ জন্মের প্রত্যেক কাজ নানা জন্মের নানা কারণ দিয়ে গঠিত - এতদূর পর্য্যন্ত বলে থাকেন। ফলিত জ্যোতিষের যাঁরা চর্চ্চা করেন তাঁরা আরও চমৎকারভাবে এই "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ"টিকে স্বীকার করেন। গ্রহনক্ষত্রের স্থিতি আর চলাফেরা-রূপ কারণ মানুষের প্রত্যেক কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে এই তাঁদের বিশ্বাস। অতএব এই সিদ্ধান্তটি আমাদের জীবনের মধ্যে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে, আমাদের সমস্ত দার্শনিকতার মধ্যে যত নিবিড়ভাবে এক হয়ে আছে এমন বোধ হয় আর কিছুতেই নয়। তাই যখন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখলেন যে, ইহা ছাড়া আর কিছু যে হ'তে পারে তা আমরা ভাবতেও পারি না, তখন তিনি একটি খুবই সত্য কথা বলেছিলেন। যে সত্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, যা আপনা আপনিই চিরকাল সত্য, তাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে বলা হয়। জার্ম্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট এই কারণে "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ"কে "স্বতঃসিদ্ধ সত্যে"র পর্য্যায়ে ফেলে বলেছিলেন, ইয়ুক্লিডের জ্যামিতির axiomগুলি যেমন স্বতঃসিদ্ধ সত্য "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ"ও তেমনি একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নূতন নূতন গবেষণার নূতন আলোতে অতিকায় প্রাচীন স্বতঃসিদ্ধরা নিজের স্বরূপ মূর্ত্তি উদ্ঘাটিত করতে বাধ্য হয়েছে। ইয়ুক্লিডের জ্যামিতির অটুট axiomগুলিও আজকাল আর সে রকম অটুট স্বতঃসিদ্ধ বলে পরিগণিত হয় না। অতএব নব-বিজ্ঞানের নির্ভীক দৃষ্টির সামনে "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে"র মূল কতদূর তা হয়ত নতুনভাবে ধরা পড়তে পারে। এইখানে একথা জানিয়ে রাখা যেতে পারে যে, বর্ত্তমানে খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিকেদের বেশীর ভাগই এই "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ"কে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। আণবিক জগতে তাঁরা খুব স্পষ্টভাবে এর ব্যতিক্রম দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু যাঁরা এর স্বপক্ষে এখনও ওকালতি করেন তাঁরা বলেন যে, মানুষের সমস্ত যৌক্তিকতার মূলে রয়েছে খুব সূক্ষ্মভাবে এই "কার্য্য-কারণ তত্ত্ব"। একে বাদ দিলে পরে মানুষের দার্শনিকতার ক্ষেত্রে প্রলয় দেখা দিবে। অপর পক্ষীয়েরা তাতে একটুও বিচলিত হন না। তাঁরা বলেন যে, সম্পূর্ণ অনিয়ম বা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থেকেই সমস্ত কার্য্যকরী নিয়ম গড়ে উঠতে পারে। কার্য্য-কারণ তত্ত্ব এননিতরই একটা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে দেশকাল অনুসারে সীমাবদ্ধ নিয়ম। ইচ্ছা হ'লে একে স্বীকার করতে পারা যায়, অস্বীকার করলেও কিছু যায় আসে না।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা এইরকম একটা অতিসাহসের দুঃসাহসের কথা প্রচার করেন কি সাহসের ওপর নির্ভর করে—তা বুঝতে হ'লে প্রথমে কার্য্য-কারণ তত্ত্বটিকে আরও একটু পরিষ্কার করে বুঝা দরকার। দুটি ঘটনা সংঘটিত হ'তে দেখতে পাওয়া গেল। এই ঘটনা দুটি যুগপৎ নয়—একটি অপরটির পরবর্ত্তীকালে সংঘটিত। এই ঘটনা-দুটি কার্য্য-কারণসূত্রে আবদ্ধ হ'তে হ'লে এই দুটি পরস্পরে কোনও রকম নিয়মে শৃঙ্খলিত থাকতে হবে। এইরকম নিয়ম দ্বারা শৃঙ্খলিত একটি অপরটির ঠিক পরবর্ত্তীকালে সংঘটিত এমন দুটি ঘটনার প্রথমটিকে বলা হয় কারণ, আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় তার কার্য্য।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন দুটি খুব স্পষ্টভাবে মনে জাগে। তার প্রথমটি এই হ'ল যে, যে নিয়ম এই দুটি ঘটনাকে এক ক'রে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখছে তার বাস্তবিক স্বরূপ কি? নিয়মটি যে কি তা ঠিকভাবে জানা না থাকলে ঘটনা দুটি বাস্তবিক "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে" আবদ্ধ কি-না তা বলা চলে না। একটি উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হ'তে পারে। রাতের পর দিন, আর দিনের পরে রাত--পৃথিবী যে ক্ষণ থেকে নিজের অক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে, সে ক্ষণ থেকেই হ'য়ে আসছে। অতএব আপাতদৃষ্টিতে এই রাত আর দিন হওয়ার মধ্যে একটা নিয়ম বর্ত্তমান। শুধু এইটুকু তথ্য নিয়েই যদি, ধরা যাক, রাতকেই দিন হবার কারণ বলে ঠিক করি তবে তা যুক্তি হিসাবে ঠিক হ'লেও বাস্তবিক পক্ষে ঠিক হবে না। কিন্তু রাতের পরে দিন যে নিয়মে হয় সেটিকে জানতে পারলে আর রাতকে দিনের

কারণ বলবার অবকাশ থাকে না। তাই কারণ আর তার কার্য্য যে নিয়মে শৃঙ্খলিত তার সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই নিয়মটি যে কি তা না জানতে পারা যাচ্ছে ততক্ষণ পূর্ব্বাপর ঘটনা দুটির প্রথমটি পরেরটির কারণ এই কথা জোর ক'রে বলা চলে না। তার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, পরবর্ত্তী কালের ঘটনা যে পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ঘটনা থেকেই উদ্ভূত সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ রকম প্রমাণ আছে কি? এইখানে সেই চিরকালের উদাহরণ—গাছ আর তার বীজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক শ্রেণীর দার্শনিকের মত এই যে, সম্পূর্ণ গাছটাই সুপ্ত আকারে ওই বীজটার মধ্যে বর্ত্তমান না থাকলে পরবর্ত্তী কালে ওই গাছটা ওই আকার পেতে পারত না। এই কথা বলা তখনই সম্ভব—যখন ওই গাছটা নিজের পরিপূর্ণ আকার পেয়েছে। কিন্তু বীজ অবস্থায় এই বীজটা দেখে পরবর্ত্তী কালে এর কি আকার হ'বে তা ভবিষ্যদ্বাণী করবার সাহস কোনও উদ্ভিদবিদের আছে কি-না জানি না। অতএব গাছ আর বীজের উদাহরণটা স্বীকার করলে আমরা কার্য্য থেকে কারণ উদ্ধার করি, কারণ থেকে কার্য্যকে পাই না।

সে যাহোক, কার্য্য-কারণ তত্ত্বের শেষ পর্য্যন্ত যে চেহারা আমরা দেখলাম তা থেকে একটা জিনিষ আমরা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারি। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ যদি সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপারের মূলে থাকে তবে কোনও একটা ঘটনা সম্পূর্ণভাবে জানা থাকলে তার পরবর্ত্তীকালের ঘটনা আমরা তা থেকে নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। মাল্লারা নদীতে নৌকো নিয়ে যাচ্ছে। নদীর স্রোতের বেগ আমরা জানি, মাঝিমাল্লার দাঁড় টানবার জোর কতখানি তা হিসাব করতে পারি, আর ধরা যাক বাতাস কেমনভাবে ওই নৌকোটার ওপর ক্রিয়া করছে তাও আমাদের অজানা নয়। এইগুলো স্পষ্ট ক'রে জানা থাকলে আর পাঁচ ঘণ্টা পরে নৌকা আমাদের ঘাটে লাগবে তা আমরা সকলেই অনুমান করে নিই। আর বস্তুতঃ সে অনুমান ঠিকও হয়। অতএব ভবিষ্যদ্বাণী করা যে সম্ভব একথা আমাদের একটা খুবই সাধারণ ধারণা। পঞ্জিকাতে এক বছরেরও আগে থেকে গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থান অঙ্ক কষে ভবিষ্যদ্বাণী করা হ'য়ে থাকে, আর তার ব্যতিক্রমও হ'তে দেখা যায় না। যেদিন চন্দ্রগ্রহণ হ'বে বলে লেখা থাকে ঠিক সেই দিনেই তা হয়, এমন কি, ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডও মিলে যায়।

বৈজ্ঞানিকেরা যে ধরণের বিচার করেন তা সাধারণ মানুষের বিচার থেকে একটু স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষ ব্যবহারিক মানুষ। তার কাজ চলবার মত মিল পেলেই সে সন্তুষ্ট হয়—খুব নির্ভুলভাবে, একেবারে খুঁটিয়ে মিলল কি-না—সে সংবাদে তার কোনই প্রয়োজন নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ঠিক তার উল্টো। সে দেখতে চায় একেবারে পুরোপুরি ঠিক হ'ল কি-না। অঙ্ক কষে সে যা বার করল, তার সঙ্গে সত্য যা ঘটবে তা একেবারে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে কি-না এই কথা সে স্পষ্ট ক'রে জানতে চায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সে দেখতে পায় যে, তার অঙ্ক তাকে প্রায় ঠিক উত্তর—সম্পূর্ণ নির্ভুল উত্তর দেয় না। যত দিন সে বিশ্বাস করত যে এই দুটো ব্যাপার অর্থাৎ তার অঙ্ক-ক'ষে-বার-করা ভবিষ্যদ্বাণী—আর সত্য যা ঘটেছে তা একেবারে পুরোপুরি মিলে যাবেই—তত দিন সে খুঁজে বেড়ায় কোথায় কোথায় সে ভুল ক'রেছে আর কি পরিমাণ ভুল সে করতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত সে সম্ভব আর অসম্ভব সব রকম ভুল ভেবে চিন্তে জেনে নিল, তখনও তার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ নির্ভুল হয় না। বৈজ্ঞানিক তখন বিপদে পড়লেন। তাঁর সামনে এখন দুটি সমস্যা—স্বীকার করা যে, নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবই নয়, কিম্বা তার সব রকম ভুল জেনে নেওয়া এখনও হয় নি। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা দ্বিতীয়টাকে সত্য বলে স্বীকার করেন না—তাঁরা প্রথমটার ওপরেই বেশী বিশ্বাস রাখেন।

বিভিন্ন মতের বৈজ্ঞানিকেরা যাই নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস করুন না কেন আজকাল তাঁরা সকলেই এই তথ্যটি (fact), সে যত সামান্য ব্যাপারই হোক না কেন আর যত সূক্ষ্ম যন্ত্রই তার জন্যে ব্যবহার করা হোক না কেন—আগে থাকতে তাঁদের পরীক্ষার ফল তাঁরা সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে বার করতে পারেন না। যে ফল তাঁরা পূর্ব্ব থেকে অঙ্ক কষে পান তাঁর মধ্যে সর্ব্বদাই কোথাও না কোথাও একটু অনিশ্চয়তা থাকেই। উদাহরণস্বরূপ এখানে ইলেক্ট্রনকে নেওয়া যেতে পারে। ইলেক্ট্রন হ'ল আমাদের জানা জিনিষের মধ্যে বোধ হয় লঘুতম কণা, অতএব ধরা যাক সামান্যতম পদার্থ। মনে

করা যাক্ এই ইলেক্ট্রনটা অবাধভাবে, কারুর সঙ্গে ধাক্কা না খেয়ে বিচরণ করতে পারে। আর ধরা যাক্, এই মুহূর্ত্তে এই ইলেক্ট্রনটা সম্বন্ধে যা-কিছু জানবার আছে সবই আমরা জেনে নিলাম। এইবার দেখা যাক্, এক সেকেণ্ড পরে এটা কি অবস্থাতে পৌঁছুবে তা আমরা কতখানিটা গুণে বলতে পারি। সব দিক দিয়ে আমরা যদি সম্পূর্ণ সুবিধা পাই তবে এক সেকেণ্ড পরে ইলেক্ট্রনটা যেখানে বাস্তবিক পৌঁছুবে তার দেড় ইঞ্চিপরিমাণের মধ্যে আমরা তার অবস্থিতি গুণে বার করতে পারি—এ থেকে বেশী নির্ভুলভাবে বলা আমাদের সাধ্যের অতীত। ভুলটা অবশ্য খুবই সামান্য, কারণ ওই এক সেকেণ্ডে ও ইলেক্ট্রনটা প্রায় ১৮,০০০ হাজার মাইল চলে গিয়েছে। কিন্তু যত সামান্যই হোক, ভুল ভুলই। আবার এক অবস্থায় যে ভুল অতি সামান্য হয় অন্য অবস্থায় তাই মারাত্মক হয়ে ওঠে। ধরা যাক ওই ইলেক্ট্রনটা দিয়ে আমরা একটা কোন পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত কণাকে ধাক্কা লাগাতে চাই। এই ক্ষেত্রে ওই দেড় ইঞ্চির অনিশ্চয়তা অতিশয় বিরাট ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান ইহুদী বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স বহ্ন এই জিনিষটাকে বোঝাতে গিয়ে একটা অতি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। উইলিয়াম টেল্‌কে তাঁর ছেলের মাথায় একটা আপেল রেখে দূর থেকে তীর মেরে সে আপেলটাকে বিদ্ধ করবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। টেল্-এর তীরন্দাজ হিসাবে দক্ষতা তাঁকে নিজের পুত্রহন্তা হ'তে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আপেলের পরিবর্ত্তে সেখানে যদি একটা পরমাণু থাকত আর তীরের পরিবর্ত্তে একটা আল্‌ফা কণা ছুঁড়ে দিয়ে সেই পরমাণুকে বিদ্ধ করতে দেওয়া হত, আর তাঁর ধনুকের পরিবর্ত্তে আজকালকার দিনের সব থেকে ভাল পরীক্ষকদের সর্ব্বোত্তম যন্ত্র তাঁকে ব্যবহার করতে দেওয়া হ'ত, আর সে যন্ত্র ব্যবহার করতে তিনি তীর ধনুক চালাবার মতই দক্ষ হতেন তবুও তাঁর দক্ষতা কোন কাজেই লাগত না। পরমাণুটাকে বিদ্ধ করা বা না-করা তখন একেবারে তার সক্ষতার বাইরে চলে যেত, কারণ তখন তা নির্ভর করত সম্পূর্ণভাবে আকস্মিকতার ওপর।

নৌকো থেকে আরম্ভ ক'রে যে উদাহরণগুলি দিয়ে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী করবার অক্ষমতা সিদ্ধ করছিলাম তাতে কেবলমাত্র জগতের এক শ্রেণীর ব্যাপারই অর্থাৎ mechanical world-এর বিষয়েই বলা হ'ল। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের এই অক্ষমতা বিদ্যমান। বায়ুর চাপ গণনায়, রেডিও য়্যাক্‌টিভিটিতে, আলোক বিজ্ঞানে, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আমরা শেষ পর্য্যন্ত সঠিকভাবে কোন কথা পূর্ব্ব থেকে জানতে পারি না। আমাদের জানার মধ্যে সর্ব্বদাই কিছু না-কিছু অনিশ্চয়তা জড়িয়ে থাকবেই। অতএব যে ভিত্তির ওপর স্থাপন ক'রে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধকে আমরা স্বীকার করতে চাইছিলাম সে ভিত্তি শেষ পর্য্যন্ত কঠিন হ'য়ে রইল না। নতুন নতুন তথ্যের প্রবল চাপে তা অবশেষে তলিয়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

তবে কি জগৎ সংসারে কোন কাজ কোন কারণের অপেক্ষা রাখে না? কথাটাকে মন সহসা স্বীকার করতে চায় না, বহু শতাব্দীর সংস্কার তাকে বাধা দেয়। একথা স্বীকার করবার স্পষ্ট কোন যুক্তি তার নেই—তবু সে একে মেনে নিতে সাহস পায় না। মনের দিক দিয়ে এমন কঠিন বাধা সত্ত্বেও অগ্রগামী বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে ভূতকালের ওপর নির্ভর করে না। খানিকটা অবশ্য সে করে, তাই ভূতকালের সঙ্গে কতকটা সম্পর্ক তার আছে। খানিকটা সম্পর্ক আছে বলেই আমরা কতকটা ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারি, কিন্তু বাকিটা একেবারে অনিশ্চিত থাকে। এই বৈজ্ঞানিকদের কাছে বাহ্য জগৎ প্রকাশ পায় এক অভিনব রূপ নিয়ে। বর্ত্তমান রচনায় তা প্রধান বিষয় নয় বলে এর শুধু উল্লেখ মাত্রই আমরা আপাততঃ করে রাখলাম। আমাদের প্রধান বক্তব্য কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, তাই যাঁরা এখনও তাকে জগতের মূলে বর্ত্তমান বলে স্বীকার করে থাকেন তাঁদের যুক্তিপ্রণালী কি তাই আমরা অনুসরণ করব।

আমরা এই নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম যে, কার্য্য-কারণ তত্ত্ব দিয়ে প্রত্যেক ঘটনা বা কাজ নিয়ন্ত্রিত হ'তে হ'লে তা থেকে এই একটি স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হয় যে, কাজ বা ঘটনাগুলিকে পূর্ব্ব থেকেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যেতে পারে। কিন্তু এই নিয়ে বিচার ক'রে এই পাওয়া গেল যে, কাজ বা ঘটনাকে নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভব নয়। কার্য্য-কারণ তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা বললেন যে, আমরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে যাচ্ছি ঘটনা বা event-কে—যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপ-জোক ক'রে যাকে পাওয়া যায় তাকে নয়। মাপ-

জোক করা ব্যাপার আমাদের ইন্দ্রিয়গত ব্যাপার, তাই তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু এই event-এর মধ্যে সে অসম্পূর্ণতা এসে লাগে না। এই জন্যেই ঘটনা বা event পূর্ব্ব থেকেই জানবার সীমার মধ্যে এসে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ ছাওড়া আর কলকাতার মধ্যে গঙ্গার ওপরের যে সেতু আছে তাকে নেওয়া যেতে পারে। এই সেতুটা কতটা লম্বা তার একটা স্পষ্ট পরিষ্কার ধারণা আমাদের সকলেরই মনে বর্ত্তমান। মনের এই ধারণা আমরা ঠিক কত গজ কত ফুট ইত্যাদি দিয়ে না বলতে পারলেও ধারণার মধ্যে এর যা দৈর্ঘ্য বর্ত্তমান তাতে এতটুকুও কোনও অনিশ্চয়তা নেই। এই অনিশ্চয়তা এসে পড়ে যখন তাকে হাতে কলমে (actually) মাপ-জোক করে দেখতে যাই। জগতের সবকিছুকেই এই ভাবে দু দিক দিয়ে দেখলে তার দুটো রূপ পাওয়া যায়। একটা রূপ যা আমাদের মনোগত বা ধারণাগত জগতের জিনিষ, যা আমরা একেবারে সমগ্রভাবে আমাদের মধ্যে পাই; আর অন্য একটা যা আমরা মাপজোক করে টুকরো টুকরো একত্র করে তৈরী করে নিই। প্রথমটার মধ্যে কোনও রকম সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা নেই, অনিশ্চয়তা থাকে সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয়টার মধ্যে। তাই মাপজোক করে দেখতে গেলে কোনও জিনিষ পূর্ব্ব থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভাবনার বাইরে চলে যায়। অতএব তাঁরা বলেন যে, বৈজ্ঞানিকেরা শুধু মাপজোকের জগৎ নিয়েই কারবার করেন, তাই তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল হয় না।

আমরা এই জগতে মাপজোক করি কেবলমাত্র চারিটা জিনিষের—দৈর্ঘ্য, সময়, ভার (mass) আর বৈদ্যুতিক শক্তি বা চার্জ্জ (charge)। এই চারটি জিনিষ ছাড়া আর কিছু আমাদের মাপজোক করতে হয় না। আগে যা বলা হয়েছে সে অনুসারে এই চার রকম মাপজোকের মধ্যে সর্ব্বদাই দুটো অর্থ বর্ত্তমান থাকে। একটা, মাপজোক করার অতিরিক্ত আমাদের মনে সর্ব্ব সময়ের জন্যে এদের সম্বন্ধে যে অর্থ থাকে তা, আর অন্যটা মাপজোক করে যে অর্থ আমাদের হস্তগত হয় তা। প্রথমটা একেবারে নিশ্চিত, তাতে কোথাও সন্দেহের অবকাশ নেই; অপর পক্ষে দ্বিতীয়টা কখনও একেবারে নিশ্চিতভাবে আমরা জানতে পারি না, তার মধ্যে মূলগতভাবে একটা অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। কার্য্য-কারণ তত্ত্বের উদ্ভোক্তারা বলেন যে, জগতের বাস্তবিক রূপ নিহিত থাকে প্রথমটারই মধ্যে, মাপজোক করে যা পাওয়া যায় সেটা সত্যকারের রূপ নয়। জগতের সত্যকারের রূপে মাপজোক করে পাওয়া রূপের এই অনিশ্চয়তা নেই, তাই সেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে, আর তাই তার মূলে কার্য্য-কারণ রয়েছে এই কথাও স্বীকার করতে হয়।

তাঁরা বলেন যে, আমাদের সর্ব্বদাই যুগপৎ দুটো জগতের মধ্যে বিচরণ করে বেড়াতে হয়। একটা আমাদের বোধগত বা দৃশ্যমান জগৎ। আর একটা কার্য্যকরী জগৎ বা world of measurement. এই দুটো সব সময়ই পাশাপাশি চলেছে, আর মানুষের চেষ্টা এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করা। মানুষ এই দুটোর মধ্যে কতকটা সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় তাই তার মাপজোকগত জগৎ বা world of measurement-এর মধ্যেও সে কতকটা কার্য্য-কারণ দেখতে পায়। এই সম্পর্ক সৃষ্টি তার যত সর্ব্বাঙ্গীন হয় তার মাপজোকগত জগতেও কার্য্য-কারণের প্রভাব সে ততটা সর্ব্বাঙ্গনী দেখতে পায়, আর এই সম্পর্কের পূর্ণতম বা চরম অবস্থায় তার বোধের জগৎ আর মাপজোকগত জগৎ এক হ'য়ে মিলে যায়। এই অবস্থায় তার কোথাও কিছু সামান্যতমও ভ্রান্তি হবার সম্ভাবনা নেই—পৃথিবীর প্রথম উষার আলো দেখে সে শেষ সন্ধ্যার বর্ণনা করতে পারে।

তাই কার্য্য-কারণতত্ত্ববাদীদের মতে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়; তার কারণ, জগতের মূলে কার্য্য-কারণ তত্ত্ব নেই তা নয়, তার কারণ এই যে, তার বোধগত জগৎ আর পরিমাণগত জগতের পরস্পরের সম্পর্কের চাবিকাঠিটি এখনও সে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করতে পারেনি। গতযুগের বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা ক্রমে ক্রমে এই চাবিকাঠিটি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করবার পথে চলেছেন; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের নবীনেরা বলেন, গত যুগের বৈজ্ঞানিকদের তা ছিল দুরাশা মাত্র, মানুষের কখনও সে চাবির সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেমন ক'রে নেই সে সম্বন্ধে তাঁদের যুক্তি এই,—

জার্ম্মান পদার্থবিদ্ মাক্স প্লাঙ্ক আবিষ্কার করলেন আলোর কোয়ান্টাম্ (Light quantum) অর্থাৎ রূপাকে, আর তা থেকে গড়ে উঠল কোয়ান্টাম থিয়োরী বলে বর্ত্তমান

পদার্থবিজ্ঞানের আদপখানারও ওপর এত বড় একটা মীমাংসা। নানারকম সূক্ষ্ম ও স্থূল পরীক্ষা আর প্রয়োগের ভিতর দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে, আলোর শক্তি একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হবার সময় অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মত হ'য়ে যায় না, বরং কণার ঝাঁক হয়ে এগিয়ে চলে। আলো যেখানে অতিশয় তীব্র সেখানে এই কণার ঝাঁক খুব ঘনহয়—আর এই অবস্থায় তাকে আমরা অবিচ্ছিন্ন স্রোতের আকারে চলে যেতে দেখতে পাই। আলো যেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেখান থেকে অনেক দূরে এসে পড়লে স্বভাবতই এই স্রোতের অবিচ্ছিন্ন ভাব কমে আসে আর আলোর কণাগুলো তখন অত কাছাকাছি থাকে না। কাজে-কাজেই আলোর তীব্রতা কম হবার সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তি (energy) আপনা আপনিই কম হ'য়ে যায়। কিন্তু দেখা গিয়েছে শেষ পর্য্যন্ত আলোর তীব্রতার সঙ্গে তার শক্তির কম হওয়ার এই সম্পর্কটি আর থাকে না। আলো যতই ক্ষীণ হোক না কেন তার শক্তি একটা নিম্নতম মানের নীচে আর যায় না। তখন আলো ক্ষীণতর হতে হলে তার শক্তি কম হ'য়ে হয় না, যেখানে সেকেণ্ডে চারিটা আলো আসত সেখানে দুটা বা একটা হ'য়ে গিয়ে এই ভাবে ক্ষীণ হয়। আলোর এই রকম ব্যবহার কার্য্য-কারণ তত্ত্বকে যে ধাক্কা দিয়েছে তা থেকে সে এখনও উদ্ধার পায় নি। কোথায় যে তার বিপদ্ তা নীচে বলছি।—

চক্‌চকে পালিশ করা জায়গায় আলো পড়লে তা থেকে, খানিকটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, আর খানিকটা ভেতরে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। ধরা যাক, তিন ভাগ প্রতিফলিত হচ্ছে আর এক ভাগ অন্যদিক ভেদ ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে। আলো যতই তীব্র বা যতই ক্ষীণ হোক না কেন, এই ব্যাপারের কোনও ব্যতিক্রম হয় না—যেখানে তিন-ভাগ প্রতিফলিত হবার কথা, ক্ষীণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তা কমে গিয়ে দুই ভাগ হয়ে যায় না—ঠিক তিনই থাকে। যখন অনেকগুলো, ধরা যাক, ১০০টা আলোর কণা এসে পালিশ করা জায়গায় লাগল তখন হিসেব মত ৭৫টা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল আর ২৫টা অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। এই অবস্থায় অবশ্য কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু ওই ১০০টা কমতে কমতে যখন একটায় দাঁড়ায় তখনই বাস্তবিক বিপদ উপস্থিত হয়। সোজা হ'ত যদি বলা যেত যে একটা কণা চার টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়ে তিন টুকরো প্রতিফলিত হবে আর এক টুকরো বেরিয়ে যাবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, আলোর কণা এইভাবে টুকরা হতে পারে না। তাই, কাজে কাজেই, তা সম্ভব নয়। অতএব এই একটা আলোর কণাকে হয় সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হ'তে হবে, নয় সম্পূর্ণই ভেদ করে যেতে হবে। এই কণাটা এখন কি করবে তা গণনা ক'রে আগের থেকে জানতে পারা মানুষের সাধ্যের বাইরে। মানুষ কোনও দিনই পূর্ব্ব থেকে বলতে পারবে না যে, অমুক কণাটা প্রতিফলিত হবেই বা অমুক কণাটা জিনিসটাকে ভেদ ক'রে যাবে। যখন একশটা আলোর কণা ছিল তখনও তাদের মধ্যে যে-কোনও একটা কণা নিয়ে বিচার করতে গেলে ঠিক এই রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়. তখন ৭৫টা প্রতিফলিত হবেই একথা অতি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারলেও কোন্ ৭৫টা তা হবে একথা একেবারে নির্ভুল ক'রে বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মানুষের সমস্ত জ্ঞানার মূলে এই অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তা সর্ব্বদাই রয়েছে। এ অনিশ্চয়তা তার মাপজোকের, অনিশ্চয়তা বড় নয় তাই কোনও দিনই তার ভবিষ্যদ্‌বাণী একেবারে নির্ভুল হবে না।

আলো ছাড়া যেখানে প্রকৃতি জড়রূপে প্রতিভাসিত, সেখানেও ঠিক এই রকম অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। পূর্ব্বে ইলেক্‌ট্রনের কথা একবার বলেছি। এই ইলেক্‌ট্রনই হ'ল এখনও পর্য্যন্ত জড়প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম প্রকাশ, কারণ এখনও এর থেকে ক্ষুদ্রতর কোনও জিনিষের অস্তিত্ব মানুষ জানতে পারে নি। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন যে, ইলেক্‌ট্রনও অবিকল ঐ photon বা আলোর কণার মতই আচরণ করে। এই ইলেক্‌ট্রন তার চলবার অবস্থায় যদি কোনও জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন তা হয় ফিরে আসে, নয় সে তাকে ভেদ করে চলে যায়। কিন্তু এটা ভেদ করে যাবে—না ফিরে আসবে তা পূর্ব্ব থেকে গণনা ক'রে জানতে কেউ সমর্থ হয় নি। সমর্থ হয়নি তাদের নিজেদের দোষে নয়। কারণ তা সম্ভব নয় বলেই। এখানেও তার ভবিষ্যদ্‌বাণী করার সাধ্য নেই। অতএব তত্ত্বের দিক দিয়েও মানুষ তার বোধের জগৎ আর তার অনুভবগত জগৎ (world of measurement and world of experience)-কে কোনও দিন মিশিয়ে দিতে

পারবে না, এই দুটি জগতই তার কাছে চিরকাল পৃথক হয়েই থাকবে।

মানুষের জ্ঞানের পথ যে কি পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ এই ইলেক্ট্রনই আবার একটা নতুন দিক দিয়ে তা মানুষকে দেখিয়েছে। প্রত্যেক জিনিষের দুটো দিক আছে, অর্থাৎ দু দিক দিয়ে আমরা প্রত্যেক জিনিষকে দেখে থাকি বা বিচার ক'রে থাকি। একটা হ'ল সে কোথায় আছে, আর দ্বিতীয়টা হ'ল সে কিভাবে আছে। প্রথমটাকে বলা যেতে পারে তার অবস্থান (position), আর দ্বিতীয়টাকে বলা যেতে পারে তার গতি (velocity)। কোথায় আর কিভাবে আছে এই জানতে পারলে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন কোনও ক্ষেত্রে যুগপৎ কোনও জিনিষের অবস্থান আর গতি জানতে পারা মানুষের সাধ্যাতীত। একটা ইলেক্ট্রনকে নিয়ে এই কথাটাকে স্পষ্ট করা যাক্। ইলেক্ট্রনটা কোথায় আছে তা জানতে হ'লে তাকে আমাদের দেখা দরকার। দেখতে হ'লে আলোর প্রয়োজন, আলো ফেলে তাকে আলোকিত না করলে তা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। আলোর রশ্মি ইলেক্ট্রনের ওপর পড়লে তাই গতিকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করে দেয় যে, তা আর ধরতে পারা যায় না। অর্থাৎ ইলেক্ট্রনটার অবস্থিতি (position) জানতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার গতি অজানিত থেকে যায়।

ইলেক্ট্রনের এই রকম ব্যবহার থেকে একটা অত্যন্ত গুরুতর সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিকেরা টেনে বার করেছেন। কোনও জিনিষকে ভাল ক'রে জানতে গেলে জানবার প্রক্রিয়া সেই জানার মধ্যে বিক্ষোভ এনে দেয়। যা আমরা মাপজোক ক'রে জানতে পাই তার মধ্যে মাপজোক করার প্রক্রিয়া নিজে আত্মগোপন ক'রে থাকে, আর যাকে জানতে যাচ্ছি সে গোপন রয়ে যায়। স্যর জেম্‌স্ জীন্স একটা চমৎকার কথা এ সম্বন্ধে বলেছেন। তিনি বলেন যে, Nature is something which is destroyed by observation. অর্থাৎ স্পষ্টভাবে নির্ভুলভাবে প্রকৃতিকে জানতে গেলেই সে নষ্ট হ'য়ে যায়। এ ঠিক যেন মরুভূমিকে উড়োজাহাজে চড়ে দেখবার মত। দূর ওপর থেকে বেশ দেখা যায়, কিন্তু কাছে এসে আরো ভালো ক'রে দেখতে গেলে নিজেরই যন্ত্রের তাড়নায় এত ধূলো ওড়ে যে, প্রকৃতি একেবারে গোপন হয়ে পড়ে, তাকে আর দেখা চলে না। অতএব কোনও জিনিষকে ভাল করে দেখতে গেলেই তার সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে তাকে জানতে গেলেই তার মধ্যে আমরা নানা রকম উৎপাত এনে ফেলি, এর পর যাকে পাই আর যাকে জানতে গিয়েছি এ দুটোর একটুও মিল থাকে না। অর্থাৎ আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা (experience) নির্ভর করে যে যন্ত্র দিয়ে সে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা হয়েছে তার ওপর। অর্থাৎ আমরা আমাদের কাজকেই ফিরে পাই—প্রকৃতি চিরকাল অজানিতই থেকে যায়।

অতএব মাপজোক করে measurement-এর মধ্য দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎকে জানা ত দূরের কথা বর্ত্তমানকেও সম্পূর্ণ-ভাবে আমরা জানতে পারি না। এই সব নূতন আর অচিন্তিত-পূর্ব্ব তথ্যের সামনে a priori বা a posteriori কোনও রকম যুক্তি দিয়েই কার্য্য-কারণ তত্ত্বকে মেনে নেওয়া চলে না। কার্য্য-কারণ তত্ত্ব, পূর্ব্বে বলেছি, কঠিন আর নিশ্চিত নিয়ম দিয়ে শৃঙ্খলিত। এই জন্যেই এর আর এক নাম determiniom বা নিশ্চয়তাবাদ। আজকালকার নতুন বৈজ্ঞানিকেরা একে স্বীকার করেন না। তাঁরা এর পরিবর্ত্তে ঠিক এর বিপরীত এক তত্ত্বকে স্বীকার করেন আর তার নাম দেন অনিশ্চয়তাবাদ (indeterminism)। স্যর আর্থার এডিংটন-এর কথায় এই অনিশ্চয়তাবাদের ওপর নির্ভর ক'রে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যা হয়েছে তা অসাধারণ, অপর পক্ষে নিশ্চয়তাবাদ বা কার্য্যকারণ তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে তার অগ্রগতির পরিমাণ—"just nil", এই কিছু না।

কার্য্যকারণ বা causality-কে পরিত্যাগ করলেই একটা সমস্যা স্বভাবতঃ এসে পড়ে। তবে কি জগতের সবই স্বাধীন, এ জগতে সবই কি সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছা-পরায়ণ? এ সমস্যা ঠিক বিজ্ঞানের না হলেও যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার উত্তর ফল স্বরূপ হ'য়ে এ প্রশ্নের উৎপত্তি হয়েছে তখন বৈজ্ঞানিককে এর সম্মুখীন হ'তেই হয়। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকে এর উত্তর দিতে চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু সে আলোচনা আপাততঃ অন্য সময়ের জন্যে তোলা রইল।

প্রোপাগাণ্ডা

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

আমার নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হইতেছিল। নিরুপায় হইয়া তাঁহার সামনে বসিয়াছিলাম। তাঁহার নূপনিগড় উচ্ছ্বসিত বাক্যপ্রবাহ নদীর স্রোতের মত যেন লহরী তুলিয়া ছুটিতেছিল। সেই তরঙ্গবেগে আমি ভাদ্রমাসে তৃণখণ্ডের মত নিঃসহায় হইয়া কোন্ অকূলে ভাসিয়া চলিয়াছি।

ভদ্রলোকটি যেন একটি জীবন্ত সংবাদপত্র। তিনি বলিতেছিলেন—বিচার, বিচার কোথা! চেয়ে দেখুন য়ুরোপের দিকে—সাম্রাজ্যলোভী ইটালীর কি পররাজ্যলোলুপতা: আমাদের চোখের সামনে নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তারা আবিসিনিয়া অধিকার করলে। সমস্ত দেশটার ওপর থেকে মরণোন্মুখ মনুষ্যত্বের যে আর্তনাদ "জাতির বর্মপুলে ধ্বনিত হয়ে উঠল—তাহা'ত নিষ্ফল। সবাই শক্তির দম্ভকে নির্বিচারে মেনে নিলে। মুসোলিনির বিরুদ্ধে কেউ কথাটা পর্য্যন্ত কইলে না। তারপর দেখুন জার্ম্মানী। দুর্ব্বল ইহুদীদের ওপর নাৎসী গবর্ণমেণ্টের সে কি নিদারুণ নিষ্পীড়ন! আইনষ্টাইনের সম্মান পর্য্যন্ত তারা রাখলে না। দ্বিধাদুর্ব্বল অপরাপর শক্তির আকস্মিক বিবেলতার সম্পূর্ণ সুযোগটুকু নিয়ে সে আজ তার হারানো উপনিবেশগুলি পুনর্ব্বার দাবী করছে। তারপর চেয়ে দেখুন—আমেরিকার এসিয়া মহাদেশে প্রতিবেশীদের মধ্যে পরস্পর সে কি হানাহানি! প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল সদ্যজাগ্রত চীনের প্রতি য়ুরোপের মনস্তিক্ত জাপানের অভিযান! উন্মত্ত-শঙ্করের রুদ্রতাণ্ডব নালকিং-এ মূর্ত্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোন বকধার্ম্মিকের কিন্তু সে দিকে চোখ নেই। মাঞ্চুকুও থেকে সুদূর জাপান তার অসীম সাম্রাজ্যলিপ্সা—অবাধে চরিতার্থ করবার অবসর পেয়ে মনে মনে হাসছে। বিচার কি সত্যি আছে?

আমি নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাঁহার কথা সমর্থন করিলাম।

তিনি বলিয়া চলিলেন—আধুনিক মানব পশুশক্তির উপাসক। মনুষ্যত্ব বলে যে একটা কথা আছে—আধুনিক অভিধান থেকে তারা সেটাকে বাদ দেবে। এ যুগে অর্থনীতিই একমাত্র নীতি আর সেই নৈতিক সাফল্যের মূলেই এ যুগের সার্থকতার সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। জাতি বা ব্যক্তি—সকলেরই টাকা হ'চ্ছে একমাত্র উপাস্য, সমস্ত দুনিয়া টাকা টাকা করে ক্ষেপে উঠেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী, জার্ম্মানী, রুশিয়া যেখানেই যান—একমাত্র টাকা ছাড়া দেখবেন কারো কিছু কাম্য নেই যে যাত চাইছে—বাণিজ্যের প্রসার, উপনিবেশ স্থাপন, সৈন্যসজ্জার বৃদ্ধি, একটু ভেবে দেখবেন, একমাত্র অর্থসম্পদ বৃদ্ধি ছাড়া তাদের পরম প্রয়োজন আর বিশেষ কিছু নেই, যা আছে সব—সেকেণ্ডারী ইম্পর্টান্স!

তাঁহার উপর শ্রদ্ধা ক্রমশ বাড়িতেছিল। ভদ্রলোক যেন সুদূরবীক্ষণ করিয়া সমস্ত দুনিয়াটা এবং দুনিয়াবাসীদের অন্তর্নিহিত স্থান সমস্ত দেখিতে পাইতেছিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আবেগময়ী ওজস্বিনী ভাষার ইন্দ্রজালে তিনি এইবার আমাদের দেশের দুর্দ্দশার মূলগত কারণটি বিবৃত করিতে সুরু করিলেন:

আজি এই হতভাগা দেশের হতভাগা লোকগুলোর পরিবর্ত্তন আর দেখতে পাচ্ছি না। এঁরা লক্ষ্মীপূজা করে বটে কিন্তু সে পূজা প্রাণহীন, শুধু একটা আনুষ্ঠানিক সমারোহ মাত্র। প্রকৃত লক্ষ্মীর আরাধনা কাকে বলে সে এরা জানে না। কি আশ্চর্য্য, দেশ আজ ধর্ম্ম নিয়ে মারা আজ হৈ হৈ করছে—তারা দেশ আর ধর্ম্মের কোন মানেই জানে না।

সবিস্ময়ে বলিলাম—বিংশ শতাব্দীতে দেশ আর ধর্ম্ম এই দুটো কুসংস্কারই আজ পর্য্যন্ত জারতে টিকে আছে, এ দুটো গেলেই আর কোন ঝঞ্ঝাই থাকবে না। তখন পরম সুখে ছাই দিয়ে আমরাও আমাদের দেশে য়ুরোপ-লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করব। তখন এই আনুষ্ঠানিক লক্ষ্মী পূজাই হয়ে উঠবে অলক্ষ্মীর আরাধনা। ইস্কুলের সেই অলক্ষ্মী বিদায়ের ছাঁচা আর কুলো এখন থেকেই জোগাড় করে রাখা হচ্ছে সে তার অভিজ্ঞতা নিয়েছে বাংলা সাহিত্য। সে দিকে দা ঘরলে-ভরে-ছিল—নির্দ্দয় হাতে কাঁটা ঘরে সাহিত্যিকরা সড়ক একেবারে সাফ করে রাখছে। এই নয়া সড়ক ধরেই পশ্চিমের চঞ্চলা কমলা দেশ করি পূর্ব্বে একেবারে অচলা হয়ে বসবেন।

তিনি বলিলেন—আমার কথা সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যে কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে সে খবর আমি সদাসর্ব্বদা রাখতে পারি না—দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতেই অধিকাংশ সময় কেটে যায়। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সাহিত্য ছাড়া আরও একটি বস্তুর প্রয়োজন।

দেশবিদেশে সদাসর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ান শুনিয়া আমার শ্রদ্ধা বোধ করি বাড়িয়া গেল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—আর একটি বস্তু কি? তিনি কিন্তু আমার কথায় কান দিলেন বলিয়া মনে হইল না। আমি মন দিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া চলিলাম—দেখতে পাচ্ছেন না—কি যুগ আমাদের চোখের সামনে এসেছে, এ যুগে ন্যায় আর নীতি বলে কোন কথাই নেই। এ হিটলার-মুসোলিনির যুগ। এঁদের বাক্তিত্বের প্রভাব বিশ্বশক্তির সমগ্র মানব সমাজকে বাঁদর নাচ নাচাবে—সমস্ত পৃথিবীজোড়ে তারই একটা আয়োজন চলেছে। ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র—যা নিয়ে বিরাট মানব-সমাজ, এঁরাই তার অনাগতবিধাতা। এঁদের প্রবর্ত্তিত পথ অনুসরণ না করে আর আমাদের কোন উপায় নেই।

এইবার যেন তাঁহাকে অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। তিনি নিশ্চয়ই

একজন অনন্যকর্ম্মা স্বদেশপ্রেমিক এবং এমনও হইতে পারে, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি হইতে আসিয়াছেন। বলিলাম—আপনার পরিচয় দয়া করে—

তিনি স্মিতমুখে মৃদু হাস্য করিলেন। তাঁহার শান্ত ও সৌম্য মুখশ্রী স্বর্গীয় বলিয়া মনে হইল। তিনি বলিলেন—আমার পরিচয়? আমার দেশের হতভাগ্যদের লক্ষ্মীহীন ভাণ্ডারে আমি অচলা কমলার বার্ত্তা প্রচার করে বেড়াই এই আমার পরিচয়। লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব নিয়ে যারা অনশনে, অর্দ্ধাশনে বেঁচে আছে, মৃতপ্রায় হয়ে যারা দুটি অন্ন খুঁটে খাওয়ার নিষ্ফল চেষ্টায় সমস্ত জীবনটাকে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ করছে, আমি তাদের একজন দীন সেবক। তাদের দেওয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা, নির্য্যাতন ও নিষ্ঠুরতা সমস্ত আমি মুখ বুজে সহ্য করছি এবং করব, যদি তারা আমায় কোনদিন বুঝতে পারে এই আশায়।

আমার শ্রদ্ধা ক্রমশ ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহার প্রাবল্যে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। আর কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিলে দরবিগলিতধারে চক্ষু হইতে অশ্রু বহিবে তাহা বুঝিতে পারিলাম। গলাটা কাশিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলাম—এই যে বলছিলেন একটু আগে—দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সাহিত্য ছাড়া আরও একটি বস্তুর প্রয়োজন, সে বস্তুটি কি?

তিনি তাঁহার অটল গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া অচঞ্চল স্বরে আমায় বলিলেন—সে বস্তুটা লাইফ ইন্সিওরেন্স! বলিয়া একখানি ছোট বই আমার হাতে দিলেন।

বইখানি এক জীবন-বীমা কোম্পানীর প্রস্পেক্টাস।

অচিন ফল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

কভু ত আমি দেখিনি হেন ফল,
জানি না বুকে ধরে কি সুধা অথবা হলাহল।
নম্রনত দোদুল শাখা 'পরে
আবেগভরে শুধু নিমেষতরে
অধর কোণে আগুসারিয়া সরিয়া গেল হায়
গন্ধে মোর ভরি নিশাস বায়।

পাড়িব বলি ধরিতে যবে গেনু,
গৃধ্নবাহু বাড়ানু বৃথা নাগাল নাহি পেনু।
চুকিতে শাখা ঊর্দ্ধে গেল সরি'
পত্রাবলি উঠিল মর্ম্মরি'
কি যেন তারা কহিল মৃদুভাষে,
চপল সখীদলের মাঝে অচল ফল হাসে।

লভিব তারে করিনু আমি পণ,
বিফল হ'ল উদ্বাহু সে বামন-লক্ষন।
সে তরুমূলে রহিনু তদবধি
পাকিয়া ফল আসিয়া পড়ে যদি
অমনি তারে কুড়ায়ে 'লব তুলি,
ব্যর্থতার বহুবেদনা নিমেষে যাব ভুলি।

ঊর্দ্ধমুখে কত না দিবাযামী,
রহিনু চাহি তৃষিত আঁখি, এল না সে ত নামি।
আসিল পাখী বসিল আব্‌ডালে
চঞ্চুপুট কুটাল সে রুমালে
অচিরে তারে করিল সর্ব্বগ্রাস,
হেরিনু হায় আপন চোখে এমন সর্ব্বনাশ।

তৃপ্ত-সুখে উড়িয়া গেল পাখী
কপালে মোর ছিল না লিখা কেবলমাত্র ফাঁকি।
ক্ষুদ্র আঁঠি পড়িল ভূমি 'পরে
কুড়ায়ে তারে লভিনু নিজকরে
ভাবিনু মনে, শূন্য বুক চিরি
রোপিব তারে বৃক্ষাকারে পাব তাহারে ফিরি।

সোভিয়েট রুশিয়ার ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি

শ্রীঅনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী

সোভিয়েট রুশিয়ার গোড়ার কথা হচ্ছে—উৎপন্ন দ্রব্য থেকে প্রয়োজন মিটাতে হবে, তা থেকে লাভ করা চল্‌বে না। প্রত্যেককেই খাটতে হবে শক্তির অনুপাতে, আর মূল্য পেতে হবে চাহিদার মাপ মত। এ মূলমন্ত্রটিকেই অনুসরণ ক'রে কম্যুনিষ্টরা গড়ে তুলেছে একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান—সমগ্র জাতির কাজ আর পাওনা দু'টারই জোগান দেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা রয়েছে যার হাতে। কৃষক আর শ্রমিকদের কাছ থেকে যে ওরা নিংড়ে যন্ত্রর সম্ভব লাভ বের করে নিতে একটুও কার্পণ্য করে না তাতে কোন ভুল নেই; এ বিষয়ে নিকারবোকার হিসাব করেছেন—উৎপন্ন শস্য থেকে গভর্ণমেণ্টের ল্যাভ দাঁড়ায় শতকরা এক হাজার, তবে সে লাভের সবটাকেই আবার তাদের কাজেই লাগানো হয়। ব্যক্তিগত লাভ ব'লে কিছুই থাকে না, কম্যুনিষ্টদের মতে যা দেশের স্বার্থ তাকেই শুধু মেনে নেওয়া হয় লাভের মাপকাঠি ব'লে। ওরা পারিশ্রমিক পায় নামমাত্র হারে, সে খুবই সামান্য। কম্যুনিষ্টদলের বাইরে থেকে যে-সব বিশেষজ্ঞের কাজে লাগানো হয়, তাদের ভাতার তুলনায় কম্যুনিষ্টদের ভাতা সাধারণত খুবই কম! থিওরিটা এই: উৎপাদনের সবটুকু ফল একত্র করে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। রাজনীতির দিক দিয়ে গণতন্ত্রের কোঠা একেবারেই শূন্য, তবে ধনবিজ্ঞানের দিক থেকে—অন্তত থিওরি হিসাবে—গণতন্ত্রকে পূর্ণতাই দেওয়া হয়েছে।

এ প্রণালীকে কাজে লাগাতে গিয়ে, আর বাস্তবতার ক্ষেত্রে যে-সব অদল-বদল সাময়িকভাবে মেনে নিতে হয়েছে সেগুলোর জন্যেও এমন অনেক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যাদের কতকগুলো সত্যিসত্যিই পরস্পর-বিরোধী, বাকীগুলো শুধু উপরি উপরি দেখতে গেলে তাই বলেই মনে হয়। এ রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ সকল বিরোধ খুঁজে বের করার কাজে মস্কোর লোকদের উৎসাহের অভাব নেই।

নজির ধরে বলা যেতে পারে—সোভিয়েট নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পারে, যদিও এ ব্যাপারে আইনের কিছুটা কড়াকড়ি আছে—মানে, মৃতের সঙ্গে সোজাসুজি বংশগত সম্পর্ক, বা পোষ্যগ্রহণের সম্পর্ক থাকলেই শুধু উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা থাকবে। যাদের বয়স আঠারোর নীচে তাদের উত্তরাধিকারে আইনের কোন বাধা সেখানে নেই। কেউ উইল ক'রে ষ্টেটকে তার সম্পত্তি দান ক'রে যেতে পারে—যদি সে রকম ইচ্ছা তার থাকে, তবে তা বড় একটা হয় না।

একটা কথা হয়ত অনেকেই জানেন না; আইনের মারপ্যাঁচ থাকলেও বসবাড়ীর সম্পত্তি সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত হতে পারে। শহরের ছোট ছোট বাড়ী কিম্বা গ্রামের বড় বড় বাড়ীও (ড্যাচা) বিক্রি করা চলে, আর তা কিনে নেওয়ার পর ক্রেতাই তার সম্পূর্ণ ও একমাত্র মালিক। তবে এতে একটা সর্ত্ত এই, কারুরই একখানার বেশী বাড়ী রাখা চলবে না। জমির ব্যক্তিগত অধিকার নেই। সোভিয়েট গণতন্ত্রের এলাকায় যা-কিছু জমি সবই জাতিগত বা রাষ্ট্রের দখলে।

দোর বাড়ীর অংশবিশেষ সোভিয়েট নাগরিকের পক্ষে কিনে নেওয়া চলতে পারে; কিন্তু সে সম্পত্তি থেকে আইনের জোরে তাকে বিচ্যুত করা হয়, যদি সে—ব্যার্নেসের ভাষায় বলতে গেলে—'আইনগত কোন অপরাধ ক'রে ফেলে, এমন কোন ব্যক্তিগত ব্যবসাতে লিপ্ত হয় যা বে-আইনী, কিম্বা হারমিতের কাজ অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাজে যোগ দেয়।' কখনও কখনও শুধু ঘর-বাড়ী তৈরী করার উদ্দেশ্যে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে জমি ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তা কালে ভদ্রেই হয়।

লাইব্রেরী বা শিল্প-সংগ্রহ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রেজেষ্ট্রী করিয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যে-কেউ, সাধ্য হ'লে, মোটর গাড়ী কিনে নিতে পারে; বোট, লঞ্চ বা ষ্টীমারেরও মালিক হওয়া চলে। এরোপ্লেন কিনে নিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবহারেও বাধা-নিষেধ কিছুই নেই, তবে কোন সোভিয়েট নাগরিকের পক্ষে—

অবিশ্যি সরকারী লোক না হলে—বাস্তবে এরোপ্লেন পর্য্যন্ত পৌছানো কখনও হয়েই ওঠে না।

যে-কোন সোভিয়েটের নিজের অধীনে লোক খাটাবার অধিকার রয়েছে। ঘর-সংসারের কাজের জন্ত কিম্বা কারু একার জন্ত চাকর-বাকর রাখা চলে। এমন কি নিজের ইচ্ছামত কোন পেশাদারের পক্ষে শ্রমিক নিয়োগ করাও অচল নয়—যেমন কোন-এক অঞ্চলের চর্ম্মকার তার কাজের জন্তে একজন সহকারী রাখতে পারে—কিন্তু তা'তে লোক-হাসের সম্ভাবনা অনেক। এ রকম ব্যবস্থাতে কাজ করে দু'পয়সা ঘরে আনা কখনও ঘটে না। ডাক্তার, আইনজীবী কিম্বা তেমনতর পেশা যাদের, তারা যদি সরকারী চাকুরে না হ'ন, তবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করতে পারেন।

ভাতা সম্পর্কে—অন্তত আইনের দিক থেকে—কোন সীমারেখাই টেনে দেওয়া হয়নি, টাকা কড়ি জমিয়ে রাখার দিকেও কোন অঙ্কের নির্দ্দেশ নেই। তবে রাষ্ট্রের দলিল ছাড়া অন্ত কোন উপায়ে টাকা খাটাবার পথ বন্ধ। এ-সব দলিলে রাষ্ট্রকে যে টাকা দেওয়া হয়, তাতে সুদ পাওয়া যায়—যেমন ধনিকদের দেশে পাওয়া যেতে পারে; আর সে সুদের হারও দেশ ভালই—শতকরা আট টাকা। সেভিং ব্যাঙ্কের কারবারে রাষ্ট্রের সমর্থন রয়েছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়নের কম পক্ষে চার কোটি ত্রিশ লক্ষ লোক সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছিল, তারা শতকরা আট থেকে দশ টাকা পর্য্যন্ত সুদ পেয়েছিল।

সব চাইতে বড় কথা—আয়ের দিক দিয়ে পার্থক্যের যথেষ্ট সুযোগ থেকে গেছে। সোভ্‌কিনোর এক সিনেমা কোম্পানীতে দরোয়ান মাসে প্রায় দেড়শত রুবল পায়, প্রধান অভিনেতা পনরশ রুবল পর্য্যন্ত পেয়ে থাকে। কারখানাগুলোতে বেশী কাজ করাবার জন্তে কাজের অনুপাতে মাইনে দেবার নিয়ম আছে। শিল্পী ও সাহিত্যিকরা যথেষ্ট টাকা রোজগার করতে পারেন, কিন্তু সে টাকা শুধু রুশিয়ার ভাণ্ডারেই থেকে যায়। কারণ ব্যাঙ্ক-নোটগুলোকে তাঁরা নিজেদের কাজে লাগাবার কোন সুবিধাই পেয়ে ওঠেন না। ভ্যাসিলি ভি, স্‌ভার্কিন বলে একজন নাট্যকার মধ্যবিত্ত লোকদের উপযোগী করে য়োনাদার ম্যানস্ চাইল্ড' নামে এক মিলনান্ত নাটক লিখেছিলেন। এ নাটকখানিতে সবগুলো দেশ এমনি মেতে উঠেছিল যে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ঐ থেকে নাট্যকার রয়্যাল্টি পেয়েছিলেন—দুইলক্ষ রুবল। হাস্য-রসের পত্রিকা ওগানকের সম্পাদক মাইকেল কোলজফ মাসে ত্রিশ হাজার রুবল রোজগার করে নামজাদা হয়েছেন। রুশিয়ার সেরা সংবাদ-পত্র 'ইজভেস্তিয়া'তে ক্রমিক লেখার জন্ত লেখককে দেওয়া হয় পাঁচশত রুবল।

অবিশ্যি মনে রাখতে হবে, এ-সব আয় এ পর্য্যন্ত খুব কম লোকেরই হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে আয়ের পরিমাণ ব্যক্তি-বিশেষে তফাৎ হতে পারে বটে, তবু—ফিশার (Fisher) দেখিয়েছেন—তাতে এমন আকাশ-পাতাল প্রভেদ হয় না—যেমন বৃটেন বা আমেরিকাতে কারখানার মালিক আর কেরাণীর মধ্যে দেখা যায়। রুশিয়ার ১৬০ লক্ষ লোকের ভিতর হয়ত বা দশজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না যাদের আয় বছরে পাঁচ হাজার পাউণ্ড হতে পারে।

আরও মনে রাখতে হবে—এ সামাজিক অসাম্যের মূলে দুটি বড় কার্য্য রয়েছে: প্রথম—সোভিয়েট ইউনিয়নে উৎপাদনের উপায়গুলোর উপর ব্যক্তির কোন হাত নেই। টাকা জমিয়ে রাখা বা হস্তান্তর করা চলতে পারে, কিন্তু উৎপাদনের উপায়গুলো সম্পর্কে তা চলবে না।

দ্বিতীয়—সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রমকে ব্যক্তির লাভে ব্যবহার করা চলবে না। দলিলের উপর সুদ পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে সুদকে শ্রমের ব্যক্তিগত মূল্য বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে।

এ-সব রক্ষা-কবচের মূল্য অনেক। আর এগুলো আছে বলেই বিরোধগুলোর জন্তে ষ্টালিনের মাথা ঘামাবার কিছু দরকার নেই। জনগণের খুবই অল্পসংখ্যার উপর ও-গুলোর প্রভাব। তা ছাড়া, এ বিরোধগুলো ইচ্ছা ক'রেই সৃষ্টি করা হয়েছে উৎপাদন বাড়িয়ে দেবার জন্তে।

সেকালের উৎসব

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

প্রবন্ধ

বাংলার উৎসবগুলির মূল্য অপরিসীম। উৎসবগুলির ভিতর দিয়া বাঙ্গালী নরনারী অবাধিল আনন্দ উপভোগ করে ও অশেষ শিক্ষালাভ করে। এই উৎসবগুলি মিলনক্ষেত্র। এখানে হিন্দু-মুসলমান, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, পণ্ডিত-মূর্খ প্রভৃতি ভেদাভেদ নাই। প্রত্যেকেই উৎসবগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশে যোগদান করিতে পারে। উৎসবসমূহ সাহিত্য, শিল্প ও কৃষ্টির আলোচনা কেন্দ্র। বাংলার সংস্কৃতিধারাগুলির মধ্যে উৎসবগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার যোগ্য। প্রাচীন উৎসবগুলির মধ্যে দোল, মহরম, দুর্গোৎসব ও বিবাহোৎসব অন্যতম।

বিবাহোৎসব সম্পূর্ণ সার্ব্বজনীন। যে পরিবারে বিবাহ, উৎসবটী শুধু সেই পরিবারে সীমাবদ্ধ নহে—সমগ্র গ্রামখানী লইয়া ইহার ঘটা পড়িয়া যায়। এই উৎসবে আত্মীয়-স্বজন, এমন কি ব্রাহ্মণ, নাপিত, ধোপা, কুমার, কামার, কলু, মালি, মালাকর, বাদ্যকর নিমন্ত্রিত হয় এবং প্রত্যেকেই ইহাতে যোগদান করিয়া উৎসবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গ্রহণ করে ও ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বর-কন্যার সজ্জা, বরযাত্রীর অভ্যর্থনা, নিমন্ত্রিতের আহার বাস, নৃত্য-গীত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য চারিদিকে একটা বিরাট সাড়া পড়িয়া যায়। উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নারীই বেশী অংশ গ্রহণ করে। নারী সমস্ত গৃহটীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া সিন্দূর ও গিরিমাটির সাহায্যে দেওয়ালে নানা প্রকার ফুল-লতা, লক্ষ্মীর পা, শিবের মূর্ত্তি সুন্দরভাবে চিত্রিত করে। বর ও কন্যার বসিবার পিঁড়িতে পদ্ম আলিপনা অঙ্কিত হয়। ছায়ামণ্ডপের চারি কোণের কলার থামগুলি বিভিন্ন ফুল ও লতার সজ্জায় অপূর্ব্ব রূপ গ্রহণ করে। আলিপনার সিদ্ধহস্ত নারী ছায়ামণ্ডপে পদ্মচাকী আলিপনার চিত্র আঁকে। শুকুমণির করের জন্য জননী দশ-বার বৎসরে যে আদর ও স্নেহ দিয়া যে কাঁথাখানি সেলাই করেন তাহা তিনি বরকে দান করেন। এত আদরের, এত স্নেহের জিনিষ রাজা বা রাজরাজাও পান না। অনেক নারী বর-কন্যার আনন্দোৎসাহের জন্য নৃত্য-গীতের চর্চ্চা করে। মালাকর বরকন্যার জন্য কত বিচিত্র রংএর সমাবেশে ফুলের মুকুট রচনা করে। শুভ মুহূর্ত্তে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে, নারীর হুলুধ্বনিতে, আত্মীয়-স্বজনের আশীর্ব্বাদে নৃত্য-বাদ্য-গীতের ভিতর বর-কন্যার শুভমিলন সম্পন্ন হয়। বরকন্যার মিলনোৎসব রামায়ণের রাজ্যাভিষেকের মতই।

বাংলার দুর্গাপূজা সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দময় উৎসব। বর্ষার মেঘ-গর্জ্জনে ও বর্ষণে জনগণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কৃষক-কুটীরে শ্রমের ভিড় পড়িয়া যায়। কৃষক ভূমি কর্ষণ, বীজ রোপণ, বীজ ছেঁচন, পাট কর্ত্তন প্রভৃতি পরিশ্রমের ভিতর ডুবিয়া যায়। কৃষক মাঠে শ্রমের মধ্যে গান ও সন্ধ্যায় কীর্ত্তনের আনন্দোপভোগ ছাড়া অবকাশ পায় না। সোনা হাওয়া ও মৃদু রবি-কিরণ লইয়া শরৎ যখন পৃথিবীতে আসে, তখন বর্ষার প্রকোপ হ্রাস পায়। তখন কৃষকজীবনেও ক্রমশ আনন্দের আলোকসঞ্চার হয়।

এই সময়েই দুর্গোৎসব। শারদীয়ার আগমনে বাংলার আকাশ-বাতাস, নদী-স্থল আনন্দে আত্মহারা। গগনই ধরায় শারদীয়ার আবাহন আনে, তখনই চারিদিকে কার্য্যের সাড়া পড়িয়া যায়। মৃৎ-শিল্পীর ভবনে আনন্দময়ী শারদীয়ার মূর্ত্তি গড়িবার প্রচেষ্টা চলে। শারদীয়ার আগমনী প্রচারের জন্য চাষী বাদ্যকর্চ্চা আরম্ভ করে। জননীর মঙ্গলাচরণের জন্য পুরোহিতগৃহে চণ্ডীপাঠের শুভারম্ভধ্বনি বাজিয়া ওঠে। দেবীর অভ্যর্থনা জন্য কৃষক শাপলা, আলোভোপের চাউল সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। জারি, যবসাযন্ত্রণ, লক্ষ্মী, কবির গানের আখড়ায় প্রতিদিন সঙ্গীত পালা আলোচিত হয়। আখড়ায় আখড়ায় লাঠি, ছোরা, কুস্তিতে শরীরচর্চ্চা চলে। নদীতে নদীতে নৌকার বাইচ খেলা চলে। ব্যবসায়ী নিত্য নূতন জিনিষের আমদানী করে। মালী ফুলের বাগানে সুন্দর ফুল সংগ্রহের চেষ্টা করে। নারী তাহার গৃহখানি সাজাইবার উদ্দেশ্যে আলিপনা ও চিত্র অঙ্কনে ব্যাপৃত। চতুর্দ্দিকে শুধু নূতন বস্ত্র, নূতন আহার্য্য, পরিবারের আত্মীয়স্বজন শুভাগমন—পূর্ণ মিলন। চারিদিকে যেন আনন্দের ফোয়ার। উৎসবের নির্দ্দিষ্ট তিন দিনের জন্য সবাই প্রতীক্ষায়। ঐ তিন দিনের জন্যই চারিদিকে এত প্রতিযোগিতা। কে কত ভাল বাজাইতে পারে, কে গান গাইতে জানে, কে ভাল কুস্তি বা লাঠি খেলা দেখাইতে পারে। কে ভাল বাইচ করিতে পারে, কোন্ শিল্পীর প্রতিমা শ্রেষ্ঠ—এইগুলি লইয়া একটি তুমুল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

জননীর আগমনে কোনও বিচার নাই—সবাই সমান। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য কোনও ভেদাভেদ নাই। সকলেই প্রতিমা দর্শন করে ও দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করে। সকলেই গীত, নৃত্য, বাদ্য, বাইচ, খেলাধূলায় যোগদান করে। এত সার্ব্বজনীন এই দুর্গোৎসব।

এই দুর্গোৎসব অতীব আনন্দময়। আজ আর কি সেদিন আছে? আজ শিক্ষিতসম্প্রদায় পল্লী ছাড়িয়া সহরবাসী হইয়াছে। শিক্ষিত পল্লীকে আর শ্রদ্ধা বা সম্মান করে না। পল্লীতে তাই অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর জনগণ নিরুৎসাহ হইয়া বাস করে। পল্লী আজ ধ্বংসের মুখে! সাথে সাথে উৎসব, শিল্প, সাহিত্য বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে।

সাম্প্রদায়িকতার বিষ আজ শিক্ষিত বাঙ্গালী জর্জ্জরিত। হিন্দু-মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে বিরোধ—উদ্বত-অনুদ্ধত, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বাংলার পল্লীর নিরক্ষর লোক এইগুলির খোঁজও রাখে না। আজও মুসলমান হিন্দুর উৎসবে যোগদান করে, হিন্দুও মুসলমানের উৎসবে যোগদান করে। পল্লীতে এইগুলির দৃষ্টান্ত আজও প্রতি উৎসবেই মিলিবে।

বাংলার উৎসবগুলি ছিল বড় বড় প্রদর্শনী। এইগুলিকে উপলক্ষ করিয়া সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য ও বাদ্যের রীতিমত আলোচনা হইত। জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এইগুলিতে যোগদান করিয়া বাঙ্গালী অনাবিল আনন্দলাভ করিয়াছে এবং সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালীকে যদি বাংলার নিজস্ব সম্পদ্ লইয়া বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে বাংলার উৎসবগুলিকে প্রাচীনভাবেই বাঁচাইতে হইবে।

ডাকঘর

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

(১)

মিশর

মানব সভ্যতার আদি জন্মভূমি এই মিশর। এতৎ কারণে অনুমান হয় যে ডাকবিভাগের আদি উৎসও এই দেশে এবং বিভিন্ন হরকরা দ্বারা দূর প্রদেশে সংবাদ প্রেরণের যে ধারা তাহা এই উৎস হইতেই প্রবাহিত হইয়া ফিনিসিয়া, য়্যাসেরিয়া প্রভৃতি দেশকে প্লাবিত করিয়া সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কারণ আমরা মিশরের প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, "১৬২৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বে ক্যারাও রাজাদের সময় মিশর দেশে যথেষ্ট পত্রের আদান-

খৃঃ পূঃ ১১০০ অব্দে এই বৃহৎফলকের পত্রখানি লিখিত। আজও কেহ ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মধ্যস্থান হইতে ইহার পাঠ আরম্ভ হইবে

প্রদান ছিল।" 'হিষ্ট্রী অব্ দি ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রেস'-এ আছে, যে, মিশরের মন্দির-গাত্রে যে সকল পত্রবাহী পারাবতের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১২৯৭ অব্দ বা তাহারও কিছু পূর্ব্বে খচিত। পত্র-প্রেরণের এই যে ধারণা, এই যে কৌশল ইহা নিশ্চয় মানবের মনে একদিনে জাগিয়া ওঠে নাই। ইহার পশ্চাতে অনেকখানি চিন্তা ও চেষ্টা এবং একটা ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত ডক্টর আর, পি, গ্রীনফণ্ এবং ডক্টর হাণ্ট অস্থিরেকাসের পাপিরী সকলের মধ্য হইতে একখানি দলিল বাহির করিয়াছেন, সেখানি ২৭০ খৃষ্ট-পূর্ব্বে নাইল উপত্যকার মধ্যস্থিত কোন একটি ডাকঘরে পত্রাদি রেজিষ্ট্রী করার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাতে হরকরা পৌঁছানর সময় ও তারিখ, মোড়কের সংখ্যা, যে যে ব্যক্তির নিকট পত্র পৌঁছাইতে হইবে তাহাদিগের নাম ও ঠিকানা এবং পত্র-বাহীর নাম লিখিত আছে। ইহা আরও স্পষ্টই প্রমাণিত করিতেছে যে, সেই প্রাচীন যুগে ডাকঘরের কার্য্য-বিষয়ে মিশরবাসীরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল। উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন, "খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় হইতে প্রথম শতকের মধ্যে মিশরবাসীদের সহিত ভারতবাসী হিন্দুদিগের যথেষ্ট পত্রের আদান-প্রদান চলিত।" মিশরের ইতিহাসে আছে, সুলতান নাসিরউদ্দীন যিনি ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন, তিনি তাঁহার রাজ্যকালে পারাবতের সাহায্যে পত্র প্রেরণ করিতেন। অতঃপর ১২৬০ খৃষ্টাব্দে শাসনকর্ত্তা বাবিলুকা ডাকের বহুল প্রচার ও উন্নতিসাধন করেন।

ব্যাবিলন

ব্যাবিলনে ২০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বে হামুরাবীর রাজ্যকালে যে ডাক প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। টেল্-এল-আমর্নার মৃত্তিফলক ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ। এই দেশের অধিবাসীরা মিশরবাসীদিগের ন্যায় কাগজ ব্যবহার জানিত না। এই কারণে তাঁহারা ছোট ছোট সমচতুষ্কোণ ইষ্টকখণ্ডের উপর কাঁচা মাটির অক্ষর সাজাইয়া তাহা পোড়াইয়া লইত; অতঃপর মাটির খামে ঐ ভাবে ঠিকানা লিখিয়া তন্মধ্যে উক্ত পত্র বন্ধ করিয়া পাঠাইত। ১৩৫৮ খৃষ্ট-পূর্ব্বে লিখিত ঐরূপ কতক-গুলি পত্র টেল্-এল্-আমর্নায় আবিষ্কার হইয়াছে, তন্মধ্যে

অধিকাংশই বৃটিশ মিউজিয়ম ও বার্লিন মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। য়্যাসেরিয়া, মিটানি, সাইপ্রাস, হিটাইট, ফিনিসিয়া এবং কেনান ইত্যাদি দেশের সহিত ইহাদের যথেষ্ট পত্রের আদান-প্রদান ছিল, এই পত্রগুলি হইতে তাহা জানা যায়। ডাকবাহীরা ভারবাহী পশুর সাহায্যে ঐ সকল পত্র লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইত। এই দেশের স্ত্রী-পুরুষ উভয়পক্ষই পত্র লিখিতে জানিত। প্রবাসী পুত্র পিতামাতার সহিত, স্বামী স্ত্রীর সহিত, বণিক মহাজনদিগের সহিত, শাসনকর্ত্তারা সম্রাটের সহিত—এইভাবে নিত্য শত শত পত্র আদান-প্রদান করিতেন। আবার ইহার মধ্যে কোন বিশেষ পর্ব্বদিন উপস্থিত হইলে, সেদিন শুভ-সম্ভাষণ জানাইয়া লোকে এত পত্র আদান-প্রদান করিত যে, রাজা মাথায় ডাক-হরকরাদিগের ভিড়ে রাস্তা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

প্যালেষ্টাইন

প্যালেষ্টাইন হইতে মোশেক যখন মিশরে যান, সে সময় (১৬৮১ খৃষ্ট-পূর্ব্ব) প্যালেষ্টাইনে পত্র আদান-প্রদান ছিল। অতঃপর ১০১৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বে সোলেমান যখন এই দেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, সেই সময় এই দেশে পারাবতের সাহায্যে পত্র প্রেরণের রীতি প্রচলিত হয়।

ফিনিসিয়া

ফিনিসিয়ার প্রাচীন ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ৯৭৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বে হারণ যখন ঐ দেশের সিংহাসন লাভ করেন সেই সময় তদানিন্তন অন্যান্য রাজ্যগুলির সহিত ইহাদের যথেষ্ট পত্রের আদান-প্রদান ছিল।

কার্থেজ

কার্থেজেও বহু প্রাচীনকাল হইতে পত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ২২৫ খৃষ্ট-পূর্ব্ব সময় হিন্দুদিগের সহিতও ইহাদের পত্র আদান-প্রদান ছিল।

আরব

ওলিদা মোজা নামক জনৈক ব্যক্তি মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় ৪০ বৎসর পর আরবে সর্ব্বপ্রথম ঘোড়ার ডাক স্থাপন করেন।

বোগদাদ

কোদামা নামে বোগ্দাদের একজন অধিবাসী যিনি ৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মারা যান, তিনি তাঁহার 'বুক অফ দি টেক্সাস'-এ লিখিয়াছেন যে, সে সময় বোগ্দাদে সর্ব্বসমেত ৯০০টা ডাকঘর ছিল। বোগ্দাদ হইতে যে ছয়টি রাজপথ বাহির

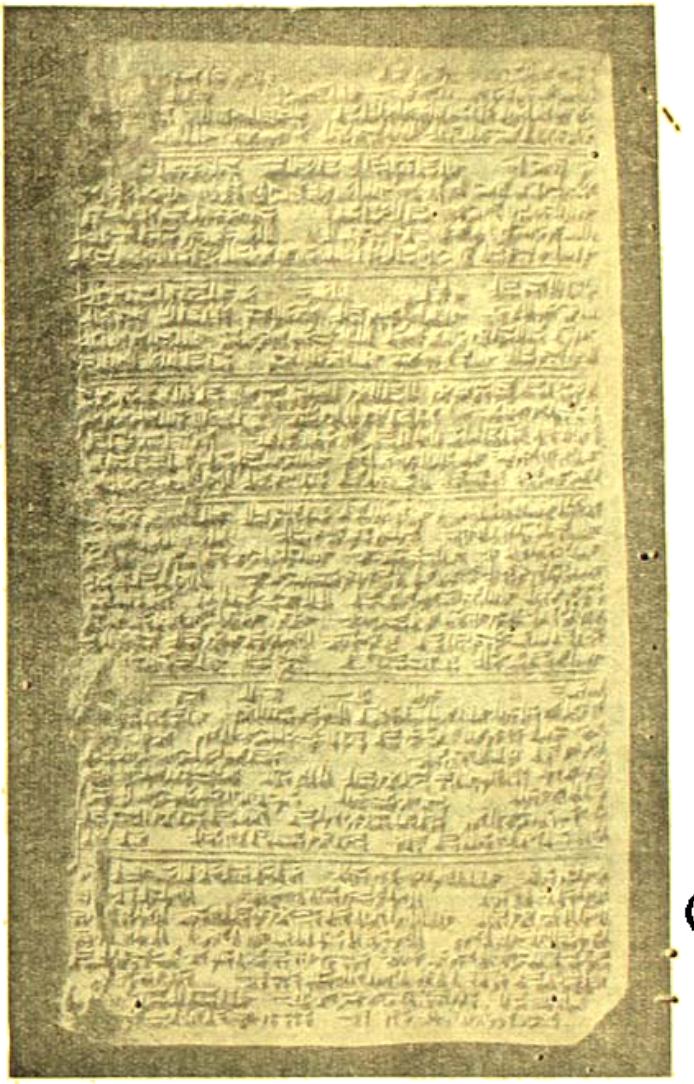

খৃঃ পূঃ ১৪৫০ অব্দে মিশর রাজ তৃতীয় এমেন হোটেপের নিকট মিটানী রাজ এই পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন

গিয়াছে, তাহার উপরে ঐ সকল ডাকঘর স্থাপিত। এই রাজপথগুলির মধ্যে বেষ্ট পারস্য অভিমুখে গিয়াছে এই পথে হরকরারা পত্র বহন করে; সিরিয়া এবং আরবের পথে উটের ডাকে পত্রাদি প্রেরিত হয়; অপরাপর পথগুলিতে ঘোড়ার ডাক প্রতিষ্ঠিত আছে। ডাক অধ্যক্ষ মহাশয়ের

"নওয়াকুইয়াম" এবং যাঁহারা শহরস্থ ডাকঘরগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন তাঁহারা "করওয়ান কুইয়াম" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে তদানিন্তন ডাকঘরগুলির মধ্য দিয়া যে সকল পত্রের আদান-প্রদান হইত তাহা অতি-আধুনিক কালের ন্যায় রেজিষ্ট্রি করার রীতি ছিল।

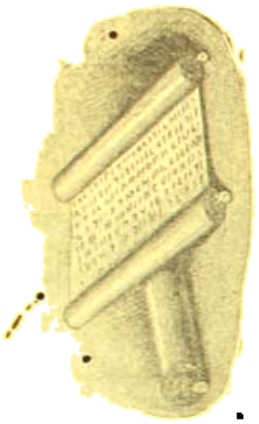

খৃঃ পূঃ ৫ম শতকে লিখিত দুইখানি পারস্যের পত্র

পারস্য

হেরোডোটাস লিখিয়াছেন, ৬০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বে পারস্য দেশে পরস্পর পত্র আদান ছিল। হেরডেটাস ও জেনফন্ পাঠে জানা যায় যে, ৫৫০ খৃষ্ট-পূর্ব্বে সম্রাট কুরুষ পারস্য দেশের রাজধানী এবং দূরস্থ শহরগুলির মধ্যে রাজকীয় পত্রাদি আদান-প্রদানের জন্য প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির উপর স্থানে স্থানে হরকরা এবং ঘোড়ার ডাক স্থাপন করেন। গ্রীক হেরডোটাস ও জারক্সেস-এর রাজ্যকালে ইহার বহুল প্রচার ও উন্নতিসাধন করেন। নেকিদন্ অধিপতি পারস্যরাজ সময়ও ডাক স্থাপিত ছিল। ঐ সময়ে লিখিত কতকগুলি পত্র ডক্টর আর-পি-গ্রীণফল ও ডক্টর হাণ্ট, অক্সিরিঙ্কাসের পাপিরিসকল্পের মধ্য হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পত্রের একখানি অদ্যাপি বার্লিন ডাকবিভাগের বাদুঘরে রক্ষিত আছে।

বৃহত্তর ভারত

ইন্দোনেসিয়া, ইন্দোচীন, সেরিন্দিয়া এবং ইণ্ডিয়া-মাইনর এই কয়টি দেশ লইয়া বৃহত্তর ভারত। ভারতীয় কৃষ্টি ও চিন্তাধারা ইহাদিগের মধ্যেও সমভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এই সকল কারণে মনে হয়, এই সকল রাজ্যের অধিবাসীরাও প্রাচীনকাল হইতেই পত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং প্রথম হইতেই এ-বিষয় ঘোড়া, উট, খচ্চর অথবা গাধা এবং নৌকার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তাহা না হইলে, সেই যানবিহীন দিনে সুদূর ভারতবাসীদিগের সহিত সখ্যতা স্থাপন ও বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষা করা তাহাদিগের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর হইত না।

মহা চীন

বিভিন্ন হরকরাদ্বারা পত্র প্রেরণের যে ধারণা, অনেকের অনুমান যে চীন দেশেই তাহার সূচনা। কিন্তু চীন দেশের ইতিহাসে আমরা ইহার কোন সন্ধান পাই নাই। তবে বহুপ্রাচীনকালে লিখিত কয়েকখানি চীনাগত পত্র যাহা আজিও ভারতের ২।১ প্রাচীন লিপিরাদিতে রক্ষিত আছে, তাহা হইতে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে সে যুগে চীন দেশেও পত্র ব্যবহার চলিত এবং মিশর প্রভৃতি প্রাচীন দেশগুলির ন্যায় ইহারাও ভারতের সহিত আদান-প্রদান রাখিয়াছিল। সে যাহা হউক, নবম শতাব্দীতে এ দেশে যে ডাক প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার সন্ধান আমরা পাইয়াছি। সোলেমন এবং আবু জায়াদ হোসেন নামক দুইজন আরব তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, চীন সম্রাট প্রদেশস্থ শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত যথেষ্ট পত্রের আদান-প্রদান রাখিয়া থাকেন। পত্রবাহীরা ছোট ছোট ল্যাজবিশিষ্ট খচ্চরের পৃষ্ঠে ঐ সকল পত্রভার চাপাইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। অতঃপর ভেনিস দেশীয় পর্য্যটক মার্কোপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, ১২৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন চীন ভ্রমণে যান সে সময় উক্ত রাজ্য মধ্যে বেশ উন্নত প্রথায় এবং বিস্তৃত ভাবে ডাক বিভাগের কার্য্য চলিতে দেখিয়াছেন। ঐ সময় চীন দেশে ১০,০০০

মিশর দেশের একটি ডাকঘর, আধুনিক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইহা বর্ত্তমান ছিল। সম্মুখে কায়রোর বিখ্যাত মসজিদ

ডাকঘর এবং প্রতি ডাকঘরে দুইটি হিসাবে সর্ব্বসমেত প্রায় ২০,০০০ ঘোড়া ডাক বহনের জন্য নিযুক্ত ছিল। বাহকেরা

একটি ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়া অপরের পৃষ্ঠে পত্রাদির ভার চাপাইয়া পাশাপাশি দুইটি ঘোড়া লইয়া যাত্রা করিত। পথিমধ্যে যে-সকল ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সকল স্থানে ঘোড়া বদল করিয়া হরকরারা এইভাবে দিন প্রায় দুই-তিন শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া চলিত। ইহাতে খুব শীঘ্রই গন্তব্য স্থানগুলিতে পত্র পৌছাইবার সুবিধা হইয়াছিল। এইভাবে ডাকবহনের রীতি এখনও চীন দেশে বর্ত্তমান আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে একজন বাহক ৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া লাসায় পৌছাইয়াছিল, পণ্ডিত নাইন সিং এই দূতটিকে দেখিয়াছিলেন।

খৃঃ পূঃ ১১০০ অব্দে ইস্রাইল রাজ দাযূদ বেকবের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিতেছেন

মেক্সিকো

মেক্সিকো দেশের অধিবাসী এজেক্টসরাও পত্র আদান-প্রদান করিত। তবে তাহারা আধুনিক বর্ণমালার সহিত পরিচিত না থাকায়, ছবি আঁকিয়া নিজদিগের মনোভাব পত্র মধ্যে প্রকাশ করিত। এই দেশের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির উপর সর্ব্বত্র প্রায় ৬ মাইল অন্তর ডাকঘর এবং তন্মধ্যে ঘোড়ার ডাক প্রতিষ্ঠিত ছিল। হাত বদল করিয়া পত্র বহনের যে রীতি তাহাও ইহাদিগের জানা ছিল। ইহারা দিন প্রায় ১০০ মাইল পথ চলিয়া রাজধানী হইতে দূর নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তেও পত্র বহন করিয়া লইয়া যাইত।

পেরু

পেরু দেশের অধিবাসীরাও বহুপ্রাচীন কাল হইতে সংবাদ আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছে। এই দেশে ডাক-পথের আয়তন মেক্সিকো হইতে আরও অনেক বিস্তৃত। রাজধানী হইতে যে কয়টি রাজপথ উঠিয়াছে সেই সকলের উপর সর্ব্বত্র ৫ মাইল অন্তর ডাকঘর নির্দ্মিত ছিল এবং তাহার প্রত্যেকটাতেই হরকরা নিযুক্ত ছিল। এই হরকরারা

মধ্যযুগের প্রথমভাগে ডাক হরকরা মারফত এইভাবে পত্র প্রেরণ করা হইত

খুব শীঘ্রগামী বলিয়া প্রসিদ্ধ। হাত বদল করিয়া পত্র বহন রীতি ইহাদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। এইভাবে ডাক বহন করিয়া এই হরকরারা দিন প্রায় ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া চলিত। পেরুভিয়ানারও লিখিতে পড়িতে জানিত না, তবে ইহাদিগের মধ্যে, কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রচলিত ছিল, যাহা কোন একটি লম্বা দড়ির স্থানে স্থানে নানারূপ গ্রন্থিদ্বারা জানান চলিত। ইহারা সেই কারণে দড়িতে ঐ ভাবে গ্রন্থী দিয়া তাহাই পত্র স্বরূপ পাঠাইয়া দিত।

গ্রীস

গ্রীসের ইতিহাসে আছে পূর্ব্বে স্পার্টানরা লিখিতে পড়িতে জানিত না, তবে তাহারা খুব মেধাবী ছিল। সে সময় তাহাদের কোন সংবাদাদি দূর প্রদেশে প্রেরণ করিতে হইলে তাহারা দূত নিযুক্ত করিত। দূতেরা খুব দ্রুতগতিতে যথা-স্থানে উপস্থিত হইয়া সংবাদ প্রচার করিয়া ফিরিয়া আসিত। অতঃপর যেদিন উত্তরাধিকারী পারস্য-রাজদিগের সময় পত্রাদি প্রেরণের উদ্দেশ্যে ঘোড়ার ডাক এবং হরকরা স্থাপিত হয়।

রোম

রোম সাম্রাজ্যের কালে সম্রাট অগাষ্টস (৩২ খৃষ্ট-পূর্ব্ব) রাজকীয় পত্রাদি প্রেরণের জন্য স্বীয় রাজ্যমধ্যে প্রধান প্রধান পথগুলির উপর ডাকের নির্ম্মাণ করাইয়া সর্ব্বত্র ঘোড়ার ডাক স্থাপন করেন। কিন্তু প্রথমে জনসাধারণে ইহার দ্বারা পত্র প্রেরণের কোন সুবিধা পায় নাই। সেই কারণে রাজ্যের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকেই আপন আপন পত্র বহন জন্য হরকরা নিযুক্ত রাখিতে হইত। রাজকীয় ডাক-বিভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও সাধারণের পত্র প্রেরণের এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া সদাশয় হাড্রিন রাজকীয় ডাক-বিভাগের দ্বার সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ডাকবিভাগের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুল উন্নতি সাধিত করেন। পেনিজ, পল, কেল্ট প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রাচীন জাতিগণও এই ডাকবিভাগের সাহায্য স্পষ্টরূপে ছিলেন। রোমকদিগের পত্র প্রেরণে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহারা নিশরবাসীদিগের ন্যায় প্যাপিরী কাগজে পত্র লিখিয়া প্রেরণের পূর্ব্বে তাহা সুগন্ধিত করিয়া অতঃপর তাহা রেশমের সূতায় বাঁধিয়া ঐ সূতার দুই মুখ সীলমোহর করিয়া দিত। ভারতে সিন্ধুনদীর তীরে যে সীলমোহরগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহাও বোধ হয় রোমকদিগের ন্যায় পত্রাদিতে ঐরূপ সীল-মোহর করিতে কাজে লাগিত। ভূতত্ত্ববিদ্‌ও প্রাগ্-ইতিহাসকার পণ্ডিতগণ যে এরূপ অনুমান না করিয়াছেন তাহা নয়; তবে সেরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অভাব।

কুসুম-কাব্য

(কাল্পনিক)

শ্রীরামেন্দু দত্ত

চিনিতে পারো নি ?—এ যে আজ সুধু শুকানো ফুলেরই দল
সযত্নে রাখিতে পারেনি ইহারে আমার আঁখির জল !
নাই এ ফুলে নাসিক গন্ধ, বর্ণ-সুষমা নাহি
শুকানো ফুলেরও স্বরূপ হারালো আঁখিনীরে অবগাহি' !
চিনিতে যাহারে পারো নি তাহারে সারাটি জীবন ধরি'
আমি মনে মনে পূজিব যতনে বুকের রতন করি'—

. . . . . .

বহু দিন আগে, মনে কি পড়িবে, তোমার কবরী 'পরে
গোলাপের ফুল লাল টুল্ টুল্ গালটির শোভা ধরে—
ভুল করেছিনু ফুলটিকে তব গোলাপী অধর ব'লে
তুমি, "এই নাও রাণীরে তোমার"—ব'লে দিয়ে গেলে চ'লে।
আসল রাণীরে পেলাম না আর; রাণীর খোঁপার ফুলে
আমার রাণীর রতনই যতনে বুকে রেখেছি তুলে !

কভু নিরজনে বসি' একমনে এরই মুখপানে চেয়ে
দেখি মৃদু মৃদু হাসিছে একটি পরীর মতন মেয়ে—
কভু দুরন্ত ঝড়ের নিশীথে পাতার কুটীর কাঁপে,
বসন্ত নিশা হারাইয়া দিশা মূরছায় অভিশাপে,
সে আঁধার সখি' তোমার মূরতি উপজে লক্ষ্মী সম !
অশ্রু-সরসী আরসিতে ভাসে শুকানো কুসুম মম !
কভু এই ধরা ধরিলে সাহারা মরুর মূরতি হায়
তব-দেওয়া-ফুলে দেখি, আর সব শ্যামল হইয়া যায় !
এই কুসুমের সুষমা-সুবাস কোথায় গিয়াছে চলি'
রূপ যৌবন পলায় যেমন রূপসী নারীরে ছলি'—
কুসুম বলিয়া চিনিবে ইহারে অন্যে কেমন ক'রে
তোমার খোঁপার গোলাপ, তুমিই চিনিতে নারিলে যারে,
তুমি নাহি চেনো, ক্ষতি নাই, জেনো একটি হৃদয় ভরি'
আছে এই ফুল সৌরভাকুল গৌরবে ফুলপরী !

দিবসে নিশীথে বসন্তে শীতে সুখে ও দুঃখে মম
ইহারে ঘেরিয়া কাব্য রচিব নিত্য নূতনতম !

দীপক সেন

শ্রীযামিনীমোহন কর

দীপক সেন—দীপক সেন—চারিদিকেই দীপক সেন। থিয়েটারে দীপক সেন—বায়স্কোপে দীপক সেন—রেডিওতে দীপক সেন। আপনারাও হয়ত তার বিশেষ ভক্ত। কিন্তু বছর দু-এক আগে দীপক সেন কি ছিল? তার সম্বন্ধে আপনারা কিছু জানেন? তার নাম কখনও শুনেছিলেন?

আমার কথাগুলো হিংসের মত শোনাচ্ছে। হয়ত এতে রাগেরও একটু আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা আগে শুনুন, তার পর বিচার করবেন।

বছর দু'তেক আগে দীপক একটা ভ্যাগাবণ্ড ছিল। তখন তার নাম ছিল রাখন। আমি, সে, বারীন, মুরারী, প্রমথ—আমরা সব রোজ হাজ্‌রা-মুড়োর চায়ের দোকানে আড্ডা দিতুম। কেউ কেরাণী, কেউ জীবন-বীমার দালালি, কেউ বেকার। রাখন ছিল একটা সিনেমা হাউসের খোট্টা দারোয়ান, ওর চেহারাটা চিরকালই ভাল। লম্বা রঙ, টানা টানা চোখ, কোঁকড়ানো চুল। গলাটি আশ্চর্য রকম মিষ্টি। গান ও গাইতো চমৎকার। কিন্তু চললে চলবে না, দু'বছর আগে ও ছিল দশ টাকা মাইনার একজন খোট্টা দারোয়ান।

সেই রাখনটা আজ দীপক সেন হয়ে উঠল কি করে সেই কথাটাই আজ বলব।

দুবছর আগেকার কথা। আমি, রাখন, বারীন আর প্রমথ হাজ্‌রা-মুড়োর দোকানে চা খেতে খেতে গল্প করছি। হাজ্‌রা মুড়োর এক পয়সা "টী" এখনকার দু'আনা দামের কাপকেও হার মানায়। যাক্ সে কথা।

রাখন বলছিল—"আমার চেহারা আছে, গলা আছে। যদি কোনো রকমে একবার কর্তাদের নজরে পড়তে পারি তো দেখে নিস্। কোথায় যাবে পাহাড়ী সান্যাল, আর কোথায় যাবে সইগল। জানিস্ তো ওদের নজরে পড়তে গেলে একটু সাজগোজ করে কিছুদিন ইডিওর চারিধারে ঘুরতে ফিরতে হয়। একবার যদি হাতে কিছু পয়সা আসে, তাহলে বাইরি বলছি—"

এমন সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে মুরারী এসে ঢুকল। ও যে এতদিন এখানে আসে নি সেটাই আমাদের হঠাৎ তখন খেয়াল হ'ল। আমাদের এভাবে ত্যাগ করবার কারণ জিজ্ঞেস করতেই বলে—"ভাই, দিন পনের বিছানায় শুয়ে ছিলুম।"

"বিছানায় শুয়েছিলে! ছিঃ ছিঃ! এই যৌবন, গ্রীষ্মের অমূল্য সময় বিছানায় শুয়ে নষ্ট করছ?" প্রমথ বলে।

আক্সিডেন্ট মুরারী বলে—"একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। লাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকে গিয়েছিল।"

আমরা সবাই—"আহা! বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা—" ইত্যাদি বলুম।

মুচকে হেসে মুরারী বলে—"দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলা কঠিন। তবে দিন পনের বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকতে বেশ লাগল না। তার ওপর আবার দশটা টাকা।"

"দশটা টাকা!"

"হ্যাঁ। 'স্পোর্টস্‌ম্যান্' কাগজওরা দিলে।"

"তোমাকে—দিলে!" প্রমথ আশ্চর্য হয়ে বলে। "শুয়ে পড়ে থাকবার জন্য দশ টাকা? কেন? ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বল। কলিকালে তো ঠিক এমনটা হয় না।"

"কিন্তু কথাটা সত্যি।" মুরারী বলে।

"আগে দশটা টাকা দেখা—"

"সাইরি আর কি। আমি দেখাই, আর অমি তুমি ধার নাও। তোমাকে আমার বেশ জানা আছে।"

লাঞ্ছিত হবার ছেলে প্রমথ নয়। জিজ্ঞেস করলে—"হ্যাঁ হে, যে-কেউ পা মচকে দশ টাকা পেতে পারে?"

"নিশ্চয়ই। তবে গ্রাহক হওয়া চাই।"

"গ্রাহক মানে?"

"সেলো ধুলো সম্বন্ধে কাগজগুলোর একটা নূতন কায়দা। গ্রাহক হয়ে একবছরের অগ্রিম টাকা দিলে গ্রাক্সিডেন্ট ইন্‌সুরেন্স-এর বেনিফিট পাওয়া যায়। ইন্‌সুরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে হাপা-হাপি ব্যবস্থা।"

আমরা সকলেই চুপ। এ বলে কি! প্রমথ তখন ভাবছে।

"আচ্ছা এরকম কটা কাগজ বেরিয়েছে? খোটা দশেক হবে?"

"তা হবে।"

"যদি কেউ প্রত্যেক কাগজের গ্রাহক হয় আর তার পা মচকায় তবে সকলের কাছ থেকেই দশটা করে টাকা পাবে?" প্রমথ জিজ্ঞেস করলে।

"নিশ্চয়ই। বেশিও পেতে পারে। ছোট হিসেবে ধর। পা মচকালে দশ, হাত ভাঙলে পঁচিশ, পা ভাঙলে একশ'—এই রকম সব ধরা আছে।"

"What!" প্রমথ লাফিয়ে উঠল। "তাই নয়?"

"না, না, মিথ্যে।"

"হ্যাঁ হে, তোমরা নিজেদের মধ্যে কত টাকা তুলতে পারো?" আমাদের জিজ্ঞেস করছে প্রমথ।

বারীন ব্যাঙ্কের কেরাণী। অতি সতর্ক লোক। বলে—"টাকায় কি হবে?"

"কি বলছ হে? টাকায় কি হবে! যা মজলিস জেঁকেছি তাতে

এমনই বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে কেউ পায়ে দি। যত কাপড় আছে সব-গুলোর আমরা একজনের গ্রাহক হব।"

"তারপর?" বারীন শুধালে। "যদি কিছু না হয়—"

"নন্‌সেন্স! কিছু না হয় মানে? আমরা টাকা তুলে সব কাপড়ের গ্রাহক হব। তারপর লটারী করব। যার নাম উঠবে তাকে পা ছাড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার টাকা। সকলে ভাগ ক'রে নিয়ে কিছুদিন মনের সুখে থাকব।"

সকলে স্তব্ধ, বিস্মিত, স্তম্ভিত।

আবার বারীন বলে—"যদি সে পা না ছাড়তে পারে?"

"দিলী, বিশ্ব লড়াইতে একটা লোক পা ছাড়তে পারে না এ কথা ভাবলে কি ক'রে? চারিদিকেই তো পা ছাড়বার ধুম হচ্ছে। একটা পাখাও পারে। আমার তথা আর বলব কি ভাই, লুয়ারী যদি দুটো টাকা ধার না দেয় তবে তো না খেয়েই মরতে হবে। আমাদের সবারই মরতে গেলে পোড়নীর অবস্থা—এমন সময় এই রকম ইটনিক একটা স্যান্স দিচ্ছি আর তোমরা কি-না তর্ক করছ। তগবান এতে অসন্তুষ্ট হবেন।"

বারীন হিসেবী মানুষ। সে জিজ্ঞেস করলে—"তোমার যদি এমন হোপলেস অবস্থা, তবে তোমার তাদের টাকা দেবে কি ক'রে?"

বিস্ময়ে প্রমথ চোখ দুটো গোলাকার করলে।

"টাকা! আমার কাছ থেকে তোমরা টাকা নেবে? এত বড় একটা কাসের কি কোনো দাম নেই? আমি চন্দন তোমাদের দেব, আর তোমরা কি-না আমাকে বলছ টাকা দিতে। ছিঃ ছিঃ! আর কেউ বলেও কথা ছিল—কিন্তু তোমরা আমার most intimate friends—তোমরা কি-না এই কথা বলে—"

"যাক্, যাক্, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।" বারীন তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

"তবে তোমার নামটা যদি তুলি, আমি সকলকে 'চাচার হোটেলে' একদিন খাইয়ে দেব।"

প্রমথ বলে—"তেব না। আমার নাম উঠবে না।"

সত্যিই। লটারী হ'ল। নাম উঠল মাখনের।

কয়েকদিন পরে সকালে চা খাচ্ছি এমন সময় প্রমথ এসে হাজির। মুখে চিন্তার ভাব। পাশে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে—"হেরোন, মাখনটা দেখছি আমাদের ডুবোবে। এত কষ্ট ক'রে বুদ্ধি খরচ ক'রে একটা স্কীম করলুম—যাতে ক'রে এই যুদ্ধের আমাদের সকলেরই একটা সংস্থান হয়—আর এই মাখনটা কি না মাঝ দাকলে। আগে জানলে এরকম লোককে কখন দলে টানতুম না। বেটা ভীরু, কাপুরুষ। এখন তো আবার নতুন করে আর কারুর জন্যে টাকা তোলা সম্ভব নয়। যে রকম ক'রে হোক ওকে দিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে।"

আমি বলুম—"আমার মনে হয় ওকে আর কিছুদিন সময় দেওয়া দরকার।"

প্রমথ জবাব দিলে—"মাখনও তাই বলে। বাড়াবার কাল ফলেন কি করে যে ব্যাক্‌সিডেন্ট করব ভেবে পাচ্ছি না। ফুল, এর জন্যে একটা কোর্স ধারণার। একটা তিন বছরের ছেলে পর্য্যন্ত পাঁচ মিনিটের মধ্যে বানিয়ে দেবতে পারে। যে পরামর্শই দি, তার পছন্দ হয় না। কাল রাত্রে আমি আর মাখন কর্জন পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলুম। দু'ঘণ্টা পোরা হয় খেয়ে ঝগড়া করছে। কেন তাপড়া তাপড়া চেহারা। ওদের একটা খুসি খেলে সোজা এক মাসের জন্য হাসপাতালের বারান্দা হয়ে যেত। কত ক'রে বোঝালুম যে দুই বা—ঘিয়ে ভাজিয়ে খেয়ার চেষ্টা কর। তারপর সব ব্যবস্থা আমি করব। করে কি-না—পরের ঝগড়ার মধ্যে হাত দেওয়া উচিত নয়। লজ্জার কথা। ঈশ্বর নেই—বিবেক নেই। এমন টাইপের ছেলেদের দিয়ে কখন দেশের উন্নতি হবে না। যাক্, এখন এক কাপ চা আর দু'টো টোষ্ট খাওয়া।"

"পয়সা নেই।" ক্ষীণ কণ্ঠে বলুম।

"ধার করে খাওয়া।" উত্তর দিলে।

অগত্যা খাওয়াতে হ'ল। সকাল বেলা কতকগুলো পয়সা খোয়া গেল।

খেতে খেতে সে বলে—"আচ্ছা ভিক্ষে চুক্তে দেয়ে যা-হোক্। এতগুলো টাকা মিছিমিছি আটকে রইল। আমার ভাই ভাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কোনো দিনই আমি ওটাকে বিশ্বাস করি-না—কোঁকড়ানো চুল, কর্মা রঙ। মনে রেখ, ঐ কোঁকড়ানো চুল তাকে জীবনে কখনো বিশ্বাস কোরো না।"

কিছুক্ষণ আমাকে নিয়ে প্রমথ বেড়াতে গেল। বেড়াতে বেড়াতে মেথি ভগবতী হোটেল-এ নিয়ে গিয়ে হাজির করলে। "ভগবতী হোটেল"কে হোটেলও বলা চলে, মেসও বলা চলে। এক বেলা খাবার চার্জ দু'পয়সা।

প্রমথ বলে—"আমি আগে এখানে থাকতুম। আমার সীটটে এখন মাখন থাকে। সঙ্গে নরেন বলে এক ছোকরা আছে।"

"কিন্তু আমাকে এখানে আনবার কারণ?"

"তার সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিতে চাই।"

"কেন? কিছু হয়েছে নাকি?"

"না হয়নি। তবে আমার মনে হচ্ছে তাকে আজ ঘুসুয়ে কামড়াবে।"

"হঠাৎ এরকম মনে হবার মানে?"

"কে জানে। কিন্তু মন যেন বলছে।" প্রমথ বলে।

"তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।" আমি বলুম।

মনে যেন তৃপ্তি হ'তে লাগল। যাক্ কিছু আমায় ডুবে! সাহসা যেন সামনে সাপ দেখলে এমন ভাবে প্রমথ চমকে উঠল। পিছে দেখি সামনে মাখন।

আমাদের দেখে মাখন বলে—"কি হে? হঠাৎ এখানে? কি খবর সব?"

প্রমথ গম্ভীরভাবে শুধু বলে—"ঘ।"

মাখন বলে—"আচ্ছা ভাই, চলুম। দেরী করবার উপায় নেই। ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।"

"ডাক্তার—কেন?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"আর বল কেন। নরেনকে ঘুসুয়ে কামড়েছে।"

প্রথম আমার দিকে চাইলে, আমি প্রথমের দিকে চাইলুম।

কুকুরের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্য আক্ষেপ হতে লাগল। এক ঘরে মরেশ আর মাখন। কামড়ালে কি-না মরেশকে। কুকুর কামড়ানো মরেশের ব্যারামে কি যায়!

"আমাদের হোটেলওয়ালার কুকুরটাকে দেখেছ তো?" মাখন বলে চলল। "আমি আর মরেশ ঘরে ঢুকছি—মরেশ আগে, আমি পিছনে পিছনে। দরজার পেকল খুলতে দেখি একটা কুকুর লাফিয়ে আমাদের ঘাড়ে পড়ল। আমি কোন মতে পাশ কাটিয়ে একটা টেবিলে উঠে পড়লুম, মরেশকে কামড়ে দিয়ে কুকুরটা সরে পড়ল। আমাদের ঘরে তাকে যে কে বন্ধ করেছিল, কোন রকমে ভেবে উঠতে পারছিনা; ম্যানেজারকে একথা বলতে সে তো মহা খাপ্পা। আচ্ছা ভাই, চলুম।"

মাখন চলে গেল। আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলুম।

প্রথম বলে—"শুনলে কথা? পাশ কাটিয়ে একটা টেবিলে উঠে পড়লুম। হিঃ হিঃ। কুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কামড় খাওয়ার সাহস হোলো না? বড়ই দুঃখের কথা।"

"ঘটেই তো"। আমি বলুম।

"এখন কি করা যায়?" প্রথম বলে। "এ লোকটার তো কর্তব্যজ্ঞান বলে কিছুই নেই। কালই এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।"

পরদিনই আমাদের দল মাখনের ঘেরে গিয়ে হাজির হোল। প্রথম হ'ল আমাদের মুখপাত্র। ভূমিকা না করে সোজা মাখনকে জিজ্ঞেস করলে—"তারপর কি করছ?"

ভীত স্বরে মাখন প্রশ্ন করলে—"কিসের?"

জলদগম্ভীর স্বরে প্রথম বলে—"ম্যাকসিডেন্টের।"

"ওঃ। হ্যাঁ—ভাবছি।" মাখন উত্তর দিলে।

"ভাবছি মানে? পনের দিন শুধু ভাবছ? ওসব ভাওতায় চলবে না। কবে কাজে নামছ ঠিক করে উত্তর দাও।"

মাখন চুপ করে রইল। কাঠগড়ায় আসামী!

"কতগুলো টাকা আমরা তোমার ওপর ইনভেস্ট করেছি, তুমি জান—কি কষ্টের পয়সা তাও জান। তবু যে তুমি কি করে এমন ভাবে চুপ করে অবলম হয়ে বসে রয়েছ, বুঝতে পারছি না। হিঃ হিঃ। তোমার সম্বন্ধে আমাদের এর চেয়ে উচ্চ ধারণা ছিল।"

"কিন্তু—"

"এতে কিন্তু নেই। তোমার মনের জোর নেই—তুমি কাপুরুষ। সেদিন যখন দু ন্যাটা গোরা মদ খেয়ে ঝগড়া করছিল, তোমায় আমি টান দিতে বলুম। তুমি কথা শুনলে না। জান মেথি, একটা লরি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দেখে তুমি তাড়াতাড়ি ফুটপাতে উঠে পড়লে। তোমার ভয়ে এত' তোয়ক্কা করে একটা কুকুর পুষলুম, আর তুমি কি-না পাশ কাটিয়ে একটা টেবিলে উঠে পড়লে—মাঝ থেকে মরেশ ব্যাচারী কামড় খেলে। এরের অর্থ কি? আমরা জানতে চাই—পরিষ্কার উত্তর শুনতে চাই—"

"কিন্তু—"

"কিন্তু-কিন্তু চলবে না। যাদ, টাদ, লরি কিছুই তো অবশ্য নেই—তবু একটা ন্যাকসিডেন্ট করতে পারলে না, এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে।"

"জেনে শুনে কি করা যায়?"

"নিশ্চয়ই যায়। মনে কি একটু কবিত্ব কি বীরত্ব কিছুই নেই! ভাববে, একটি ষোল বছরের সুন্দরী তরুণী রাস্তা দিয়ে তাঁর ছোট ভাইয়ের হাত ধরে যাচ্ছেন। হঠাৎ ছেলেটি হাত ছাড়িয়ে ছুটল। এক বাসের তলায় পড়ে-পড়ে, সুন্দরী চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন—তখন তুমি কি করবে? চট্ করে বাসের সামনে ছুটে যাবে। বাস—তাহলে আমরা আছি।"

"বলা সহজ; করা সহজ নয়।"

তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে প্রথম বলে চল'—"তারপর আমরা তোমায় হাসপাতালে নিয়ে গেলুম। পেল জোড়া তোমার সার্জারি হ'ল—কাগজে কাগজে তোমার নাম বেরিয়ে গেল। সভা-সমিতিতে তোমার জন্য অভিনন্দন-সভা হ'ল, তোমার আরোগ্য কামনা করা হ'ল। তিন মাসের মধ্যে তুমি ভাল হয়ে ফিরে এলে—সাতটি নালা গলায়, হাজার টাকা পকেটে। তখন তোমার নামডাক পাইয়ে আর অভিনেতা হবার পথ রোধে কে?"

প্রথমের বক্তৃতা মাখনের মনে সুগভীর রেখা কাটছে বলে মনে হ'ল। দেখা গেল সে ভাবছে। কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ বলে উঠল—"বেশ ভাই, ভেবে দেখলুম আমার ন্যাকসিডেন্ট করা কর্তব্য। কিন্তু এখি করতে পারব না। যদি বেশী করা যায় তবেই সম্ভব, নচেৎ নয়। তোমরা যদি আমাকে একটু 'স্কচ্' কিংবা 'হোয়াইট হর্স' খাওয়াতে পার, তবে হয়ত আমি কাজটা হাসিল করতে পারি।"

আমরা সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলুম। বাগীন বলে—"কিন্তু আমাদের কাছে আর পয়সা কই?"

মাখন উদাসভাবে উত্তর দিলে—"তবে হ'ল না।"

প্রথম বলে—"আহা-হা চট কেন? তুমি একটু বাইরে যাও আমরা পরামর্শ করে তোমায় এর উত্তর এখুনি দিচ্ছি।"

"বেশ।" বলে মাখন বেরিয়ে গেল।

প্রথম চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে বলে—"ভাই সব, এ উত্তেজনার সময় নয়। আমাদের সকলকে এখন ধীরভাবে চিন্তা করতে হবে। মাখন যা বলছে নেহাৎ অযথা নয়। আর ওকে ছাড়া যখন আমাদের উপায় নেই তখন তাই করতে হবে। এ সুযোগ বুঝে লোচন দিচ্ছে কিন্তু আমাদের হাত পা বাঁধা। সুতরাং আমার মনে হয় কিছু চাঁদা তুলে ওকে চাঙ্গা ওয়াতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেওয়া যাক্। তারপর ওকে ধরে এনে চৌরঙ্গীর মোড়ে ফেলে দেওয়া যাবে। এ গুপ্ত অনুষ্ঠানে আমি ৫টাকা চাঁদা দেব।"

আমরা সকলে অবাক। লোকটা ক্ষেপে গেল নাকি? দু টাকা! তুমি কোথায় পাবে?" আমরা জিজ্ঞেস করলুম। অবিশ্বাসের হাসি হাসলুম।

"এসরাজটা বিক্রী করেছ কেন?" প্রমথ বলে।

বিস্মারিত নেত্রে মুরীরা জিজ্ঞেস করলে—"এসরাজ! জীবনে তুমি কখনও এসরাজ বাজিয়েছ? তোমার এসরাজে কোথেকে এল?"

"আমার না। পাশের ঘরের নবীনবাবুর।" অবিচলিত কণ্ঠে প্রমথ উত্তর দিলে।

যাই হোক—চাদা দেওয়াই সাব্যস্ত হ'ল। মাখনকে ডেকে আমাদের সম্মতির কথা জানালুম। সেইদিন বিকেলেই চা-ওলা খাওলা ঠিক করে আমরা বিদায় নিলুম।

সেদিন সন্ধ্যায়। মাখন চপ, কাটলেট, ফাউলকারী ইত্যাদি খাচ্ছে, মাসের পর মাস চালাচ্ছে। আমাদের পয়সায়। আর আমরা মুখ চুন করে চেয়ে আছি—মনের কষ্ট মনে চাপছি। চতুর্থ মাসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিরকেলে ভীতু মাখন একেবারে হয়ে বেজায় চটে উঠল।

তাড়াতাড়ি বিল চুকিয়ে তাকে টেনে আমরা রাস্তায় নিয়ে এলুম। তার মুখে একটা ডোন্ট ক্যারার ভাব। আমাদের সঙ্গে আসতে দেখে চীৎকার করে পিছন পিছন যাবার কারণ জিজ্ঞেস করলে। অতি কষ্টে রাগ সামলে প্রমথ হেসে উত্তর দিলে—"আমরা ভাবছি তুমি যখন সেই কাজটা করবে তখন আমরা কাছে থাকলে তোমার উপকারে লাগতে পারব।"

"কোন্ কাজটা?" বিস্মিত স্বরে মাখন প্রশ্ন করলে।

"মানে? সেই না? ড্যাকসিডেন্ট।" প্রমথ বলে।

"ওঃ, গাড়ি-চাপা! আচ্ছা বোকা তো তোমরা। ড্যাকসিডেন্ট করবে না কচু করবে। অনেক দিন পেটভরে ভাল খাওয়া হয়নি, কাই' ক্লাস মালও টানা হয়নি, তাই এই মতলব করেছিলুম। একটু ঝামড় হ'ল যাওয়া করি কিন্তু মনে করবে না। "আচ্ছা—" বলে প্রাচ্য কৃতজ্ঞতার ভঙ্গীতে একটা পাক দিয়ে যেই এগিয়েছে অমি কলার খোসায় পা। সঙ্গে সঙ্গে একটি ধামিনার গলার তলায় পতন ও মূর্ছা।

পুলিস, ডাক্তার, লোক, হ্যাম্বুলেন্স কার, হাসপাতাল।

"হাত ভেঙেছে, একটা পাঁজরা ভেঙেছে।"

আমরা সকলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলুম—স্বস্তির, না দুঃখের, জানি না।

তিন দিনের পরে আমরা খবর পেলুম রোগীর জ্ঞান হয়েছে, ভয় নাই—আমরা ইচ্ছে করলে দেখা করতে পারি। কিন্তু ফল নিয়ে আমি আর প্রমথ হাসপাতালে গেলুম। "কি হে—এখন কেমন আছ?" আমরা ঘরে ঢুকে গলায় প্রশ্ন করলুম।

"এই যে—আসুন বসুন।" রোগী উত্তর দিলে।

আমি একটু বিস্মিত হলুম। মাখন তো আমাদের সঙ্গে এভাবে কথা কয় না। প্রমথ কিন্তু লক্ষ্য করেছে বলে মনে হ'ল না।

"বসছি।" প্রমথ বলে। "তারপর আর সব খবর কি?"

মাখন বলে—"আমি এখন বেশ ভালই ফীল্ করছি। এখানকার ডাক্তার এবং মার্শের ব্যবহার সত্যিই চমৎকার। রোগীর কষ্ট লাঘবের জন্য সর্ব্বদাই প্রাণপণ চেষ্টা করেন।"

—এই যে আজকাল এয়ারে স্পোর্টস্-এর কাগজের সঙ্গে ড্যাকসিডেন্ট ইন্সুরেন্স, অর্থাৎ বিপদহীনা দিচ্ছে এর উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। দৈনিক জীবনে, বিশেষতঃ স্পোর্টস্-এ ড্যাকসিডেন্টের সতত ভয়। এ ধরণের জিনিষের আমাদের দেশে বহুল প্রচলন হওয়া উচিত। আমাদের সকলের কর্ত্তব্য এ প্রচেষ্টাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সহানুভূতি করা। বিশেষ ক'রে যিনি এর আবিষ্কারক তিনি আমার ও সমগ্র বেঙ্গলীর ধন্যবাদের পাত্র। লিখেছেন?—

আমি ও প্রমথ দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলুম। আমরা খবর পেয়েছিলুম ও এখন সুস্থ, কিন্তু এ তো দেখছি সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত।

প্রমথ কাঁপাকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—"লিখেছি মানে?"

মাখন বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলে—"কেন? আপনারা কি কাগজের লোক ন'ন?"

"কাগজের লোক? কোন্ কাগজের?"

"স্পোর্টসের কাগজ। যারা আমার ইন্সিওরেন্সের টাকা দিচ্ছে।"

আবার আমরা দু'জনে দু'জনের দিকে চাইলুম। এ বলে কি?

উদ্বিগ্নভাবে প্রমথ জিজ্ঞেস করলে—"আমাকে চিনতে পারছ না? আমি যে প্রমথ।"

"প্রমথ—সে কে?" মাখন জিজ্ঞাসু চোখে আমাদের দিকে তাকালে।

তারপর বিদ্যুৎবেগে চিন্তা করে বলে—"হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন মনে এসেছে চিনতে পেরেছি বটে। তুমিই প্রমথ, না?"

প্রমথ বলে—"হ্যাঁ, আমিই তো। কি মনে হচ্ছে?"

আমি ঘাড় নেড়ে মানা দিলুম। কথা বলতে চেষ্টা করলুম, বেরোল না।

মাখন বলে—"বেশ বেশ দেখেছে। ডাক্তাররা বলে পুরোনো কথা কিছু কিছু পরিষ্কার মনে থাকবে, আবার কতক কতক একেবারেই থাকবে না।"

প্রমথ প্রায় কাঁদ কাঁদস্বরে জিজ্ঞেস করলে—"কিন্তু আমাদের চিনতে পারছ তো?"

"হ্যাঁ। তুমি প্রমথ আর ও নরেন।"

"নরেন নয় সত্যেন।" ব্যথিতকণ্ঠে আমি বলুম।

"হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যেন। ঠিক ঠিক সত্যেনই তো।" মাখন বলে।

সন্দেহ-দোলায় তখন আমার মন দুলছে।

ভীতকণ্ঠে প্রমথ প্রশ্ন করলে—"আর সেই স্পোর্টস্ কাগজের ইন্সিওরেন্সের কথা মনে আছে তো?"

"নিশ্চয়ই। থাকবে না! তারা আমায় টাকা দিচ্ছে।" মাখন উত্তর দিলে। অনেকটা স্বস্তির স্বরে প্রমথ জিজ্ঞেস করলে—"তুমি আমাদের টাকা ধরে তোমার নামে টাকা দিয়েছিলাম। তুমি ড্যাকসিডেন্ট করবে এই সর্ত্তে। পরে টাকা পাওয়া গেলে আমরা সকলে ভাগ করে নেব—"

প্রমথর কথা শেষ করা হ'ল না। মাখন বিস্ফারিতভাবে তার দিকে চেয়ে বলে—"এসব আবোল তাবোল কি বকছ! আমার তো এমন কোন কথা মনে পড়ছে না। আর ইণ্ডিয়েন্স কোম্পানীকে এমনভাবে ঠকাবার চেষ্টা যে দণ্ডবিধির আইনের কোঠায় পড়ে। আমি কখনই এ কথায় রাজী হতে পারি না।"

রাগে দুঃখে প্রমথর গলার স্বর প্রায় বন্ধ হয়ে এল। রুদ্ধকণ্ঠে বলে—"মাখন, তুমি কি-না শেষে আমাদের এমনি করে ডুবোবে। আমাদের কি কষ্টের পৈতৃক টাকা তো তুমি জান—"

কথা কেড়ে নিয়ে মাখন বলে—"কি বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, যদি এমন কোন সর্ত্ত হয়ে থাকে তার একটা লেখাপড়া নিশ্চয়ই আছে। কই সেটি?"

প্রমথর ধৈর্য্য শেষ হয়ে গেছে। "সেটা জোচ্চোর বিশ্বাসঘাতক!" বলে সেই চেঁচিয়েছে আর গোঁ গোঁ করতে করতে মাখন একেবারে শিবনেত্র। ডাক্তার, নার্স সব ছুটে এল। আমরা তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

প্রমথ আমার দিকে চাইলে, আমি প্রমথর দিকে চাইলুম।

... ...

সেই মাখন আজ দীপক নেই।

রামেশ্বরম্

ডক্টর শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

ভ্রমণ

'ত্রিচি'র পরেই আমাদের গন্তব্যস্থান হ'ল সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সেতুবন্ধ রামেশ্বর; মাদ্রাজে এ শুধু রামেশ্বরম্ বলেই পরিচিত। 'ত্রিচি' হতে রাত্রি প্রায় দশটায় আমাদের গাড়ী ছাড়লে। আমাদের একটি কামরার নীচেকার দুখানি বার্থ রিজার্ভ করা ছিল, আমরা তাই দখল ক'রে শুয়ে পড়লুম। বন্ধু চাটার্জ্জি আমাদের শোবার মত ব্যবস্থা করে দিয়ে অন্য কামরায় অপর দুই বন্ধুর কাছে চলে গেলেন। আমাদের কামরার উপরকার দুটি বার্থও 'রিজার্ভ' বলে টিকিট-আঁটা ছিল। প্রায় আধঘণ্টা পরেই একটা স্টেশনে ঐ বার্থগুলির মালিকেরা এসে হাজির হলেন। 'ত্রিচি' স্টেশনে প্রতীক্ষা-গৃহে আমাদের একটি ওদেশীয় ব্রাহ্মণ-দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল; অপরাহ্নে তাঁরা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা গাড়ীতে উঠে পড়েছিলেন। রাত সাড়ে দশটায় দেখি তাঁরাই-আবার আমাদের সহযাত্রী হতে ফিরে এসেছেন —সঙ্গে তাঁদের নয়-দশ বছরের ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে। এই মেয়েটি 'ত্রিচি'তে তাদের সঙ্গে ছিল না, পাশেই কোথায় কোন এক বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে; তাই বিকেল বেলা মা ও বাবা তার কাছে গিয়েছিলেন তাকে সঙ্গে করে নিতে রামেশ্বরম্-এর পথে। মেয়ের বাবা বল্লেন, মেয়েটির নাকি বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে, দু-তিন মাসের মধ্যেই বিয়ে হবে। আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম, এইটুকু মেয়ের বিয়ে! আইনেও ত আজকাল বাধে! ভদ্রলোকটি হেসে বল্লেন, "আইনকে ফাঁকি দেওয়ার অনেক উপায় আছে, তাতে কিছু যায় আসে না, বিশেষত যখন মনের মতন একটি সুপাত্র পাওয়া গ্যাছে, ইত্যাদি!" বুঝে কিছু বল্লুম না, কিন্তু দুঃখ

সমুদ্র স্নান—ধনুষ্কোডি

হ'ল, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যেই এরকম গতানুগতিক অতি সাধারণ মনোবৃত্তি দেখে। যাক্, ভদ্রমহিলাটি একটি বার্থে শুয়ে পড়লেন এবং অপর বার্থটিতে ছোট্ট মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে বাপও শুয়ে পড়লেন। ছোট দুখানি হাতে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে মেয়ের সে কি হাসি! বোর্ডিং-এ

থাকে, অনেক দিন মা-বাপের কাছে ছিল না, তাই এতদিন পরে বাপের বুকের উপর মাথাটি রেখে, তাকে জড়িয়ে নেয়ার কি আনন্দ, আমাদের তা বুঝতে বাকী রইল না। সুইচ্ টিপে বাতি নিবিয়ে আমরা আবার নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মন দিলুম।

অতি প্রত্যূষে তখনও রাতের অন্ধকার দূর হয় নি, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল রেলওয়ে কুলীর মুখে চীৎকার শুনে; বুঝতে পারলুম গাড়ী কোন একটা স্টেশনে এসে থামল। জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের আলোর একটা ক্ষীণ রশ্মি কামরার মধ্যে এসে পড়েছিল; হাত বাড়িয়ে তারই কাছে ঘড়িটা এনে দেখলুম সাড়ে চারটা বেজে গেছে! আর দশ পোনর মিনিটের মধ্যেই আমরা রামেশ্বর দ্বীপে যাবার যোজক রেলওয়ের উপর পৌছব। দশ বছর আগে কলম্বো যাওয়ার

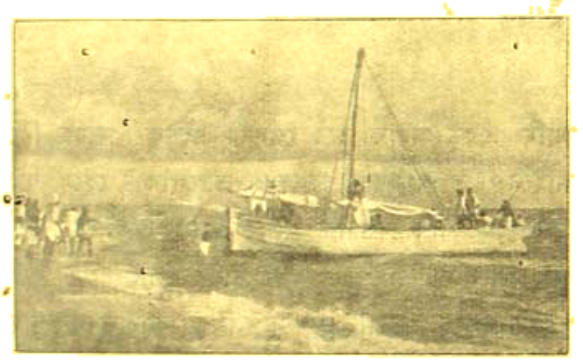

রামেশ্বর হতে ধনুষ্কোডি, যাত্রীবাহী নৌকা

পথে এই স্থানটি আমার চোখে খুবই ভাল লেগেছিল। তাই ছোট স্টেশনটি হতে গাড়ী ছাড়বামাত্র নিদ্রিতা পত্নীকে জাগিয়ে দিলুম ঐ স্থানটা দেখতে। প্রায় দশ মিনিট পরেই গাড়ী এসে পৌছল, সংযোজক সেতুটির উপরে। তখনও অন্ধকার ছিল, তবু দুপাশের জানালাগুলি দিলুম খুলে! ঘড়ঘড় শব্দে ট্রেন চলেছিল সংযোজক সেতুর উপর দিয়ে! সপত্নী আমি এবং কন্যাসহ ব্রাহ্মণ-সন্ততি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলুম শেষ রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে দুপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় নীলাম্বুরাশি! উপরে অসংখ্য তারকাখচিত অনাবৃত্তার সুনীল চন্দ্রাতপ, আর নীচেও সুনীলাম্বুরাশিতে প্রতিফলিত হচ্ছে আকাশের প্রতিচ্ছবি; সে এক অপূর্ব্ব মহিমময় দৃশ্য! অপলক দৃষ্টিতে আমরা দেখছিলুম প্রকৃতিরাণীর সেই অপরূপ বেশ, আর আমার মনে হচ্ছিল কবি নবীন সেনের 'রৈবতকে'র দুটি লাইন—

"নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,
মিশাইয়া পরস্পরে গাঢ় আলিঙ্গনে—"

বাস্তবিক দশ বছর পূর্ব্বে দিনের বেলায় একই দৃশ্য দেখেছি, তখনও ভাল লেগেছিল, কিন্তু এবারে যা দেখলুম তা সত্যই অপূর্ব্ব এবং অদ্ভুত! পুলটা যখন পার হয়ে গেল, তখন আমি পত্নীকে জিজ্ঞেস্ করলুম, "কেমন, দেখলে?"

পত্নী একটি কথায় তার উত্তর দিলেন, "চমৎকার!" আমারও মনে হ'ল, এই একটি কথা ছাড়া যেন আর কিছুতেই মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়।

মিনিট পাঁচ পরেই আমাদের গাড়ী এসে পৌছল পামবন্ জংশনে। এখানে রামেশ্বর-যাত্রীদের গাড়ী বদল করতে হয়, কেন-না আমাদের গাড়ীটা সোজা যাবে চলে 'ধনুষ্কোডি'তে, পাঁচমাইল দূরে। তীর্থকামীরা প্রথমেই যান ধনুষ্কোডিতে। সেখানে সমুদ্রস্নান করে, পিতৃপুরুষের তর্পণ প্রভৃতি করে, তবে তারা ফিরে যান রামেশ্বর দর্শনে। ধনুষ্কোডি হতে সিলোনের টালাইনানার-এর জাহাজ ছাড়ে। সুতরাং ধনুষ্কোডি, যেখান হতে শ্রীরামচন্দ্র ধনুকের সাহায্যে সমুদ্র শাসন ক'রেছিলেন, তা দশ বছর পূর্ব্বে বিলাত-যাত্রার পথেই আমার দেখা হয়েছিল। বন্ধুরা যখন শুনলেন যে, রামেশ্বরম্-এও সমুদ্র আছে, তখন স্থির করলেন যে ধনুষ্কোডিতে আর না গিয়েই রামেশ্বর-এই সমুদ্রস্নান করে মন্দিরদর্শনে যাবেন। রামেশ্বর-এই-প্রথম নাবার আর একটা কারণও ছিল। সেদিন সোমবার—অমাবস্যা, রামেশ্বর দর্শনের নাকি মহা পুণ্যসঞ্চয়ের দিন! তাই আমাদের গাড়ীর অসংখ্য যাত্রী সকলেই ধনুষ্কোডিতে স্নান করে মন্দিরে যাবে দেখে, ও বেলায় মন্দিরে অসংখ্য জনতা হবে এ স্থির নিশ্চয় জেনে, বন্ধুরা আগেই রামেশ্বর যাওয়া স্থির করলেন। ধনুষ্কোডি আমার পূর্ব্বেরই দেখা, সুতরাং আমিও তাদের মতেই মত দিলুম। কথা রইল, সন্ধ্যা হ'লে আমরা রামেশ্বর থেকে নৌকা ক'রে ধনুষ্কোডিতে যাব; আর হাওয়া অনুকূল হ'লে অনেকেই এভাবে রামেশ্বর থেকে

ধনুষ্‌কোডি যান। সুতরাং আমরা পাম্‌বন্ জংশনে নেমে রামেশ্বরম্-এর ছোট গাড়ীতে চাপলুম। আমাদের কামরার সহযাত্রীরা সমুদ্র স্নানের জন্য ধনুষ্‌কোডি রওয়ানা হলেন, সেই গাড়ীতেই। রামেশ্বরম্-এ যদিও তাঁদের সঙ্গে আমাদের আর দেখা হয় নি, তবু অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরবার পথে আবার তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল মাদুরার মীনাক্ষীর মন্দিরে।

পাম্‌বন্ থেকে রামেশ্বরম্ মোটে পাঁচ মাইল। গাড়ী খুব ধীরে ধীরে চলে বলে এটুকু পথ যেতে প্রায় আধঘণ্টা লাগে। আমরা ভোরে প্রায় সাড়ে ছ'টার সময় গিয়ে রামেশ্বরম্-এ পৌঁছলুম। অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনই পাণ্ডার ভীড়, তবে দু-চারজন হিন্দুস্থানী পাণ্ডাও দেখতে পেলুম। তা ছাড়া লক্ষ্য করে দেখলুম, গাড়ী হতে

রামেশ্বর মন্দিরের গোপুরম্ (প্রবেশ-দ্বার)

যে সকল তীর্থকামী যাত্রী রামেশ্বরম্-এ নামলে, তার বেশীর ভাগই উত্তরভারতবাসী। রাজপুতানা, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাব প্রভৃতি সুদূর স্থান হতে ভারতবর্ষের অপর প্রান্তে সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে আসার কৃচ্ছ্রসাধন সত্যিই খুব নিষ্ঠা ও ধর্মপ্রবণতার পরিচায়ক। গাড়ী হতে নামার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডার দল আমাদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল 'তীর্থ-কাকে'র মত। ডাক্তার মিত্র তাদের মধ্য হতে নধরকান্তি গৌরবর্ণ একজন হিন্দুস্থানী পাণ্ডাকে বেছে নিলেন; তখন অন্যেরা আপনা আপনি সরে দাঁড়াল। আমরা কোথায় আস্তানা নিতে পারি, ডাক্তার মিত্র পাণ্ডার কাছে তাই জিজ্ঞাসা করে একটা জৈন ধরমশালার ঠিকানা জেনে নিলেন। স্টেশনে অন্য কোন যানের ব্যবস্থা ছিল না, শুধু 'ঝেট্' অর্থাৎ ঝটকা গাড়ী ছাড়া, তাও আবার ঘোড়ার নয় গরুর। অগত্যা আমরা তারই দুখানি বন্দোবস্ত ক'রে মন্থরগতিতে চল্লুম 'রামেশ্বর'-এর বাধুকাপূর্ণ রাজপথের উপর দিয়ে গোরানের ভারী চাকা দুটির গভীর দাগ কেটে কেটে। দেখে অবাক্ হয়ে গেলুম, পথে অসংখ্য মাড়োয়ারীর ভীড়, তার মাঝে মেয়েদের সংখ্যাই অনেক বেশী।

আমরা প্রায় দেড় মাইল পথ অতিক্রম ক'রে এসে পৌঁছলুম ধরমশালার দ্বারে। এই সুদূর দক্ষিণ ভারতেও ধরমশালাটি একজন বিকানীর-বাসীর কীর্তি! কিন্তু ধরম-

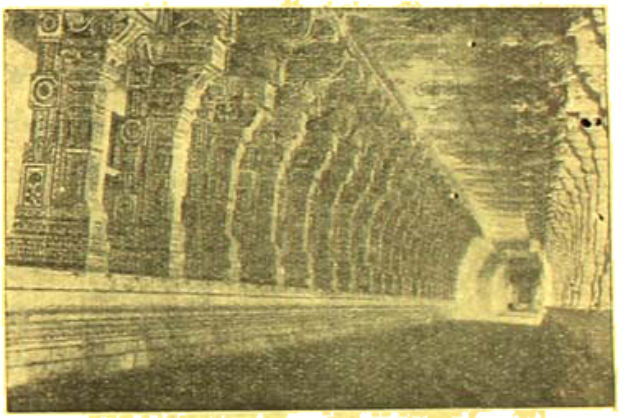

রামেশ্বর মন্দিরে কারুকার্যময় গুম্বজের অংশ

শালাটি দেখে আমরা খুসী হতে পারলুম না, কেন-না সেরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মোটেই নয়; তার উপর অসংখ্য ঘর খালি থাকা সত্ত্বেও পরিচালক কিছুতেই আমাদের একটি কামরা ছাড়া দুটি খুলে দিতে রাজী হ'ল না—তাও আবার এত ছোট, যে, আমাদের লট-বহরেই প্রায় অর্দ্ধেক ভরে উঠ্‌ল! তার উপর চারিদিকে অসংখ্য মাছি ভন্‌ভন্ করছে। শ্রীমতী প্রতিমা অপ্রসন্ন মুখে শুধু ছোট দুটি কথা উচ্চারণ করলেন "ছিঃ, ছিঃ!" চাটার্জ্জি তাড়াতাড়ি কৌশা থেকে ক' পেয়ালা কফি জোগাড় করে এনে একেবারে সকলের মুখের কাছে তুলে ধরলেন, "খেয়ে ফেল" বলে!

আমরা সকলেই এক-নিশ্বাসে তা গলাধঃকরণ করলুম, শুধু মিসেস্ পাল তা স্পর্শও করলেন না। ডাক্তার মিত্র ও নায়ক ইতিমধ্যে প্রাতঃকৃত্যের জন্য বাইরে গিছ্‌লেন, ফিরে এসে দুজনেই বলতে লাগলেন, "যত শীগ্‌গির সম্ভব এ স্থান ত্যাগ করাই সমীচীন।" কথা ছিল আমরা একদিন ওখানে থাকব, কিন্তু আমাদের সে প্ল্যান তখনই সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে বদলে গেল। তখন ভাবনা হ'ল, খাবার ব্যবস্থা কি করা যায়। যদিও রান্নার হাঁড়ি-কুড়ি পাওয়া যাবে ধরমশালায়, তবু রাঁধে কে? রান্নাবান্নায় মন দিলে মন্দির দর্শনে যেতে বেলা হয়ে যাবে, ততক্ষণে মন্দিরে লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌বে! 'দেখি কি করা যায়'

রামেশ্বর মন্দিরের স্বর্গদ্বার মন্দির চূড়া

বলে ডাক্তার মিত্র বাইরে চলে গেলেন এবং মিনিট কুড়ির মধ্যেই কোথা হতে একটি হিন্দুস্থানী বাবুর সংগ্রহ করে নিয়ে এসে হাজির হলেন; বল্লেন, "রাঁধুনী পাওয়া গেছে, এবার রান্নার জোগাড় করতে হবে। তার পরে আমরা যাব সমুদ্র-স্নানে।"

আমরা "বহুৎ আচ্ছা"; কিন্তু প্রতিমা গররাজি হয়ে বল্লেন, "তিনি সমুদ্রস্নান করতে যাবেন না, ধরমশালাতেই স্নান করে মন্দিরে পূজা দিতে যাবেন। তখন আমাদের চার বন্ধুর কার্য্যবিভাগ আপনা আপনি হয়ে গেল। ডাক্তার নায়ক গেলেন রান্নাঘর, বাসনবর্ত্তন প্রভৃতি ধুইয়ে পরিষ্কার করাতে, মিত্র গেলেন বন্ধুপত্নীর জন্য বাথ্‌রুম ও স্নানের জলের ব্যবস্থা করতে, চাটার্জ্জি গেলেন ডাল, চাল, তেল, ঘি, নুন কিনতে বাজারে, আর আমি চল্লুম টিফিন্-কেরিয়ারের বড় ঘটীটা হাতে করে দুধের সন্ধানে। একে ওকে জিজ্ঞেস করে প্রায় দুই ফার্লং দূরে একজন দুধ-ওয়ালীর বাড়ীতে পৌঁছে দুসের দুধ চাইলুম। মাদ্রাজের কোথাও সের দরে জিনিস পাওয়া যায় না, কিন্তু শুধু রামেশ্বরেই দেখলুম, সের হিসেবে পাওয়া যায়; তার কারণ বোধ হয়, হিন্দুস্থান থেকে প্রতি বৎসর অসংখ্য তীর্থযাত্রীর যাতায়াতের প্রভাবে। দুধওয়ালী বল্লে, দুধ ঘরে নেই, তবে একটু অপেক্ষা করলে গরু দুইয়ে দিতে পারে। আমি অগত্যা প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর দুধওয়ালী এসে আমাকে একটা ছোট-ঘরের ভিতর দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল একটা আম বাগানের মধ্যে। সেখানে দু-তিনটে ছোট গরু গাছের সঙ্গে বাঁধা; অদূরে, তাদের কচি বাছুরগুলি লাফালাফি করছে, মুখে দড়ির জাল আঁটা, যাতে ইচ্ছামত মার দুধ পান করতে না পারে। অদূরে একটি পাতকুয়া, তার চারিদিকে বসে আছে সাত-আটটি মেয়ে, কেউ বা ছাগ দুগ্ধছে, কেউ বা বাসন ধুচ্ছে, আবার কেউ বা কাপড় কাচছে। এই আম বাগানের মাঝে, এই কালো, ভারী গোট, টেনে সিঁটকে চুল বাঁধা আর লম্বা লম্বা ঝুলে পড়া কান দেখে মনে হচ্ছিল যেন এদের কোথায় দেখেছি! কিন্তু কোথায়! আমি ত পূর্ব্বে কখনও রামেশ্বরে আসি নি! তবে কোথায়! হঠাৎ আমার মনে পড়ল, কৃত্তিবাসী রামায়ণে অশোক বনে চেড়ীদল পরিবেষ্টিতা সীতার একখানা ছবি দেখেছিলুম, এই মেয়েদের হাবভাব, বেশভূষা, কেশ-বিন্যাস প্রভৃতি সবই হুবহু মিলে যাচ্ছে—রামায়ণের সেই ছবির সঙ্গে! তবে তফাৎ অশোক-বনের পরিবর্ত্তে আম্র-কানন, আর সীতার পরিবর্ত্তে দর্শক হিসাবে আমি স্বয়ং। অশোক বনের ত্রেতাযুগের দৃশ্যের একমাত্র দর্শক ছিল বীর হনুমান্। রামসেবকের সঙ্গে দেখা হ'লে ভেবে নিতুম এরাই তারা—অর্থাৎ তাদের বংশধরী কি না! দুধওয়ালী আপন মনে দুধ টেনে নিচ্ছিল গরুর বাঁট হতে, একটাকে দুইয়ে আর একটীর কাছে যাচ্ছে, এমন সময় আমার নজরে পড়ল, বাছুরের কাছেই উপবিষ্ট একটি নয় বছর দুয়ের শিশুর উপর, সে বসে আপন মনে

মলত্যাগ করছে, আর তার চারিপাশে মাছি ভন্‌ভন্ করছে। দেখামাত্র আমার গা কেমন ঘিন্‌ঘিন্ করতে লাগল, আমার আর সেখানে একমুহূর্তও দাঁড়াতে প্রবৃত্তি হ'ল না। হাত বাড়িয়ে বল্লুম, "যা হয়েছে দাও, আর চাই নে।" আমার তাড়ায় দুধওয়ালী ঘরের ভিতর দুধ এনে মেপে বল্লে, "দুধের হয়নি, কম হয়েছে।"

"যা হয়েছে তাই দাও।" বলে তাড়াতাড়ি ঘটীটা টেনে নিয়ে পয়সা ফেলে দিয়ে আমি বেরিয়ে এলুম সেই অশোক-বনের দৃশ্য হতে! ধরমশালায় ফিরে দেখি রান্নার জন্য রান্নাঘর ও বাসনবর্তন প্রস্তুত এবং বন্ধুর তদারকে প্রতিমার জন্য বাথরুম ও স্নানের জলও তৈরী। শুধু চাটার্জ্জি বাজার থেকে ফিরে এলেই হয়! প্রায় আধঘণ্টা পরেই চাটার্জ্জি মুটের মাথায় বাজার নিয়ে ফিরে এল; ভাল চাল, ঘী নুন, মশলা, তরীতরকারী, ঘাঠ, এমন কি দেশলাইটি পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নি।

দুমিনিটের মধ্যেই 'মেন্থ' তৈরী হয়ে গেল; ডাল, ভাত, আলুভাজা আর পেঁয়াজ ও বেগুনের ঘণ্ট। প্রবাসে, বিশেষত তীর্থ-ভ্রমণে তাই যথেষ্ট। ডাক্তার মিত্র পাচক ঠাকুরকে কিভাবে কি করতে হবে সব বুঝিয়ে দিলেন, আর বল্লেন ভাঙ্গা হিন্দীতে, "ভাত আমরা শক্ত খেতে পারি না, আচ্ছা করে 'গিলা' অর্থাৎ নরম করা চাই, আর যত স্টীম্ গির সম্ভব তৈরী করা চাই।"

তারপরেই প্রতিমা ডাক্তার মিত্রকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে গিয়ে স্নান করতে ঢুকলেন স্নানের ঘরে; আর আমরা চার বন্ধুতে চল্লুম সমুদ্র-স্নানে। সমুদ্র কোন্ দিকে জানি না, মন্দির কোনদিকে তাও জানি না, লোককে জিজ্ঞেস্ ক'রে ক'রে চল্লুম সমুদ্রের দিকে। খানিকক্ষণ পরেই এসে পৌছলুম মন্দিরের গোপুরম্-এ (প্রবেশ-দ্বারে); শুনলুম এবার মন্দিরের মধ্য দিয়েই সোজাসুজি গিয়ে পৌছতে হবে সাগরে। মন্দিরে প্রবেশ করেই দুধারে দোকান-পাটের সারি; ফুল, মালা, কলা, নারিকেল, শঙ্খ, শঙ্খের মালা, মন্দিরের ছবি ইত্যাদি কেনা-বেচা হচ্ছে। এগুলি পার হয়ে গিয়ে আমরা বাঁ দিকের চত্বরে পড়লুম। দু-পাশে নানা কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভের সারি, উপরে ছাদেও বড় বড় খিলানের উপর নানা রকম কাজ। দেখে স্পষ্টই মনে হ'ল, দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই সেতুবন্ধ রামেশ্বরের মন্দির! দু-পাশের স্তম্ভসারি যদিও সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত, তবুও মন্দিরের অপর প্রান্তে, মনে হয় যেন আর সমান্তরাল নেই, যেন দুইতে মিলিত হয়ে একটি কোণের সৃষ্টি করেছে, আর সেই কোণের মধ্য দিয়ে ও-পাশে যাবার পথ। এইভাবে আমরা প্রায় দুই ফার্লং পথ অতিক্রম ক'রে আসল মন্দিরটি ডান দিকে রেখে গিয়ে পৌছলুম অপর দিকে সমুদ্রের পথে। মন্দির থেকে বেরিয়ে আবার পথে চল্লুম, ছাই রং-এর বালুকারাশির উপর দিয়ে অদূর সমুদ্রের পানে। ক'মিনিটের মধ্যেই আমরা এসে দাঁড়ালুম বেলা তটে! ওঃ হরি! এই কি সমুদ্র, না আছে উত্তাল তরঙ্গ, না আছে ঢেউয়ের মাথায় রূপালী ফেনার মুকুট, না আছে জলের শব্দ! মনে একটা হতাশের ভাব এল, তবু স্নান ত করা চাই, ভেবে নামলুম জলে, আর সঙ্গে সঙ্গে পা বসে গেল বালুকামিশ্রিত কাদায়! সেই ঘোলাটে জলেই খানিক দূর এগিয়ে গেলুম; আশা ছিল পরে বোধ হয় ভাল জল পাব; কিন্তু সে আশায়ও ছাই পড়ল, কেন না, পেলুম পায়ের নীচে আগাছার জঙ্গল! সাঁতার কাটবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু লাভ হ'ল শুধু মুখের ভিতর এসে ঢুকল খানিকটা বিস্বাদ নোনা জল! ভাবলুম যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়; কোন রকমে দুটা ডুব দিয়েই কাদা ভেঙ্গে উঠে এলুম। বন্ধুরাও হৈ-চৈ ক'রে কোন রকমে 'কাক-স্নান' সেরে উঠে এলেন উপরে! ডাক্তার চাটার্জ্জি বল্লেন, এবার বুঝতে পেরেছি, কেন লোকেরা দূরকোটিতে স্নান ক'রে তবে রামেশ্বরে পুজো দিতে আসে! ডাক্তার নায়ক পুরীর লোক, সুতরাং এরকম সমুদ্র-স্নান করে তাঁর মুখের ভাবখানাই হয়েছিল সকলের চেয়ে বেশী শোচনীয়, না দেখলে তা বলে অথবা লিখে বুঝানো শক্ত! ডাক্তার মিত্র বল্লেন, "ভাগ্যিস্ মিসেস্ গুপ্ত আসেন নি!"

আমি বল্লুম, "আমাদেরও তার মতই সমুদ্র স্নানটা বাথ-রুমেই সেরে নিলে বোধ হয় ভাল হ'ত। যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি।"

আবার আমরা ফিরলুম মন্দিরের পথে! যেতে যেতে ডাক্তার মিত্র বল্লেন, "মন্দিরের মধ্যেই আসতে হবে জানলে, সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে আসতুম, একসঙ্গে পুজো শেষ ক'রে যাওয়া হ'ত!"

নায়ক বল্লেন "হাঁ, একসঙ্গে দু'কাজই হয়ে যেত!"

চাটার্জ্জি বল্লেন "কিন্তু বন্ধুপত্নীর যে আসা হ'ত না!"

নায়ক বল্লেন, "তাও ত বটে!"

আমি নির্ব্বাকভাবে তাদের কথা শুনে যাচ্ছিলুম। এমন সময় দেখা গেল আমাদের নংরকান্তি, গৌরবর্ণ পুরুত ঠাকুরটি সেদিকে আমাদেরই সন্ধানে আসছে। আমরা স্নান ক'রে ফিরে যাচ্ছি দেখে সে বল্লে, "আপনাদের স্নান হয়ে গেছে, তবে এখন পূজা দিতে মন্দিরে আসুন।" ডাক্তার মিত্র গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "আমরা টাকা পয়সা ত কিছু সঙ্গে আনি নি; পাণ্ডা ঠাকুর, আপনি যদি কিছু ধার দেন এখনকার মত, তবে পূজোটা সেরে নেই!"

কথাটা শুনে পাণ্ডা ঠাকুরের মুখের ভাবটা একেবারে অন্য রকমের হয়ে গেল, বল্লে "তা আপনারা ধরমশালায় গিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে আসুন, আমার একটু কাজ আছে, বড্ড তাড়াতাড়ি, আমি আসি তবে!" বলেই পাশ কাটিয়ে দ্রুতপদে পাণ্ডাঠাকুর অন্তর্ধান হলেন। আমরা চারজনে একেবারে হো হো ক'রে হেসে উঠলুম। ডাক্তার মিত্র বল্লেন, "বেটা কথাটা সত্যিই ভেবেছে, কোথায় দু-পয়সা লাভ করবে, তা না হয়ে 'উল্টা বুঝলি রাম' হয়ে গেল; যাত্রীরা আবার ধার চেয়ে বসল, বেচারা কোন রকমে পালিয়ে বাঁচল।" আমরা এবার মন্দির ডান দিকে রেখে ও পাশের চত্বর দিয়ে বেরিয়ে গেলুম। কথা হ'ল যদি ফিরে এসে শীগ্‌গির পূজা শেষ হয়ে যায়, তবে সেদিনের ইণ্ডো-সিলোন্ এক্সপ্রেসেই রামেশ্বর ছেড়ে যাবো, কারণ ওখানে থাকার কোন সুবিধাও নেই এবং সার্থকতাও নেই।

মিসেস্ পাল স্নান করে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, তিনি আমাদের সমুদ্র স্নানের বিড়ম্বনার কথা শুনে হেসেই খুন, আর বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলছিলেন, "ভালই করেছি আমি যাইনি, ও-ভাবে আমি কখনও চান্ করতে পারতুম না।" ততক্ষণে ডাক্তার মিত্র আবার গেলেন ঠাকুরকে "ভাত আচ্ছা করে গিলা করা চাই" বলতে! আর আমরা কুয়োর জলে কোন রকমে হাত মুখটা ধুয়ে সমুদ্র স্নানের দোষটা কাটিয়ে নিলুম এবং অনতিবিলম্বে আবার রওয়ানা হলুম মন্দিরের দিকে, তিন বন্ধু ও পত্নীসহ আমি! সেদিন রামেশ্বরের আকাশে মেঘ করেছিল এবং ক'মিনিট আগে ছোটখাটো এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিছলো, তাই আমাদের খুব গরম ভোগ করতে হয় নি সেখানে। এবারও আমরা আগের পথেই মন্দিরে ঢুকলুম, চাটার্জ্জি সকলের হয়ে কিছু ফুল মালা ইত্যাদি কিনে নিয়ে এলেন। এবার আমরা চারজনই মিসেস্ পালের গাইড। এটা দেখ, ওটা দেখুন, কী চমৎকার ইত্যাদি বলে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম আমরা আসল মন্দিরের দিকে! বাঁ দিকের চত্বরটা পার হয়ে ডানে মোড় নিয়ে খানিক এগিয়ে গিয়ে আমরা পৌঁছলুম রামেশ্বরের দ্বারে! এই মন্দিরটির চূড়া সোনার পাতে মোড়া, কারুকার্য্যও অতি চমৎকার, আমরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তার পানে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। তার পরেই আমরা খানিক এগিয়ে গিয়ে পৌঁছলুম মন্দির-প্রাঙ্গণে—সেখানে সোনালী ধ্বজস্তম্ভ অবস্থিত! এটি দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেক মন্দিরের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ! তার পরেই রামেশ্বর শিবের বাহন প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় প্রস্তর নির্ম্মিত ষাঁড়। আমরা তার পরেই গিয়ে পৌঁছলুম আসল মন্দিরের দ্বারে। তখন মন্দিরে একেবারে ভীড় ছিল না, সুতরাং আমাদের রামেশ্বর-শিবকে মনের মত দর্শনের কোন বাধাই ছিল না। পুরুত এগিয়ে এসে বল্লে, "পূজার টিকিট কোথায়?"

সে আবার কি? গাড়ীর টিকেট ত রামেশ্বর স্টেশনেই দিয়ে এসেছি! মন্দিরেও আবার টিকেট, এ কি?

পুরুত হেসে বল্লে, "রামেশ্বরের পূজার ভার একটি ট্রাস্ট নিয়েছেন, তারাই পূজার জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন। বাইরে কর্ম্মচারীর কাছে টিকেট পাওয়া যাবে কিনতে। সে নিয়ে এলে পূজো হবে, আর আপনাদের যার যা ইচ্ছা দর্শনী দেবেন ঐ সীল করা বাক্সের মধ্যে।" বলে দুটা প্রকাণ্ড তালাবন্ধ সীল-করা বাক্স দেখিয়ে দিলে। পাণ্ডাদের অত্যাচার হতে যাত্রীদের রক্ষা করতে ব্যবস্থাটা ভাল বলেই মনে হ'ল। আমি তখন পত্নী ও বন্ধুদের সেখানে রেখে পূজার টিকিট কাটতে গেলুম বাইরে, আর একজন লোককে পয়সা দিলুম পূজার জন্য কিছু ফলমূল কিনে আনতে। নগদ সওয়া পাঁচ আনা মূল্যের চারখানি টিকেট কেটে আমি ফিরে এলুম, তখন আমাদের পূজা আরম্ভ হ'ল এক একজনের করে। পুরুত এক একবার অবোধ্য ভাষায় বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে, তারপর পঞ্চপ্রদীপ জেলে আরতি করে, আর এসে নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করে। নাম ও গোত্র বার কয় উচ্চারণ করে ঠিক করে নিয়ে আবার যায়

ও পূজা শেষ করতে। এমনই করে প্রথম আমাদের, তৎপর ডাক্তার নায়কের পূজা শেষ হ'ল! তারপর পূজার সময় চাটার্জ্জিকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বল্লুম পূজা হবে মিসেস্ চাটার্জ্জির নামে। পুরুত কথাটা ঠিক বুঝতে পেরে হেসে বল্লে "শৈলেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, তস্য ধর্ম্মপত্নী—" আমি শৈলেনকে খোঁচা দিয়ে বল্লুম নামটা বলে দাও। একগাল হেসে বন্ধু "শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী"র নাম উল্লেখ করলেন। বলা বাহুল্য, শৈলেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ও তস্য পত্নীর সংযুক্ত নামেই পূজা শেষ হ'ল! ডাক্তার মিত্র নিজের পিতার নামেই পূজা দিলেন। পূজা শেষ করে আমরা যার যা ইচ্ছা দর্শনী বাক্সের মধ্যে ফেলে দিলুম। তার পরেই আমরা গিয়ে প্রণাম করলুম রামেশ্বর শিবের স্থাপয়িতা ভগবতার শ্রীরামচন্দ্রকে। কথিত আছে রাবণ-বধের পর রাবণের ইষ্টদেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের বিগ্রহকে লঙ্কা হতে নিয়ে এসে তিনিই এখানে স্থাপন করেন, এজন্যই এখানকার ঠাকুরের নাম রামেশ্বর। এখান হতেই সেতুবন্ধের আরম্ভ হয়েছিল, সেজন্য দুটি নামযুক্ত করে বলা হয় সেতুবন্ধ রামেশ্বর। শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণময় মূর্ত্তির কাছেই সীতা ও লক্ষ্মণের স্বর্ণমূর্ত্তি, সম্মুখেই উপবিষ্ট ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান। আমরা ভক্তিভরে তাদের কাছে মস্তক নত করে এবং তৎপরে পার্শ্ববর্ত্তী দেবী অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসছি, তখন পুরুত ঠাকুর ও সেখানে উপস্থিত আরও ক'জন নিজের মূর্ত্তি ধরলে, অর্থাৎ "আমাদের দাও।" বুঝতে পারলুম ট্রাষ্ট্ এত করেও পাণ্ডাদের সংযত করতে পারেন নি। আমরা যা হোক কিছু দিয়ে তাড়াতাড়িতে বেরিয়ে গেলুম।

আমাদের গাড়ীর সময় নিকটবর্ত্তী, তাই যত শীগ্‌গির সম্ভব মন্দির-পরিক্রমা শেষ করে গোপুরম্-এর কাছে পৌছাতেই প্রতিমা বল্লেন, "শঙ্খ কিন্‌বো!" বন্ধুরা একটু বিরক্তিসহকারেই মত দিলেন, তখন আমরাও কিছু কিছু কিন্‌লুম, ওরাও বাদ গেলেন না, আমাদের প্রায় আধঘণ্টা দেরী হয়ে গেল সেখানে। ফলে আমাদের ছুটতে হ'ল! উর্দ্ধশ্বাসে ধরমশালায় পৌছে, কেউ বা লাগলেন কসে পোটলা-পুটলি গুছোতে, কেউ বা ঝটকা ডাকতে, আর কেউ বা খাবারের ব্যবস্থা কতদূর হয়েছে দেখতে। তখন আর খাবার সময় ছিল না, আমি বল্লুম, "খাবার টিফিন্ কেরিয়ারে উঠিয়ে নিয়ে যাব, গাড়ীতেই বসে খাব!" বন্ধুরাও তাতে মত করলেন, আমি তখন উনোনের কাছ থেকে ঠাকুরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই দুটি টিফিন কেরিয়ারে পুরে নিলুম যা হয়েছে তাই। কি হয়েছে আর কি হয় নি, দেখবার সময় মোটেই ছিল না, কারণ গাড়ী ছাড়বার আর মোটে আধঘণ্টা দেরী! এ'রকম হৈ চৈ করেই আমাদের মোট বোঝা সব চাপানো হ'ল ঝটকার উপর; আর আমরাও দেবাদিদেব রামেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করে ধরমশালা ছেড়ে রওয়ানা হলুম রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে।

হেমন্ত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

কুয়াসা জালে পড়েছে বাঁধা সকলি
রাতের তারা আকাশে উঠে বিকলি,
অরুণ আলো ফোটে না আর উষাতে
প্রকৃতিরাণী সাজে না ফুল ভূষাতে।
ঘাসের পরে মতির মালা ছড়ানো
জগৎ আজি কুহেলি জালে জড়ানো।

কাক ডাকে কা কা

শ্রীঅমিয়ভূষণ গুপ্ত

পুরো তিনটি মাসও হয়নি নিখিল এই নতুন ভাড়াটে বাড়ীতে উঠে এসেছে, এরই মধ্যে তা'র দ্বী প্রভারাণী হ'য়ে উঠলো পুরোদস্তুর অতিষ্ঠ !

আগের বাড়ীটাতে অসুবিধা ছিল বিস্তর। উত্তরমুখো, সাঁৎসেঁতে, ঘুপসি ! নতুন বাড়ীতে এসে অবধি নিখিল যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচছিল।

এ বাড়ীটাতে কুটুরীর সংখ্যা কম, অথচ ভাড়া দু'টাকা বেশী। বস্তিপাড়া অধিক হ'লেও বস্তিপাড়া ছিল যা'-হোক কিছু খোলা, পুবের রোদের খবরটুকও পাওয়া যেত কিছু-কিছু, আবার বাড়ীর মধ্যে ছোট একখানি উঠোনের অস্তিত্বও ছিল ! বেশী ভাড়া দিয়েও নিখিল খুশীই হ'য়েছিল বলতে হবে।

কিন্তু এত সব সুখসুবিধা সত্ত্বেও, সেদিন সকাল বেলা চা দিতে এসে প্রভারাণী সরোষে নিখিলকে জানিয়ে দিলে, এ বাড়ীতে তার টিকৃটিকে—সার হ'য়ে উঠেছে, ইস্‌পিরই আর একখানা বাড়ী না দেখলেই নয় !

নিখিল প্রথমত কথাটা গায়েই মাখল না। বিবাহিত জীবনের এই দশটি চার বছর ধ'রে, প্রভার কত কথাই তো সে ওরকম শুনে আসছে !

চাটা বেশ সরস পলাতেই জিজ্ঞাসা করলে : আজ বুঝি চায়ের নতুন প্যাকেটটা খোলা হয়েছে ? তাই কিন্তু···

উত্তেজিতা প্রভা বাধা দিয়ে বিরক্তভাবে জবাব দিলে : না, পুরণো চা-ই খানিকটা ছিলো। কিন্তু আমি যা বলছুম সেটা শোনা হ'ল কিছু ?

নিখিল গম্ভীর মেরে ব'লে ফেলল : নিশ্চয়ই ! কি হয়েছে বল ! ব'লে, চায়ের কাপ, মুখে তুলল।

প্রভা পুনশ্চ তার বক্তব্যটা বেশ স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবেই নিখিলকে অবগত করিয়ে দিলে, নতুন বাড়ী দেখতে হ'বে।

হাতের কাপটিকে ঠোঁটের কাছাকাছি নিয়েও নিখিল সেটাকে নামিয়ে আনল। তারপর প্রভার মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করলে : অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ মানে ? অসহিষ্ণুকণ্ঠে প্রভার প্রশ্ন হ'ল।

—কিসে এমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে !

প্রভা তার অভিযোগ এবং কারণাদি সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে ফেলল। শুনে, নিখিল উঠল হা-হা ক'রে হেসে : এই কারণ ! আমি ভাবলুম না জানি কি ! একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি !

নির্লিপ্ত মনে নিখিল চায়ের বাকী অংশ গ্রহণ করতে লাগল, দৃষ্টি সহযোগে।

প্রভা যেন আরও চ'টে। বললে : তুমি তো হাসবেই ! টের তো আর পেতে হয় না নিজের কিছু ! আমি অতশত বুঝি না, হয় এর একটা বিহিত কর, নয় তো এ বাড়ী বদলাও ! আমার আর এ সহ্য হয় না !

নিখিল কিন্তু তেমনি হাসতেই লাগল।

বললে : আরে, এতে আর কি হয়েছে, তোমায় ত আর খেয়ে ফেলছে না ! একটু স'য়ে থাকলেই হ'ল ! এর জন্যে বাড়ী বদলানো—লোকে শুনলে হাসবে যে !

হাসতে গিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে প্রভা ব'ললে : তারা হাসল তো আমার তারা ব'য়েই গেল ! দুঃখটি জানবার বেলায় সবাই গেছেনকিনা !

নিখিল কথাটা উড়িয়ে দেবার ইচ্ছায় তাড়াতাড়ি বললে : আচ্ছা আচ্ছা, বেশ ক'রে ভাড়া ক'ষে নিলেই যেখানে পালাবার, তার পথ পাবে না ! ব'লে চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

প্রভা তবু বললে : ধ্যা, তাড়ালে যাবে কি-না ! ওসব ঢের ক'রে দেখেছি এতদিন ধ'রে, ওতে কিছু হবে না !

নিখিল কৃত্রিম বিস্ময়ে ব'লে উঠল : বল কি, তাড়ালেও যায় না, ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে ! এতখানি ব'য়ে গেছে, এ তো বড় ভয়ানক কথা !

প্রভা মুখভারি ক'রে বললে : যাও যাও, সব সময়ে ঠাট্টা ভাল লাগে না। এই আমার ব'লে দিচ্ছি, এর একটা কিছু না করলে, দাদা আসছে ক'দিন বাদে, আমি তার সাথেই এখান থেকে চ'লে যাব !

ব'লে আঁচল দুলে, চাবির গোছাটি ঝনাৎ ক'রে পিঠের উপর ফেলে প্রভা পলায়নোদ্যতা হ'ল।

নিখিল অকস্মাৎ যেন সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব এক নিমেষেই উপলব্ধি ক'রে ফেলল। ব্যস্ত হ'য়ে বললে : তবে যা'-হোক একটা কিছু যাঁহা নিস্কই করতে হবে !

প্রভা একটু দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলে : কি করবে, শুনি ?

শেষ চুমুক দিয়ে চায়ের শূন্য কাপটা প্রভার দিকে এগিয়ে ধ'রে নিখিল বললে : আহা, তা কি অমন চট্ ক'রে বলা যায় ! ভাবতে হবে, তবে না ! যাক্, এখন দয়া ক'রে আর এক কাপ, চা দিয়ে এসো তো, লক্ষ্মীটি ! চা খেতে খেতে ভাবি !

প্রভা খালি-কাপটা নিয়ে ঘর থেকে চ'লে গেল।

তা অতিষ্ঠ হবারই কথা।

সেই ভোর বেলা, যখন চারদিক ভাল ক'রে ফর্সাও হয় না, তখন

থেকে যতক্ষণ না অন্ধকার ঘোর হবে, প্রভার একটা চোখ, একটা কান সব সময়ে সতর্ক ক'রে রাখতে হয়, কখন কি ঘটে যায়! তবু কি পারা যায়!

সারা পৃথিবীতে যেন ওই একটিই কাক, আর সেটা মরেছে এসে এই বাড়ীতে, শুধু প্রভারাণীকে জানিয়ে যেতে। সারা বিশ্বে বাড়ীও যেন আর কোথাও নেই!

ওর স্বামীটির আর দু-একটা যে ক্বচিৎ কদাচিৎ না আসে এমন নয়, তবে তারা ওর সাদাটেই হোক্, অন্য কোনও কারণেই হোক্, আসে আধার চ'লে যায়। কিন্তু 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য'-ভাব নিয়ে উনি যেন এ বাড়ীতে একজন সম্রাট! চকল, ক্ষিপ্র ওর গতি, সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত, সতর্ক ভাব। নন্দ চাকরটাও ওর সাথে এঁটে উঠতে পারে না, বাড়ীয়ালও এঁটে নি!

নিখিলের রান্নাঘরের পুবদিকটা সেরেই একটা নিশ্চিন্তে ওর রাতের আশ্রয় এক্ষুণি বিলম্বকালীন নিরাপদ দুর্গ। আর, সারাটা দিন সে তো নিখিলের পরিবারেরই বিশিষ্ট একজন!

বাড়ীর লোকের ঘুম ভাঙবার বহুপূর্ব্বেই ওর ঘুম-ভাঙে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই প্রভা তা টের পায়, ওর পরিচিত, তীক্ষ্ণ ডাক শুনে। তারপর প্রভা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তখন ও নিশ্চয় ব'সে আছে রান্নাঘরের আল্‌নিতে, নয় তো খিড়কি দরজাটার উপর, নয় তো আর কোথাও।

প্রভাকে দেখেই কঠস্বর যথাসাধ্য খোলায়েম ক'রে দু-চারটে ডাক দেয়, যেন বলে: এসুম!

প্রভাও চোখ পাকিয়ে বলে: এলে? বেশ!

সেই থেকে সুরু হয় ওর দৈনন্দিন উৎপাত আর অত্যাচার!

অত্যাচার বই কি!

এঁটো-কাঁটা ছড়িয়ে বাড়ীময় করা যেন ওর একটা মস্ত কাজ। শেষটায় খোবায় ছড়িয়ে হয়রাণ হতে হয় প্রভারাণীকে। নন্দ চিল ছুঁড়ে মারে, ওর গায়ে লাগে না, টুপ্ ক'রে লাফিয়ে স'রে যায়।

বাইরে কোথাও একটি জিনিষ রাখবে, তা'র জো কি! খাবার বস্তু হ'লে তো কথাই নেই, অখাদ্য জিনিষগুলোতে অবধি ঠোক্ মেরে দেখবেই একবার! আর, নিয়ে পালিয়ে যাবার মত পদার্থ হ'লে কাকেও তা করতে একতিল বিলম্ব হয় না। একটু অসতর্ক হয়েছে কি একটা কিছু ঘটে যাবেই!

প্রভা চ্যাঁচাতে থাকে: কি অলুক্ষুণে যাযাতে কাক রে বাবা! কোত্থেকে এ জুটুণ্ডী এসে জুর করেছে, একবণ্ড যদি নিশ্চিন্ত হ'তে দেবে! হুস্, হুস্!

জুটুণ্ডী উড়ে গিয়ে বসে ওদিককার বাঁশটার মাথায়। ব'সে প্রভার কথাগুলো শোনে। অতঃপর, প্রভা যখন একখানা কাঠ উঁচিয়ে এগিয়ে যায়, তখন ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় একেবারে নিমগাছের ডালে। সেখান থেকে মাথা হেলিয়ে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে, অতঃপর প্রভারাণী কি করে।

খানিকবাদে আবার চারিদিক একটু ঠাণ্ডা হ'তেই নিঃশব্দে নেবে এসে এখানে ওখানে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে থাকে। প্রভাও আবার বেরিয়ে এসে তাড়াহুড়ো আরম্ভ ক'রে দেয়।

নিখিলের মাইনে বেশী নয়; অথচ তা'তে ঘিরেই সংসার চালাতে হয়।

প্রভা নিজেই রান্না করে, গৃহস্থালী কাজকর্ম ছাড়াও। চার টাকা মাইনেতে ছোকরা চাকর নন্দকে রাখা হয়েছে, নইলে সত্যিই চলে না।

সকালবেলা নন্দ উনুন ধরিয়ে দিলে। প্রভা কেৎলি ক'রে চায়ের জল চাপিয়ে নন্দকে ডেকে বললে: যা তো নন্দ, চট্ ক'রে চার পয়সার মাখন নিয়ে আয় তো!

নন্দ পয়সা নিয়ে বেরিয়ে গেল, প্রভাও এদিকে চায়ের সরঞ্জামগুলা গুছিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় বসল।...

নন্দ যতক্ষণ না ফিরে আসে, তারই মধ্যে পাউরুটিখানি স্লাইস্ ক'রে সেঁকে ফেলবে, জলও ততক্ষণে ফুটে যাবে।

প্রভারাণী রুটির বুকে ছুরি চালাতে লাগল।

কয়েকখানা স্লাইস্ কাটা হয়েছে, এমনি সময়ে জল ফুটে উনুনে উথলে পড়বার শব্দে প্রভা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। যাবার আগে, চকিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বেশ ক'রে চারিদিকটা একবার দেখে নিল, জুটুণ্ডী কাছাকাছি কোথাও আছে কি-না।

নেই। থাক্।

আর, ঘর থেকে কেৎলিটা নিয়ে আসবে, এইটুকু তো সময়!

রান্নাঘরে ঢুকে গরম হাতলটা আঁচল দিয়ে ধরে ক'রে কেৎলিটা সরে উনুন থেকে তুলেছে, ঠিক সেই সময়ে বাইরে একটা ছুটোছুটি শব্দ এবং তারই সাথে নন্দর সতর্ক চীৎকার: নিলে যা, নিলে!...ঐ যাঃ, নিয়েছে! হুস্ হুস্!

আচম্বকা খোলমালে প্রভা উঠল চম্‌কে, খানিকটা গরমজলই ছল্‌কে পড়ল এসে তা'র পায়ের উপর। যন্ত্রণায় মুখখানি কুঞ্চিত ক'রে বাইরে এসে দেখে, আর কিছুই নয়, জুটুণ্ডী এক স্লাইস্ রুটি নিয়ে পালিয়েছে। নন্দ ঠিক সময়ে এসে না পড়লে, হয় তো আরও নিত!

একে পায়ের যন্ত্রণা, তার উপর এই কাণ্ড, প্রভা ভেঙে পড়ে। কেৎলিটা ঠুস্ ক'রে মেঝের রেখে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল: মরণ হয়েছে আমার! মুখপোড়ার জ্বালায় জলে পুড়ে ম'রলুম! কাক তো নয়, যেন রাক্ষস! একটু যদি নিশ্বাস ফেলতে পারবো! মরতে ওর কি আর রাজ্যও নেই ইত্যাদি।

সাথে গজ্‌গজ্ করতে করতে গরম জলে চা ছেড়ে রুটি সেঁকতে প্রভা আবার ঘরে ঢুকল। এবার নন্দকে বসিয়ে রেখে গেল বারান্দায়।

কিন্তু এ রকম ক'রে পোষারা দিয়ে কতক্ষণই বা চালানো যায়, ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে!

সুতরাং নিখিলকে চা দিতে গিয়ে প্রভারাণী যে উষ্মাপ্রকাশ ক'রে ফেলে, সেটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়!

এমনি খুঁটিনাটি কত না উৎপাত!

বাজার থেকে বাড় নিয়ে এসে নন্দ কুটতে বসেছে, একটু অন্যমনস্ক হলে আর রক্ষে নেই, নিশ্চই যাবে তার থেকে অন্তত একটা। কোথায় যে সুযোগের অপেক্ষায় লুকিয়ে ব'সে থাকে, আগে তা কিছুতেই টের পাওয়া যায় না। তারপর, হৈ চৈ লেগে গেলে সোজা পুবদিকের সেই নিমগাছে, পাড়ার পশ্চিমদিকের আমড়া গাছটায় উঁচুডালে।

প্রভাই বা তার কি করবে, নন্দই বা কি করবে!

এটায় মুখ দিচ্ছে, ওটায় ঠোঁট লাগাচ্ছে, কামড়াচ্ছে পর্যন্ত। আবার চোরের মত রান্নাঘরে গিয়েও ঢুকেছে কতদিন, শেষটায় তাড়া খেয়ে পালাতে হয়েছে!

বৃষ্টিকে এড়াতেও না কিন্তু। কোথায় প্রভা তার চুলের কাঁটা কিরে রেখে দিয়েছে, ও তা খোঁজ ক'রে বের করবে। নিখিল হয় তো ভুলে তার পাইপ-পুরুলটা বাইরে রেখে গেছে, সেটাকে একবার নাড়াচাড়া করতেই হবে। নন্দ তার বিড়িটা কোথায় গুঁজে রাখল, বেহারা সে সন্ধান অবধি রাখবে। তা ছাড়া, এঁটো আবর্জনা সোয়া সেঁটে দেই মুদ ঘটির জলে, বালতির জলে নিখিল ডোবাচ্ছে, কোনও বাছবিচার নেই! তাড়া দাও, গালমন্দ কর লজ্জা ব'লে বস্তু ওর আছে কি না!

মাঝে মাঝে প্রভা ওকে রীতিমত হাসিয়ে!

জানলা চাপিয়ে সে হাত ঘুচ্ছে, এমনি সময়ে কিসের শব্দ হ'ল, বাইরে বারান্দায়। প্রভা এল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে।

এসে দেখে, ঝুনুণ্ডী চায়ের একটা খালি কাপ্ নিয়ে টানাটানি করছে, তারই শব্দ। প্রভাকে দেখতে পেয়েই সেটা ফেলে দিলে চৌচাপ্টে!

বারান্দার ঠিক নীচেই খানিকটা জায়গা ছিল পানি-বাগানো। কাপ্‌টা ধাক্কা খেয়ে ছিট্‌কে পড়ল গিয়ে সেইখানে। সুতরাং সেটা যে সম্বন্ধে চুমুরার হ'য়ে ভেঙে গেল, সেটা অস্বাভাবিক কিছুই হ'ল না।

খানিক স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রভা ডাকল: নন্দ!

নন্দ তখন বাড়ীতে ছিল না, বাড়ি-বাসনগুলো ধুয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেখে এইমাত্র নিখিলের সিগারেট আনতে গেছে।

প্রভা দাঁড়িয়ে ফুলতে লাগল।

একটু বাদেই নন্দ এল ফিরে। তাকে দেখতে পেয়েই প্রভা উঠল চেঁচিয়ে: কোথায় গেছলি তুই, হতভাগা পাজি!

নন্দ ব্যাপার কি, কিছুই জানে না। প্রভার মেজাজ দেখে হতভম্ব হ'য়ে সে বেচারা জবাব দিলে: বাবু পাঠিয়েছিলেন সিগারেট আনতে।

প্রভা উগ্রকণ্ঠে বললে: যাবার আগে বাসনগুলো ঘরে রেখে যেতে কি হাত ক'রে গেছল? ওটার দাম এখন কে দেয়, শুনি!

ব'লে আঙুল দিয়ে কাপ্-এর ভাঙা টুকরোগুলো দেখিয়ে দিলে। একবার মনে করলে, নিখিলকেও ডেকে দেখায়।

নন্দ এতক্ষণে বুঝল, ব্যাপার কি। বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে: কি ক'রে ভাঙলো, মা! এমনি তো রেখে গেলুম?

প্রভা উত্তেজনায় পরিশ্রান্ত হ'য়ে তিক্ত গলায় বললে: আর পারিনে বাপু, তোরা সব হয়েছিস্ সমান, আমার হাড়, জ্বালা-জ্বালা হ'য়ে গেলো!

একটু চুপ ক'রেই আবার বললে: তোরই বা আক্কেলখানা কি, ওগুলো রেখে গেলি বাইরে! জানিস্নে কি ভাকাত ঐ বাড়ীতে আছে!

নন্দ এবার সবই বুঝতে পারল। কারণ, প্রভারাণী ও বিশেষ বিশেষণটি শুধু একটি জীবের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করত এবং নন্দও তা জানত। তাই সে ব'লে: ও, সেই কাকটা? আচ্ছা, বাবুর সিগারেট দিয়ে আসি, আজ দেখাচ্ছি ওকে।

এবম্বিধ আস্ফালন এবং প্রতিজ্ঞা নন্দ হামেশাই ক'রে থাকে, কিন্তু ঝুনুণ্ডীর কিছুই সে ক'রে উঠতে পারে না। আজও তার বেশী কিছুই যে হ'ল না, একথা বলাই বাহুল্য। তার অশেষ চেষ্টা বিফল ক'রে, ঝুনুণ্ডী নানাপ্রকার নিরাপদ জায়গায় ব'সে সস্পিত এবং সতর্কভাবে ঘিলি নাড়তেই লাগল। কাপ্‌টা ভাঙবার পর ওর সম্বন্ধেই একটা যে আলোচনা হয়েছে, সেটা সম্ভবত ওর মনের এড়ায়নি এবং তার পর থেকে নন্দর পরিবিধির তাবৎকাজও হয়তো বা নেহাৎ বন্ধুজনোচিত নয় ব'লে বুঝতে পেরেছিল কতকটা। তাই তার নাগাল পাওয়া নন্দর সাধ্যই হ'ল না।...

দুপুর বেলা ঘেরে ঘেরে প্রভা ঘুরেছে। নিখিল অফিস। নন্দও কাজকর্ম সেরে নিয়ে বাইরের ঘরটাতে একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিচ্ছে।

হঠাৎ রান্নাঘরের দিক থেকে শব্দ এল, ঠন্‌ঠন্‌ঠনাৎ!

নন্দ উঠল লাফিয়ে, প্রভাও শশব্যস্তে বাইরে এল ছুটে।

কি হ'ল রে, ভাখ, তো নন্দ! নন্দকে ঠেকে প্রভা বললে।

নন্দ দেখল, ভাঙা বালতিটা বাইরে বারান্দায় ছিল, সেটা নীচের পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর কাকটা বারান্দা থেকে, তাদের দেখেই দিলে ছুট। কাজটি যে কার কৃত, সে কথা জলের মতই পরিষ্কার হ'য়ে গেল।

প্রভা চাপারাগে বললে: নন্দ, তুলে রাখ বালতিটা। দুপুরবেলা একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে যে শোব, তারও কি যো আছে ছাড়হাবাতের জ্বালায়! ও বালতিটার কি এমন মাসোহারা ছিল যে ওটা নিয়ে লাগতে এসেছিল!

বালতিটা তুলে রেখে নন্দ বললে : কিছু না। কাজ তো নেই, তাই ক'রে বসল একটা ! বেহদ্দ পাজী !

ব'লেই, অকস্মাৎ চোখ কপালে তুলে গলায় স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল : এ যে একখানা হাড় দেখছি কিসের ! রাম রাম ! এ নিশ্চয়ই ওই লচ্ছারের কাজ, মা ! কোত্থেকে এনে এই বারান্দায় ফেলেছে !

প্রভা এগিয়ে এল।

বললে : কিসের হাড় রে ! ফেলে দে, ফেলে দে, শীগ্‌গির ! নাঃ, আর পারলুম না ! যা, এইবার খানিকটা গোবর নিয়ে আয়।

মোটের উপর, পৃথিবী এবং তৃতীয় উভয়ের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামসুখে অন্তত আধটি ঘণ্টা ব্যাঘাত জন্মিয়ে তৃণ্ডী সেই নিমগাছে তার বারান্দাইতে গিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে হ'য়ে ব'সে থাকল, পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায়।

অষ্টপ্রহর চলছে এইরকম। যখন আর কোনও কাজ থাকে না, তখনও প্রভাবতীকে বিব্রত ক'রে তুলবার মত কাজের অভাব তৃণ্ডীর হয় না। যেমন—

কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছে, সে হয়তো এসে অযথা সেখানা ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়তে লেগে গেল। একপাশে ছিল একটা লঙ্কাগাছ তারই পাকা পাকা লঙ্কাগুলো এসে রাক্ষসের মত হয়তো বা গিলতে লাগল, নয়তো গাছের ডালগুলোকে মট্ মট্ ক'রে লাগল ভাঙতে ! পেঁপে গাছটায় তার অত্যাচারে পেঁপে থাকে না একটাও। আর যদি কিছু না পায়ে, তো এসে ঝাঁটার কাঠিগুলো খামকা পটাপট টুকরো করতে লেগে যাবে ! এমনি সব।

এর উপর, তার সেই চীৎকার, যখন তাকে বাড়ী শুদ্ধ সকলের কাছে বেত খাওয়ানো হ'য়ে। আবার, তারই মাঝে যখন কণ্ঠস্বরে একটা গদ্‌গদভাব এনে দু'লে দু'লে সে ডাকতে সুরু ক'রে দিত, প্রভা তার রকম দেখে, রাগতে গিয়ে কেবল হেসে। ব'লত : আহা, কি চং !

কিন্তু সে যা হোক্, এই নিয়ে প্রভার অভিযোগ ক্রমশই বেড়ে চলল, নিখিলের কাছে। সে বেচারা অবশেষে নিরুপায় হ'য়ে সত্যিই বাড়ী খুঁজতে গেলে গেল।

এরই কদিন বাদে প্রভার দাদা সুকুমার এল বোনের বাড়ী বেড়াতে। দু-চার দিন থেকে আবার ফিরে যাবে। এই মর্মে প্রভার কাছে সে চিঠিও দিয়েছিল আগে একখানা।

তার আগমনে বাড়ীতে কাজকর্ম এবং খাওয়া-খাওয়ার বহরটা স্বভাবতই গেল কিছু বেড়ে। তৃণ্ডীও যে সেই সাথে অধিকতর ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ল, একথাটাও নিঃসংশয়ে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

শুরুতরের মাঝে, দাদার কাছে প্রভা বিষয়টির উল্লেখ না ক'রে পারল না। কাকটার জন্যে এ বাড়ীতে থাকা তার পক্ষে কি প্রকার দুঃসহ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সেটাও অবশ্য জানানো হ'ল। শেষটায় স্পষ্টই ব'লেফেলে : মনে ক'রেছি, এবার এ বাড়ীটাই ছেড়ে দেব !...

সুকুমার মহাবিস্মিত হ'য়ে বললে : বলিস্ কি রে ! একটা কাকের জন্যে বাড়ীই ছেড়ে দিবি ! পাগলি কোথাকার !

নিখিল কোড়ন দিলে : সেটা তোমার বোনকে নাকি বড্ড বেশী রকম পাল্ট ক'রে ফেলেছে, সাক্ষী সেটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারছেন না ! কেমন, তাই না ? নিখিল প্রভার দিকে তাকাল।

প্রভা রুখে উঠে বললে : থাম, ঢের হয়েছে। তোমার সব তাতেই ইয়ে ! ঘরকন্নার কাজ তো আর করতে হয় না, তা ব'লে বুঝতে ! সত্যি দাদা, বাড়ী না বদলালে আমি এখানে আর থাকতে পারব না, তোমার সাথেই চ'লে যাব !

সমস্ত জিনিসটা ঠাট্টা কি-না, সঠিক বুঝতে না পেরে সুকুমার খানিক প্রভার মুখের দিকে ন্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে।

আর ফলাভাব বুঝতে পেরে প্রভা বললে : আচ্ছা, বিশ্বাস না হয়, দেখবে চল। কোথাও না কোঁথাও ঠিক ওৎ পেতে ব'সে আছে ! কি দেবে, কি ভাববে, সব সময়ে ব'সে এই মৎলব আঁটছে !

সুকুমার হেসে বললে : বেশ কথা। চল্ তো দেখি কোথায় তোর কাক !

তিনজনেই ঘর থেকে বেরুল।

ওই ভাখো, ওই ! প্রভা চেঁচিয়ে উঠে রান্নাঘরের চালের দিকে আঙুল দেখাল।

কথাটা মিথ্যে নয়, বাস্তবিকই কাকমহাপ্রভু উপর সেখানে ব'সে চারিদিক নিরীক্ষণ করছিল। ওদের দেখতে পেয়ে, ফিক্ ক'রে প্রভার অঙ্গুলি নির্দেশে, সে তক্ষুনি উড়ে পালাল সত্যন সেই নিমগাছে।

প্রভা উত্তেজিতকণ্ঠে বললে : ওই পালাল !...

সুকুমার কৌতুক অনুভব ক'রে বললে : তাই তো।

দাদার কাছ থেকে সহানুভূতি পেয়ে প্রভা ব'লে চলল : চব্বিশ ঘণ্টা এমনি ক'রে জ্বালায় ! যে ক'টা দিন তুমি থাকবে, একটু কষ্ট ক'রে নজর রেখো, টের পাবে। আর, উনি তো আমার কথা মোটেই মানেন না।

ব'লে, নিখিলকে দেখিয়ে দিলে।

নিখিল ভালমানুষের মত বললে : মানি না কি রকম ! দিনরাতই তো মানছি !

প্রভা ঝঙ্কার দিয়ে ধমক দিলে : হয়েছে হয়েছে ! একটি কথা বলতে গেলেই কেবল ফাজলামি ! কিন্তু দাদা, তুমি এর যা হোক একটা উপায় ক'রে দিয়ে যাও ! সুকুমারকে বললে প্রভা।

সুকুমার একটু ভেবে বললে : আচ্ছা, দেখি।

তারপর নিখিলের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে : তোমার জানাশোনা কারো কাছে বন্দুক আছে, নিখিল ?

নিখিল পালটা প্রশ্ন করলে : কেন গুলি ক'রে মারবে নাকি ?

কথাটা প্রভার ভাল লাগল না। সে অমনি ব'লে উঠল : না না, মেরে কাজ কি ! আর, কাক মারতেও নেই ! তার চাইতে বরং এ বাড়ীই ছেড়ে দি।

মাথা দিয়ে সুকুমার হেসে বললে : ভয় নেই, বাড়ীও ছাড়তে হবে না, কাক-হটানোর পাতেরও হবে না। শুধু বাজনাগুলোর দিকে তাক্ ক'রে দুদিন দুটো ক'াকা আওয়াজ করলেই দেখবে আর আসবে না। বন্দুক, বিশেষ ক'রে ওর আওয়াজকে, ওরা যম্ভ ভয় পায়। দেখাই যাক্ না, তাই ক'রে।

এ কথায় প্রভার অবশ্য আর কোন আপত্তি হ'ল না। নিখিলও বললে : বেশ ! বন্দুক এনে দিতে পারব আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে। তারপর, তাতেও যদি না যায়, তবে বাড়ীও আমার ঠিক করা আছে একটা।

সুকুমার বললে : বল কি, এর মধ্যে বাড়ী ঠিক করাও হ'য়ে গেছে ! তুমি তুখুড় ছেলে !

নিখিল হতাশভাবে বললে : কি আর করা ! তবে, একেবারে ঠিক হয়নি, বাড়ীওলা এখানে নেই। ক'দিন বাদে সে এলেই কথাবার্ত্তা পাকাপাকি ক'রে ফেলব।

প্রভা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে : কেমন বাড়ী ক'খানা ঘর, ভাড়া কত ?

নিখিলের কাছ থেকে বাড়ীর বিষয় যা জানা গেল, ভাড়া কিঞ্চিৎ কম হ'লেও এ বাড়ীর তুলনায় তা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

তবু যা হোক্, প্রভা চিন্তিতভাবে বললে : এ যন্ত্রণা থেকে তো অব্যাহতি পাওয়া যাবে !

যথাসময়ে সুকুমারের ব্যবস্থামতই কাজ করা হ'ল।

অর্থাৎ, পরদিন নিখিল তার এক বন্ধুকে সব কথা জানিয়ে ডেকে আনল, তার বন্দুকটাসহ। সুকুমার নিজেই বন্দুক ছুঁড়তে জানত, সেই নিলে সেটা হাতে।

সবাই মিলে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে হাজির হ'ল। প্রভা শোবার ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল।

খিড়কির দিকে পাচিলটার উপর ব'সে ভুসুণ্ডী তখন কি একটা জিনিস পায়ে চেপে, ঠোঁট দিয়ে অপর মনোযোগ সহকারে খুঁটছিল, আসন্ন বিপদের কথা বিন্দুমাত্রও জানতে পারলে না।

হঠাৎ সুখ তুলতেই তার নজরে পড়ে গেল, তারই দিকে বাগিয়ে ধরা বন্দুকের নলটা। অবশ্য পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার আগেই শব্দ হ'ল : গুড়ুম্ !

কাক কীবনও পাগল হয় কি-না জানা নেই, তবে সেই আওয়াজ শুনে সম্পূর্ণ নিরাপদ হ'বার আগে সহসা ভুসুণ্ডীর পলায়নের যে ভঙ্গীটা প্রকাশ পেল, সেটা শুধু একান্ত আতঙ্কিত নয়, উন্মত্ত ব'লেও মনে হ'ল। কোথায় যে সে উধাও হ'য়ে গেল, তার আর কোনও হিসেবই থাকল না !

ব্যাপারটা এসব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানত না, ছিল রান্নাঘরে। গুলীর শব্দ হবার সাথে সাথে সেও একলাফে এসে প'ড়ল একদম বাইরে !

সবটা মিলে একটা ব্যাপারের সৃষ্টি হ'ল। সুকুমার হাসতে হাসতে বললে : দেখলে তো !

নকলটা অবধি বোকার মত হাসতে লাগল আসল কথা শুনে।

যাই হোক্, পরিকল্পনার নিখিলের বন্ধু বিদায় নিলে। সুকুমার তাকে অনুরোধ করলে : দয়া ক'রে যখনই, কালও ওটা আর একটিবার আনতে হবে। কারণ, আরও একবার ওঁর আগমন হ'তে পারে। তারপর থেকে আর দরকার হবে ব'লে মনে করি না।

বন্ধু সানন্দে রাজী হ'য়ে হেসে বললে : বেশ তো !

সকাল বেলা সেই কাণ্ডের পর থেকে ভুসুণ্ডী সেদিন আর এ বাড়ী-মুখোই হ'ল না। প্রভা যেন বাঁচল।

কিন্তু পরদিনই সে আবার এসে হাজির, সেই নিমগাছটার ডালে। প্রভাকে দেখতে পেয়েই স্বাভাবিক কণ্ঠে বিনীত সম্ভাষণ জানাল।

প্রভা কি জানি কেন, খুব যে বিরক্ত হ'ল, ঠিক এমনটি মনে হ'ল না। সুকুমারকে ডেকে মৃদুস্বরে বললে : জানো, সে এসেছে ! ফের এসেছে সেই হতভাগা কাকটা, দেখবে এসো !

সুকুমার ছিল শুয়ে। বললে : আসুক, কিন্তু বলিসনি ওকে, বন্দুকটা আসুক আগে !

কলাবাহুল্য, অতঃপর সেদিনও পূর্ব্ব ঘটনার পুনরভিনয় হ'ল এবং ভুসুণ্ডীও পূর্ব্বের মতই ভীত, সচকিত হ'য়ে পালিয়ে গেল।

তারপর থেকে আর তার দেখা নেই। এমন কি পরদিনও গেল কেটে।

প্রভার কিন্তু মনে হ'তে লাগল, একবার সে নিশ্চয়ই আসবে··· যে শয়তান ! সব কাজের মধ্যেও সে নজর রাখল, কখন্ আসে।

ভুসুণ্ডী কিন্তু সত্যিই এল না।

রাত্তিরে নিখিলকে প্রভা বললে : কাকটা আজও আসেনি। আর বোধ হয় আসবে না।

নিখিল রাগে উঠল চেঁচিয়ে : রেখে দাও তোমার কাক। কাক-কাক ক'রে আমায় পাগল ক'রে তুলবে দেখছি। আচ্ছা পাজায় পড়েছি যা হোক্।

প্রভারাণী একটু লজ্জিতা হ'য়েই বললে : না,-এমনিই বলছিলুম ! গেছে, বেশ হয়েছে !

নিখিল কাজের কথা পাড়ল : তোমার দাদা কি কালই যাচ্ছে ?

প্রভা সংক্ষেপে জবাব দিলে : হ্যাঁ।

তারপর বলাবাহুল্য ফেলতে ফেলতে মৃদুকণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করলে : আচ্ছা, কাকগুলো বন্দুককে খুব ভয় করে, না ?

নিখিল মর্ম্মাহত হ'য়ে পাশ ফিরে শুয়ে জবাব দিলে : জানি নে !

পরদিন বেলা ন'টার গাড়ীতে সুকুমার যাবে। প্রভা খুব সকালে উঠে কাজকর্ম্মে লেগে গেল, দাদাকে যত্ন দিয়ে ক'রে যা-হোক্ চারটি খাইয়ে দিতে হবে, সারাটা দিনও কাজ তো আর তার হ'য়ে উঠবে না !

নিমগাছটার দিকে আমড়াগাছটার দিকে দু-চার বার তার দৃষ্টি প'ড়ল, কিন্তু কোথাও কিছু নেই! হঠাৎ এক সময়ে নন্দকে সে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল: সেই কাকটা আর এলই না, না রে নন্দ!

নন্দ দন্তবিকাশ ক'রে সোৎসাহে বললে: না মা!—তারী বিরক্ত করত দিনরাত, তারী জব্দ হয়েছে এবার!

হুঁ—ব'লে প্রভা রান্নাঘরে ঢুকল।

খানিকবাদে কি একটা কাজে বেরিয়ে আসতেই তার চোখ গেল নিমগাছটার দিকে; ভুলুণ্ডী ঠিক সেই মুহূর্তে উড়ে এসে বসল তারই একটা ডালে। আর ওই সময়টিতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুকুমার, প্রভাকে একটু তাড়াতাড়ি করবার জন্যে উপদেশ দিতে।

সুকুমারকে দেখতে পেয়েই, তৎক্ষণাৎ ভুলুণ্ডী গাছ ছেড়ে আবার উধাও হ'ল, সেই মন্থর গতিতে, ভীত ভঙ্গীতে। সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে প্রভা বললে: দাঁড়াল, কাকটা একদিন এসেছিল, ওই তোমাকে দেখেই পালিয়ে গেল!

সুকুমার গাছটার দিকে তাকিয়ে সকৌতুক তাচ্ছিল্যে হেসে বললে: তাই না কি?

ন'টার গাড়ীতে সুকুমার চ'লে গেল। এর পর দু' তিন দিন কাটল, ভুলুণ্ডী আর আসেই না, একদম কেয়ার। প্রভা অমন অবসরে মাঝে মাঝে অন্যমনস্কা হ'য়ে ভাবে, কাকটা সত্যিই চ'লে গেল নাকি! সমস্ত দিন কি অস্থিরই না ক'রে তুলত সবাইকে। যাক্, আপদ বিদেয় হয়েছে, বেশ হয়েছে!

কিন্তু বাড়ীটা যে ফাঁকা লাগে, একথা মনে মনে প্রভাকে স্বীকার করতেই হ'ল। ও যেন ছিলো একটা দুষ্টু ছেলে, যার অনুপস্থিতিটা সব সময়েই টের পেতে হয়!

এমন কত জিনিষই তো বাইরে প'ড়ে থাকে, কই কিছুই তো হয় না! কি ভাঙল, কি খেয়ে ফেলল, কি ছড়াল, এসব নিয়ে সতর্ক হবার আর কোনও প্রয়োজনই নেই। যেখানকার যা, সব ঠিকঠাক, কোনও হেরফের নেই, দর্পণে যেমন যেন একটা নিশ্চিন্ত নীরবতা! প্রভার অস্বোয়াস্তি লাগে।

দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে অলসভাবে বই পড়তে পড়তে প্রভা অকস্মাৎ মাঝে মাঝে উৎকর্ণ হ'য়ে ওঠে, রান্নাঘরের দিক থেকে কোনও শব্দ এল কি না!—কিছু না। প্রভা বইয়ে মন দেয়।

খিড়কির থেকেই জানলা দিয়ে নজরে এ'দো পুকুরের ঘাটটা দেখা যায়; খেজুর গাছ কেটে তৈরী ঘাট। প্রভা একটু ঘুমিয়ে প'ড়েছিল, ঘুমটা ভাঙতেই তার নজর পড়ল সেইদিকে।

বেলা প্রায় প'ড়ে এসেছে। আলসজড়িত চোখে সেইদিকে চেয়ে প্রভা ভাবতে লাগল, কত দিন এমনি পড়ন্ত বেলায় ওই ঘাটে গিয়ে কাকটা স্নান করত, মাথাটা জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ডানার কালুটার লীলায়িত জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে! স্নানপর্ব সমাধা ক'রেই সোজা সে বসত গিয়ে তার নিজস্ব জারুলগাছটিতে, ওই নিমগাছের ডালে। সেখানে ব'সে কত না ভঙ্গীতে তার চিকনকৃষ্ণ অঙ্গখানি পাড়াবোধ্য শুরু ক'রে দিত, রোদের কত না আঘাতে তার গায়ের রোঁয়াগুলো চুলুকো পুলকো হ'য়ে ফুলে ফুলে উঠত!

তারপর, খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে রোদটুকু উপভোগ ক'রে, পরীরটাকে তাজা ক'রে নিয়ে আবার শুরু করত তার বৈকালিক উৎপাত!

এ ছিল তার প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য। আজও যেন সে একটু বাদেই তেমনি এসে স্নান করবে, ঘাটটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুধু এই কথাটাই প্রভার মনে হ'তে লাগল।

বিকেলে জলখাবারের সময় নন্দকে প্রভা বললে: ডাক্তারটা আর আসে না, রক্ষে পাওয়া গেল, না রে!

নন্দ সূর্পসমর্থন ক'রে ব'লল: হ্যাঁ মা! বাবাবাবু ঠিকই ব'লেছিলেন, শত্রুই হচ্ছে ওদের আসল ওষুধ!

প্রভা যেন ঈষৎ ক্ষুব্ধভাবে আপনমনেই বললে: তা ব'লে কি আর মোটেই আসবে না!

নন্দ বিজ্ঞের মত মন্তব্য প্রকাশ করলে: তাই তো মনে হচ্ছে, মা! অন্তত এ বাড়ীতে আর নতুন লোক না আসা অবধি তো নয়!

প্রভা আর কোনও কথা না ব'লে চুপ ক'রে গেল।

তেমনিভাবে আরও দুদিন কাটল।

নিখিলকে পান দিতে এসে প্রভা জিজ্ঞাসা করলে: কই, তোমার সে বাড়ী ঠিক হ'ল? বাড়ীওলা এসেছে?

নিখিল পান চিবুতে চিবুতে বললে: সে তো এসেছে, আমিই যাই ও নিয়ে বলিনি কিছু। কেন, সে কাকটা তো আর আসে না, ওসে আর বাড়ী বদলাবার এখন দরকারটাই বা কি?

প্রভা কি ভেবে বললে: না, তুমি সেই বাড়ীটাই দেখো! অন্তত ভাড়া তো কম হ'বে! এখানে আমার আর ভাল লাগছে না!

নিখিল খানিকক্ষণ প্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে: এর মানেটা কি, বুঝতে পারি? কি হয়েছে এ বাড়ীতে, দস্তি ক'রে বল তো!

প্রভা প্রথমত কোনও জবাব দিলে না। তারপর যেন জোর করেই খানিকটা হেসে বললে: হবে আবার কি?

—তবে? এ বাড়ীটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে, আসল কারণটা কি তাই? নিখিল খোঁচা দিলে।

—না না, তা কেন, এমনিই! বাব্বাঃ, এমন ঝঞ্ঝাটেও তুমি: প্রভা অসহায় হয়ে পলায়নে ব'লে উঠল: ভাড়া কম আছে, যদি চাও, তবে বলা কি! তাই বলছিলুম—

ব'লে ঘর থেকে প্রস্থান করলে।

নিখিল অবাক। ভাবল, স্ত্রীচরিত্রের রহস্য যে অতীব দুর্বোধ্য—বেদা ন জানন্তি, কে কথা সহস্রবার স্বীকার্য!

সকালবেলা প্রাতর্ভোজন সেরে নিখিল বেরিয়ে। প্রভা চায়ের কাপ নিয়ে বসেছে, সাথে একটা রেকাবীতে কিছু ঘি-মাখানো মুড়ি আর খানকতক গরম-ভাজা পরম বেগুনি?

চা-টা শেষ হয়ে গেছে, রেকাবীও প্রায় খালি, হঠাৎ তার চোখ পড়লো খিড়কির দরজাটার দিকে।

ও কি, দরজার উপরে ব'সে ভুবুণ্ডী না?

হাঁ, ভুবুণ্ডীই।

প্রভা উঠল লাফিয়ে। ছেলেমানুষের মত নন্দকে ডেকে ব'লে উঠল: নন্দ, ঈশ্বরির বেগনি আন, সেই কাকটা আবার ফিরে এসেছে!

নন্দ রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়াল: কই, মা? কোথায়?

প্রভা সোৎসাহে বললে: ওই তো! খবরদার, কিন্তু বলিসনি ওকে! কেমন, তোকে বলিনি বা দেখিনি, বন্ধুকের আওয়াজ কি চিরকালই ওদের মনে থাকে!

বলতে বলতে ভুরুাবশিষ্ট মুড়িগুলো উঠোনময় ছড়িয়ে দিতে লাগল।

ভুবুণ্ডীও এদিক-ওদিক সতর্কদৃষ্টিতে কি যেন দেখে নিয়ে সন্তর্পণে নেমে এসে মহোল্লাসে সেগুলোর সদ্ব্যবহার শুরু ক'রে দিলে।

—বজ্জাতটা ঘায়ের ভয়ে এতদিন আসতে পারেনি;—ব'লে, স্মিতহাস্যে প্রভা রান্নাঘরে ফিরে চুকল।

এরই খানিকবাদে, নিখিল দর্শনাস্তে কলেজে ফিরে এসে বললে: তথাবার্তা একরকম ঠিক ক'রে এলুম, বাড়ীওলার সাথে। কিন্তু এই বাড়ীটাই ছিল সব দিকে ভাল! সে কাকটাও তো আর নেই, তবু তোমার কি যে খেয়াল।

বাধা দিয়ে প্রভারাণী হেসে বললে: আচ্ছা আচ্ছা, অতই যদি ভাল লেগে থাকে এ বাড়ী, তা হ'লে না-হয় না-ই ছাড়লে! আমিই না-হয় আমার মতটা বদলে ফেলনুম! কেমন, হ'ল তো এবার? ব'লে—মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগল।

তার হাসির আড়ালে রাগ বা অভিমানের বিন্দুমাত্র ছায়াটিও খুঁজে না পেয়ে নিখিল সেল বোকা ব'নে।

প্রভা কিন্তু তেমনি তরলকণ্ঠে ব'লে চলল: আর সে কাকটার কথা বলছ, সেটা তো আজ আবার ফিরে এসেছে!"

নিখিলের মুখ থেকে অস্ফুটভাবে শুধু বেরিয়ে এল: এসেছে! তবে!

প্রভা সহজভাবেই বললে: তবেও আর কি! আসুক সে, ওতে আর এমনই বা কি হ'চ্ছে! তবে দেখলুম, ওদের একটু স'রে থাকতেই হয়। ও বাড়ীটেই যে হ'বে না, তারই বা কি মানে? তুমি বরং বাড়ীওলার সাথে বেগা হ'লে ব'লে দিও, বাড়ীর আর আমাদের দরকার নেই!

নির্বাক নিখিল হাঁ ক'রে প্রভারাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখমুখের তখনকার অবস্থাটা হ'য়ে দাঁড়াল বাস্তবিকই দেখবার মত।

মনে নাই

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

দূরে দূরে গাওয়া করুণ কাহিনী
কেঁদে মিশে যায় আকাশে;
মর্ম্মরি যায় মর্ম্মের বাণী,
অবশে উদাসী বাতাসে।
মনে ভেসে আসে, ক্ষণে নাই;
কিছু যেন আর মনে নাই।

কত না তরুণ চোখের কিরণ,
অরুণের প্রভা হরে' যায়;
কত না সুপ্ত বাথার পীড়ন,
শিশিরের জলে ঝরে' যায়;
তারা সজীব বেদন শোনে নাই;
কিছু যেন আর মনে নাই।

অতীতের গুপ্ত যত ইতিহাস,
চেতনা-পরশি কেঁপে যায়।
প্রাচীনের পরে নবীন বিকাশ
একাকী আমায় ঝেপে যায়।
কণিকা কি কেউ গণে নাই?
কিছুই যে আর মনে নাই।

পঞ্চম – কাহারবা

নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে
জাগো চণ্ডিকা মহাকালী।
মৃতের শ্মশানে নাচো মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশক্তি
দনুজদলনী করালী
জাগো মহাকালী॥
প্রাণহীন শবে শিব শক্তি জাগাও
নারায়ণের যোগ নিদ্রা ভাঙাও
অগ্নিশিখায় দশ দিক রাঙাও
বরাভয়দায়িনী চণ্ডমুণ্ডমালি।
শ্রীচণ্ডিতে তোরই শ্রীমুখের বাণী
কলিতে আবির্ভাব হবে তোর ভবানী
এসেছে সে কলি কালিকা এলি কই
শুম্ভ নিশুম্ভ জন্মেছে পুনঃ ঐ
অভয় বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ
শুনিব কবে নাগো পর করতালি॥

কথা ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম সুর ও স্বরলিপি ঃ—কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার

II পা পা পা পা | -ক্ষাগক্ষা -া -গা ক্ষা | ধা ক্ষাধনর্সা -া -ননর্সা | র্সা -া র্সা -া I
নি পী ড়ি তা ০ পৃ থি বী০০০ ডা ০ কে

I ধ্বনা ধনা র্সনর্সনা -ধা | ধা -া না ধনধা | -ক্ষাধক্ষা -গা ঋগক্ষাপা গক্ষা | গা ঋা -সা -া I
জা০ গো০ ০ ০ ০ চন্ ০ ডী কা০০ ০০০ ০ ম০০০ হা০ কা ০ লী

I সসা নধ্না নসা ধ্নসঋা | নসগা -া ক্ষা ক্ষা | গগা ক্ষাধা ধর্সা র্সা | -া া র্সর্সর্গা গঋা I
রক্ত শানে না০০০ চো০০ ০ মু ণ্ডান্ জয়ী মহা শক্ তি ০ ০ দনু ০ জদ

I সর্সা নং র্সা না -ধা | ক্ষাধক্ষা ক্ষাগা -া ক্ষাগা | গক্ষা সা ক্ষাধা র্সা | র্সনা ধনা ধপক্ষধা পা II

নমো ক রা লী ক০০ খো০ ০ মহা কা লী মহা কা লী০ মহা কা০০০ লী

II পপা পপা ক্ষপা গক্ষা পনা র্সঋর্সা নর্সা র্সা | র্সর্সর্গা র্গা ঋা র্সর্সা | ধনা নর্সা ধনা ধা I

প্রাণ্ ভীন্ করে ফির এক ত্রি০০০ ভা০ গাও নারা০ য ণের যোগ্ নি০ দ্রা০০ ভূঁ ভাও

I ক্ষাধনর্সা র্সনা ধধনা নধা | ক্ষাধা ধক্ষা গক্ষা পা | নর্সা গগা ক্ষাধা র্সা | নধা ক্ষাগা ক্ষাক্ষাগা ঋাঋর্সা II

নো০০ ন্ নি০ ফির০০ যায় বন্ ফির্ রা০ ভাও বরা ভয় দায়িনী নুমু নুড় মা০ ০ লী০০

II ধধা না ধনা ধনা | -ধা -া ক্ষা পা | -গক্ষা -পা -গক্ষা -গা | ঋা -ী -র্সা র্সা I

ম ০০ ০০ ০ ০ শ্রী০

I সগা০০০ গা গা ক্ষাক্ষা -ঋগা ঋগা -া ক্ষা র্সা না ধা | ধক্ষা নধা ধর্সা-র্সা I

ভ ভ ভো০ ০০ রি০ ০ শ্রী মু খে র ০ লী ০

I না না না ধধা ধনা -নধা ধক্ষা গা | গা গা ঋগক্ষপা -গক্ষা | গক্ষগা ঋধঋা সা -া I

ক লি তে অ বি ০র ভ ব্ ই বে ভো০০০ ০র ভ ০ বা০ লী ০

I ক্ষর্সা র্সর্সা ধনা ধা ' ক্ষাধা নর্সা ধনা র্সা | না নঃ নধঃ ক্ষা ক্ষগা | গক্ষা গগা ঋঋা সা I

এসে ছে সে ক লি কা০ লীকা এলি কট শুম্ভ নি শুম্ ভ জন্ মেছে পুন ঐ

I র্সর্গা র্গঃ ঋর্গক্ষা র্গঃ ঋর্সা | নর্সা ঋর্সা নর্সা র্সা | পর্সা ননা ণা ক্ষগা | ক্ষক্ষা গগা ঋা-ক্ষপা II II

অভ য বা০০০ ণী ভব মা০ ত্রৈ০ মা০ ভৈ শুনি নক বে মাগো পর কর তা লী০

জন্ লকের পেশা-শিক্ষাতত্ত্ব

ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ, ইডি-ডি

জন্ লক্ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৬৩২ হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভা-শালী ছিলেন এবং বহু বৎসর যাবত তাঁহার সময়ে রাজ-নৈতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি দর্শনশাস্ত্রবিদ্রূপে পরিচিত ছিলেন। রাজনীতি, দর্শনশাস্ত্র এবং শিক্ষাবিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তিনি লিখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজনীতিক অবস্থার বিপর্য্যয় লকের প্রতিকূল হইলে পর তিনি ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় রাজনীতিক জীবন পুনরায় আরম্ভ করিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নৃপতিদের ঐশ্বরিক শক্তির (divine right of kings) বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছিল। লক্ প্রকাশ্যভাবে প্রতিপক্ষ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়া-ছিলেন ও জনসাধারণের ঐশ্বরিক শক্তির (divine right of the people) অনুকূলে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন। জনসাধারণের ঐশ্বরিক শক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেও লক্ সর্ব্বদাই রাজকীয় সরকারের সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি রাজার ক্ষমতা হ্রাসের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁহার মতে রাজার ক্ষমতা জনসাধারণের অনুমোদন সম্ভূত এবং প্রত্যেক পরবর্ত্তী রাজার শক্তি তাঁহার প্রজার অনুমোদনের উপর নির্ভর করে। ইহা চুক্তি তত্ত্ব (contract theory) নামে পরিচিত। তাঁহার এই তত্ত্বে লক্ ব্যক্তিত্বের স্থান আদৌ স্বীকার করেন নাই। ব্যক্তিবিশেষকে ষ্টেটের বশ্যতা মানিয়া চলিতে হইবে। সুতরাং লকের শিক্ষা-তত্ত্বানুযায়ী রাজ্যের মঙ্গলই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে পরিচালিত রাজ্যশাসনের বিরোধিতা ব্যতিরেকে লক্ সপ্তদশ শতাব্দীতে সুকুমার-বিদ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সুনাগরিক গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি অভিজাত এবং দরিদ্র সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর লোকজনের লেখাপড়ার আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে শিক্ষা অযথা বিষয়ে না হইয়া সমাজে বসবাস করিবার উপযোগী জীবিকা সম্পর্কিত বিষয়ে হইবে। এই কারণে জন্ লককে শিক্ষা-বিজ্ঞানের ইতিহাসলেখকগণ "সোসিয়াল রিয়ালিষ্ট" শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

সমাজে ব্যক্তিবিশেষের বর্ত্তমান পদমর্য্যাদানুযায়ী শিক্ষা হওয়া উচিত এই দৃঢ় প্রত্যয় হেতু লকের শিক্ষাতত্ত্বানুসারে অভিজাত এবং শ্রমিক পরিবারের শিক্ষার উদ্দেশ্য, উপায় ও পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হইবে। রাজ্যে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ততার জন্য উচ্চপদস্থ পরিবারের যুবকগণ ফরাসী ও লাটিন ভাষা, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি, এবং বিবিধপ্রকার পেশায় স্বল্প পরিমাণে শিক্ষালাভ করিবে। রাজ্যে স্বাবলম্বী নাগরিক ও সমাজে সম্মানী সভ্য হইবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক পরিবারের যুবকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার বিষয়ে লক্ কোন আলোচনা করেন নাই। সমাজের ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর শিক্ষার বিষয়েই তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

সাধারণ শিক্ষার অবস্থার বিষয়ে লকের অভিমতের সংক্ষিপ্ত বিবৃতির পর আমরা এক্ষণে তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বে পেশা-শিক্ষার অবস্থানের বিষয় আলোচনা করিব। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সাম্ পট্‌স কন্‌সারনিং এডুকেশন্ (Some Thoughts Concerning Education) নামক প্রকাশিত রচনাবলী হইতে পেশা-শিক্ষা বিষয়ে লকের অভিমতের বিষয়ে বিশেষরূপে উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। হল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিতজীবন যাপনের সময় লক্ প্রথমত তাঁহার বন্ধু এডওয়ার্ড ক্লার্কের সন্তানসন্ততির শিক্ষা সম্পর্কে ধারাবাহিক-রূপে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন এই প্রবন্ধ ইহাদেরই সমষ্টি। অপর একজন বন্ধু ওইলিয়াম মোলিনিউক্সের (William Molyneux) অনুরোধে এইগুলি একত্রিত

করিয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত ও ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কনডাক্ট অব্ দি আণ্ডারষ্টাণ্ডিং (Conduct of the Understanding) নামক প্রবন্ধ হইতে শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। জন্ উইলিয়াম্ এডামসনের "দি এডুকেশনাল রাইটিংস অফ্ জন্ লক্" নামক সংস্করণে এই রচনাবলী দৃষ্ট হইবে। দরিদ্র ভরণপোষণার্থ আইনের সংশোধনে ও শ্রমিক বিদ্যালয় বিষয়ক লকের ক্ষুদ্রলিপি হইতেও উপকরণ গৃহীত হইয়াছে। এই মূল পুস্তিকা একণে দুষ্প্রাপ্য কিন্তু ইহা এইচ্ আর সন্স বোর্ণ কর্তৃক বিরচিত "দি লাইফ অফ্ জন্ লকের" দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

লকের শিক্ষাতত্ত্বের মূলনীতি রেবালের শিক্ষাতত্ত্বের মূলনীতির অনুরূপ। মন ও দেহের পরিপুষ্টির জন্য রেবালে ও লক্ উভয়েই শিক্ষার নব যুগের আদর্শের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে শিক্ষার নব যুগের বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে এই শিক্ষার আদর্শের লোপ পাইয়াছিল। এই আদর্শের বিষয়ে লক্ লিখিয়াছিলেন, "সুস্থদেহে সুস্থ মনই এই পৃথিবীতে আনন্দদায়ক অবস্থার সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ বর্ণনা।"১ তবু এই মূলতত্ত্বে একমত হইলেও শিক্ষা-বিজ্ঞানবিদ্গণ এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার পন্থা বিষয়ে দ্বৈধ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। রেবালে অভিজাত পরিবারের যুবাদের ব্যায়াম চর্চ্চায় হস্তশিল্পের অনুমোদন করেন নাই। তাহাদের বিশ্বকৌষিক বিদ্যার পরিপূরণের জন্য তিনি হস্তশিল্পের প্রচার করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে লক্ শারীর চর্চ্চার নিমিত্ত যেরূপ হস্তশিল্পের প্রচার করিয়াছিলেন তদ্রূপ কৃষি অথবা বিশ্বকৌষিক জ্ঞানের জন্য ইহার প্রচার করেন নাই। উভয়েই সম্মত হইয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান অর্জ্জিত হইবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-জাত জ্ঞানের পরিপূরকের উদ্দেশ্যে রেবালে প্রাচীন গ্রন্থকারদের পুস্তক পাঠের অনুমোদন করিয়াছিলেন। লক্ ইহার সমর্থন করেন নাই। রেবালে অভিজাত পরিবারের যুবাদিগকে সকলপ্রকার পেশার সহিত পরিচিত করাইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বিবিধ প্রকার পেশার দক্ষতা জন্মাইতে চেষ্টা করেন নাই। লক্ সম্ভ্রান্ত-পরিবারের তরুণদের মধ্যে দুই বা তিনটি বৃত্তিতে সাধারণ জ্ঞান এবং একটি পেশায় বিশেষ বুৎপত্তি জন্মাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। লক্ এবং রেবালের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত এবং অপরাপর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও মোটের উপর লক্ শিক্ষার নবযুগের পরবর্ত্তী সময়ে শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরের সমালোচনায় ও রাজ্যে নেতৃত্বগ্রহণে উপযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চপদস্থ পরিবারের যুবাদের জন্য হস্তশিল্প এবং উচ্চাঙ্গের পেশা প্রচারে রেবালের সহিত একমত।

লকের পেশা-শিক্ষাতত্ত্ব তাঁহার "সুস্থদেহে সুস্থ মন" এই মতের ভিত্তির উপর নির্ভর করে। কৃষি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, হস্তশিল্প এবং পেশা বিষয়ক আদর্শ পাঠ্যলিপির সাহায্যে তিনি মন ও দেহের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে শিক্ষার নবযুগের পরবর্ত্তী সময়ে ইউরোপীয় স্কুল-কলেজগুলি সম্ভ্রান্তপরিবারের যুবাদিগের কৃষি বিষয়ক অধ্যয়ন আবৃত্তির রঙ্গভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। ছাত্রদিগকে লাটিন ও গ্রীক ভাষায় বিশুদ্ধ বাক্য রচনা করিতে এবং প্রাচীন ভাষার ভঙ্গী অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। মানসিক অনুশীলনের উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী যুগের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের সকল উৎসাহ পরিচালিত হইয়াছিল। ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিকাশের কিছুই করা হইত না। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অমানুষিক রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ লক্ ব্যায়াম চর্চ্চার উদ্দেশ্যে হস্তশিল্প শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, লক্ সর্ব্বদাই অভিজাত পরিবারের যুবাদের শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং উচ্চাঙ্গের পেশা-শিক্ষার আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছিলেন। মানসিক আয়াস ও উৎসাহ, দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে। "আমার বিবেচনায় অধ্যয়নই অভিজাত-পরিবারের যুবাদের গুরুকার্য্য এবং যখন ইহা আরাম ও বিশ্রাম দাবী করে তখন ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা চিন্তাকে শিথিল করে এবং স্বাস্থ্য ও শক্তিকে দৃঢ় করে।"২ আমরা অবশ্য মনে রাখিব যে, লক্ হস্তশিল্পের

১ জন্ উইলিয়াম্ এডামসন্, দি এডুকেশনাল্ রাইটিংস অফ্ জন্ লক্, পৃঃ ২৪।

২ জন্ উইলিয়াম্ এডামসন্, দি এডুকেশনাল্ রাইটিংস অফ্ জন্ লক্, পৃঃ ১৭০।

সাহায্যে নৈপুণ্য গঠনের উপকারিতা বিস্মৃত হন নাই। তিনি এই উদ্দেশ্যে ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হস্তশিল্পশিক্ষার আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপে শুধু ভাষা ও বিজ্ঞানে নৈপুণ্যলাভ করা হইবে না। কিন্তু চিত্রাঙ্কন, বাগান ও লোহার কাজ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্পে নৈপুণ্য লাভ করিবে।"৩

অতি প্রয়োজনীয় পঠিতব্য বিষয়গুলি অধ্যয়নের অব্যবহিত পরেই হস্তশিল্পশিক্ষার অতি উত্তম সময় বলিয়া লক্ সমর্থন করিয়াছেন। এই সময়ে অত্যধিক পঠনের ফলে মনের অবসাদ হয় এবং মনের আরামের জন্য কর্ম্মান্তরের আবশ্যক। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে এই সময়ে অভিজাত পরিবারের যুবাগণ খামার অথবা কারখানায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা বিবিধপ্রকার পেশা শিক্ষা লাভ করিবে। এইরূপে তাহারা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পেশা-সমূহ শিক্ষানবিশের সাহায্যে শিক্ষা করিবে। এই কার্য্য শিক্ষার্থীদিগকে নিশ্চয়ই আনন্দ ও সুখ আনয়ন করিবে এবং যে সময় আলস্যে অথবা যথেচ্ছাচারিতায় কর্ত্তিত হইত তাহা লাভজনকরূপে ব্যয়িত হইবে। "পূর্ব্বোক্ত শিল্পকলার সহিত সুগন্ধি দ্রব্য নির্ম্মাণ, বার্ণিশ, খোদনকার্য্য এবং লৌহ, পিত্তল ও রূপা প্রভৃতির কার্য্য সংযোজিত হইবে। যদি অভিজাত পরিবারের অধিকাংশ যুবাদের ন্যায় একটি সুবৃহৎ নগরে তাহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় তাহা হইলে সে মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড কর্ত্তন, পালিশ ও স্থাপন কার্য্য শিক্ষা করিতে অথবা চশমা পালিশ করিতে আত্মনিয়োগ করিবে। বিবিধপ্রকারের মধ্যে এমন হস্তশিল্প আছে যাহাতে নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। ইহা একেবারে অসম্ভব হইবে যাহা তাহাকে আনন্দদান করিবে না……। যে হেতু সে সর্ব্বক্ষণই পঠন, অধ্যয়ন ও আলাপনে রত থাকিতে পারে না তদ্দরুণ যথেষ্ট সময় থাকিবে। তাহার পঠনের সময় ব্যতীত ইহা এইরূপে ব্যয়িত না হইলে আরও মন্দরূপে ব্যয়িত হইবে।৪

হস্তশিল্পে শিক্ষা ব্যতীত সম্ভ্রান্তপরিবারের যুবাদের পেশা শিক্ষার পাঠ্যতালিকায় সিভিল ল, সদাগরী হিসাব ও শর্টহ্যাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ক কোর্সের সন্নিবেশ হইবে। এই শিক্ষণীয় বিষয়গুলি এমনই মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় যে এইগুলি উচ্চপদস্থ যুবাদের শিক্ষাবিষয়ক পাঠ্যলিপির অন্তর্ভুক্তরূপে বিবেচিত হইবে। আর্থিক, সামাজিক এবং কৃষ্টিবিষয়ক উদ্দেশ্যের জন্য এইগুলি পঠিত হইবে। নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদে এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটিতে লক্ যে প্রয়োজনীয়তা আরোপ করিয়াছেন তাহা সূচনা করিবে।

সম্ভ্রান্তপরিবারের যুবকের পক্ষে সিভিল আইনের জ্ঞান বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল—কেন না, ইহা তাহাকে রাজ্যের মধ্যে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিতে এবং পৃথিবীতে তাহার সহচরদের নিকট হইতে সম্মান অর্জ্জন করিতে সহায়ক হইবে। সুতরাং সে সমাজের উৎপত্তি ও ভিত্তি এবং সমাজে মানবের অধিকার ও কর্ত্তব্যের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিবে। সুচারুরূপে আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ বুঝিবার উদ্দেশ্যে সে আন্তর্জ্জাতিক আইনে অনুরূপ বুৎপত্তি লাভ করিবে। এই বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভের জন্য আন্তর্জ্জাতিক আইন বিষয়ে গ্রোটিয়াস এবং পুফেন্ডরফ্ প্রভৃতি প্রাচীন রোমকদের পুস্তক অধ্যয়ন করিবে। "টুলিস্ অফিসেস্" (Tully's Offices) সুচারুরূপে হজম করিবার পর এবং তৎসহ "পুফেন্ডরফের ডি অফিসিও হোমিনিস এট্ সিভিস" (Puffendorf, de officio hominis et civis,) যোগ কর, তাহাকে "গ্রোটিয়াস্ ডি জুরি বেলি এট্ পেসিস্" (Grotius de jure belli et pacis) অথবা এই দুইটির মধ্যে শ্রেষ্ঠতর "পুফেন্ডরফ ডি জুরি নেচারেলি এট্ জেণ্টিয়াম্" (puffendrof de jure naturali et gentium) পড়িতে দিবার সময়োচিত হইবে। তৎসমুদয় হইতে মানবের স্বাভাবিক ক্ষমতা, সমাজের আদি ভিত্তি এবং সেই সকল হইতে সমদ্ভূত কর্ত্তব্যের বিষয়ে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। সিভিল ল্ এবং ইতিহাসের এই সাধারণ পঠিতব্য অংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবাগণ কেবল মাত্র সাধারণরূপে পাঠ করিবে না। কিন্তু সর্ব্বক্ষণই অধ্যয়ন করিবে ও কখনও বিরত হইবে না। যে ধার্ম্মিক ও বিনয়ী তরুণ যুবক সিভিল লয়ের সাধারণ অংশের সহিত সুপরিচিত (যাহা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতারণামূলক মোকদ্দমার সহিত বিজড়িত নহে,

---

৩ পৃঃ ১৩১।

৪ উইলিয়াম্ এডাম্সন, দি এডুকেশনাল্ রাইটিংস অব্ জন্ লক্, পৃঃ ৩৩।

কিন্তু অধিকাংশে সভ্য জাতিসমূহের কার্য্যাবলী ও সম্পর্কের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং প্রমাণের মূলতত্ত্বের উপর সংস্থাপিত)। লাটিন ভাষা সুচারুরূপে বুঝিতে পারে এবং সুশ্রী লিখিতে পারে, তাহাকে কোন লোক এই দৃঢ় বিশ্বাসে ছানিয়াতে ছাড়িয়া দিতে পারে যে সে সর্ব্বত্র চাকুরী ও সম্মান পাইতে পারে।"৫

লকের মতে ইংলণ্ডে প্রধান বিচারপতি হইতে সমাজের পর্য্যন্ত যে কোন পদ পাইতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ ভদ্র যুবাদের পক্ষে আইন অধ্যয়ন বিশেষ প্রয়োজনীয়। ন্যায় ও অন্যায়ের নির্ণয়ে আইন বিশেষ প্রয়োজন। আইন শাস্ত্র করায়ত্ত করিতে চাইলে ইংলিশ কন্‌ষ্টিটিউশন এবং গভর্ণমেণ্ট বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের পুস্তক পাঠ করিবে।৬

বিজ্ঞতার সহিত তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ ও ধ্বংসের কবল হইতে তাহাদের বিত্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে লক উচ্চপদস্থ পরিবারের যুবাদের সওদাগরী হিসাব-প্রণালীতে বুৎপত্তি লাভের আবশ্যকতার প্রচার করিয়াছিলেন।৭

অভিজাত পরিবারের যুবাদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত লিপিজ্ঞানও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে জ্ঞান, বিশেষতঃ গোপনীয় চিঠিপত্রাদি লিখনে ব্যক্তিগত বিশেষ উপকারে আসিবে।৮

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের আলোচনা প্রকাশ করিয়াছে যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবাদের সম্পর্কিত লকের পেশা-শিক্ষাতত্ত্ব দ্বিতবোধক। চিত্তবিনোদন ও দৈহিক শক্তির উদ্দেশ্যে তিনি হস্তশিল্প শিক্ষার সুপারিশ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থলাভ এবং সুচারুরূপে নাগরিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য বিবিধ প্রকার উচ্চাঙ্গ পেশা-শিক্ষার অনুমোদন তিনি করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা দরিদ্র-শ্রেণীর সন্তানের বিষয়ে লিখিত লকের পেশাতত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা করিব।

৫ জন্ উইলিয়াম্ এডামসন, দি এডুকেশনাল্ থিওরিজ অফ্ জন্ লক, পৃঃ ২৪১-১৪২।

৬ জন্ উইলিয়াম্ এডামসন, দি এডুকেশনাল্ থিওরিজ অফ্ জন্ লক, পৃঃ ১৪২।

৭ জন্ উইলিয়াম্ এডামসন, পৃঃ ১৭৬-১৭৯।

৮ জন্ উইলিয়াম্ এডামসন, পৃঃ ১২৪।

লক্ শ্রমিকদিগকে ব্যবসা ও ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দিবার সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহাদের পক্ষে ব্যবসা, ধর্ম্ম ও বিনয়শিক্ষা তাঁহার বিবেচনায় যথেষ্ট। এইরূপে তাহারা গণতন্ত্রের উত্তম নাগরিকরূপে প্রমাণিত হইবে। এইস্থলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সামাজিক শ্রেণী-ভাগই পেশা বাছাইয়ের প্রয়োজনীয় মাপকাঠি। বহু-সংখ্যক দরিদ্রদিগকে চিরতরে সমাজের নিম্নস্তরে চাপিয়া রাখিতে হইবে, এবং তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যথোপযুক্ত পেশা শিক্ষা দেওয়া হইবে ও তাহাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিকল্পে যথোপযুক্ত ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইবে। "গণতন্ত্রস্থিত ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহার বিশেষ পেশা সম্পর্কিত কর্ত্তব্য কার্য্য ও ধর্ম্মবিষয়ে (এই জগতের অধিবাসী বলিয়া যাহা তাহার পেশা) জ্ঞান হইতে সাধারণতঃ সকল সময় অতিরিক্ত হইয়া থাকে।"৯

ষ্টেট্ গরীব ও ভিখারীদের রক্ষক। শ্রমিক বিদ্যালয়ে গরীব ও ভিখারীদিগকে ব্যবসা এবং শিল্প শিক্ষা দ্বারা ষ্টেট্ দারিদ্র্য বিমোচন করিবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিককে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করিতে হইবে। উত্তম নাগরিক হইতে হইলে ব্যক্তিবিশেষকে ব্যবসা, শিল্প ও ধর্ম্ম-বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। ষ্টেটের তত্ত্বাবধানে এই শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং দরিদ্র বালকবালিকা-দিগকে শ্রমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে ষ্টেট্ বাধ্য করিবে। "আমরা ইহার জন্য যে অতি ফলোৎপাদক উপায় কল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং যাহা আমরা অতি বিনীতভাবে প্রস্তাব করি তাহা এই যে, পূর্ব্বোল্লিখিত নূতন প্রস্তাবিত আইনে এই ব্যবস্থা হইবে যে, প্রত্যেক পেরিশে শ্রমিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে, যেখানে পেরিশের সাহায্য পাইবার উপযোগী তিন বৎসরের ঊর্দ্ধ ও চৌদ্দ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক গৃহে-বাসী বালক বালিকাগণ দরিদ্রের পরিদর্শকের নিকট হইতে বেতন প্রাপ্ত হইয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয় নাই তাহারা তথায় যাইতে বাধ্য হইবে।"১০ এই শ্রমিক বিদ্যালয়গুলি বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয় হইবে। বয়ন, ধোলাই,

৯ জন্ উইলিয়াম্ এডামসন, দি এডুকেশনাল্ থিওরিজ অব জন লক, পৃঃ ২১৭।

১০ এইচ্ আর্ দত্ত বোর্ণি, দি লাইফ অব জন্ লক, পৃঃ—৩৮৩।

ಚಿತ್ರ — ೬೦ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆ

অথবা পশম নির্মাণ প্রভৃতি বিবিধ পেশা শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। স্থানীয় জিলাগুলির বিশেষ প্রয়োজনানুসারে শ্রমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা গঠিত হইবে। পেশাশিক্ষা সমাপনান্তে দরিদ্র ছেলেমেয়েদিগকে হস্তশিল্পী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কুটিরজীবী প্রজা, অথবা কুলাচার্য্য মণ্ডলীর অন্ততমের নিকট শিক্ষানবীশরূপে চাকুরীতে প্রবেশ করাইবে।[১] এইরূপে দরিদ্রজনসম্পর্কিত লকের পেশা-শিক্ষাতত্ত্ব দারিদ্র্যকে সমাজের অভিশাপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। স্থানীয় শ্রমিক বিদ্যালয়ের সাহায্যে সকল দরিদ্রদিগকে পেশা শিক্ষা দ্বারা দারিদ্র্য অবশ্য মুছিয়া দিতে হইবে।

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, লক্ তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বে সমাজের সম্ভ্রান্ত ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর উদ্দেশ্যে পেশা শিক্ষার প্রচার করিয়াছিলেন। চিত্তবিনোদন, দৈহিক ও মানসিক শক্তি-সংগঠন, হস্তনৈপুণ্য লাভ এবং পৌরকার্য্য ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে উপযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্টি শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ বিবিধ প্রকার পেশাশিক্ষা ধনাঢ্য শ্রেণীর যুবাদের জন্য প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রস্তাবে লক্ সর্ব্বক্ষণই মন ও দেহের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য সংরক্ষণের বিষয় মনে রাখিয়াছিলেন। লক্ দরিদ্রলোকের জন্য ব্যবসা ও ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সমাজ হইতে দারিদ্র্য-বিমোচন দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্মানী ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলা ষ্টেটের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহার মতে এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক দরিদ্রকে উপস্থিত হইতে বাধ্য করাইতে ষ্টেটের অধিকার আছে।

---

১ এই অংশ কপ্ত নোনি, দি লাইফ অব জন্ লক্, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ—৩৮৮-৩৯৪, ৩৯৫।

সঙ্গীতের জের

কুমারী লঙ্কা গুহ

মিনুর বড় গান শেখার শখ, কিন্তু মনের দুঃখে থাকিত বলিয়া এতদিন শিখিবার কোন সুযোগই সে পায় নাই। আরাকানের প্যাগোডা দিয়ে ঘেরা মিহং শহরে বাংলা গানের কোন চলন নেই, সুদূর ভবিষ্যতেও হইবে কি-না বলা কঠিন। তারপর যদিও মিনুর বাবার কুষ্টিতে লেখা আছে, তিনি অত্যন্ত মৃত্যাশীলপ্রিয় হইবেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সঙ্গীতের প্রতি নিতান্তই বিরূপ। একমাত্র কন্যার আবদার ঠেলিতে না পারিয়া একবার "একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ চাই" বলিয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। সঙ্গীত-প্লাবিত বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ হইতে বন্যার স্রোতের মত দরখাস্তগুলি তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। আয়তনগৌরবে একটিকে চিঠি বলা চলে। কেহ কেহ আবার গুণিয়া বিচার করিবার জন্য, রিপ্লের রেকর্ডের মত পাঠাইতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহাদের মধ্য হইতে একজনকে নিযুক্ত করা যে বড় কঠিন ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে মিনুর বাবা এই বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ গায়কের হাতের তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ভাল গায়কের হাতের [illegible] হয় না! তাঁহার পরামর্শমত সকলে মিলিয়া সব অসুন্দর লেখাগুলি একস্থানে জড় করিলেন। তারপর অনেক চিন্তা বিবেচনার পর একজনকে আসিতে লেখা হইল।

যথাসময়ে মিনুর সঙ্গীতশিক্ষক আসিয়া পৌঁছিলেন; ফিটফাট কায়দাদুরস্ত অল্পবয়স্ক যুবকটিকে দেখিয়া সকলেই যেন একটু নিরাশ হইলেন। যাহা হউক, তিনি ওস্তাদীয় ঢঙে রবি ঠাকুরের গানি যেন ভালই জানিতেন, খাইবার সময় মুখব্যাদান মিনুর বাবা মোটেই সহ্য করিতে পারেন না, এই অতি-আধুনিক মাষ্টার সেই দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। কিছু দিন খুব উৎসাহের সহিত ছাত্রীকে শিক্ষাদান করিলেন কিন্তু ক্রমেই যেন তাঁহার উৎসাহে ভাঁটা পড়িয়া আসিল। হঠাৎ একদিন তিনি এক মর্ম্মান্তিক খবর দিলেন। তাঁহার নিকট চিঠি আসিয়াছে যে তাঁহার স্ত্রীর অত্যন্ত অসুখ, সুতরাং তাঁহাকে অবিলম্বেই সেখানে চলিয়া যাইতে হইবে। তিনি প্রস্থান করিবার কিছুদিন পরে মিনুর বাবা খুব বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলেন যে, ভদ্রলোক অবিবাহিত, সে বছর মাত্র এম-এ পরীক্ষা দিয়াছেন, এমনি সব করিয়া বয়স্থাও দিয়াছিলেন। পরের পয়সায় বর্ম্মা দেখিবার লোভ সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল, তাই সসম্মানে পাশের খবর পাওয়া মাত্র কারুমিক-প্রিয়ার অসুখের

বালাই দিয়া বিলায় দেওয়াই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। মিনুর বাবা লাইনের আকস্মিক হিংস্রাধানের প্রকৃত কারণ জানিতে পারিয়া ভয়ে এত বাবা পাইলেন যে, সকলের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আর কোন নূতন মাইনাকে আঙ্কিতে লিখিলেন না। তবে মিনুকে হাতের লেখা ভাল করিবার জন্য এক ডজন কপিবুক কিনিয়া দিলেন।

এই ব্যাপারের পর বেশ কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে। মিনুর বাবা সম্প্রতি বদলি হইয়া সপরিবারে কলকাতায় আসিয়াছেন। কন্যার ম্যানেমোনিয়াতে অস্থির হইয়া তাহাকে গান শিখাইবার জন্য বেশ নামকরা একজন ওস্তাদ নিযুক্ত করিয়াছেন।

একদিন ভোরে প্রায় সাড়ে চারটার সময় বিকট চীৎকারে মিনুর বাবার ঘুম ভাঙিয়া গেল, তিনি বিস্ফারিতনেত্রে মশারির ফাঁক দিয়া [illegible] কন্যা মাটিতে বসিয়া হারমনিয়মের সহিত প্রাণপণ জোরে গলা সাধিতেছে। সেই তীব্র রাগিণী ভেদ করিয়া কোন কথা মিনুর কানে যাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ গলায় বাধা অনুভব করিয়া মিনু একটু থামিল। পিতা ধমক দিলেন, "এত ভোরে পাগলের মত চেঁচাচ্ছিস্ কেন? মাথা খারাপ হয়েছে [illegible]" মিনু গম্ভীরস্বরে কহিল, "ওস্তাদজী বলেছেন খুব ভোরে উঠে ভৈরবীর উপরি গলা সাধতে—"

এবার রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া মিনুর বাবা বলিলেন, "কানের কাছে কেন, অন্য কোথাও যা।"

মিনু একটু লাজনম্রকণ্ঠে উত্তর দিল, "অন্ধকারে একলা থাকতে ভয় করে।"

পিতাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া পুনরায় তারার পর্দায় গলা সাধিতে সুরু করিল। সেই দিনই তাহার পিতা আপিসের পর একটু দিবানিদ্রা উপভোগ করিতে যাইবেন এমন সময় দেখিলেন মিনু আবার হারমনিয়ম লইয়া বসিয়াছে। মিনুকে কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিবেন—না বাজনাটা জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিবেন এই চিন্তায় তিনি বিশেষ ব্যস্ত, এমন সময় মিনুর মার বিরক্তি-মাখান স্বর কানে আসিল, "মেয়েটা এত চেষ্টা করে গান শিখছে তাও তোমার সহ্য হয় না; আজকাল ঘরে ঘরে সব মেয়েই গানবাজনা করে, তোমার সব কিছুতেই খোলবাল বাধান চাই।" —এইরূপ অগ্নিগর্ভ সত্যকথার উপর তিনি আর কি বলিবেন? মনে পড়িল এই তৎসেদিন এক পুরাতন বন্ধুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন; সেই ভদ্রলোক নিজের কন্যার অজস্র প্রশংসা করিলেন, শেষালে প্রথম হইয়া কি পুরস্কার পাইয়াছে, টুনী জজকে কি কি মেডেল পাইয়াছে—সব দেখাইলেন। তারপর নিজেই আগ্রহ করিয়া বন্ধুকে কন্যার একঘণ্টা-ব্যাপী ভীষণ কাওয়ালী শুনাইলেন। গান শেষ হইলে মিনুর বাবা একটু কাষ্ঠহাসির সহিত কহিলেন, "বা; বেশত কীর্তনখানা।" পিতাপুত্রী উভয়েই একথা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির। অর্বাচীন মেয়েটা ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা! আপনি বুঝি গান কিছুই বোঝেন না? কীর্তনে কি এত ওস্তাদী থাকে? এটা প্রোঃ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের একটা জয়জয়ন্তী সুরের খেয়াল।" কন্যার বয়সী একটি রোট মেয়ের নিকট এরূপ অপ্রস্তুত তিনি আর ইতিপূর্বে হন নাই। যাহা হউক সেদিন আর দিবানিদ্রা হইল না—বোধ হয় নিজের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য এক প্যাকেট ওঁাস লইয়া মিনুর বাবা 'পেসেন্স' খেলিতে সুরু করিলেন।

সন্ধ্যার সময় মিনুর উৎকট রেয়াজের পালা পুনরায় আরম্ভ হইল। উচ্চৈস্বরে পিতা হাঁক দিলেন, "কেরু চীৎকার সুরু করেছিস? আর বলছি এখনি।"

মিনুর হইয়া মিনুর মা সেলাই করিতে করিতে উত্তর দিলেন, "সন্ধ্যার সময় পূরবী সুরে রেয়াজ করার নিয়ম, তাকে গলা খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়।"

মিনুর মার প্রতি এক অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মিনুর বাবা ঘরের কোণ হইতে ছড়িগাছি লইয়া হনহন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কয়েক মিনিট এরূপ রেয়াজ শুনিয়া মিনুর বাবার স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি আজকাল কানে একটু কম শোনেন। এই মানসিক দুর্বলতাবশত জোরে না ডাকিলে সহজে সাড়া যেন না।

রবিবার—ছুটির দিন। সকালে কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় কন্যা শিল্প হইতে আসিয়া দুই হাতে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের ভঙ্গীতে কহিল, "বাবা, আমাকে এবার বাঁয়াতবলা কিনে দাও না!"

চক্ষু কপালে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত মিনুর বাবা বলিলেন, "তুই তবলা বাজাবি, বলিস কি রে! ফের্ ওসব কথা মুখে আনবি ত গানশেখা বন্ধ করে দেব।" মিনু পিতার অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "তুমি কিছু বোঝ না, তবলচী বাজাবে, আমি শুধু সুরে গাইবো।"

এ কথার পরও তিনি সামান্য আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু মিনুর মার তর্জ্জন গর্জ্জনে সব আপত্তি অচিরাৎ দূর হইল।

হঠাৎ সেদিন একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়িতে পড়িতে মিনুর বাবার চোখে পড়িল '··· ৭ বছর বি ক্লাসের টুনুর মা কন্যার বেসুরে গলায় গান বাহির করিবার জন্য দুইজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন যে গান না জানিলে আজকালকার বিবাহের বাজারে তাহার কন্যা অচলমান বলিয়া বিবেচিত হইবে।" পত্রিকা হইতে এই স্থানটুকু কাটিয়া অবিলম্বে পত্নীর সেলাইয়ের বাক্সের উপর গদ দিয়া আঁটিয়া দিলেন।

এই খবরটি পড়িয়া মিনুর মার মনে কোন রেখাপাত করিয়াছিল কি-না দুঃখের বিষয় তিনি জানিতে পারেন নাই—হারমনিয়ম সম্বন্ধে নেপ-নেতা অহরলাল কি বলিয়াছেন তাহা মিনুকে তিনি দিনে অন্তত [illegible] করিয়া বলেন। মিনুর মার অন্তরালে "জোরে চীৎকার করিলে মাথার রগ ছিঁড়িয়া যায়, মস্তিষ্কে গণ্ডগোল হয়।" ইত্যাদি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ মিনুকে অনেক দিয়াছেন কিন্তু কোন লাভ হয় নাই।

মিনু যে সঙ্গীত-জগতে অতি উচ্চস্থানে অধিকার করিবে সে বিষয়ে মিনু ও মিনুর মার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই [illegible] বলিয়াছেন যে, আর মাত্র তিন বৎসর এভাবে সাধনা করিলে [illegible] গানের প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবে। "মিনু [illegible]

বৎসর" শুনিয়া মিনুর বাবার অবস্থা কাহিল হইয়াছিল আর কি! তারপর মিনু ভয়ের প্রাণের সঙ্গে রেখার নিকট হইতেও অনেক আশার বাণী শোনে। বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র রেয়াজের আলায় অতিষ্ঠ হইয়া বাড়ীওয়ালা নাকি তাঁহাকে নোটিস্ দিয়াছিল (অবশ্য তখন এই গায়ককে কেহই চিনিতেন না)। মিনুর বাড়ীওয়ালার নোটিস্ পাইবার ভয় নাই, কারণ তাহারা নিজেদের বাড়ীতেই থাকে। যা কিছু আপত্তি গোলমাল আসে সব পিঠার দিক হইতে। রেয়াজ কানে আসিলেই মাথা-ধরা কাশে-কটকট করা গুম-গুম ভাব প্রভৃতি নানা উপসর্গ আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করে। অনুতাপজনক, ওরিয়েন্টালবাম অনেক শিশি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কোন উপকার পান নাই। রেয়াজের সময়টা ছাড়া অন্য সময় বেশ ভালই থাকেন।

ভোরে সেদিন যখন রেয়াজের শব্দ কানে আসিল না, তখন মিনুর বাবা একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। পরক্ষণেই মিনুর ঘর হইতে বিড় বিড় করিয়া পড়ার আওয়াজ কানে আসিল। ও নহসা তাঁহার মনে পড়িল, "আহা! কাজে, রাত থাকার কতদিনের মধ্যেও বেচারীকে একটু পড়া বলিয়া দেওয়া হয় নাই। অনুতপ্তচিত্তে কাছে গিয়া দেখেন টেবিলের উপরে একটুকরো কাগজে কি লেখা আছে সেটা মিনু খুব মনোযোগের সহিত মুখস্থ করিতেছে। অনেক ভাবিয়াও তিনি ঠিক করিতে পারিলেন না; বাঁশের ছড়ি দিয়া কাঁচের বাসনের উপর আঘাত করিলে যেমন একটা অদ্ভুত আওয়াজ হয় এটা অনেকটা সে ধরণের। কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামণি, এটা কি শিখছিস রে, ল্যাটিন গ্রামার?" মিনু জবাব দিল, "ল্যাটিনের বুঝি এমন উচ্চারণ হয়? এগুলি তবলার বোল, ওস্তাদজী আজকে মুখস্থ করতে দিয়েছেন।" কি বিদঘুটে কথাগুলি—ধি, তেরেকেটে, ধি, না, তুনা, কিছুতেই মনে রাখতে পারছিলাম না, বাবা লক্ষ্মীটি একটু মুখস্থ দাও না!" উহা কণ্ঠস্থ হইয়াছে কি-না তাহা পরীক্ষা করিবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তোর পরীক্ষা কবে?" কন্যা তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দিল, "এখনও বেড় মাসের উপর বাকি আছে, আজকে সপ্তাহে টেষ্ট আরম্ভ হবে।"

এই রেয়াজ করিয়াও যখন মিনু একবারে সিনিয়র স্কেলিপ পাশ করিয়া গেল, তখন সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য হইলেন মিনুর বাবা। তিনি ত ঠিক করিয়াছিলেন, স্কেল বাহিরেই গান শেখা বন্ধ করিয়া দিবেন। কলার সঙ্গ অনুযায়ের কৈয়ম খাঁ, আবদুল করিম খাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়কের দুই চারজন রেকর্ড উপহার স্বরূপ কিনিয়া দিলেন। মিনুর রেয়াজ শুনিতে শুনিতে কিছুটা রস হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু এই রেকর্ডগুলি যখন বাজান হইত তখন তিনি রসের বদ নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা অতিকষ্টে দমন করিতেন।

* * * * *

সেই দ্বিতীবিকাময় তিন বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আগামী বছর এলাহাবাদে যে মিউজিক কনফারেন্স হইবে তাহার জন্য এখন হইতেই মিনু তৈরী হইতেছে। এ দিকে মিনুর বাবা, 'হারমনিয়মের অপকারিতা' সম্বন্ধে একটা গবেষণামূলক পুস্তক লিখিতেছেন। আশা করা যায়, মিনু এলাহাবাদ হইতে অনেক পুরস্কার লইয়া ফিরিবার পূর্বেই তাঁহার বইটা বাজারে বাহির হইয়া যাইবে।

মোটর বাইকে পাঁচ হাজার মাইল

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ

ভ্রমণ

শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে আরম্ভ ক'রে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "পা-দুটো থাকলেই চলা যায়, কিন্তু হাত দুটো থাকলেই তো আর লেখা যায় না!"

এটা অবশ্য শরৎচন্দ্রের স্বভাব-সুলভ বিনয়। তা হোক্, কথা কিন্তু সত্যি; তা আমাদের পক্ষে যে কতদূর আক্ষরিক সত্য, তা তখনই বুঝি, যখন দেখি দিনের পর দিন, রাতের পর দেশ অতিক্রম ক'রে চলেছি, স্মৃতির পাতায় কত বিচিত্র রকমের কাহিনী মুদ্রিত হ'য়ে গেছে, অথচ লিখতে ব'সে আকাশ-পাতাল ভেবে কূলকিনারা পাই না যে কেমন ক'রে কাহিনীটা আরম্ভ করি।

কথার মালা গেঁথে যাঁরা আমাদের মুগ্ধ করেন তাঁরা আপনাদের নমস্য।

আমি কবিও নই, সাহিত্যিকও নই—এই কথাটাই আমাদের সর্বাগ্রে জানিয়ে রাখি।

অনেকদিন আগে থেকেই ভূস্বর্গ কাশ্মীর দেখবার বাসনা মনের মধ্যে জেগেছিল। তাই যখন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত

অমিয় লাহিড়ীর কাছ থেকে প্রস্তাব এল কাশ্মীর-ভ্রমণের, তখন আমরা সানন্দে তাতে রাজী হলাম। ইনি কলিকাতা-বাসী। দার্জিলিং ছাপীভালী টী-এষ্টেটের অধ্যক্ষের পুত্র অমিয় ব্যানার্জি এঁর বন্ধু। তিনিও আমাদের সঙ্গী হবেন—এ কথা কল্‌কাতা থেকে বন্ধুবর আমাদের জানিয়েছেন। ঠিক হ'লো—আমি ও বন্ধু শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ মাত্রা হুগলী থেকে যাব।

বাংলার গভর্ণর বাহাদুর তখন দার্জিলিং-এ। সুতরাং ছাড়পত্রের ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী। যত শীঘ্র তা পাবার আশা করেছিলাম, তত শীঘ্র না পাওয়ায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত লাহিড়ী আগেই দার্জিলিং রওনা হলেন। তাঁর ছাড়পত্রের ব্যবস্থা আগেই হয়েছিল। তিনি ও তাঁর বন্ধু ১৮ই অক্টোবর

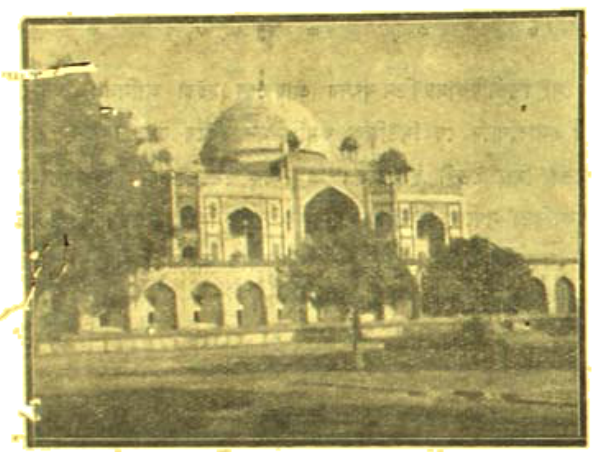

হুমায়ুনের সমাধি মন্দির দিল্লী

দার্জিলিং থেকে নেমে এসে শিলিগুড়িতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন—এই ঠিক হ'ল। ঐ তারিখের মধ্যে আমাদের ছাড়-পত্র পাওয়া যায় ভালই, না-পাওয়া গেলেও আমরা শিলিগুড়ির পথে রওনা হব ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই, একথা বন্ধুবরকে জানিয়ে দিলাম।

যথাসময়ে ছাড়পত্র হস্তগত হ'ল।

১৯শে অক্টোবর সকাল সাতটায় শিলিগুড়ি ষ্টেশনে এসে দার্জিলিং মেল থামল।

ষ্টেশনের বাইরে প্রকাণ্ড সাইডকারযুক্ত মোটার বাইকে বন্ধুবর আমাদের প্রতীক্ষায় ব'সে ছিলেন। তাঁকে তাঁর সঙ্গীটির কথা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, তিনি ১৬ মাইল দূরে তিস্তালিপ্তার (জলপাইগুড়ি) ডাক-বাঙ্গলোতে অপেক্ষা করছেন। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা তিনজন তিস্তালিপ্তায় এসে পৌছালাম।

যথাযোগ্য আলাপ-আপ্যায়নের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা বারটার সময় কিষণগঞ্জের দিকে গাড়ী চালালাম।

দার্জিলিং-নিবাসী সঙ্গীটিকে আমিও চিনতুম না, আমার বন্ধু নিমাই মাত্রাও চিনত না। কিন্তু এই অপরিচয়ের প্রাথমিক সঙ্কোচ কখন্ কেমন ক'রে যে-কেটে গেল তা আমরা টেরই পেলুম না। কিষণগঞ্জে এসে যখন পৌছালাম তখন তিনি বললেন, "নতুন বিয়ে-করা ইয়ের মতন মুখ ইয়ে-ক'রে থাকা আমার ধাতে সয় না; সুতরাং বায়নাক্কা এই যে, যখন যা খুশী বলব, যখন যা খুশী করব, কিন্তু ঐ যে বললুন, ইয়ের মতন ইয়ে হ'য়ে থাকবও না, থাকতে পারবও না—কি বলেন মিষ্টার ঘোষ?"

আমি এই সদাপ্রফুল্ল অমায়িক ভদ্রলোকটিকে অন্তরের প্রীতির অভিনন্দন জানিয়ে বললুম, আপনার কথা অকাট্য।

পথ দারুণ খারাপ। একে বিপথ বলাও চলতে পারে। কামানের গোলা এসে হঠাৎ কানের কাছে ফাটলে যেমন আওয়াজ হয়, তেমনি একটা শব্দ হ'য়ে বাইকখানা হাত দুই লাফিয়ে উঠ্‌ল। উল্টে যে যায়নি, সেটাকে সৌভাগ্য ব'লে মেনে নেবার প্রবৃত্তি তখন আর হ'ল না, আমরা এমনি বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলুম। যাত্রার প্রারম্ভেই এই অবস্থা—না জানি অদৃষ্টে কি অশেষ দুর্গতিই আছে!

চাকার ফুটা মেরামত ক'রে কন্-কনে নদী পার হ'য়ে তার ছ মাইল দূরে আর একটা নদীর সামনে এসে হতাশ হ'য়ে পড়ি।

ভাদ্রের ভরা গাঙের মত এই অগ্রহায়ণের নদীটি তার কূলে-কূলে উপ্‌চে-পড়া যৌবন কেমন ক'রে যে ফুটে রেখেছে—সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। অজানা নদীটির নাম মহানন্দা। কোন্ এক অজ্ঞাত কালের কোন্ অজ্ঞাত মনীষীর মুখ থেকে এর নাম প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল তা জান্‌বার আজ কোন উপায় নেই; কিন্তু যিনিই তার নাম দিন না কেন, কোন্ এক অলৌকিক মহিমায় আজ সে সার্থকনামা হ'য়ে উঠেছে—মহানন্দা।

ফেরিঘাটে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, পথ খুব ভাল।

ভাল যে কেমন তা পরে বুঝেছিলুম।

আধঘণ্টার মধ্যেই অন্ধকার হ'য়ে গেল। বাইকের সার্চলাইট জ্বলে উঠ্‌ল। সাম্‌নে অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটি নদী। আমাদের চার্টে এ নদীর কোন উল্লেখ ছিল না। হঠাৎ খুব জোরে ব্রেক ক'সে গাড়ীর গতিরোধ না করলে একেবারে স-বাহন নদীগর্ভে বিসর্জিত হতে হ'ত।

পূর্ণিয়ায় যখন পৌছালাম তখন খানিকটা রাত হয়েছে, শীতের নিশুতি রাত, শহর নিস্তব্ধ। জনযোগে সোলযোগ বাধ্‌ল। অথচ কারুর উপর অভিযোগ করা চল্‌ল না। অদৃষ্ট যে মন্দ! রাত দশটায় কারাগোলা রোড স্টেশনে পৌছালাম।

এখান থেকে ভাগলপুর যেতে একমাত্র ট্রেনই ভরসা। অথচ সে রাত্রে ট্রেন যে মিল্‌বে, এমন আশ্বাসবাণী টাইম টেবলে লেখা ছিল না। স্টেশন মাষ্টার দয়া ক'রে ওয়েটিং-রুমে থাকতে দিলেন। গাড়ী পরদিন বেলা এগারটায়।

আহারান্বেষণে দুই বন্ধু বেরুলেন। ঘণ্টাখানেক পর খবর নিয়ে ফিরলেন বাজারের মধ্যে এক বিহারী ব্রাহ্মণের একটা সরাই আছে। বাজারে অন্যান্য আহার্য্যও মিল্‌তে পারে। অনেক বন্ধু বিহারীর হোটেলই মনোনীত করলেন—কারণ তিনি শুনেছিলেন, হোটেলওয়ালা অন্যান্য উপাদেয় আহার্যের সঙ্গে "চোখা" নামক একটি অতি অভিনব বস্তু আমাদের খাওয়াবেন।

খেতে বসে বন্ধুবর অপরূপ "চোখা" বস্তুটির আবির্ভাব সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে রইলেন। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গেল, প্রায় কেন, সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল—তবুও সেই অ-পূর্বদর্শন বস্তুটি পাতে এসে পড়্‌ল না দেখে তিনি বিমর্ষ মুখে হোটেলওয়ালাকে অনুযোগ করলেন। সেই হোটেলওয়ালা ওরফে নিরীহ বিহারী ব্রাহ্মণটি সহাস্য মুখে জানালেন, "বাবু, আপনি তামাসা করছেন, 'চোখা' কেমন লাগল, বলুন?" বন্ধুটি তখন খুব বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন, "সে কি, চোখা আমি খেয়েছি!"

বিহারী ব্রাহ্মণটি সবিনয়ে জানালেন যে, আমরা যাকে 'আলু ভাতে' বলি, সেইটা তাদের 'চোখা'। বন্ধুবর অপ্রতিভ হ'য়ে একরূপ ক্ষিপ্ত হ'য়েই উঠ্‌লেন। তাঁর অনিন্দ্য অনাস্বাদিত-পূর্ব অভিনব "চোখা" শেষে হ'ল কি-না সেদ্ধ আলু ভাতে!

হাত মুখ ধুয়ে পান-চিবুতে চিবুতে বললেন, এতক্ষণে মনে পড়েছে—আমাদের বাড়ীতে একটা খোট্টা চাকর ছিল, সে বল্‌ত বটে, 'আলুকা চোখা আর ডংরকা ডাল'। বেটা অন্নবুক—তখন যদি আমাকে মানেটা বুঝিয়ে রাখ্‌ত।

যাই হোক, এমনি ক'রে আমাদের "চোখা"-পর্ব শেষ হ'য়ে গেল। আমি মনে মনে এই কথাই সেদিন ভেবেছি, বিহারী ব্রাহ্মণ চোখার নামে বন্ধুবরকে বোকা বানিয়েছিল সত্য, কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে মানুষের যে একটা স্বাভাবিক আদিম লোভ আছে সেটাকে উপলক্ষ ক'রে বন্ধুকে সেদিন এ মর্মান্তিক বেদনা দেওয়ার আমাদের কোন অধিকার ছিল না।

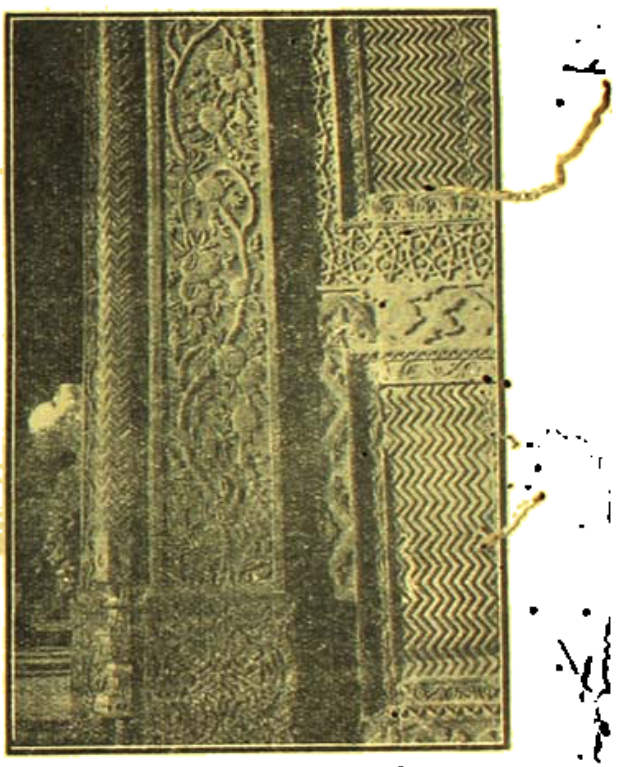

জগদীশপুর সিভিল একটা প্রাচীন স্তম্ভের কারুকার্য

বলা বাহুল্য, যথাসময়ে ১১টার ট্রেন এসেছিল ও আমরা তাতে চেপে ভাগলপুর পৌছেছিলাম। ভাগলপুরে আহারাদি সেরে রাত ৮টায় দেওঘর অভিমুখে যাত্রা করলাম। ভাগলপুর থেকে ৭২ মাইল ঘুরে যেখান থেকে দেওঘর রোড বের হয়েছে, সেখানে আমাদের এক বন্ধুর মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধি চাপে। তখন রাত প্রায় ১১টা। অনেকগুলি গরুর গাড়ী যাচ্ছিল। প্রত্যেক গাড়োয়ানই নিদ্রিত। বন্ধুবর একটা গাড়ীকে নিয়ে গিয়ে একটা সোড়ো বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে

দিলেন। তারপর তিনি ঘুমন্ত গাড়োয়ানের কানে বিকটভাবে চীৎকার ক'রে উঠলেন।

লোকটি এই অবস্থায় জেগে উঠে এত ভয় পেয়ে গেল যে আমরা তিন জন তাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারি না। আমাদের অদ্ভুত সাজ পোষাকে সে হয়ত আমাদের ভৌতিক জীব মনে করেছিল।

অবশেষে তাকে শান্ত করতে আমাদের কি যে বেগ পেতে হয়েছিল তা বর্ণনা ক'রে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। বন্ধুটির উপর আমরা সকলে অপ্রসন্ন হয়েছিলুম। দেওঘরে যখন পৌঁছালাম তখন রাত বারটা। দেওঘরে যে বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণের কথা ছিল সেটা বার করা আমাদের পক্ষে একটা মর্মান্তিক ট্রাজেডি।

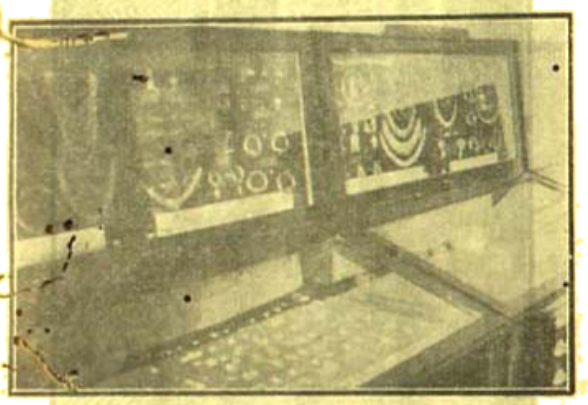

তক্ষশীলার মিউজিয়ামে রক্ষিত স্বর্ণালঙ্কার

কলকাতার মত বাড়ীর নম্বরের কোনবালাই নেই, সুতরাং অপরিচিত বিদেশী লোকদের অন্য কারও সাহায্য ছাড়া বাড়ী খুঁজে বের করা অসম্ভব। কিন্তু রাত্রে জনপ্রাণীহীন শহরে আমাদের তখন কে চিনিয়ে দেবে সেই বাড়ীটি! আমরা হতাশ হ'য়ে বিমর্ষভাবে রাস্তার ধারে বসে পড়লুম; মনে করলুম, দূর ছাই, কি হবে আর সারা শহরটা টহল দিয়ে অনিশ্চিতভাবে? তার চেয়ে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া যাক।

কে একজন বললেন, গাছেরা রাত্রিকালে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ত্যাগ করে, সুতরাং গাছের তলায় রাত কাটাতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণটা মাঠের মাঝে হারাতে পারব না।

এক পাহারাওয়ালা এসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুললে; আমাদের অবস্থার কথা তাকে জানালুম, একটু কাতরভাবেই জানালুম। দেখলুম লোকটা আর যাই হোক, করুণ রসটা উপভোগ করবার তার ক্ষমতা আছে। লোকটি ব্যাপারটা বুঝে বললে, "আমি সে বাড়ী চিনি, চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।" তারপর খানিক দূর আমাদের নিয়ে গিয়ে দূর থেকে একটা বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। আমরা শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করলাম।

পরদিন (২১ অক্টোবর) নির্মলবাবু আমাদের গাইড হলেন। তাঁর সাহচর্যে আমাদের দিনটা পরমসুখে কেটে গেল।

২২শে অক্টোবর আমরা গিরিডি অভিমুখে রওনা হলাম। আমাদের রোড ম্যাপে দেওঘর থেকে গিরিডি যাবার ভাল রাস্তা দেখানো ছিল না। নির্মলবাবু বাসওয়ালাদের কাছে খোঁজ নিয়ে আমাদের জানালেন যে একটি পথ আছে। শুষ্ককালে মোটর বাইক চলতে পারে। তাঁরই নির্দেশমত গন্তব্যপথে যাত্রা করলুম।

খানিকটা যাওয়ার পর একটা নদী পড়ল। জল খুব কম, কিন্তু বালি ভাঙতে হয় অনেকটা। গাড়ী নিজের 'পাওয়ারে' পার হ'তে পারবে ভেবে আমরা নদীতে নেমে পড়লুম, বেশ কতকটা যাবার পর পিছনের চাকা ডস্ ক'রে বালির মধ্যে বসে গেল। যতই ইঞ্জিন 'রেশ' করি, ততই চাকা যায় ব'সে। বড়ই নিরুপায় বোধ হ'ল। জুতা মোজা খুলে জলে নামতে হ'ল গাড়ী ঠেলবার জন্যে। কিন্তু আমাদের চারজনের সমবেত চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে গাড়ী রইল অচল অনড়।

দূরে শস্যক্ষেতে অনেকগুলি চাষী কাজ করছিল। মোটরের বিকট আওয়াজে আর আমাদের হৈ চৈ-এ তারা গুলি এরই মধ্যে নদীর ধারে এসে জুটেছিল। তারা স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়েই আমাদের সাহায্য করতে এল। তাদের সাহায্যে অনেক কষ্টে গাড়ীকে ওপারে ঠেলে তুলতে পেরেছিলুম।

গাড়ী খানিকটা চলতেই দেখি পথরেখা হঠাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে আছে বড় খানা, খোন্দল, নালা। বহুকষ্টে ধীরে ধীরে [illegible] হ'তে লাগলুম। ক্রমান্বয়ে আরও তিনটা বড় ও ছুটা [illegible]

নদী পার হলুম। সবগুলিতেই জল কম, কিন্তু বালি বেশী। সুতরাং পূর্বোক্ত নদীটির মতন সবগুলিই অল্পবিস্তর বেগ দিয়েছিল পার হবার সময়, একথা বলা বাহুল্য!

এইভাবে ৪৬ মাইল পথ অতিক্রম করার পর মির্জাগঞ্জ নামে একটা গ্রামের কাছে এসে আমাদের গাড়ীর পেট্রোল গেল ফুরিয়ে। যদিও দেওঘর ছাড়ি তখনও দুই গ্যালন অর্থাৎ ১০০ মাইল চলবার মত পেট্রোল ছিল। সেই বাসওয়ালারা বলেছিল ৭২ মাইল পথ। কাজেই আমরা ঠিক করেছিলুম গিরিডিতে এসেই তেল কিনব। যাই হোক মির্জাগঞ্জে জানতে পারলুম, সেখান থেকে ছয় মাইল দূরে জামুইতে বাস চলাচল করে। সেখানে বাস-ওয়ালাদের কাছে পেট্রোল মিলতেও পারে।

কিন্তু এ পর্যন্ত দেওঘর থেকে মির্জাগঞ্জ এই ৪৬ মাইল পথ আমরা সকলেই এমন নাস্তানাবুদ হ'য়ে এসেছি যে এই দুই মাইল পথ যে হেঁটে যাব তেমন সামর্থ্য আমাদের ছিল না। পেট্রোল ট্যাঙ্কে ফুঁ দিয়ে কারবুরেটারে পেট্রোল জমিয়ে খানিকটা বাইক চালান গেল। খানিকটা পথ বাইক আর আমাদের চড়তে হ'ল না—বাইকই আমাদের উপর চড়ে চলল। ভাগ্যক্রমে বাকী পথটুকু ঢালু ছিল, তাই রক্ষে; জামুই পৌঁছুতে আর বেশী কিছু কষ্ট পেতে হয়নি।

বাণিহাল পাশ—টানেলের মুখে—৮৯৯০ ফিট, কাশ্মীর

বিকাল তিনটায় গিরিডি পৌঁছালুম। উষ্ণ নদীর জল ও দোকানের 'পুরী'তে উদর পূর্তি ক'রে সন্ধ্যা ছটায় গিরিডি-ডুমুরি চটি রোড ধ'রে ডুমুরিতে এলুম। সেখানে চা খেয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে ফের চলতে লাগলুম। কিছু দূরে রাস্তার দুপাশে হাজারিবাগের জঙ্গল পাওয়া গেল। আমরা বন্দুক নিয়ে শিকারের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। জামুয়া ডাক বাংলোর পৌঁছাবার মাইল খানেক আগে হঠাৎ এক শিকার পাওয়া গেল। জনৈক বন্ধু ক্ষিপ্রহস্তে বন্দুক ছুঁড়লেন, গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'ল। একটি পরগোস লক্ষ্য পথ থেকে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। আমাদের পিছনে দূরে একটা সার্চলাইট ফিট-করা শিকারী মোটর আসছিল। আমাদের বন্দুকের আওয়াজ শুনে সেটি তীরবেগে ছুটে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। মোটরস্থ জনৈক ভদ্রলোক চড়া গলায় আমরা কেন প্রাইভেট জঙ্গলে শিকার করছি তার কৈফিয়ৎ তলব করলেন। আমরা তাঁকে সবিনয়ে জানালাম যে, ওটা যে প্রাইভেট্ জঙ্গল তা আমাদের জানা ছিল না। পরিশেষে তিনি ও মোটরস্থ অন্যান্য ভদ্রলোক আমাদের অজ্ঞতা মেনে নিয়ে বললেন যে, গাড়ীর নম্বর দেখেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা বিদেশী। নইলে তাঁরা আমাদের বন্দুক কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারতেন। আলাপ ক'রে জানতে পারলুম যে, প্রশ্নকর্তা স্বয়ং টিকারীর রাজপুত্র।

সে রাত্রে আমরা জামুয়া ডাকবাংলোয় রইলুম।

পরদিন (২৩শে অক্টোবর) সকাল সাতটায় আমরা সারঘাটী অভিমুখে যাত্রা করলাম। সারঘাটীর জমিদার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয় আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেইখানেই উঠলুম। কিন্তু তখন শ্রীনগরের অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী আমাদের মানসপটে বিচিত্র

তুলির রঙে প্রতিনিয়ত রঙ ফলিয়ে চলেছে, কতক্ষণে যে তা প্রত্যক্ষ উপভোগ করতে পাব—এই ছিল আমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়। তাই পথের আর কোন ব্যাপার আমাদের আর তেমন ক'রে আকর্ষণ করতে পারে নি। যেখানে কোন একটা আকর্ষণের কারণ ঘটেছে, সেইখানেই এই অজুহাত দিয়ে মনকে প্রবোধ দিয়েছি যে, শ্রীনগর দেখার পর ফেরবার পথে যথেষ্ট সময় পাব, তখন আমরা তন্ন তন্ন ক'রে প্রত্যেক জায়গার প্রত্যেক জিনিষটি দেখে যাব, এখন নয়।

দূর পথের স্বপ্নমায়া তখন তার অলৌকিক হাতছানি দিয়ে আমাদের সামনের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছিল, তাই গুপ্ত মহাশয়ের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সেখানে একটা দিনের জন্যও থাকতে পারলুম না। ফেরবার

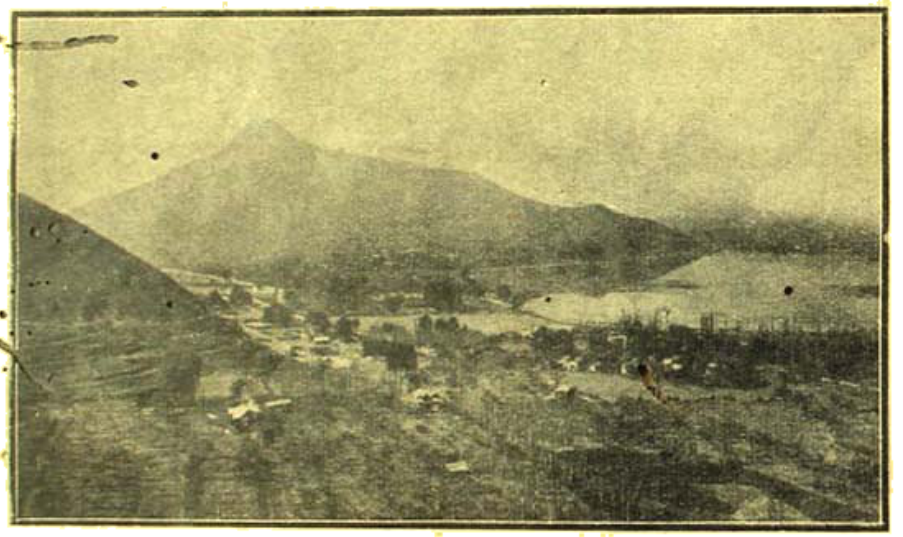

পরীমহল পাহাড় হইতে হারুদ্রু ও শ্রীনগর সহরের একাংশের দৃশ্য

পথে থেকে যাব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

বেলা বারটায় শোন নদীর তীরে পৌঁছালাম। সেখানেই স্নান সারা গেল। আহারের প্রয়োজন ছিল না। কারণ সারঘাটীর গুপ্ত মহাশয় জলযোগের নামে আমাদের জঠরের উপর যে অত্যাচার করেছিলেন, তার উপরে আমাদের আর কিছু করতে ভরসা হ'ল না।

এইবার আমাদের শোন নদী পার হবার পালা। এক বন্ধু বললেন—ট্রেনে পার হওয়ার চেয়ে নৌকায় পেরোনো কম খরচে হতে পারে। তাঁরই কথামত নৌকা ঠিক করতে গেলাম। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে, নৌকায় গাড়ী তুলতে বেশ একটু বেগ পেতেও হবে, অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতেও হবে। মাঝি বললে, গাড়ী সমেত আমাদের পরপারে পৌঁছে দিয়ে সে বারটি রৌপ্যমুদ্রা দক্ষিণা নিশ্চয়ই নেবে। সুতরাং পেছিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কেন না গাড়ীতে ওর চেয়ে বেশী ভাড়া লাগবে না, অধিকন্তু তা অধিকতর সুবিধাজনক ও নিরাপদ।

এর পর আমরা ইষ্ট-ব্যাঙ্ক ষ্টেশন-এ এলাম। দেখলুম এবারকার ব্যবস্থা খুব ভাল। আগে কোন গাড়ী পার করতে হলে ষ্টেশন মাষ্টারের কামরার দুয়ারে ধরণা দিয়ে অন্তত তিন ঘণ্টা পড়ে থাকতে হত। এখন আর সে বালাই নেই। গাড়ী তোলা-নামানর কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্যে উপযুক্ত লোকজন সবসময়ই মোতায়েন থাকে, কাজেই আমাদের এতটুকুও অসুবিধা হ'ল না।

ও পারে ডিহিড়ি-অন-শোনে গুরু ভোজন করা গেল। ব্যস, পথে আর কোথাও অপেক্ষা করা নয়, আর যেন আমাদের কোন কাজই নেই—কেবল ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথ অতিক্রম করে চলা—এই চলার পথে যা না করলে নয় তাই করা—ঘুম পেলে ঘুমানো, খিদে পেলে খাওয়া—আর দিনের পর দিন পথকে অতি সহজে অবলীলাক্রমে পিছনে ফেলেরেখে চ'লে যাওয়া।

আমরা এখন বেনারসের দিকে চলেছি। এখান থেকে বেনারস ১০০ মাইল। সাসারাম পর্য্যন্ত পথ মন্দ নয়। সাসারামে শের শাহের সমাধি দ্রষ্টব্য। দুর্গাবতী নদীর উপরে সেতু আছে। পার হয়েই বৃক্ষপ্রদেশের এলাকায় এলুম। সাসারামের পর থেকে পথ বরাবর খারাপ। বেনারস পৌঁছাতে যখন মাত্র ২০ মাইল বাকী, তখন হঠাৎ একটা চাকা পাংচার হ'ল। তাড়াতাড়ি চাকা বদলে আবার পথ চলতে সুরু করলুম। পথে যখন বেরিয়েছি তখন দমলে চলবে না, পথের বিপদকে বরণ ক'রে নিতেই হবে।

বেনারসের প্রবেশমুখে ডাফরীন্ ব্রীজ। সেখানে

যথাবিধি আটক পড়লুম। তখন রাত সাড়ে আটটা। এটা রেলওয়ে রোড ব্রীজ। সুতরাং রেলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে থাকায় মোটর-যাত্রীদের পার হ'তে রেলওয়ে কর্মচারীদের মর্জ্জির উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয়। ক্যাবিনে অনেকক্ষণ দরবারের পর রাত দশটায় তারা দয়া ক'রে পারের অনুমতি দিলেন।

বেনারসে যে বাড়ীতে ওঠ্‌বার কথা ছিল, বড্ড বেশী রাত হোয়ে গেছে দেখে, সেখানে গিয়ে ওঠা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। বীরেশ্বর পাঁড়ের ধর্মশালায় গিয়ে অতিথি হওয়া গেল।

যাঁর বাড়ীতে ওঠ্‌বার কথা ছিল, পরদিন সকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে প্রথমেই খুব একচোট বকুনি খেলুম, এ বড় মন্দ নয়। ভদ্রলোককে অযথা বিব্রত করিনি, এই হ'ল আমাদের অপরাধ! বকুনি-পর্ব শেষ ক'রে তিনি সটান্ আমাদের টান্‌তে টান্‌তে ধর্মশালায় নিয়ে এলেন এবং আমাদের বোচকা-বুচ্‌কি কতক গাড়ীতে, কতক মুটের মাথায় বোঝাই ক'রে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তবে ক্ষান্ত হ'লেন। সত্যি, পথে ঘাটে এরকম সজ্জন লোক পাওয়া যায় বলেই মানুষ দেশভ্রমণ করতে পারে। নতুবা দেশভ্রমণের নামে লোকের গায়ে জ্বর আসত হয়ত।

ইনি অবশ্য আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত অমিয় ব্যানার্জীর আত্মীয়—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত ভাস্করদেব মুখোপাধ্যায়।

সারনাথে মূলগন্ধকুটীবিহারের দেওয়ালে অঙ্কিত চারু কারুকার্য্যগুলি দেখে মুগ্ধ না হ'য়ে থাকা যায় না, এতই মনোহর।

নানা কারণে বেনারস ত্যাগ করতে একটা বেজে গেল। পথে যথাসম্ভব কম বিশ্রাম ক'রে রাত্রি এগারটায় মহারাজপুর পৌঁছাযায়। এখান থেকে কানপুর আরও এগার মাইল। রাস্তার অবস্থা মোটের উপর মন্দ ছিল না। মহারাজপুর ডাকবাংলোয় সেই রাত্রির মতন থাকা স্থির করলুম, নিজেদের তৈয়ারী চা ও সঙ্গে আনীত খাবার খেয়ে রাতটা কাটানো গেল।

আমাদের এই একঘেয়ে একটানা ভ্রমণকাহিনীর ভেতর নূতনত্ব কিছু ছিল না। ছিল শুধু এগিয়ে চলার একটা প্রত্যক্ষীভূত আনন্দ। তাই এ কাহিনী হয় তো পাঠককে নব নব রস পরিবেশন করতে সমর্থ হবে না। তবে সহৃদয় পাঠককে এই ভেবে এই কাহিনী-লেখককে ক্ষমা করবেন যে, যেখানে দেখা ও শোনার মধ্যে কোন নূতনত্ব নেই সেখানে শুধু লেখনীর রঙে রঙীন করবার কৌশল এ অধমের জানা ছিল না।

পরদিন সকালে চা-পান ক'রে আটটায় রওনা হই কানপুরের দিকে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ১১ মাইল পথ পার হওয়া গেল। কানপুর শহরের চারিদিক ঘুরে আস্‌তে আরও ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। আমরা—যে সময়ে কানপুরে গিয়েছিলাম তখন সেখানে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার গণ্ডগোল সবেমাত্র থেমেছে। শহর শান্ত। আমরা স্টেশনের

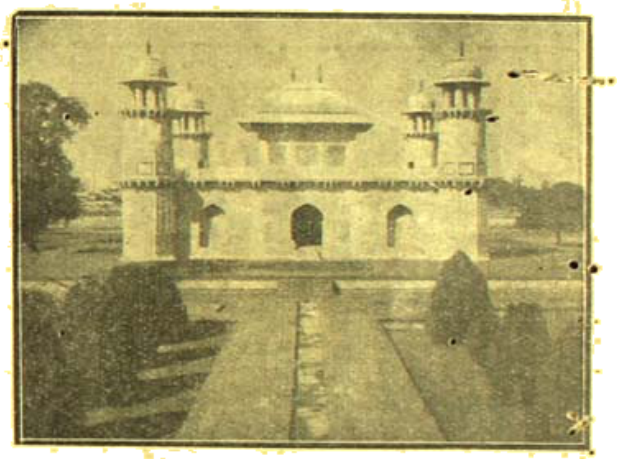

ইতিমাদ্ উদ্দৌলা—নূরজাহানের পিতার সমাধি মন্দির, আগ্রা

কাছে এক পারশী হোটেলে আহারাদি সারলাম। বিদেশে বেরিয়ে অবধি আমরা স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মকানুনগুলোও মেনে কখনও চল্‌তে পারিনি। আহারের পরে যে স্নান করার বিধিবদ্ধ প্রণালী আছে, তা পালন করার সময় ঘটে ওঠেনি। স্থির করলাম, পথে অনেক খালটাল পাওয়া যাবে তাতেই স্নান সারব। বেলা দশটায় কানপুর ছাড়লুম। কিছুক্ষণ চলার পর একটা খাল পাওয়া গেল। জলের রঙ্ কালো, বন্ধুরা বললেন—জল বড় অপরিষ্কার। এ জলে স্নান করা উচিত হবে না। আরও এগিয়ে চললুম। একটার পর একটা ক'রে অনেকগুলি খাল পার হয়ে এলুম। প্রত্যেকটির জল কালো। সুতরাং স্নান করা আর হ'ল না। বেলা ৩টায় ফতেপুর শহরে পৌঁছালুম। রৌদ্রের প্রখরতায় প্রত্যেকেরই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছিল।

স্নান না ক'রে আর এক পাও খাওয়া অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছিল। শহরে ঢুকে আবার একটা খাল পেলুম, তারও জল কালো। কিন্তু বেহদ্দের তখন এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছি যে, এর কালো রঙ্ আর আমাদের স্নানের প্রবৃত্তিতে বাধা ঘটাতে পারলে না। পোষাক পরিচ্ছদ খুলে নেমে পড়লুম। জল খুব ঠাণ্ডা। স্নান ক'রে এত তৃপ্তি মনে হ'ল, যা জীবনে কখনও পাইনি। দেখলুম, জলের উপরকার ঐ কালো রং ওটা ওর ছদ্মবেশ। ওর অন্তরে কোন আবিলতা ছিল না। খালের জল যতটা নির্মল হওয়া উচিত ততটাই তা নির্মল ছিল।

গুলমার্গ হইতে খেলনবার্গ যাইবার পথে—কাশ্মীর

ছেলেবেলা থেকে বইয়ে পড়ে এসেছি, বর্ণহীনতা ও গন্ধহীনতা—এই হ'ল জলের বিশুদ্ধতার লক্ষণ। পৃথিবীর সর্বত্রই নাকি এই নিয়ম। তবুও কানপুরে ওর ব্যতিক্রম ঘটল কেন? মনে সংশয় জাগল, তবে কি রোদে পুড়ে পুড়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটল? নিজেদের দেহের দিকে তাকালাম, না সেখানে তো কোন গোলযোগ নেই! নিজের নিজের শরীরের যা রঙ তাইই আছে—গাছপালা, ঘরবাড়ী আকাশ—সর্বত্র একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম—না তাদেরও রঙ তো কিছু বদলায় নি।—প্রত্যেকটি বর্ণের বিভিন্নতা, তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের চোখের সামনে বিবিধ প্রতিভাত হচ্ছে তো—কেবল জলের বেলায় এমন হ'ল কেন? তবে কি রোদের সঙ্গে কেবল জলেরই শুধু কোন অলৌকিক বিরুদ্ধ সম্বন্ধ আছে—যা এতদিন আমাদের কারও জানা ছিল না।

যাই হউক, এই রকম নানা প্রশ্নবহুল সমস্যা নিয়ে আমরা জল থেকে উঠে পড়লুম এক সময়। ভাবলুম 'ভারতবর্ষ'-এ আমাদের ভ্রমণ-কাহিনী ছাপা তো হবেই, এই সমস্যার মীমাংসার ভার দেব পাঠকবর্গের উপর। তাঁরা হয়ত আমাদের মত বিশেষজ্ঞরা নাও হ'তে পারেন। উত্তর ঠিক মিলবে।

কিন্তু আজ আর আমাদের কোন প্রশ্নই নেই। ব্যাপারটা যে জলের মত সোজা, তা আজ জেনে ফেলেছি। যমুনার জল কালো। আর এখানকার সব খালই যমুনা থেকে কেটে আনা। সুতরাং তাদের জলও অনিবার্য কারণে কালো।

খাওয়া তো আগেই সারা হয়েছে। স্নান সেরে আবার যাত্রা সুরু। পথে একটা জলের ধারে মাণিকজোড় পাখী দেখতে পেয়ে এর বন্ধু গুলি চালালেন। এর আগে আরও কয়েকটি পাখী মারা হ'য়েছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে রান্না ক'রে তাদের সদ্ব্যবহার করতে না পেরে সেগুলি পথের ধারে ফেলে রেখে যেতে হয়েছিল। তাই আজ আর পাখী মারবার মত প্রবৃত্তি কারও ছিল না। কিন্তু বন্ধুর হঠকারিতা গুলি চালানো ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী—তাই হোক, মারা যখন হ'লই তখন তার পরের কাজটা করতে তিনি পেছুবেন কেন? বেশ যত্ন ক'রে ও ঐকান্তিক মনোযোগের সঙ্গে পাখীটির নাড়ী ভুঁড়িগুলো বার ক'রে ফেলে দিয়ে তিনি সেটাকে বেঁধে নিলেন। কথা রইল, আজ আর কিছুতেই ফেলা হবে না।

রাত্রি আটটায় আলিগড়ে পৌঁছালুম। তখনই শহর

প্রায় জনবিরল হ'য়ে গেছে। বাজারের মধ্যে ক্বচিৎ দু-একটা লোক চলা ফেরা করছে।

অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করছিলুম। একবার পাখীটি ও তার

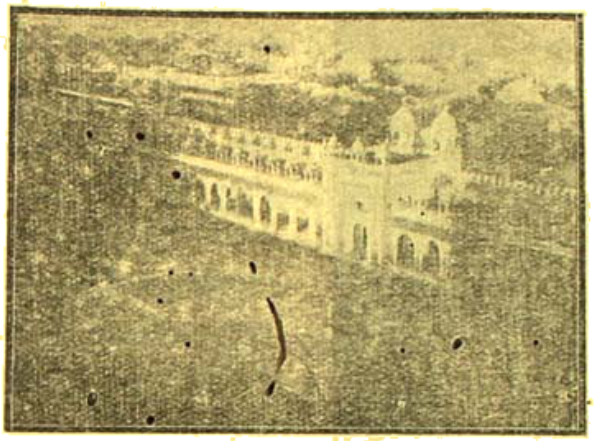

ফতেপুর সিক্রীর সাধারণ দৃশ্য

শিকারীর দিকে চাইলুম। আহা বেচারী! করুণার সঙ্গেই দৃষ্টিতে পাখীটির দিকে চেয়ে বললেন, আহও এটাকে ফেলে দিতে হ'ল নিষ্ঠুর বোধ।

বললুম, ফেলবেন কেন, রাঁধুন না।

—দেখ্‌ছেন না, গা কি রে উঠেছে কি রকম, এ কি আর খাওয়া যায়!

আলিগড় শহর তা দেখা ভাল লাগ্‌ল না। বড্ড অপরিষ্কার। পথ-ঘাট খুব নোংরা। বাজারে কোন হোটেল নেই। আহারান্তে আলিগড় ত্যাগ ক'রে রাত ১১টায় খুরজা ডাক বাংলোয় পৌছুলুম। এখান থেকে দিল্লী ৫৫ মাইল।

পরদিন ৮টায় খুরজা ডাকবাংলো ত্যাগ করলুম। সুন্দর রাস্তা। দিল্লী পৌছুলুম বেলা সাড়ে দশটায়। শহরে ঢুকেই সরাসরি ই. আই. আর পত্রাদির তল্লাসে গেলুম। পথে এক শিখ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোলো। তাঁর অনুরোধে তাঁর হোটেলে গিয়ে উঠলুম। হোটেলটির নাম 'প্রিন্সহোটেল'; ইনি আমাদের খুব খাতির-যত্ন করলেন। ট্যুরিষ্টস্ ব'লে কনসেসন্ রেটও দিয়েছিলেন।

এক বন্ধুর কোন পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ী টীমারপুরে। তাঁর সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হ'য়ে গেল। তিনি তাঁর বাড়ীতে আমাদের সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ ক'রলেন।

অসিমবাবুর পূর্বেকার ট্যুরে পরিচিত কাশ্মীর গেটের মোটর সাইকেল হাউস-এ আমাদের গাড়ী গ্যারেজ করলুম। ট্যুরিষ্টস্ বলে বরাবর এঁরা খাতির ক'রে থাকেন।

পরদিন ২৮শে অক্টোবর দিল্লীতেই কাটল। দিল্লীর দ্রষ্টব্যগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলুম। আমাদের কাছে বন্দুক দেখে আমাদের হোটেলের অধ্যক্ষ পরদিন ভোর পাঁচটার সময় আমাদের শিকারে নিয়ে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমরা রাত চারটা থেকে জেগে বসে রইলুম পাছে তিনি ডাকাডাকি ক'রে বিরক্ত হ'য়ে ফিরে যান এই ভয়ে। কিন্তু ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ঘণ্টা তিনেক কেটে গেল। কে জানত যে, চিন্‌চিনে রোদ্দুর জানালা দিয়ে ঢুকে ভদ্রলোকের গায়ে না লাগলে তাঁর ঘুম ভাঙে না!

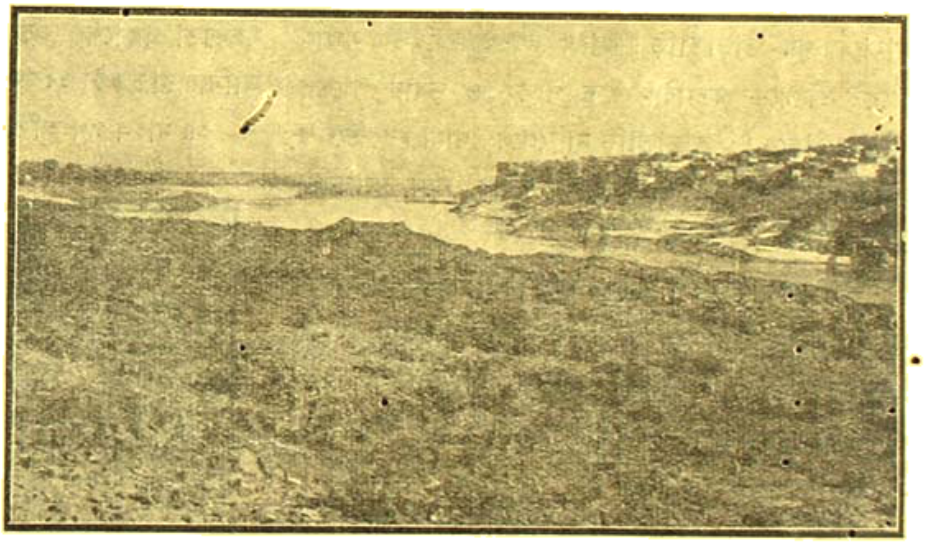

সিমুনদ—একদিকে পাঞ্জাব, অপর দিকে কাশ্মীর প্রতিবন্ধ

ভদ্রলোক যথেষ্ট লজ্জিতভাবেই আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন। নিজের ত্রুটি স্বীকার ক'রে সবিনয়ে জানালেন যে, কাল আর এরকম অন্যায় হবে না, আর একটা দিন থেকে যান। নিশ্চয়ই শিকারে নিয়ে যাব, কথা দিচ্ছি।

আমাদের সেই দুষ্ট বন্ধুটি আমার কানে কানে বল্‌লেন, এখানেও সেই 'পলিসি'—আরও একটা দিন অর্থাৎ চার ঘণ্টায় আটটি মীল!

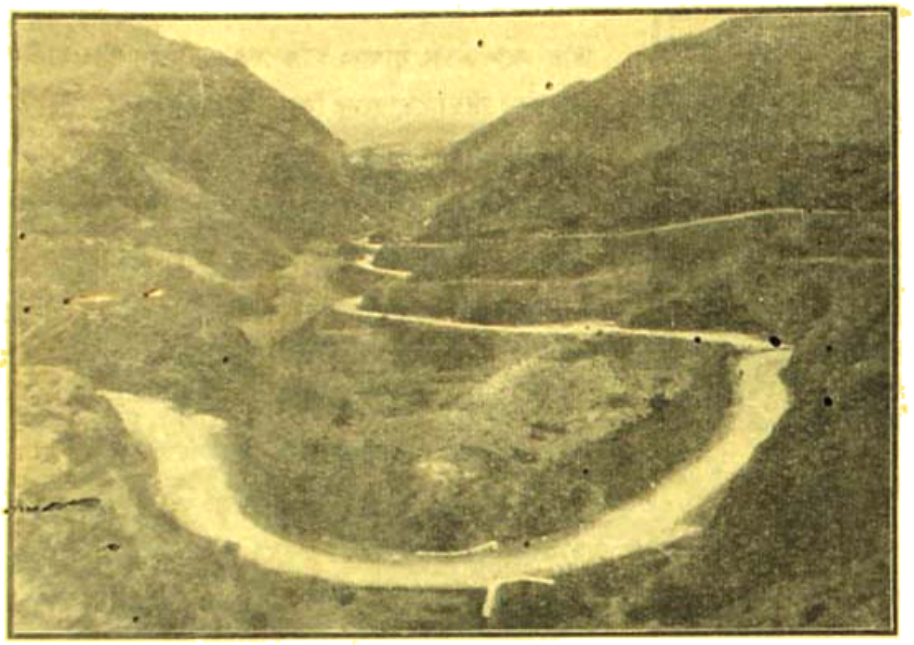

রাইবার পাশের দৃশ্য

আমি হোটেলাধ্যক্ষকে সবিনয়ে জানালুম যে, বাবার পথে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি; কারণ নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শ্রীনগরে অত্যধিক শীত পড়বে ও তুষার পাতের পরিমাণ বাড়বে। তাড়াতাড়ি না গেলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে। বরঞ্চ ফেরার পথে আপনার এখানে দুদিন বেশী থাকা যাবে।

২৯ অক্টোবর বেলা ১১টার সময় দিল্লী ত্যাগ করলাম। আজ থেকে আমাদের বাইকের স্পীড বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। আগে ৫০ মাইল স্পীডে যাচ্ছিলাম। এখন থেকে ৫০, ৫৫ মাইল. পথ খুব ভাল থাকায় ঐ গতি সর্বত্র সমান রাখা সম্ভবপর হয়েছিল।

নির্বিঘ্নে পথ অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যা ৭টায় লুধিয়ানায় পৌছালুম। এইখানে জলযোগের পালা। বেলা ১১টার আগে দিল্লীতে মধ্যাহ্ন আহারটা সেরেছিলুম। ট্যুরে বেরিয়ে একটা কথা কেবলই মনে হয়েছে যে, মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থাটা দুবার থাকলেই ভাল হ'ত।

এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি সম্মুখ পথের অনেক খবর বল্‌লেন।

এই রাতেই আমরা আরও অগ্রসর হব শুনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন, এই পথে যে ডাকাতের উপদ্রব আছে তা কি আপনাদের জানা নেই?

আমরা আমাদের অজ্ঞতা স্বীকার ক'রে বল্‌লুম, ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের আজ আরও গ্রানিকটা এগিয়ে থাকতেই হবে।

তিনি বল্‌লেন, আজ আপনারা এই দীনের কুটীরে অতিথি হোন্। বিপদের মুখে আপনাদের এ রাত্রে যেতে দিতে পারব না।

না-ছোড়-বান্দা। আমাদের কাছে বন্দুক আছে। আমরা প্রত্যেকেই সুশস্ত্র। তাছাড়া, ৫০।৫৫ মাইল স্পীডের মুখে কখনও কোন ডাকাত কারো কিছু করতে পারে না, এই কথা জানিয়ে তাঁর এই অযাচিত সহৃদয়তা প্রকাশের জন্য তাঁকে আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে রাত ৮টা ১৫ মিঃ সময় লুধিয়ানা ত্যাগ করলুম।

৩৪ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে রাত্রি প্রায় ৯টার সময়

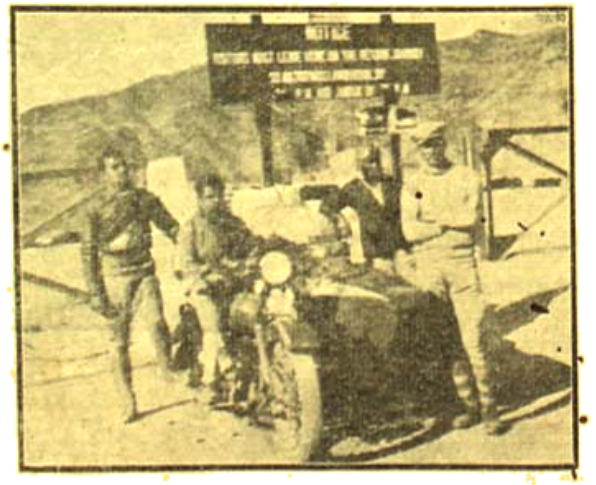

খার্তিকোটাল—উত্তর পশ্চিম ভারতের শেষ সীমানা। [illegible] ও—
যাত্রার সঙ্গী তিনজন—বামদিক হইতে অমিয় লাহিড়ী,
অমিয় ব্যানার্জি, নিমাই মাঝা, সুধাংশু ঘোষ।

জলন্ধরে পৌছালুম। স্টেশনের নিকটস্থ একটি হোটেলে নৈশ ভোজন ও নিশা যাপনের ব্যবস্থা হ'ল।

পায়খানার সন্ধান করায় হোটেলের একটি লোক বাড়ীর ছাদের ওপর ছোট একটি ঘেরা জায়গায় নিয়ে গেল। তার উপরে কোনি আচ্ছাদনই ছিল না, দরজা ব'লে কোন বস্তুও সেখানে ছিল না। পাকবার মধ্যে ছিল, ভিতরে দুটা পা-দান।

পরদিন সকালে বেলা সাড়ে সাতটায় চা পান সেরে জলন্ধর ত্যাগ করলুম। দিনের আলোয় একটা নূতন দৃশ্য উপভোগ করা গেল—লোটা হস্তে লোকের ছাদে গমন। এ পর্য্যন্ত সকলকে মাঠেই ছুটতে দেখেছি। সে-দেখা বড়ই একঘেয়ে। তাই এই পরিবর্ত্তিত দৃশ্য মন্দ উপভোগ্য হ'ল না।

এখান থেকে পথ অতিশয় চমৎকার। বেলা এগারটায় লাহোর পৌছালুম, অনিলবাবুর আগেকার ট্যুরে পরিচিত হোটেলে ওঠা গেল। কিন্তু তাঁরা অতিরিক্ত চার্জ করায় তাঁদের সঙ্গে বনল না। সেখান থেকে চ'লে গিয়ে আনারকলি বাজারে সেণ্ট্রাল হোটেলে কম খরচায় ব্যবস্থা করা গেল।

স্নানাহার সেরে G. P. O-তে চিঠি পত্রের সন্ধানে গেলাম। পথে এক ট্রাফিক পুলিশ আমাদের এক বাইকে চারজনকে দেখে ধরলে, পরে আমাদের রেজিষ্ট্রেশন বুক (যাতে চারজনের বসবার অনুমতি লেখা ছিল) দেখে তবে আমাদের অব্যাহতি দিলে।

বেলা ২টায় লাহোর ছাড়লুম। ৩টায় গুজরানওয়ালা ছাড়বার আগে পথে খাবার জন্য কিছু মাখন ও রুটি কিনে নেওয়ার কথা হ'ল। কিন্তু দোকানে দোকানে ঘুরেও অল্প মাখন ও রুটি থাকা সত্ত্বেও তা সংগ্রহ করতে পারলুম না। আমরা কি চাই বহুকষ্টেও তা তাদের বোঝাতে পারলুম না। এরা যে হিন্দী বোঝে না তা এই প্রথম জানলুম।

বিরক্ত হ'য়ে ফিরছি এমন সময় ইংরেজী-পড়ুয়া একটি স্থানীয় লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁরই সহায়তায় সে যাত্রা মাখন রুটির ক্রয় পর্ব শেষ করতে পেরেছিলুম।

বর্ত্তমান গন্তব্য শিয়ালকোট। শিয়ালকোট যেতে হলে ওয়াজিরাবাদ দিয়ে যেতে হয়, আমাদের অটোমোবাইল এসোশিয়েশনের (বেঙ্গল) গাইড পুস্তকে লেখা ছিল। সেইদিকে অগ্রসর হ'য় এমন সময় এক বাসওয়ালা হিন্দীতে আমাদের শিয়ালকোট যাওয়ার একটা সোজা রাস্তা বাৎলে দিলে। শিয়ালকোট পৌঁছে আরও কিছু মাখন ও রুটি কেনা গেল। শহরটা মন্দ লাগল না। মিলিটারী ভাবটাই বেশী প্রকট।

ক্রমশঃ

অলঙ্কারের শোভা

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

নীহার বলিছে "দূর্ব্বে! আমি অলঙ্কার
কত না অঙ্গের শোভা বাড়াই তোমার।"
দূর্ব্বা বলে "ক্ষণ পরে তোমার মরণ,
আমার শাশ্বত শোভা শ্যামল বরণ।"

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

"মানুষের দেহ ত মাটির বাসন নয়—যে একবার এঁটো হ'য়ে গেলে আস্তাকুঁড়ে ফেলতে হবে! যে ধর্ম্ম মানুষকে পিছনে ফেলে আপনি চলে এগিয়ে, সে ধর্ম্ম আমি মানি না।"

"না মেনে লাভ ?"

"অন্ততঃ মানুষের সাধনা আর আত্মরক্ষার লোকসান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। নাগালের বাইরে যে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ অ্যাসোসের আদর্শ দেখিয়ে চোখ রাঙানো নীচে দাঁড়িয়ে তার অনুধ্বনি করে মূর্খরা।

নোটবুকের নাইকা-টা ছেঁড়ে ফেলে, সত্যেন সুরেখার পিস্টোগ্রাফখানা বের ক'রে দেখল। তড়িৎ-এর মুখপানে এক লহমাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে, ছবিখানা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে দিল ফুটপাথে। সুন্দরী হ'লেও ওর চোখে আজ সুরেখা মজুমদার আকর্ষণীর চেয়ে কদর্য্য।

তড়িৎ বিস্ময়ের সুরে বলে—"তবে যে ব'লছিলে—"

"ব'লছিলাম কেন! এখনও বলি, পরেও ব'লবো—বিচ্যুতিকে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু নীচতাকে নয়।"

প্রায় দশমিনিটের নীরবতা উদ্যত হাসিতে কাটিয়ে, সত্যেন তড়িৎ-এর পিঠে একটু চাপ দিয়ে ব'লে উঠল—"সে কথা থাক্, চল্‌তি পথের অপায় ওরা। স্ত্রী রীণে গত শনিবারের প্ল্যানিকটা আজ নেক-আপ ক'রেছি। আসছে সপ্তাহে ক'রব ট্রিপ্‌ল্।"

"ট্রিপ্‌ল্? একবারে—"

"ট্রিপ্‌ল্; তবে তৌট্ ত নিশ্চয়ই। সত্যেন সেনের টিপ্ সব্যসাচীর তীরের চেয়ে কম অব্যর্থ নয়।"

"মানি। তবে—"

"তবে মনে? মেজাজটা সব সময় ঠিক থাকে না তাই। গত শনিবার সব ওলট্ পালট্ হ'য়ে গেল এম্পায়ারের 'পোয়ে' ভাঙ্গা। চার্মিং ছিম্!"

"থাক্ আপ্ বন্ধু, থাক্ আপ্! আজ 'ডমিনিয়নে' ছুই নৃত্য।"

"চুলোয় যাক্ তোর ছুই। যে সব হতভাগাদের বউ আছে, তারাই দেখুক-গে ছুই। আমি এবার লাইট্ ম্যান।"

"লাইট্ ম্যান!—তুমি, সত্যেন সেন!"

"নিশ্চয়ই। এবার আমার আকর্ষণ 'মণি রোজ', না হয় 'ফ্লাশ লাইট'। আপ্-সেট্ হবে ওড়িৎ; দেখে নিও।"

"তথাস্তু। জয় হোক্ তোমার। আজ তো চল, টেম্পল হোটেলের ফেরৎ ছুই দেখে শনিবারটাকে গুড্-বাই করি।" তপনও সেনরয় যাবে মল্লিকাদের নিয়ে।"

কপালটা কুঁচ্‌কিয়ে সত্যেন কি যেন ভেবে নিয়ে বলে—"আচ্ছা, আজকের মত—শুধু আজকের মতই।"

তড়িৎ তর্জ্জনী-সঙ্কেতে একখানি চলমান ট্যাক্সির গতি রুদ্ধ ক'রে পেভমেণ্টের পাশে দাঁড় করায়। পথের দুপাশে তখন অজস্র আলো জ্বলে' উঠেছে; বড় বড় বাড়ীগুলোর ভিতর জীবন্ত বিকারের মত নানা-দেশী সুরের কোলাহল মনটাকে ঘরছাড়া ক'রে দেয়।

তড়িৎ ও সত্যেন অন্যমনস্কভাবে গাড়ীর কাছে এগিয়ে গেল। প্রাসাদের বুকে ওই রেডিওগুলো যেন প্রেতাত্মার বীভৎস উৎসব।

তড়িৎ-এর মনে আলোক-রেখার ছায়াপথ এম্পায়ার থেকে গার্ডিন প্লেস পর্য্যন্ত পুঞ্জীভূত রসচেতনার বৈচিত্র্য এঁকে দেয়। সত্যেন নিবিষ্ট মনে ভাবে—গ্রে-ক্রহাম আর ক্যামেরনের তফাৎ ছিল মাত্র তিন পাউণ্ড, চমৎকার পেডিগ্রি, রাইট ব্যালান্স; তবুও সব গেল ভেস্তে। কেমন ক'রে প্লেস আর উইনে গোলমাল হ'য়ে গেল! থাক্—

"সেনরয় মল্লিকা বোসের সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড্; তপন আছে মল্লিকার ছোট বোন মঞ্জরীর রেশমি ফাঁসে মাথা গলাবার চেষ্টায়। জন্মদিনে এবার ওকে সে জাপানী সিল্কিং পাউন উপহার দিয়েছে।"

"পাকা সাইকোলজিষ্ট ব'লতে হবে; মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিণামটাকে প্রকারান্তরে ওর মনে জাগিয়ে তোলা মানেই, নিজের পাওনাটুকু সুদের আনা আদায় ক'রবার

পথ পরিষ্কার ক'রে নেওয়া। ভবিষ্যৎ স্বপ্নের গাঙচাষটা আদ্‌গোছে একবার ছুঁয়ে দেওয়া, আর কি!"

দুজনে ট্যাক্সিতে উঠে ব'সল। সত্যেনের মনটা কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে আসে। জাপানী ব্লোক-পরা আবছা একটী নারীমূর্ত্তি হয় তো ভেসে ওঠে ওর চোখের সামনে; মুখখানা মঞ্জরীর, কিন্তু গলা থেকে পা পর্য্যন্ত সুরেখা মজুমদারের: তেমনি লম্বা অথচ নিটোল চেহারা, দুটি বাহুতে উদগ্র কামনার চঞ্চলতা।

প্রকাণ্ড হল। দুপাশে সারি সারি টেবিল;—নানা আসবাবে সাজানো। নিত্য প্রয়োজনের উপকরণ রূপ নিয়েছে ঐশ্বর্য্যের মহিমালায়। ধব্‌ধবে টেবিল-ক্লথের উপর স্যালাড্‌-সেটটা ঝক্‌ ঝক্‌ করে; রকমারি গন্ধ নানা রকম স্ত্রীপুরুষের উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। ডিনার কনসার্টের সঙ্গে মাঝে মাঝে কাঁটা-চামচের রুনঝুন্‌ শব্দ; অসংখ্য পাখার ঝাপ্‌টায় বাতাসটা ঘুরপাক খেয়ে রেশমি পর্দ্দার ঝালরগুলো চঞ্চল ক'রে তোলে; আশেপাশে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেম-সাহেবদের কৃত্রিম মিহি গলার প্রণয়গুঞ্জন স্যাম্পেনের হাল্‌কা গন্ধের মত ঐসবটায় ঝিম্‌ ধরিয়ে দেয়। ও পাশের হলে 'ডান্স' সুরু হ'য়েছে; মৃত্যুক্লিষ্ট জীবনের পাত্রখানায় অমৃতের উৎসব যেন ফেনিল হ'য়ে উঠেছে।

তড়িৎ ও সত্যেন এ পাশের একটা ছোট কেবিনে গিয়ে ঢুকল। ষ্টুয়ার্ট যেন ঠিক এই দুজনেরই অপেক্ষায় এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ছিল। নিতান্ত প্রত্যাশিত আগমন তাদেরই দুজনের, অন্য কারুর নয়; হ'লেও হয় ত এতটা আনন্দের হ'ত না। সসম্ভ্রমে সেলাম দিয়ে বয় আদেশের অপেক্ষায় মুখপানে চেয়ে থাকে।

হুকুম দিয়ে সত্যেন ও তড়িৎ চুপটি ক'রে ব'সল। সত্যেনের মনটা আজ কোন রকমেই স্বাভাবিক হ'তে চায় না। বৈশাখী সন্ধ্যার মত মাঝে মাঝে বাতাস ওঠে, আবার পরক্ষণেই থমথমে গরমে গুমট ধরে।

পাশের কেবিনে একটী বাঙালী মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। নব পরিচিতকে ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলবার চেষ্টায় সে যেন ঘন হাসির ঝিনুকি ছড়িয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো কথার জাল বুনছে। স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিচ্ছে—তার আজন্ম-সঞ্চিত ব্যাকুল প্রতীক্ষা ওই নবপরিচিতের পথ চেয়ে এতকাল কেমন ক'রে বন্ধ জলের মত শেওলায় আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল। আজ ফুটেছে সেখানে সার্থকতার হিমুল শতদল।

ওরা দুজনে নির্ব্বাক হ'য়ে শোনে। সত্যেনের অন্যমনস্কতা কখনো একটু ক'মে আসে; আবার বেড়ে যায়; হঠাৎ টিপ্‌গুলোর কথা, না হয় সুরেখার আচরণটা মনে প'ড়ে।

স্পষ্ট অস্পষ্ট আরও অনেকের কথা শোনা যাচ্ছে। মেয়েটা খুব হাস্‌তে পারে; কথায় কথায় ঠিক্‌রে প'ড়ছে ওর হাসি—জৈতালি বাতাস-লাগা শিমুলের পাপ্‌ড়ির মত। সঙ্গীদের ভিতর একজন সিন্ধী ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় আলাপ করে; ষ্টুয়ার্টকে কিরিস্তি দেয়।

হঠাৎ সত্যেন চম্‌কে উঠ্‌ল সুরেখার কণ্ঠস্বরে। বিশ্বাস হ'ল না। মাথাটা ঝাঁকিয়ে কানপেতে শুন্‌বার চেষ্টা করে—'হাঁ সুরেখা, সুরেখাও আছে ওদের ভিতর।'

সত্যেনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঝিম্‌ ঝিম্‌ ক'রে উঠ্‌ল। এক নিঃশ্বাসে বিয়ারের টাম্‌রাটা শেষ ক'রে, তড়িৎকে এক রকম টান্‌তে টান্‌তে বাইরে নিয়ে এলো। বিল আন্‌বার আগেই বয়ের হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে, চেঞ্জের অপেক্ষা না রেখে সে বেরিয়ে প'ড়ল রাস্তায়।

মেট্রোর নীল এন্‌গাইন্‌গুলো চাবুকের মত ঝিলিক্‌ করে। সাম্‌নের ময়দানটায় ছড়িয়ে পড়ে ইলেক্‌ট্রিক্‌ নিউজের তীব্র আলো।

তড়িৎ হঠাৎ সত্যেনের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে একটু বিস্মিত হ'য়েছে, কিন্তু কারণটা অনুমান ক'রতেও পারে নি। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে সত্যেন কি ভাব্‌ছিল। একজন ফিটন্‌ওয়ালা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটু ইতস্ততঃ ক'রে চুপি চুপি জিজ্ঞেস্‌ ক'রল—"চায় বাবু, খাঁটি বিলিতি?. একদম নয়া—উনিশ কি বিশ!"

তড়িৎ হো হো শব্দে হেসে উঠ্‌ল। সত্যেন কোন কথা না ব'লে এগিয়ে চল্‌ল 'ডমিনিয়নের' পথে। ফিটন্‌ওয়ালা পিছু পিছু আসে; তাহাদের ইচ্ছা হয় দাঁড়িয়ে একটু আলাপ ক'রতে, কিন্তু সত্যেন দৃক্‌পাত করে না।

• • • •

সত্যেন সেন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সংসারে আপন বলতে বিশেষ কেউ নেই তার। পিতার মৃত্যুর পর পিসিমা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন সত্যেনের একটা কেন্দ্র অন্ততঃ ছিল। সুতো-বাঁধা খেলনা-বেলুনের মত উড়বার চেষ্টা ক'রেও ফিরে আসতে হ'ত তাকে পিসিমার হাতের কাছে। দুরন্ত মন চলন্ত এক্সপ্রেসের মত ছুটবার আয়োজন ক'রলেও লাইন ছাড়িয়ে চলতে পারত না।

ললিতবাবু মৃত্যুকালে কয়েক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ও জীবনবীমার কয়েকখানি মেয়াদি দলিল রেখে গিয়েছিলেন। দেশে একখানি বাড়ী ও অল্পস্বল্প জমিদারিও ছিল; দেখেশুনে চললে একটী মাত্র পুত্রের পক্ষে বোধহয় তাই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সত্যেন দেশের বাড়ীতে যেতে চাইল না। ব্যাঙ্কের খাতাখানি ফিরে পড়ে' উঠ্‌ল তার এক ক্রমবিবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠা; বন্ধুমহলে নিরর্থক নেতৃত্বের সমারোহ।

লেখাপড়া সে অনেকদিন আগেই ছেড়েছে। এখন মাঝে মাঝে করে সঙ্গীতচর্চ্চা, গণজীবনে নিজেকে বিশিষ্ট ক'রে তুলবার অসার্থক প্রয়াস, আর অভিজাত মহলে সুপরিচিত হবার নানা উদ্যোগ।

পিসিমা মারা গেছেন। সত্যেন বাসা উঠিয়ে দিয়ে একটী প্রথম শ্রেণীর হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সে এখন চেরি-ক্লাবের সেক্রেটারী ও সবুজসঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট।

সৌখিক সঞ্চয়ের অনেকখানি বার ক'রে সত্যেন যখন বুঝ্‌ল যে অবশিষ্ট অর্থ শেষ হ'তে আর বেশী দিন নেই; তখন বাকী টাকা সিকিউরিটি জমা রেখে সে সিটি ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ-ম্যানেজ্যারের পদে নিযুক্ত হ'ল। দেড়শ টাকা মাইনে; ভবিষ্যতের আশাপ্রদ সম্ভাবনাও আছে।

মানসিক পরিস্থিতির সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই এসে প'ড়েছে সুরেখা মজুমদার। অর্থকে সুরেখা অবহেলা করে, তাই ওর চলাপথে পায়ের দাসের মতই অর্থকে পিছনে ফেলে চলতে হয়; নইলে সুরেখার আভিজাত্য নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপের ভ্রূকুটি করে।

হোটেলের অন্যান্য মেম্বারের চোখে সত্যেন যেন একটা জীবন্ত বিস্ময়। রঙ-বেরঙের শাড়ি-পরা সে সব আধুনিকাদের ভিড় জমে তার ঘরে, তাই নিয়ে আশপাশের বৈঠকী ছোট আসরগুলি মশ্‌গুল হ'য়ে ওঠে নানা আলোচনায়। ওর সম্পর্কে তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই।

সত্যেনের জন্মদিন উপলক্ষে একটা উৎসবের আয়োজন ক'রবার জন্য সুরেখা পীড়াপীড়ি সুরু ক'রেছে। অনেক কিছু ভেবে সে প্রথমটা রাজী হয় নি, কিন্তু সুরেখার অনুরোধ উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অগত্যা সত্যেন সম্মত হয়েছে সে প্রস্তাবে। সুরেখা উদ্যোগী হ'য়ে কার্ড ছাপিয়ে বিলি ক'রেছে: কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু, সাহিত্যিক ও ট্যুরিষ্টকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছে সে নিজে গিয়ে। ওর জন্মদিনকে স্মরণীয় ক'রবার জন্য সুরেখার এই আগ্রহ যেন শিরায় শিরায় স্পন্দন জাগিয়ে তোলে: সত্যেনের বুকের তলায় গ'ড়ে ওঠে ভবিষ্যতের তাজমহল।

কিন্তু আশ্চর্য্য মেয়ে ওই সুরেখা মজুমদার! নিজে থেকে যতখানি সে ধরা দেয়, তার বেশী এক তিলও অধিকার থাকে না অন্যের। হাতের কাছে থেকেও সে ছায়ার মত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি চলে।

নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে সত্যেন সেদিন হঠাৎ সুরেখার হাতখানা নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে মধ্যমার অগ্রভাগটায় দিয়েছিল আল্‌গোছে দাঁতের চাপ। নিমেষে সুরেখা ধনুকের ছিলার মত ছিট্‌কে উঠ্‌ল—

"মিঃ সেন!"—কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক তীব্রতা।

সত্যেন শুধু অপ্রস্তুত হ'ল তাই নয়, লজ্জায় তার মাথাটা যেন মাটিতে মুইয়ে পড়তে চায়। সুরেখার মুখপানে আর ও ভালভাবে চাইতে পর্য্যন্ত পারে না।

কিন্তু পরক্ষণেই সুরেখা নিজে থেকে তার সঙ্কোচ কাটিয়ে দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"তাড়াতাড়ি কেন? অত বেশী—"

এবার সত্যেন সাহস ক'রে চাইল ওর মুখপানে। সুরেখার মুখে আগেকার মতই স্বাভাবিক হাল্‌কা হাসির রঙ। সত্যেনের হাতখানা কোলের উপর টেনে নিয়ে বলে—"দ্রুত আত্মসাৎ করবার চেষ্টা আসন্ন ত্যাগের লক্ষণ।"

সত্যেন বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকে। হয়ত তেমনিক'রে চেয়ে থাকতে থাকতে আবার কখন সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এবার সুরেখা ওর আঙুলগুলো নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে ঝক্‌ঝকে শাদা দাঁত দিয়ে মধ্যমার নাখাটা আস্তে চেপে ধরে। মুহূর্ত্তে সত্যেনের দেহমন শিউরে ওঠে।

সুরেখার আচরণে মাঝে মাঝে মনে যে দাগ পড়ে, সে দাগ পরমুহূর্ত্তেই মিলিয়ে যায়।

ডিনারের দিন ঘুম থেকে উঠেই সত্যেন ম্যানেজারের কাছে খবর পাঠালো—ওবেলা চব্বিশ জন গেষ্ট আছে তার নিমন্ত্রিত। এ-ধরণের খবর ম্যানেজারের কাছে এই নতুন নয়; আগেও অনেকবার হয়ে গেছে।

সকালে সুরেখার আসবার কথা; কথা নয়, আসবেই সে। সত্যেন তার অপেক্ষায় আজ এখনও চা খায় নি। খবরের কাগজখানা নিয়ে ডেকচেয়ারে অবসন্নভাবে ব'সে কি ভাব্‌ছিল সে, এমন সময় হোটেলের বুড়ো চাকরটা এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।

বুড়ো কৈলাসের হাতে সবুজ সিপ দেখে ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিতে সত্যেনের বিলম্ব হয় নি। তবুও কাগজখানা উল্টাতে উল্টাতে হেসে জিজ্ঞেস্ ক'রল—"কি খবর কৈলাস? ম্যানেজারবাবু—"

"হাঁ হুজুর!"—মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে কৈলাস সিপখানা বক্সুর হাতে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

সত্যেনের হিসাবে হোটেলে বাকী প্রায় হাজার টাকা। সন্ধ্যার আগে টাকা না দিলে ডিনারের কোন ব্যবস্থাই হবে না। আগামী রবিবার থেকে তার বিল্ বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে।—এক নিঃশ্বাসে সিপখানা দু'তিনবার পড়ে সত্যেন অন্যমনস্কভাবে উঠে দাঁড়াল। নিমেষে তার মাথার ভিতরটা যেন কেমন পাক খেয়ে গেল। এই আসন্ন লাঞ্ছনাকে ঠেকিয়ে রাখবার কোন পন্থা নেই আজ। হয় ত এখুনি আস্‌বে সুরেখা, আরও কেউ তার সঙ্গে। স্বপ্নলোকের তাজমহল পলকে ভেঙে পড়বে পথের ধূলোয়; সুরেখার বড় বড় দুটো চোখে ঘনিয়ে উঠ্‌বে অবহেলা—ঘৃণা!

কোন জবাব না দিয়ে সত্যেন জামাটা ঘাড়ে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কৈলাস হতভম্বের মত চেয়ে রইল; সত্যেনের চেহারা দেখে কোন কথা জিজ্ঞেস্ ক'রবার সাহস তার হ'ল না।

সত্যেনের দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল। শুধু এ্যারিষ্টোক্রেসির একটা অদম্য নেশা ছাড়া তার জীবনে অন্য কোন বালাই ছিল না। আভিজাত্য মহলে মেলামেশা ক'রতে সে ভালবাসে। বিশেষ করে যে সব আধুনিক অভিজাত সম্প্রদায় পাব্‌লিক ষ্টেজে মেয়েদের নিয়ে প্রাচ্য নৃত্যকলার রস পরিবেশন করেন, তাঁদের প্রতি সত্যেনের অপরিসীম শ্রদ্ধা। এক কথায়, সে নব্যতন্ত্রের সাধক। যে আধুনিকারা প্রাচ্য কলার রস-পরিবেশনে পাশ্চাত্য স্ত্রী-স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা দেখায়, সত্যেন তাদের একনিষ্ঠ ভক্ত।

চল্‌তি পথে সত্যেনের সঙ্গে হ'ল সুরেখা মজুমদারের পরিচয়। সুরেখার দিক থেকে যে গভীর আগ্রহ ওৎ পেতে ছিল এতকাল, তাতে সত্যেনকে ঘনিষ্ঠতর করে নিতে তার বিলম্ব হ'ল না মোটেই। রূপের চেয়েও ব্যবহারে ছিল ওর বেশী মাদকতা, সেটা পুরাণ মদের মত যেন হাওয়ায় হাওয়ায় আমেজ বাড়িয়ে দেয়। সুরেখার সঙ্গে একটী দিনের পরিচয়ের নেশা কাটিয়ে উঠ্‌তে যে কোন পুরুষকে অন্ততঃ একপক্ষকাল কঠোর সাধনা করতে হয়। আধুনিকতার জন্যে সুরেখা আধুনিকদের চিত্ত-জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না; তার চালচলনে আছে এমন একটা সহজবেদ্য সুর, যাতে করে প্রত্যেকটি গতিভঙ্গি স্বতন্ত্র মৌলিকতায় আত্মপ্রকাশ করে। অসাধারণ না হ'লেও সে সাধারণের বাইরে।

কথাপ্রসঙ্গে সত্যেন একদিন ব'লেছিল—"জীবনটা পাহাড়ি ঝর্ণার মত টেনে নিয়ে যাব। বাধন আমার নেই, থাক্‌বেও না কোনদিন।"

সুরেখা হেসে উত্তর দিয়েছিল—"বাঁধন না থাক্‌লেই যে বাধা থাক্‌বে না, তার ত কোন কারণ নেই।"

"কেন?"

"পাহাড়ি ঝর্ণা ব'লে; সমতলের ফোয়ারা হ'লে শিলাতটে আঘাত লাগ্‌বার ভয় ছিল না।"

সত্যেন হেসে ব'লেছিল—"ওঃ, তাই! সে বাধার আঘাত শুধু নিজেকেই লাগ্‌বে, আর কেউ ত ব্যথিত হবে না!"

সুরেখা মুখ টিপে শুধু একটু হেসেছিল। পাৎলা ঠোঁট দুখানি আগুনের ফণার মত লক্‌লক্ করে; নিটোল দুটি গালের মাঝখানে হাসির মধুপর্কের মত ফুটে ওঠে দুটি অগভীর রেখা। সেই টোল-খাওয়া গাল দুটো অনেকক্ষণ ধ'রে আঁকা থাকে অন্যের মনে।

সত্যেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল—"হাস্‌লেন যে?"

"হাসি পায়, আপনার কথা শুনে'। পুরুষ কি নাস্ তাই অগ্রপশ্চাৎ ভাব্‌বার দরকার হয় না। বেশী ভয় মেয়েদের, যারা পুষ্পিত লতার মত পাহাড়ের পাদদেশে

দাঁড়িয়ে উর্ধ্ব-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। পাহাড়ি স্বর্ণাঙ্গেই তাদের ভয় সব চেয়ে বেশী।"—ব'লে সুরেখা অকারণ ব্লাউজের বোতামটা বারবার খুলছিল আর লাগাচ্ছিল।

তেমনি ক'রেই ওর দিকে চেয়ে সত্যেন জিজ্ঞেস ক'রেছিল—"তার মানে?"

এইবার সুরেখা হেসে উঠেছিল আরও জোরে—"মানে আর বুঝবেন কেমন ক'রে? পাহাড়ের মাথা থেকে হুড়মুড় বেগে নেমে আসেন শিলা-উপশিলা ব'রে, আর তারই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে ভেসে যায় আমাদের মত অসহায় লতাগুল্মো; আপনাদের সেই চলার বেগে কোন্ অচেনা তলে তলিয়ে যায় তারা।"

তারপর থেকে তিলে তিলে সত্যেন যেন কেমন জড়িয়ে গেল সুরেখার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে। নিজেকে চালিয়ে নেবার ক্ষমতা যার নেই, এমনি ক'রেই সে আঁকড়ে ধরে চলমান সহচারীকে।

ওদের মহলে সত্যেনের যাতায়াত গেল ক্রমেই বেড়ে; বন্ধু ও বান্ধবীর সংখ্যা হ'ল বেশী। নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রবার জন্যে সত্যেনকে প্রায়ই বহন ক'রতে হয় ডিনারের খরচ। বন্ধুদের নিয়ে সাহেবি হোটেলে পার্টি দেয়; প্রীতি-ভোজ, ডান্স—আরও কত কি! প্রতি শনিবারে চলে ওদের উৎসব; তা ছাড়া জন্মদিন ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের অভাব নেই। বান্ধবীদের জন্মদিনে সে-ই দেয় সব চেয়ে দামী উপহার।

আগের চেয়ে খরচ বেড়ে গেছে দশগুণ, কিন্তু মাসিক আয় নিক্তির ওজনে পরিমিত। দেনা বাড়ে, সত্যেন নিশ্চিন্ত হবার আশায় দুটো পেগ দিয়ে মনের বর্তমানটাকে চাপা দেয়। প্রগতির মাঝখানে গৌরবের আসনটুকু অটুট রাখবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে অগ্রগামী ক'রে রাখে। ঠিক এমনই সময় তার মাথায় হঠাৎ চেপে ব'সলো "রেস্"। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অর্থের প্রয়োজন যত বাড়ে, তত বেড়ে চলে তার অপ্রত্যাশিত প্রচুর অর্থের আকস্মিক আগমনের স্বপ্ন।

মাঝে মাঝে মনটা প্রকৃতিস্থ হ'য়ে আসে, কিন্তু নিতান্ত ক্ষণিক সেই আত্মস্থতা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার কর্পূরের মত বিলীন হ'য়ে যায়। সত্যেন দেনায় জড়িয়ে পড়ে, তবুও একটী শনিবারের অভাবনীয় কল্যাণস্পর্শের স্বপ্ন তাকে মাতাল ক'রে রাখে।

সন্ধ্যার আগেই সত্যেন ফিরল তড়িৎকে সঙ্গে নিয়ে। সারাটা দিন ঘুরেও সে কারো কাছে টাকা যোগাড় ক'রতে পারে নি। যাদের কাছে একদিন অনায়াসে পেত ওই সামান্য টাকা, তাদের প্রত্যেককে সে জলৌকাবৃত্তিতে একে একে পিছনে ফেলে এসেছে অনেক আগে। অন্ততঃ আজ আর সেখানে হাত বাড়াবার মুখ নেই তার। নিরুপায় হ'য়ে সত্যেন ব্যাঙ্কের ক্যাশ থেকে টাকা এনে হোটেলের দেনা শোধ ক'রে দিল। অত বড় লাঞ্ছনা সে কোনমতেই সইতে পারবে না।

ব্যাঙ্কের ক্যাশে হাত দেওয়া এই তার প্রথম নয়। অবশ্য প্রত্যেকবারই সে ভেবেছে—আগামী শনিবার বেশী টাকা ষ্টেক্ ক'রে নিশ্চয়ই পাবে প্রচুর অর্থ; তাই থেকে ক্যাশ মেক্‌আপ ক'রে পাওনাদারদের পাই-পয়সাটি পর্যন্ত মিটিয়ে দেবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ঘটে সম্পূর্ণ উল্টো।

দুপুর থেকে সুরেখা না হবে তো পাঁচবার ফোন ক'রেছে ব্যাঙ্কে—সত্যেনের কাছে। সারা বিকেল মঞ্জরী আর সে মিঃ সেনের ঘরখানা সাজিয়েছে রকমারি ক'রে। মঞ্জরী আসতে চায় নি; সুরেখা জোর ক'রে তাকে এনেছে গান গাওয়াবে ব'লে। অজন্তা নৃত্যে অদ্বিতীয়া হ'লেও সে মঞ্জরীর মত গান গাইতে পারে না। অথচ আশ্চর্য্য এই যে মঞ্জরী ভাল গাইতে পারে ব'লে সুরেখা গর্ব্ব অনুভব করে।

সত্যেন আসতেই সুরেখা হৈচৈ ক'রে ব'লে উঠল—"চমৎকার হোষ্ট যা হোক্!"

সত্যেন কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে সামনে মঞ্জরীকে দেখে হঠাৎ থেমে গেল। মঞ্জরীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয় ত হয় নি কোনদিন, তবুও সত্যেন তাকে জানে অন্য মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী।—হঠাৎ জাপানী রোকটার কথা মনে জেগে ওঠে। মঞ্জরী সুরেখার চেয়েও স্মার্ট!

রেইন-বো ক্লাব ছেড়ে সত্যেন ভিক্টোরিয়া চেম্বার্সে উঠেছে। মেসের বাড়ী ও জমিদারিটুকু-এক রকম মাটির দামেই বিক্রি ক'রেছে সে, মাত্র সাত হাজার টাকায়।

ব্যাঙ্কের দেনা মিটিয়ে, হোটেলে দিয়েছে কিছু টাকা জমা আর কিনেছে একখানি টু-সিটার। নিজেই ড্রাইভ করে।

রেসকোর্সের মোহ একটুও কমে নি; তবে সুরেখার প্রতি মোহ বোধহয় একটু কেটেছে মঞ্জরীর সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে। কিন্তু সুরেখার প্রভাব সে কোনমতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না।

এম্পায়ারে যে-দিন তমাল দত্ত ও সুরেখা মজুমদারদের 'ঘোষ নৃত্য' উপলক্ষে সহরময় হ'য়েছিল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি, সেদিন সিল্কী এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সুরেখার সম্পর্কটা অনেকখানি পরিষ্কার হ'য়ে গেছে সত্যেনের চোখে।

সত্যেনের ভাবান্তর হলেও সুরেখার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। সে আগের মতই সকালে উঠে এসে ওর ঘুম ভাঙার মুখে-চোখে টাসেলের কেশর বুলিয়ে, কোনদিন এলোচুলের গোছা আলগা হাতে ধ'রে সত্যেনের দুই চোখে ভাস্তে ছুঁইয়ে দেয়। ঘুমন্ত মুখ দেখেও হয়ত সুরেখা বুঝ্‌তে পারে ওর মনের গোপন কথা; ম্লান হাসির সঙ্গে বলে—"মিঃ সেন, দূর পথে যা দিনের আলোয় টলমল করে, তাকে সব সময় জল মনে ক'রলে ঠক্‌তে হয়।"

সত্যেন আগের মত হেসে কথা ব'লতে পারে না, তবুও ব'লতে হয়—"আপনার কথাগুলো হেঁয়ালির মত।"

সুরেখা কিন্তু হেসেই তার উত্তর দেয়—"আর আপনার মনটা যে তার চেয়েও বেশী। রমণীর নয়, পুরুষের মন সহস্র যুগের সখা সাধনার ধন।"

পথ শেষ না হ'তেই সত্যেনের জীবনে আংশিক পরিবর্ত্তনের সূচনা হ'ল। ভিক্টোরিয়া চেম্বার্সেও দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক টাকা বাকী প'ড়ল; এবার সত্যেন গাড়ীখানা বিক্রি ক'রে কিছু টাকা জমা দিয়ে, বাকী টাকার জন্যে মালিকের কাছে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী হোটেলে উঠে গেল। কিন্তু সেখানেও তাগিদ আরম্ভ হ'তে দেরী হ'ল না।

ব্যাঙ্কের হাফ-ইয়ারলি হিসাবে দেখা গেল, সত্যেন প্রায় পনের হাজার টাকা ক্যাশ ভেঙেছে। এ টাকা শোধ ক'রবার কোন সঙ্গতিই এখন আর নেই তার। ব্যাঙ্ক কেস্ ক'রল। সিকিউরিটীর টাকা হ'ল বাজেয়াপ্ত; বিচারে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডও হ'ল।

খবরের কাগজে বড় বড় হরফে প্রকাশিত হ'ল সে সংবাদ। বন্ধু মহলে তাই নিয়ে চলে নানা আলোচনা। চেরি ক্লাবের সেক্রেটারী ও সবুজ সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট সত্যেন সেনের জীবনে এত বড় আকস্মিক সংঘটন হয় তো কেউ কোনদিন কল্পনাও করে নি।

আজ নিঃসঙ্গতায় সত্যেনের কান্না পায়। অবসরের বিশ্রামকুঞ্জে বান্ধবীর ভিড় নেই; পর্দ্দার আড়াল থেকে "বুকী" উঁকিঝুঁকি মারে না।

জীবনের ত্রিশটি বৎসর অতীত দিনের বিস্মৃত প্রায় ইতিহাসে মিলিয়ে গেছে। মনের সবটুকু সম্বল নিঃশেষে বার ক'রে সত্যেন জেল থেকে ফিরে এলো ভবিষ্যের আতঙ্কিত কঙ্কালের হাত ধ'রে। আর সকল দ্বার রুদ্ধ। বন্ধুমহলে সে আর মুখ দেখাতে পারে না। মাথা গুঁজবার মত একটু ঠাঁইও নেই কোথাও। যে কোন মেস-বোর্ডিং-এ উঠ্‌তে যায়, সেখানেই অগ্রিম টাকার বিজ্ঞপ্তি। নিরুপায় হ'য়ে পার্কের একটা বেঞ্চে ব'সে ব'সে সত্যেন ভাবে; কিন্তু আজ এ ভাবনার কোন কূল-কিনারা নেই আর। দুপুর গড়িয়ে যায়, অনন্ত সূর্য্য ধীরে ধীরে লাল হ'য়ে আসে পশ্চিমের আকাশে; ওর সর্ব্বাঙ্গে আসন্ন সন্ধ্যার মতই আস্তে আস্তে নামে উপবাসের অবসন্নতা।

মাত্র একটি দিন! একটি দিন আশ্রয় দেবার মত কোন আত্মীয়ও নেই তার! হঠাৎ সত্যেনের মনে হ'ল অবিনাশের কথা; ওর ছেলেবেলার বন্ধু। ঠিক বন্ধু না হ'লেও, পরিচিত।

অবিনাশ প্রেসে চাকরি করে। কুড়ি টাকা মাইনের কম্পোজিটার। অনেক দিন আগে সত্যেন তার প্রেসটা একবার দেখেছিল, মাণিকতলার ছোট একটা গলির ভিতর। সেই প্রেসেরই এক পাশে অবিনাশ থাকে।

অনেক ঘুরে ঘুরে সত্যেন রাত্রি আটটার সময় এসে উপস্থিত হ'ল অবিনাশের ঘরে। সত্যেনকে এ অবস্থায়

দেখে অবিনাশ প্রথমটা চিনে উঠ্‌তে পারে নি। রুক্ষ চেহারা, চোখে সশঙ্কিত বিহ্বল দৃষ্টি!

একদৃষ্টে ওর মুখপানে চেয়ে অবিনাশ সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস্ ক'রল—"সত্যেনবাবু?—আপনার এ চেহারা! অসুখ ক'রেছিল বুঝি?"

সত্যেনের মুখে শুষ্ক একটু হাসি। "হুঁ, আমি। অসুখ ঠিক নয়, অমনি; না না অসুখ বৈ কি! এখন সেরে গেছে।"

তবু ভাল, অবিনাশ জানে না ওর কথা। জানলেও ক্ষতি ছিল না; আজ না হোক্, দুদিন পরে জানবেই।

অবিনাশের মনে কেমন ধাঁধা লাগে। তাড়াতাড়ি টুলটা এগিয়ে দিয়ে সত্যেনের পায়ে মাথা রেখে সে প্রণাম করে।

না ব'লে উপায় নেই, তবুও সত্যেন মুখ ফুটে ব'লতে পারে না। অবিনাশ নানা কুশলপ্রশ্ন করে। সত্যেন কোনটার উত্তর দেয়, কোনটা হয় ত অন্যমনস্কতায় এড়িয়ে যায়। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে সে হঠাৎ ব'লে ফেল্‌ল—"একটা টাকা ধার দিতে পার অবিনাশ?"

কথাটা শুনে অবিনাশ যেন প্রথমটা বিশ্বাস ক'রতে পারে না। সত্যেন সেন, ওদের গ্রামের জমিদার! একটা টাকা ধার! এ নিয়ে প্রশ্ন ক'রতেও তার সাহস হয় না।

সাত জায়গা খুঁজে অবিনাশ সিকি-দুআনিতে মিলিয়ে একটি টাকা সত্যেনের হাতে এনে দিল। সত্যেনের চোখ দুটো তখন জলে ছাপিয়ে উঠেছে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত ক'রে সে আর কোন কথা না ব'লে রাস্তায় এসে নাম্‌ল। হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে অবিনাশ পিছু পিছু এসে বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল। (ক্রমশঃ)

যুগমাতা

শ্রীকালিদাস রায়

হে যুগজননি চরণে নমি
ধন্য জনম জীবন ধন্য তোমার পুণ্য ক্রোড়ে জনমি'।
পাপে তব ভয় তুর্ক রুশিয়া মিশর ইরাক ভারত চীন,
নাগা তুলে উঠে জগৎ জুড়িয়া যত লাঞ্ছিত পতিত দীন।
জেগেছে শূদ্র, জেগেছে ক্ষুদ্র, জেগেছে পান্থ যাত্রাপথে,
সত্য দেবতা রথের বল্গা ধরেছেন নব-জীবন-রথে।
আজি জেগে উঠে অর্দ্ধ-মৃতেরা পথের প্রান্তে চরণ ঘায়,
জেগেছে ভ্রমিক বিধির নিদেশে ঋদি-শোণিতের মূল্য চায়।
চিরবঞ্চিত দীনলাঞ্ছিত মানবাধিকার করিছে দাবি,
অন্ধ মূর্খ জ্ঞানভাণ্ডার-দ্বারের আজিকে মাপিছে চাবি।
কূপমণ্ডুক আলোকে আসিছে অন্ধকূপের গণ্ডী ছাড়ি,'
সর্দ্দারদের বাহিরে আসিছে বিবরের মাঝে রহিতে নারি।
স্বার্থতন্ত্র ভুলাটের পুঁথি ছিঁড়ে চলে সবে সগৌরবে,
সবার উপরে মানুষ সত্য—এই সত্যই বিজয় লভে।
মিথ্যাজ্ঞানের প্রথা বিধানের আশ-পৃষ্ঠস সবলে ছিঁড়ে
মুক্ত জীবন করে উৎসব মহামানবের সাগরতীরে।
বংশকুলের অহমিকা দলি' ত্যাগের সাধনা লভেছে জয়,
ন্যায়ধর্ম্মের পাঞ্চজন্য ধ্বনিত আজিকে ভুবন ময়।
জাগিয়াছে নারী চূর্ণ করিয়া সংস্কারের অন্ধকারা,
মানবাত্মার জয় জয়কার—নয়ন পেয়েছে অন্ধ যারা।
জড় প্রকৃতিরে বিজয় করিয়া মানুষ ছুটেছে ঊর্দ্ধলোকে,
তাহার বিমানে জয় অভিযানে শৈল সিন্ধু কে আজ রোখে?
কত কাল পরে নব বসন্ত জাগাইলে তুমি মানব-মনে,
শিল্পী তাহারে করিছে অমর—কবি গায় জয় গুঞ্জরণে।
মহাসমরের যজ্ঞভস্মে ভরেছিল বটে পৃথ্বীতল,
ঋষি কবি তায় আজিকে ছিটায় অমৃত মন্ত্রে শান্তিজল।
অশোক মন্ত্র অমৃত মন্ত্র অভয় মন্ত্রে দীক্ষা লভি'
বিশ্বমানব প্রাচী পানে চায়—যুগান্তরের উদিছে রবি।
ব্যর্থ হবে না ব্যর্থ হবে না হে যুগজননি তোমার দান,
পুন যদি হয় জয় জগতে জন্মিব হয়ে মহাপ্রাণ।
তোমার অঙ্কে জনমি' জননি জীবনে ধন্য গণ্য করি,
পরজন্মের যুগমাতা হবে ধন্য আমারে জন্ম ধরি'।

যে পাখের দিলে আত্মার পুটে ভরে রহিয়া সে বৈভবে,
যুগযুগান্তে লোকলোকান্তে চলে যাব আমি সগৌরবে।

কাজু বা হিজলী বাদাম

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

প্রবন্ধ

এই বাদাম ভারতের একটী অতি প্রয়োজনীয় পণ্য বলিলে কেহই বিশ্বাস করিবেন না। সাধারণত রপ্তানির মধ্যে ফলের (fruits) তালিকায় ইহা স্থান পাইয়াছে। কারণ এই বাদামের বীজের শাঁস লোকে ভোজন করে এবং বৎসরে এক কোটী টাকা পরিমাণের শাঁসের রপ্তানির ইহাই একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করিতে পারা যায়।

পণ্ডিতেরা মনে করেন পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আমেরিকার কোনও কোনও স্থানে কাজু বাদামের গাছ সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেও নানাস্থানে, বিশেষত সমুদ্রতীরের বনানীতে, মন্দ্রাজ, উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরের কাঁথিতে এবং অন্যান্য স্থানে প্রচুর ফল পাওয়া যায়। জগতে নানা কারণে বাদামের বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে আজকাল অনেক স্থানেই বাদাম গাছ জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে। তাহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের স্থান হয়ত প্রথম। শাঁসের রপ্তানির পরিমাণ হইতে কতক বোঝা যাইতে পারে। আফ্রিকা মহাদেশে পর্ত্তুগাল অধিকৃত মোসম্বিক প্রদেশে প্রচুর বাদাম জন্মে। কিন্তু ভারতবর্ষে কেবল যে বাদাম জন্মে তাহা নয়, এখানে বীজের কঠিন আবরণী হইতে তৈল নিষ্কাসিত করিবার বিরাট শিল্প থাকায় কাজু সম্পর্কে ভারতবর্ষের স্থান অপরাপর দেশ অপেক্ষা অনেক উপরে।

এই ফলের একটী বিশেষত্ব আছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ অর্থাৎ বীজটী ইহার সমস্ত ফলের বাহিরে থাকে। মূল ফলের আকার ও পরিমাণ যাহাই হউক, বীজটী তলদেশ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। জানি না, ইহা হইতেই "বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীজ" কথাটী জন্মলাভ করিয়াছে কি-না। তবে ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে ফলের অপেক্ষা বীজটী আকারে বা পরিমাণে বড়।

বাদামটী পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কেহ কেহ তাহা খাইয়া থাকে, কিন্তু এই কারণে তাহার সমাদর নহে; বীজের অভ্যন্তরস্থিত শাঁসই লোকের ভোজনে সমধিক লাগে। ইংরেজীতে বীজের আবরণী অংশকে "cashew apple" বলে, অর্থাৎ কাজুর আতা; ইহা নরম এবং অখাদ্য নহে।

আসল বাদামটী বৃক্কাকার (kidney shaped); ইহা হইতেও একপ্রকার তৈল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা শাঁস মূল্যবান, মুখরোচক এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া শাঁসেরই ব্যবহার বেশী। এই শাঁস চাটনী, মোরব্বা, মুখরোচক মিষ্টান্ন, চকোলেট প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে লাগিয়া যায়।

আমরা সমস্ত সকল ব্যবহার জানি না; কিন্তু ইহা যে নানা কাজে লাগে তাহা বুঝা যায় প্রতি বৎসর ইহার রপ্তানির পরিমাণ হইতে। বর্ত্তমানে এই শাঁসই প্রায় এক কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকার যায়; তন্মধ্যে আমেরিকা (U. S. A.) প্রধান খরিদ্দার। তাহার সহিত অপরাপর জাতিও আছে। পরিশিষ্ট (ক) হইতে ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের রপ্তানির পরিমাণ ক্রেতাগণের নাম ও প্রত্যেকের অংশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার পূর্ব্বে কাজু বাদামের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইত না; অপরাপর ফলের সহিত একসঙ্গে ছিল, সুতরাং পরিমাণ বুঝিবার উপায় নাই; তাহা হইলেও এই যুক্ত হিসাবে যে পরিমাণ ফলের রপ্তানি ছিল, তাহার মধ্যে কাজুর স্থান প্রধান। যে ফল এদেশে আমদানি হয়, তাহা প্রধানত এখানকার কারখানায় সাঁকা, পোড়া বা roasting-এর জন্য আসে।

এই শাঁসের রপ্তানি ব্যতিরেকেও কাজুর অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ব্যবহার রহিয়াছে। বীজের কঠিন আবরণী (shell) জগতের পণ্যের বাজারে মহা মূল্যবান্ বস্তু। উপরের কোমল অংশ (আমের থাক্‌ড়াংশের ন্যায়) দূরীভূত হইলে বাদামগুলি একস্থানে করিয়া তাহা সাঁকিয়া লওয়া

হয় (roasting)। ভারতবর্ষে এই কাজটী বেশ সুচারুরূপে হইয়া থাকে এবং এতৎসংক্রান্ত কয়েকটী কারখানারও আবির্ভাব হইয়াছে। বোম্বাই রত্নগিরি জেলায় মাণভান ও ভেনগুর্লায়, পণ্ডগঞ্জ-ভারতে গোয়া ও পানজিমে, মদ্রে মাঙ্গালোরে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কোনও কোনও স্থানে এই সকল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বাদামের শাঁস বাহির করিবার জন্য যখন ঐ বীজগুলি আগুনে ঝলসাইয়া লওয়া হয়, তখন উহা হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হইতে থাকে। লোহার পাত্রে—খোলা বা চাকা—খুব উত্তাপ দিবার সময় ইহা হইতে যে তৈল বাহির হয়, তাহা জমিয়া উঠে। প্রয়োজনমত সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ প্রজ্বলিত অবস্থায় উহার উপর জল দিয়া আগুন নির্ব্বাপিত করে এবং খুব ঢালু স্থানে নামাইয়া রাখে। তখন জল ও তৈল গড়াইয়া একস্থানে গিয়া জমে এবং সাধারণ উপায়ে জল হইতে তৈল পৃথক করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সংস্কার সাধন আরম্ভ হইয়াছে এবং উন্নত প্রণালীর নমুনাদি আবিষ্কৃত হইতেছে। আশা করা যায়, ভারতবর্ষের অন্যান্য পুরাতন নানা প্রথার ন্যায় এই প্রথাও অনতিকালের মধ্যে লোপ পাইবে।

কাঁচা বাদামের তৈলের নানাপ্রকার ব্যবহার জানা ছিল। বহুকাল হইতে লোকে নৌকার কাঠে বা জালের সুতায় কষ লাগাইত; ইহার উপর জলের ক্রিয়া কম হওয়ায় পচন নিবারণ করিয়া থাকে। উইপোকার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে পুস্তকাদিতে মাখাইয়া রাখিত। এই তৈল নিতান্ত কটু, তিক্ত ও উগ্রগন্ধি। বর্ত্তমানেও বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া এই তৈল ঐ সকল বিষয়ে আরও অধিক কার্য্যকরী করা হইয়াছে। Waterproof, Verminproof নানা প্রকার রঙ বার্ণিশ হইয়াছে এবং তাড়িৎশক্তি রোধক মলমা বা বার্ণিশ (insulating material or varnishes) তৈয়ারী হইতেছে। কোনও পদার্থের নমুনা ও ছাঁচ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল বস্তু প্রয়োজন হইতে পারে তাহা যৌগিক উপায়ে (synthetic plastics) এই তৈল হইতে কারখানায় সৃষ্টি হইতেছে। আমেরিকা এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী, এমন কি, এই ব্যবসা তাহার একচেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জার্ম্মানীতেও কিছু কিছু এই সকল দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয়। আয়ুর্ব্বেদের মতে কোনও স্থানে ফোস্কা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনে এই তৈল লাগাইয়া দেওয়া হইত।

এই তৈলের স্বাদ তিক্ত হইলেও ইহার নাকি এক বিশেষ সুগন্ধের জন্য মাদিরা (madeira) এবং অন্যান্য মদ্য সুবাসিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। শাঁস হইতে যে তৈল নির্গত হয়, তাহার দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয় কি-না বলা কঠিন।

বৃক্ষের ত্বক হইতে এক প্রকার আঠা নির্গত হয়; তাহা দ্বারা নির্লোপ চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া কাপড় প্রভৃতিতে দাগ দেওয়া হয়।

প্রকৃতপক্ষে জগতের বাজারে ভারতবর্ষই খুব বেশী তৈল সরবরাহ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন এই রপ্তানি তৈলের পরিমাণ দুই হইতে আড়াই লক্ষ গ্যালন।

বাদামের সিকি পরিমাণ আস্ত বা পূর্ণ বীজ পাওয়া যায়; আরও পাঁচ বা ছয় ভাগ ভাঙ্গা বীজ হইয়া থাকে। ফলের মোটামুটি অর্দ্ধেক বীজের কঠিন আবরণী বা shell এবং এই আবরণীর ওজনের এক পঞ্চমাংশ তৈল পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ হাতের দ্বারাই শাঁস বাহির করা হইয়া থাকে এবং তাহার অধিকাংশ বিদেশে চালান যায়। হস্তত সমস্ত বীজের পরিমাণের শতকরা দশ বা খুব বেশী কুড়ি ভাগ এদেশে ব্যবহৃত হয়।

পরিশিষ্ট (ক)

রপ্তানি— ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দ
পরিমাণ—১২,৭৪৫ টন
মূল্য— ১,২৮,৯০,৯৭৯ টাকা
ক্রেতাগণের নাম ও অংশ

১৯৩৭-৩৮

	টন	টাকা	শতকরা অংশ
আমেরিকা—	১০,৭০৫	১,১০,৫৩,৪১০	৮৫·৫
ব্রিটেন—	৬১২	৫,৭৮,২৯৭	৪·৪
নেদারল্যাণ্ড—	৩৩০	৩,২৮,৯৮০	২·৫
কানাডা—	২৭১	৩,২০,৯৩৫	২·৪
ফ্রান্স—	৩০৪	১,৫০,৩২৯	১·১
বেলজিয়ম—	১৪০	১,২৫,২৯১	১·০
অন্যান্য—	৩২৩	৩,৩৩,৭২৭	—

(খ)

আমদানি—১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দ
পরিমাণ— ১৭,৭৮২ টন
মূল্য— ২৩,২৯,৮৫৭ টাকা

বালিগঞ্জের বাড়ী

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম-এ

আজ যে আমার গৃহপ্রবেশের দিন। আমার নতুন বাড়ীতে—

একটা আর্ত চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি চোখে বাইরে তাকালাম। খোলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ল শুধু অন্ধকার রাত্রির আবছা-অন্ধকার। কোনখানে কিছু নাই।

তবু কেমন ভয় করতে লাগল। আর্তনাদের রেশ এখনও কানে বাজছে। হাত বাড়িয়ে শিওরের জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। বিছিড়ি মাঁয়ারে পর ভয়ে পেলাম।

বয়:কলের এক স্কুলের মাষ্টার। এক নতুন আত্মীয়ের কৃপায় সম্প্রতি কর্পোরেশন-স্কুলে একটা চাকরী জুটেছে। তাই বালিগঞ্জের এককোণে নব-নির্মিত একটি বাড়ীতে উঠেছি। আজ্ঞ অল্প। বাড়ীটিও ছোট। ছোট দুখানি শোবার ঘর দুপাশে। মাঝখানে তাত্ত্বিক ছোট বসবার ঘর। ভিতরে তার চেয়েও ছোট দুখানি ঘর—রান্নার ও ভাঁড়ারের। ডান দিকের শোবার ঘরটি আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। ডানের জানলাটি খুললেই ছোট একটু মাঠ। তারপর খানিকটা বেল জমলা। বাঁশঝাড়ের ঝাড়। বেশ।

মেসে কাল এসে এ বাড়ীতে উঠেছি। এখনও আর কেউ আসে নাই। আজই জোর করে দিয়েছি। সঙ্গে চিঠিও পাঠিয়েছি দিলীকে—বাড়ীটি বড় সুন্দর। দু-একদিনের মধ্যেই তারা এসে পড়বে। কিন্তু ইদানীং আমি একা। না—ভাঁড়ার ঘরে চাকরটা ঘুমুচ্ছে।

চোখ বুজে খানিকটা পড়ে রইলাম। ঘুম কিন্তু এল না। সে আর্তনাদের রেশ বার বার কানে বাজতে লাগল। চোখের উপর ভাসতে লাগল কয়েকটি মানুষের জীবনের কয়েকটি টুকরা ঘটনার রেখাচিত্র। কিন্তু সে কথা খুলে বলতে হ'লে একটি পারিবারিক জীবনের রহস্যকের উপর থেকে বিস্মৃতির যবনিকাটি তুলে ধরতে হয়। আপনারা অনুমতি করুন, সে অকরুণ কাজটি আমিই করছি। এ পাপের বোঝা গল্প-লেখকদের মাথা পেতেই নিতে হয়।

যবনিকার অন্তরালে।

প্রথম দৃশ্য।

দশ বছর আগেকার কথা।

গোপাল বসু লেনের একটি অন্ধকার বাড়ী। ঢুকতেই দুপাশে দুটি ঘরে ঘুঁটির দোকান। তারপর কলতলা। কলকাতার ঘুঁটিওয়ালার দুটি পরিবার। একটি উৎকলবাসী। অপরটি বরিশালের। সামনের ছোট বারান্দায় তারা রান্না করে, ঘরকন্নার জিনিষপত্র রাখে। ভিতরে রাতকাটায়। তারপর তারা লোহার সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠলেই দোতালার দুখানি ঘর। সেখানে থাকে একটি কেরাণি-পরিবার—আমাদের গল্পের নায়ক।

* সুরেশ পোষ্টাপিসে চাকরি করে। যা পায় তাতে সংসার চলে। বুড়ো বাপ প্রায় অকর্মণ্য। কাঠের শিক দেওয়া জানলার পাশে সারাদিন বসেই কাটায়। ইট-কাঠের ফাঁক দিয়ে খোলাটে আকাশ চোখে পড়ে। তার মনে পড়ে গ্রামের বাড়ীর চারপাশের অফুরান মাঠ, আর অজস্র হাওয়ার কথা। খড়ের তিনখানি বড় বড় গরের কথা। মেলার যাবে সব বিকিয়ে গেছে। তা যাক—বুড়ো স্বীপুত্র—ছেলে—তবু সুরেশ তো মানুষ হয়েছে। বি-এটা পাশ করেছে। আশা ভাল, তাই পোষ্ট আপিসে একটা চাকরিও পেয়েছে।

ঠিড়িং ঠিড়িং ক'রে লাফাতে লাফাতে একটি বছরের মানু এসে জোটে। বলে: আম বাবা, সতুরা সব ভবানীপুরের নতুন বাড়ীতে চলে গেল।

মানা কৌতূহলী হয়ে শুধায়: কেন রে?

মানু জানে বাড়ী বদলের ব্যাপারে মায়ের ভারী উৎসাহ। পরম বিজ্ঞের মত সে বলল: ও হরি, তুমি জান না বুঝি? সতুর ঠাকুরমার যে অসুখ। এ বাড়ীতে হাওয়া খেলে না, আলো নাই। তাই তো ভবানীপুরে গেল। মস্ত বড় বাড়ি সে বাড়ী।

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: হুঁ।

রোগ বুঝে মানু রোগ দিল: আমরাও কেন বাড়ী বদল ক'রে ভবানীপুর যাই না বাবা।

বাবা জবাব দিল না।

মানু আবার বলল: তুমিই তো বল বাবা, এই অন্ধকার ঘুঁটেওয়ালীর বাড়ীতে তোমার শরীর ভাল থাকছে না। বাড়ীটা ছেড়ে দিলে ভাল হ'ত। তবে ভবানীপুর কেন চল না বাবা?

বুড়ো বাবার সাথে মানুর, ভারী সদ্ভাব। যেন খেলার সাথী।

মানু বাবার গলা জড়িয়ে ধরে: আজই তুমি মাকে বল না বাবা, ভবানীপুরে বাড়ী দেখতে।

বাবা কি বলতে যাচ্ছিল, মানুর মা ঘরে ঢুকল। একহাতে ওষুধের গ্লাস, আর এক হাতে এক কাপ গরম দুধ।

মা বলল মানুকে: কোথায় গেছলিরে তুই সেই ভরা দুপুরে?

মানু বাবার বুকের কাছে আরও ঘেঁষে বলল: মা রে কোথায় আবার খেলাম! ওই সতুদের বাড়ীতেই তো ছিলাম। জানো মা, ওরা সব আজ ভবানীপুরে উঠে গেল!

মা বুঝল, বাপ-ছেলের এতক্ষণ এই আলোচনাই চলছিল। কৃত্রিম রাগের সাথে বলল: গেল তো গেল, তাতে তোর কি রে! তুই কেন সারাদুপুর ওদের বাড়ীতে হা-পিত্যেশ্ ক'রে থাকতে গেলি?

কানু ভয়ে ভয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, বাবাই ওকে সে বার থেকে উদ্ধার করল : তাতে আর একি হয়েছে ? খেলার সাথী চলে যাচ্ছে, ওদের কচি মনে একটু লাগেই তো।

মানুর মা দুধের কাপটি নামিয়ে রেখে বলল : এই ক'রেই তো ছেলেটার মাথা তুমি খেলে ! দিনরাত ভাল কথায় ছেলে মানুষ করা যায় নাকো, বুঝলে ?

বাবা হেসে বলল : ছেলে মানুষ করতে জানি কি-না আমার ভূষণই তার সাক্ষী। এ ছেলে না হয় তুমিই মানুষ ক'র।

মাও হেসে ফেলল : নাও হয়েছে। এখন এই ওষুধটা খেয়ে ফেল তো। তোমাদের সঙ্গে বকতে বকতে দুধটা বুঝি জুড়িয়েই গেল। ওমা, জল তো আনি নি। এত জ্বালাতে কি কিছু মনে রাখবার জো আছে ! বৌমা-ও-বৌমা, কাঁচের গ্লাসে একটু জল দিয়ে যাও তো মানু।

বাবা হেসে বলল : তোমাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না তো। চুপ করে বস, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তা আর যাবে না ! তোমাদের সংসারে এসে জিরিয়ে জিরিয়ে তো খেলাম। নাও, এখন ওষুধটা খেয়ে নাও, আমার আরও কাজ আছে।

ওষুধের শিশিটা নিতে নিতে বাবা বলল : কেন, তোমরা এই রাতদুপুরে কর কি তো ? কত দিন বলেছি, এ ছাইভস্ম ওষুধপত্তর খেয়ে আমার কিছু হবে না।

এই খিটখিটে তিক্ত সময়টাই উঠে পড়ার মা জলে উঠল : ছাইভস্ম খেলে কিছু হয় না, কিন্তু ডাক্তার যে আর কোন পিণ্ডি গিলতে বলে না।

আগুনে ঘোঁয়াচ লেগে বুড়োও জ্বলে উঠল : ডাক্তার বললেই তাই করতে হবে নাকি ? ডাক্তার তো কত কিছুই বলে, সব করেছ নাকি তোমরা, না, সব করবার ক্ষমতা তোমাদের আছে শুনি ?

বুড়োর শীর্ণ শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। হাতের ওষুধের শিশিটা পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

বুড়ো চেঁচাতেই লাগল : ডাক্তার বলেছে ! ডাক্তার তো বলেছে গিরিডি-মধুপুর যেতে, পারলে তোমরা যেতে ? ডাক্তার তো বলেছে এই এঁদো বাড়ী ছেড়ে একটা ভাল বাড়ীতে যেতে, তা কুলিয়েছে তোমাদের সামর্থ্যে ? শুধু ডাক্তার বললেই—

মা দুহাত এক ক'রে ব'লে উঠল : ওগো, তোমার পায়ে পড়ছি, ক্ষমা দাও—থাম।

বুড়ো আবার গর্জে উঠল : কেন থামব ? যত সব অপদার্থের কাণ্ড তোমাদের। চোখের উপর দেখছ যে, কোথা কে কটু দংসারটা চালাচ্ছে। গায়ে একটা ভাল জামা নাই। এই তো বৌমা আমার, গায়ে একখানা গয়না দিতে পারলাম না আজও। আর আমি বুড়ো কেতো খুশী, আমার জন্য আউন্সিই খরচ করছ। কেন ? আমার অসুখ করেছে, না হয় আমি মরব। তাই বলে যা সামর্থ্যে কুলোয় না—

রেণুকা এরই মধ্যে জলের গ্লাস এনে দাঁড়িয়েছিল। সে বাধা দিল : সে কথা এখন থাক বাবা, আপনি দুধটা খেয়ে ফেলুন।

বুড়ো তেমনই চিড়িকি মেজাজেই জবাব দিল : না না, ও সব দুধ-টুধ আর আমি খাব না।

বাইরে ছুতার শব্দ শোনা গেল।

বুড়ো তাড়াতাড়ি হাতে বাড়িয়ে দুধের কাপটি নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে ফেলল : যাও না তোমরা সব আজ করগে। এখানে অমন ক'রে বলে আছ কেন ? এই মানু, জাঁতা কাঁচওলা জামলা গলিয়ে ওপাশে ফেলে দেতো বাবা।

সুষম শুনল সব। বুঝলও। আজকের এই দাঁবানলের স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল অতীতের কয়েকটি ঘটনার সংঘাতে। বুড়ো বাবা যাতে আজার হবার পরেই ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিল বাড়ী বদল করতে—একটা বেশ আলোযুক্ত বাড়ীতে যেতে। কিন্তু বুকপেই সে পরামর্শ সে তার কানে ঢুকেছিল, বুড়োর মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল—বাড়ী না বদলালে সে আর ভাল হবে না।

বুড়োর তাগিদের বিরাম নাই। বাড়ীওলা লোক অতি। সুষম চেষ্টার ত্রুটি করল না, কিন্তু এত অল্প টাকায় যে বাড়ী পাওয়া যায় তা এ বাড়ীর চেয়ে ভাল তো নয়ই, বরং খারাপ।

কিন্তু সে কথা কে শোনে ! বুড়োর জিদ—বাড়ী বদল করতেই হবে, নইলে সে মরে যাবে এখানে।

সুষম বলল : বাড়ী তো কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবা বলল : হ্যাঁ, এ আবার একটা কথা। কলকাতা শহরে আবার বাড়ীর অভাব !

সুষম বলল : আমি তো অনেক খুঁজলাম বাবা, এত কম টাকায় কোথাও ভাল বাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না।

মানু বলল : ভাল বাড়ী কি আর রাজবাড়ী চাই আমাদের। এই একটু আলোটা বেশ পাওয়া যায়।

বেচারা সুষম বাড়ী খুঁজতে কসুর করে নাই। একটু বিরক্ত হয়ে তাই বলল : কিন্তু আলোটা দেখতে গেলেই টাকাটাও যে বেড়ে যায়।

কথাটা খচ্ ক'রে বুড়োর বুকের মাঝে বিঁধেছিল। মুখ তুলে শুধু বলল : ও, আচ্ছা।

আর কখনও বুড়ো বাড়ী বদল করবার কথা বলে নাই। সুষম পরে অনেক কথা ভেবেছে। বাবা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু মনের কথা তার একটা গভীর বেদনার ক্ষত ক্রমশ গভীরতর হয়ে চলেছে। অনেক অসতর্ক মুহূর্তেই সে বেদনা আত্মপ্রকাশ করে কণী ও কাজে।

আজকার ঘাবানলও সেই স্ফুলিঙ্গের বৃহৎ প্রকাশ।

শেষ দৃশ্য।

পাঁচ বছর পরে।

বালিগঞ্জের এক কোণে একখানি ছোট একতলা বাড়ীতে সুষম

গৃহপ্রবেশের উৎসব। মাথের ছোট পরদাখিতে পূজার নানা সরঞ্জাম জড় করা হয়েছে। একপাশে আলপনা আঁকা হয়েছে নিপুণ হাতে।

বাড়ীখানির একটু ছোট ইতিহাস আছে—সে ইতিহাস এর স্রষ্টার। এর প্রত্যেকখানি ইটের বুকে লেখা আছে একটি অসমাপ্ত পুত্র-সন্তানের অক্লান্ত প্রচেষ্টার কাহিনী। সেই কাহিনীই সংক্ষেপে বলব। কারণ আমাদের গল্পের নায়ক-নায়িকা পরিচয়টির জন্ত এ কাহিনী বলা দরকার।

সুমথর জীবনে সহসা একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই সুযোগের হ'ল। একদিনে ৯৯ টাকারী-জীবনের অনেকগুলি সিঁড়ি পার হয়ে গেল। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বাড়ল পঁচিশ টাকা।

বাড়ী ফিরেই সুমথ বাবার পা জড়িয়ে ধরল : আমার কথা তোমাকে এবার রাখতেই হবে বাবা, বাড়ী বদল করতেই হবে।

পুত্রের উন্নতির আনন্দে বাবার মনেও সেদিন আনন্দের জোয়ার। দীর্ঘ দিনের চোখের জলে সে অভিমান ভাসে নাই, আজ তা কোথায় ভেসে গেল।

বুড়ো সুমথকে তুলে ধরে বলল : বেশ তো, তার জন্তে এমন ক'রে পড়লি কেন?

সুমথ বলল ধরা গলায় : না বাবা, হঠাৎ একদিন যে অন্তায় করেছিলাম, তা তোমাকে ভুলতেই হবে। আমি কালই নতুন বাড়ী দেখব।

বুড়ো হেসে বলল : না রে, নতুন বাড়ী দেখে কাজ নাই।

সুমথ জলভরা চোখ তুলে চাইল। বুড়ো ওর মাথাটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল : না রে না, আর আমার রাগ নাই। কিন্তু আমি বলছিলাম কি, বেশী টাকায় নতুন বাড়ী ভাড়া করে আর কাজ নাই। এই বাড়ীতেই আরও কিছু দিন না হয় থাকি। তুই এদিকে চেষ্টা দেখ, একটু জায়গা-জমি কিনে কোথাও মাথা গুঁজবার একটু ছাউনি ফেলা যায় কি-না।

প্রস্তাবটি ভাল। সুমথও অনেক দিন ভেবেছে। তবু বলল : কিন্তু সে যে অনেক টাকার ব্যাপার বাবা, কত দিনে তা হবে।

বুড়ো হেসে উঠল : তত দিন আমি মরব না রে। আর বেশী দিনই বা কি লাগবে। এই তো বালিগঞ্জের ওদিকে শুনছি খুব সস্তায় জমি বিক্রি হচ্ছে।

সুমথ বাধা দিল : ওদিকটা মোটেই ভাল না বাবা। বা জলো আর পচা ডোবার ভীতি।

বুড়ো হাত নেড়ে বলল : না রে বাবা, পরীবের ওই ভাল। তবু খোলা রোদ্দুর আর গাছের বাতাস তো একটু গায়ে লাগবে। তোদের এ ইটকাঠ-সুরকি বাবা আমাদের আর সহ্য হয় না। ওই জলো আর পচা ডোবাই আমাদের ভাল।

তারপর এই বাড়ীর সৃষ্টি। সুমথর প্রায় পাঁচ বছরের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের চিন্তা, প্রতিটি মুহূর্তের মন এই বাড়ীর প্রতিটি অণুতে মিশে আছে। সুখ-সম্ভোগের হাত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে ও অর্থসঞ্চয় করেছে। সে অর্থ নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে গড়ে তুলেছে এই বাড়ী। পাঁচ বছরের শ্রম আজ সফল। বাড়ী দেখে বাবা তারি খুশী। অনুতপ্ত পুত্র-হৃদয় আজ প্রশান্তিময়।

গৃহপ্রবেশের উৎসব।

মা নানা আয়োজন-উপচার নিয়ে ব্যস্ত। রেণুকা গৃহকর্মে ডুবে আছে। কত কাজ আজ। পূজা-অর্চনা। নূতন লোক থাকে। বাড়ীটাকে সাজাতে হবে।

বাসু জোগাড় করেছে অনেকগুলি ফুলের টব। সেগুলি সাজাতে সে ব্যস্ত। রাস্তার পাশ দিয়ে কেয়ারী করে লাগিয়ে দিয়েছে পাতা-বাহারের ডাল। ভিতরে গোল করে পুতেছে মরশুমী ফুলের চারা।

বুড়ো বাবা বাইরের রকে বিছানা নিয়ে পড়ে আছে। সকালের মিঠে রোদে শরীর ছড়িয়ে দিয়েছে পরম আরামে। কাঠের শিকের ফাঁকে দেখা আকাশ আজ তার চোখে নীলাভীম নীলিমায় ভরে উঠেছে। বুড়ো চেয়েই আছে।

সুমথ বেরিয়ে গেছে খুব সকালে। কোন্ বন্ধুর মোটর নিয়ে সে নিমন্ত্রণ করতে গেছে দু-চারজন বন্ধুবান্ধবকে। আর তার বড় আনন্দের দিন। এ দিনটিকে সে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখতে চায় নানারূপে নানা রসে।

মোটরের হর্ন বেজে উঠল কড় রাস্তার মোড়ে। বুড়ো বাবা চোখ ফিরাল। বাসু লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল, মা এসেছে। মা দরজার এ পাশে এসে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল দুটি চোখের চাওয়া।

মোটর থামল।

সুমথর অচেতন রক্তাক্ত দেহ ধরে তোলা হ'ল ধরাধরি ক'রে। কয়েকটি মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদে বাঁধ আকাশ কালো হয়ে গেল।

মোটর-অ্যাক্সিডেন্টে ভীষণভাবে আহত হওয়ায় সুমথ বাবা গেলেন মরবার আগে অর্ধচেতন অবস্থায় আকুল দৃষ্টি মেলে ও শুধু কয়েকবার বলেছিল : আজ যে আমার গৃহপ্রবেশের দিন। আমরি নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ উৎসব।

গৃহপ্রবেশের আগেই বাড়ীর সামনে 'টু লেট' ঝুলান হ'ল।

* * * *

বেজায় গরম। কিছুতেই ঘুম আসছে না।

হাত বাড়িয়ে শিওরের জানলাটা খুলে দিলাম। একটা স্নিগ্ধ্যিরে বাতাস এসে ঘরে ঢুকল।

আবার চোখ বুজলাম।

আজ রাতে কোন্ বাতগ্রস্ত বুড়ো বাবা কাঠের শিকের ফাঁক দিয়ে রাতের আকাশের দিকে চেয়ে আছে কি-না কে জানে।

ফলের ব্যবসা ও তাহার উপায়

শ্রীমতী প্রতিভা দাস

(প্রবন্ধ)

সকলেই জানেন, বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে বেকার সমস্যা কিরূপ ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছে। অল্প-শিক্ষিত, এমন কি উচ্চ-শিক্ষিত যুবকেরা পর্য্যন্ত কর্ম্মের অভাবে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। উপস্থিত এই বিষয় লইয়া বহু আলোচনা হইতেছে এবং কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং উহার আলোচনা করিব না; শুধু ব্যবসায় করিবার একটি সহজ ও সরল পথ কিরূপ ভাবে উপেক্ষিত হইয়া আছে সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি।

ব্যবসায়ী বুদ্ধি আমাদের দেশের লোকের যে বিশেষ নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। আগে ছিল। বাঙালী বণিকেরা জলপথে ডিঙা ভাসাইয়া সুদূর ছাতা বলী প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। সে ত আজিকার কথা নয়! সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। এখনকার ছেলেরা ইচ্ছা সত্ত্বেও কোনরূপ ব্যবসায়ে যাইতে পারিতেছেন না, তাহার কারণ তাঁহারা আরম্ভ করিতে জানেন না। মূলধনের অভাব ত বটেই, আরম্ভ করিতে না জানাও একটা কারণ। সকলেই জানেন, চাকা একবার চলিতে আরম্ভ করিলে কতকটা আপন বেগেই চলে, কিন্তু এই আরম্ভ করাটা না-জানার দরুণ অনেকে অগ্রসর হইতে ভয় পান। কিছু দিন হইতে আমেরিকানরা খুব জাঁকাইয়া ফলের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। শুষ্ক ফলের নয়, ফল স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ু-শূন্য পাত্রে রাখা। এই ফলের অত্যন্ত চাহিদা।

আমাদের ভারতবর্ষ ফলের দেশ, কিন্তু আমাদের দেশের কজন লোকের দৃষ্টি এদিকে আছে, শীতের দিনে কমলা, আপেল, গ্রীষ্মের আম, জাম, কাঁটাল, লিচু—কত নাম করিব। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকারের ফলে আমাদের দেশ পরিপূর্ণ থাকে। এত প্রকারের ফল কোন দেশে পাওয়া যায় বলিয়া শুনি নাই।

সুতরাং ফলের ব্যবসায়ে আমাদের দেশে কিরূপ লাভের সম্ভাবনা! কেবল যদি আমের কথাই ধরা যায়, তাহা হইলে বলিব আমের উপর দিয়াই যে কোন ব্যক্তি বিস্তর লাভ করিতে পারেন। আমের ন্যায় সুস্বাদু ফল আর পৃথিবীতে নাই। ইউরোপে ইহার বিলক্ষণ চাহিদা আছে। শুনিয়াছি বিলাতে দুই শিলিং করিয়া একটা আম বিক্রয় হয়। অতএব কেবল আমের দ্বারাই এরূপ লাভ হয়-তা ছাড়া অন্যান্য ফল ত আছেই।

ক্যালিফোর্নিয়া ও হাওয়াই দ্বীপ হইতে লক্ষাধিক টাকার ফল আমাদের দেশে আসিয়া থাকে। আমেরিকানরা পাকা ব্যবসায়ী, উহারা ব্যবসা করিতে জানে; সুতরাং পঁচিশ-ত্রিশ টাকা ডিউটি দিয়াও স্বচ্ছন্দে ব্যবসা বজায় রাখিয়াছে।

আমাদের দেশে ফল এত প্রচুর ফলে যে, আমরা খাইয়া উঠিতে পারি না—এক ভাগ যদি খাই ত যথেষ্ট। বাকী পাখী পক্ষীতে খায়, কিম্বা পচিয়া গলিয়া নষ্ট হয়। আমরা যদি সেই প্রাচুর্য্যের দিনে ফল কোন রকমে ধরিয়া রাখিতে দিতে পারি, তাহা হইলে অসময়ে পাওয়া যাইতে পারে, বিদেশেও পাঠাইতে পারা যায়। প্রথমে দেখিব কিরূপে বিদেশে পাঠান যাইতে পারে। এমনই পাঠাইলে পচিয়া গলিয়া নষ্ট হইবে, বরফ দিয়া পাঠাইতে পারা যায় কিন্তু তাহাতে অসুবিধা আছে, বরফ হইতে বাহির করিলে আর বেশীক্ষণ রাখা যাইবে না। কোল্ড রুমেও সেই অসুবিধা, যদি শীঘ্র বিক্রয় না হয় তবে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং বায়ুশূন্য করিয়া রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায়।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স দেশে বায়ুশূন্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে চেষ্টা করা হয়। ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট বায় শত ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ঘোষণা করেন। যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য সবচেয়ে ভাল-ভাবে রাখিবার উপায় বাহির করিবে উহা তাহাকে দেওয়া হইবে। নিকোলাদ্ এপার্ট নামে এক মিষ্টান্ন বিক্রেতা বুদ্ধি বলে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, বায়ুতে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে। খাদ্যদ্রব্য যদি বায়ুশূন্য করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে

দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। সেই ব্যক্তি এক পুস্তিকা বাহির করে এবং পুরস্কার তাহারই প্রাপ্য হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি বুঝিতে পারে নাই যে, খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করিবার জন্য বায়ুতে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণুই দায়ী। এই কীটাণু যে নির্দ্দিষ্ট তাপে ধ্বংস হয় তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এপার্টের ছেলে বায়ুশূন্য ও বীজাণু রহিত (sterilize) করিবার এক প্রকার যন্ত্র বাহির করে, ইহার নাম 'অটোক্লেভ'।

তারপর পাস্তুর সাহেব এই আন্দোলন সম্পূর্ণ করেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে micro-organism হইতে খাদ্যবস্তু রক্ষা করিতে হইলে pasturisation করিতে হইবে। ফ্রান্সে House of Apert এখনও প্রসিদ্ধ, তথায় এখনও অতি উত্তম জ্যাম জেলি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ ফলের দেশ, মজুরীও অন্যান্য দেশ হইতে কম, দেশের লোকের দৃষ্টি এদিকে পড়িলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়, যথা—

১। দেশের ছেলেরা কাজ পায়।

২। ফলের অযথা অপচয় দূরীভূত হয়।

৩। কৃষকদের বিক্রয় সমস্যা দূর হয়।

৪। ভাল ফলের চাহিদা বাড়ে।

৫। বিদেশে ফলের জন্য যে টাকা যায় তাহা বাঁচে।

৬। ভারতের চিনির একটা উপায় হয় অর্থাৎ কাজে লাগে।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে Fruit Grower's Association-এর পক্ষ হইতে শ্রীযুত মূলচাঁদ মালবীয়ের বিশেষ চেষ্টায় ছাত্রদিগকে হাতে কলমে ফল-সংরক্ষণ, জ্যাম জেলি প্রস্তুত শিখাইবার জন্য একটি বিশেষ ক্লাস করা হয়। গ্রীষ্মের বন্ধে চৌদ্দ দিনের কোর্সে দুই বেলা করিয়া শিখান হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান বৎসরে আমি কৌতূহল প্রযুক্ত উক্ত ক্লাসে যোগদান করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। শুধু ছাত্র নয়, মেয়েরা যাঁহারা জ্যাম জেলি প্রস্তুত করিতে ভালবাসেন, এমন কি, যাঁহারা ও বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিনী তাঁহারাও সামান্য একটু আধটু বৈজ্ঞানিক সাহায্য লাভ করিলে আরও সহজে ওই সব প্রস্তুত করিতে পারিবেন। যেমন টেম্পারেচার ব্যবহার, একটু এসিড্ বা প্রিজারভেটিভ্ ব্যবহার, বায়ুশূন্য করিবার সহজ উপায় ইত্যাদি—এই সব দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী আরও সহজ হইবে। আমি লক্ষ্য করিয়াছি ছাত্রগণের এবিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ আছে। গ্রাজুয়েট, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছেলেরাও ছিল, আবার কাছাকাছি গ্রামের ছেলেও অনেক ছিল—যাহারা সামান্য লেখাপড়া জানে, এমন কি, সুদূর মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে চারিজন মাদ্রাজী ছাত্র আসিয়াছে, তাহারা এদেশের ভাষাও জানে না, কেবল ইংরেজীর সাহায্যে চলে। আহার ও বাসস্থানের বিশেষ অসুবিধা, তথাপি Fruit Preservation শিখিবার উৎসাহে কোন অসুবিধা গ্রাহ্য করিতেছে না।

আমার মনে হয় ছেলেরা যখন এত উৎসাহী তখন প্রত্যেক প্রদেশে ঐরূপ ক্লাস করা উচিত। আমি বাঙালীদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। আমাদের বাঙলা সকল ব্যাপারেই অগ্রবর্ত্তী হইয়াই চলে, সুতরাং জনকত উৎসাহী ভদ্রলোক যদি আন্তরিক চেষ্টা করেন তাহা হইলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। খুব বেশী টাকারও প্রয়োজন নাই, দু-একটা auto clave ইত্যাদি আবশ্যক। এইবার এলাহাবাদের Fruit Preserving class-এর একটু বিবরণ দিব।

এলাহাবাদের Fruit Preserving Class চৌদ্দ দিনের কোর্স, ফলরক্ষা, ফল শুষ্ক করিবার প্রণালী, জ্যাম জেলি মোরব্বা, আচার, প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ক্লাস হইতে পাশ করিবার পর Agriculture Institute-এ ছয়মাসের কোর্সে কোন একটি জিনিষের উপর স্পেশালাইজ করিতে হয়। যাহা হউক বাঙালী ছাত্রগণ যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হন তবে কুটীরশিল্পরূপে আরম্ভ করিয়া দশ-পনর টাকা লাভ করিতে করিতে ক্রমে দশ-পনর হাজারও লাভ করিতে পারেন।

শুধু স্বপ্ন আর ছায়া

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বি-এ

বছর ঘুরে এল।

কি ভাবে যে কেটে গেল এতগুলা দিন টেরই পাওয়া গেল না। নীনার মৃত্যুর তারিখটা বিষুর হ'য়ে দেখা দিল ক্যালেণ্ডারের পাতায়। হঠাৎ পুরান একখানি চিঠি হাতে পড়তেই শিশির শিউরে উঠল—হাতের লেখাখানা বালিশের উপর রেখে সে বিছানা থেকে নেমে এসে দাঁড়াল আয়নার কাছে। মনে পড়ল তার, এমনি একদিনে সে লিখেছিল তার নীনাকে এক বছর আগে। পাশের টেবিলের ওপর থেকে শিশির তুলে নিল একখানা মুকুরের বাসন—তখনও উষ্ণ, একটু আগেই যেন নীনা বালাই তার বুক থেকে বাহিরে রেখে গেছে। শিশির আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, হার খাটাকে বুকে চেপে ধরে সেই খিরে ধরে পড়ল—সব শক্তিটার নাসেও সে একবার ঘরের চারদিকে চেয়ে নিল—পিয়ানোর ওপর স্বরলিপির শেষ পাতাটি সে তাদেই খোলা, নীনার আপন হাতের হরা ফুলদানিতে ফুলের গুচ্ছ তেমনই যেন সজীব।

শিয়রে মোমের বাতির ক্ষীণ শিখা কেঁপে উঠল পরিসমাপ্তির ভয়ে। শিশির নিজেই তাকে নিভিয়ে দিয়ে ভয় থেকে তাকে রেহাই দিল; তারপর ধীরে ধীরে দু'চোখে তার ছড়িয়ে এল নীল নিশার কুহেলি মায়া।

শিশির দেখছে, নীনা আসছে—আসছেই ভবে তাকে, মিলিয়ে তার দৃষ্টির সৌরভ, আর সে আসবে না? শিশির দেখল, নীনা প্রভুর আলো আর স্বর্গের অনেক পারিজাত-সৌরভ নিয়ে এসে পড়েছে তার ঘরে—ঘরের সমস্ত কিছুই তাকে আলোয় বরণ করে নিল। আবার সব সজীব হয়ে উঠল। অপরীরী নীনাকে কাছে পেয়ে শিশির তাকে বাহুপাশে বেঁধে নেবার জন্য একবার হাত দুটাকে বাড়িয়ে দিয়েই পাশ ফিরে শুল।

একটা ক্ষীণ নিঃশ্বাস বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেল।

জাগলেন শিশির। অন্ধকার ঘরখানা তখনও আলোকে ভার ভোলে কেঁদে উঠল আড়াই বছরের এক রক্তঝরা ইতিহাস!

দেকের এক বাসন্তী সন্ধ্যা। আকাশে নীল তরলতা। দেকের জলে তীরের আলোগুলোর টুকরা টুকরা ছায়া মৃদু বাতাসের দোলায় চলছে খেলে খেলে তাদা ভাঙা ছোট ঢেউয়ের সাথে। পুরান একবন্ধুর সাথে দেখা অনেক দিন পর। সঙ্গে তার একটি তরুণী গ্রাম থেকে নূতন কলকাতা এসে লেক দেখতে এসেছে তাকে নিয়ে। দুই বন্ধুর মধ্যে আলাপ চলল অনেকক্ষণ ধরে। পল্লীর এই সরলা মেয়েটিকে শিশিরের খুব ভাল লাগল। শহরে মেয়েদের প্রতি তার বিতৃষ্ণা এই পল্লীবালাকে বাহুনে রেখে যেন বিগুণ বেড়ে গেল। যাবার বেলা মেয়েটি শিশিরকে প্রণাম জানিয়ে গেল তার মামারই ইসারায় নেহাৎ গাঁয়ের কায়দায়।

কিছুদিন পর শিশিরের এই ভাল লাগাটাই ঐ মেয়েটির সাথে এনে দিল তার আজীবনের বন্ধন—প্রেমের পুণ্য-তীর্থে হ'ল তাদের মহামিলন।

শহরের এক নিভৃত অঞ্চলে গিয়ে তারা বাসা বাধল। অর্থের অভাব নেই। দিনগুলা তাদের কেটে চলল বেশ—খাবো, গানে গল্পে!

খানিকক্ষণ পর হঠাৎ শিশির আবার শিউরে উঠল। নীনার সেই নিষ্ঠুর বিদায় দিনের ছবি! নীনা পলাতকা?

শিশির দেখতে পেল, সোফাটা যেমনি তাদেরই রয়েছে—ওরই হাতলের ওপর নীনার নীল চাইনিজ সিল্কের ব্লাউজটা অলস হ'য়ে পড়ে আছে সাপের দীড়া পোষাকের মতন। নীনার বালিশের ওপর তার একরাশ চুলের এলোমেলো ছাপ আর পরিচিত একটা সুগন্ধের রেশ। কিন্তু তাতে আজ আর কোন উন্মাদনা নেই, কোন উত্তেজনা নেই—শুধু কেবল বেদনার কিরে ভরা।

হঠাৎ শিশির কিসের একটা শব্দ শুনতে পেল। তার মনে হ'ল, পিয়ানোটার ওপর নীনার অঙ্গুলির মৃদু স্পর্শ লেগেছে, তাই!

নীনার চুড়ির টুং টাং শব্দ! খুট খুট করে সে আসছে আমার দিকে, ঐ যে নীনার পরণে আমারই দেওয়া বেগুনী রংয়ের জর্জেট শাড়ী—তার খানিকটা দেখা যাচ্ছে! আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে, কপালে উড়ে পড়া চুলগুলাকে নীনা সরিয়ে দিচ্ছে দু'দিকে।

শিশির আর দেখল, হাসির লহর তুলে নীনা এসে ভেঙে পড়ল তার বিছানার ওপর তার বুকে মাথা রেখে। তার কিছু বলবার অবসরও দিল না—তার কপোলে পরপর অনেকগুলা চুমুর রেখা এঁকে দিয়ে নীনাই বলল তাকে—"তুমি ভয় পেয়েছ? সত্যি, ভয় পেয়েছ? খুব কষ্ট হয়েছে তোমার, না? আমি শুই তারার দেশ থেকে কটা দিন একটু বেড়িয়ে এলাম। আমি আবার যাব। তুমি যাবে আমার সাথে? যাবে?"

শিশির ডাকল—নীনা!

সে উত্তর শুনল—বন্ধু! প্রিয়তম!

শিশির বলল—আমিও তোমার সাথে যাব তারার দেশ বেড়াতে।

নীনা ডাকল—চল!

শিশির তার দু'হাত বাড়িয়ে দিল নীনাকে জড়িয়ে ধরতে।

ঘর ভেঙে গেল।

তখন ফুটে এসেছে ঊষার আলোর মায়াজাল। প্রাঙ্গণের ঘাস-ফুলের আকাশে আর রোদ-স্নান উষার ছবি ভেসে এসেছে খোলা জানলার ভেতর দিয়ে। শিশির দারো ঘরটাকে আর একবার ভাল করে চোখে দেখে নিল।

মায়া-সঞ্চার

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

ছয়

সেইদিন অপরাহ্ণে সর্বেশ্বর রায়ের বাড়ীর ভেতরের ড্রয়িং-রুমের কোণে পিয়ানোর কাছে বসে মাধুরী গান গাইছিল। মাধুরীর গলাটী ভারি মিষ্টি, শুধু সে সুর মিষ্টি তা নয়, গান গাইতে হ'লে যে সাধনার প্রয়োজন হয়, তার সঙ্কেত মাধুরী অনেকখানি আয়ত্ত করেছিল।

পিয়ানোর কাছ থেকে একটু দূরে একখানা সোফায় ইলা বসে একখানা বিলাতী ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা উল্টে-উল্টে ছবি দেখছিল। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কি ক'রে মেক-আপ করে—রূপসজ্জা বিস্তার তারা মুখের ও চেহারার কত রকম বদল করতে পারে, কত ভাল চেহারাকে কুৎসিত করে, আর কুৎসিতকে সুন্দর করে। বইখানা এক পাশে রেখে মাধুরীর দিকে চেয়ে ইলা বললে: আচ্ছা রি, তুই এ সব গান কোথায় শিখলি, তুই ত আগে রবিঠাকুরের গান গাইতিস—আজকাল তোর মুখে আর সে-সব গান একটাও শুনতে পাওয়া যায় না।

মাধুরী একটু হেসে সুরটা বদলে বললে: ইলা, শোন্ একটা নতুন গান:

তোমায় আমায় গোপন ঘরে
কইব কথা কানে-কানে।
যে কথাটি বলব তোমায়,
আমি জানি আর মনই জানে।
বলবে যখন ভালবাসি
চুমু খাব মুচকে হাসি
ইসারায় জানিয়ে দেব
তার কি মানে···
মুখের কথা মুখেই রবে
বুঝে নেব প্রাণে-প্রাণে।

গানটা শুনে ইলা মুখ লাল ক'রে উঠল। কি যেন একটা গোপন ক্রোধ তার চোখে মুখে ফুটে উঠল। সে মাধুরীকে তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করলে: What do you mean? এর মানে কি রি? Don't tell me in this way, I tell you.

মাধুরী চমকে গেল। বললে: কেন লো, এ গানে আবার তোর কি হ'ল? আর তোকেই বা আমি ক্ষেপাতে যাব কেন?

ইলা অত্যন্ত অভিমানের সুরে বললে: কলেজের সেই ব্যাপারটা নিয়ে সব মেয়েরা—শীলা, রেবা, যূথী সবাই আমায় টিটকিরী দিচ্ছে, ঠাট্টা করছে।

কেন? সত্যি আমি কিছু জানি নি ভাই, আমি বরং জানি যে তারা তোমার দলে।

না তুমি জান না, তুমি নিশ্চয় জান!

সত্যি ইলা, আমি কিছু জানি নে।

সেদিন অমিয় প্রতিবাদ ক'রে ক্লাস থেকে চ'লে গেল না···তারা সব বলতে আরম্ভ করেছে যে, আমি তার কি অন্ সে···সেইজন্যে সে ওই শিভালরি দেখালে। মেয়েরা সব কত ঠাট্টা করেছে। আমি কলেজ ছেড়ে দিয়েছি। শুনলাম, অমিয়ও কলেজ ছেড়ে দিয়েছে।

ইলা কথাগুলো কান্নার সুরে অভিমান নিশিয়ে কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে বলতে লাগল, দেখ্ না ভাই, আমি কি করেছি···

মাধুরী হাসতে হাসতে বললে: তাই নাকি! Eventful day···I congratulate you, Senora Ila. বলে ফরাসী দেশের ভঙ্গীতে তাকে অভিবাদন করলে।

যাঃ, কি জ্বালাম করিস—বলে ইলা একটু মুখ টিপে হাসল।

মাধুরী আবার পিয়ানোর কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে গান ধরলে

দেখা হবে অশোকতলায়
বলে গেছে ইসারায়।

সেই বাগানে ঝোপের কোণে
বেঞ্চি পাতা নিরালায়।

ইলা লাফিয়ে উঠে হাতের রেশমী রুমালখানা ছুঁড়ে মাধুরীর গায়ে মারলে : দাঁড়া ত, I will pricle you red···

মাধুরী হাসতে হাসতে বললে, কেন ভাই, রাগ করছিস, মিষ্টি লাগছে না ?

ইলা ফের ঘুরে গিয়ে মাধুরীর কাছে বসল ; বললে, দেখ ভাই, সত্যি কথা বলি, I did never feel such things before. আগে আমি এটা একেবারে বুঝতে পারি নি যে, অমিয় সত্যি আমায় ভালবাসে—সেদিনের ওই ঘটনা···

হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে, তারপর···My dear lover, এখন কি বলছে সেও প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে ?

মাধুরী খুব গম্ভীর হয়ে বললে, তুই তাকে এই গানটা শুনিয়ে দিয়ে আয়। বলে আবার গান ধরলে :

ফুলের কলি বলে ভোমর
অমন ক'র না।
এ কি রীতি ওগো তোমার
বারণ মান না॥
কাগুন দিনে সখিন বায়
আগুন জেলে লাগবে গায়
আবেশ ভরে উঠবে দুলে
সকল কামনা।
সেই কালেতে এস ভোমর
বাধা দেব না॥
(এখন) অমন ক'র না
এ কি রীতি ওগো তোমার
বারণ মান না॥

ইলা হেসে বললে, After all, it is vulgar. তুই এসবও জানিস্।

জানতে হবে না, না জানলে ভেড়া বানাব কি করে ?

তার মানে ?

হয় ভেড়া বানাতে হবে, নয় ভেড়া হতে হবে। তা নইলেই চুঁ মারবে যে।

কেন ? তা হবে equal status, সমান অধিকার··· স্বামী স্ত্রীর সমান অধিকার···

স্বপ্ন রে ইলা, স্বপ্ন ; কোন দিনই হবে না ভাই, হয় পুরুষের মুখে লাগাম পরাতে হবে, নয় নিজের নাকে দড়ি পরতে হবে, either of the two, দু-এর একটা। হয় সে করবে না—না—না, তুই করবি মিয়ো—মিয়ো—মিয়ো—তা না হলেই পরমা গতি।

সে আবার কি ? পরমা গতিটা কি ?

সিনেমা আর্টিস্ট হওয়া।

তাতে সুবিধে কি ?

মেলাই ছোঁড়ার মুখে লাগাম পরান যায়—আর বেদুইনদের মত মরুভূমে ঘোড়া ছোটান যায়।

মরুভূমি কেন ?

ছায়াশীতল গ্রাম ত সেখানে পাবে না—জলের তৃষ্ণায় ছুটে বেড়াতেই হবে।

তবে কি তুই বলতে চাস্ যে, বিয়ে করাটা একটা দাসত্ব ?

সংসারে যদি কারুর কাছে কিছু চাও—তা হ'লেই—দাসত্ব করতে হবে তার। নিলেই ঋণ, ঋণ করলেই শোধ দিতে হবে।

এর আবার ঋণ কিসের ? বাপ-মা ভাই যে ছেলে-মেয়ে—বোনকে দেয়, তাতে কি তাদের ঋণ হয় নাকি ? তোর সবই কেমন উল্টো-উল্টো কথা—

শোন্, ছেলে-মেয়ে বাপ-মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে সে ঋণ শোধে, স্ত্রী স্বামীর কোলে ছেলে দিয়ে সে ঋণ শোধ করে, স্বামী সংসার প্রতিপালন ক'রে—সন্তান গড়ে তুলে স্ত্রীর ঋণ শোধ করে। ঋণ শোধ করতেই হবে।

যাক গে, ও—ফিলসফিতে আমার দরকার নেই শোনবার। কিন্তু শোন ভাই রি, এই কদিনে আমি কেমন যেন হয়ে গেছি, আমার পড়া-শোনা কিছু হচ্ছে না। এটা অবশ্য সত্যি যে, অমিয়ও আমার দিকে একরকম চাইত—আমিও তাকাতাম, কিন্তু তাতে বুঝতে পারি নি তখন—এখন···

বুঝে ফেলেছিস্ যে অমিয় তোকে ভালবাসে, কেমন ?

এই দেখ্ না তার চিঠি। ব'লে তার ব্লাউসের ভিতরে হাত দিয়ে বুকের কাছ থেকে একখানা চিঠি বার ক'রে দিলে।

মাধুরী আগ্রহভরে চিঠিখানা পড়তে লাগল, পড়ে

আর মুখ টিপে-টিপে হাসে; বলে: দেখ্ ভাই ইলা, পুরুষ মানুষগুলো এমন নির্লজ্জ—এ সব কি ক'রে লেখে—

ইলা জিজ্ঞাসা করলে, তুই এই রকম চিঠি আরও কারুর দেখেছিস্?

হুঁ! যখন লভ্ হয় তখন সবারই কোঁচার খুঁটে খুড়ি ঝুড়ি কাব্য—আর উঠতে বসতে 'প্রাণ যায়, মন যায়, বুক যায়'···কি যে তাদের হয় তা তারাই জানে। দিদির চিঠিতে অবশ্য এই রকম কত কথা—সে আবার কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে কথা···

যাক্ তোর কপাল ভাল—আমাদের কেউ ভাই এমন চিঠি যদি একখানা লিখত—সত্যি না হ'লেও মনটাকে প্রবোধ দিতাম যে—যাক্ সংসারে আমার দর বেড়ে গেল—একজনও তবু ভালবাসে—পোড়া অদৃষ্টে বোধ হয় নেই। যাক্ তোরই বরাৎ ভাল

কন্যাকর্ত্তা স্বয়ং কন্যা
বরকর্ত্তা বর।
মদন রাজার জয় হোক ভাই
(তোরা) ঘরকন্না কর॥

তুই কি বলিস্, রাজী হই?

মন্দ কি—তোর মন কি বলে? তবে একবার বাজিয়ে দেখে নিবি নি?

বাজিয়ে আবার কি ক'রে দেখব?

বলি, লোকে হাড়ী-কলসী কিনতে গেলেও টোকা মেরে ঠংঠং ক'রে বাজিয়ে দেখে, কাণ্টা ভাঙা, কি আস্ত,—সে ত দু-চার পয়সার ব্যাসাতি। এত বড় মূল্য, দেহ মন—সর্ব্বস্ব সমর্পণ, একবার বাজিয়ে দেখবি নি ভাই যে, কাণ্টা ভাঙা কি-না? মূলো কি বোঁচা, জগন্নাথের মত ঠুঁটো কি-না?

কি করে বাজিয়ে দেখব বল্?

আহা! আমার রসকে রে, ভালবাসা বুঝতে পারেন, এটা আর জানেন না···ঘর করবেন উনি, আর বাজিয়ে দেখব আমি!

আচ্ছা, তোকে যদি কেউ এই রকম চিঠি লিখত, তুই কি করতিস্?

বাড়ীতে ডেকে এনে বেশ ক'রে পেট ভরিয়ে রসগোল্লা খাইয়ে—তার পর এক হাতে কান ধরে তিন বার ওঠবোস্ করিয়ে বলতাম—ভ্যাড়ার ডাক ডাকতে পার কি-না?···

তুই অতি অসভ্য। তা আর করতে হয় না। তা কি আবার মানুষে পারে—না কি ছাই···

কেন আগে বিয়ের সময় ছাদনাতলায় নাপ্তিত দিয়ে যাচিয়ে নিত—তখন ভ্যা করত বাপু বলত, এখন আগেই না হয় ছাদনাতলাটা নিজেরা সেরে নিই। 'বর বড়, না কনে বড়' এই ত কথা, কখন বর বড়; না হয় কখন কনে বড়, এইটে বুঝে নিতে পারলেই হ'ল। যাক্, সে তুই আপনিই দু'দিন গেলেই পারবি এখন। কিন্তু একটা কথার সমাধান হয়ে গেল।

কিসের?

তোর কালেজ ছাড়া, আর প্রোফেসারের সঙ্গে ঝগড়ার কারণটা।

কি সমাধান পেলি?

পেলাম এই যে, আমাদের ওই অল্পবয়সী প্রোফেসরটীর অমিয়কে ভাল লাগে নি।

সত্যি কথা, নইলে তুই ছাড়া সব মেয়েই ত হাসি ঠাট্টা করে ক্লাসে—চোট্টা এল কেন আবার ওপর, সেই জন্যই সর্ত্তহীন ক্ষমাপ্রার্থনা—

তার জবাব ত তোরা দু'জনেই দিয়েছিস।

যাক্ গে ও কথা—এখন আমি কি করি?

অনুরাগের প্রথম লক্ষণ—ঠিক হয়েছে. সখি-সম্বাদ আমার কাছে হ'ল; কিন্তু এখন সুবল সখা কোথা পাই বল্ তা হ'লে না হয় পাঠাতাম দৌত্যে। আগের কালে শুনেছি কৃষ্ণে দূতীগিরি করত, আমার ত ভাই সে বয়েস হয় নি যে, দূতীগিরি করব। এখনকার দিনে দূতীকে পারাপ নাম দেয় জানিস্ ত।

না, তুই যা বলেছিস্, যাচাই ক'রে নিতে হবে। আমি দাদাকে বলেছি বি-এ আমি পাশ করবই, আগে পাশটা করি তারপর···

ততদিন ধৈর্য্য থাকবে ত!

নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু আজ তার সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে।

কোথায়?

এক জায়গায়।

এক জায়গায় না ত কি দু জায়গায়—তবু কোথায় শুনি?

বাগানে।

কোথাকার বাগানে, স্বর্গে—না মর্ত্তে? বাগানে? বাগানে মানে কি?

বাগানে মানে—বাগানে—স্বর্গে নয় এই মর্ত্তে। শোন্, আমাকে একটা বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারিস্?

আমার চেয়ে প্রেমশাস্ত্রে তুই অনেকখানি এগিয়ে গেছিস্—আমি তোকে বুদ্ধি দেব?

না শোন্, আমার কিন্তু একলা দেখা করতে ভয় হয়। কেউ যদি টের পায়—যদিও ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়—কণ্টকশূন্য না হতে পারলে প্রেম করা যায় না। তুই যাবি আমার সঙ্গে?

নাধুরী এতক্ষণ খেলছিল ইলার সঙ্গে—কথাটা শুনে শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটু হেসে বললে: আমারও ত প্রেমিক থাকতে পারে, সেও হয় ত এখনি আসতে পারে, আর আমি।

হাঁ, তোর আবার প্রেমিক কে

কেন সেখানে যত প্রেমিক আছে সবই ইলার একচেটে নাকি?

তুই কি, আমায় বুঝিয়ে গাল দিচ্ছিস!

রান কহো, পাগল হলি না কি, আমি যাব কোথা? তোর সঙ্গে? শোন্ ইলা, একটা কথা তোকে বলে রাখি—এ ভাবে মাকে না জানিয়ে, লুকিয়ে তার সঙ্গে বাড়ীতেই হোক্ আর বাগানেই হোক্—পথেই হোক্ আর ঘাটেই হোক্—এভাবে দেখা করা ভাল নয় ভাই! সে দেখা করতে বললেই দেখা করতে হবে—এরই বা মানে কি···যদি সত্যিই if his bent of love be honourable, his purpose marriage, তাহলে তার উচিত মানবের সঙ্গে দেখা করা—এ বিষয়ে সহজভাবে গ্রহণ করা—না ইলা, স্বর্গেই হোক, আর মর্ত্তেই হোক—দু'দিনের চোখ-চার—একদিনের চিঠি, তারপরই নিজেকে এমন ভাবে ধরা দিতে যাওয়া, একে আমি কিছুতেই সঙ্গত বলে মনে করিনে!—তুই যখন সহজভাবে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলি তখন আমার সহজ বুদ্ধিতে যা এল তাই তোকে বললাম।

তা আমি সে চিঠিতে তাকে বলেছি, যাব, দেখা করব। অমিয় আমার আসার আশায় সেখানে যে অপেক্ষা করবে!

বরং টেলিফোন ক'রে কিম্বা এমনি চিঠি দিয়ে কাউকে দিয়ে না হয় পাঠিয়ে দে যে, একলা সেখানে গিয়ে দেখা করতে পারব না—সে বরং তোদের বাড়ীতে এসে দেখা করুক না কেন! মনে ভাবাটাই সব নয়, যাচাই করার প্রয়োজন আছে।

কেন, কত মেয়ে ত তাদের কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যায়। তাতে কি ক্ষতি হয় বা অন্যায় হয়?

সত্যি যদি বন্ধু হয় তবে তার মর্য্যাদা সে হয়ত রাখবার চেষ্টা করে—স্বামী এখনও আমার হয় নি—সব কথা সে সম্বন্ধে আমার বলবার অধিকারও নেই—তবে এটা হয়ত বুঝতে পারি যে, স্বামীর বন্ধুত্বটা বন্ধুর বন্ধুত্ব অপেক্ষা দামী বলেই অনুমান করি। অনুমান করি, কেন না, সেইটেই সম্ভবত সত্য।

তোর দেখছি সব সেকেলে ধারণা। বিয়ে করাটা একটা প্রয়োজন বলেই লোকে বিয়ে করে—প্রেমটা ত পরের ব্যাপার—

বিয়ে করাটাই যদি প্রয়োজন হয়, তবে বিয়ে করে ফেল্। সমাজ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আগুনই হোক্ আর মানুষই হোক্, সাক্ষী রাখা ভাল।

প্রেম যদি হয় গৌণ, তবে ভালবাসার এত ভাবনা কেন লো?

সেটা হ'ল খুসী—আমার ওপর তার মন পড়েছে, তার ওপর আমারও মন পড়েছে—তাই কি যথেষ্ট নয়?

তাই যদি যথেষ্ট হয়, তবে আমার কাছে এ পরামর্শ চাস্ কেন? শোন্ ইলা, আমি দেখেছি, শুধু বইতে পড়েছি বলে বলছি তা নয়—আমি দেখেছি, ভালবাসা না হ'লেও বিয়ে হয়, আর ভালবাসা—যা তুই বলছিস সে রকম বিয়ে হয়েও শেষকালে হয় বিয়ে ভেঙে যায়—নয় বিয়ে না ভেঙেও দু'জনে লোকচক্ষে ঠিক থাকে, কিন্তু আসলে দু'জনের মাঝখানে পাঁচিল উঠে যায়। সেইজন্যেই বলছি, যাচাই ক'রে দেখা ভাল।

থাক গে, আমি আজ তাহলে দেখা করব না, চিঠি পাঠিয়ে দেবার কিন্তু সময় আর আজ নেই—আজ যাব না, সকালে সে চিঠি পাবে। সেই ভাল।

কিন্তু শোন্ ভাই ইলা, আমার বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে তোকে আমি চলতে বলতে পারিনে—তুই তোর মনকে বুঝে দেখ্—মন সত্যি কি চায়···this is an age of

liberty. স্বাধীনতার যুগ—রাস্তা-ঘাটে, পথে—ঘরে-বাইরে. দেশে-বিদেশে সব মানুষ এখন স্বাধীনতা চায়। ইতিহাস পড়লে এই দেখতে পাওয়া যায় যে, কোন সভ্যতা কোন দিন বিংশ-শতকের সভ্যতার ছাচে স্বাধীনতা চায় নি। প্রত্যেক মানুষটি তার জীবনের ধারার মধ্যে তার কাজ তার শিক্ষা, তার ধারা তার সঙ্গী, তার দিনের কাজ, রাতের কাজ, তার ধর্ম, তার নীতি, সব বিষয়ে স্বাধীনতা চাইছে। আগের দিনে মানুষের কাউকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে হ'ত না, আমি মাছ খাব কি মাংস খাব, বোষ্টম হব কি শাক্ত হব, সমাজতন্ত্রবাদী হব কি আত্মতন্ত্রবাদী—মাতাল হব, কি একেবারে ব্রহ্মচর্য্যব্রতগ্রস্ত হব, বিয়ে করব কি বিয়ে করব না—এর কোন কথা তাদের ভাবতে হ'ত না—সমাজ যে আইন আর তার কাছুন ঠিক ক'রে দিয়েছিল, পাঁজি পুঁথি সব বেঁধে দিয়েছিল—স্বামী-স্ত্রী আজ ঘরে এক সঙ্গে শোবে কি-না—সব নিয়ম বাঁধা ছিল—এখন সেটা একেবারে উল্টে গেছে। এ যুগে সে সব নেই, আসলে আমাদের দেশের কবিরা যত প্রেমের গানই বাঁধুক, যত মিলন-বিরহ-মাথুর বোষ্টমের চঙেই হোক, আর ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজী কবির নকল করুক—সে প্রেমের ভাব সত্যি আজকের মানুষের মেয়ে-পুরুষের ভাবের মধ্যে নেই—তা যদি থাকত তাহলে দেশের সাহিত্যে প্রেমের স্বরূপ ও রূপ এমন বদল হয়ে যেত না। সে নেই? আজ আমার দেশের সাহিত্য মেয়েদের সতীত্বকে প্রশ্ন করছে, সংশয় এনে দিয়েছে। শুধু, আমার দেশেই বা কেন বলি—পৃথিবীর সব জায়গায়ই প্রায় অল্পবিস্তর স্বাধীনতার ঢেউ চলেছে। আমার সঙ্গে আমাদের ভোলাদার একদিন তর্ক হচ্ছিল—ভোলাদা কিন্তু বলে, এটা হচ্ছে age of liberty নয়, age of libertine স্বাধীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা—দুটো শব্দের মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ আছে।

শব্দে তফাৎ থাকলেও মানে প্রায় একই।

মাধুরী হেসে বললে, তুই দর্শনের ছাত্রী—শব্দ সম্বন্ধে এটা বিচার করা তোর পক্ষে শক্ত নয়। নিজের অধীন হতে হলে অনেকখানি দায়িত্ব নিতে হয়। উচ্ছৃঙ্খলতায় কোন দায়িত্ব না থাকাই সূচনা করে।

তুই বলতে চাস্, এই রকম ভালবাসা হলেই তার মানে উচ্ছৃঙ্খলতা?

তা কেন বলতে যাব—আগে বুঝি, অনুভব করে ভাবনা করে দেখি যে তোর এটা ভালবাসা, তখন মেনে নেব।

আর তা না হলে—মানবে না?

কেন মানব—আমি তোমায় চাই বললেই ভালবাসা হয়ে গেল না কি? তাহলে পথে ঘাটে—কলেজের বাসে কি বাড়ীতে কি পাড়ীতে—অন্ধ পুরুষ বা ছেলেরা যে মেয়েদের দিকে হাঁ করে চায় তার মানেও তবে ভালবাসা!

বা রে! তা কেন হতে যাবে! তুই এত কড়া কথা বলিস্—আবার সঙ্গে সঙ্গে কেবল academic discussion করবি, তোর সঙ্গে আর পারা যায় না···

এটা অবশ্য একটা স্তরের প্রেমের লক্ষণ ত বটেই।

কোন্‌টা?

ওই 'পারা যায় না' বলাটা···আর সঙ্গে সঙ্গে সে আমায় ভালবাসে ওইটে মনে করাটা···যাক গে, শোন্—বলেই মাধুরী আবার তখনি গান ধরলে—

সে আমায় বুঝি ভালবাসে।
আঁখিতে আঁখিতে কথা,
সে ব্যথা তার চোখে ভাসে॥
কারণে কি অকারণে
পড়ে সদা তারে মনে···
স্বপনে জীবনে ধ্যানে
সে ধ্যানে জল চোখে আসে॥
সে আমায় কত ভালবাসে···

এমন সময় গানের শেষ কলি শেষ হবার পূর্ব্বেই পারদারের পর্দা সরিয়ে একজন বললে: May the intruder come in?

মাধুরী চমকে উঠল—তারপর সামনে গিয়ে গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে হেসে বললে: Who you please? O I see···

Yes! yes! the intruder may come in, if he likes···ও আপনি···কবে থেকে আপনি আবার এ বাড়ীতে intruder হলেন···ম্যাতারলিঙ্ক-এর 'ইনট্রুডার' নয় ত?

বলেই মাধুরী হেসে ফেললে, কিন্তু মনের ভিতর একটু ভীষণ নাড়া পেয়ে। তবুও হাসলে।

রি! তুমি কি আমায় সেই রকমের ইনট্রুডার বলেই মনে

কর নাকি ?···এ কি ইলা, তুই এখানে, এই যে মা বললে তোর কে কলেজের বন্ধু—তার সঙ্গে সিনেমায় যাবি !···

ইলা বললে : দাদাও মনে করেছিলাম, কিন্তু ওই ত আটকে রাখলে, যেতে দিলে না। দাদা, তুমি আমাদের নিয়ে চলনা···তুমি কিসে এলে ?

হেঁটে। আমার আজ অনেক কাজ আছে, আমি ঠিক খেয়ে উঠব বলে মনে হচ্ছে না, তবু একবার এদের সঙ্গে দেখাটা করে যাই বলে এলাম, অনেক দিন আসিনি। মাধুরী, তোমরা সবাই বেশ ভাল আছ ? মা ভাল আছেন ?

না, নাম সেই মাথার অসুখটা বেড়েছিল, বুকের ভেতরের সেই বন্ধণা···ডাক্তার অধিকারী দেখছেন—আজ কদিন একটু ভাল ছিলেন—আজ আবার তেমনই শুয়ে আছেন।

তোমাদের ওবাড়ীর খবর ভাল ?

কোন্ বাড়ীর ? কথাটা বলেই সে মানবের মুখের ওপর তাকালে—যেমন অন্ধকার ঘরে ডাক্তারেরা চোখ পরীক্ষা করার সময় দেখে, তেমনই করে চকিতের মধ্যে মানবের ভিতরটা বুঝে নেবার চেষ্টা করলে। মানবও যেন একটু ইতস্তত করে বললে : জয়ন্তদের বাড়ীর। ভাল আছে সব ?

ভালই আছে বোধ হয়। তা বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে···

মানব একটু দূরে টেবিলের কাছে বসল।

মাধুরী আবার একটু হেসে বললে : আপনি অমন আনকমফর্টেবল্ ফীল করছেন কেন, একটু সুস্থ হয়ে বসুন।

না—না—আনকমফর্টেবল্ বোধ করব কেন—আমি বেশ বসেছি।

দাদার আসা দেখে ইলাও অস্বস্তি বোধ করছিল। সে বললে : দাদা, তুমি তাহ'লে সিনেমায় যাবে না ?

না রে, বলছি—আমার কাজ আছে।

বি-ও যাবে না, তুমিও যাবে না, তবে আর আমার যাওয়া হয় না—আমি বাড়ী যাই। আমার একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিলাম, তাও হ'ল না। বি-র পাল্লায় পড়লে কার কিছু হয় না।

Then you ought to reject me···আমাকে বাদ দিলেই পার !

অমনই মেয়ের রাগ হয়ে গেল !

রাগের কথা আবার কি বললাম। দেখুন ত মানববাবু ! ও তোমাদের ঝগড়ার ভেতর আমি নেই।

দাদা, আমার মাস্টারের কি হ'ল ?

সব ঠিক করেছি, কাল আসবে তিনটের সময়, হুমিং নিয়ে আসবে।···

তাহ'লে দাদা, তোমরা যাবে না, দেখ, এখনও ছ'টা বাজে নি।

তাহ'লে আমি বাড়ী গিয়ে, তোমায় গাড়ীটা পাঠিয়ে দেব।

তাই দিস্।

বি, তোর কথাই রইল, আজ চললাম ভাই।

এমন সময় বয় চা নিয়ে এল। মাধুরী বললে : চা খেয়ে যা, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

চা খেতে খেতে আবার গল্প সুরু হ'ল। মানব বলতে লাগল : দিল্লী গিয়েছিলাম, ভাল লাগল না ; গেলাম কাশী···ভাল লাগল না···ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক-মাস ঘুরে-ঘুরে···

মাধুরী হাসতে হাসতে বললে : ভাল ত লাগতেই পারে না···

কেন ?

না ব'লে, কাকেও না জানিয়ে অমনি গেলেন বেড়াতে। সেখানে বুঝি সঙ্গী পান নি বকবার !

আমি বুঝি খুব বকি ?

ইলা বললে : মাগো, তোমার যখন গল্প-করা সুরু হয় তখন রাতই প্রায় কাবার···কেবল ডেমোক্রাসী আর সোশ্যালিজম্-এর তর্ক। বি ! আমার চা খাওয়া হয়েছে—আমি চলি।

মাধুরী অমনি গান ধরলে : গান গাইতে গাইতে ইলাকে এগিয়ে দিতে গেল :

চলি গো চলি, যাই গো চ'লে।
বুকের ব্যথা মনের কথা,
রইল সবি আঁখির কোলে।
রইল তা যা বলবার ছিল,
শুধু মুখ দেখে প্রাণ ভরিল···

মানবের অলক্ষে ইলা মাধুরীকে একটা কিল দেখিয়ে হাসতে হাসতে গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

মানব বললে : গানটা থামল কেন বি ?

আপনাকে শোনাবার জন্যে ত গান করি নি। অত্যন্ত গর্ব্ব ও অহং-ভাবে মাধুরী উত্তর দিলে : আপনাকে শোনাবার জন্যে ত' গান গাই নি।

না হয় শোনালে, তাতে কি এমন···

কিছু নয়···তারপর সকালে যখন ফোন করলাম, তখন ত বললেন আসতে পারবেন না—তবে যে বড় এলেন আবার !

একটা দরকারে এসেছি।

আমার কাছে ? কি দরকার ?

মাধুরী, তুমি অমন ক'রে কথা কইছ কেন ?

কি ক'রে ?

তুমি ত এভাবে কথা কখনও কও না—আজ যেন কি···

আপনাকে যখন ফোন করলাম, তখন ত এ দরকার আছে বলে জানতে পারি নি···

এখন তোমার দিদি ডেকে পাঠিয়েছে।

দিদি ! মাধুরী আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বললে : দিদি ! কখন পাঠিয়েছে ? সে ত এখানে।

তা আমি জানি, সেই জন্যেই এখানে এলাম।

দিদি ! আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে—অ···তাহ'লে দিদিকে খবর দিই।

না, একটু পরে—শোন মাধুরী···

মাধুরীর ভিতরটা আগুনের মত জ্বলছিল—সে তার রাগ প্রকাশ করতে পারছিল না। ভেতরে একটা ভীষণ গর্জ্জন উঠছে, সে সেটাকে দাবিয়ে রেখে সহজ সরলভাবে কথা কইতে চেষ্টা করলেও গলার স্বরে কেমন একটা তীব্র ঝাঁঝের মত প্রকাশ পাচ্ছে।

বলুন।

জয়ন্ত সম্বন্ধে কতকগুলো কথা আমি শুনলাম, সে সব কথা—

জয়ন্তর কথা দিদিই বলতে পারে, আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি। আপনি বসুন।

মাধুরী উঠে দাঁড়াল।

মানব অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললে : শোন মাধুরী, তুমি ত কখনও আমায় আপনি-আপনি সম্বোধন করতে না—বরাবর তুমি বলে এসেছ—আজ এ-ভাবে কথা বলছ কেন ?

ভেবে দেখলাম যে, তুমি শব্দটা বলা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় না।

এতদিন ত বলতে।

এতদিন একটা ভুল ক'রে এসেছি ব'লে আরও যে তার সংশোধন করব না এমন কি মানে আছে ?

ভুল করে এসেছ ?

হাঁ, ভুল হয়ে গেছে। মানুষেই ভুল করে, গাছ-পালা পাখী ভুল করে না—তারা শোধরায় না, শোধরাবার তাদের প্রয়োজন হয় না—মানুষের প্রয়োজন হয়, তাই মানুষ ভুলটাকে ছিঁড়ে নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে।

আর ভুল যদি আমি ক'রে থাকি ?

সে কথা আপনি জানেন—সে কথা জানবার আমার কি দরকার ?

কোন দরকারই তোমার নেই মাধুরী ?

মানুষ যে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, সে তার নিজের জন্যেই করে—অন্যের সুবিধে বা অসুবিধের কথা ভাববার তার অবসরও থাকে না। যাক্, আপনি বসুন, আমি দিদিকে ডেকে দিচ্ছি। দিদি ডেকেছে বলেই ত আপনি এসেছেন !

দেখ মাধুরী, মানুষ ভুল করে, ভুলের জন্য মানুষ তাকে ক্ষমাও করে—করে না কি ?

না, ক্ষমা করে না, ক্ষমা করা অন্যায় ; ভুল করা যেমন অন্যায়, তার জন্যে শাস্তি ভোগ না করাও তার চেয়ে বেশী অন্যায়। অন্যায়ের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়, ক্ষমা করলে মানুষের মনুষ্যত্বকে ছোট করা হয়। যদি আপনি অন্যায় করে থাকেন, তবে তার জন্যে ক্ষমা চাওয়া আপনার পক্ষে অন্যায় ও গর্হিত—অন্যের পক্ষে সে ভাল ক্ষমা করাও আপনাকে ছোট করা। থাক্, আমিই বা এ সব কথার আলোচনা আপনার সঙ্গে করি কেন···কোন প্রয়োজন ত নেই আমার।

কোন প্রয়োজন নেই তোমার ?

না—কোন প্রয়োজন নেই—আপনি আমার কে ?

মানব আর কিছু না বলে সিগারেট-কেশ বার করে একটা সিগারেট ধরালে, খুব জোরে টেনে ধোঁয়া বার ক'রে

বললে : ভাল, অন্যায়ের শাস্তি আমিই ভোগ করব। সেই ভাল।

মাধুরী তার আঁচলের কোণটা আঙুলে পাক দিয়ে দিয়ে ওড়াচ্ছিল, সে আর কোন কথা না ব'লে খট্-খট্ ক'রে পায়লার থেকে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে বললে : দেখুন, সব জিনিষ সকলকে সাজে না, মানায় না। পুরুষ মানুষের অনেক অ্যাড্‌ভান্‌টেজ—তাদের অনেক সুবিধা—তাদের মিথ্যাবাদী, শঠ প্রবঞ্চক হওয়া সহজ হয় এবং সাজেও—হয়ত তাদের সেভাবেচলে ; তবে আমরা মেয়েমানুষ, আমরা প্রবঞ্চনা শঠতা এ সবগুলো যে করতে পারি না তা নয়, করলে আমাদের সংসার করা চলে না—নিজেদের ছোট করলে আমাদের ক্ষতি হয়·· না হলে ইতিহাসের খাতা থেকে দেখে আসা যাচ্ছে যে, ইচ্ছা করলে ছলনার মায়ায় খেলায়—পুরুষের চেয়ে নারী ঢের বেশী অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে··· বুঝলেন···এবং তাতে সে কোন দিনই পিছপা নি···বুঝতে পারলেন ?

বুঝলাম। আরও বুঝলাম যে, শ্রীমতী মাধুরী দেবী আমার অন্যায়ের কথা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, তিনিও সকল রকমেই আমাকে ছলনা করছেন।

মাধুরী চলে গেল। মনে হল সে দাঁতে-দাঁত দিয়ে নিজের কথাকে অস্পষ্ট চিবিয়ে নিজেই গিলে ফেললে।

পাশের টেবিলের ওপর একখানা বই পড়েছিল। মানব বইখানা টেনে নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে লাগল। শুধু অন্য দিকে মনটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। এটা মানব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলে না যে মিলনী তাকে ডেকে পাঠালে কেন। মাধুরী যে আমার সে কথা জেনেছে এ ত তার হাব-ভাব কথাবার্ত্তায় স্পষ্টই বোঝা গেল। সে কাজটা সে আমার সহিত করেছে, একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু মিলনীর এ ব্যাপারটা আমার কাছে অন্য রকম বলে মনে হচ্ছে। সে এ ক্ষেত্রে আমাকে ডেকে পাঠালে কেন ?···আমার বইখানার পাতা ওল্টাতে লাগল···বইয়ের পাতা ওল্টানটা উপলক্ষ মাত্র, মানব নিজের মনের স্মৃতির কেতাবের পৃষ্ঠা উল্টে যেতে লাগল। সে খুঁজছিল সেই পৃষ্ঠা—সেই পুকুরঘাটের অসংযমের পৃষ্ঠা—সত্য বলতে গেলে সেটা সে খুঁজছিল না—সেই পৃষ্ঠা যদি আজ এমন সময় কৈফিয়ৎ চায়—সে অন্যায়ের বিচার যদি এখনই এখানে সুরু হয় তবে সে কি করবে।

ক্রমশঃ

অন্তর্দ্দহী

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

আমি যত কথা বলি
তুমি হও উদাসীন,
বৃথা আপনারে ছলি,
জানি তুমি শ্রুতিহীন।

আমি যে অন্ধ কত'
সে কথা ভুলিয়া যাই,
আঁখি তব আয়ত,
কিছু অগোচরে নাই।

আমার মুখের কথা
কত যে মিথ্যা নয়
—বোঝ, তাই নীরবতা
দিয়া তারে কর জয়।
যেটুকু সত্য আছে,
তোমারে তা বাঁধিয়াছে।

জন্ম—আশ্বিন ১২৭৭ রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মৃত্যু—[illegible]

রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস, এফ্-আর্-ই-এস্

(জীবনী)

কমলার বরপুত্র হইয়াও যাঁহারা অবিচলিত অধ্যবসায়, একাগ্র সাধনা ও গভীর নিষ্ঠার সহিত আজীবন সারদার সেবা করিয়া নিজ জীবন ধন্য করিয়াছেন এবং দেশকে ধন্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্থান অতি উচ্চে। ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে, সঙ্গীত বিদ্যার বিস্তারে এবং সঙ্গীত বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাদি প্রণয়নে তিনি যে ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে কেহ সেরূপ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অনন্যসাধারণ ছিল এবং পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গীতসমাজ তাঁহার সঙ্গীত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছিল। তিনি সঙ্গীত-বিদ্যার প্রচারের জন্য, সাহিত্যের উন্নতির জন্য এবং দেশের অন্যবিধ কল্যাণার্থে অকাতরে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা বাঙ্গালার এই বরেণ্য সন্তানের স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার (পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে) সৌরীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুপণ্ডিত হরকুমার ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র—জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহনের নাম বাঙ্গালার রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ।

নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি হিন্দু কলেজে বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন। নয় বৎসরকাল তথায় অধ্যয়ন করিবার পর তিনি শিরোরোগগ্রস্ত চিকিৎসকগণের পরামর্শে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার গ্রন্থকার হইবার বলবতী বাসনা ছিল এবং এই বাসনা উত্তরকালে তাঁহাকে অন্যূন পঞ্চাশখানি গ্রন্থ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি "ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত" নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। উহা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি ইহার পূর্ব্বেই বাটীতে পণ্ডিত তিলকচন্দ্র ন্যায়ভূষণের নিকট সংস্কৃত ও কলাপ ব্যাকরণ শিক্ষা করেন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'মুক্তাবলী নাটক' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। প্রাণীবৃত্তান্তেও তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল এবং নানাবিধ গৃহপালিত পশু পক্ষীর আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তিনি যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এই বিদ্যার গুণেই তিনি ভূমণ্ডল-ব্যাপী যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহাদের কাছারীর কোনও আমলার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে প্রসিদ্ধ বীণ্‌কর ওস্তাদ লছমীপ্রসাদ মিশ্র এবং বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট তিনি উচ্চতর সঙ্গীতজ্ঞান লাভ করেন। একজন জার্ম্মান-সঙ্গীতবিদের নিকট তিনি পিয়ানোতে প্রতীচ্য সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পরে প্রতীচ্য বহু কলাবিদের সংস্পর্শে আসিয়া প্রতীচ্য সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি বিজ্ঞানী সম্মত প্রণালীতে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যন্ত্র গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড, বারাণসী, কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি বহু স্থান হইতে তিনি প্রভূত ব্যয়ে এই সকল গ্রন্থ আনাইয়াছিলেন। ফাদার লাফোঁর নিকট তিনি সঙ্গীত বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব শিক্ষা করেন।

সৌরীন্দ্রমোহন ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি লিখনপ্রণালী প্রচলিত করেন। 'সঙ্গীত সার' গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীতবিদ্যার্থীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। তাঁহার 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা'র সেতারের অনেক গৎ লিপিবদ্ধ হয়। তিনি বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার প্রচারের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ইনি রাগ রাগিণীর শাস্ত্রোক্ত মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া উপযুক্ত চিত্রকর দ্বারা চিত্র অঙ্কন করিয়

প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রাগাদির এইরূপ অপূর্ব ভাবব্যঞ্জক চিত্র সন্দর্শন করিলে মনে হয় যেন তাহাদের কল্পনাকারীর মানস নয়নের সম্মুখে এই সকল রাগ রাগিণী সজীব মূর্তিমন্ত হইয়া বিরাজ করিত। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থও তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ে চিৎপুর রোডে বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। উহাতে নামমাত্র বেতনে ছাত্রগণকে উপযুক্ত সঙ্গীতাচার্য্যগণ কর্তৃক সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার পরবৎসর কলুটোলায় একটি শাখা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা সৌরীন্দ্রমোহন স্বয়ং পরিচালনা করিতেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যার প্রচারের জন্য সঙ্গীতাচার্য্য-গণকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন এবং সঙ্গীতবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাদির প্রচারে সাহায্য করিতেন। কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষকের বেতনাদি ও সঙ্গীত পুস্তকাদি তিনি বহু বৎসর স্বয়ং দিতেন। কনসার্ট বাজের অনেক গৎ সৌরীন্দ্রমোহনের রচিত।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রকাশিত বহু গ্রন্থাদিতে তাঁহার সঙ্গীত শাস্ত্রের জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে "ডক্টর অব মিউজিক" বা সঙ্গীতবিশারদ উপাধি প্রদান করেন। তদানীন্তন শিক্ষাধ্যক্ষ উড্রো সাহেবের অভিমত গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই উপাধি স্বীকার করিয়া লন। অতঃপর আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পোর্ত্তুগাল, স্পেন, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, বটাবী, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, বাভারী, স্যাক্সনি, প্রাশিয়া, বেলজিয়াম, হলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, রাশিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, ইজিপ্ট, আফ্রিকা, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, জাভা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি বহু দেশের শাসনকর্ত্তা বা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি অতি উচ্চ সম্মান-সূচক পদক, প্রশংসাপত্র বা উপাধি লাভ করেন। পারস্যের শাহ্ ইঁহাকে 'নবাব সাহেবজাদা' উপাধি দেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর অব মিউজিক' উপাধি লাভ করেন। এরূপ সম্মান সচরাচর প্রদত্ত হয় না। কবি হেমচন্দ্র "হতোম প্যাচার গানে" দেশের যে সকল কৃতবিদ্য সন্তানের যশোগান করিয়াছেন তন্মধ্যে সৌরীন্দ্র-মোহনের উদ্দেশে লিখিত পংক্তিগুলি এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য :—

এসো এসো দাদার গলায় পরে হার,
অধিতীয় ধরা মাঝে 'মিউজিক-ডাক্তার'।
'অর্ডার অফ সি আই ই, অ্যাণ্ড রাজা-কম';
'অর্ডার অফ লিওপোল্ড কিংডম বেলজিয়ম,'
'অর্ডার অফ ফ্রান্সে জোসেফে এম্পাইয়ার অষ্ট্রিয়া',
'অর্ডার অফ ডনার ব্রোগ' ডেনমার্ক নিয়া,
'অর্ডার অফ অ্যালবার্ট অ্যাণ্ড স্যাক্সনী',
'অর্ডার অফ মেলুসাইন মেরী মুসিগ্লানী',
'অর্ডার অফ মল্টা-রোড স্ ক্রাঙ্ক সিজেলার,'
'অর্ডার ডিউ টেম্পেল ডিউ সেণ্ট সেপলকার',
'ইম্পিরিয়েল অর্ডার অফ পাউসিং' চাইনার,
'সেকেন কেলাস ইম্পিরিয়েল লাইয়ন এণ্ড সন্,'
'সেকেন কেলাস ইম্পিরিয়েল মেজেডিজি সুলতান,'
'অর্ডার অফ গুর্খা-তারা' দিয়েছে নেপাল,
'শ্যামদেশের বসবামালা পারস্য সা-জাদা।
এর ওপরে আরো কত এটসেটেরার গাদা !!
সত্যই এ সকলগুলি রাজন্যের হার,
সাক্ষী রেখো সব কেতাবের ললাটে বিস্তার !!

সৌরীন্দ্রমোহন এত দেশ হইতে, এত বিজ্ঞসমাজ হইতে, এত সম্মানসূচক উপাধি পাইয়াছিলেন যে তাহার তালিকা প্রদান করাও অসম্ভব। কোনও সংবাদপত্র সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে এ বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রিন্স বিসমার্ককে তিনি আরও কতকগুলি পদক লাভ না করিলে পরাস্ত করিতে পারিবেন না, কারণ প্রিন্স বিসমার্কের ৬৮২টী পদক প্রভৃতি পরিতে হইলে তাঁহার বিশাল বক্ষ ২১ ফুট প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন।

সৌরীন্দ্রমোহন 'God save the 'Queen' শীর্ষক ইংলণ্ডের জাতীয় সঙ্গীতটির যথোচিত সুস্বরে রচিত একটি সুন্দর বঙ্গানুবাদ করুন। উহা লণ্ডনের জাতীয় সঙ্গীত-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং উক্ত সমিতির অনুরোধে তিনি নানা রকমের দেশীয় রাগিণীতে উহার স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া সমিতিকে চমৎকৃত করেন। তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন।

সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড যখন যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্‌রূপে এদেশে আসেন তখন সৌরীন্দ্রমোহন একটি

অভ্যর্থনা সঙ্গীত রচনা করিয়া তাহার সুর সংযোজনা করিয়া দেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে সৌরীন্দ্রমোহন সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন এবং পরবর্ত্তী মাসে রাজোপাধিতে ভূষিত হন। বাঙ্গালা প্রদেশের আটটি জিলায় বিস্তৃত তাঁহার বিস্তৃত জমিদারি (যাহার মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ প্রাঙ্গণও অবস্থিত) ছিল বলিয়াই তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হন নাই। বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এশলি ইডেনের একখানি পত্রে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও গবেষণা যাহা য়ুরোপে সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছে এবং দেশে তাঁহার নাম সুপরিচিত করিয়াছে—তাহাও এই উচ্চ উপাধিদানের অন্যতম কারণ।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সৌরীন্দ্রমোহন "বেঙ্গল একাডেমি অব মিউজিক" প্রতিষ্ঠিত করেন। উহা হইতে সঙ্গীতে পারদর্শিতার জন্য ডিপ্লোমা দেওয়া হইত।

সৌরীন্দ্রমোহন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ফেলো অব দি পীস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো প্রভৃতি সম্মানসূচক পদপ্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকারে দেশের কল্যাণসাধন করেন। তিনি নানা প্রতিষ্ঠানে বহু অর্থদান করিয়াছিলেন। লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব মিউজিক হইতে তিনি সুযোগ্য ছাত্র ছাত্রীকে সুবর্ণ পদক পুরস্কার দিবার জন্য ভারতসচিবের নিকট অর্থ প্রেরণ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পিতা হরকুমার ও শ্বশুরের পত্নী আনন্দময়ী দেবীর নামে বৃত্তি দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থদান করিয়াছেন। পিতার নামে গঙ্গাসাগর দ্বীপে একটি পুষ্করিণী খনন এবং বরাহনগরে ভাগীরথী তীরে একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বরিশাল বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ভূমিদান, কলিকাতা আলবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠাশ্রমে অর্থসাহায্য, বাকুড়া লেডী ডাফরিণ হাসপাতাল নির্ম্মাণের অর্থদান উল্লেখযোগ্য। ইনি বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, বিনয়ী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুন (২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সালে) তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থাবলীর পরিচয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নহে, আমরা কেবল প্রসিদ্ধতর গ্রন্থগুলির একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করিয়া আংশিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম।

বাঙ্গালা গ্রন্থ

ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত
মুক্তাবলী নাটিকা (মৌলিক নাটক)
মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক (অনুবাদ)
জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব
গীতসূত্রসার
গীতক্ষেত্র দীপিকা
মৃদঙ্গ মঞ্জরী
হার্মোনিয়ম সূত্র
যন্ত্রকোষ
ভিক্টোরিয়া গীতিমালা
ভারতীয় গীতিমালা
ভারতীয় নাট্য রহস্য

ইংরাজী

Hindu Music from various Authors (A collection)
Six Principal Ragas of the Hindus (with Lithographic Illustrations)
Eight Principal Ragas of the Hindus (with Lithographic Illustrations)
Ten Principal Avataras of the Hindus (with Lithographic Illustrations)
The Binding of the Braid: A translation of the Veni-samhara Nataka
Hindu Music
English verses set to Hindu Music
Short Notices of Hindu Musical Instruments
Fifty Tunes
Specimens of Indian songs.
Ekatana or the Indian concert
A few Lyrics of Owen Meredith set to Hindu Music
Eight Tunes.

সংস্কৃত

সঙ্গীত সার সংগ্রহ
মানস পূজনম্
কবিরহস্যম্
ভিক্টোরিয়া গীতিকা
প্রিন্স গুণাশংস
রোম কাব্য

হিন্দী

গীতাবলী

সংস্কৃত (হিন্দী, বাঙ্গলা ও ইংরাজী অনুবাদসহ)

মণিমালা

সমাজতত্ত্ব

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

প্রবন্ধ

সমাজ বলিতে কি বোঝায়

সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিতে হইলে, সমাজ কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা আবশ্যক। (পক্ষীদের ঝাঁক থাকে, গাভীর পাল থাকে, ছাগের দল থাকে, সেই রকম মানুষের জন্য সমাজ আছে)। বেকনের রচনায় মানুষ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, যে মানুষ সমাজের অন্তর্গত নহে, সে হয় ভগবান, না হয় বনের পশু। মানুষের স্বভাবগত চাওয়া হইল মানুষের সহবাস। এই স্বাভাবিক সংস্পর্শের চাওয়াই হইল সমাজগঠনের মূল কারণ। মানুষ চায় বিপদে বন্ধু, আদান-প্রদানের জন্য আত্মীয়, চিন্তাধারার লেওয়া-দেওয়ার জন্য স্বজন। যতই ব্যক্তিত্বের ঝোঁক না কেন তারই মনের কোণা থেকে জেগে ওঠে মিলনের ইচ্ছা, তাহাই আমাদের জ্ঞানের অগোচর। সঙ্ঘ, সমাজ বা অন্য যে-কোন অনুষ্ঠান হউক না কেন, তাহার মধ্যে পরস্পরের মিলনই হইল সৃষ্টির ভিত্তি। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বিভিন্ন সঙ্ঘের উৎপত্তি হইবার কারণ কি এবং কেনই বা নানা জাতি, বহুপ্রকারের সভ্যতা, রকম-বেরকমের জীবন-ধারার গতির সৃষ্টি হইল? তাহার উত্তর এই যে বিভিন্নতাই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। এই বিভিন্নতার মধ্যে একস্থানে একতটুকু লুকাইয়া আছে। মানুষের চাওয়া একপ্রকারের হইতে পারে না। সেই কারণে সদৃশ-চাওয়া যাহাদের তাহারা একটী দল বা শ্রেণী গড়িয়া তুলিয়াছে। এই জন্য নানা দল একই সঙ্গে একই দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সমষ্টিগত জীবনও আছে। প্রত্যেক মানুষের যেমন ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজগত জীবন দেখা যায়, সেইরূপ প্রত্যেক দল বা সঙ্ঘের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবন দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক রাজনৈতিক লেখক লাস্কির মতে জাতি অর্থে নানাদের সমষ্টি না ধরিয়া দল, অনুষ্ঠান বা সঙ্ঘের সমষ্টি ধরাই হইল বিজ্ঞানসম্মত। যেখানে যাহাই হউক না কেন, শেষ পরিণতিতে মানবই হইল একক বা ইউনিট এবং এই মানব ও মানবের আত্মীয়তাই হইল সঙ্ঘ গঠনের আকর্ষণ। এই সঙ্ঘগুলি আবার বাসনার রূপ অনুযায়ী স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাব ধারণ করে। সাধারণত সমাজকে আমরা দুইভাবে দেখিতে পাই—প্রথম রাষ্ট্রিক এবং দ্বিতীয় স্বাভাবিক। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা থাকায় নানা প্রকারের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। আহার বিহারাদি ব্যাপারে যে সকল অনুষ্ঠান তাহাকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিতে পারা যায়, কিন্তু সম্পত্তিরক্ষা, দেশের উন্নতিসাধন করার জন্য অথবা জ্ঞান বা রাজনৈতিক বিষয়ীভূত অনুষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রিক শ্রেণীর অন্তর্গত বলিতে পারা যায়। মোট কথা সমাজ বলিতে বোঝা যায়—কতগুলি ব্যক্তি সঙ্ঘবদ্ধভাবে মেলামেশা করিতেছে কিম্বা একপ্রকারের উদ্দেশ্য-সাধন করিবার জন্য একটা অনুষ্ঠান গঠিত করিয়াছে। উপরিউক্ত ভাবে যদি সমাজের সংজ্ঞা করা যায় তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানশুদ্ধ বলা চলিবে না। বিজ্ঞানশুদ্ধভাবে দেখিতে হইলে বলা উচিত সমাজ হইল কতগুলি সচেতন ব্যক্তির সমষ্টি যাহা পরস্পরের একাত্মানুভবের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিতেছে।

সমাজতত্ত্বের সামান্য ইতিহাস

সমাজতত্ত্বের ইতিহাসের আরম্ভ হইয়াছে কোথায় বলা বড় কঠিন ব্যাপার। মানব যখন হইতে ক্যান বা ট্রাইবে পরিণত হইয়াছে তখন হইতেই সমাজতত্ত্বের সুরু হইয়াছে বলা যাইতে পারে, আবার ইহাও বলা যায় যে, যখন মানব মিলিত চেষ্টার ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করিল তখনই ইহার প্রথম সৃষ্টি হইল। যাহাই হউক, পুঁথিগত সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া আমাদের দেশের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া মনু, শুক্র প্রভৃতি সকলকার নামই আমরা বলিতে পারি; পাশ্চাত্যে সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোচনার আরম্ভ হয় সর্বপ্রথম গ্রীসের যুগে। ইহা হইল সমাজশাস্ত্রী গিডিংসের মতে—কিন্তু বাঙ্গালী সমাজশাস্ত্রী

বিনয়কুমার সরকার মহাশয় বলেন যে, কোঁতের যুগের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা-সম্ভূত তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার দ্বারা আর পুরাতন সমাজ-তত্ত্বের অস্তিত্ব আছে কি-না সন্দেহ। কোঁত, হার্বার্ট স্পেন্সার এবং মাক্‌লে এই তিনজন সমাজশাস্ত্রীকে তিনি "ক্ল্যাসিক্যাল সোসিঅলজিস্ট" বলেন। যাহাই হউক সাধারণত দেখা যায় বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজতত্ত্বের চর্চ্চা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বহুকাল ধরিয়া ইহার গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। প্লেটোর "ল" এবং আরিষ্টটলের "পলিটিক্স" নামক গ্রন্থেও ইহার পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাকালে কেহই সঙ্ঘ এবং সামাজিক অনুষ্ঠানকে পূর্ণভাবে ধরিয়া বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করেন নাই।

সমাজতত্ত্ব বলিতে বোঝায় সমগ্র সমাজকে একত্রে গ্রহণ করিয়া তাহার নিয়মিত ব্যাখ্যা করা এবং বর্ণনা করা। অগষ্ট কোঁতের "কোর্স ডি ফিলসফিএ পজিটিভ্" নামক গ্রন্থে "সোসিঅলজি" বা সমাজতত্ত্ব শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছিল। তিনিই প্রথমে ধারণা করিয়াছিলেন যে, উক্ত বিষয়টি পৃথকভাবে বৈজ্ঞানিক মতে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। হব্‌স্, মন্‌তেস্কিয়ো প্রভৃতি মনীষী কেহই সমগ্র সমাজকে চিন্তার বিষয়ীভূত বলিয়া ধরেন নাই। কোঁত প্রথমে ধরেন যে, সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞানের মতে গবেষণা করিতে হইলে দেখিতে হইবে—সমাজের প্রকৃতি কিরূপ, তাহার পরিবর্ত্তনের কারণ কি, সমাজের প্রাকৃতিক বিধিসমূহ প্রভৃতি; অসাধারণ বা মনুষ্য বিচারের বহির্ভূত বিষয় হইতে সেগুলি বিভিন্নভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। হার্বার্ট স্পেনসার তাঁহার সমাজতত্ত্বের উপর লিখিত "সিন্থেটিক ফিলসফি" নামক গ্রন্থে বলেন যে, সমাজতত্ত্বের জন্ম হইল মনস্তত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব নামক বিজ্ঞান হইতে। তাঁহার মতে সমাজের গতি জৈব-ধর্ম্মের অনুযায়ী অথবা সমাজতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব উভয়ই সদৃশ। "দেহের যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক কার্য্য করিয়া থাকে, সমাজের বিভিন্ন অঙ্গেরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কল-কারখানার শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদ্বারা "সাস্‌টেনিং সিস্‌টেম" গঠিত হইয়াছে, বাণিজ্যিক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক "ডিস্‌ট্রিবিউটিং সিস্‌টেম্" হইয়াছে, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক "রেগুলেটিং সিস্‌টেম্" হইয়াছে। সাস্‌টেনিং সিস্‌টেম্ বা যাহার দ্বারা বাঁচিয়া থাকা যায়। ডিস্‌ট্রিবিউটিং সিস্‌টেম্ অথবা যাহার দ্বারা বাঁটোয়ারা হইয়া থাকে। রেগুলেটিং সিস্‌টেম্ বা যাহার দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। অনেক সুধী ব্যক্তি স্পেন্সারের এই মত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া সমালোচনা করেন। অনেক বিষয়ে দেহতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব সদৃশ হইতে পারে কিন্তু উভয়েই একই প্রণালীতে চালিত বলিলে ভুল হইবে। (১)

সমাজতত্ত্বের বিষয়

আধুনিক সমাজতত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে টোনিস্, তার্দ, দুর্খাইম এবং সিমেলের লেখা হইতে। মার্কিণ এবং ইংরেজ সমাজশাস্ত্রীর নামও এখানে উল্লেখযোগ্য যথা:—ফ্লন্, গিডিংস, ব্যস্, ওয়ালাস, ম্যাকডুগল, কুলী, এলউড্ প্রভৃতি। সমাজশাস্ত্রী ডুপ্লার্টের মত—যে সকল ঘটনাকে সামাজিক বলিয়া ধরা যায় এবং সমাজ সংক্রান্ত কোন ব্যাপার বলিয়া মনে হয় তাহাকেই সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত বিষয় বলিতে পারা যায়। ডক্টর সরকারের মতে প্রাচ্যধারায় সমাজতত্ত্বকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা প্রয়োজন :—

১। থিওরেটিক্যাল সোসিয়লজি (পুঁথিতে সমাজতত্ত্ব)
(ক) ইন্‌স্টিটিউসনাল সোসিঅলজি (গৃহ, সম্পদ, রাজত্ব, পুরাণ, বিজ্ঞান, ভাষা প্রভৃতি) (খ) সাইকলজিক্যাল সোসিঅলজি (ইহাই হইল আসল সমাজতত্ত্ব, অবশ্য সঙ্কীর্ণ ভাবে ধরিলে); ইহাতে সমাজের মনস্তত্ত্ব, সমাজের গতি, এবং তাহার রূপ প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

২। এপ্লায়েড্ সোসিঅলজি।

পাশ্চাত্য সমাজশাস্ত্রী গিডিংসের মতে সমাজতত্ত্বের মধ্যে বহুরকমের আলোচনা পড়িয়া যায়, সেইজন্য বাস্তবিক ইহার নিজস্ব আলোচ্য বিষয় কি তাহা নিরূপণ করিতে হইলে কয়েকটি বিশিষ্ট চিহ্নের প্রয়োজন। যাহা নিছক সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তু তাহাকে পৃথক্ করিতে হইলে সেই সেই চিহ্ন অনুসরণ করিলেই সহজসাধ্য হইবে। কোন কোন সমাজশাস্ত্রীর মতে অর্থনীতির সাহায্যে সমাজতত্ত্বের বিষয়ীভূত আলোচনার বস্তুকে বিভিন্ন করা যায়। অর্থনীতির উন্নতির সহিত শ্রমিক বিভাগও উন্নত হইতেছে এবং সেই কারণে পরস্পরের মধ্যে একতা,

(১) এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য—"দি সোসিঅলজি অফ পপুলেশন", পৃঃ ৪। অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত।

সহানুভূতি এবং অন্যান্য সদ্‌গুণেরও বিকাশ হইতেছে। এখন যদি ধরা যায় যে, "ডিভিসন্ অফ্ লেবর" বা "শ্রমের বিভাগ"ই কার্য্য-বিভিন্নতার মূল কারণ, অতএব সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয়েও তাহা কার্য্যকরী হইবে তাহা হইলে ভুল করা হইবে। কারণ কার্য্য-বিভিন্নতা জীবনের সঙ্গে অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত হইয়াছে বা হয়, কিন্তু তাহা সঠিক সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যায় না। দেহের মধ্যে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তো রহিয়াছে এবং তাহারা পরস্পরের সহানুভূতি না চলিলে সমস্ত দেহই বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িবে, ইহা সত্য; কিন্তু তথাপি দেহতত্ত্বকে সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া চালানো কঠিন। অষ্ট্রিয়ান সমাজশাস্ত্রী লুড্‌উইগ্ গুনপ্লোভিচ্ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রাথমিক বস্তুর যে সামাজিক ঘটনা-চিত্র, তাহাতে প্রকাশ পায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ, তাহার পর সংমিশ্রণ ও সমাজগঠন। বেলজিয়ান সমাজশাস্ত্রী গ্রীফ্ দেখাইয়াছেন যে, মানুষের জীবনে যে যে বস্তু ও ঘটনার মধ্যে "চুক্তির" প্রভাব দেখা যায় একমাত্র সেই সকল বস্তু ও ঘটনাই সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার মতে সমাজের উন্নতির মাপ করিতে হইলে দেখা চাই, কর্তৃপক্ষের বাধ্যতামূলক অনুজ্ঞা হইতে মানুষ যখন মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় চুক্তির পরবশ হয় এবং আপনাকে সেই চুক্তির কথা অনুযায়ী বাঁধা করে তখনই তাহার প্রকৃত উন্নতি।

ফরাসী অধ্যাপক দুর্খাইম্ এবং তার্দ উভয়ের মতবাদ একেবারে বিরুদ্ধবাদী। তার্দ বলেন যে, প্রাথমিক সমাজগত বিষয়ের লক্ষণ হইল "অনুকরণ"। এই অনুকরণ করার প্রবৃত্তিই পরস্পরকে সহানুভূতি করিতে দেওয়ায় শ্রমবিভাগ করার বাসনা উদ্দীপ্ত করে এবং চুক্তির সৃষ্টি করে। এমিল দুর্খাইম বলেন যে, মানব ভিন্ন অন্যান্য জীবের মধ্যেও অনুকরণ-প্রিয়তা খুবই প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। দুর্খাইম বলেন যে, সমাজের বিশিষ্ট চিহ্ন হইল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই একে অন্যের প্রতি প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাকে চালিত করে।

পুনরাবৃত্তির দ্বারা প্রত্যেক জিনিষের সৃষ্টি হয়। তার্দ বলেন এই পুনরাবৃত্তি হইল অনুকরণের ছাপা মাত্র। জড়-তত্ত্বে এবং জীবতত্ত্বে আমরা এই পুনরাবৃত্তিকেই পরিষ্কার দেখিতে পাই। জীবতত্ত্বে জন্ম—যেমন এক শ্রেণীর জীব বা একটি বংশে তাহার স্থিতি হয়—শিশু জনন দ্বারা পুত্র বা কন্যার মধ্যেই পিতা-মাতার নিজের বিকাশ অথবা সৃষ্টির ধারাবাহিক সূত্র স্থায়িত্বের একমাত্র উপায়। সমাজতত্ত্বের বিষয়েও ঠিক ঐ কথা প্রযোজ্য, কারণ "অনুকরণ" দ্বারাই আমরা ভাল-মন্দ কার্য্যের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া থাকি এবং তাহার দ্বারা নিজের ভাব, উচ্ছ্বাস, জ্ঞান সমস্তই প্রকাশ করি। দুর্খাইম্ কিন্তু দেখাইতে চাহেন যে, বহু-মনের যে কার্য্য-করণের ছাপ কোন এক বিশিষ্ট মনের উপর পড়া এবং তদনুযায়ী সেই ব্যক্তির কার্য্যধারার বৈচিত্র্য আনয়ন করাই হইল সমাজবিষয়ের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। সে যাহাই হউক, একটি মনের প্রভাব বহুমনের উপরেই বিস্তৃত হউক আর বহুমনের ছাপ একটা মনের উপরেই ছায়াপাত করুক, তাহার দ্বারা সঙ্ঘ বা সমষ্টির সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর কিনা? একটি সর্প কোন এক পক্ষীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে চমৎকৃত করিয়া ফেলে এবং পক্ষীর মনে পূর্ণ প্রভাবও বিস্তার করিয়া থাকে কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহাকে নিঃশেষ করিয়াও ফেলে। জুয়াচোরে পরচুলো পরে বা মুখোস ধারণ করে কিন্তু সে অনুকরণের মধ্যে সামাজিক বৃত্তির অভাব দেখা যায়। কাজেই এমন একটা গুণ বা চিহ্ন আবিষ্কার করা বাঞ্ছনীয়, যাহার মধ্যে সামাজিক অনুকরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। "সমভাবাপন্ন ব্যক্তির একত্রিত হইবার যে অনাবিল বাসনা" সেই বাসনা হইতেই সমষ্টির সৃষ্টি হওয়া এবং পরস্পরের সহানুভূতির জন্য একে অন্যের নিকটে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হয়। তাহাই হইল সমাজান্তর্গত বিষয়ের পৃথকীকরণের চিহ্ন।

সমাজতত্ত্বের প্রণালী

সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সমগ্র সমাজকে একত্র করিয়া তাহার বিশ্লেষণ করা এবং প্রত্যেক ঘটনা এবং সামাজিক ব্যাপারকে যথাযথ ব্যাখ্যা করা। ব্যাখ্যা করিবার সময় কার্য্য-কারণসম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত বিধি—ইংরেজীতে যাহাকে বলে "ল"—তাহার সন্ধান করা। ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইলে "সাবজেক্‌টিভ" বা মনোজগতের উদ্ভব হইতে "কন্‌সাসনেস্" বা চেতন, এবং "টেনডেন্সি" বা বৃত্তি এই দুইটির বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক। আবার বাস্তব জগতের দিক হইতে উহার ব্যাখ্যা

করিলে বাহ্যিক এবং দার্শনিক বস্তুসমূহের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, উভয় প্রকারের ব্যাখ্যাই এমনভাবে করিতে হইবে যে পরস্পরের মধ্যে যেন মিল থাকে এবং পরস্পরের নির্ভরতা প্রকাশ পায়। উভয় ব্যাখ্যার প্রণালী বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইবে না বরং তাহাদের মধ্যে যেন যোগাযোগ থাকে। এরিস্টটলের "পলিটিক্স" হইতে আরম্ভ করিয়া বোদাঁ, মঁতেস্কিয়ো এবং অন্যান্য ফিসিওক্রাত বা প্রকৃতিনিষ্ঠ দার্শনিকগণ একটা বস্তুনিষ্ঠ প্রণালীতে জাতি, জল, জলবায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে বিচার করিয়াছেন। আবার অন্যদিকে গ্রোসিয়াস্, হব্‌স্, লক্, হিউম্, বেন্‌থাম, বার্কলে, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি মনীষীরা মানব-প্রকৃতি, ব্যবহার, নৈতিক চরিত্র এবং আদর্শ সম্বন্ধীয় ব্যাপারসমূহকে মনোজগতের দিক হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত দুই প্রকারের ব্যাখ্যাকে একত্রিত করিয়া পরস্পরের মধ্যে মিলন করার সম্ভাবনা দেখা যায় না। বার্কের রাজনৈতিক বিষয়ে লিখিত পুস্তকাদির মধ্যে কিছু কিছু মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং বস্তুনিষ্ঠের ব্যাখ্যা উভয়ই একসঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। সত্যের অনুসন্ধানের জন্য সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান—এই উভয় প্রণালীর সংমিশ্রণে উৎপাদন হওয়াই আবশ্যক। এখানে মনস্তত্ত্বের দিক হইতে ব্যাখ্যার যতটা প্রয়োজন আছে, ঠিক ততদূরই বাস্তব জগতের দিক হইতেও ব্যাখ্যার আবশ্যক। উভয় দিক হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একটা দৃশ্যকে বিশ্লেষণ করিলে তবে তাহার ব্যাখ্যার সঠিক রূপ প্রকাশ পাইবে। বিশ্লেষণের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন কার্য্য-কারণতথ্যের ব্যাভিচার না ঘটে এবং পর পর নিয়মিত ভাবে সাজান হয়।

মনোজগতের দিক হইতে যখন ব্যাখ্যা করিতে হইবে তখন এমন একটা "ডেটা" বা ধর্ত্তা লইতে হইবে যাহা এখনও পর্য্যন্ত তথ্যে পরিণত হয় নাই। স্পেন্সারের একটা মত এখানে দেখা যাক। তিনি বলেন যে, চুক্তি বা কণ্ট্রাক্ট এবং বন্ধুত্ব বা "এলায়েন্স" এই দুটি দৃশ্য সঙ্ঘ, সমাজ, অনুকরণ বা অনুভূতি প্রভৃতির সমস্ত প্রকারের দৃশ্য হইতেও অধিক প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে; কাজেই আমাদের মনোজগতের দিক হইতে "উদ্দেশ্য, বৃত্তি, প্রগতি" প্রভৃতি বিষয় আলোচনা না করিয়া সমাজতত্ত্বের যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে পারি না। সমাজশাস্ত্রী গিডিংসও বলেন, মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে সমাজ-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাই চরম ও পরম।

সমাজ-বন্ধন

সমাজের বন্ধনপ্রকৃতি সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। সমাজের গোড়ার দিকে কেন্দ্রীকরণ আরম্ভ হয় বাহির হইতে। কারণ, মানুষে খাদ্যের জন্য, জলবায়ুর জন্য, পরস্পরের আত্মীয়তার জন্য কিম্বা দুই সঙ্ঘের বিরুদ্ধতার জন্য একত্রে মিলিত হইবার জন্য আসে। এক প্রকারের আচার-ব্যবহারসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা এক-আদর্শের লোকের মধ্যে ধীরে ধীরে এক একটি সঙ্ঘ গড়িয়া ওঠে এবং ভবিষ্যতে তাহাই এক বিরাট সমাজে পরিণত হয়। এই সকল সঙ্ঘ বা অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ-দুঃখের জন্য বহুভাবে দায়ী। সমষ্টির চেষ্টায় ব্যষ্টি উন্নতি করে, আবার ব্যষ্টির চেষ্টায় সমষ্টির উন্নতি হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কে আগে চেষ্টা করিবে বা কাহার উন্নত হওয়া প্রথম আবশ্যক এ আলোচনা অমূলক, কারণ তাহা হইলে নৈয়ায়িকের "তৈলাধারে পাত্র" না, "পাত্রাধারে তৈলের" মত তর্ক হইয়া যাইবে। উভয়েরই একসঙ্গে উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ একে অপরের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। ব্যক্তিগত চাওয়া না-চাওয়ার উপর সমাজের চাওয়া না-চাওয়ার কথাও সেই রকম সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এক সম্বন্ধ রাখা-না-রাখা অথবা যোগসূত্র উন্মোচন করার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, "শ্রেণীত্বের একতার চেতনা" হইল মূল। আর সমাজ-বন্ধন, গঠন এবং বিচ্ছিন্ন-করণের কারণ হইল এই চেতনা।

প্রজাপতি

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রবন্ধ

পতঙ্গশ্রেণীর জীবগণের মধ্যে প্রজাপতির বিচিত্র বর্ণচ্ছটা তাহাকে অপরূপ রূপসম্ভারে গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রজাপতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ঔৎসুক্য পাশ্চাত্য দেশবাসীর তুলনায় আমাদের কম থাকিলেও আমরা প্রজাপতিকে শ্রদ্ধা করি। কেন করি তাহার উত্তর নিষ্প্রয়োজন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি সংগ্রহের পিছনে যে সমস্ত দেশ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে তাহাদের

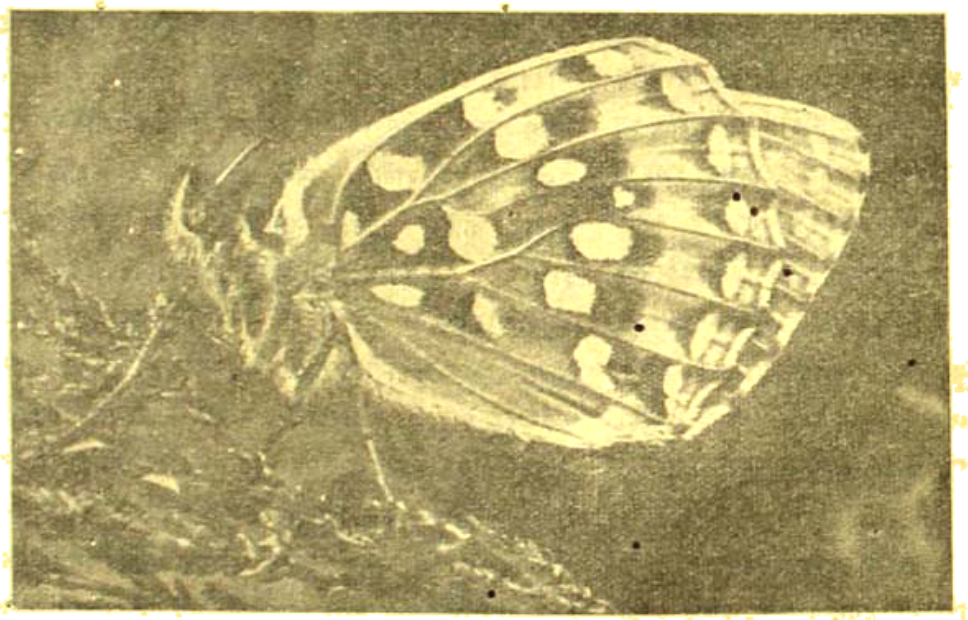

স্ত্রী-জাতীয় পার্থে প্রজাপতি

মধ্যে আমেরিকার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানকার প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ যেরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে প্রজাপতি সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এ প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে প্রকৃতির রহস্যজাল উদ্‌ঘাটন করিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন অধিকার বিস্তার করা।

বর্ণভেদ, দেহের কোন কোন অঙ্গের তারতম্য এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর বৈষম্য হেতু প্রজাপতিকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ছয় শ্রেণীর মধ্যে কয়েক শ্রেণীর প্রজাপতির মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে।

অন্যান্য পতঙ্গশ্রেণীর জীবগণের মতই প্রজাপতির দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর এই তিনভাগে বিভক্ত। ইহাদের বক্ষদেশ ও উদর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলয়-সংলগ্নে গঠিত। বক্ষের পার্শ্বে দুইটী দোলায়মান ডানা, মস্তকের উপর দুইটী শুণ্ড এবং পার্শ্বে দুইটী চক্ষু আছে। প্রত্যেক চক্ষু আবার কতক গুলি ছোট ছোট চক্ষুর সমষ্টি লইয়া গঠিত; চক্ষুপুঞ্জ নামে ইহারা পরিচিত। মুখের ভিতর হইতে মধু সংগ্রহের জন্য প্রজাপতির আর একটী লম্বা শুণ্ড আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় শুণ্ডটী স্প্রীংয়ের মত গুটান থাকে। উদরের দুই পার্শ্বে শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথ রহিয়াছে—এই সকল ছিদ্র-পথ দিয়া দেহে বাতাস প্রবেশ করে। প্রজাপতির ডানাগুলি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র শিরায় তৈয়ারী কাঠামোর উপর পুরাতন কাগজের মত একপ্রকার বস্তুর দ্বারা গঠিত। আমাদের অঙ্গুলি চাপে ইহারা নষ্ট হইয়া যায়। ডানাগুলি

মজবুত নয় বলিয়াই প্রজাপতিকে মধ্যে মধ্যে বেশ পরিবর্তন করিতে হয়। ডানার আকৃতিও বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ডানার উপরিভাগ সূক্ষ্ম আঁইস দ্বারা আবৃত। প্রজাপতির ডানা স্পর্শ করিলে ইহাদের নানা বর্ণের ছাপ আঙুলে দেখা যায়। আঁইসগুলি বিচিত্র বর্ণের এবং ডানার উপর ইহারা নানারূপে চিত্রিত বলিয়াই প্রজাপতির রূপসৌন্দর্য্য এতখানি।

কাশ্মীরী শালের বিচিত্র বর্ণের নক্সা নাকি এ দেশীয় প্রজাপতির ডানার চিত্রিত নক্সা অনুকরণে প্রস্তুত—দেশ-বিদেশে ইহার জন্যই তাহার খ্যাতি। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে আমরা প্রজাপতির ডানার উপর একশ্রেণীর আঁইস দেখিতে পাইব। শরীরের অন্যান্য আঁইস হইতে ইহারা পৃথক এবং সুবাসিত আঁইস নামে পরিচিত। ডানার উপরিভাগস্থ কয়েকটী অদ্ভুত গ্রন্থির উপর এই আঁইসগুলি গুচ্ছাকারে সজ্জিত। এই গ্রন্থির মধ্য দিয়া একপ্রকার উদ্বায়ী গন্ধ প্রবাহিত হয়। উহার উপরিভাগস্থ আঁইসগুলির সাহায্যেই সেই উদ্বায়ী গন্ধ বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। লেবুর গন্ধের ন্যায় ইহার গন্ধ। কোন কোন শ্রেণীর প্রজাপতির পশ্চাদ্দেশীয় ডানায় বিশেষ বিশেষ স্থানে এই সুবাসিত আঁইস দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া কয়েক শ্রেণীর প্রজাপতির ডানার উপর পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থিগুলি ঘনায়তনে বিস্তৃত এবং গ্রন্থিগুলি প্রধান শিরার সহিত সংযুক্ত। কোনরূপে উত্তেজিত না হইলে বিনা প্রয়োজনে এইরূপ গন্ধ প্রজাপতির গাত্র হইতে বাহির হয় না।

প্রজাপতির শত্রু অনেক। আত্মরক্ষার্থ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির বিচিত্র বর্ণ এবং এইরূপ উদ্বায়ী গন্ধের সৃজন করিয়াছেন। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—পক্ষী এবং কীট-পতঙ্গ ভক্ষণকারী প্রাণী প্রজাপতির এই বিচিত্র বর্ণ এবং গন্ধ মোটেই পছন্দ করে না। কারণ তাহারা কয়েকবার মাত্র পরীক্ষা করিবার পর প্রজাপতি ভক্ষণ হানিকর এবং অনুপাদেয় ইহা বুঝিতে পারে। ইহার পর তাহারা আর প্রজাপতি শিকারে উৎসাহিত হয় না।

আত্মরক্ষা ব্যতীত প্রজাপতির এই সুবাসিত গন্ধের অনেকখানি প্রয়োজন রহিয়াছে।

যৌনসঙ্গমের পূর্ব্বে পুং প্রজাপতি স্ত্রী প্রজাপতিকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত এই গন্ধ নির্গত করিয়া থাকে। এই গন্ধের মাদকতা এতই বেশী যে, কোন কোন স্থলে পুং প্রজাপতি স্ত্রী প্রজাপতির অবর্ত্তমানে এই গন্ধ নির্গত করিয়া উভয়ের মিলন ঘটাইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যেই এই গন্ধ নির্গত করিবার ক্ষমতা বিদ্যমান। তবে পুং প্রজাপতি কর্ত্তৃক নির্গত গন্ধ স্ত্রী প্রজাপতির গন্ধ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত উগ্র। পুং প্রজাপতির ডানার বিচিত্র বর্ণও স্ত্রী প্রজাপতি অপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

ডিম্ব, শূক, পুত্তলি এবং পতঙ্গ—এই চার অবস্থার মধ্য দিয়াই প্রজাপতির জন্ম।

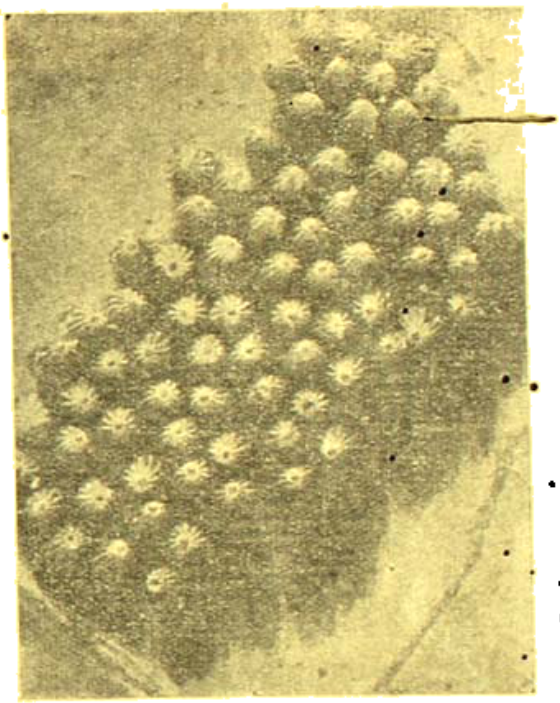

শ্বেত প্রজাপতির ডিম্ব

প্রজাপতির ডিম্বের আকার মোচাকৃতি, বর্ত্তুলাকার, এমন কি সমকোণী আকারেও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন শ্রেণীর প্রজাপতির ডিম্বের উপরিভাগ মসৃণ এবং গন্ধযুক্ত, আবার কোন কোন প্রজাপতির ডিম্বের উপরিভাগ শৈলমালার ন্যায়—ইহারা জালবৎ উন্নত ভূষণ দ্বারা ভূষিত; দেখিতে অতিশয় মনোরম।

গাছের পাতায় নিম্নভাগেই প্রজাপতি ডিম্ব প্রসব করে। প্রসবকালে ডিম্বের সহিত একপ্রকার আঠা নিসৃত হয়। ঐ আঠা ডিম্বকে পাতার সহিত এরূপ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রাখে যে, বৃষ্টির জলে বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় প্রজাপতির ডিম্ব

স্থানভ্রষ্ট হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাপতি নিজ নিজ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এক এক জাতীয় গাছের পাতার নিম্নেই কেবলমাত্র ডিম্ব প্রসব করে। আমাদের দেশে সজিনা, করবী ও কালকাসিন্দে গাছের পাতায় প্রজাপতির ডিম্ব প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত প্রজাপতির প্রচুর পরিমাণে ডিম্ব প্রসব করিবার ক্ষমতা আছে। আমেরিকার শ্বেতকায় প্রজাপতি দুই বা ততোধিক শৃঙ্খল রচনায় ডিম্ব প্রসব করে। প্রত্যেক শৃঙ্খল শ্রেণীতে পঞ্চাশের উর্দ্ধ সংখ্যক ডিম্ব থাকে।

প্রজাপতি একই স্থানে বহু সংখ্যক ডিম্ব প্রসব করে না, কারণ ডিম্ব হইতে বহির্গত শূক কীট যাহাতে খাদ্যাভাবে না পড়ে সেই জন্য তাহারা বিক্ষিপ্তভাবে ডিম্ব প্রসব করিয়া বংশ-বিস্তারে মন দেয়। ডিম্ব প্রসব করিয়া স্ত্রী প্রজাপতির মৃত্যু ঘটে।

প্রজাপতির আয়ু। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—বিভিন্ন শ্রেণী অনুযায়ী প্রজাপতি এক সপ্তাহ হইতে দুই কি তিন মাস পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। উত্তর আমেরিকার 'টরটরেল সেল' জাতীয় প্রজাপতি এক বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া দীর্ঘজীবী বলিয়া পরিচিত।

ডিম্ব হইতে বহির্গত শূককীটের দেহ কতকগুলি বলয় জুড়িয়া গঠিত। শূককীট অবস্থায় দেহে শ্বেত এবং পীতবর্ণের ছোরা থাকে। কয়েক জোড়া-পা এবং মস্তকের উপরিভাগে দুই জোড়া শুণ্ড দেখা যায়। শূককীটের জীবনের একমাত্র কর্ম্ম—প্রচুর খাদ্য ভক্ষণ করিয়া শরীর পুষ্ট করা। পূর্ণাঙ্গ শূককীট অবস্থার পূর্ব্বে ইহারা কয়েকবার দেহের চর্ম্মাবরণ পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। ফুলের কুঁড়ি, গাছের পাতা ইহাদের প্রধান খাদ্য। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ম্যাসাচুসেট্‌স এবং শ্যামদেশের কয়েক শ্রেণীর প্রজাপতির শূককীট পিপীলিকা অথবা ঐ জাতীয় কীট ভক্ষণে অভ্যস্ত। এই শ্রেণীর পিপীলিকাভোজী প্রজাপতির প্রায় সকল শূককীটদেরই পশ্চাদ্ভাগে মাংস গ্রন্থি আছে। ঐ মাংস গ্রন্থি হইতে নিসৃত একপ্রকার রস পিপীলিকার অতি প্রিয় খাদ্য। এই উপাদেয়

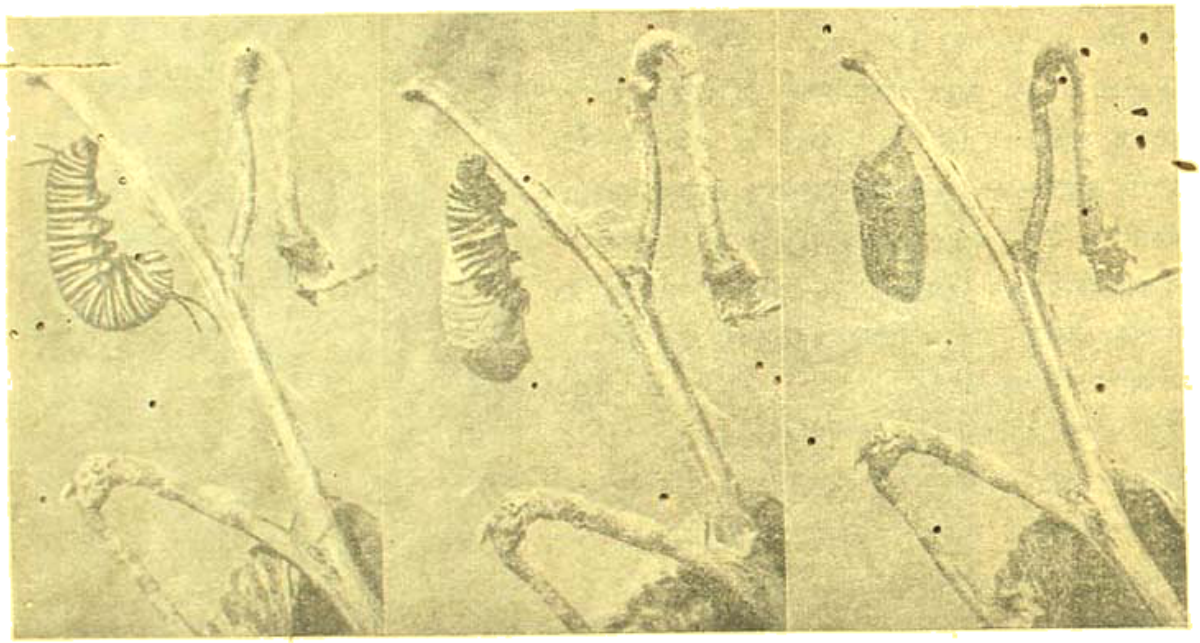

পূর্ণাঙ্গ অবস্থার শূককীট পুত্তলি অবস্থার ঠিক পূর্ব্বে দেহের চর্ম্মাবরণ পরিত্যাগরত শূককীট পুত্তলি অবস্থা

খাদ্যের পরিবর্ত্তে পিপীলিকা শূককীটকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। শূককীট বেশ পুষ্ট হইলে পিপীলিকার গর্ত্তে প্রবেশ করে এবং পিপীলিকার ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া শূককীট অবস্থার শেষ দিনটুকু তাহাদের বাসায় অতিবাহিত করে। আফ্রিকা দেশের এক শ্রেণীর প্রজাপতির শূককীট কেবলমাত্র পূর্ণবয়স্ক পিপীলিকা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। পিপীলিকা-ভোজী শূককীট শিকারে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি পরিণত অবস্থার ন্যায় শূককীট অবস্থাতেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে।

শূককীট অবস্থা হইতেই প্রজাপতির জননেন্দ্রিয় বিদ্যমান

থাকিলেও সেই সময়ে তাহারা কোনরূপ সন্তান উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

কয়েকবার দেহের চর্ম্মাবরণ পরিবর্ত্তনের পর পূর্ণ শূককীট অবস্থায় পরিণত হইলে শূককীট মুখ হইতে একপ্রকার রেশম প্রস্তুত করিয়া নির্ব্বাচিত স্থানে লাগাইয়া দেয় এবং পশ্চাতের পাগুলি তাহাতে লাগাইয়া নীচের দিকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাকাল স্থির ভাবে ঝুলিয়া থাকে। ইহাতে ক্রমশ দেহের শ্বেত এবং পীত বর্ণের ডোরাগুলি ঈষৎ সবুজ বর্ণে পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে হঠাৎ শূককীটের দেহের উপরিভাগস্থ চর্ম্মাবরণ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহার পর শূককীট দেহকে ছোট করিয়া দেহের উপরিভাগে স্বচ্ছ উজ্জ্বল বর্ণের আবরণে আবৃত রাখিয়া পুত্তলিকা অবস্থায় পরিণত হয়। প্রথম অবস্থায় পুত্তলি নরম থাকে এবং এই অবস্থায় তাহারা কোন খাদ্য গ্রহণ করে না।

প্রায় দশ দিন এই অবস্থায় থাকিবার পর পূর্ণাঙ্গ অবস্থা অর্থাৎ প্রজাপতি অবস্থায় আসিয়া পড়ে।

খোলস হইতে প্রথমে প্রজাপতির মস্তক ও সম্মুখের পা দুইটা বাহির হয় এবং পরে ডানা ও শরীরের বাকী অংশটুকু বাহির হইয়া পড়ে। খোলস হইতে বাহির হইবার দুই ঘণ্টা পর প্রজাপতি তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে সমর্থ হয়।

প্রজাপতি জন্মলাভের পর সে-স্থানে বেশী দিন থাকে না। একক কিংবা দলবদ্ধ অবস্থায় প্রজাপতি দেশদেশান্তরে অভিযান সুরু করে।

শূন্য-পথে এইভাবে সহস্র সহস্র বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতির দেশভ্রমণের অভিযান আমেরিকা অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দৃষ্ট হয়। আমেরিকার 'ননার্ক' প্রজাপতির বংশ দলবদ্ধ-ভাবে প্রতি বৎসর কানাডা হইতে ক্যালিফর্ণিয়া পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। আকারে ইহার দুই ডানা বিস্তারিত অবস্থায় পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ হইয়া থাকে।

পত্তন অবস্থায় গুটী হইতে প্রজাপতির বহির্গমনের দৃশ্য

উদ্ভেদবিহীন অবস্থায় পরিপ্রাপ্ত প্রজাপতি শিশু

জন্মাইবার পনের মিনিটকাল পরের প্রজাপতি—ডানাকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছে

নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াই প্রজাপতির যাত্রা সুরু হয়। দেখা গিয়াছে, সহস্র সহস্র প্রজাপতি দলবদ্ধভাবে রেলওয়ে সুড়ঙ্গ, এমনি কি বাড়ীর দরজা বা জানালা পথমধ্যে পড়িলেও তাহারা দিক পরিবর্ত্তন না করিয়াই তাহার মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করিয়া যায়। কয়েক শ্রেণীর প্রজাপতির এইরূপ অভিযান কোন কোন দেশের অনিষ্টকারক বলিয়া জানা গিয়াছে। আবার পশ্চিম আফ্রিকায় মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে একদল প্রজাপতি ভবনে বাহির হইলে সেখানকার লোক এই অভিযানকে কৃষি-কর্ম্মের পক্ষে শুভ

বলিয়া মনে করে। তাই সহস্র সহস্র প্রজাপতির দল যখন ইবাডান এবং দক্ষিণ নাইজেরিয়ার উপর দিয়া উত্তর-দক্ষিণ দিকে চলিয়া যায় তখন সেখানকার নিগ্রো কৃষকগণ নির্ভয়ে তাহাদের কৃষি-কার্য্য আরম্ভ করে।

কারণ ইহাদের এই অভিযানের কয়েক দিন পরেই বর্ষা আরম্ভ হয়। বর্ষার ঠিক শেষ দিকে সেই প্রজাপতির দল উত্তর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নিগ্রো কৃষকদল এই প্রজাপতির অভিযানে বিশেষ উপকৃত। বর্ত্তমানে এই প্রজাপতিদলের আর প্রত্যাবর্ত্তনের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। যে সকল শ্রেণীর প্রজাপতি পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প।

ডিম হইতে বর্হির্গমনের দুই দিন পর প্রজাপতি উড়িতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার জন্য ডানার শিরার কোন প্রয়োজন হয় না। তিনদিন পরে প্রজাপতি কূল হইতে মধু সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে

আমাদের ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে অক্টোবর মাসে পালনি পর্ব্বতে প্রায় আট হাজার ফিট উপরিভাগে বহু বৎসর ধরিয়া প্রজাপতির অভিযান দক্ষিণ দিকে চলিয়া আসিতেছে। সিংহল দেশীয় প্রজাপতির সংখ্যাও ইহাদের মধ্যে প্রচুর দৃষ্ট হয়।

ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাসের মধ্যে সেই দলের অল্প-সংখ্যক প্রজাপতি প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাদের মধ্যে কিন্তু সিংহলদেশীয় প্রজাপতি প্রত্যাবর্ত্তন করে না। আমেরিকার 'মনার্ক' শ্রেণীর প্রজাপতি ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয়।

উত্তর ভারতে বসন্তের প্রারম্ভে হিমালয়ের উপরিভাগস্থ সমতলভূমিতে প্রজাপতির অভিযানের ইতিহাস পাওয়া যায়। সিংহল দ্বীপে বৎসরে দুই বার এইরূপ প্রজাপতির অভিযান হইয়া থাকে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে উত্তর মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে ইহাদের প্রথম অভিযান আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় অভিযান সুরু হয় ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এপ্রিল মাসের মধ্যে, মৌসুমী বায়ু শেষ হইবার সময়।

এই অভিযানে ঘাট প্রকারের বিভিন্ন প্রজাপতি পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ ও মালয় দ্বীপেও প্রজাপতির অভিযানের খবর আমরা পাইয়া থাকি। একমাত্র চীন দেশ সম্বন্ধে আমরা এখনও কোন সংবাদ পাই না।

'পেচক' প্রজাপতির ডানার দৃশ্য

উত্তর আমেরিকার 'ডানায়াস প্রেক্সিপস্' শ্রেণীর প্রজাপতির অভিযান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর প্রজাপতি দলবদ্ধভাবে বহু দূর দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রাণীতত্ত্ববিদগণ বলেন, প্রায় এক হাজার প্রকারের প্রজাপতি দেশ ভ্রমণে অভ্যস্ত। প্রাণীতত্ত্ববিদগণের অভিমতে খাদ্যাভাব, আবহাওয়া এবং সংখ্যাধিক্য হওয়ার জন্যই প্রজাপতির এইরূপ অভিযান প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

আজ পর্য্যন্ত প্রজাপতি-বাহিনীর অভিযান সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে "মাউন্ট প্রজাপতি"-বাহিনীর বিস্তৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া প্রাণীতত্ত্ববিদগণের অভিমত। আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে এই জাতীয় প্রজাপতিকে প্রায়

দুইশত পঞ্চাশ নাইল স্থান ব্যাপিয়া টেকসাসের উপর দিয়া অভিযান করিতে দেখা গিয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, প্রতি মিনিটে প্রায় বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্রজাপতি ভুসার-মটিকার ন্যায় অবিশ্রান্তভাবে ধাবিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর প্রজাপতির জন্মস্থান কোথায় এবং কোন্ দেশেই বা এই অভিযানের পূর্ণচ্ছেদ ঘটে তাহা প্রাণীতত্ত্ববিদ্গণের নিকট এখনও অবিদিত।

কালিফর্ণিয়ায় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বিভিন্ন শ্রেণীর

আমেরিকার প্রসিদ্ধ 'মনার্ক' প্রজাপতি

বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি দৃষ্ট হয়। সেখানকার 'টয়টয়েজশেল' প্রজাপতি প্রায় আট হাজার দুই শত ফিট উপরিস্থিত স্থান-সমূহের উপর দিয়া যে অভিযান করিতে সক্ষম হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কালিফর্ণিয়ার প্রজাপতি-সংগ্রহকারীগণ বিদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাপতি রপ্তানি দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে।

লণ্ডন শহরেও প্রজাপতি বিক্রয়ের জন্য বহু ধনশালী ব্যবসায়ী আছে। আমাদের দেশে কাশ্মীরের ও দার্জিলিংয়ের পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগকে প্রজাপতি বিক্রয় করিতে দেখা যায়।

বর্ত্তমানে প্রজাপতি সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণা চলিতেছে। পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলী এ বিষয়ে বহু গ্রন্থে বহু শ্রেণীর প্রজাপতির জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আশার কথা, আমাদের দেশে ইদানীং প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে।

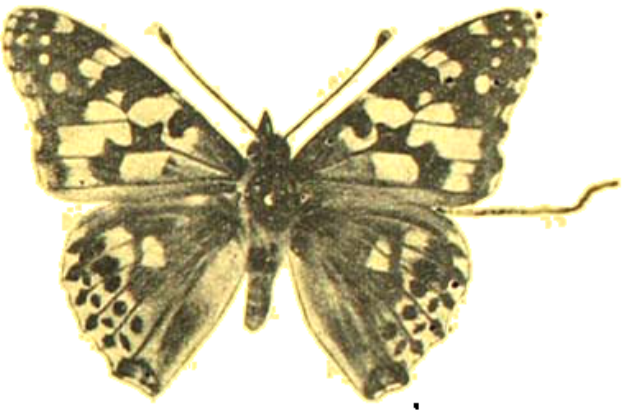

লণ্ডনের 'পেকেট রেড' প্রজাপতি

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদ্গণ প্রাণীজগত সম্বন্ধে গবেষণার জন্য আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে সাগরের অতলতলে দিনের পর দিন জীবনকে বিপন্ন করিয়া প্রকৃতির কত যে রহস্যময় ঘটনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিতেছেন তাহা ভাবিলে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় শির নত হইয়া আসে। আমাদের দেশেও এইরূপ অভিযানের প্রয়োজন আজ অনুভূত হইতেছে।

চেকোশ্লোভেকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ

শ্রীঅতুল দত্ত

(রাজনীতি)

বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ মাসে মধ্য ইউরোপের একটী প্রাচীন রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে একটী আর নূতন রাজ্যের অঙ্গচ্ছিন্ন হইয়া বস্তুত উহার অস্তিত্ব বিপন্ন হইল। প্রাচীন রাজ্যটীর সমস্ত দেহ এবং নূতন রাজ্যটীর বিচ্ছিন্ন অঙ্গের প্রায় সমুদয় অংশ জার্মানীরই উদরস্থ হইল। ঘটনা দুইটীর অভিনবত্ব এই যে, এইরূপ বিরাট রাষ্ট্রীয় বিপর্য্যয়ে একাধিক রক্তপাত হয় নাই, একখানি তরবারি কোষমুক্ত হয় নাই, সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সগর্ব্ব পদক্ষেপে ধরাবক্ষ তিলমাত্র বিকম্পিত হয় নাই। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের অবতারণা করিয়া যে নাৎসী-নীতি গত ছয় বৎসর কাল যাবৎ প্রত্যেক বিষয়ে সফলতা লাভ করিয়া আসিতেছে, উহা মধ্য-ইউরোপে আশাতীতভাবে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই —"দাবী পূরণ না হইলে যুদ্ধ করিব" এই ভীতি প্রদর্শনেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। ফলে এই ইঙ্গিতটীতে সন্ত্রস্ত হইয়া ইউরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের বীরপুঙ্গবগণ সন্ধি, প্রতিশ্রুতি, আশ্বাস প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়াছেন এবং নাৎসী নীতির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া 'বিরাট রক্তপাতের' সম্ভাবনা দূর হইল মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ বোধ করিতেছেন। ইউরোপের ত্রাণকর্ত্তা সাজিয়া তাঁহারা সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, সহস্র সহস্র মানব জীবন রক্ষার জন্য ইহা ব্যতীত অন্য কোন পন্থা আর ছিল না।

মধ্য-ইউরোপের নব-গঠিত চেকোশ্লোভেকিয়া রাজ্যে সুদেতেন্ জার্মান্ (নাৎসী) দলের আন্দোলন এবং এই সম্পর্কে জার্মানীর মনোভাব ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। গত আগষ্ট মাস হইতে সুদেতেন্ জার্মানীদের দাবী সম্বন্ধে তাহাদের প্রতিনিধিদিগের সহিত চেক্ গভর্ণমেণ্টের আলোচনা চলিতেছিল। এই আলোচনার গতি লক্ষ্য করিয়া ইহাই মনে হইয়াছিল যে, সুদেতেন্‌গণ "নানা ছলে" কালক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা আবদার করিয়াছিল যে, তাহাদের নেতা হের হেনলাইন্ গত মে মাসে কার্লস্‌বার্গে বক্তৃতাকালে যে সকল দফা দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা সমগ্রভাবে পূর্ণ না হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে না। পক্ষান্তরে চেক্ গভর্ণমেণ্ট সুদেতেন্ জার্মান্-দিগের প্রতি কতদূর উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা "ডেলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার একটী মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে। এই পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন—চেক্ গভর্ণমেণ্ট সুদেতেন্‌দিগকে যে সকল অধিকার প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, পৃথিবীর কোথাও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সেইরূপ অধিকার সম্ভোগ করে নাই।

এই সময় জার্মানীতে অকস্মাৎ সমরায়োজনের ধূম পড়িয়া যায়। পশ্চিম সীমান্তে ব্যূহ রচনার কার্য্য দ্রুত-গতিতে চলিতে থাকে, পশ্চিম সীমান্তও উপেক্ষিত হইল না। দেশের অভ্যন্তরেও নানাবিধ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। জার্মানীর এই সমরায়োজন দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, সত্বর সে কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহার এই উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া ফ্রান্স নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই। সেও রিজার্ভ সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া পূর্ব্ব সীমান্তের "মেগিনট লাইন" নামক রক্ষাব্যূহে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া সম্ভাবিত বিপদের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। এদিকে চেক্ গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনায় সুদেতেন্ প্রতিনিধিগণ নানা উপায়ে কালহরণ করেন; জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাইয়া অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টাও হয়। এই সময়ে নিউরেম্‌বার্গের বার্ষিক নাৎসী সম্মিলনীতে হের হিট্‌লার চেক্ গভর্ণমেণ্টের প্রতি তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করেন এবং সুদেতেন্-জার্মানদিগের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করেন। হের হিট্‌লারের এই বক্তৃতায় চেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে তাঁহার অভিসন্ধি ব্যক্ত না হইলেও ইহার পর সুদেতেন্ জার্মানগণ

অত্যন্ত সাহসী হইয়া ওঠে; তাহারা চারিদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ করে। এই সকল হাঙ্গামা যে আকস্মিক নহে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। হাঙ্গামা সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যে সকল লিপি আবিষ্কার হয় তাহাতে নেতৃবর্গ কর্তৃক অপ্রশমন্য উত্তেজনা সৃষ্টির আদেশ ছিল। দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইলে চেক গভর্ণমেণ্ট যখন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন, তখন হের হেন্‌লাইন প্রভৃতি সুদেতেন্ নেতৃবর্গ একটী সুদেতেন্ বাহিনী গঠন করেন। শুনা যায়, এই বাহিনী নাকি চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল। এই সময় সীমান্ত অঞ্চলে সমবেত জার্মান সৈন্য নাকি চেকোশ্লোভেকিয়ার প্রবেশে উদ্যত হয়।

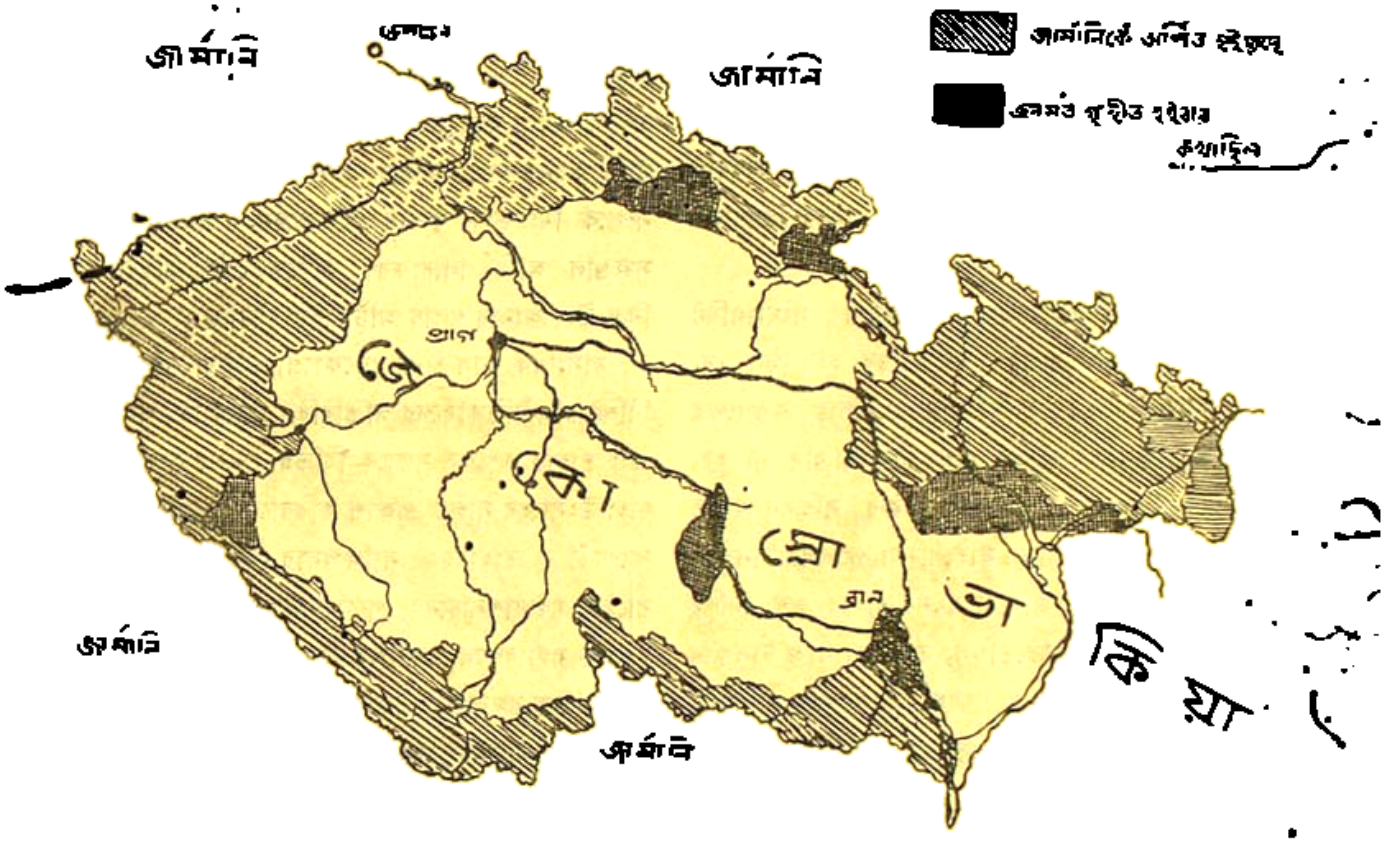

সেপ্‌টেম্বর মাসের মধ্যভাগে ইউরোপের রাজনীতিক অবস্থা যখন এইরূপ, তখন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন্ গডেন্‌বের্গে হের হিট্‌লারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী সিদ্ধান্তের কথা তাঁহাকে জানান। হের হিট্‌লার এই সিদ্ধান্তে তত সন্তোষ প্রকাশ করেন না; তাঁহার দাবীর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সম্পর্কে একখানি স্মারকলিপি তিনি মিঃ চেম্বারলেনকে প্রদান করেন। মিঃ চেম্বারলেন ক্ষুণ্ণচিত্তে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করিয়া সাক্ষাৎকারের ফলাফল তাঁহার সহকর্মিগণ ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর গোচর করেন। এই সময় প্রচারিত সংবাদ হইতে মনে হইয়াছিল, হয়ত চেকোশ্লোভেকিয়া সমস্যার আর শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হইবে না। ইহার পর গত ৩০এ সেপ্‌টেম্বর তারিখে হের হিট্‌লারের আমন্ত্রণ অনুসারে মিউনিকে মিঃ চেম্বারলেন্, মিঃ দালাদিয়ার, সীনর মুসোলিনি এবং হের হিট্‌লার চেকোশ্লোভেকিয়া সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

মিউনিক সম্মিলনীর আলোচনা সংক্ষেপ, কিন্তু সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনা অন্তে সর্বপ্রথম হের হিট্‌লার ও মিঃ চেম্বারলেন্ ফ্রুটেন্ এবং জার্মানীর অচ্ছেদ্য মিত্রতা জ্ঞাপন করিয়া এক ঘোষণা বাণী প্রকাশ করেন।

চেকোশ্লোভেকিয়া সমস্যা সম্পর্কে স্থির হয় যে, বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও সাইলেসিয়া প্রদেশের জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার (এক্ষণে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত) সীমান্তের নিকটবর্ত্তী চারিটী নির্দ্দিষ্ট জার্মানী-অধ্যুষিত অঞ্চল ১০ই অক্টোবরের মধ্যে জার্মানী অধিকার করিবে; ঐ সকল প্রদেশের অন্য কয়েকটী অঞ্চল জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের তত্ত্বাবধানে তথাকার জনমত গৃহীত হইবে; চেকোশ্লোভেকিয়ার সর্ব্বশেষ সীমান্ত নির্দ্ধারণকার্য্যও আন্তর্জ্জাতিক কমিশন কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে। মিউনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে জার্মানী চেকোশ্লোভেকিয়ার চারিটী নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল অধিকার করিয়াছে। যে সকল অঞ্চলে জনমত গৃহীত হইবার কথা ছিল, ঐ সকল অঞ্চল সম্পর্কে জার্মানী চেকোশ্লোভেকিয়া সরাসরিভাবে আলোচনা করিয়াই যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবে—জনমতগ্রহণের আর প্রয়োজন হইবে না।

মিউনিক চুক্তিতে চেকোশ্লোভেকিয়ার সংখ্যালঘিষ্ঠ হাঙ্গেরিয়ান্ ও পোলদিগের সম্পর্কে স্থির হইয়াছিল যে, চেক্ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত হাঙ্গেরিয়ান্ ও পোল্ কর্ত্তৃপক্ষের সরাসরি আলোচনার দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা যদি না হয়, তাহা হইলে তিন মাস পরে চতুঃশক্তির সম্মিলন আহূত হইবে। পোলাণ্ডের দাবী ছিল সাইলেসিয়া প্রদেশের টাস্কান নামক স্থানটীর উপর। জার্মানী যখন তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলগুলি অধিকার করিতেছিল, তখন পোলাণ্ড টাস্কান্ অধিকার করিয়া লইয়াছে। অবশ্য এই সম্পর্কে যথারীতি দাবী উত্থাপন, চরমপত্রপ্রদান প্রভৃতি রাজনীতিক অভিনয়ে পোলাণ্ডের কোন ত্রুটি হয় নাই। হাঙ্গেরীর দাবী রুমেনিয়ার উপর। এই সম্পর্কে হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভেকিয়া কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে প্রথমবারের আলোচনা নিষ্ফল হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয়বার আলোচনা চলিতেছে।

মধ্য ইউরোপের এই রাজনীতিক বিপর্য্যয়ের সময় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। চেকোশ্লোভেকিয়ার হোজা মন্ত্রি-সভা পদত্যাগ করিয়াছেন। জেনারেল সিরভি নামক জনৈক সামরিক নেতা কর্ত্তৃক নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়াছে। নূতন মন্ত্রি-সভায় কামিল্ ক্রোফতার পরিবর্ত্তে ষলকোভেস্কি পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। চেক্ প্রেসিডেন্ট ডক্টর বেনেস্ পদত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগকালে তিনি বলিয়াছেন, "চারিটী প্রধান শক্তি আমাদিগের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই আমাদিগের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আমি এই বিষয়ের কোনরূপ সমালোচনা করিব না। ইতিহাস ইহার বিচার করিবে।" বৃটিশমন্ত্রিমণ্ডলের নৌ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ ডাফ কুপার বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতির সহিত একমত হইতে না পারিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। মন্ত্রি-সভার অন্যান্য সদস্যদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া মিঃ চেম্বারলেন ইঙ্গ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষর করায় তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; মিঃ চেম্বারলেনের ন্যায় তিনি হিট্লারের প্রতি বিশ্বাসবান নহেন। মিঃ ডাফ কুপার এই এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের নীতি কখনও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। মিউনিক্ চুক্তি সম্পর্কে মিঃ ডাফ কুপার বলিতেছেন, "মিউনিক চুক্তির সর্ত্তগুলি আমি গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা আমার গলায় আট্‌কাইয়া গিয়াছে।"

মাসাধিক কাল ধরিয়া চেকোশ্লোভেকিয়া সমস্যা সম্পর্কে বিশিষ্ট রাজনীতিকদিগের গতিবিধি, গলাবাজি, শলাপরামর্শ এবং তাহার ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রগুলি যাহা উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিয়াছে, উল্লিখিত অনুচ্ছেদ কয়েকটী তাহারই সংক্ষিপ্তসার। চেকোশ্লোভেকিয়া রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশসাধনের পূর্ব্বে উদ্ভূত রাজনীতিক অবস্থা সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণই প্রকৃত বিবরণ কি-না, রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চের প্রকাশ্য অভিনয় অপেক্ষা যবনিকার অন্তরালের অভিনয়ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ কি-না, তাহা পরে আলোচনা করিব। অভিনয় যেরূপই হউক, চেকোশ্লোভেকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে ইহা সত্য এবং ইহার ফলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে চেকোশ্লোভেকিয়া ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে ইহাও সত্য। (অঙ্গচ্ছেদ হওয়ায় চেকোশ্লোভেকিয়ার সর্ব্বপ্রধান ক্ষতি এই যে, সে সুরক্ষিত সীমান্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে তাহার এই ক্ষতি অপূরণীয়। চেকোশ্লোভেকিয়ার সমগ্র পশ্চিম সীমান্ত এবং দক্ষিণ ও উত্তর সীমান্তের একটী বিরাট অংশ পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভেকিয়া তাহার সীমান্তকে দুর্ভেদ্য করিয়াছে। এই দুর্ভেদ্য সীমান্ত হস্তচ্যুত হওয়ায়

ভবিষ্যতে সর্ব্বদা তাহাকে জার্মানীর "চোখ-রাঙানী"র ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে। তাহার পর চেকোশ্লোভেকিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষতি; রাজ্যের কতকাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বোহেমিয়া, মোরাভিয়া এবং টাস্‌কানের শিল্পকেন্দ্র, কয়লা ও লৌহ হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে। এই ক্ষতি উপেক্ষণীয় নহে; কারণ চেকোশ্লোভেকিয়ার অধিকাংশ বিখ্যাত শিল্প-কেন্দ্র এই সকল অঞ্চলে অবস্থিত; তাহার প্রয়োজনীয় লৌহ ও কয়লা প্রধানতঃ এই সকল অঞ্চল হইতেই আসিত। জার্মান্ অধিকৃত অঞ্চলের আট লক্ষ চেক্ সম্পর্কে এখনও কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। ঐ অঞ্চলের ইহুদী ও সোশ্যাল্ ডিমোক্রাটগণ নাৎসীদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য পলায়ন করিতেছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সুদেতেন্ অঞ্চল জার্মানীর কুক্ষীগতস্থওয়ায় অন্তরায়টা কোথায়? চেকোশ্লোভেকিয়ার মুক্তির জন্য জার্মানী দায়ী নহে—সে তাহার স্বজাতিকে স্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে; চেক্-জার্মানগণও স্বেচ্ছায় এই পরিবর্ত্তন মানিয়া লইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, জাতিগত ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হয় না—রাষ্ট্র গঠিত হয় অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের ঐক্যকে (community of economic interst and political ideal) ভিত্তি করিয়া। মানুষ যদি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অনুসারে অথবা জাতি অনুসারে বিভিন্ন হইতে থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অতি সত্বর বিলুপ্ত হইবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কতকগুলি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় থাকে। যত দিন মানুষের জাতিগত অথবা ধর্ম্মগত সম্প্রদায়ের বোধ থাকিবে, তত দিন সংখ্যালঘিষ্ঠ-সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি স্বতন্ত্র দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে সে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের সহিত ঐ সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের ঐক্য আছে, সেই রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। চেক্ গভর্ণমেণ্ট সংখ্যালঘিষ্ঠ জার্মান্‌দিগের প্রতি কত দূর ন্যায় বিচার করিয়াছেন, তাহা গত ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষে 'চেকো-শ্লোভেকিয়ার সঙ্কট' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। নিউরেমবুর্গের বক্তৃতায় হের হিট্‌লার চেকগণ কর্ত্তৃক জার্মান-দিগের প্রতি অন্যায় আচরণের মিথ্যা অভিযোগ করিলে "টাইম্‌স" পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এইরূপ মিথ্যা উক্তি করিয়া হের হিট্‌লার তাঁহার একান্ত অনুগত শ্রোতৃ-বর্গকেও প্রতারিত করিতে পারেন নাই।" অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য চেকোশ্লোভেকিয়ার জার্মান্‌গণ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহিয়াছে এইরূপ কথা কখনও শুনি নাই, বরং ইহার বিপরীত কথাই শ্রবণ করিয়াছি। জার্মানী যখন সুদেতেন্ অঞ্চল অধিকার করিতেছিল, তখন "টাইম্‌স" পত্রিকার প্রাগ-স্থিত প্রতিনিধি ঐ অঞ্চলের বহু ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহারা সকলে জার্মানী কর্ত্তৃক ঐ অঞ্চল অধিকারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিয়া-ছিল, "আমরা ইহা কখনও আশা করি নাই। আমরা কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। প্রাগের সহিত আমাদের ব্যবসা-সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহার কি হইবে? আমরা কি জার্মানীর রুটি পাইব? আমরা স্বায়ত্তশাসনাধিকার চাহিয়াছিলাম, ইহা কখনও চাহি নাই।". রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে চেকোশ্লোভেকিয়ার সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা জার্মানীর ডিক্টেটরী শাসন ব্যবস্থাই যে প্রত্যেক চেক্-জার্মানের প্রিয়, তাহাও নহে। চেকোশ্লোভেকিয়ার প্রত্যেক জার্মান্ অধিবাসীই হের হেন্‌লাইনের নেতৃত্বাধীন নাৎসী দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত নহে। বস্তুতঃ তাহাদিগের এক-তৃতীয়াংশ হের হেন্‌লাইনের ঘোরতর বিরোধী ছিল। চেক্-জার্মান্‌দিগের মধ্যে সোশ্যাল্ ডিমোক্রাট দলও আছে। ইহারা নাৎসী মতবাদের কতদূর বিরোধী, তাহা এই দলের নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে। ক্যাথলিকদিগের পক্ষেও নাৎসী দল ত্রাসের বস্তু। তাহাদিগের সম্পর্কে হের হিট্‌লার ও তাঁহার নাৎসী দলের মনোভাব সংবাদপত্রের পাঠকগণের অবিদিত নাই। সম্প্রতি ভিয়েনার কার্ডিন্যাল্ ইনিজারের প্রতি নাৎসীদিগের ব্যবহার সমগ্র সভ্য জগৎকে বিমুগ্ধ করি-য়াছে। যাহা হউক, এইরূপ অবস্থায় একমাত্র সুদেতেন-জার্মান্ (নাৎসী) দলের আন্দোলন ও চক্রান্তে সুদেতেন্ অঞ্চল জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত কি-না, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমরা এক্ষণে চেকোশ্লোভেকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ এবং তৎ-সংক্রান্ত ঘটনাবলীকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করিব। ঘটনাগুলি সংক্ষেপে এইরূপ—সুদেতেন জার্মান্ দল চেকোশ্লোভেকিয়ার দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ করিল; হের

হিট্‌লার বলিলেন, চেক্-জার্মানদিগের প্রতি অত্যাচার হইতেছে, সুতরাং তাহাদিগকে জার্মান্ রাইকের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তিনি যুদ্ধ করিবেন; মিঃ চেম্বারলেন ও মঃ দালাদিয়ার রক্তপাত নিবারণের উদ্দেশ্যে সুদেতেন্ অঞ্চল জার্মানীকে অর্পণ করিতে চেক্ গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিলেন। সুদেতেন্ জার্মান্ দল বিশেষ অভিসন্ধি লইয়া ইচ্ছা করিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়াছিল এবং হের হিট্‌লার বিশেষ উদ্দেশ্যে চেক্ জার্মানদিগের প্রতি অত্যাচারের মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহা ঘটনাস্রোত হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। এক্ষণে কথা হইতেছে, হের হিট্‌লার তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সত্যই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন কি-না। ইহার উত্তরে দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে, হিট্‌লার যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিতেছিলেন মাত্র—যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার মত শক্তি তাঁহার ছিল না। হিট্‌লার জানিতেন, মধ্য ইউরোপে যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে উহা কখনও সীমাবদ্ধ থাকিবে না। মিঃ এণ্টনি ইডেনের ভাষায় মধ্য-ইউরোপের সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ রাখিবার কল্পনা অলীক স্বপ্নবিলাস। হিট্‌লার এইরূপ অলীক স্বপ্ন দেখিবার লোক নহেন। হিট্‌লার যদি সত্যই চেকোশ্লোভেকিয়াকে সশস্ত্র আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে ফ্রান্স চেকোশ্লোভেকিয়ার সহিত সামরিক চুক্তি অনুসারে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইত। সোভিয়েট রুশিয়া কেবল প্রস্তুত ছিল না—ফ্রান্সের মৌখিলো সে পুনঃ পুনঃ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং মধ্য-ইউরোপে যুদ্ধ বাধিলে সে যুদ্ধ যে ব্যাপক আকারেই হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্যাপক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার মত অর্থনৈতিক সামর্থ্য জার্মানীর নাই। এই সম্পর্কে অধিক কথা না বলিয়া গার্হনানা সাংবাদিক ভারনন্ বার্টলেটের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ভারনন্ বার্টলেট তাঁহার সম্পাদিত "ওয়ার্ল্ড রিভিউ" পত্রিকার গত জুলাই সংখ্যায় "কেন যুদ্ধ হইবে না" শীর্ষক প্রবন্ধে জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "জার্মান্ সৈন্য যখন ভিয়েনা অধিকার করে, তখন মিউনিকে এবং অন্যান্য শহরে পেট্রোলের এত টান পড়িয়াছিল যে, 'প্রাইভেট' গাড়ীগুলি পেট্রোল পায় নাই। জার্মানীর সংবাদপত্রগুলি তামা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবের জন্য সর্ব্বদা দুঃখ করে। একজন প্রসিদ্ধ জার্মান্ সেনাপতি কিছুদিন পূর্ব্বে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, তোজন-পাত্র (food-cards) হাতে লইয়া যুদ্ধ বন্ধ করা যায়, আরম্ভ করা যায় না।" ভারনন্ বার্টলেটের এই উক্তির পর অন্য কোনরূপ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন; কারণ দুই মাসের মধ্যে জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থার কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন হয় নাই।

তাহার পর জার্মানীর মিত্র-শক্তি। জার্মানীর কমিণ্টার্ণ-বিরোধী বন্ধু জাপান সুদূর-প্রাচীর যুদ্ধে শুধু বাঁপৃষ্ঠ নহে—বিপন্ন। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কমিণ্টার্ণ-বিরোধী ইটালীর রাষ্ট্রপতি মুসোলিনি 'ভাঙেন তবু মচ্‌কান্ না।' যে আবিসিনিয়া সাম্রাজ্য লইয়া তিনি 'তাল ঠোকেন,' উহা এক্ষণে ইটালীর ভারস্বরূপ হইয়াছে। এখনও আবিসিনিয়ায় ঔপনিবেশিক যুদ্ধ (colonial war) চলিতেছে। এই যুদ্ধে আহত ইটালীর সৈন্য পূর্ব্বে নেপল্‌সে অবতরণ করিত। এই করুণ দৃশ্য যাহাতে দেশবাসীকে বিক্ষুব্ধ না করে, তদুদ্দেশ্যে এক্ষণে আহতদিগকে গোপনে হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। স্পেনের যুদ্ধ মুসোলিনির 'ছুঁচো গেলা' হইয়াছে; ইহা কবে শেষ হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। সম্প্রতি ইটালীতে মুসোলিনির জনপ্রিয়তা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জার্মান্ গুপ্তচরবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হের হিম্‌লীর গুপ্তচরের সাহায্যে ইটালীর অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ লইয়া হের হিট্‌লারের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই স্মারকলিপিতে তিনি জানাইয়াছিলেন, "রোম-বার্লিন্ মেরুদণ্ড কেহই আর পছন্দ করিতেছে না; যুদ্ধ বাধিলে ডিক্টেটরী প্রথা আরও দৃঢ় হইবে এই ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত; মুসোলিনির ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে; জার্মানীর সহিত সামরিক চুক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে সকল ইটালীয় সেনাপতির মত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি দশ জনের মধ্যে নয়জন উহার বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছে; বিশিষ্ট কর্ম্মচারী, অভিজাত সম্প্রদায়, এমন কি রাজবংশের ব্যক্তিদিগের মধ্যেও ফ্যাসিজমের বর্ত্তমান গতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা আরম্ভ হইয়াছে; অর্থনৈতিক অবস্থা এক্ষণে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।"

জার্মানী এবং তাহার মিত্র-শক্তির অবস্থা যখন এইরূপ, তখন হের হিট্‌লারের যুদ্ধের ভীতি-প্রদর্শন যে "শ্রীপদের

আঘাতের" ভয় ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

এক্ষণে কথা হইতেছে, জার্মানীর যদি ব্যাপক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন এইরূপ দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন করিলেন কেন? গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষ-এ" 'জার্মানীর অষ্ট্রীয়া গ্রাস' শীর্ষক প্রবন্ধে এবং গত কার্ত্তিক মাসের 'প্রাচী ও প্রতীচী' শীর্ষক প্রবন্ধে চেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে বৃটেনের মনোভাবের যে আলোচনা করিয়াছি, উহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, মিঃ চেম্বারলেনের এই দৌর্ব্বল্য আকস্মিক নহে—পূর্ব্ব হইতেই তিনি জার্মানীকে মধ্য-ইউরোপে যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বনের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। গত বৎসর লর্ড হ্যালিফক্স হিট্‌লারকে মধ্য ইউরোপে যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বনের উৎকোচ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সাময়িকভাবে উপনিবেশের দাবী উত্থাপন বিরত হইতে সম্মত করাইয়াছিলেন। আমরা জানি, তদবধি হের হিট্‌লার উপনিবেশের দাবী তত উচ্চ-কণ্ঠে জ্ঞাপন করেন নাই—তাঁহার মনোযোগ মধ্য ইউরোপের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়াছে। মধ্য ইউরোপে জার্মানীর আয়তন বৃদ্ধিতে বৃটেন্ যাহাতে নিরপেক্ষ থাকে, তদুদ্দেশ্যে উপনিবেশের জন্য অধৈর্য্য হইয়া হের হিট্‌লার তাহাকে চাপ দিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করাও অযৌক্তিক নহে; কারণ হিট্‌লার তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন, "অধুনা রাজ্য বিস্তৃতির নীতি সফল করিতে হইলে তাহা ইউরোপেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে—ক্যামারুণ (জার্মানীর হৃত উপনিবেশ) পর্য্যন্ত ঐ নীতি বিস্তার করিলে চলিবে না।" সে যাহা হউক, চেকোশ্লো-ভেকিয়া রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বিপন্ন হইলে বৃটেন্ যে উদাসীন থাকিবে, তাহা মিঃ চেম্বারলেনের গত ২৪শে মার্চ তারিখের বক্তৃতাতেই বুঝা গিয়াছিল। গত সেপ্‌টেম্বর মাসের শেষ-ভাগে চেকোশ্লোভেকিয়ার সমস্যা সম্পর্কে মিঃ চেম্বারলেন ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, ২৪শে মার্চ তারিখে যাহা বলা হইয়াছে তদতিরিক্ত কিছুই বলিবার নাই। মিঃ চেম্বারলেনের ২৪শে মার্চ তারিখের বক্তৃতা সম্বন্ধে গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষ"-এ যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা অন্যায় হইবে না। ঐ সময় "জার্মানীর অষ্ট্রীয়া গ্রাস" শীর্ষক প্রবন্ধে "সঙ্কটাপন্ন চেকোশ্লোভেকিয়া" শীর্ষক অনুচ্ছেদে বলিয়াছিলাম, "হ্যালিফক্স কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব (মধ্য ইউরোপে জার্মানীর যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বনের স্বাধীনতা) সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ যে ভিত্তিহীন নহে, তাহা আজ মিঃ চেম্বারলেনের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝা যাইতেছে। মিঃ চেম্বারলেন কিছুতেই চেকোশ্লোভেকিয়া সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন না। প্রথম বার বিরোধী দল কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই সঙ্কীর্ণ বিষয়ে সহসা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে তিনি রাজী নহেন। তারপর গত ২৪শে মার্চ তারিখে তিনি যখন কমন্স সভায় পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে তাঁহার অতি-প্রত্যাশিত ঘোষণাবাণী পাঠ করেন, তখনও তিনি কৌশলে এই প্রসঙ্গটী এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি সকল দিক বজায় রাখিয়া বলিয়াছেন যে, জার্মানী ও চেকোশ্লোভেকিয়ার মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য সকল প্রকার সাহায্য দানে বৃটেন প্রস্তুত আছে। চেকোশ্লোভেকিয়া বিপন্ন হইলে তাহাকে সামরিক সাহায্য দানে বৃটেন্ অগ্রণী হইবে কি-না তৎসম্পর্কে কোন কথা বলা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না; কারণ তৎসম্বন্ধে কোন কথা এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলিলে উহা কূটনীতির পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে এবং নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিবে।"

জার্মানীর অষ্ট্রীয়া অধিকার এবং চেকোশ্লোভেকিয়ার জার্মান্ অঞ্চল অধিকারের কৌশল উত্তমরূপে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে হের হিট্‌লার অতি সন্তর্পণে যুদ্ধ এড়াইয়া চলিতেছেন। অষ্ট্রীয়া সম্পর্কে হিট্‌লার জানিতেন যে তথায় কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই—সামরিক শক্তিরূপে অষ্ট্রীয়া দুর্ব্বল, সর্ব্বোপরি ডক্টর সুশ্‌নীগের "দুকচি" মুসোলিনি তাঁহার এই কার্য্যে বাধা দিবেন না। এই জন্য তিনি অষ্ট্রীয়া সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অত্যন্ত দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে চেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে হের হিট্‌লার এক একটী পদ অগ্রসর হইয়াছেন এবং "চাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে," তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। বৃটেন্ কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবে, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, বৃটেন ফ্রান্সকে নিরপেক্ষ থাকিতে বাধ্য করিবে। ফ্রান্স যদি নিরপেক্ষ থাকে, তাহা হইলে রুশিয়াও চেকোশ্লোভেকিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে না। ফ্রান্স ও রুশিয়ার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলে

চেকোশ্লোভেকিয়া তাহার সামরিক শক্তির ব্যবহারে সাহসী হইবে না। কিন্তু ফ্রান্স যখন অকস্মাৎ সমরায়োজন আরম্ভ করিল এবং মনে হইল যে, সে তাহার মিত্র বৃটেন্‌কে উপেক্ষা করিয়াই চেকোশ্লোভেকিয়ার সহিত তাহার সামরিক চুক্তি পালন করিতে সচেষ্ট হইবে, তখন হিট্‌লার একটু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এই জন্য নিউরেমবুর্গে তাঁহার বক্তৃতা একটু নরম হইয়াছিল। ইহার পর, চেকোশ্লোভেকিয়ার জার্মান্-অধ্যুষিত অঞ্চলে যখন (সম্ভবত তাঁহার নির্দ্দেশেই) হাঙ্গামা আরম্ভ হইল, তখন বৃটেনকে মধ্যস্থতা করিবার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে হিট্‌লার পুনরায় "মেজাজ" দেখাইতে লাগিলেন। এই সময় মিঃ চেম্বারলেন যখন সুডেটেন অঞ্চল জার্মানীকে প্রদান করিবার প্রস্তাবে ফ্রান্সকে সম্মত করাইলেন, তখন হিট্‌লার বুঝিলেন যে এইবার "বাজি মাৎ" হইয়াছে; তখন তিনি পুনরায় কিঞ্চিৎ "উষ্ণ" হইয়া উঠিলেন। চেকোশ্লোভেকিয়ার জার্মান্ অঞ্চল অধিকার সম্পর্কে তাঁহার দৈন্যের সীমা অতিক্রম হইবার উপক্রম হইল। গডেন্‌বুর্গে তিনি মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আরও কঠোর প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ওদিকে চেকোশ্লোভেকিয়ার জেনারেল সিরভির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নূতন গভর্ণমেণ্ট জার্মান অঞ্চলে পুনরায় সৈন্য সমাবেশ করিলেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহারা যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রদর্শন করিবেন, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। তখন হিট্‌লার বুঝিলেন যে, এত অধিক "উষ্ণতা" প্রদর্শন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য হয় নাই; বৃটেন্ ও ফ্রান্সকে উপেক্ষা করিয়া রুশিয়া একক চেকোশ্লোভেকিয়ার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইতেছে কি না, কে বলিবে? কাজেই তিনি পুনরায় "চব্বিশ ঘণ্টার জন্য" ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মিউনিকে চতুঃশক্তির সম্মিলনী আহ্বান করিলেন। হিট্‌লারের কণ্ঠধ্বনির এই যে "সা" হইতে "নি" পর্য্যন্ত উত্থান-পতন, ইহার কারণ তিনি "লাঠি না ভাঙ্গিয়া সাপ মারিতে" চেষ্টা করিতেছিলেন।

হিট্‌লার সাময়িকভাবে উপনিবেশের দাবী উত্থাপনে বিরত থাকিলেও ঐ দাবী ত্যাগ করেন নাই। মধ্য-ইউরোপে তাঁহার অভিসন্ধি সফল হইলে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহা মিঃ চেম্বারলেন জানিতেন। তবুও তিনি হিট্‌লারকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, কারণ তিনি স্থির করিয়াছেন যে, ইউরোপীয় রাজনীতিতে বৃটেন্ সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে না। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক্ষণে এইরূপ একটী স্থানে উপনীত হইয়াছে, যখন প্রত্যেক দেশের পক্ষে পররাষ্ট্রনীতিতে হয় জার্মানী-ইটালী, নতুবা সোভিয়েট রুশিয়া—এই দুয়ের মধ্যে একটী পক্ষ বাছিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। গণতান্ত্রিক ধুয়া ধরিয়া নিরপেক্ষ পন্থা অবলম্বন আর সম্ভব নহে। চেকো-শ্লোভেকিয়া সংক্রান্ত সমস্যায় বৃটেন্ যদি হিট্‌লারের ঔদ্ধত্যে প্রশ্রয় না দিত, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে যে রুশিয়াও ফ্রান্সের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইত। রুশিয়ার পক্ষাবলম্বন 'চেম্বারলেন এণ্ড কোম্পানী'র মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। রুশিয়ার পক্ষ গ্রহণ করিয়া কম্যুনিজম্‌কে প্রশ্রয় দান ধনিকপ্রভাবান্বিত রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট কিরূপে সহ্য করিতে পারেন? কম্যুনিজম্ বৃটিশ রক্ষণশীলদিগের মনে কিরূপ ভীতি ও ঘৃণার সঞ্চার করে, তাহা স্পেনস্থিত বৃটিশ দূত লোকের একটী উক্তি হইতে বুঝিতে পারিব। এই ব্যক্তি এক সময় বলিয়াছিলেন, "ইংরেজ কম্যুনিষ্ট কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া অপেক্ষা রাজতন্ত্রী জার্মান্ কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া শ্রেয়।" এইরূপ মনোভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ রুশিয়াকে উপেক্ষা করিয়া ফ্যাসিষ্ট শক্তি-দ্বয়কে সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বে সরকার পক্ষ যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে তথায় সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে, এই আশঙ্কায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরে বিদ্রোহী পক্ষকেই সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। ইটালীর জলদস্যুর দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ জাহাজ বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইটালীকে তুষ্ট করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। স্পেনের বিদ্রোহী পক্ষকে ইটালী ও জার্মানী সাহায্য করিতেছে, ইহা জানিয়াও বৃটেন্ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছে। এই সম্পর্কে নিরপেক্ষতা সমিতিতে সোভিয়েট রুশিয়ার অভিযোগ বৃটেন্ পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা করিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি বৃটেনের এই মনোভাবের উল্লেখ করিয়া লণ্ডনের "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান্" পত্র দুঃখ করিয়াছেন, "বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদিগের অনুসৃত নীতিতে আমরা সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি বিরূপ হইয়াছি।"

মিঃ ইডেন্ প্রভৃতি রক্ষণশীল দলের কয়েক জন বিশিষ্ট

ব্যক্তি ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের নিকট দৌর্ব্বল্য প্রদর্শনের বিরোধী ছিলেন বলিয়া মিঃ চেম্বারলেন এত দিন অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইবার চেকোশ্লোভেকিয়া সমস্যার সীমাংসায় মিঃ চেম্বারলেনের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে কোন অবস্থাতেই রুশিয়ার পক্ষাবলম্বন করিবেন না—তাঁহা এক্ষণে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছে। চেকোশ্লোভেকিয়ার সমস্যায় বৃটেন্ ও ফ্রান্সকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য রুশিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল ; কারণ সে জানিত, এই সুযোগ যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে বৃটেন্ নিশ্চিতভাবে ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের পক্ষাবলম্বী হইবে। রুশিয়ার এই শেষ চেষ্টা বিফল হইয়াছে। বৃটেনের অধিবাসীদের সমরাতঙ্কের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মিঃ চেম্বারলেন্ নিশ্চিতভাবে ফ্যাসিষ্ট পক্ষে যোগদান করিয়াছেন।

মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের যে সমালোচনা করিলাম, ইহার সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এইচ্, এন্, আইক্সের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। মিঃ আইক্স সম্প্রতি সান্‌ফ্রান্সিস্কোর এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, মিউনিক্ চুক্তিতে প্রমাণিত হইয়াছে যে গণতান্ত্রিক দেশগুলি ফ্যাসিজম্ অপেক্ষা কম্যুনিজম্‌কেই অধিক ভয় করে। তাঁহার মতে, ইউরোপীয় মহাসমরের কোন আশঙ্কাই ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটী মিঃ চেম্বারলেন, মঃ দালাদিয়ার, মুসোলিনি ও হিটলারের ধাপ্পাবাজী ; ইঁহারা পূর্ব্ব হইতেই চেকোশ্লোভেকিয়ার কতকাংশ জার্মানীকে প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই পরিকল্পনার সমর্থনে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ভান করিয়াছিলেন।

কবি

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসাক

উন্মুক্ত সৈকতে শুনি ঝঙ্কারিত সাগর-সঙ্গীত
তন্দ্রাতুর রক্তিম সন্ধ্যায়,
উদাস বিরাট বুকে মরণের নৃত্য পরিচিত
নৈশাকাশে কৃষ্ণ অন্ধকায়।
অগ্নির দাহিকা রহে বৈশাখের মধ্যাহ্ন ভাস্করে,
সর্ব্বহারা হাহাকার নিত্য শুনি প্রতি ঘরে ঘরে,
বৈধব্যের নগ্ন বুকে পুঞ্জীভূত রহে অন্ধকার—
তপ্ত অশ্রুভার।

শুনি বসি জনপদে পুত্রহারা বিধবা জননী
বিনাইয়া কাঁদে নিশিদিন,
আকাশের বুকে জমে তপ্তশ্বাস বঞ্চনার ধ্বনি
বিহগ কাকলি দুখে ক্ষীণ ;
শুনিবারে চাহি আরো, যত শুনি মিটে না বাসনা,
বিরাট এ পৃথ্বীবুকে অতৃপ্তের মৌন আরাধনা,
আমি চাহি ভাষা দিতে বিশ্বজনা মূক আকাঙ্ক্ষার—
পাণ্ডুর সন্ধ্যায়।

সৃষ্টির আনন্দপাশে ধ্বংসের চরণধ্বনি শুনি,
আবর্ত্তিত মৃত্যু-বিভীষিকা,
ব্যথিত অন্তর মোর কল্যাণের গাহে আগমনী
ধ্বংস করি' মিথ্যা প্রহেলিকা।
মোর ভাষা মোর গান অসত্যের চাহে না বিলাস,
পূর্ণ হোক কণ্ঠে মোর নিখিলের ব্যর্থ অভিলাষ,
মূর্ত্ত হোক স্বপ্ন মোর, বাস্তবের বিচিত্র যৌবন—
তৃপ্ত আপিনার।

মৃত্যুর অনল গ্রাসে দগ্ধীভূত শত জনপদ,
ভস্মীভূত মানবের আশা,
বন্যার সুতীব্র বেগে ভেসে যায় অন্তরের সাধ,
তৃপ্তিহীন স্নেহ ভালবাসা।
শক্তিমান শৃঙ্খলিত অসত্যের লৌহ কারাগারে
আঘাত হানিছে নিত্য নির্য্যাতন ক্লেশ বারে বারে।
চাহিছে মুক্তির স্বাদ অগণিত নিম্ন বিশ্ববাসী—
আলোর প্রয়াসী।

আমি গাহি অনাগত মানুষের ভবিষ্যের গান,
কণ্ঠে মোর বাজে বিশ্ব-বাণী,
সর্ব্বহারা মানবের চাহি স্বাস্থ্য চাহি তৃপ্ত প্রাণ,
মুছে যা'ক সর্ব্ব ক্লেশ গ্লানি।
বর্ত্তমান শ্মশানের ভিত্তি 'পরে চাহি গড়িবারে
স্বর্গরাজ্য পরিপূর্ণ সুন্দরের ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে।
আমি চাহি বিশ্বজনে বিলাইতে মুক্তি অনুপম—
প্রাণ নবতম।

শিরসি মা লিখ

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল

এক বার নয়, দু বার নয়, বারবার চার বার যখন উপর্যুপরি ফেল করলাম—তখন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই স্থির করলেন আমি একটা আস্ত চতুষ্পদ ভারবাহী জন্তুবিশেষ। আমারও ইচ্ছা হ'ত সবার থেকে একটু দূরে থাকতে। তাই বাধ্য হ'য়ে আমার চিরাভ্যস্ত সান্ধ্যভ্রমণটুকু গোলদীঘির পাড়ে না সেরে সারতে হ'ত এস্‌প্ল্যানেডের মাঠে।

এতটা রাস্তাই কি নিরাপদ, পথে সতীন সেন, অতুল মিত্তির, মিথিল ধর সবার বাড়ীই পড়ে। এতগুলি লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে পথ চলাটা যে কি কষ্টকর সেটা শুধু আমিই জানি।

আমি চাই না ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে, চিরকাল যাদের সঙ্গে একসাথে পড়ে এসেছি তারা যে আজ আমার অবস্থার দৃষ্টিতে দেখে কথা কইবে এটুকু আমি সহ্য করতে পারি না। তার এখন ওদের সঙ্গে ত চলতেই পারে না—কিছু বললে ওরা যে শুধু ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে তা নয়—হয়ত প্রকাশ্যে অপমানই ক'রে বসবে। এই ভয়ই সব সময় ওদের এড়িয়ে চলি। তাই কি সব দিন পারা যায়।

চায়ের দোকানের সামনে সেদিন সবাই জুটে চলা করছিল—পড়ে গেলাম ওদেরই সামনে।

আর যাই কোথা! কেউ বলে—ভালো; কেউ—কেমন আছিস? কেউ—আরে, কেউ—কি আর বেশী যায় না সে, কেউ—তারপর? পঞ্চবাণে আহত হয়ে সংক্ষেপে বললাম—এই ত।

চট্ ক'রে একজন বলে বসল—গোলদীঘি বর্জ্জন যে?

কি বলি? আগে বললাম—আজকাল মাঠের দিকে একটু যাই।

অখিল সান্যাল ঠোঁট-কাটা, বলতে কিছুই বাধে না, ফস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—ঘাস খেতে না কি?

হো হো ক'রে উঠল এক হাসির হর্‌রা।

আমার তখন যে অবস্থা সে অবস্থায় কথার উত্তর দিতে হ'লে বস্তুরবত সেক্সপীয়রী আইনের জ্ঞান থাকা চাই, তাই চুপ ক'রে পাশ কাটিয়ে চলে যাই। যাবে একটু গাতাস লাগলে নিজের মনেই গাহি—

—এই করেছ ভাল, নিঠুর, এই করেছ ভাল!

চাকরীর চেষ্টায় যাই নাই কলকাতায় এমন আফিসই নাই। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান-এর কর্ণপাতি ত রোজই দেখি, একটাও ত জুৎসই পাই না। এই যে একটা—স্টু, কালই যাচ্ছি দরখাস্ত নিয়ে দশটায়।

দশটায় হাজির হই। মহামারী ব্যাপার। এখানে দরখাস্ত দেবার আগে কুস্তি লেখা দরকার। এরকম ক'রে বাহুবোপের কোর্ট ফ্লাস টিকেট কেনা চলে—দরখাস্ত দেওয়া অসম্ভব।

দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি। পৃথা ঘরে যায় কলকাতার আফিসে—দেখা যাক, বাইরে কোথাও সুবিধা হয় কি-না।

টাং টাং টাং, টাং টাং টাং—গৌরীপুর হাঃ কলেজ ছ'টার আটটার ঘণ্টা পড়ে। কুলীর স্রোত চলেছে ঠিক গোদুলীর ধারার মত। অনিলদার নির্দ্দেশমত দরখাস্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি গেটের একপাশে। অনিলদা পনের নম্বর ঘরে সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্য্যন্ত এখানে তার ছেলের-রক্ত জল করছে—তার একটা কথা কি আর সাহেব রাখবে না?

—এই যে, এসে পড়েছিস্, বেশ। ঠিক এইখানে, দাঁড়া, আমি দরখাস্তখানা দিয়ে আসছি বড় সাহেবকে, একটু পরেই ডাকবে।

—হাঁা, বেশ ভাল ক'রে একটা সেলাম আর মনে আছে ত সেই গ্রাণ্ডওয়েট্ নাইনাদ্ টেয়ার ওয়েট্ সমান নেট ওয়েট, যাস্—আর কি জিজ্ঞেস করবে ভাই, জানে ত কত।

—ঠিক দাঁড়া, যাই, ঘণ্টা পড়ে গেছে, ব্যাটা আবার দাঁত খিঁচোবে!

অনিলদা সিনেমার ছবির মত মিলিয়ে যায়। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকি। দু-চারজন কুলী বোধ করি চাকরীপ্রার্থী, রাস্তার উপর ব'সে খইনী ডলে, কেউ বা রামকেলী ভাঁজে।

—আপ্ দরখাস্ত লেকা?

বিপুলকায় দারোয়ান বেরিয়ে আসে, তার হাতে আমারই দরখাস্ত। হাতে নিয়ে খুলে দেখি নীচে লাল পেন্সিলে বড় বড় অক্ষরে লেখা—Regret, no vacancy.

বরাত, তা ছাড়া আর কি? সোজা ষ্টেশনে চলে আসি। টেপ ছাড়লে মদুকরবিনিন্দিত কণ্ঠে গান ধরি—

এই করেছ ভাল, নিঠুর, এই করেছ ভাল।

ইন্সিওরেন্সের এজেন্টগিরি তিনমাস হাঁটাহাঁটি ক'রে ছলোড়া ছুতো ছিঁড়ে আজ পারিশ্রমিক পেলাম তিরিশটি টাকা। জীবনে প্রথম উপার্জ্জন—টাকা কটি হাতে নিয়ে বাড়ী আসছিলাম। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বেঞ্চে ব'সে ষষ্ঠীদা কি লিখছে দেখতে পেলাম। ষষ্ঠীদা সেদিন ছেলের অসুখের জন্য দশটা টাকা ধার করতে এসে আমার কাছে দুপুর থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বসেছিল। ফিরে পাবিনি বলে বোধ হয় আর তাগিদ দেয় করেনি। ষষ্ঠীদা লোক ভাল, অল্প বয়সে বিয়ে করে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। বড়বাজারে কোন এক কাপড়ের দোকানের আগাগোড়ায়, তা এখানে বসে কি লিখছে দেখা যাক্।

চট্ ক'রে পেছন থেকে গিয়ে ষষ্ঠীদার হাত চেপে ধরি। ষষ্ঠীদার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

এ কি অসহ্যতা!

আমি তখন কাগজ কিনিয়ে নিয়ে পড়তে সুরু করেছি—

আমার মৃত্যুর জন্য কেহই দায়ী নয়।

রোগগ্রস্ত পুত্রকে মরণের হাত থেকে বাঁচাতে জীবনে প্রথম অবিশ্বাসী হয়ে মনিবের পঁচিশ টাকা আত্মসাৎ করেছি. ভেবেছিলাম জোগাড় ক'রে দেব। কিন্তু—

—বউদা, এসব কি?

—বিরুপায় ভাই। আজ হিসাব দাখিলের দিন, চাকরী ত যাবেই; সঙ্গে সঙ্গে জেল—ওদিকে ওরাও মরবে অনাহারে শুকিয়ে, তাই পথ পরিষ্কার করছি।

—কিন্তু, পঁচিশটা-টাকার জন্য!

—অথচ সবার সেরা ঘুষে পঁচিশ পয়সাও জোগাড় করতে পারিনি।

বউদার হাতে পঁচিশটা টাকা দিতে বউদা কেঁদে ফেলে। বউদাকে পাশ কাটিয়ে বিদায় নিয়ে বড়ো শিক্ষা পেলাম জীবনে একটা কাজের মত কাজ করেছি। বৈকাল ও সন্ধ্যা কখন কোন্ ফাঁকে কেটে গেল জানতেও পারলাম না। রাতে পুষ্পিতাকে আজকের ব্যাপারটা সালঙ্কারেই শুনালাম। প্রথমে পুষ্পিতা বলিল—যাও, শুধু শুধু মিথ্যে কথা কেন?

যখন ভাল ভাবে বুঝিয়ে বললাম—এর মধ্যে একটিলও মিথ্যা নাই, এটা সবই সত্যি, তখন পুষ্পিতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—পোড়া কপাল আমার, নইলে আর এমন দশা। তারপর একেবারে নিরুত্তর। ডাকিয়া সাড়া পাইলাম না। অভ্যাসবশত এধারেও ওধারে খুঁজিতে গেলাম—

এই করেছ ভাল,

হঠাৎ বিষম লেগে গেল।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে গলদ

শ্রীসতীশচন্দ্র বৈদ্য বি-এ

ফ্রয়েড সাহেবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বর্ত্তমান জগতে যে আলোড়ন এনেছে তার ফলে তরুণ মনে এক অভাবনীয় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কেবল তা নয়। নীতি ও ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা তরুণ-তরুণীর মনকে আর যেন আয়ত্তাধীনে রাখতে পারে না। সর্ব্বত্র এক প্রকার বেসামাল বিদ্রোহের ভাব।

মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানের নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও আবিষ্কৃত তথ্য যুক্তি-তর্ক দ্বারা মিথ্যা প্রমাণ করারও উপায় নাই। অবস্থা-বিচারে মনের গতি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র এক—নীতির বিধান একরূপ নয়—ধর্ম্মের বিধান একরূপ নয়। এতকাল পৃথিবীতে লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি নীতির বিধান দিয়েছে—মনের গতিবিধি নির্দ্দেশ করে দিয়েছে। অন্য কথায়, এ তিনের মধ্যে ধর্ম্ম-জ্ঞান ছিল পরিচালক। এ যুগে ধর্ম্ম বা ভগবান স্থান পেয়েছে এত উপরে যে নীতির সঙ্গে বা মনের গতির সঙ্গে তার কোনরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধই পণ্ডিতগণ (?) স্বীকার করতে চান না। আমাদের দেশে মুনিঋষিগণ পরমব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে যে আভাষ দিয়েছেন তা যদি সত্য হয় তবে তাঁদের সঙ্গে মনের ত কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না; যিনি 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্', তাঁর সঙ্গে আবার মনের সম্বন্ধ! সে কি কথা? যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্—তাঁর বিধান শাশ্বতের বিধান, দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তনশীল ও অশাশ্বত হতে পারে না। নীতির এমন সব বিধান কখনও ভগবানের বিধান নয়। যুক্তিতর্কের কথা ছেড়ে দিলেও আজ মানুষ অনুভূতি দিয়ে বুঝছে যে মানুষের মনের গতির সঙ্গে ভগবানের কোন সম্পর্ক নেই—ভগবান থাকুন বা না থাকুন, ভগবান মঙ্গলময় হউন আর নাই হউন, ভগবান এক হউন আর একাধিক হউন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান হউন আর নাই হউন, (১) সম-অবস্থায় মানব-মনের গতি সম-নিয়মে চলবে, (২) মানুষের সুখ সুবিধার জন্য মানুষ নীতির নিগড় গড়বে ভাঙবে, আবার গড়বে। প্রয়োজনমত তার পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তন সাধবে। স্বাধীন চিন্তা দ্বারা এ যুগের মানবমণ্ডলী যে সত্য আবিষ্কার ও অনুভব করছে তারই আলোকে তাঁদের পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক এবং একেই যুগধর্ম্ম বলে। এটাই এ যুগের দর্শন।

এখন বিচার্য্য বিষয় হল—এ নব-দর্শনের প্রভাবে মানবের

গতি কোন্ দিকে চল্‌ছে। যুগে যুগে মনীষিগণ নব নব সত্য প্রকাশ করে মানবকে উন্নততর করেছে। আমরাও এ যুগে নূতন সত্যের আভাষ পেয়েছি, কিন্তু আমাদের গতির আভাষ পেয়েছি কি?

যে সত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হয়, মানুষের সকলপ্রকার শক্তি অল্পবিস্তর হ্রাস পায়, মানুষ ভীরু কাপুরুষ হয়, মানুষে মানুষে রক্তারক্তি সুরু হয়, তেমন সত্য কি মানুষকে মঙ্গলের (শিব) পথে নিয়ে যেতে পারে? তেমন সত্য কি মানুষকে সুন্দরের পথে নিয়ে যেতে পারে? যা একাধারে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ নয়, তা নিয়ে আমরা কি করব! স্বীকার করি নীতির সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই, স্বীকার করি ধর্ম্মের বাঁধ মনের স্বাভাবিক গতিকে পরিচালন করতে পারে না এবং একথাও স্বীকার করি, এ সত্য যে কেবল যুক্তিসহ তা নয়—অনুভূতিমূলক; তবু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের বাঙালী হিন্দুর নীতিবোধে আঘাত পায় অথচ ফ্রয়েড্ সাহেবের মনোবিজ্ঞানসম্মত অর্থাৎ মনের স্বাভাবিক গতি চায় এমন অনৈতিক—ধর্ম্মের কথা তুলব না—কাজ করে কেউ অনুতাপ না করে থাকতে পারেন? মনস্তাত্ত্বিক সত্য অস্বীকার করলে ত চলবে না। মুহূর্ত্তের জন্যই বা কেন এ অনুতাপ আসে? দুর্ব্বলতা? হাঁ, তাই মানলুম; এ দুর্ব্বলতাই বা কেন থাকে? যা সত্য বলে বুঝি বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বাইরে, তার অনুষ্ঠানে মনে এ অনুতাপ আসে কেন? এ দুর্ব্বলতা আসে কেন? দুর্ব্বলতা এবং অনুতাপ দুই-ই ত মনের কষ্টদায়ক অনুভূতি। অনুভূতিই ত সত্য। সুখের আকাঙ্খায় মনের স্বাভাবিক গতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে-কর্ম্ম সাধন ক'রে মন তৃপ্তি পেয়েছে তারই অব্যবহিত পরে একই মনে একই কারণে আবার অতৃপ্তির অনুভূতি! এও সত্য—যেহেতু এ অনুভূতি। এ কেমন ধারা? নিশ্চয়ই এরকম সত্যের সন্ধানে কোথাও কোনরকম গলদ আছে। সে গলদ কি এবং কোথায়?

ফ্রয়েড্ সাহেবের মনস্তত্ত্বালোচনা একদেশী। তা সত্য কিন্তু সমগ্রভাবে সত্য নয়। এজন্য তা সত্য হলেও শিবও নয়—সুন্দরও নয়। তরুণ তরুণীর মনোরাজ্যে আজ যে উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহ ও চঞ্চল বিরাট উপস্থিত হয়েছে তার কারণ ফ্রয়েড্ সাহেব মানব-মনের আসঙ্গ-আকাঙ্ক্ষার সম্যক আলোচনা করেছেন; কিন্তু ঐ মনের ঠিক অর্দ্ধেক অংশ জুড়ে যে সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা তিনি লক্ষ্য করে থাকলেও সে সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করেন নাই। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে কয়েকটি সার-তথ্য লিপিবদ্ধ করা হল মাত্র।

মানব-মনে সর্ব্বপ্রথমে জন্মে সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা, তারপর আসঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা। রোরুদ্যমান মানবশিশু—পুরুষই হউক, নারীই হউক—ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর উন্মীলিত নয়নে অন্য লোক দেখে—কিংবা নিমীলিত নয়নে অন্যের স্পর্শ অনুভব ক'রে ক্রন্দন বন্ধ করে। কিছুকাল পরে বিছানায় সুপ্তোত্থিত শিশু একাকী ক্রন্দন করে সঙ্গলাভের নিমিত্ত, যে-কোন দ্বিতীয় শক্তির আগমন-অভাব পেয়ে ক্রন্দন বন্ধ করে। কিছুকাল পরে পাঠশালার পথে শিশু চায়—তার সঙ্গী আর কিছু নয়—আর যদিও বা কিছু সে নির্ব্বাচনের পালা আসে পরে পরে। যে কোনরূপ দীর্ঘ নির্জ্জন পথ যাদের ভাগ্যে ঘটেছে—তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা পর্য্যালোচনা করলে বুঝতে পারবেন, সর্ব্বপ্রথম তাদের মনে জাগে সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা। ইহাই মানব মনে আদি-আকাঙ্ক্ষা। এজন্যই কবি বলেছেন সমাজ, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা (society, friendship and love) ভগবানের দান। এজন্যই মানুষকে সামাজিক জীব (social being) বলা হয়। এজন্যই আমাদের আদি-পুরুষগণ অন্য কোনরূপ কাজ সুরু করার আগে মনের আদি-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে সঙ্গ-সুখের জন্য সমাজ গঠন করেছিলেন—সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সমবিধি (social contract) প্রণয়ন করেছিলেন। ইহাই মানবের আদি-কর্ম্ম—তারপর অন্য কিছু। আজ যে মানব-মন পরিপূর্ণ স্ফূরণ পেতে বসেছে এর আরম্ভ সেই আদি-সমাজের গঠন থেকে। সমাজের দাবী সকলের আগে, সকলের বড়। এর অর্থ কি? মানব-মনে যেমন সর্ব্বপ্রথমে জাগে সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা, তাই চরিতার্থ করতে মানব প্রথম গঠন করলে সঙ্গ-তন্ত্র।

বর্ত্তমান যুগের স্বাধীন ও সাবলীল চিন্তাপ্রবাহে যদি মানব-মনের সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা ও আসঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা পাশাপাশি স্থান পেত—যে ধৈর্য্য ও উৎসাহভরে আজ ফ্রয়েড্ সাহেবের কামতন্ত্র আলোচিত হয়—ঠিক সেভাবে যদি সঙ্গ-তন্ত্র ওরফে মানবের প্রতি মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আলোচিত হ'ত—তবে একই মনস্তাত্ত্বিক সত্যের পরিপূর্ণ আলোকে আমরা অভ্রান্তভাবে দেখতে পেতাম, মনের এক অংশে যদি জাগে বন্ধুপত্নীর জন্য আসঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা সেই মনেরই অপর অংশে জাগে বন্ধুজন সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা। দুই চক্ষুতে মনের দুটি দিক দেখে যে পথে চলা যায় সেই পথই পূর্ণ-সত্যোদ্ভাসিত পথ। সেই পথের শেষে গিয়ে যাঁর সাক্ষাৎ হয় তিনিই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

হার্ডওয়ার মার্চেন্ট

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত বি, এস্-সি

রাইভ ষ্ট্রীটের এক তিনতলা বাড়ীর আধা-অন্ধকার ঘরে আমার অফিস। অফিস ব'লেই অভিহিত করতে হয়—ওটা ব্যবসাদারী চাল। কি সে ব্যবসা কবি তা আমার চেয়ে আমার বন্ধুরাই জানে বেশী। ওরা বলে, হার্ডওয়ার মার্চেন্ট হ'য়ে পড়, দাত আছে—চাই কি, বাড়ী গাড়ীও হ'তে পারে। মানুষের মতো! রাজী হ'য়ে যাই। অর্ডার ছাপান হ'য়ে যায়—দস্তুরমত একটা মার্চেন্ট! একটা লোকও রাখতে হয় হুকুম তামিল করবার জন্যে—লোকজন এলে কারবা ক'রে ডাকি—বেয়ারা! তবে লোকটা ভাল, সদ্য উড়িষ্যা থেকে এসেছে, এখনও পাকা হ'য়ে ওঠেনি। বাড়ীতেই থাকে, কাজ করে বাড়ীর আর অফিসের—পায় দায় আর তিন টাকা পায় মাইনে। ভগবানে ঘুচিয়ে দিয়েছেন ওকে, নইলে নিজেকেই হ'তে হ'ত বেয়ারা থেকে ম্যানেজার। অফিসের কারবা যেত চুলোয়—বন্ধুরা বলে, কারবাটাই আসল, আর সব ফাঁকি।

তাইতেই রক্ষে। বন্ধুদের কথা বেদবাক্যের মত মেনে নিয়ে লেগে পড়ি কাজে। কিন্তু সমস্ত কিছুই ভুলো ব'লে মনে হয়। বাড়ী গাড়ী মাথায় থাকুক, অফিস রাখাই দায় হ'য়ে পড়ে। বন্ধুরা সাহস দেয়, বলে, আরে থামো না—প্রথম প্রথম ক্ষতি হ'লেই কি পেছিয়ে প'ড়লে চলে? এ হচ্ছে ব্যবসা—লাভ যখন হ'তে থাকবে, হুঁ হুঁ।

হুঁ হুঁ-ই বটে, আমার অবস্থা এদিকে লেদ। কিন্তু তবু সৎপরামর্শ দিতে হয় তাদের। বুদ্ধিটুকু তার পিতার দেওয়া অলঙ্কার পতির জন্যে রাখতে থাকে। পুরুষের দেওয়া জিনিষ পুরুষের কাজেই ব্যয় হয়। হিন্দু মেয়েদের জন্যপান করতে ইচ্ছে করে—ভাগ্যে সতী-সাধ্বীর দেশে জন্ম!

সেদিন অফিসে ব'সে একটু ঝিমিয়ে নিতে থাকি, কড়ই যা আর সোরা যায়। শরীর যায়, তাতে দুঃখ নেই কিন্তু কোন কিছুই আসে না যে।

মহাপাত্রটির ডাকে বিরোন কণ্ঠ হ'য়ে যায়। ওর দিকে চেয়ে থাকি অবাক হ'য়ে। হাঁসিমার মহাপাত্র জানায় কে একটি বাবু আসছে এদিকে।

বুঝি আরও হতভাগ্য সে। কিন্তু তবু অফিসের কারবা আছে ত। টেবিলের ওপর থেকে আধ-পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে বার ক'রতে হয় ড্রয়ার থেকে একটা সিগরেটের বাক্স, গোল্ড ফ্লেক—অবশ্য বাক্সটার নামে থেকে ভেতরকার জিনিষগুলোর স্বরূপ জানা যায় না, কারণ ওগুলো সস্তা-দরের। ওটাও একরকম কায়দা।

ওরই একটা ধরিয়ে দাঁতে চেপে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে একটা খাতা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি। রাইভ ষ্ট্রীটের মার্চেন্ট—সে ত আর সোজা কথা নয়।

লোকটি এসে একধারে চুপ ক'রে দাঁড়ায়। তার জামা, কাপড় আর চেহারা দেখে মনে হয়, এই আমার সত্যিকার বন্ধু। ও চেহারা শুধু ওরই নয়, আমার সঙ্গেও মাদুলি আছে যেন অনেকটা। বন্ধু ব'লে গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে কিন্তু রাইভ ষ্ট্রীটের কায়দা ছাড়লে ত আর চলে না।

চেয়ারটায় ভাল ক'রে হেলান দিয়ে বলি, বসুন।

লোকটি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে সামনের চেয়ারটায় ব'সে পড়ে—আর দাঁড়িয়ে থাকাও যেন তার পক্ষে অসম্ভব।

একটা হাই তুলে বলি, কি কাজ আপনার?

লোকটি আস্তে আস্তে বলে, দেখুন, একটা কাজ যদি দিতে পারেন—যে-কোন রকম, টাইপ ক'রতেও জানি আমি। পনেরটা টাকা পেলেই আমার চলে। ও যেন জেড়ে পড়ে।

কাজ? জবাব দিই, লোকের ত এখন দরকার নেই মোটেই। তবে হ্যাঁ, টাইপের জন্যে শীগ্‌গীরই লাগবে বটে, কিন্তু সে ত আপনাকে দিয়ে হবে না, সেজন্যে—

ও যেন একটু ভরসা পায়—বলে, বলেন ত আমি সাইকিকেই নিয়ে আসতে পারি—টাইপ করতে জানি আমি খুব ভাল।

একটু হেসে বলি, না সেজন্যে নয়, ও কাজটা আজকাল মেয়েদেরই দেওয়া হচ্ছে—ওরা ভাল জানুক আর নাই জানুক, বুঝলেন না?

লোকটি চুপ ক'রে থাকে, আস্তে আস্তে উঠে পড়ে। তাড়াতাড়ি বলি, একটু চা খেয়ে—

ও মাড় নেড়ে বলে, না, বরং একটু জল যদি—

গম্ভীর হ'য়ে ডাকি, বেয়ারা!

জল খেয়ে লোকটি বেরিয়ে যায়। ভদ্রতা জ্ঞান আছে—দু-দুটা পয়সা বাঁচিয়ে দিয়েছে। মনে মনে ধন্যবাদ জানাই।

বন্ধুদের কথা মনে হয়—তাদের জয়জয়কার, কিন্তু পেট ভরে কই!

বাইরের দৃশ্যের দিকে চাইতে লজ্জা হয়। হাত দুটো ত প্রায় বরফ হ'য়ে এসেছে, মেরুর হাড়গুলো বোধ হয় দেখা যায়। হঠাৎ অত্যন্ত রাগ হয়। কেন ও এমনি নির্বিবাদে সহ্য করে সমস্ত অত্যাচার? কি পায় এমনি অত্যাচারের মাঝে ও?

মায়া এসে বলে, কিছু সুবিধে হচ্ছে আজকাল?

বলি, হাই, সুবিধে হবার জন্যেই ভগবানের অস্ত্রে কিনার মাথায় পেতে নিয়েছি-কি-না। কিন্তু মায়া, তোমার মধ্যে কি আর এতটুকু শক্তিও নেই? আমি শুধু অবাক হ'য়ে ভাবি এত নিষ্ঠুর ভগবান হয় কি ক'রে? কি ক'রে সে তোমাদের এমন রিক্ত ক'রে ফেলে!

মায়া যেন ভয় পেয়ে যায় কাছে স'রে এসে বলে, কেন, হয়েছে কি, ওর দুটা বাঁয়ের ওপর হাত দুটা রেখে ভাল ক'রে চেয়ে দেখি ওর মুখের দিকে। আস্তে আস্তে বলি, আজও স্বামী ব'লে আমার সন্ধান ও সম্মান কর কি ক'রে লেইটেই আমি ভেবে পাইনে মায়া। আমাদের রাজার জাতের মেয়েরা কিন্তু—

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই মায়া ব'লে ওঠে, রাজার জাতের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। তবে আমার কথা? ও আমার মুখের দিকে চায়, একেবারে বুকের কাছে স'রে এসে মাথাটা বাঁয়ের ওপর রাখে।

এই মায়া—সতী সাধ্বীর দেশের মেয়ে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই ভাল, কি মন্দ, তা ভাবতেও ইচ্ছে হয় না, শুধু মনে হয়, এটুকু না থাকলে বুঝি চলত না।

একটা দেশলাইএর বাক্স দুটো দিয়ে কেঁদে টানতে টানতে চাকর হয় খোকন। বলে, বাবা, গাড়ী—মা যাবে, পৌঁ, পৌঁ। তুমি যাবে না?

ওকে বুকে তুলে নি। ওর কচি মুখে খাঁচ অসংখ্য চুমো। খোকন —মায়ার খোকা।

বলি, আমাকেও নিয়ে নেও বাবা, তুমি আমি আর তোমার মা।

খোকন রাজী হ'য়ে যায়, বলে, ভাল গাড়ী এনো কিন্তু।

চেয়ে দেখি মায়া চেয়ে আছে আমাদেরই দিকে একদৃষ্টে। ওর চোখ দিয়ে যেন মায়া মমতা উজাড় হ'য়ে প'ড়তে চায়। ওর স্বামী আর ওর ছেলে।

সেদিন রাখী-পূর্ণিমা।

দিঁড়ি দিয়ে নামতেই বাড়ীটার দরওয়ান এসে সেলাম ক'রে দাঁড়ায়, হাতা-কাতরায় বলে, বাবু: রাখী বাঁধতে হবে আজ।

নিকীরের মত হাতটা বাড়িয়ে দিই, দরওয়ান তার কাজ শেষ ক'রে সেলাম ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

বুঝতে বাকী থাকে না, কিন্তু না বুঝতে পারলেই বোধ হয় ছিল ভাল। পকেটে হাত দিয়ে দেখি একটা আধুলী—দরওয়ানের হাতে তুলে দিই।

সেলাম ক'রে আর একটা রাখী আমার হাতে দিয়ে বলে, মাজীকো দিজিয়ে। মাজীর উদ্দেশে বহুত বহুত সেলাম জানিয়ে সে এগিয়ে যায়।

খোকার জামা কেনবার জন্যে এনেছিলুম আধুলীটা, ফেরা মাত্রই ও হয় ত এসে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু উপায় কি? মনে মনে ভাবি, যার হাতে আগে তুলে দিলুম খোকার আনন্দটুকু, সে কিন্তু আমার চেয়ে ঢের সুখী। আজও আমি বাবু, কিন্তু সত্যি কি তাই? দক্ষিণা দেবার হাত আমার কি আজও কেউ ছেড়ে যেতনি?

হাওড়ার পোলের সামনে আসতেই কেন জানি না মনটা হঠাৎ খুশী হ'য়ে ওঠে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হ'য়ে যাওয়ায় রাস্তা মাঝে মাঝে বেশ জল দাঁড়িয়ে গেছে—কাদাও হয়েছে মন্দ নয়। ওদের সঙ্গে আমার যেন একটা যোগ আছে আর তাই বোধ হয় মনটা আমার হঠাৎ এত খুশী হ'য়ে ওঠে।

পুরণো দিনের ভুলে-যাওয়া একটা গান মনে হয়—সুর জানি না, জানতুমও না কোন দিন। কিন্তু তাই ব'লে মনের খুশীকে চাপা ক'রে রাখে কে? গলা দিয়ে আমারই মত জীর্ণভাবে গানটা বেরিয়ে পড়ে।

পাশের লোকটি হঠাৎ রেগে গিয়ে মুখের কাছে এসে, হাত ঘুরে কি সব বলে—আর ঠিক সেই সঙ্গেই পাশ দিয়ে যায় একটা মোটর—কাদায় ভ'রে যায় কাপড়টা। কিন্তু কিছুই বাধা দিতে পারে না আমায়।

বাড়ী ফিরতেই মায়া বলে, খোকার জামা!

বলি, ঘুমিয়ে আছে ত, থাক্। সে দরওয়ান নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কি হবে আমার কথা মনে ক'রে, তার গাড়ীর কথা আর বাড়ীর কথা। বুদ্ধ জাগল ব'লে, আর কি, একেবারে বড়লোক—বন্ধুদের কথায় অবিশ্বাস করতে নেই মায়া। পরে কাপড়টাকে দেখিয়ে আস্তে আস্তে বলি, কিন্তু আজ এটাকে একটু ভাল ক'রে ধুয়ে রেখো বড্ড বেশী রকম কাদা লেগে গেছে।

মায়া আমার মুখের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে থাকে—কি-ই বা ব'লবে সে।

বর্ত্তমান শিক্ষায় বাঙ্গালী কোন্ পথে?

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু

জগতের সকল জাতিই—শিক্ষার ভিতর দিয়া উন্নতিলাভ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে কলকারখানার সৃষ্টি হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের যে এত উন্নতি, ইহা একমাত্র শিক্ষার ফল। শিক্ষা ভিন্ন রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রভৃতি কিছুতেই উন্নতি করা সম্ভব নহে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিলেও শুধু ভারতের প্রদেশগুলির তুলনায় বাঙ্গালা আজ একেবারে নিঃস্ব। বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় এদেশের লোকের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা ছিল না। যে দেশে অন্নবস্ত্রের জন্য পরিশ্রম করিতে হয় না, সে দেশের লোক সাধারণতঃ অলস হইয়া পড়ে। এমন কি, সুজলা সুফলা বাঙ্গালার চাষীরা পর্য্যন্ত বৎসরে তিন মাস পরিশ্রম করিয়া নয় মাস আলস্যে অতিবাহিত করিত। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের বাঙ্গালার মত এত সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধা ছিল না। কাজেই ভারতের অন্য সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীরা ব্যবসার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ায় আজ তাহারা ধনী ব্যবসায়ী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে আজ বাঙ্গালার দুর্গতির প্রথম কারণ, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তাহাতেও বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইত না, যদি সাধারণ লোক কেরাণীগড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ করিয়া চাকুরীর দিকে না ঝুঁকিত, আজ মাড়োয়ারী ভাটিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়, যাহারা বাঙ্গালায় ব্যবসা করিয়া প্রভূত ধনী, তাহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালা দেশেরও যে সমস্ত অশিক্ষিত বৈশ্য সম্প্রদায় ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল, আজ তাহারা নিঃস্ব নহে। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীদের যেমন কেরাণীগিরি ফুরাইয়াছে, অমনই তাহারা পথে দাঁড়াইয়াছে। আমাদের মধ্যে নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু, যাহারা ব্যবসা করিত, তাহাদের বংশধরগণ এখনও ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া উচ্চবর্ণের সম্পত্তিশালী লোক-দিগকে টাকা ধার দিয়া তাঁহাদের সম্পত্তির মালিক হইয়া পড়িতেছে। উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি এবং যাহারা এতদিন বড় বড় চাকুরী করিয়া কিছু সম্পত্তি ও অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সকলেই ঋণগ্রস্ত। সভ্যতার চাল-চলন বজায় রাখিতে গিয়া সকলেই নিঃস্ব। কেরাণীগিরির তো কথাই নাই; যেমন আয়, তেমনই ব্যয়। বরং মুদী-দোকানে দেনদার। কাহারও কিছুই সঞ্চিত নাই। কন্যার বিবাহে কিংবা কঠিন পীড়ায়, ভিটামাটী অলঙ্কারাদি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বন্ধক ও বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। যে শিক্ষায় অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান হয় না, অধিকন্তু বিলাসিতা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দেয়, আমাদের দেশে সেই শিক্ষাই প্রচলিত। একটি ছেলেকে বি-এ, এম-এ পড়াইতে যাহা খরচ হয়, হয়তো অনেক ছেলের জীবনে তাহা রোজগার হয় না। যাঁহারা কায়ক্লেশে, এমন কি ঋণ করিয়াও পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দেন, তাঁহারা হয়তো পুত্রের বিবাহের সময় কন্যার পিতার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ওরাশিল করেন। নতুবা বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গোলাম তৈরির পরীক্ষায় পাশ করিয়া অন্ন-সমস্যার সমাধান নাই। অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছাড়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের পুত্রগণকে উচ্চ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করা ভুল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বি-এ পর্য্যন্ত পড়াইতে চারি বৎসরে যে সময় ও অর্থ নষ্ট হয়, যদি সেই সময়টি অন্য যে কোন অর্থকরী শিক্ষায় নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে যুবক সম্প্রদায় হয়ত কর্ম্মক্ষেত্রে কিছু না কিছু উপার্জ্জনে সক্ষম হইতে পারে। যাহাদের অন্নবস্ত্রের চিন্তা নাই, তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হউক। বিশেষতঃ কলেজে পড়ার সময় সাধারণ গৃহস্থের ছেলেদের পোষাক-পরিচ্ছদের ঝোঁক ও বায়োস্কোপের নেশায় যায় বাড়িয়া যায়। যে সমস্ত ছাত্র ধনী সন্তানের সহিত একত্রে হোষ্টেলে বাস করে, তাহারা ঐ সমস্ত ধনী সন্তানের চাল-চলনের সহিত সমান তালে চলিতে গিয়া নিজেদের আর্থিক অবস্থার কথা মনে রাখিতে পারে না। যে সময় ছাত্রদের জীবন ও চরিত্র গঠিত হইতে আরম্ভ হয়, ঠিক সেই সময়ে যদি

তাহাদের মনে ধনী সন্তানের জীবনযাত্রার আদর্শের সংস্কার বদ্ধমূল হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের মিতব্যয়িতার শিক্ষা নষ্ট হইয়া যায়। প্রথম জীবনে যদি বালকগণ মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা না পায় এবং বিলাসিতায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়, সংসার-জীবনে তাহারা আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া জীবন যাপন করে।

আমি জনৈক নিরক্ষর ব্যবসায়ীর কথা জানি। তিনি প্রথম জীবনে কোন একটি ইংরেজ কোম্পানীর লোহার কারখানায় মাসিক পনর টাকা বেতনে মিস্ত্রির কাজ করিতেন। পরে নিজের অধ্যবসায়ে নিজেই খুব ক্ষুদ্রভাবে প্রথমে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া ক্রমশ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি তাঁহার পুত্রগণকে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়াইয়া নিজেই কারখানায় মিস্ত্রিদের সহিত কাজ শিক্ষায় নিযুক্ত করিতেন। কিছুকাল ঐ ভাবে কাজ শিক্ষা দেওয়ার পর মিস্ত্রিদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার দিতেন। তিনি কোন দিন পুত্রদের বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার পুত্রেরা পিতার নিকট ঐ ভাবে শিক্ষা পাইয়া বর্ত্তমানে ঐ কারখানার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রেরা যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন তিনি একজন বিশিষ্ট ধনী। সে অবস্থায় যদি তিনি তাঁহার নিজের আর্থিক অবস্থার তুলনায় পুত্রদিগকে ঐ ভাবে সাধারণ মিস্ত্রির কাজে নিযুক্ত করা অপছন্দ করিতেন এবং পুত্রদিগকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে হয়ত এতদিন তাঁহার ব্যবসার অস্তিত্ব বজায় থাকিত না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন কোন নিরক্ষর ব্যক্তি অতি হীনাবস্থা হইতে প্রভূত অর্থ ও সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াও নিজের নিরক্ষতার জন্য সভ্য সমাজে মেলামিশা করিতে প্রাণের মধ্যে দারুণ দুঃখ অনুভব করেন। তজ্জন্য তিনি পুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা ও সভ্য সমাজে মিশিবার জন্য কোন প্রকার অর্থব্যয়ে কৃপণতা করেন না। পুত্রগণকে উচ্চশিক্ষিত করিয়া পিতা যেমন মনে মনে একটা তৃপ্তি লাভ করেন, পুত্রগণ কিন্তু নিরক্ষর অসভ্য পিতাকে তদনুরূপ ঘৃণা করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। শরৎবাবু তাঁহার 'বৈকুণ্ঠের উইলে' ইহার উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষার ছাত্রদের প্রাণে একটা বিলাসিতার ভাব আনিয়া দেয়। পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছাড়াও পারিবারিক জীবনে একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে পূর্ব্বেকার মত মিলনের ভাব দেখা যায় না। প্রত্যেকেই নিজের স্ত্রী-পুত্রের স্বার্থের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিরা নিজেদের পরিবার লইয়া পৃথকভাবে কর্ম্মস্থলে বাস করেন। সংসারে প্রতিপাল্য, এমন কি বৃদ্ধ পিতা-মাতার উপরও অনেক ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন দেখা যায়। ইউরোপীয়েরা যে ভাবে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, বর্ত্তমানে আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেক স্থলে ঐ জাতীয় বিচ্ছিন্নভাব আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রচুর পরিমাণে পৈতৃক সম্পত্তি থাকিলে বর্ত্তমান যুগে সম্মিলিতভাবে উহা পরিচালন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পরিচালকের উপর কাহারও বিশ্বাস থাকে না। ফলেই ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। যৌথ সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার ফল সকলের পক্ষে যে ক্ষতিজনক তাহা কেহই চিন্তা করেন না। যৌথ সম্পত্তি যাহা একজন ম্যানেজার বা কর্ম্মচারীর দ্বারা পরিচালন করা যায়, ভাগ-বাঁটোয়ারার ফলে ঐ সম্পত্তি যতগুলি ভাগে বিভক্ত হইবে, অংশীদারগণের ততগুলি কর্ম্মচারীর বেতন বহন করিতে হইবে। চারিজন অংশীদারের পক্ষে একজন কর্ম্মচারীর যাহা বেতন দিতে হইত, যৌথ সম্পত্তি বিভাগ হইলে তাহার কর্ম্মচারীর বেতন চারিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি পরিচালক থাকিয়া যদি কিছু আত্মসাৎও করেন, তাহাতেও লোকসান নাই। কিন্তু একজনের স্থলে যদি চারিজন চোর নিযুক্ত করা হয়, সে তুলনায় কত বেশী ক্ষতি ইহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এই লাভ-লোকসান যে কেহই বোঝেন না তাহা নহে। কিন্তু সরিকগণের মধ্যে পরস্পরের এমন একটা জিদ্ ও হিংসাভাব দেখা যায় যে সর্ব্বস্ব নষ্ট হইলেও নিজেদের জিদ্ বজায় রাখিতেই হইবে। বরং একান্নবর্ত্তী পরিবার পৃথক অন্ন হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু সম্পত্তি বিভক্ত হইলে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ ঘটে। কোন একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ লইয়া হাইকোর্টে পার্টিসনের মামলা রুজু হয়। দীর্ঘকাল মামলা চলিবার পর এটর্নিগণের উদর স্ফীত হইলে কয়েকজন এটর্নি সালিশ নিযুক্ত হইয়া সম্পত্তি পার্টিসন করিয়া দেন। পরে এটর্নি যাহা পরিশ্রমিকের বিল দিলেন, তাহাতে যে

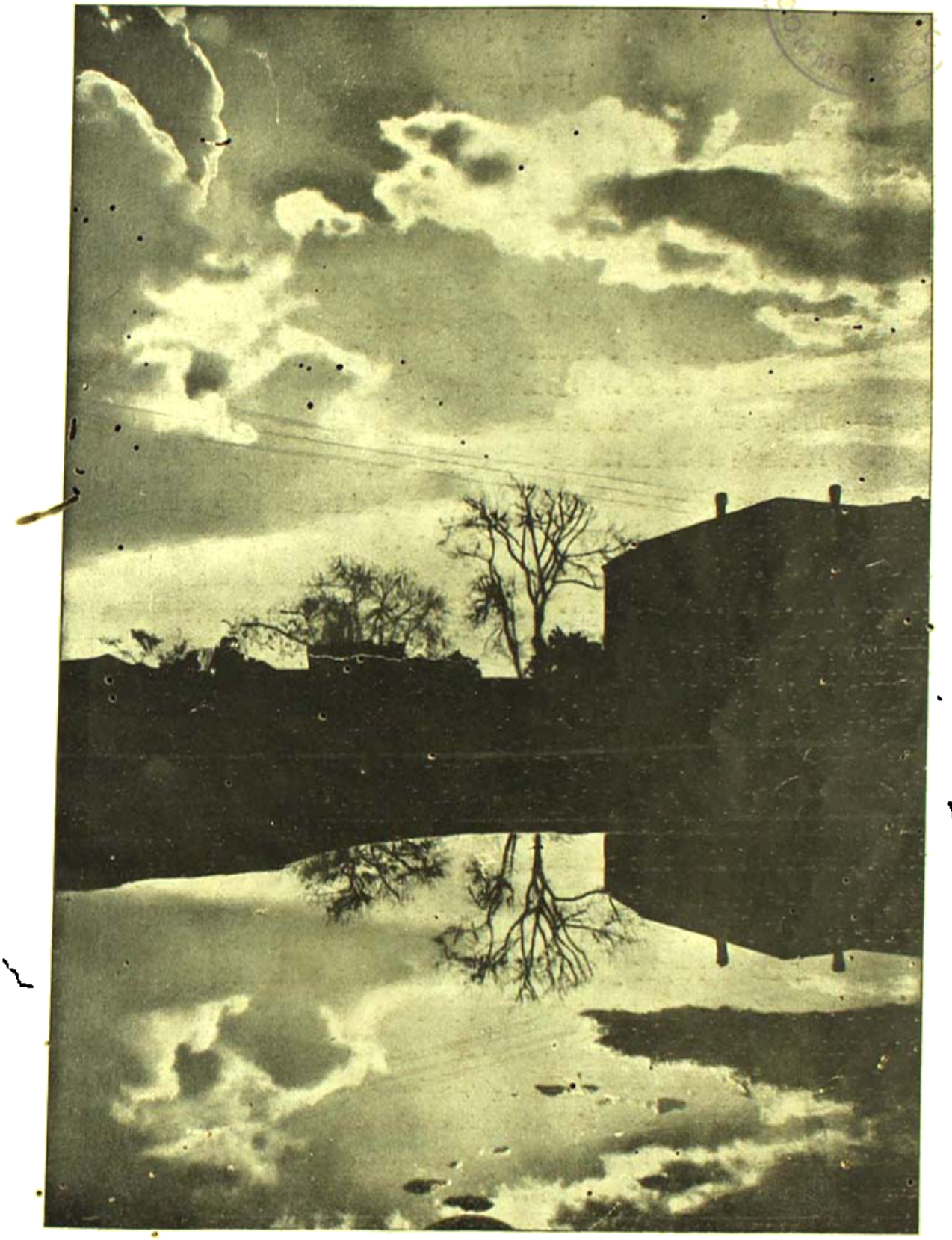

প্রকৃতির দর্পণ।— শিল্পী—অমর পালোধী, কলিকাতা।

উপরে : (বামে) শ্রীমতী চিয়াং-কাইশেক স্বয়ং চৈনিক সৈনিকদিগের ও আতপ্রার্থীদের জন্য জামা তৈয়ারী করিতেছেন (দক্ষিণে) তিব্বতের বড় লামা (পূর্ব্বে দাকার রাজা) ভারতবর্ষীয় শিল্পী জানওয়াল কৃষ্ণকে তিব্বতীয় মূর্ত্তি উপহার দিতেছেন

(নীচে) রেঙ্গের কর্পোরেশন গ্রেজেসেপ্তলস্ স্কোয়ার, বোহেমিয়ানের সম্রাটের রাজা ওয়েনেসেস্লস্-এর প্রস্তরমূর্ত্তি স্কোয়ারের সম্মুখে অবস্থিত। 'খৃষ্টমিলন' উপলক্ষে রাজার মূর্ত্তি বিশেষভাবে সজ্জিত হয়

সম্পত্তি বাটোয়ারা হইয়াছিল, সেই সম্পত্তিই বিক্রয় করিয়া এটর্নির প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে চাহিয়াছিল। শিক্ষিত পরিবার মধ্যে এই ভাবটা বেশী দেখা যায়। বর্ত্তমানে ঐ আদর্শের আবহাওয়া অশিক্ষিত পরিবার মধ্যেও দেখা দিয়াছে। আজ যাঁহারা এই আদর্শের সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাদের পুত্রগণও যে উক্ত আদর্শ অনুসরণ করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্ব স্ব ভাবটা ইংরেজ জাতিরই আদর্শ। কিন্তু ইংরেজ জাতির মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত গুণ আছে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার অনুসরণ করেন না; কেবল তাহাদের দাম্পত্য জীবনযাত্রারই অনুকরণ করেন—যাহা আমাদের সংসারে আদৌ খাপ খায় না। ইংরেজ জাতির সংসারে স্বামী-স্ত্রী ও নাবালক পুত্রকন্যা—আর বাঙ্গালী জাতির সংসারে মা, বাপ, ভাই, বোন, মাসি, পিসি প্রভৃতি অনেককে প্রতিপালন করিতে হয়। ইংরেজ জাতির প্রত্যেকে উপার্জ্জনক্ষম; যদি কেহ উপার্জ্জনক্ষম না হয়, তবে সাধারণ উপার্জ্জনে কেহ বিবাহ করে না। আর বাঙ্গালীর সংসারে হয়ত একজন রোজগার করে, দশজনে তাহার মুখাপেক্ষী। ইংরেজ জাতির মেয়েরা স্বাধীনভাবে রোজগার করে; আর বাঙ্গালীর ঘরের অনেক বিধবা হয় পিতার সংসারে, না হয় স্বামীর বংশের কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া জীবনযাপন করে।

বর্ত্তমানে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সাধারণের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। দেশের পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। আমাদের আর্য্যনারীগণ সকলেই বিদুষী ছিলেন। যাঁহারা মাতৃজাতি সন্তান পালন তাঁহাদের শিক্ষার বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু যেভাবে নারী-শিক্ষার প্রবর্ত্তন চলিয়াছে, যদি উহার আমূল পরিবর্ত্তন না হয়, তবে এতদিন বাঙ্গালীর সংসারে যে সুখশান্তি ছিল তাহা অতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে। এই বিলাতী আদর্শের শিক্ষায় নারীজাতি সংসারের গৃহিণী পদে ইস্তফা দিয়া স্বামীর বিলাসসঙ্গিনী হইয়া উঠিতেছে। হিন্দুজাতির মধ্যে এতদিন ডাইভোর্স ছিল না। বর্ত্তমানে আদালতে উহার মামলা পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার ফল যদি এইরূপই দাঁড়ায়, তবে এ জাতির জাহান্নমে যাওয়ার আর বেশী দেরী নাই।

আজকাল শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় শিক্ষিতা পাত্রী ছাড়া বিবাহ করিতে চাহেন না। কিন্তু বর্ত্তমান বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়বহুল সভ্যতার যুগে অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর আয়ে শিক্ষিতা স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হইলে ক্রমশ একটা অশান্তির সৃষ্টি হইয়া পড়ে! যে শিক্ষায় চরিত্র গঠন নাই, সংযম শিক্ষা নাই, যাহাতে ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দেয়, সবর্ণ অসবর্ণ যুবকযুবতীর মধ্যে অস্বাভাবিক প্রণয় সৃষ্টি হইয়া পড়ে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের মিলন না ঘটিলে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিতেছে, ইহাই কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা? যত দিন যুবক-যুবতীর চরিত্র গঠন শিক্ষা না হইতেছে, তত দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্র সহস্র ডিগ্রী লাভ করিয়াও জাতীয় উন্নতির কোন সাহায্য হইবে না।

ইংরেজ জাতির ব্যবসায়ে কোনপ্রকার প্রতারণা নাই। ইংরেজ জাতি ব্যবসাক্ষেত্রে কাহাকে ঠকাইয়া লাভ করিতে চাহে না। কোন মালের অভাব লইয়া খারাপ বা ভেজাল মাল, সরবরাহ—ইহা ইংরেজ ব্যবসায়ী কখনই করে না। এইজন্য ভারতের বাহিরের অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা ব্যবসাক্ষেত্রে ইংরেজের সুনাম বেশী। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়—যাঁহারা ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা লোককে ঠকাইয়া কি উপায়ে লাভ হইবে, এই উপায় উদ্ভাবনে সর্ব্বদা সচেষ্ট। এই সমস্ত কারণে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কোন ব্যবসায়ে জনসাধারণের বিশ্বাস নাই। এই কলিকাতা শহরে কতকগুলি বিবাহ, মৃত্যু বীমা কোম্পানী খুলিয়া পল্লীগ্রামের বহু দরিদ্র অনাথ বিধবার যে সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে লোককে চাকুরী দিবার প্রলোভন দেখাইয়া, মিথ্যা অফিস খুলিয়া কত লোকের নিকট হইতে টাকা ডিপজিট্ লইয়া কত লোককে ঠকান হইতেছে, তাহা প্রত্যেক দিনের সংবাদপত্রে "আইন-আদালত" কলমে সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

আইনকে ফাঁকি দিয়া সাধারণ লোককে ঠকাইবার অভিনব ফন্দি শিক্ষিত লোকের মাথায় যত সহজে আবিষ্কার হয়, সাধারণ অশিক্ষিত লোকের দ্বারা তাহা কখনই সম্ভব হয় না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভ্যতার চালচলন বজায় রাখিতে অভাব-অভিযোগের মাত্রা যত বেশী বৃদ্ধি পাইতেছে, দিন দিন অভিনব প্রতারণার কৌশল তত বেশী আবিষ্কার হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজ জাতির

বহুবিধ গুণের মধ্যে কেবলমাত্র ইংরেজের দাম্পত্য জীবন-যাত্রার আদর্শ অনুকরণে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হইতেছেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নেতাগণ দেশের স্বার্থ রক্ষায় পরস্পর সম্মিলিতভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন, আর বাঙ্গলার শিক্ষিত নেতাগণ নিজ নিজ স্বার্থের জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে দেশের স্বার্থ বলি দিতেছেন। সকল দেশের লোকের মধ্যে সাধারণ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। আর বাঙ্গলার শিক্ষিত সম্প্রদায় ঐ জাতীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠানেও নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। যে দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই প্রকার আদর্শ, সে দেশে অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে দোষ দিয়া লাভ নাই। যে দেশে পূর্ব্বকালে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইত, সে দেশের লোক এখন শিক্ষার প্রভাবে হাজার হাজার রেজিষ্টারী খত, বন্ধকী দলিল আদালতে উড়াইয়া দিতেছে। বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়-নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে না পারিলেও প্রতারণা বিদ্যায় তাঁহারা যে সমস্ত অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে যে নূতনত্ব কিছু নাই এমন কথা বলা যায় না।

যত দিন এই জাতীয় দুষ্ট মনোবৃত্তির সংশোধন না হইবে, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতি নাই। যত দিন না সাধারণ প্রতিষ্ঠানে পরস্পর মতের সামঞ্জস্য করিয়া সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে পারিবে, তত দিন এ জাতির কলঙ্ক দূর হইবে না। যত দিন বাঙ্গালীর প্রাণে জাতীয় স্বার্থের প্রেরণা না জাগিবে, তত দিন এ জাতি শক্তিহীন হইয়া থাকিবে। যতদিন বাঙ্গালী নিজ স্বার্থের চেয়ে জনস্বার্থের প্রতি অধিক সহানুভূতি সম্পন্ন না হইবে, তত দিন এ জাতির কোন কূলে স্থান মিলিবে না। বাঙ্গালী বিলাসিতা বিসর্জ্জন দিয়া যত দিন সহজ ও সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত না হইবে, তত দিন এ জাতির দরিদ্রতা কেবল বাড়িয়াই চলিবে। রাজনীতি-ক্ষেত্রেই বল, আর ব্যবসাক্ষেত্রেই বল, ঐকান্তিকভাবে সনষ্টিগত সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া এ জাতির উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

পাড়াগাঁয়ে

দিলীপকুমার

গাছের তলায় গান বাঁধছি—কৃষাণ এসে বসে এত কাছে—
কী এক ব্যথা লুকিয়ে ছিল—বিরাগ জেগে ওঠে মনের মাঝে।
চেয়ে দেখি : সাদা দাড়ি, মাথারো চুল সবই পাকা তার,
বিরল বস্ত্র দেহখানি শীর্ণ—চোখে দৃষ্টির নেই ধার।
ছোট্ট বুকের হাড়গুলো বার গোনা, ঠোঁটে কোমল হাসির রেশ,
মুখে দরদ—অনুতাপে শুধাই : মিঞা, কোথায় তোমার দেশ?
"হেথায়ই"।
"নাম?"
"কাসিম মিঞা বলে সবাই।"
"কি চাও?"
"কী চাই? মানে?"
হঠাৎ এসে কাছে বসার মানে যে কেউ চায় সে কি হায় জানে?
কয় না কথা—ঠায় চেয়ে রয়।
"দেখছ কী ভাই?"
"দেখব কী আর?—তোমায়।"
আমি হাসি, হাসে সেও···আলাপ সুরু হ'ল কথায় কথায়।

"কৃষাণ আমি। আছি হেথাই একশো বছর। সাতটি ছেলে মেয়ে।
একটি দূরে—ছ'টি নিলেন আল্লা।"
একাই চলে খেয়া বেয়ে।
হঠাৎ বলে: "মাটি হেথায় কাঁকরভরা—দিই না চাটাই পেতে?"
"দরকার নেই মিঞা, বোসো, গল্প বলো।"
"একটু তামাক খেতে—"
"তামাক আমি খাই না তো ভাই—"
"খাবার কিছু?"
"নেই যে ক্ষিধে—তবে
একটি গেলাস জল যদি দাও—" অবাক্ হ'য়ে চায় সে: সাধু কবে
মুসলমানের জল খেতে চায়! খুশি হ'য়ে কুঁড়ের গেল চ'লে।
মনটা ওঠে ভ'রে—ছায়ামের না ব্যথা ধীরে গেছে গ'লে!

পিতলের এক পাত্রে মিঞা মিছরীমিঠে টলটলে দুধ মুখে
ধরল আমার—আধেক স্নেহ আধেক কৌতূহলেরি কৌতুকে।
"দুধ এ যে ভাই!"
"কোথায়? একটু মিছরিগোলা সর্বৎ—নিন খেয়ে।
খাবার কিছু খেলেই হ'ত—বেলা হ'ল—" আবার হাসে চেয়ে।
"উঠি মিঞা?"
"ধুপ যে বড়—"
"অভ্যেস আছে।"
"না না, বেজায় কড়া—
ছাতা একটা দিই?"
"না মিঞা, দেখছ না এ-মাথায় টুপি-পরা?
দুধটি তোমার কী যে ভালো লাগল—ঠাণ্ডা, মিষ্টি, চমৎকার।
শান্তি যেন পাও ভাই—না দেখা যদি হয় আমাদের আর,
তোমার কথা ভুলব না—"
"কী বলেন সাধু! সেলাম।"
"নমস্কার।"
রয় চেয়ে তার, মুখে করুণ হাসি, চোখে দৃষ্টির নেই ধার।

সোনার আলোর ঘোড়া ছোটে, গাছ গান গায়—এ কী? কোথায় ব্যথা?
অরুণ স্নেহে ছায়ার মতই মিলিয়ে গেছে। উছল কৃতজ্ঞতা
ঢেউয়ে ঢেউয়ে উপ্‌ছে পড়ে।
একলা? কে নয়? তবু পথের 'পরে
এম্‌নি কত দরদ-ভরা দৃষ্টি-প্রদীপ রয় কে জেলে ধ'রে?

———

সাময়িকী

সতীশচন্দ্র বাগচী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অবৈতনিক অধ্যাপক ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী গত ১৮ই অক্টোবর কলিকাতার ক্যাম্বেল হাসপাতালে ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং দশ হাজার টাকা মূল্যের পুস্তক কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ডক্টর বাগচী জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহাদের বাড়ী নদীয়া জেলার শান্তিপুরে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পাশ করিয়া তিনি বিলাত গিয়াছিলেন এবং কেম্ব্রিজে ১৯০৫ সালে গণিতশাস্ত্রে ও ১৯০৬ সালে আইনে ট্রাইপস লাভ করেন; পরে তিনি কেম্ব্রিজ ও ডাবলিন উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এল-এল-বি উপাধি লাভ করিয়া ১৯০৯ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের প্রিন্সিপালের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' হইয়াছিলেন এবং ১৯৩১ সালে তাঁহাকে 'আশুতোষ মুখার্জ্জি লেকচারার' নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মধ্যে দুই বৎসরকাল (১৯৩১-৩২) ছুটি লইয়া তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। পদার্থ-বিদ্যা, গণিত, সাহিত্য ও আইন বিষয়ে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ডক্টর বাগচী বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ—

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ গত ২৩শে অক্টোবর রবিবার সকালে ৬৬ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহরক্ষা করিয়াছেন। গত ২৫শে এপ্রিল বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের সভাপতি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মৃত্যুর পর শুদ্ধানন্দজী সভাপতি হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনের পর স্বামী শুদ্ধানন্দ পঞ্চম সভাপতি:— প্রথম ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ (১৮৯৮—১৯২২); দ্বিতীয় স্বামী শিবানন্দ (১৯২২—১৯৩৪), তৃতীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ (১৯৩৪—১৯৩৭); চতুর্থ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (১৯৩৭এর মার্চ্চ হইতে ১৯৩৮এর এপ্রিল, ও পঞ্চম স্বামী শুদ্ধানন্দ (১৯৩৮এর মে হইতে অক্টোবর)। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বামী শুদ্ধানন্দের জন্ম হয়; সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বি-এ ক্লাসে পড়িবার সময় তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য হন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত ইংরেজী গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন; পাঁচ বৎসরকাল রামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত উদ্বোধন মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন; ১৯২৭ হইতে ১৯৩৪ পর্য্যন্ত তিনি মিশনের সম্পাদক ছিলেন; পরে তিনি মিশনের সহ-সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটী ও ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল। তিনি মিশনের ভারতস্থ সকল শাখা কেন্দ্রে গমন করিয়া সকল স্থানের কার্য্যধারার সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত কর্ম্মী জগতে অসাধারণ।

সম্রাট সহোদরের চাকরী গ্রহণ—

পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র এবং বর্ত্তমান সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের ভ্রাতা 'ডিউক অফ কেন্ট' সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই নভেম্বর মাসেই তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। তাঁহার পত্নী এবং পুত্রকন্যাগণ তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। ডিউকের বর্ত্তমান বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র। ১৯৩১ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ১৯৩৪ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দক্ষিণ আমেরিকায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে গ্রীসের প্রিন্স নিকোলাসের কন্যাকে তিনি বিবাহ

করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা আছে। রাজপরিবারে এইরূপ উচ্চ রাজকার্য্য গ্রহণ এই প্রথম। তিনি দুই-তিন বৎসরকাল অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূতপূর্ব্ব সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড ইংলণ্ডে বাস করেন

'ডিউক অফ কেণ্ট'

না। এখন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ ব্যতীত মাত্র তৃতীয় ভ্রাতা 'ডিউক অফ গ্লষ্টার' ইংলণ্ডে থাকিবেন; তাঁহাকেই রাজ-প্রতিনিধি হিসাবে বহু রাজকার্য্য করিতে হইবে।

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী—

যুক্তপ্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য কাশীবাসী ডাক্তার ভগবানদাস সম্প্রতি পদত্যাগ করায় কেন্দ্রীয় পরিষদের যে সদস্যপদ শূন্য হইয়াছিল, এলাহাবাদের প্রবাসী কৃতী বাঙ্গালী শ্রীযুত আর-এন-বসু বিনা বাধায় সেই পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তাঁহার দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাধাশ্যাম পাঠক ও লালবিহারী শাস্ত্রী উভয়েই নিজ নিজ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীযুত আর-এন-বসু এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান। বাঙ্গালার বাহিরে একজন বাঙ্গালীর এইরূপ অসাধারণ সম্মান প্রাপ্তিতে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরবানুভব করিবেন।

কুমার সত্যমোহন ঘোষাল—

ভূকৈলাস রাজবংশের অন্যতম সন্তান কুমার সত্য-মোহন ঘোষাল গত ২০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের অন্যতম ট্রাষ্টি ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁহার নিকট বাট হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কুমার সত্যমোহন সেই ঋণের টাকার দাবী ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গত বার বৎসরকাল দেশবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের অন্যতম ট্রাষ্টী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন।

আসামে নূতন মন্ত্রিসভা—

আসামে পুরাতন মন্ত্রিসভার পতনের পর কংগ্রেস দল হইতে যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত আট জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে; দুইজন উচ্চ জাতির হিন্দু, দুইজন তপশীলভুক্ত জাতির প্রতিনিধি, একজন পার্ব্বত্য জাতির প্রতিনিধি ও তিনজন মুসলমান—এই ৮ জনকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই কংগ্রেসের নীতি অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিবেন। নিম্ন-লিখিত ভাবে মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে কার্য্য বণ্টন করিয়া লইয়াছেন—(১) প্রধান মন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলই—শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ, (২) ফকরুদ্দীন আলি আমেদ—রাজস্ব ও অর্থবিভাগ, (৩) কামিনীকুমার সেন—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, বিচার ও আইন বিভাগ, (৪) অক্ষয়কুমার দাস—কৃষি ও আবগারী বিভাগ, (৫) রামনাথ দাস—চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও শ্রমবিভাগ, (৬) রূপনাথ ব্রহ্ম—বন ও রেজিষ্ট্রেসন বিভাগ, (৭) আলী হায়দার খাঁ—পূর্ত্তবিভাগ, (৮) মামুদ আলী—শিল্প ও সমবায় বিভাগ। ইতিমধ্যে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী নেতা: নিকোলাস রায়ের দলের তিনজন সদস্য, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রোহিনী চৌধুরীর দলের তিনজন সদস্য ও মুসলেম লীগ দলের তিনজন সদস্য কংগ্রেসী দলে যোগদান করায় নূতন মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। নূতন মন্ত্রীরা কম বেতন লইতে সম্মত হইয়াছেন এবং মন্ত্রীদের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বেতনের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থের যাহা উদ্বৃত্ত হইবে,

তাহা তাঁহারা বস্ত্রাদির সাহায্য করে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রায় সকল প্রদেশেই ক্রমে কংগ্রেসদল কর্তৃক সমিতি গঠিত হইতেছে।

শিল্প পরিকল্পনা সমিতি—

এবার কংগ্রেস হইতে ভারতের জাতীয় শিল্পগুলির উন্নতি বিধানের উপায় নির্ণয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিছু দিন হইতে রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং সম্প্রতি তিনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি 'জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা সমিতি' গঠন করিয়াছেন—(১) সার এম বিশ্বেশ্বরাচার্য্য, (২) ডক্টর মেঘনাদ সাহা, (৩) সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, (৪) শ্রীযুত অম্বালাল সারাভাই, (৫) অধ্যাপক কে-টি-সাহা, (৬) বোম্বাইয়ের তুলা-গবেষণাগারের ডক্টর নাজির আনেদ, শ্রীযুত এ-ডি-শ্রফ, (৮) মিঃ এ-কে-সাহা ও (৯) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ডি এস ক্রবে। সুভাষচন্দ্র এই সমিতিতে আরও একজন রাসায়নিক পণ্ডিতকে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে এই সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস, পণ্ডিতজী এ পদ গ্রহণ করিবেন। ভারতের যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস শাসন প্রচলিত হইয়াছে, অন্তত সেই সকল প্রদেশ যে এই সমিতির নির্দ্ধারণ মত কার্য্যে অগ্রসর হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ বিশেষজ্ঞ কমিটীর নির্দ্দেশ মত কাজের জন্যও আশা করি এ দেশে অর্থের অভাব হইবে না।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। আমরা নিম্নে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিয়াছেন—"ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র একটা ভীতি ও অসন্তোষের ভাব দেখা গিয়াছে। ইউরোপের কোথাও জনগণ সুখে আছে বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও ভবিষ্যতের জন্য ভীতি দেখা যাইতেছে। অধিকাংশ দেশেই শাসন ক্ষমতাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান রাজনৈতিকদলগুলির বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন মনোভাব বিরাজ করিতেছে। ঐ সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি নিজেদের পক্ষে ব্যাপকভাবে পরস্পর-বিরোধী যে সকল প্রচারকার্য্য চালাইতেছে, তৎপ্রতি জনগণের খুব কমই আস্থা আছে বলিয়া মনে হয়। স্কান্দিনেভিয়ান দেশসমূহ (ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড) ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য সকল দেশে জন-সাধারণের মধ্যে ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা অনিশ্চিতের ও উদ্বেগের ভাব পরিলক্ষিত হয়।" সুনীতিবাবু যে অবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে ইউরোপে একটা ব্যাপক যুদ্ধের সূচনা করিতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা কি সত্যই তবে একদিন মহাযুদ্ধের ফলে বিলুপ্ত হইবে?

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু—

গত ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায়

নগেন্দ্রনাথ বসু

তাঁহার জন্ম হয়। প্রথম যৌবনে তিনি 'তপস্বিনী' ও 'ভারত' নামক দুইখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছেন। তাহার পর দর্জ্জিপাড়া থিয়েটার ক্লাবের জন্য তিনি 'শঙ্করাচার্য্য' ও

'পার্শ্বনাথ' নাটক রচনা করেন। উনিশ বৎসর বয়সে বিশ্বকোষ সম্পাদনের ভার নগেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বকোষ সম্পাদনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি সম্প্রতি বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতেছিলেন; কিন্তু সে কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ হিন্দী ভাষাতেও বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহা সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্য পরিষদের জন্য তিনি বহু গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল; তিনি পুরাতত্ত্ব সঙ্কলন, প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধার ও পুরাতন পুঁথি সংগ্রহের জন্য বহু অর্থব্যয়ও করিয়াছিলেন। প্রাচ্যতত্ত্বে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্যই তাঁহাকে 'প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব' উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। নগেন্দ্রবাবু কিছুকাল ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ময়ূরভঞ্জে চাকরী করিবার সময় তিনি যে সকল পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার করেন তিনি সেগুলি গ্রন্থাকারে পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে ইতিহাস শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। বসু মহাশয় বহুদিন কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ১৯৩৭ সালে তাঁহার একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার দেহ ও মন আদৌ ভাল ছিল না। মহাত্মা গান্ধী হিন্দী বিশ্বকোষ দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ১৯২৯ সালের ২রা জানুয়ারী নিজে গিয়া বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বাটীতে সাক্ষাত করেন। নগেন্দ্রনাথ তখন রোগ শয্যায়—গান্ধীজি সেইখানেই নগেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবু যে ধরণের পণ্ডিত, এ-দেশে ক্রমে সেই প্রকৃতির পণ্ডিতের অভাব দেখা যাইতেছে। বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ যাহাতে উপযুক্তভাবে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়, বাঙ্গালী জাতি তাহার ব্যবস্থা করিলেই নগেন্দ্রবাবুর প্রতি 'যোগ্য' সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা—

'ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে' সে সম্বন্ধে সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী তাঁহার হরিজন পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই বিষয় লইয়া যাঁহারা বিতর্ক করিতেছিলেন তাঁহাদের সেই বিতর্কের অবসান হইবে সন্দেহ নাই। গান্ধীজি বর্ত্তমান হিন্দী বা উর্দ্দু কোন ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন না। তিনি 'হিন্দুস্থানী' নামক এক অদ্ভুত ভাষাকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিতে চাহেন; সেই 'হিন্দুস্থানী' ভাষা কি অক্ষরে লিখিত হইবে সে বিষয়েও এখন পর্য্যন্ত গান্ধীজি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। গান্ধীজি লিখিয়াছেন—'কংগ্রেস যে হিন্দুস্থানীর কল্পনা করিয়াছে সে ভাষা এখনও রূপ পরিগ্রহ করে নাই। কংগ্রেসের সভা-সমিতি ও কার্য্য বিবরণী যে পর্য্যন্ত আগাগোড়া কেবলমাত্র হিন্দুস্থানীতে পরিচালিত না হয়, হিন্দুস্থানীর প্রকৃত গঠন সে পর্য্যন্ত সম্ভব নহে।' যে ভাষার বর্ত্তমানে অস্তিত্ব নাই, হরফ নাই, সে ভাষা যে কি করিয়া ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। যে ভাষায় কোন কোন প্রদেশের কোন কোন লোক কথা বলে, সেই ভাষা কি সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। গান্ধীজির প্রবন্ধ হইতে তাঁহার রাষ্ট্রভাষার রূপ স্পষ্ট বুঝা যায় না। সেইজন্য একদিকে যেমন হিন্দী বা উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতেছে, অন্য দিকে সেইরূপ বাঙ্গালা যাহাতে রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হয় সে-জন্য সমগ্র ভারতে ব্যাপক আন্দোলন হওয়া উচিত। হিন্দী প্রচার সমিতির মত বাঙ্গালা দেশে 'বাঙ্গালা প্রচার সমিতি' গঠন করিয়া সমগ্র ভারতে তাহার পক্ষ হইতে আন্দোলন ও প্রচার কার্য্য করিতে হইবে। শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির মত যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া কার্য্য করা উচিত। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

সংখ্যক লোক যে বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাজেই বাঙ্গালার মত একটী জীবন্ত ও ক্রমবর্দ্ধমান ভাষা যদি ভারতের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রভাষা নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে না বা রাষ্ট্রভাষার সাহিত্য রচনার জন্য নূতন করিয়া উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন হইবে না। আমরা বাঙ্গালী জাতিকে এ বিষয়ে অবহিত হইয়া সত্বর এই কার্য্যে অগ্রণী হইতে অনুরোধ করি।

সুকুমার বসু—

মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ সুকুমার বসু আই-সি-এস মোটর দুর্ঘটনায় কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাণ হারাইয়াছেন। বিক্রমপুরের মালখানগর গ্রামের বসু বংশে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত সন্তোষের রাণী ৺দিনমণি চৌধুরাণীর গৃহে সুকুমারের জন্ম হয়। সুকুমারের পিতা ৺নলিনীকুমার বসু রাণী দিনমণির দৌহিত্র ছিলেন। ১৯১৯এ বি-এসসি পাশ করিয়া সেই বৎসরই সুকুমার বিলাত গিয়াছিলেন এবং পর বৎসর আই-সি-এস পাশ করেন। সে বৎসর বাঙ্গালীদের মধ্যে একমাত্র সুকুমারই আই-সি-এস হন। ১৯৩৪ সালে ছুটি লইয়া সুকুমার ইউরোপের নানাস্থানে ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন।

৺সুকুমার বসু

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সুকুমার সাগর জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ হইয়াছিলেন। সুকুমার বেলুড় মঠের স্বামী সারদানন্দের শিষ্য ছিলেন। সুকুমারের মাতা স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাগিনেয়ী।

করাচীতে দুর্গোৎসব—

অন্যান্য বারের ন্যায় এ বৎসরও করাচী প্রবাসী বাঙ্গালীরা সমারোহের সহিত দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায়

করাচীর প্রতিমা

যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই দেখিবার মত হইয়াছিল। প্রবাসী কয়েক ঘর বাঙ্গালীর এই চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। আমরা এই সঙ্গে তাঁহাদের মাতৃমূর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করিলাম।

রাজবন্দীদের মুক্তিদান—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান স্বরাষ্ট্র-সচিব গত দুর্গাপূজার ঠিক পূর্ব্বেই (২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে) দমদম জেল ও আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে এক সঙ্গে পঞ্চাশজন রাজনৈতিক

বন্দীকে তাঁহাদের দণ্ডকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুক্তিদান করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল রাজনীতিক বন্দীর দণ্ডকাল শেষ হইতে আঠার মাসের অধিক বিলম্ব ছিল না, তাহাদের সকলকেই নাকি ঐদিন মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। শুনা যায় তাহার পরও শুধু দমদম জেলে সেদিন পঞ্চাতাল্লিশ জন রাজনীতিক বন্দী ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের প্রশংসা করিতে হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা দরকার যে বাঙ্গালার রাজনীতিক বন্দী-দিগকে মুক্তিদান সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিবের সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা ফলবতী হয় নাই। স্বরাষ্ট্রসচিব গান্ধীজির পরামর্শে সম্মত না হওয়ায় গান্ধীজি সে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখনও যে বাঙ্গালা দেশে বহু রাজনীতিক বন্দী আটক আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন দ্বারা দেশে নূতন শাসন-ব্যবস্থার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইলে সকল রাজবন্দীকেই মুক্তি দেওয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। যতদিন না সে ব্যবস্থা হয়, ততদিন দেশবাসী কখনই বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত নূতন সাপ্তাহিক 'বাঙলার কথা'তে মন্ত্রী খাজা সার নাজিমুদ্দীনের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও জনগণের ধারণা পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

কেশবচন্দ্র শততম বার্ষিকী—

বাঙ্গলা দেশ শতবর্ষ পূর্ব্বে যে তিনজন মহাপুরুষের জন্মে ধন্য হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের শততম বার্ষিকী উৎসব দেশবাসী বিশেষ উৎসাহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বাকী শুধু রহিয়াছে—কেশবচন্দ্র শততম বার্ষিকী উৎসব। এইবার তাহাও সম্পাদিত হইতে চলিল। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম আগামী ১৯শে নভেম্বর হইতে কেশবচন্দ্র শততম বার্ষিকী উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। কেশবচন্দ্র বাঙ্গালা দেশে একজন অসাধারণ মনস্বী পুরুষ এবং অদ্ভুত কর্ম্মা ব্যক্তি ছিলেন। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি শিক্ষা, কি অস্পৃশ্যতা বিরোধী প্রচেষ্টা, কি ধর্ম্ম সমন্বয়, মাদকতা নিবারণ, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, সংবাদপত্র প্রচার, স্ত্রীশিক্ষা, জনশিক্ষা, সাহিত্য সেবা প্রত্যেক বিষয়েই তিনি ছিলেন অগ্রদূত এবং সংস্কারপন্থী। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা ছিল অতুলনীয়। তাঁহার বাঙ্গলা বক্তৃতা ও উপদেশসমূহ এক সময়ে কথিত বাঙ্গলার আদর্শ রূপে গৃহীত হইয়াছিল। সেকালে কেশবচন্দ্রের প্রভাব সমাজের সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচারিত ছিল। বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার নামে গৌরববোধ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রের

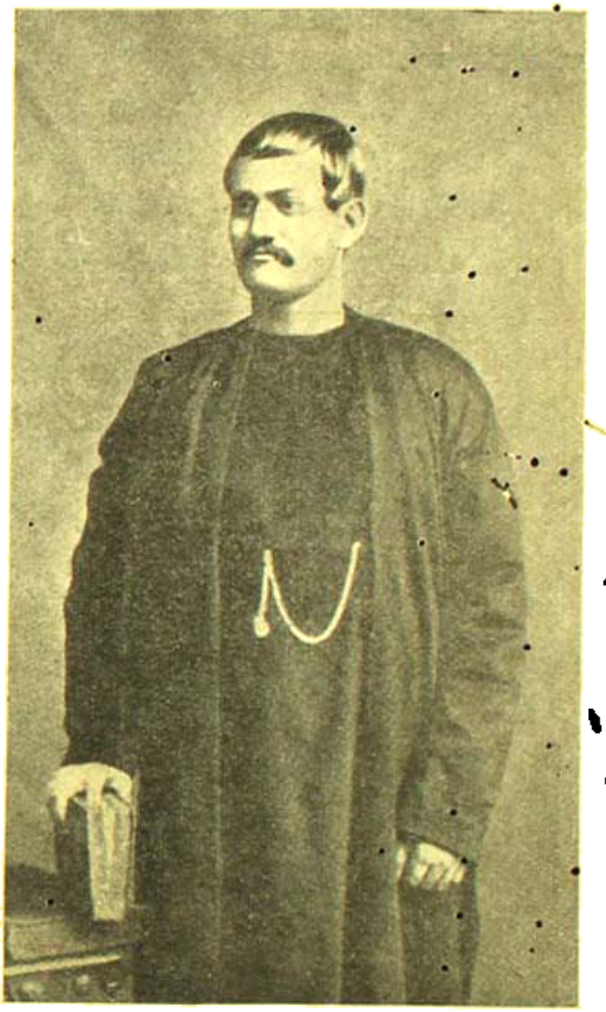

কেশবচন্দ্র সেন

বক্তৃতা শুনিতে ভালবাসিতেন এবং তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার পরিচয় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে ও গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের দিক্ দিয়া কেশবচন্দ্র ছিলেন একজন দিক্‌পাল! তাঁহার বাগ্মিতা, তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলী আজ তাহার সাক্ষী দিতেছে। কেশবচন্দ্র স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তক, ধর্ম্মপ্রচারক, দেশ-

প্রেমিক এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাধু মহাপুরুষ রূপে বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরদিন বরণীয় হইয়া থাকিবেন। কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং আদি, সাধারণ ও নববিধান সমাজের ব্রাহ্মগণ দেশবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া কেশবচন্দ্রের শততম বার্ষিকী উৎসব করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আশা করি বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই এই মহাপুরুষের শততম বার্ষিকী উৎসবের ব্যবস্থা হইয়া দেশবাসী এই বরেণ্য মহাপুরুষের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবেন।

মাদ্রাজে দুর্গোৎসব—

এ বৎসরও মাদ্রাজপ্রবাসী বাঙ্গালীদের দুর্গোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। 'কেদার রায়' ও 'বন্ধু' নাটক অভিনীত হইয়াছে। এ দেশে দুর্গোৎসবের প্রচলন না থাকিলেও শহরের বহু গণ্যমান্য নরনারী পূজায় যোগদান

মাদ্রাজের দুর্গা

করিয়াছিলেন। প্রত্যহ পূজার্চ্চনার পর নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার দ্বারা বাংলার পূজাবাড়ীর বৈশিষ্ট্যটুকু ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল। প্রতিমার রূপ দিয়াছেন নিপুণ চিত্র-শিল্পী ও ভাস্কর শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রচন্দ্র নাগ।

দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

মৃদঙ্গাচার্য্য পণ্ডিত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তিরোধানে ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রের যে ক্ষতি হইল তাহা বর্ণনাতীত। মৃদঙ্গ বাদ্যের উৎকর্ষ সাধন, প্রচার এবং এই বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। প্রাতঃস্মরণীয় মৃদঙ্গবিশারদ ৺মুরারি গুপ্ত মহাশয়ের তিনি শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় জীবনব্যাপী গুরুর আদর্শ রক্ষা করিয়া দেশবরেণ্য হইয়াছিলেন। দুর্লভ-বাবু হাওড়া জেলার সাঁত্রাগাছী গ্রামনিবাসী স্ব-ধর্ম্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ নন্দলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার সঙ্গীতানুরাগ দৃষ্ট হয়।

দুর্লভ ভট্টাচার্য্য

মৃদঙ্গবিদ্যায় যথারীতি শিক্ষিত ও পারদর্শী হইয়া তিনি গুরুর সহিত দেশ বিদেশে বহু সঙ্গীত সভায় গমন করেন এবং শিবনারায়ণ মিশ্র, কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, অঘোর চক্রবর্ত্তী, লছমীপ্রসাদ এবং সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভারতীয় শ্রেষ্ঠ গুণিগণের সহিত সঙ্গত করিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেনারস নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন, চট্টগ্রাম আর্য্যসঙ্গীত সমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মেলন, বগুড়া সঙ্গীত সম্মেলন প্রভৃতি বিশিষ্ট সম্মেলনে গিয়া তাঁহার অসাধারণ বাদ্য-নৈপুণ্যে অসংখ্য শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করেন। তিনি নিরহঙ্কারী, উদারচেতা এবং অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁহার অর্জ্জিত অমূল্য বিদ্যা অসংখ্য ছাত্রগণকে অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। ১২৭৮ সালে ফাল্গুন মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং গত আশ্বিন মাসের ২৪শে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে একটী সঙ্গীত আসরে নৃত্যসঙ্গতকালে পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করি।

কামাল আতাতুর্ক—

তুরস্কের গণতন্ত্রের সভাপতি গ্যাজি মুস্তাফা কামাল গত ১০ই নভেম্বর সকাল ৯টার সময় ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম

কামাল আতাতুর্ক

তুরস্ক গণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং পর পর ১৯২৭, ১৯৩১ ও ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দেও পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কামাল পাশা অতি সাধারণ অবস্থায় দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি জেনারেল পদ লাভ করেন এবং তাহার পর সন্ধির সর্ত্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তুরস্কের স্বাধীনতা অর্জ্জন করেন। লোঁজা সন্ধিতে তুরস্ক পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। মহাযুদ্ধের সময়েই তিনি 'জাতীয় পরিষদ' গঠন করেন। তাঁহার সময়ে তুরস্ক নবজীবন লাভ করিয়াছে। বেশ পরিধান প্রথা চলিয়া গিয়াছে. মহিলাগণ তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার পাইয়াছেন, ধর্ম্মযাজকদের প্রতিপত্তি কমিয়া গিয়াছে, জমীর মালিক কে তাহা স্থির হইয়াছে, শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে, ল্যাটিন লিখন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তুরস্কের যে প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়াছিল কামাল কয়েক বৎসরে তাহা ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তিনি জাঁকজমকের জীবন যাপন করিতেন না, সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতেন, মোটরে না চড়িয়া যথাসম্ভব অধিক পদব্রজে যাতায়াত করিতেন, সাধারণ লোকের সহিত একত্র বসিয়া সাধারণভাবে আহার করিতেন—সেজন্য তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার গৃহে ধনীরা অপেক্ষা দরিদ্রেরাই অধিক সত্বর প্রবেশাধিকার পাইত। তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বহু বৎসর পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছিল; তাঁহার সন্তানাদি ছিল না, সেজন্য তিনি কয়েকটি মেয়েকে 'পালিতা-কন্যা'রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দেশকে পাশ্চাত্য প্রথায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং সকল প্রকার পাশ্চাত্যভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে এই প্রকৃতির মানুষ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাঁহার মৃত্যুতে তুরস্কের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তুরস্কবাসীরা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অনুভব করিবে।

STUDENTS' P. G. A COMMON ROOM

শ্রীযুত বিমলচন্দ্র গাঙ্গুলী বি-ই, এ-এম-আই-ই
কলিকাতা কর্পোরেশনের নব নিযুক্ত এসেসার

দুই বৎসরের শিশুর মুখে ভাবের খেলা। মনে মনে একটি বিশিষ্ট ভাব কল্পনা করে তাকে মুখ চোখের ও দেহের ভঙ্গীতে প্রকাশ কোরতে পারা। এটা কম শক্তি—নয়। লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, বালকটির ভঙ্গীতে কোথাও জড়তা, অস্বচ্ছন্দতা বা আড়ষ্টভাব নেই। ভবিষ্যৎ অভিনেতার আভাস পাই।—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

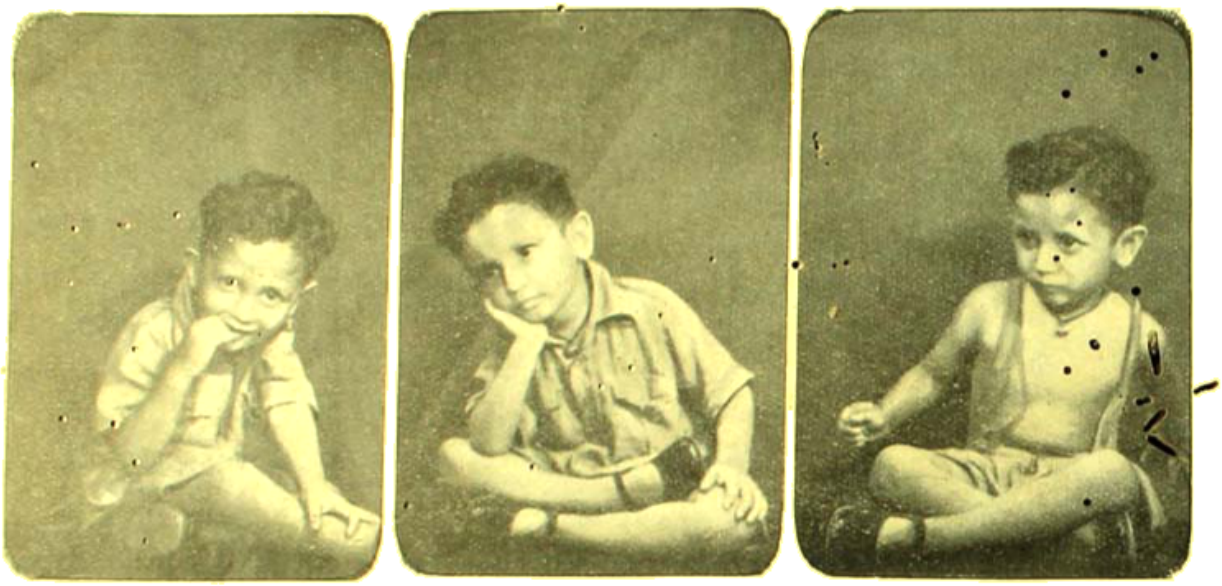

ক্রুর সম্বর

ছবি—কাঞ্চনমুখোপাধ্যায়

প্রভাের ভঙ্গী :-

আনন্দ

শিল্পী—কুমারী অরুণি গঙ্গোপাধ্যায়

আরতি মুদ্রা

প্রতিশোধ

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

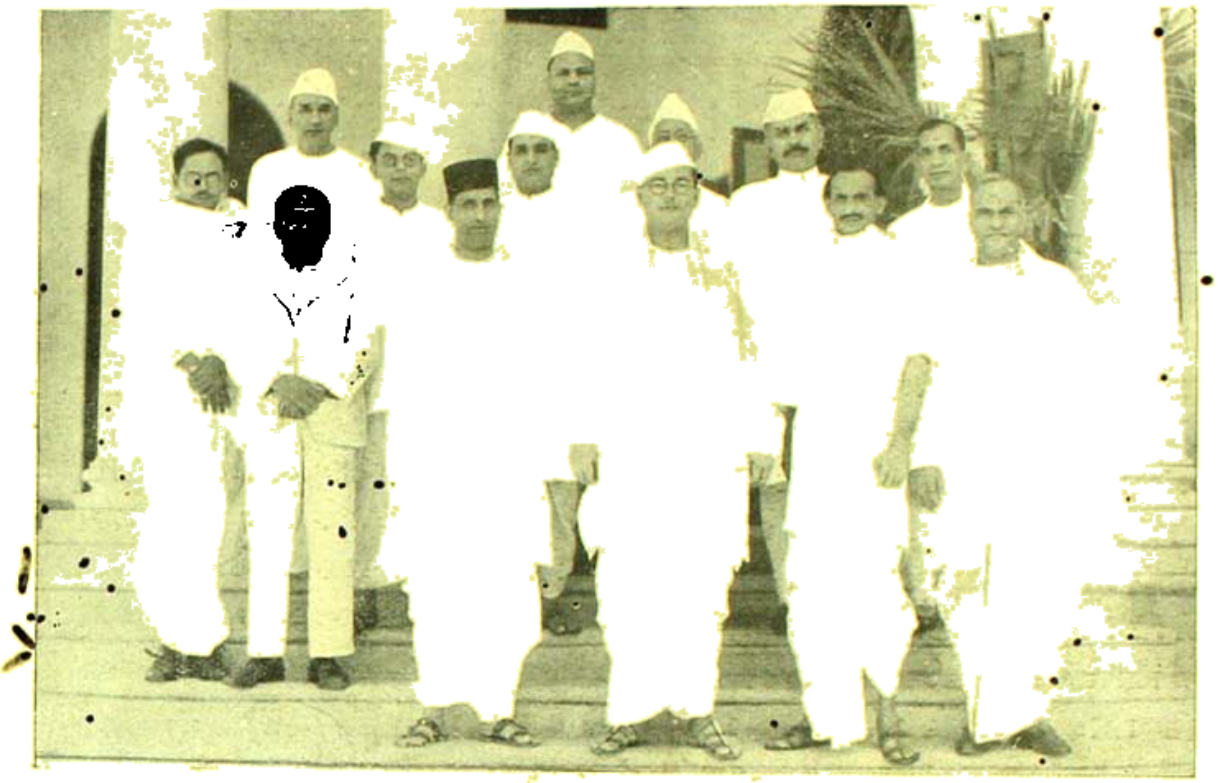

চেকোশ্লোভাকিয়ার মৃতপূর্ব প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড বেনেস ও প্রথম প্রেসিডেন্ট ডক্টর টমাস গ্যারিক্ ম্যাসারিক্, যিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৮৮৫ থেকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ইনি প্রেগ ইউনিভার্সিটির দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার বাণী রচনা করিয়াছিলেন

শিল্পী—রমেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

চেকোশ্লোভাকিয়ার হোয়াইট লাইন। এক সময় বোহেমিয়ান রাজবংশ ও বিশিষ্ট লোকের আবাসস্থান ছিল। মধ্যে সেণ্ট ভিটাস্ ক্যাথিড্রাল দৃষ্ট হইতেছে। ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট এডওয়ার্ড বেনস্ এই প্রাসাদের বামপার্শ্বের অংশভাগে বাস করিতেন

অষ্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেষ্ট ঃ

সীডনেতে বার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে অষ্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে ৫-৩ গোলে আই এফ এ দলকে হারিয়ে দিয়ে তাদের 'রাবার' পাবার পথ সুগম ক'রে নিল। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম বার মিনিটের ভেতরই পর পর দু'খানা গোল চাপিয়ে দেয়। মাত্র তিন মিনিট খেলার পরেই হুরেসের পাশ থেকে কুইল বা পায়ে চমৎকার সট ক'রে একটি গোল পরিশোধ করে। আট মিনিট পরে ক্রাউন হার্টের পাশ থেকে অষ্ট্রেলিয়া পক্ষে হুরেস্ হেড দিয়ে আর একটি গোল দেয়। এর একটু পরেই দূরের পাশ থেকে লামস্‌ডেন first timed shot ক'রে একটি চমকপ্রদ গোল দেয়। বিশ্রামের সময় অষ্ট্রেলিয়া ৩-২ গোলে এগিয়ে থাকে। খেলা পুনরায় আরম্ভ হবার দু'মিনিট পরেই ব্র্যাগাণ্ট কুড়ি গজ দূর থেকে সট্ মেরে পক্ষকে পরাভূত

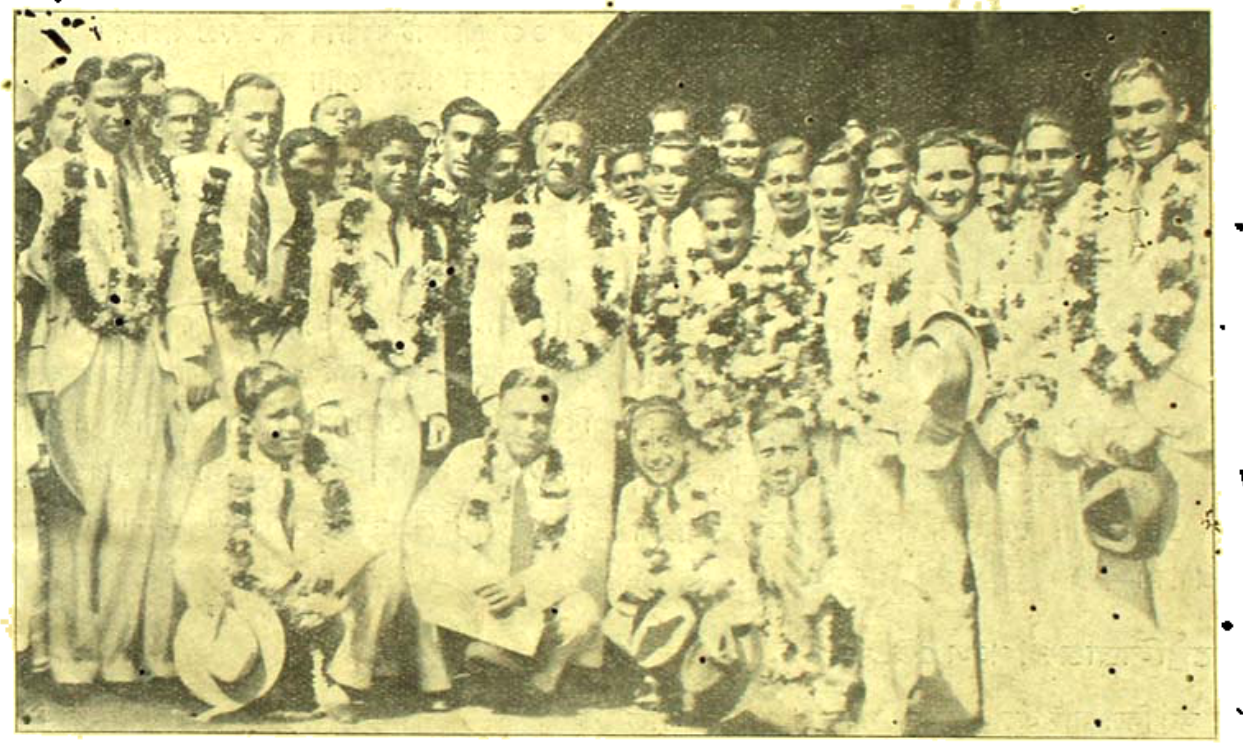

হাওড়া ষ্টেশনে অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যাগত আই এফ এ ফুটবল দলের সম্বর্ধনা — ছবি—কে কে সান্যাল

প্রথম গোল করলে। ব্যাকেদের বোঝাপড়ার ভুলের জন্যই এই গোলটি হয়। বার মিনিটের সময় ওসবর্ণ গোলের সামনে বলটা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে উইলকিন্‌সন্ দৌড়ে এসে চলন্ত বলের ওপর সট্ ক'রে দ্বিতীয় গোল দিলে। এবার আই এফ এ দল আক্রমণ সুরু করে, ১৮ মিনিটের সময় রহিম পাশ্ দেয় প্রসাদকে। প্রসাদ কঠিন angle থেকে করে। এরপর উইলকিন্‌সন্ দলের পঞ্চম বা শেষ গোলটি দেয়। অনেক দর্শকের মতে তার হাণ্ডবল হয়েছিল। তিন গোল পিছিয়ে থেকেও আই এফ এ প্রবল বেগে আক্রমণ আরম্ভ করে এবং লামস্‌ডেন পর পর দুটি গোল পরিশোধ করে; একটি গোল হয় পেনালটি থেকে, আর একটি হয় ভট্টাচার্য্যের চমৎকার পাশ থেকে। আই এফ এ

দল শেষ-পর্য্যন্ত চেপে থেকেও শেষ গোলটি পরিশোধ ক'রতে সক্ষম হয়নি। রহিম ছটি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে আই এফ এ দল বিজয়ী হতে পারতো। অষ্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের নৈতিক শক্তির প্রয়োগও আই এফ

২২০ গজ 'হেট ষ্ট্রোক' বিজয়ী পি মল্লিক

ছবি—জে কে সান্যাল

এ দলের সাফল্যের পথে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি ক'রেছিল। আই এফ এ :—দত্ত; দাসগুপ্ত, ছুন্না খাঁ; নন্দী, বীরেন সেন ও প্রেমলাল; হুরমহম্মদ, রহিম, লামস্‌ডেন, ভট্টাচার্য্য ও প্রসাদ।

অষ্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেষ্ট :

অষ্ট্রেলিয়া-আই এফ এ দলকে পঞ্চম বা শেষ টেষ্ট ম্যাচে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে 'রুবার' পেয়েছে। খেলা হ'য়েছিল পৃথিবী বিখ্যাত মেলবোর্ণ ক্রিকেট গ্রাউণ্ডে। দর্শক পাঁচ হাজারের কিছু উপর। আবহাওয়া ও মাঠের অবস্থা খুব ভাল। আই এফ এ দল নেমেই আক্রমণ সুরু করে। চৌধুরী, রহিম ও লামস্‌ডেনের সট্ মরগ্যান সুন্দরভাবে প্রতিরোধ করলে, ভট্টাচার্য্যের একটা কঠিন সট্‌ও চমৎকার বাঁচালে। ওদিক থেকে হোয়াইট হেড্ দিয়ে উইলকিন্‌সনকে বলটা দিলে তাঁর সট একটুর জন্যে পোষ্টের উপর দিয়ে চ'লে গেলো। আবার আই এফ এ দল প্রবলভাবে আক্রমণ করলে। চৌধুরী ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে বল পেয়ে কৌশলে বিপক্ষকে কাটিয়ে গোলের কাছে পৌছেও শেষ রক্ষা ক'রতে পারলে না। চৌধুরী, ভট্টাচার্য্য ও লামস্‌ডেনের সঙ্গে সুন্দর আদান-প্রদান ক'রে গোলের নিকটে গিয়ে লামস্‌ডেনকে পাশ ক'রলে লামস্‌ডেন চমৎকার ভাবে বল গোলে মারলে, কিন্তু মরগ্যান অত্যাশ্চর্য্যরূপে গোল বাঁচালে। দশ মিনিটকাল প্রবল আক্রমণেও কোন ফল হলো না। অষ্ট্রেলিয়া দল এবার আক্রমণ সুরু করলো। হজেস হোয়াইটকে চমৎকার পাশ দিলে, কিন্তু বিমল সুকৌশলে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিলে। এরপর মরগ্যান রহিমের কাছ থেকে আর দত্ত উইলকিনসনের কাছ থেকে দুটো কঠিন সট্ আটকালে। লামস্‌ডেনের চমৎকার সট ও চৌধুরীর সট মরগ্যান অতি কষ্টে বাঁচালে। হাফ টাইমের সময়ে কোন পক্ষেই গোল হয়নি। খেলারম্ভে ভারতীয় দল আক্রমণ সুরু করলে। প্রেমলালের কাছ থেকে বল পেয়ে চৌধুরী ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ে কর্ণার থেকে লামস্‌ডেনকে ব্যাক পাশ করলে লামস্‌ডেন গোল দেয়। অল্পক্ষণ পরেই ম্যাকিভার ও হজেস আদান-প্রদান ক'রে বল নিয়ে গিয়ে গোল শোধ দেয়। ভট্টাচার্য্যের গোল দেবার চেষ্টা দু'বার অল্পের জন্য ব্যর্থ হলো। ম্যাকইভার হজেসের নিকট হইতে বল পেয়ে দ্বিতীয় গোল করে। আই এফ এ দল একটুও না দমে প্রবল বেগে আক্রমণ আরম্ভ করলে। রহিম বল নিয়ে সকলকে কাটিয়ে গোলে সট করেছে,

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন স্পোর্টসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পয়েন্ট লাভ করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়ী এল নাথ

ছবি—জে কে সান্যাল

মরকগ্যান পরাজিত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বল পোষ্টে লেগে ফিরে এল। আই এফ এ দল হতাশ না হয়ে প্রবলভাবে আক্রমণ চালাতে লাগলো। হাড্‌ব্যাকেরাও ফরওয়ার্ডদের সঙ্গে যোগ দিলে। প্রেমলালের খেলা বিশেষ দর্শনযোগ্য হয়েছিল। রহিম প্রেমলালের পাশ থেকে মাত্র চারগজ দূর হতে গোলে সট্ করলেও মরগ্যান আশ্চর্য্যভাবে বল ধরে ফেলে কুলহানের দিকে ছুঁড়ে দিলে। কুলহান সেই বল নিয়ে দৌড়ে বিপক্ষদের কাটিয়ে দলের তৃতীয় গোল দিলে। খেলা শেষ হলো। মরগ্যানের চমৎকার গোল রক্ষা, আই এফ এ রক্ষণ-ভাগের অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ও ফরওয়ার্ডদের খারাপ সুটিং তাদের পরাজয়ের কারণ। অতি সুন্দর আদান-প্রদান ও গ্যালারী প্লে দেখিয়ে বেশ বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু খেলায় জয় পরাজয় নির্ভর করে ফরওয়ার্ড-দের সময়মত সুন্দর ও অব্যর্থ লক্ষ্যের উপর। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হ'তে হ'লে আমাদের খেলোয়াড়-দের দৈহিক শক্তির যে আরও বেশী প্রয়োজন তা' বলাই বাহুল্য।

২৫ ও সিকি মাইল ক্রি ষ্টাইল সন্তরণ বিজয়ী দুর্গাবাস

রবি—জে কে সন্তোষ

আই এফ এ :—দত্ত, রেবেলো, জুমা খাঁ ; বিমল, বি, সেন, প্রেমলাল ; সুরমহম্মদ, রহিম, দামলডেন, কে ভট্টাচার্য্য (ক্যাপটেন) ও চৌধুরী।

কলম্বোর টেষ্ট ঃ

কলম্বোয় 'অল সিলোনে'র সঙ্গে টেষ্ট খেলায় আই এফ এ দল ৩-০ গোলে জয়ী হ'য়েছে। চৌধুরী অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ে চলন্ত বলের উপর সট্ ক'রে দলের প্রথম গোল দেয়। পুনরায় চৌধুরীর চমৎকার পাশ থেকে রহিম দ্বিতীয় গোল করে। তারপর সিংহল দলের ডায়াসের সট্ দুর্ভাগ্যের জন্য গোলে ঢোকে না। সুরমহম্মদের পাশ থেকে রহিম দলের তৃতীয় গোল করে। এদিন চৌধুরীর খেলা খুব চমৎকার হ'য়েছিল।

আই এফ এ :—দত্ত, রেবেলো, দাশগুপ্ত ; মুখার্জ্জি, সেন, নন্দী ; সুরমহম্মদ, রহিম, জোসেফ, ভট্টাচার্য্য ও চৌধুরী।

সিংহলে অন্য খেলার ফলাফল :

কান্‌ডি একাদশের সহিত ড্র	০-০
সিলোন " "	৩-০
রেয়ার স্কুটেড্ একাদশের সহিত বিজয়ী	২-০

অষ্ট্রেলিয়ায় জয়-পরাজয়ের তালিকা ঃ

অষ্ট্রেলিয়া অভিযানের জয়-পরাজয়ের সম্পূর্ণ তালিকা :

সাউথ অষ্ট্রেলিয়ার নিকট	বিজয়ী	১-১ গোলে
ভিক্টোরিয়ার "	বিজিত	২-৪ "
নিউ সাউথ ওয়েলসের "		৪-৬ "
নরদার্ণ ডিষ্ট্রিক্টের "		১-১ "
পীডমেতে প্রথম টেষ্ট	"	৩-১ "
কুইন্সল্যাণ্ডের নিকট	বিজয়ী	৭-১ "
ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেষ্ট	ড্র	৪-৪ "
ইপস্‌উইচের নিকট	বিজয়ী	৭-২ "
ডুমার "	"	৫-২ "
নিউকাসেলে তৃতীয় টেষ্ট	বিজয়ী	৪-১ "
সাউথ কোষ্টের নিকট	"	৬-৩ "
চতুর্থ টেষ্ট	বিজিত	৪-৫ "
গ্রানভিলা ডিষ্ট্রিক্টের নিকট	"	৪-১ "
সিডনি একাদশের সহিত	ড্র	৩-৩ "
মেলবোর্ণে পঞ্চম টেষ্ট	বিজিত	১-৩ "
ওয়েষ্ট অষ্ট্রেলিয়ার নিকট	"	১-৫ "
ওয়েষ্ট অষ্ট্রেলিয়ার নিকট	বিজয়ী	৩-১ "

মাদ্রাজে খেলার ফলাফল ঃ

আই এফ এ ভারতে ফিরে এসে মাদ্রাজে দু'টি প্রদর্শনী খেলা খেলে। তারা মাদ্রাজ এফ এ কে ৩-১ গোলে

মাদ্রাজ রেজিমেন্টের এবং মাদ্রাজ রেজিমেন্ট প্রত্যাগত আই এফ এর খেলোয়াড়গণ। আই এফ এ মাদ্রাজ দলকে পরাজিত করেছে

পরাজিত করেছে এবং মাদ্রাজ একাদশের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে।

ডুরাণ্ড ঃ

সাউথ ওয়েলস্ বর্ডারার নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে লোকো স্পোর্টসকে ১-০ গোলে হারিয়ে ডুরাণ্ড বিজয়ী হ'য়েছে। পঞ্চাশ বৎসরাধিক সৈনিকদলই এই কাপ্ বিজয়ী হ'য়ে আসছে। বিজয়ীদল খেলা আরম্ভের কিছু পরেই গোলটি দেয়। রেলওয়ে দল বহু চেষ্টা ক'রে এবং বহু সুযোগ পেয়েও গোলটি শোধ করতে পারে নি।

ছোট ডুরাণ্ড ঃ

কলেজিয়ানস্ 'এ' ১-০ গোলে বিশপ কটন্ স্কুলকে হারিয়ে ছোট ডুরাণ্ড বিজয়ী হ'য়েছে।

ইণ্টার ন্যাসন্যাল ফুটবল ঃ

মিউক্যাসেলে ইণ্টার-ন্যাসনাল ফুটবল খেলায় ইংলণ্ড ৪-০ গোলে নরওয়েকে পরাজিত করেছে। এডিনবরাতে ইণ্টার-ন্যাসনাল খেলায় স্কটল্যাণ্ড ৩-২ গোলে ওয়েলস্‌কে হারিয়েছে।

চ্যারিটির অর্থ ঃ

আই এফ এর চ্যারিটির টাকা ব্যয়ের কমিটি এ বৎসরের প্রাপ্ত মোট ৪১,৬৮৪৷৷০ টাকা সমান তিন ভাগে বিভক্ত করে হাঁসপাতালে, ভারতীয় ও ইউরোপীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রদত্ত হবে বলে স্থিরীকৃত করেছেন।

কোন কোন খেলায় কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া গেছে :—

ভারতীয় বনাম ইউরোপীয়	৩২১২৷৷৶০
ইষ্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং	৮৮৩৬৷৶০
লোকাল বনাম ভিজিটার্স	৭২৭৷৶০
কাষ্টমস্ বনাম মহমেডান স্পোর্টিং (শীল্ড সেমিফাইনাল)	৯৯৮৬৷৷০
ইষ্টইয়র্কস্ বনাম মহমেডান স্পোর্টিং (শীল্ড ফাইনাল)	১১৪৮৫৷৶০
বর্ম্মা দলের খেলা থেকে	৩১৬৩৷৶০
ইসলিংটন কোরিন্থিয়ান্সের খেলা থেকে	৫৩৬৪৲
মোট.....	৪১,৬৮৪৷৷০

সিন্ধুর পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা ঃ

হিন্দু—২১৫ ও ৭২ (৬ উইকেট)

(সাতারাম দাস নট আউট ৯৫ ; দ্বিতীয় ইনিংস—ভিকাজী ২২)

প্রথম ইনিংসে গোলাম মহম্মদ ৭৬ রানে ৫, হাইদার ৪৬ রানে ২, সাত্তার ২৭ রানে ১, লালেওয়ালা ১৯ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে—হাইদার ৩৬ রানে ৩, লালেওয়ালা ১৬ রানে ২, গোলাম মহম্মদ ২০ রানে ১ উইকেট।

মুসলিম—১৩৯ ও ১৪৫ (দাউদ খাঁ ৫৮, গোলাম মহম্মদ ৩৪ ; দ্বিতীয় ইনিংস—হায়দারি ৫৮, দাউদ খাঁ ৩২)

গোপালদাস ৩১ রানে ২, ওধৌজী ৩৭ রানে ৪, জগরাপ ৪৩ রানে ২, নওনল ২৯ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

২২শে অক্টোবর সিন্ধুতে হিন্দু ও মুসলমান দলের মধ্যে ফাইনাল পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় হিন্দুদল ৪ উইকেটে জয়ী

সাত্তারাম

গোপাল দাস

হয়েছে। মুসলিমদল টসে জিতে প্রথমে ব্যাট ক'রতে নামে। কোমরুদ্দিন ও খাদিম হাসান যোগ দিতে না পারায় দল কিছু দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। আরম্ভ খুব ভাল হয়নি, লেনওয়ালা মাত্র এক রান ক'রে বিদায় নিয়েছে। দাউদ খাঁ ও গোলাম মহম্মদ দলের রান সংখ্যা খানিকটা তোলেন ৫৪ ও ৩৪ করে। তাঁদের খেলা বেশ চমৎকার হ'য়েছে। লাঞ্চের সময়কার স্কোর ছিল চার উইকেটে ১১০, এভারেজ খুব খারাপ নয়। এরপর দলের এমন ভাঙ্গন ধরলো যে, কেউই আর দাঁড়াতে পারলো না ; বাকী ছ'টা উইকেট মাত্র ২৯ রানেই চ'লে গেল। পর পর তিনজন ক'রলেন শূণ্য। ওধৌজি চারটে উইকেট পেলে ৩৭ রানে।

হিন্দুদলের আরম্ভও খুব ভাল হয়নি। আমরেল, গোপাল দাস, ভিকাজী কেউই সুবিধে ক'রতে পারলেন না। একমাত্র নবাগত সাতারাম উইকেটের চতুর্দ্দিকে চমৎকার পিটিয়ে খেলতে লাগলেন। ওধৌজি কুড়ি রান ক'রে সাত্তারের কাছে এল বি ডবলিউ হ'লেন। দিনের শেষে হিন্দুদলের ৬ উইকেটে রান ৯৯, সাতারাম তখনও ব্যাট ক'রছেন।

পরের দিন এক গিরিধারীলাল ছাড়া সাতারামকে কেউই বিশেষ সাহায্য ক'রতে পারলে না। মাত্র পাঁচ রানের জন্যে সাতারাম সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হ'লেন। হিন্দুদলের ২১৫ রানে ইনিংস শেষ হ'ল, সাতারাম নট আউট ৯৫। মুসলিম দলের উইকেট রক্ষা অত্যন্ত খারাপ হ'য়েছে, অতিরিক্ত দিতে হয়েছে ৪০।

৭৬ রান পিছিয়ে মুসলিম দল দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। ৩১ রানের মাথায় তিনটে উইকেট পড়ে গেল। তারপর দাউদ খাঁ ও হাইদার আলির সহযোগিতায় চায়ের সময় স্কোর দাঁড়াল ৯৫। হিন্দু দলের ফিল্ডিং খুব খারাপ হ'চ্ছিল, তারা তিনটে সহজ ক্যাচ ফেলেছে। ৩২ রানে দাউদ খাঁ ও ৫৮ রানে হাইদার বিদায় নিলে। আবার উইকেট পড়া সুরু হলো। ইনিংস শেষ হ'ল ১৬২ রানে। ওধৌজি ২২ রানে ৪টা, আর গোপালদাস ১৮ রানে ৩ উইকেট পেলে।

৬৮ রান ক'রলেই হিন্দুদল জিতে যাবে। খুব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে হিন্দুদল ব্যাট করতে নামলো, কিন্তু দিনের শেষে মাত্র ২৯ রানে চারটে উইকেট পড়ে গেল। সাতারাম মাত্র তিন রানে আউট হ'য়ে গিয়ে সকলকেই হতাশ ক'রে দিলে। হাইদারের বল ও ফিল্ডিং খুব ভাল হ'চ্ছে, নিজে দুটো উইকেট নিয়েছে আর লালেওয়ালার বলে দুটো 'ক্যাচ' নিয়েছে।

পরের দিন খেলা আরম্ভ হলে হিন্দুদল ৬ উইকেটে ৭২ রান করলে। ভিকাজীর ২২ রানই সর্ব্বোচ্চ। দু'বছর পরে হিন্দুরা পেণ্টাঙ্গুলার জয়ী হ'ল।

এম সি সির আফ্রিকায় প্রথম খেলা ঃ

ওয়ালি হ্যামণ্ডের নেতৃত্বে পনের জন খেলোয়াড় গঠিত এম সি সি দল টেষ্ট খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁচেছে। লে আছেন—হ্যামণ্ড, হাটন, এডরিচ, পেণ্টার, ভেরিটি, এইম্‌স্, ফারনেস, বার্টলেট, গোডার্ড, ইয়ার্ডলে, গিব্, উইলকিন্‌সন্, ভ্যালেণ্টাইন, রাইট ও পার্কস্।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম খেলায় এম সি সি কেপ্‌টাউনের ওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্স কাউন্টি ডিষ্ট্রিক্ট দলকে এক ইনিংস ও ৩৪২ রানে পরাজিত ক'রেছে। এম সি সি প্রথমে ব্যাট ক'রে ৮ উইকেটে ৫৮৯ রান করে। পেণ্টার ক'রেচেন ১৯৩, তার ভেতর ৫টা ছয় আর ১৮টা চারের বাড়ি মেরেচেন। হ্যামণ্ড ১১৫ মিনিটে রান তুলেচেন ১০৬, চারটে ছয় আর সাতটা চার। ভ্যালেন্‌টাইনের ৬৯ রানে, চারটে ছয় আর তিনটা চার ছিল।

ওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্স ১ম ইনিংসে ১৪০ করে। গডার্ড ৩৯ রানে ৪, আর্ ভেরিটি ২৬ রানে ৪ উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে রান আরও কম ওঠে, মাত্র ১০৭। এডরিচ ৪ উইকেট নেন মাত্র ১৩ রানে, আর ভেরিটি ২৯ রানে ৩ উইকেট।

ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্ট খেলা প্রথম সুরু হয় ১৮৮৮-৮৯ সালে। এ পর্য্যন্ত মোট ৫৯টি টেষ্ট খেলা হয়েছে। ৩৮টি হয়েছে সাউথ আফ্রিকায়,—ইংলণ্ড জয়ী হয়েছে ১৯বার, হেরেছে ১১বার, আর ৮বার খেলা ড্র হয়। ইংলণ্ডে ২১টা ম্যাচ খেলা হ'য়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা মাত্র একবার জয়ী হয়েছিল, ১১বার খেলা ড্র হ'য়েছে, আর বাকী ৯বার ইংলণ্ড জিতেছে।

১৯৩৫ সালে 'ওভাল' মাঠে ইংলণ্ড সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান তোলে, ছয় উইকেটে ৫৩৪। তার আগে ১৯৩০-৩১ সালে কেপটাউনে ইংলণ্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বোচ্চ রান ৮ উইকেটে ৫১৩। লীডস্ মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলণ্ডকে সব থেকে কম ৭৬ রানে নামিয়ে দেয়। ১৯২৪ সালে ইংলণ্ড মাত্র ৩০ রানে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস শেষ ক'রে দিয়েছিল। চারজন ইংলিস ব্যাটস্‌মান দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্টে প্রথমবার নেমেই সেঞ্চুরী ক'রেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কোন ব্যাটস্‌মানই আজ পর্য্যন্ত প্রথম বারেই নেমে টেষ্টে সেঞ্চুরী ক'রতে পারেননি। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্টের মতন দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্টেও নূতন রেকর্ড স্থাপিত হবে বলে আশা করা যায়।

ভারতে এম সি সি ঃ

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের মান্দ্রাজ অধিবেশনে প্রকাশ, আগামী ১৯৩৯ সালের ১২ই অক্টোবর এম সি সি দল ভারতে পদার্পণ করবে। সর্ব্বসমেত ২৬টি ম্যাচ, তার মধ্যে ৩টি টেষ্ট খেলবার পর ১৯৪০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ড যাত্রা ক'রবে। টেষ্ট খেলা হবে বোম্বাই, কলিকাতা ও মান্দ্রাজে। বিভিন্ন প্রদেশে মোট ২০টি ম্যাচ ছাড়া পাতিয়ালার মহারাজার দল, সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়

হ্যামণ্ড

ভ্যালেন্‌টাইন্

এড্‌রিচ

দল ও ক্রিকেট ক্লাব অফ্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে একটি ক'রে খেলা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলাটি আমেদাবাদে গুজরাট ক্রিকেট এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে হবে। অবশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্রিকেট কেন্দ্র আলিগড়েও এটা হ'তে পারে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ অর্থ সম্বন্ধে 'গ্যারান্টি' দেন। এম সি সির এই অভিযানে ব্যয় হবে ১২,৫০০০ টাকা। বোম্বাই কলিকাতা ও মান্দ্রাজ যেখানে টেষ্ট খেলা হবে তাদের যথাক্রমে ২৬০০০৲ টাকা, ২০০০০৲ টাকা ও ১২০০০৲ টাকা দিতে হবে। শেষ খেলা হবে বোম্বাইতে ক্রিকেট ক্লাব অব্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে। এই খেলাটির জন্য বোম্বাইকে ৩০০০৲ টাকা আরও বেশী দিতে হবে। কলিকাতায় টেষ্ট খেলার তারিখ—২৭, ২৮, ২৯, ও ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩৯।

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

বোম্বাই : বরোদা :

বোম্বাই—৪৪১ (৬ উইকেট)

(মার্চ্চেণ্ট নট আউট ১৪৩, হাভেওয়ালা—৬৪, জয়—৫৯, নায়েক—৬৮)

বরোদা—৩২৬

(নিম্বলকার—১১৯, সেখ নট আউট ৩৯)

বোম্বাই ১১৫ রানে জয়ী হয়েছে।

বোম্বাই : সিন্ধু :

বোম্বাই—৩৬৬

(মার্চ্চেণ্ট—১২০, জয়—৬৭, হাভেওয়ালা—৫৪; গোলাম মহম্মদ ৬৪ রানে ৩, হায়দার ১১৭ রানে ৩ উইকেট)

সিন্ধু—৩৭০ (৭ উইকেট)

(নাওমল—১৪৯, দাউদ খাঁ—৭৪, হায়দারআলি—৪০)

সিন্ধু প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকায় জয়ী বলে ঘোষিত হয়েছে।

নওনগর : গুজরাট :

নওনগর—৮ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে।

গুজরাট—১০৫ ও ১৪৮

(অমর সিং ৫৬ রানে ৫, ভিন্নুমানকাদ ২১ রানে ৫ উইকেট; দ্বিতীয় ইনিংসে—ভিন্নুমানকাদ ৪৬ রানে ৫ ও অমরসিং ৫৬ রানে ৫ উইকেট)

নওনগর—২৩৪ ও ১৬ (২ উইকেট)

(ভিন্নু মানকাদ ৮০, কোলা ৪৯, এস্ ব্যানার্জ্জি ৩৮)

পশ্চিমভারত : মহারাষ্ট্র :

পশ্চিম ভারত ২০৯ রানে বিজয়ী হয়েছে।

পশ্চিম ভারত—১৩৮ ও ১৮০

(পট্টবর্দ্ধন ৫১ রানে ৪, যাদব ২৭ রানে ৩ উইকেট)

(দ্বিতীয় ইনিংসে—সাহানী ৫৬ রানে ৫ উইকেট)

মহারাষ্ট্র—১৩১ ও ৭৭ (গান্ধী ৫৩ রানে ৫ ও আকবর খাঁ ৫২ রানে ৪; দ্বিতীয় ইনিংসে—সৈয়দ আমেদ ২৫ রানে ৫, গান্ধী ৫১ রানে ৫ উইকেট)

নওনগর : পশ্চিম ভারত :

নওনগর ৪ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে।

পশ্চিম ভারত—১৬৬ ও ১৮৫

নওনগর—১৬৮ ও ১৮৪ (৬ উইকেট)

পশ্চিম অঞ্চলের ফাইনালে নওনগর ও সিন্ধু খেলবে।

অমর সিং মার্চ্চেণ্ট ভিন্নু মানকাদ

হাগ মাসাই ঃ

বিশ্ববিখ্যাত অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড় হাগ মাসাই-এর মৃত্যু হয়েছে। মাসাইকে বাদ দিয়ে ক্রিকেট ইতিহাস ভাবা যায় না। মাসাই হ'চ্চেন প্রথম অষ্ট্রেলিয়ান যিনি প্রথম শ্রেণীর খেলার প্রথম দিন নেবেই 'ডবল সেঞ্চুরী' করেন। তারপর অবশ্য উড্‌ফুল ১৯২১ সালে আর ব্রাডম্যান ১৯৩০ সালে ঐ রকম রান ক'রেছেন।

'এসেসে'র জন্ম কথা ঃ

আজ যে 'এসেস্' নিয়ে ইংলণ্ড আর অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে এত 'ক্রিকেট যুদ্ধ' তার মূলে হ'চ্চেন মাসাই। ১৮৮২ সালের ওভালে মাসাই না খেল্‌লে 'ছাই নিয়ে যুদ্ধে'র কথা হয়ত আমরা শুনতে পেতুম না। ১৮৮২ সালের আগষ্ট মাসের ঘটনা। খেলা হ'চ্ছে ওভালে। অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে নট রান সংখ্যা হয়েছে মাত্র ৬৫, মাসাই একাই ৫৫ রান করেছেন। ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হ'ল ৭৭ রানে। খেলার শেষ দিকে উত্তেজনা এত প্রবল হ'ল যে একজন লোক ভিড়ের মধ্যে ওপর থেকে পড়ে গেল; তাকে আর জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল না। আর একজন লোক তো ছাতার বাঁটই চিবুতে আরম্ভ ক'রে দিলে। স্কোরাররাও উত্তেজনা থেকে মুক্ত ছিলেন না, তাঁদের একজন খাতার ওপর লিখে ফেলেছেন 'Geese'। ইংলণ্ড হেরে গেল মাত্র ৭ রানে। ইংলণ্ডের ক্রিকেটের গর্ব্ব এইরূপ বিপর্য্যস্ত হওয়ায় ইংলণ্ডের ক্রীড়ামোদীদের কাছে অসহ্য ঠেকতে লাগলো, পরের দিন Sporting Timesএ এই খবরটি বেরুল ;—

"In affectionate remembrance of English cricket which died at Oval on 29th August, 1882."

Deeply lamented by a large circle of sorrowing friends and acquaintances

R. I. P.

N. B. The body will be cremated and the Ashes taken to Australia.

ওল্ডফিল্ডের অবসর গ্রহণ ঃ

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উইকেট-রক্ষক ওল্ডফিল্ড প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ ক'রলেন। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ম্যাচে তিনি সবশুদ্ধ নব্বুইজন ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট ক'রেছেন। ৩১ জনকে ক'রেছেন ষ্টাম্পড, আর ৫৯ জনকে উইকেটের পেছনে লুফেছেন।

ওল্ডফিল্ড

১৯২৮-২৯ সালে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট খেলায় চার ইনিংসে ইংলণ্ডের সবশুদ্ধ রান সংখ্যা হ'য়েছিল ১৯০৮। ওল্ডফিল্ড উইকেট রক্ষা করে বাই দিয়েছিলেন মাত্র তিন রান। তিনি ব্যাটস্‌ম্যানও ভাল ছিলেন।

লর্ড হক ঃ

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় লর্ড হকের মৃত্যু হয়েছে। ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের টেষ্টে পাঁচবার ক্যাপ্‌টেন হন, সে কয় বারই ইংলণ্ড বিজয়ী হয়েছিল।

লর্ড হক

তিনি ইয়র্কসায়ার কাউন্টির ক্যাপ্‌টেন ও এম সি সির ট্রেজারার হয়েছিলেন এবং ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্য্যন্ত এম সি সির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ক্রিকেট শিক্ষক ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত স্লো বোলার গ্রিমেট্ জাঠের মহারাজার 'কোচ' হয়ে ভারতবর্ষে এই প্রথম এসেছেন।

গ্রিমেট

বোম্বেতে ক্রিকেট ক্লাব অব্ ইণ্ডিয়া বনাম ডাঃ কাঙ্গের একাদশের প্রদর্শনী ম্যাচে তিনি ডাঃ কাঙ্গের একাদশ দলের হ'য়ে খেলে ৭৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

জে, ডবলিউ, হিচ, যিনি সারের বিল হিচ নামে পরিচিত, বাঙ্গলা ও আসাম ক্রিকেট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তরুণ খেলোয়াড়দের 'কোচ' হ'য়ে সস্ত্রীক কলিকাতায় এসেছেন।

বাঙ্গলার ক্রিকেট খেলার উৎকর্ষতা লাভের জন্য

এসোসিয়েশনের এ প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিষ্টার হিচ বিভিন্ন ক্লাবের উদীয়মান ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছেন।

টেনিস ঃ

বর্ত্তমান বৎসরের বিশ্বের টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায়ের কোন সরকারী তালিকা প্রকাশিত না হ'লেও অনেক বে-সরকারী তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হ'য়েচে। ফ্রান্সের বিখ্যাত পত্রিকা 'লা অটোর', বিলাতের বিখ্যাত সমালোচক ওয়ালিস মায়ারের (ডেলি টেলিগ্রাফ) এবং ফরাসী টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি পেরী গিলোর তালিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনটি বিষয়ে তাঁরা একমত। তাঁরা প্রত্যেকেই ডোনাল্ড বাজ ও শ্রীমতী উইলিস্-মুডিকে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় বলে স্বীকার করেছেন। আর আশ্চর্য্যের বিষয় যুগোশ্লাভিয়ার পুনসেক তিন জনের তালিকাতেই দশম স্থান অধিকার করেছেন। দু'জনের মতে পুরুষদের দ্বিতীয় স্থান পাইবার যোগ্য ব্রমউইচ। 'লা অটো' যেমন অষ্টিনকে ষষ্ঠ স্থান দিয়ে তাঁর উপর অবিচার ক'রেচে তেমনি আবার ডেলি টেলিগ্রাফের ব্রমউইচের স্থলে তাঁদের অষ্টিনকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া পক্ষপাতিত্ব ব'লে মনে হয়। মোটের ওপর এবারের পৃথিবীর টেনিস ক্রমপর্য্যায়ে আমেরিকা খেলোয়াড়দের নাম সুউচ্চে। যে কোন অপক্ষপাত তালিকায় আমেরিকার পুরুষ ও মহিলায় অন্ততঃ দশজন খেলোয়াড় তাঁদের নাম পেতে পারেন।

উইলিস্-মুডি

ডোনাল্ড বাজ

ছোট বেলায় টেনিস খেলাটা যাঁর সব থেকে খারাপ লাগতো তাঁরই নাম আজ সখের টেনিস খেলার জগতে সবচেয়ে উপরে। ডোনাল্ড বাজ জন্মগ্রহণ করেন কালিফোর্ণিয়া সহরে। ছোট বেলায় তাঁর টেনিস মোটেই ভাল লাগতো না, কিন্তু তাঁর দাদা লয়েড বাজ দিন দিন বাক্স ভর্ত্তি নূতন নূতন বল ঘুস দিয়ে তাঁকে ভুলিয়ে টেনিস কোর্টে নিয়ে যেতেন। ১৯৩৫ সালে ডোনাল্ড মাত্র আঠার বছর বয়সে প্রথম ইউরোপে খেলতে আসেন। তখন তাঁর খেলার ভেতর কতকগুলো খুঁত ছিলো, কিন্তু তবুও তিনি ইংলণ্ডের সেরা খেলোয়াড় অষ্টিনকে উইম্বলডনে আর জার্ম্মাণীর সেরা খেলোয়াড় ভন্‌ক্রামকে ডেভিস্ কাপে হারিয়ে দেন। তারপর ১৯৩৭ সালে আবার যখন বাজ এলেন, তখন তাঁর সুন্দর 'ষ্ট্রোক', তীব্র ও নিখুঁত 'সার্ভিস', চমৎকার 'ব্যাক হাণ্ড ড্রাইভ' আর ততোধিক চমৎকার ভলির সামনে কোন খেলোয়াড়ই দাঁড়াতে পারলো না। বাজ একের পর এক ক'রে উইম্বলডন্, আমেরিকা, ফ্রান্স ও অষ্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করলেন। টেনিস খেলেয়াড়দের নাম ক'রতে গেলে তাঁর নামই আগে মনে পড়ে। গত ১০ই অক্টোবর কালিফোর্ণিয়ায় প্যাসিফিক কোষ্ট চ্যাম্পিয়ানসিপে হফম্যানের নিকট পরাজিত হওয়া ছাড়া গত দু' বছরের মধ্যে বাজ ইংলণ্ড বা আমেরিকার কোন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় কারও কাছে পরাজিত হন নি। একুশ বছর বয়সের খেলোয়াড় বাজ টেনিস জগতে আজ যে রেকর্ড ক'রেছেন তা' ভাঙ্গতে অনেক দিন লাগবে। পুরুষদের মধ্যে যেমন বাজ তেমনি মহিলাদের মধ্য থেকে শ্রীমতী উইলিস্-মুডি টেনিস জগতে নূতন নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেচেন। কুমারী ও পরিণীতা অবস্থায় সর্ব্বশুদ্ধ তিনি ন'

বার উইম্বলডনে খেলতে নামেন এবং মাত্র একবার ছাড়া সব বারই বিজয়িনী হ'য়েচেন। ১৯২৪ সালে তিনি প্রথম নেমে হেরে যান কিটি ম্যাক্‌কানের কাছে। পরে তাঁকে আর কেউই উইম্বলডনে হারাতে পারেন নি। গার্হস্থ্য জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় শ্রীমতী অনেক দিন আর খেলা-ধূলোর দিকে মন দিতে পারেন নি। এবার যখন আবার তিনি নতুন ক'রে উইম্বলডনে নামবার মনস্থ ক'রলেন সকলেই সেটা 'courageous come-back' ব'লেছিলেন, এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে উইম্বলডন বিজয়িনী হওয়া অসম্ভব বলেও মত প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী মুডি প্রমাণ ক'রে দিলেন অনেকদিন প্রথম শ্রেণীর খেলার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রলেও তাঁর পুরাতন দিন এখনও চ'লে যায় নি; এখনও তিনিই পৃথিবীর মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

ডোনাল্ড বাজ পেশাদার ঃ

ডোনাল্ড বাজ শেষ পর্য্যন্ত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় হ'তে রাজী হ'য়েছেন। ৭৫০০০ ডলার চুক্তিতে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভাইনসের সঙ্গে আগামী বৎসরে খেলবেন। তাঁদের প্রথম খেলা হ'বে ৩রা জানুয়ারী ম্যাডিসন স্কোয়ারে।

বিখ্যাত টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের আগমন ঃ

বেঙ্গল টেবল টেনিস এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে বিশ্বের টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরির গিয়াজো ভিক্টর বার্ণা এবং তাঁর সঙ্গী বেলাক্ ভারতে এসেছেন, এই মাসেই কলিকাতায় আসবেন। ভিক্টর বার্ণা ১৯১১ সালে হাঙ্গেরিতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে পৃথিবীর টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ খেলার সিঙ্গলসে ইংলণ্ডের বিখ্যাত খেলোয়াড় এ এ হেডনের কাছে সেমিফাইনালে হেরে যান। ১৯৩০ সালের সিঙ্গলস খেলায় জাবাডোসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসিপ পান। পর পর তিন বৎসর বিশ্বের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ানসিপে তিনি জয়ী হন। জাবাডোস এবং কেলেনের জুটী হ'য়ে তিনি সাতবার ডবল্‌সে বিশ্বের চ্যাম্পিয়ানসিপ পান। এ ছাড়া হাঙ্গেরী, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, জেকোশ্লোভাকিয়া ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতায়ও জয়ী হ'য়েছেন। ১৯৩৭ সালে তিনি পেশাদার খেলোয়াড় দলভুক্ত হন। পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ানসিপ খেলায় বার্ণা ও বেলাক্ তিনবার 'রানার্স আপ' হন। কলিকাতায় এসে তাঁরা কয়েকটি প্রদর্শনী খেলা খেলবেন।

বার্ণা ও বেলাক্ বোম্বাইয়ের টেবিল টেনিস খেলা সম্বন্ধে বলেছেন যে অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা এখানের খেলা উন্নত ধরণের, তবে আরো অনুশীলনের প্রয়োজন আছে।

বেঙ্গল টেবিল টেনিস ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে ভাসিন, ২১-১২, ২১-১৭, ২১-১০ সেটে হান্সলেকে হারিয়ে বেঙ্গল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ্ পেয়েছে। হান্সলে যে এরকম শোচনীয় ভাবে হারবে তা' কেউ ভাবতে পারে নি। পুরুষদের ডবল্‌সে কে, গাঙ্গুলি ও এস, ব্যানার্জ্জি ২১-১৮, ১৫-২১, ২১-১৪, ১৩-২১, ২১-১৩ সেটে ভাসিন ও ঘোষকে হারিয়ে দিয়েছে। মেয়েদের সিঙ্গল্‌সে কুমারী বান্নি সেন ২০-২১, ২১-১৭, ২১-২০ সেটে কুমারী এস লা ডিকে হারিয়ে বিজয়িনী হ'য়েছেন। এই বৎসর তাঁর প্রথম এই প্রতিযোগিতায় যোগদান।

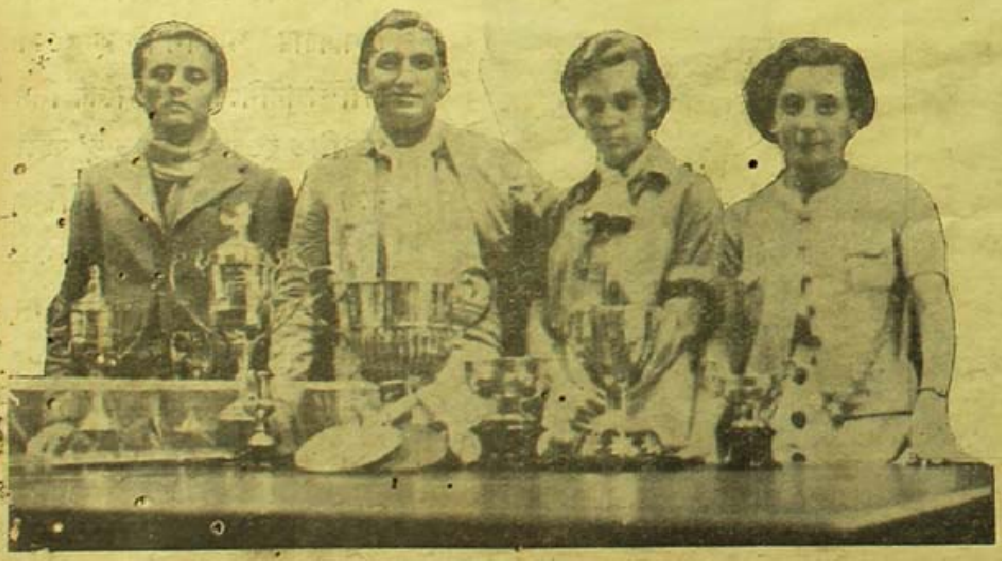

বেঙ্গল টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজিত খেলোয়াড়গণ ; (বাম থেকে) এম কে হান্সলে (রাণার্স আপ), ডি আর ভাসিন (বিজয়ী), মিস্ বান্নি সেন (বিজয়িনী), মিস্ লুডিড (বিজিতা) ছবি—জে কে সান্যাল

কলিকাতায় আমেরিকার টেনিস দল ঃ

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলিকাতা সাউথ ক্লাবের আগে এবার আমেরিকা থেকে একদল টেনিস খেলোয়াড় এখানে আসবেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানসিপে খেলতে। পরে তাঁরা ভারতবর্ষের সব বড় বড় টেনিস প্রতিযোগিতায় নামবেন। এই দলে আছেন,—চার্লস হ্যারিস, ডন্ ম্যাকনীল, আওয়েন এণ্ডারসন ও ডবলিউ রবার্টসন। রবার্টসন ছাড়া দলের সকলেই তরুণ। হ্যারিসের বয়স এখন তেইশ। তিনি সম্প্রতি পৃথিবীর তিন নম্বর খেলোয়াড়। রিগস্‌কে হারিয়ে বেশ সুনাম অর্জ্জন ক'রেছেন। এণ্ডারসনের বয়স বাইশ বছর। ইনি ভারতবর্ষে এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস মহম্মদকে Reveiraতে হারিয়েছিলেন। ম্যাকনীলের বয়স মাত্র একুশ। ফ্রান্সের এক নম্বর খেলোয়াড় Petra সম্প্রতি আমেরিকা পরিভ্রমণ ক'রে এসে এই অভিমত জ্ঞাপন ক'রেছেন যে, আমেরিকায় যেমন নূতন নূতন খেলোয়াড় তৈরী হ'চ্ছে এমনটি পৃথিবীতে আর কোথাও হয় না। টেনিস জগতে চমক্ লাগিয়ে দিতে আমেরিকার কাছে অন্য কোন দেশ দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং সাউথ ক্লাবের আমেরিকা থেকে টেনিসদল আনানোর এই প্রচেষ্টা খুব সময়োপযোগী হ'চ্ছে সন্দেহ নেই। প্রতি বৎসর বহু অর্থ ও সামর্থ্যের বিনিময়ে টেনিস খেলার উন্নতির জন্য সাউথ ক্লাবের এই প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

নিউজিল্যাণ্ডে মানাভাদার হকি ঃ

মানাভাদার হকি দল নিউজিল্যাণ্ড অভিযান শেষ করে ভারতে ফিরে এসেছে। নিউজিল্যাণ্ডে সর্ব্বসমেত ৩১টি খেলা হয়। অকল্যাণ্ড প্রদেশ দলের কাছে মাত্র একটি খেলায় তাদের হার হয়, বাকি ত্রিশটিতে তারা জয়ী হয়েছে। বে-সরকারী তিনটি খেলাতেই ভারতীয়রা জয়লাভ করে। মানাভাদার দল এ অভিযানে সর্ব্বসমেত গোল ক'রেছে ২৩২, আর বিপক্ষ দল গোল দিয়েছে মাত্র ১৯টি। অষ্ট্রেলিয়াতে ৮টি খেলা হয় এবং সকলগুলিতেই ভারতীয়রা জয়ী হয়েছে, তাদের পক্ষে গোল হয়েছে ৫৮টি। তাদের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া দল মাত্র ৬টি গোল দিতে পেরেছে।

ভারতের টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায় ঃ

গাউস মহম্মদ এবার একা প্রথম স্থান অধিকার করলেন এবং সোহানী দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেলেন। কাপুর তৃতীয়ই রইলেন। গত বৎসরের প্রথম স্থান অধিকারী বব ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী শোভনলালের নাম তালিকায় কোন স্থানেই নেই।

মেয়েদের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন মিসেস বোলাণ্ড; গত বৎসরের প্রথম স্থান অধিকারিণী মিস লীলা রাও ও মিসেস ম্যাক্‌ইন্‌সের মধ্যে মিস লীলা রাও দ্বিতীয় হলেন, মিসেস ম্যাক্‌ইন্‌স কোন স্থানই পেলেন না।

অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড প্রত্যাগত মানাভাদার হকি দল। সকল খেলাতেই জয়ী হয়েছে, মাত্র একটি খেলায় [illegible]

সোহানী গাউস মহম্মদ

মিসেস লেকম্যান তৃতীয় স্থানে নামলেন। মিস ডুবাস চতুর্থই রইলেন।

(১) গাউস মহম্মদ, (২) এস এল আর সোহানী (৩) ডি এন কাপুর (৪) রণবীর সিং (৫) যুধিষ্ঠির সিং (৬) বি টি ব্লেক এবং জে এম মেটা (৭) এস সি বিটী (৮) এস এ আজিম এবং এইচ এল সোনী (৯) টি কে রামানাথম্।

মহিলা খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায়ঃ

(১) মিসেস বোলাণ্ড (২) মিস লীলা রাও (৩) মিসেস জে সি লেকম্যান (৪) মিস এম এইচ ডুবাস (৫) মিস এম উডকক্ (৬) মিসেস আর এম ফুটিট (৭) মিস এল্, উডব্রিজ।

মিসেস্ বোলাণ্ড

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী প্রণীত উপন্যাস "কবে তুমি আসবে"—১৷৹

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্রপতি প্রণীত নাট্যনিকেতনে অভিনীত নাটক "সমাজ"—১৷৹

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অজানা পথে"—২৲

শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "রসের নাড়ু"—৷৵৹

শ্রীখেলেন্দ্রনাথ গুই প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "ডানপিটে"—৷৵৹

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "স্মৃতির বিড়ম্বনা"—৷৵৹

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "পাতালপুরী"—৷৵৹

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত "হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়"—১৲

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত শিশুপাঠ্য পুস্তক "যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্দ্ধন"—৷৵৹

শ্রীধীরকুমার চৌধুরী প্রণীত (কবিতা পুস্তক) "জলের লিখন"—২৲

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত শিশুপাঠ্য পুস্তক "ভক্তের ভগবান" —৷৵৹

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অদৃষ্টের ইতিহাস"—২৲

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "তরঙ্গ রোধিবে কে" দ্বিতীয় খণ্ড—২৲

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র প্রণীত কবিতা পুস্তক "চন্দ্রমল্লিকা"—১৲

অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র সেন প্রণীত "যজুর্ব্বেদীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পদ্ধতি"—১৷৵৹ ও "যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ পদ্ধতি"—৷৹

শ্রীজীবানন্দ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "অসমতল"—২৲

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত "মাটির নর্ব্বরূপ"—১৷৹

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত শিশুপাঠ্য পুস্তক "সিরাজদ্দৌলা"—৷৵৹

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য "রত্নদ্বীপের বিভীষিকা"—৷৵৹

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ছেলেদের পূজার উপহার "যাদুঘর"—১৷৹

শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের "শত্রু সংহার"—৷৹

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র যোগাধ্যায়ী প্রণীত মূল ও পদ্যানুবাদ "গীতা"—৷৵৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য—২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যে ষাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাইব, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বর সহ টাকা মনিঅর্ডার করিলে ৷৵৹ আনা, ভিঃ পিঃতে ৷৷৹ টাকা। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন।

—কার্য্যাধ্যক্ষ, ভারতবর্ষ

সম্পাদক—রায় জলধর সেন বাহাদুর ‖ সহঃ সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta